চিত্র-সূচী

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

৬। বাঞ্ছিত বিশ্রাম (শিল্পী—ডবলিউ, কে, ম্যাক্কেন)
৭। সাথী (শিল্পী—অটো এরেলম্যান)
৮। তিন পুরুষ (শিল্পী—ডি, এ, সি, আর্টজ)
৯। ডাচ্ ধীবর-বধূগণ (শিল্পী—পি, স্যাডে)
১০। ডাচ মাছধরা তরী (শিল্পী—এইচ, ডবলিউ মেসড্যাগ)
১১। ওসাকার পুতুল-সম্মেলনে আমেরিকার অতিথি
১২। কোরিয়ানা গায়িকা-বালা—তেই-কিও-কু-চৌ প্রেসিডেণ্ট মুবায়ামার নিকট পুরস্কার গ্রহণ করিতেছে
১৩। মার্কিণ ও জাপ বালিকারা পরস্পর করকম্পন করিতেছে
১৪। আমেরিকা প্রেরিত পুতুল সন্দেশবহ
১৫। গোসো বিল্ডিং, কাটুনি সঙ্ঘের হেড্ অফিস
১৬। আমদানী তুলার গুদাম, টোকিও
১৭। বস্ত্র শিল্প কারখানার অভ্যন্তর
১৮। মাষ্টার মোদক বা ভারতীয় 'জ্যাকি কুগান'
১৯। মিসেস যোধ, (ব্যাম) মাদাম মন্তেসরি, (মধ্যস্থলে) মিসেস ব্যাস (দক্ষিণে)
২০। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়

চৈত্র

১। কাঙ্গালিনী (ত্রিবর্ণ)
২। প্রবর্ত্তক যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির—চন্দননগর
৩। প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থী-ভবন—চন্দননগর
৪। প্রবর্ত্তক-আশ্রম—চন্দননগর
৫। প্রবর্ত্তক নারী-মন্দির—চন্দননগর
৬। প্রবর্ত্তক-ভবন—কলিকাতা
৭। প্রবর্ত্তক-আশ্রম—খাদি-বিভাগ, চট্টগ্রাম
৮। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ—কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম
৯। প্রবর্ত্তক-আশ্রম—মেলান্দহ, মৈমনসিংহ
১০। প্রবর্ত্তক-আশ্রম—সুন্দরবন
১১। প্রবর্ত্তক-আশ্রম—রায়না, বর্দ্ধমান
১২। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ
১৩। নবপরিচালিত কৃষিক্ষেত্র (বীরনগর)
১৪। পুরাতন দ্বাদশ মন্দির
১৫। চূর্ণীনদীর তীরবর্ত্তী আশ্রম
১৬। চূর্ণী নদীর আর একটী দৃশ্য
১৭। চূর্ণীতীরে কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্র
১৮। খাঁ দিঘীতে রোটারী স্প্রেয়ার দ্বারা প্যারীসগ্রীণ ছড়ান হইতেছে
১৯। বীরনগর মিউনিসিপ্যাল আফিসে অভ্যাগত-মণ্ডলীর আগমন
২০। বিধ্বস্ত পুরাণীবাজারের একাংশ
২১। শয্যাশায়িতা শ্রীঅনুরূপা দেবী
২২। শাহজীর শিবমন্দির
২৩। এই বাড়ী পড়িয়া এগার জন মারা গিয়াছে
২৪। এই ভগ্নস্তূপের নীচে সাত জন সমাধিস্থ হইয়াছে
২৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীপ্রকাশম্ ও রিলিফ কমিটীর অন্যান্যকর্ম্মিগণ
২৬। স্বর্গীয় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র
২৭। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র
২৮। মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড
২৯। সিনর মুসোলিনী
৩০। ডি, ভ্যালেরা
৩১। সুভাষচন্দ্র বসু
৩২। মহাত্মা গান্ধী
৩৩। লেনিন
৩৪। উপরে—অধ্যাপক মলি, বামে—লুই ডগলাস দক্ষিণে ওয়ারবার্গ
৩৫। মিসেস্ ফ্রান্সেস রবিনসন
৩৬। প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি-ভবনে ফরাসী ভারতের গভর্ণর

অসুরনাশিনী

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

Engraved by Prabartak Halftone Works, Calcutta.

১৮-শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪০ | ৭ম সংখ্যা

পূজার স্মৃতি

বোধহয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইবে। ভারতের হিন্দু-জাতি বহুদিন ধরিয়া পৌত্তলিক। তাহার পূজামণ্ডপে প্রতীকোপাসনার ধূম আজিও সারা জাতির প্রাণে উৎসাহ ও আনন্দ সঞ্চার করে। পূজার দালানে দশভূজার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ষষ্ঠীর দিন বোধনের মন্ত্র যখন উদ্গান তুলিল, তখন তুলি দিয়া আঁকা প্রতিমার বিস্ফারিত নয়নযুগল যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—রক্ত অধরে হাসি ফুটিল। ভাবপ্রবণ চিত্তে ভ্রম হওয়াও বিচিত্র নহে; কিন্তু সেদিন তাহা সত্য বলিয়াই অনুভূত হইয়াছিল।

সপ্তমীর প্রভাতে দলে দলে পল্লীবালকেরা রাশি রাশি ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল। স্নাত পুরোহিত পূত চিত্তে পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিল। পুরনারীগণের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল। মণ্ডপে শঙ্খ বাজিল, প্রাঙ্গণে ঢাক ঢোলের সহিত সানাই ফুকারিয়া উঠিল—সে মহোৎসবের আনন্দোচ্ছ্বাস ভাষায় বর্ণনার নহে।

সব চেয়ে মনে পড়ে অষ্টমীর সন্ধি-পূজার অনুষ্ঠান। এক-প্রহর রাত্রির পর সন্ধি-পূজার ক্ষণ ছিল। পূজাবাড়ী উৎসব-মুখরিত। পূজার দালানে কুলনারীগণ গললগ্নীকৃতবাসে, কৃতাঞ্জলি-পুটে, নির্নিমেষ নয়নে প্রতিমার দিকে চাহিয়া আছে। আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্বগণ অঙ্গনে কিসের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব, উৎকণ্ঠিত। পিতাঠাকুর মহাশয় ঘড়ির দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিলেন, "ঠাকুর, আর এক মিনিট বাকী।"

স্থির আসনে পুরোহিতের প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি স্পন্দনহীন হইল। কণ্ঠে কণ্ঠে অস্ফুট কলধ্বনি উঠিতেছিল, অকস্মাৎ

জগৎপ্রাণ সমীরণ স্তব্ধ হইলে যেমন পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ পূজাবাড়ী যেন নীরব মূকের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

তারপর, যজ্ঞবেদী সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধমুখী হইল। সকলের চক্ষু মুদিত হইয়া পড়িল। যেন বহুদূর হইতে আচম্বিতে কি এক অপ্রাকৃত কণ্ঠধ্বনি পরিশ্রুত হইল—

"কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্র-খট্বাঙ্গ-ধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতি-ভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্ত-নয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥"

"ওঁ স্বাহা—ওঁ স্বাহা" আহুতির গর্জ্জনে চক্ষু বিস্ফারিত হইলে, দেখিলাম—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভাবপ্রবণ চিত্ত সেদিনেও বোধহয় স্বপ্নই দেখিয়া থাকিবে; কিন্তু সে স্মৃতি ভুলিবার নহে।

দেখিলাম—মেরুদণ্ড ঋজু করিয়া উন্নতগ্রীব বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বক্ষে তাঁহার রজতশুভ্র ত্রিদণ্ডী উপবীত, স্তিমিত নয়ন, সঘৃত বিল্বপত্রের আহুতি, প্রচণ্ড অগ্নিশিখা; আর সেই জ্বালামালাময় অনলরাশির মধ্যে তাথিয়া তাথিয়া তাণ্ডবনৃত্যপরায়ণা ভীমা ভীষণা ভৈরবী মূর্ত্তি!

হোমের মন্ত্র স্তব্ধ হইল পূজামণ্ডপে বিস্ময়বিহ্বল নরনারী অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। কি জানি কি একটা অঘটন ব্যাপার ঘটিয়া গেল! কেহ দেখিল, কেহ অনুভব করিল, কেহ অনুমানে বুঝিল—কিন্তু সকলেরই অন্তর যে প্রসন্ন ও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময়ে বুঝিয়াছিলাম; তবে তাহা সেই একটী মুহূর্ত্তের জন্য!

আবার বাজিয়া উঠিল—ঢাক, ঢোল সানাই, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খধ্বনির মহারোল উঠিল—কণ্ঠে কণ্ঠে উৎসবের কোলাহল। পূজার যে গাম্ভীর্য্য, যে ভাব-মাধুর্য্য তাহা অষ্টমীর এই সন্ধি-পূজার পর আর যেন খুঁজিয়া পাইলাম না।

আজ এই সাতাশ বৎসর ধরিয়া এই রহস্য আমার কাছে অধিকতর মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজও পূজামন্দিরে সেই মন্ত্র-মূর্ত্তি দেখিবার আশায় উৎকণ্ঠিত নয়নে প্রতীক্ষা করি। প্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে পৌত্তলিকতার অনুষ্ঠান ভুলিয়াছি। পূজাপার্ব্বণে সে ঘটা চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছি। কিন্তু নিষ্কলুষ জীবনের সাধনায় আজও অষ্টমী-পূজার সন্ধিক্ষণে হোমকুণ্ড সাজাইয়া সঘৃত তর্পণ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলি, "কালী করালবদনা, জাগো মা, বাংলার প্রতি নারী পুরুষের হৃদয়মণ্ডপে পুঞ্জীভূত অশুদ্ধির হিমালয় বিদলিত করিয়া নাচো—ভীষণ লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া প্রতি রক্ত-কণায় যে আসুরিক বীজ তাহা নিঃশেষ করিয়া লেহন কর। মুক্তি দাও, দৃষ্টি দাও। মৃণ্ময়ী প্রতিমার আড়ালে আর লুকাইয়া থাকিও না। আমারই স্ব-ভাব স্ব-শক্তিকে জাগাইয়া, বলে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে আমায় পরিপূর্ণ করিয়া দাও। আমার দিব্য জন্ম সফল কর। জন্মের, কর্ম্মের যে মৌলিক সঙ্কল্প তাহা সিদ্ধ করার শক্তি দাও।"

যে মহাদেবি, এই মানস-পূজার পূত সঙ্কল্প লইয়া প্রতি বৎসর তোমার আগমনী-সঙ্গীত গাহিয়া থাকি; সন্ধিপূজার প্রজ্জ্বলিত হোমশিখার দিকে চাহিয়া আমার প্রাণের পরতে পরতে ভীমা কালীর নৃত্য সন্দর্শন করি—আর মহোল্লাসে বগল বাজাইয়া, উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়া থাকি—আরও যদি কিছু সঞ্চিত থাকে, হৃদয়রাসমঞ্চে তাহা পুড়াইয়া ছাই করিয়া দাও। হৃদয় শ্মশান হোক। দেবি! তোমার মঙ্গল-মধুর নৃত্যে আমার জীবনে শান্তি ও আলোর ঝরণা ঝরিয়া পড়ুক।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সমস্যার দিনে

আজ নাকি আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জটিলতার ও সমস্যার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি ; কিন্তু আশ্চর্য্য, সমস্যা কি এবং কিসের, এই প্রশ্ন তুলিলে এত কথা আসিয়া পড়ে যাহা উদ্ভিন্ন করিয়া কোন একটা সমষ্টি-শক্তিকে নিবিড়-ভাবে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সমস্যার প্রতিকারে উদ্যত হইতে দেখা যায় না। অবশ্য একটা সদুত্তর আছে, যাহা এক-যোগে আমরা সকলে স্বীকার করিয়া লই—তাহা হইতেছে আমাদের রাষ্ট্র-পরাধীনতা। এবং এই রাষ্ট্র-সাধনায় এই জন্য আমরা দেশের বিশাল জনশক্তিকে আজ সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ঠিক সমস্যা নহে, ইহা সমস্যার লক্ষণ। যে সমস্যায় পড়িয়া জাতির আজ এই দুরবস্থা সেই সমস্যার নিরাকরণ করিতে পারিলে স্বভাবতঃই দেশের সুদিন দেখা দিবে। এইরূপ চিন্তাধারার ফলে রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্র হইতে অনেক যোগ্য ব্যক্তিকেই আমরা নানা দিকে কর্ম্মোদ্যত হইতে দেখিতে পাই। অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্র-পরাধীনতা যে কারণে ঘটিয়াছে সেই কারণগুলির মূলোৎপাটন করিলে রাষ্ট্র-মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই জন্য আমাদের সমাজ-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, ধর্ম্ম-সমস্যায় জাতির অনেকখানি শক্তিকে নিয়োজিত দেখিতে পাই। অন্য পক্ষের কথা—কারণ যাহাই হউক, যদি পরাধীনতার বন্ধন মোচন করিতে পারি, তাহা হইলে সকল সমস্যাই দূরীকৃত হইবে। এইরূপ নানা ভাবে ও কর্ম্মে জাতির প্রাণশক্তি বিভিন্নমুখী হইয়া কোন একটা লক্ষ্যে সবেগে পৌঁছিতে পারিতেছে না।

অনেকে মনে করেন, হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা না থাকিলে জাতীয় শক্তি আজিকার ন্যায় এইরূপ হীনপ্রভ হইত না। অনেকে আবার মনে করেন, ধর্ম্ম ব্যক্তিগত না হইয়া সমাজগত বা সাম্প্রদায়িক হওয়ায় আমাদের সংহতি-শক্তি গড়িয়া উঠিতেছে না। কেহ মনে করেন, বাল্য-বিবাহ প্রবর্ত্তিত থাকায় ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় হিন্দুজাতির প্রাণশক্তি একদিকে দুর্ব্বল হইতেছে ও অন্যদিকে প্রসারিত হইতে পারিতেছে না। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বর্ত্তমান শিক্ষানীতি আমাদের মস্তিষ্ক-বৃত্তিকে এমনই পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে, যাহাতে আর আমরা আমাদের চরিত্রবল রক্ষা করিতে পারিতেছি না, কোনও একটী উদ্দেশ্যের উপলব্ধির পথে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া শেষ পর্য্যন্ত আগাইতে পারি না। রাষ্ট্র-সাধক একান্ত পক্ষে অচল-জীবন হইলে এই সকল দিকে আপনার জাগ্রত শক্তিকে লীলায়ত করিয়া রাখার জন্যই দৃষ্টিপাত করেন ; পরন্তু রাষ্ট্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ ব্যতীত যে পূর্ব্বোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান আসিতে পারে না, ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। লক্ষ্য এক না হওয়ায় জাতির প্রাণশক্তি এইরূপ বিচিত্র ভঙ্গীতে ও বিচিত্র ধারায় বহুমুখী গতিতে ছুটিয়াছে। রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে এই জীবন-গতির চূড়ান্ত সঙ্কল্প-রক্ষা দেখা যায় না বলিয়া ক্রমেই যেন বিশ্বাস হইতেছে, যে দেশের সকল সমস্যার অন্ত আনিতে হইলে রাষ্ট্র-মুক্তিকে পুরোভাগে ধারণ করিতেই হইবে।

কিন্তু কোন একটা লক্ষ্য সুনির্ণীত হইলেই দেশের সবখানি প্রাণশক্তি যে তাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। এই জন্য রাষ্ট্র-মুক্তিই যদি সকল সমস্যার সমাধান-হেতু হয়, তাহা হইলে দেশের জাগ্রত প্রাণশক্তিকে শনৈঃ শনৈঃ ঐক্যবদ্ধ ভাবে অবিচলিত চিত্তে অনন্যমনাঃ হইয়া এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের এক তৃতীয়াংশ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াও এই শক্তি যদি রাষ্ট্র-মুক্তির অধিকারী হয়, তবে সেই অধিকার-বলেই দেশের সকল সমস্যার প্রাচীন ভাব-সঙ্গত সমাধান না হউক, একটা সঙ্গতিপূর্ণ মীমাংসায় এই শক্তি জাতিকে উপনীত হইতে বাধ্য করিবে। ইটালী, স্পেন, জার্ম্মানী, রুশিয়া, যুগোশ্লোভিয়া ও তুর্কিস্থানে এইরূপ দৃষ্টান্ত আজ সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি লইয়া রাষ্ট্র-সাধকদের অন্তরে আশার সহস্র ঘৃত প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। অন্য সকল সমস্যাকে আজ উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্রে মুক্তিপন্থী যে যে দল শনৈঃ শনৈঃ আত্মদানের তপস্যায় জয়ের পথে অগ্রসর হইবে সেই সেই দলই ভবিষ্যতে নিখিল জাতির পুরাতন সমস্যার বনীয়াদ পর্য্যন্ত উপাড়িয়া একটা নূতন বিধানে ভারতের জাতি, ধর্ম্ম, সমাজকে গড়িয়া তুলিবে। সেদিন আমরা দেখিতে পাইব, যে সকল সমস্যা লইয়া দেশের অধিকাংশ লোক চীৎকার করিতেছিল তাহা কেবল চিন্তা-ক্রিয়ার বিলাস মাত্র।

অতএব আমরা রাষ্ট্র-মুক্তির সাধনাই দেশের সর্ব্ববিধ সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং জাতির সবখানি প্রাণশক্তিকে এই পথে নানা দিক্ দিয়া চলিবার জন্য নিঃসঙ্কোচে উদ্বুদ্ধ করিতে পারি।

কথাটা এই পর্য্যন্ত হইলে সমস্যা আর কিছু থাকে না এবং এই রাষ্ট্র-মুক্তির অভাবে আমাদের পদে পদে বাধা বিঘ্ন দেখিয়া মানুষের মনের যে সহজ ধারণা তাহাতে ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি, কোন উক্তি উত্থাপিত হইতে পারে না; কিন্তু বিষয়টা এত সহজ এবং সরল নহে। যে দলকে রাষ্ট্র-মুক্তির পথে উদ্যত হইতে হইবে, যে দলকে ভারতের সকল সমস্যার নিরাকরণ করিতে হইবে, সেই দল-গঠনের মূলেই যে প্রকাণ্ড সমস্যা বিরাট্ অন্ধকার ঘনাইয়া হুমকী দেখায়, তাহাই হইতেছে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা জটিলতম সমস্যা। আজ যে আমরা কোন মতে সংহতিবদ্ধ হইতে পারি না, কোনও সংস্কার-সাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রাণ শক্তিকে জাগাইতে পারি না, তাহার সহজ কারণগুলি অবশ্যই আমাদের স্বার্থ-পরতা, অন্ধতা অদূরদর্শিতা এবং তাহার মূলে আছে—অস্পৃশ্যতা, শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য, সামাজিক কলঙ্ক; কিন্তু এই সকলই বিচিত্র ভঙ্গীতে দেখা দিতেছে যে মূল সমস্যার দ্যোতনা স্বরূপ, তাহা যদি আমরা প্রকৃষ্টরূপে অবধারণ না করি আমাদের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়া অমোঘ হইবে না।

সেই সমস্যার কথাটা আমাদের ভাষায় আজ ব্যক্ত করিলে, যে কারণে মার্জ্জিত-বুদ্ধি বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিবেন না, তাহাও এই সমস্যারই একদিকের অভিব্যক্তি আমরা এই হেতু যাঁহাদের শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক-বৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহাদেরই ভাষায় সেই মূল সমস্যাটীর কথা উল্লেখ করিব; তাহা হইলে হয়তো কিয়ৎপরিমাণে পাঠকদের বুঝাইতে পারিব—এজাতি প্রকৃতপক্ষে কোথায় গলদ করিয়াছে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যেমন ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির ভিন্নতা-বোধের হেতু পরস্পরের মধ্যে আকার-বর্ণ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের তারতম্য, তেমনি এক জাতির সহিত অন্য জাতির এইরূপ একটা অকাট্য আকৃতি-প্রকৃতিগত ব্যবধান আছে। এক জাতি অন্য জাতির সহিত পৃথক্, কেন না এক জাতির চিন্তাধারা অন্য জাতির তুল্য নহে। এই হেতু এক জাতির আচার-ব্যবহার, সমাজ, ধর্ম্ম অন্যজাতি হইতে স্বতন্ত্র প্রকারে অভিব্যক্ত হয়। এই জাতি-বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচিত্র পুষ্পবৃক্ষের ন্যায় জগৎকে শোভ শালী করিয়াছে। রুশের সহিত জার্ম্মানীর এইরূপ প্রকৃতিগত ভেদ আছে বলিয়াই তাহারা পাশাপাশি অবস্থান করিলেও, একজাতি নহে। এইরূপ জার্ম্মানীর সহিত ফ্রান্স, ফ্রান্সের সহিত স্পেন, ইটালীর চিন্তাধারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হওয়ায় প্রত্যেকে এক একটি জাতি-রূপে মাথা তুলিয়া আছে। ভারত এইরূপ একটী মহাজাতি। ভারতের চিন্তাধারা, ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ-বিধান অপূর্ব্ব, অসাধারণ বস্তু। তাহা

যদি সে আপনার সবখানি দিয়া অবধারণ করিয়া থাকে, আর এ জাতির সবখানি অন্য এক চিন্তাধারা ও জীবন-ভঙ্গী লইয়া ভিন্ন জাতি যদি অধিকার করিয়া বসে, তাহা হইলে সমস্যার মূল কোথায় তাহা সহজেই অনুমেয়। আর যদি এই পরাভূত জাতিটা তাহাদের নিজস্ব চিন্তা-ধারা ও প্রকৃতিগত আচার আদর্শ বিসর্জন দিয়া বিজয়ী জাতির সহিত একাঙ্গীভূত হইতেই চাহে, তাহাও যে কত বড় সমস্যা তাহা অধিক করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাংলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে এই সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন এই ক্ষেত্রে তাহা উল্লেখ করিয়া বিষয়টী যতখানি বিশদ করিয়া বলিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব। লর্ড রোণাল্ডশের প্রশ্ন—"The question is whether India has the will to persist as a distinctive type among the races of the world, or whether she will be content to merge her individuality in the virile type which has been evolved in the western hemisphere ?" অখণ্ড ভারতবর্ষ কি জগতের জাতিসকলের মধ্যে তাহার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিবে অথবা পশ্চিম দিক্ হইতে যে সভ্যতার নব আলোকে সে আজ উদ্ভাসিত তাহার মধ্যে সে আপনাকে লয় করিয়া দিবে ?

আমি বাংলার অনেক মনীষীর সহিত কথা কহিয়া দেখিয়াছি, ভারতের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বাদ রক্ষা করার কোন সুফলের সম্ভাবনা নাই জানিয়া তাঁহারা ভারতের বৈশিষ্ট্যবাদের ভিত্তি উপড়িয়া দিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বিশ্বের দিগ্বিজয়ী পাশ্চাত্য শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার দাবী ইঁহাদের মধ্যে বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমস্যা এই উভয় প্রশ্নেই থাকিয়া যাইতেছে। যদি পাশ্চাত্যের আলোকপ্রাপ্ত দেশের মনীষিগণ একেবারেই এই আক্রমণকারী জাতির সহিত একীভূত হইতে চাহেন অথবা ইঁহাদের ভাব ও আদর্শ বরণ করিয়া নিজেদের চিন্তাভঙ্গী ও আদর্শধারার কিছু নূতন সংস্করণ গড়িয়া তুলেন, তাহা হইলে প্রথম ক্ষেত্রে যেমন তাঁহাদের একমাত্র পূর্ব্বতন সমাজ-শক্তি হইতেই বিরোধের সম্মুখীন হইতে হইবে, তেমনি অপর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার একাংশ লইয়া মাথা তুলিতে চাওয়ায় যুগপৎ প্রাচীন সমাজের সংঘাত এবং বিজয়ী পাশ্চাত্যের দিক্ হইতেও তাহার সবখানি লওয়ার দাবীর আঘাতও বড় কম বাজিবে না। আবার পূর্ব্ব পক্ষ যদি সম্পূর্ণভাবে তাহার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই মাথা তুলিতে চাহে, তাহা হইলেও আধুনিক শিক্ষিত স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতেই যেমন প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি হইবে, সেই সঙ্গে বিজয়ী পাশ্চাত্য জাতিও তাহাদের পক্ষে কম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে না। রাষ্ট্র-মুক্তির পথে যে অখণ্ড সংহতি-শক্তি গড়িয়া উঠিতে চাহে, সেই শক্তির সম্মুখে এইরূপ জটিল সমস্যাই নানা আকারে বিঘ্নের কারণ হইয়াছে। ইহার সুমীমাংসার ভার দেশপ্রাণ দরদী সাধকবৃন্দকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা তাই এই সঙ্কট-যুগে দেশের ভাব, আদর্শ, আন্দোলন প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে সকল মনীষী দেশের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া সমগ্র জাতিকে ভাবাইয়া তুলিতেছেন, বিপুল দেশকে উহার সম্মুখীন হইতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, এই অন্ধকার-যুগে দিগ্‌দর্শনের বিদ্যুৎ-রশ্মি সঞ্চালিত করিয়া পথ-নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাঁহাদের অবদান-ভার দেশের সম্মুখে একত্র সমাবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া যাঁহারা অনির্ব্বাণ দীপশিখা জ্বালাইয়া দেশের প্রাণকে বিপদের দিনের আশায় উৎসাহে সজীব রাখিয়াছেন, দেশের এই সাংবাদিক-মণ্ডলী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত শ্রম ও ত্যাগে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র দেশের প্রাণকে যে সচেতন, উৎকণ্ঠিত, সমস্যার সমাধানে উদ্যত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা আজ সত্যই দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। আমরা বাংলার সহযোগী সংবাদপত্র-সেবী সুহৃদ্‌বর্গের যে সকল অমূল্য অভিমত এই ক্ষেত্রে পত্রস্থ করিতেছি, তাহা কেবল ঐতিহাসিক নজীর রূপেই প্রবর্ত্তককে ধন্য করিবে না, "প্রবর্ত্তকে"র পাঠক ও বিশেষ করিয়া প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দকে তাহাদের চলার পথে নানা দিক্ দিয়া নূতন আলোক প্রদান করিবে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সঙ্কটযুগে "প্রবর্ত্তক" আশার বাণী বুকে বহিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল। আজ এই ১৯ বৎসর পরে, দেশের বুকে যাঁহারা আশা ও উৎসাহের বাণী প্রতিদিন ছড়াইয়া এই দুর্দ্দিনে মনের বল বিধান করিতেছেন, তাঁহাদের অবদানের সংযোগ পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি এবং প্রতি সুহৃদের নিকট আমার অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। "প্রবর্ত্তক" এই আশার বাণী চিরদিন সশ্রদ্ধ মাথায় বহন করিয়া থাকিবে।
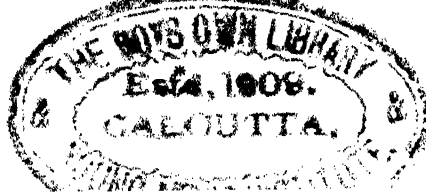
"সকলেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধির উপর অসন্তুষ্ট"

"......আপনি 'দেশের এই সমস্যাময় দিনে' অনুগ্রহ করিয়া 'জাতির গতি-নিরূপণে' আমার কিছু সঙ্কেত চাহিয়াছেন। আমি নেতা নহি, নেতৃত্ব কখনও করি নাই। সুতরাং ঠিক কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন। একটা কথা আমার এই মনে হয়, যে দেশের যে-সব লোক সমগ্র দেশের ও সমগ্র জাতির মঙ্গলের কথা ভাবেন, কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায় বা নিজ নিজ জাতি বা শ্রেণীর কথা ভাবেন না, তাঁহারা সকলেই ব্রিটিশ গবর্নেণ্টের ভবিষ্যৎ শাসনবিধির উপর অসন্তুষ্ট। তাঁহারা সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্যপথ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলে ভাল হয়। ধর্ম্মবিষয়ক ও সমাজ-বিষয়ক সমস্যা সকলের এক নয়। সেই জন্য সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা যায় না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক —"প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ"

"প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ"র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

[শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়]

"প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" কাগজ দুখানির ইতিহাস জানিতে চাহিয়াছেন। তাহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই। "প্রবাসী" বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে বাহির করি। আমি তখন এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালার প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম। কাগজখানি তথাকার প্রসিদ্ধ মুদ্রাযন্ত্র ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইত। "প্রবাসী" ছাপিবার জন্যই উপরের স্বত্বাধিকারী পরলোকগত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় ঐ প্রেসে বাংলা বিভাগ খুলিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি কলিকাতা হইতে বাংলা হরফ আমদানী করেন। পরে নিজের ঢালাইখানাতেই সব রকম বাংলা হরফ ঢালাইতেন। পরে আমি এলাহাবাদে থাকিতে থাকিতেই "প্রবাসী" কলিকাতার কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হইত। কয়েক বৎসর পরে কাগজখানি ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত হইত। এখন উহা প্রবাসী প্রেসে ছাপা হয়। গোড়া হইতে আমি ইহার সম্পাদক আছি। লেখক ও লেখিকাদের এবং চিত্রকরদের সৌজন্যে ইহা চলিয়া আসিতেছে। আমার সম্পাদকীয় ও বৈষয়িক সহকারীরাও আমায় খুব সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

কায়স্থ পাঠশালার চাকুরীতে ইস্তফা দিবার পর আমি "মডার্ণ রিভিউ," কাগজখানি বাহির করি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। উহাও প্রথমে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইত। এখন প্রবাসী প্রেসে ছাপা হয়। ইহারও সম্পাদক প্রথম হইতে আমিই আছি। লেখক লেখিকা ও চিত্রকরদিগের সৌজন্যে এবং আমার সহকারীদের সাহায্যে ইহা চলিয়া আসিতেছে। কাগজ দু'খানির জন্য আমাকে কিছু পরিশ্রম বরাবরই করিতে হইয়াছে।

"গান্ধীজি ও কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করিয়া সমস্যার মীমাংসা হইবে না"

"আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল। কোন দিকেই কোন আশার আলোক দেখা যাইতেছে না। ইহা সত্য, যে ভারতবাসী যে রাজনৈতিক অধিকার-লাভের আশা করিয়াছিল, হোয়াইট-পেপার তাহা পূরণ করিতে পারিবে না। কাজেই দেশবাসীর মন হইতে অসন্তোষ ও নৈরাশ্য দূর করা সহজ নহে। আরও দুঃখের কথা, যে শাসকগণও সেরূপ কোন সহৃদয় নীতি অবলম্বন করিতেছেন না। জাতির জননায়কদের প্রতি, প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস লইয়া শাসননীতি পরিচালনা করিলে, দেশের চিত্তে দিনে দিনে যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়, জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা মোটেই শ্রেয়ঃ নহে।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক, "অমৃতবাজার পত্রিকা"

আমরা সংবাদপত্রসেবী। প্রত্যক্ষ ভাবে কোন মতের বা কোন দলের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট নহি। যাহা প্রকৃত দেশের কল্যাণ, যাহাতে জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি ও বিকাশ, যাহা ঐক্য ও সংহতির সহায়ক, তাহার সহিত আমাদের যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হয় মাত্র। কোন পথে, কি উপায়ে বর্ত্তমান সমস্যার প্রতিকার হইতে পারে, তাহা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন।

কেননা, আমরা দেখিতেছি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতের জননায়ক মহাত্মা গান্ধী শান্তি-ও-সম্মানজনক সহযোগিতার পথই অন্বেষণ করিতেছেন। কিন্তু এক রহস্যময় কারণে অত্যন্ত অযৌক্তিক কৈফিয়ৎ দিয়া ভারত-গভর্ণমেণ্টের ধুরন্ধরগণ এ সম্পর্কে উদাসীন রহিয়াছেন। অতএব সমস্যা-সমাধানের দায়িত্ব লর্ড উইলিংডনের ও ভারতসচিবের। এই দায়িত্ব ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ধীরতার সহিত, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সহিত সত্বর প্রতিপালন করিতে অগ্রসর না হইলে, শান্তির আশা সুদূরপরাহত হইবে। গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করিয়া, মুষ্টিমেয় মডারেট বা সাম্প্রদায়িকতাবাদীর সহায়তায় এই সমস্যার মীমাংসা হইবে—এরূপ ধারণা যদি শাসকগণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিবে।

বর্ত্তমান সমস্যা গুরুতর, সন্দেহ নাই। তবু যেন আমরা নিরাশ না হই। ধৈর্য্য, সংযম, আত্মবিশ্বাস দ্বারা যেন আমরা ইত্যবসরে গঠনমূলক কার্য্যে হেলা না করি। দৈন্যপীড়িত, শতরোগজর্জ্জরিত জনসাধারণ যাহারা, তাহাদের সেবা ও সাহায্য, তাহাদের উন্নতির পথ-প্রদর্শনই জাতীয় উন্নতি, ইহা যেন বিস্মৃত না হই।"

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

"অমৃতবাজার পত্রিকা"র জন্ম-কথা

[শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ]

পরাধীন, মর্ম্মপীড়িত, দারিদ্র্যবিমথিত জাতির মর্ম্মবেদনার বোঝা লইয়া ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে যশোহরে, কপোতাক্ষী-তীরে এক ক্ষুদ্র পল্লী-কেন্দ্রে 'অমৃতবাজার পত্রিকার" জন্ম হয়। পলুয়া মাগুরার প্রসিদ্ধ ঘোষ-পরিবারের ৺বসন্তকুমার ও তাঁহার স্বনামধন্য অনুজগণ হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল দেশের আপামর সাধারণের ব্যথা ও দুরবস্থা মোচন করা জীবন-ব্রত করিয়া তাহার অন্যতম উপায়স্বরূপ এই পত্রিকা-প্রকাশের পরিকল্পনা পল্লীর বুকেই সূচনা করেন। যে নীতি লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকার আরম্ভ, তাহা বাংলার জাতীয় জীবনে এক অভিনব সাংবাদিকতার যুগ প্রবর্ত্তন করে। সে নীতি এই যে, রাজার স্বার্থ ও প্রজার স্বার্থ যখন এক নহে, তখন সজাগ সতর্ক হইয়া প্রজাকে নিজ কল্যাণ অবধারণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে নির্ভীক ভাবেই রাজ-শক্তির সমালোচনা কিম্বা প্রতিবাদ করিতে হইবে।

৺শিশিরকুমার ঘোষ

বাংলা, তথা সারা ভারতে এইরূপ স্বাধীনতার বা জাতীয়তার মর্ম্মবাণী-প্রকাশের প্রথম আদর্শ দেখাইয়াছে—"হিন্দু পেট্রিয়ট" ও "অমৃতবাজার পত্রিকা।" তরুণ শিশিরকুমার এই উভয় জাতীয় পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অতি অস্বচ্ছল আর্থিক অবস্থায় কোনরূপে কাঠের প্রেস যোগাড় করিয়া এবং ছাপাখানার কাজ সমস্ত নিজে হাতে-হেতেড়ে শিখিয়া শিশিরকুমার প্রথমে "অমৃত-প্রবাহিনী পত্রিকা" নামে একখানি বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমারের সম্পাদকত্বে বাহির করেন। ইহা শীঘ্রই বাংলা সাপ্তাহিকে পরিণত হয় ও নাম হয় "অমৃতবাজার পত্রিকা।" বলা বাহুল্য, জননী ৺অমৃতময়ীর নামেই ঘোষভ্রাতৃগণ তাঁহাদের এই পারিবারিক পত্রিকাখানির নামাগ্রে "অমৃত" শব্দ যোজনা করিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয়া করিয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রায় জন্মকাল হইতেই কর্ত্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া দেশ-সেবার কণ্টক-মাল্য পরিধান করে। ভূমিষ্ঠ হইবার ৪ মাস পরেই যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহযোগী ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে মানহানি অপরাধে পত্রিকার পরিচালকগণ অভিযুক্ত হন ও দীর্ঘ ৮ মাস কাল এই মোকদ্দমা চলে। ইহাতে তাঁহারা এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সময়ে আবার দারুণ ম্যালেরিয়ায় পল্লীগ্রাম উজাড় হইবার উপক্রম করায়, ঘোষ-পরিবার স্বগ্রাম ছাড়িয়া পত্রিকা লইয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই "অমৃতবাজার পত্রিকা" ব্যাপকভাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও দিন দিন লোকপ্রিয় হইয়া উঠে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে গাইকোয়াড় মহ্লার রাওয়ের সিংহাসন-চ্যুতির ঘটনা উপলক্ষ করিয়া, পত্রিকা দ্বিভাষায় অর্থাৎ আধা-ইংরাজী ও আধা-বাংলায় বাহির হইতে আরম্ভ হয়। "Overland Patrika" নামে একখানি অতিরিক্ত ইংরাজী সংস্করণও সুপ্রচারিত হয়। নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের ন্যায় মহামণ্ডলী-গঠনে এই পত্রিকা এইরূপে অনেকখানি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইহার দমনে লর্ড লিটনের "ভার্ণাকুলার প্রেস এক্ট" বিধিবদ্ধ হইলে ইহার হাত এড়াইবার জন্য এক রাত্রির মধ্যেই পত্রিকাখানিকে সম্পূর্ণ ইংরাজীতে রূপান্তরিত করা হয়। তখনও ইহা জনপ্রিয় সাপ্তাহিক—তাহার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্সডাউন যখন "সহবাস-সম্মতি-আইন" প্রবর্ত্তন করেন, তখন হইতেই "অমৃতবাজার পত্রিকা" একমাত্র জাতীয় দৈনিকে পরিণত হয়। এসকল কথা সবিস্তারে বলিবার এ ক্ষেত্র নহে। বিনা মূলধনে, পরিচালকদের অক্লান্ত শ্রম ও নির্ভীক আন্তরিকতা এবং দেশবাসীর সহায়তা মাত্র অবলম্বন করিয়া পত্রিকা আজ বাংলার গৌরব-বর্দ্ধন সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। পত্রিকার সুদীর্ঘ জীবনে তাহার চিরাশ্রিত অমৃত-মন্ত্রই দিনে দিনে পরিস্ফুট, সফল হইয়া উঠিয়াছে।

"অধীনতা কাল কূটে মরি হায় হায়।
করেছে কি আশা-সুতে—চেনা নাহি যায়।"

—গরলে অমৃত, পরাধীনতার গভীর নৈরাশ্যে আশার আলো মুক্তির বেদনা-বাণী বহন করার ধারাবাহিক সাধনা একে একে তাহার যোগ্য কর্ণধারগণ—প্রাতঃস্মরণীয় ৺শিশিরকুমার, ৺মতিলাল ৺পীযুষকান্তি, ৺গোলাপলাল, এবং বর্ত্তমানে তরুণ তুষারকান্তি মধ্য দিয়া অতি কৃতিত্বের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়া আসিয়াছে—পত্রিকার আজন্ম-সমাদৃত দেশ-হৃদয়ে অচল অটল প্রতিষ্ঠাই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

৺মতিলাল ঘোষ

"এ যুগের শক্তিপূজা—রাষ্ট্রসাধনা"

ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায় আজ সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন—হিন্দু মুসলমান মনোমালিন্য বা বিরোধ। এই দুই সম্প্রদায়ের এই মনোমালিন্য বা বিরোধ-ভাব অনেকদিন হইতেই আছে; কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এখন যে কঠিন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহা একটা বিশেষ চিন্তার বিষয়। চোখ বুজিলে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে যোগাসনে আসীন হইলে বহির্জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় না; বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্য বা বিরোধ-ভাব অস্বীকার করিলে তাহা উড়িয়া যাইবে না বা লঘু হইবে না। প্রত্যেক ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালী চিন্তাশীল ব্যক্তির এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং আমার বিশ্বাস, যতদিন পর্য্যন্ত না এই সম্বন্ধে একটা যুক্তি-মূলক মীমাংসা হয় ততদিন পর্য্যন্ত অন্য সমুদয় রাষ্ট্রীয় প্রশ্ন স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। এ প্রশ্ন আর চাপা দিবার নয়। পেশোয়ার হইতে শিলঙ্ আর শ্রীনগর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এই হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন—আমরা যেখানেই যাই সেখানেই আমাদের পিছু পিছু ঘুরিতেছে এবং যখনই সুবিধা পাইতেছে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা তুমুল লোমহর্ষণকর ব্যাপার ঘটাইয়া তুলিতেছে। অনেকে বলেন, আজ ভারতের প্রধান প্রশ্ন **Economic** বা অর্থনীতি-মূলক। আমার বিশ্বাস তাহা নহে। দেশে অর্থনীতিমূলক অনেক অনাচার অত্যাচার আছে। রাজা প্রজা, জমিদার রায়ত, মিলওয়ালা মজুর, মহাজন ঋণী, ধনী নির্ধন, এ সকলের পরস্পর বিরোধ-ভাব সব দেশেই আছে—আমাদের দেশেও আছে এবং থাকিবে। এই অর্থনীতিমূলক বিরোধ যুক্তি, তর্কে, আইনে, হয়তো শেষ দশায় সামাজিক বিপ্লবে অন্তর্হিত হইতে পারে; কিন্তু হিন্দু মুসলমানের বিরোধ আজ যে ভাব ধারণ করিতেছে, মনে হয়, সে বিরোধ যুক্তি, তর্ক, আইন, এমন কি সামাজিক বিপ্লবেও শেষ হইবে না—কারণ, এ বিরোধ মনোগত বিরোধ এবং এত দিন ইহা গুপ্ত ভাবে পুষ্ট হইয়া, বোধ হয় আমাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। এ বিরোধ স্বার্থান্বেষী লোক নিজের স্বার্থের জন্য সময়মত **exploit** করে। গভর্ণমেণ্ট যে **exploit** করে না, সে কথাও সত্য নয়; কিন্তু শুধু তাহাদের ঘাড়েই সমস্ত দোষ এবং দায়িত্ব চাপাইলে চলিবে না। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দেখা উচিত, বিরোধ আছে বলিয়াই তাহার **exploitation** হইতেছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী বার-এট্-ল
প্রধান সম্পাদক "এডভান্স"

Communal Award যে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর একটা গভীর অবিচার করিয়াছে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে যাচক তাহার দানের উপর অধিকার নাই, সে গ্রহণ করে মাত্র; যে দাতা, সে কি বস্তু দান করিবে, এ বিবেচনায় শুধু তাহারই অধিকার। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দু বাংলায় শাসন ও আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হাইকোর্টের জজ হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ কোর্টের পেয়াদা পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থলেই বাঙ্গালী হিন্দু। কমিশনার হইতে আরম্ভ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আর্দ্দালী পর্য্যন্ত অধিকাংশই বাঙ্গালী হিন্দু। বিচার, শাসন, রেভিনিউ—একটু তলাইয়া দেখিলেই আমরা বুঝিব, যে বাঙ্গালী হিন্দুই

চালাইয়াছে এবং চালাইতেছে। আজ বাঙ্গালী হিন্দু কাঁদিতেছে, মুসলমান Majority পাইলে তাহাদের কি অবস্থা হইবে! যে বাঙ্গালী বাংলার জন্য এত করিয়াছে। যে হিন্দু বাংলার ক্রোড়ে রমেশ দত্ত, কে, জি, গুপ্ত প্রভৃতি স্থান পাইয়াছেন, যে বাঙ্গালী হিন্দুর মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথ আজ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান কবি, যে হিন্দু বাংলার জগদীশ এবং প্রফুল্লচন্দ্র এবং মেঘনাথ সাহা বিজ্ঞানজগতে এত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন; যে বাঙ্গালী হিন্দু দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ এবং লর্ড সিংহের ন্যায় তীক্ষ্ণ ব্যবহারজীবীর জন্ম দিয়াছে—সেই বাঙ্গালী হিন্দুর মুসলমানশাসিত বাংলায় ভবিষ্যৎ কোথায়? ঠিক কথা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাঙ্গালী হিন্দু যে এত বড় হইয়াছে তাহার একটা প্রধান ভিত্তি British Bayonet এবং British Police. এই উভয়কে সঙ্গী করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, সামাজিক আন্দোলনে এবং সরকার বাহাদুরের Administration-এ অতি উচ্চ পদ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু Intellectual এবং Administrative জগতে এই প্রাধান্য সত্ত্বেও, সত্য বলিতে হইলে বলিতে হয়, Political Power হস্তগত করিবার চেষ্টা সমষ্টিভাবে বাঙ্গালী হিন্দু বিশেষ কিছু করে নাই; বরাবর তাহার উদ্দেশ্য, "ছোকরা"দের সাহায্যে নিজের অভীষ্টের সাধন"।

আজ বাঙ্গালী হিন্দু বুঝুক যে, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কবিতা, জজীয়তী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, জমিদারী, রাজা-মহারাজাগিরি, এসব Cinemaর ছায়া মাত্র, ইহার অন্তঃ-সত্ব কিছু নাই। এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহার সার মর্ম্ম এই—Political Power, রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যতীত কি সামাজিক, Administrative, কি অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক—কোন ক্ষেত্রেই জাতির এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাই। আর যদি আপনারা আমার নিকট জাতির জীবনের সারমন্ত্র শুনিতে চান তাহা এই—"এ-যুগের শক্তিপূজা—রাষ্ট্রসাধনা" মনে রাখিবেন তিন চারশ' বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী শাক্ত গাহিয়াছিলেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী

এডভান্সের গঠন-কথা

[শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত বার-এট-ল]

"এডভান্সের" জন্ম ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, ২০শে ডিসেম্বর। বাংলার রাষ্ট্রজীবনে তখন ঘোরতর দুর্ভাগ্যের দিন। দলাদলির বিষে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় চরিত্র জীর্ণ, কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার শেষ রাষ্ট্রগুরু দেশবন্ধুর অন্তর্দ্ধানে, তাঁহার চিন্তাধারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে দুইটী পক্ষের সূচনা করিল। ১৯২৯ সনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বার্ষিক অধিবেশনে এই মতভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়। কংগ্রেসের মুখপত্র "লিবার্টী" তখন দলগত মত ও সত্য প্রচার করিতে গিয়া প্রতিপক্ষ ৺দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নিন্দাবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত কংগ্রেসের কর্ম্মধারাও এই সঙ্গে নিন্দিত হইতেছিল। এই সময়ে ৺দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত খাঁটি কংগ্রেস পক্ষের একখানি দৈনিক মুখপত্র প্রকাশ করিতে আমায় অনুরোধ করেন। এই উদ্দেশ্যে "দেশবন্ধু পাব্লিশিং কোম্পানী" নামে একটী প্রকাশক মণ্ডলী গঠিত হয়। সেনগুপ্ত মহাশয় ইহার চেয়ারম্যান এবং আমি তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোনীত হই। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমার উপর পত্রিকা-প্রকাশের ভার অর্পিত হয়। ৺দেশপ্রিয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ইহার নামকরণ করেন "Advance" এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী

৺দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

বার-এট-ল ইহার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। "সাধন প্রেস" নামে মুদ্রাযন্ত্রটীও এই সময়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে আমায় প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

এডভান্সের উদ্দেশ্য—মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণে কংগ্রেসের মুক্তি-বাণী প্রচার এবং বঙ্গের তথা ভারতের গৃহে গৃহে সত্য সংবাদ বহন করা। এই মূলনীতি স্বর্গীয় দেশবন্ধুরই মহনীয় বিশ্বাসের দান এবং স্বর্গীয় দেশপ্রিয়ের অগ্নিময় জীবন-সিদ্ধ এই অমর বিশ্বাসই জাতির জীবনে সঞ্চারিত করিবার জন্য "এডভান্স" জন্মাবধি অকপট চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই আন্তরিক সাধনাই "এডভান্স"কে লোকপ্রিয় ও দেশের চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

* * *

"জাতির পথ-নির্দ্দেশ সে নিজেই করিবে"

শ্রদ্ধাভাজন "প্রবর্ত্তক"-সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ-পত্র আমাকে একটু বিব্রত করিয়াছে। কবির ভাষায় বলি—"কপোত পাখীরে চকিতে বাটুলী বাজিলে যেমন হয়", আমার অবস্থা সেইরূপ। বহু বৎসর সংবাদ-পত্রের সহিত যুক্ত থাকিয়া কাজ, অ-কাজ, কু-কাজ অনেক করিয়াছি; কিন্তু জাতির "পথ-নির্দ্দেশের" ভাবনা বড় ভাবিয়াছি বলিতে পারি না। বরং ইহা কতকটা সত্য, যে জাতিকেই আমার পথ-নির্দ্দেশের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম।

শ্রীহেমচন্দ্র নাগ—"লিবার্টী"

কাজটি খুব অন্যায় করিয়াছি, এ বোধ আমার কখনও হয় নাই। যে পরিমাণ দূরদৃষ্টি থাকিলে জাতির গতি নির্দ্দেশের ভার গ্রহণ করা যাইতে পারে মানুষের তাহা আছে কি? কেমন করিয়া বলিব আছে, যখন ভাবিয়া দেখি, যে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান সমস্যার জন্য কোনও নেতা নিজকে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেন নাই? আর এই যে অনুন্নত শ্রেণীর প্রশ্ন, ইহাও নিতান্ত আধুনিক: পনের বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল, এই যে প্রশ্ন লইয়া অনতিবিলম্বে গৃহ-দাহের সূত্রপাত হইবে? এ বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে, যে ১৯১৮ সনের মণ্টেগুলিখিত সুসমাচারে এই সমস্যার উল্লেখ মাত্র নাই।

আমার মনে হয় জাতির একটি স্বতন্ত্র মন আছে, যাহা বহুতমের বা অল্পতমের মত বা মন নয়, ব্যক্তি-বিশেষের বা দল-বিশেষের মত বা মনও নহে। গত ত্রিশ বৎসরের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি, যে জাতির মনে সময়ে সময়ে অস্পষ্ট রূপে এমন ভাব জাগে, এমন আবেগের সৃষ্টি হয়, যাহা ব্যক্তির বা সমষ্টির মতের ছায়া বা প্রতিধ্বনি মাত্র নহে। জাতির মনে ভাবের বন্যা, আবেগের প্রবাহ কখন আসিবে তাহা মানবীয় গণনার বহির্ভূত বিষয়।

উদাহরণ দিব কি? ১৯০৫ সনে বঙ্গ-ভঙ্গ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কলিকাতা নগরী, তথা সমগ্র বঙ্গদেশ কেমন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনও দুই চারিজনের মনে থাকিতে পারে। তখন একদিনের মধ্যে যে বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল,

আমি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি, একজনও তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ছিলেন না—তাহা দোষের কথা নহে। বলিয়াছি—জাতির স্বতন্ত্র মন আছে, তাহার পথ-নির্দ্দেশ করে সে নিজে।

তবে যুগে যুগে এমন মহামানবগণ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জাতির অস্পষ্ট অনুভূতিকে কতক পরিমাণে নিজের অনুভূতি করিয়া লইয়া তাহাকে আকার দান করেন। এইরূপ মহামানবকেই বলি দ্রষ্টা। জাতির গতি নিরূপণ যদি মানুষের হাতেই থাকিত, তাহা হইলে যে কোনও সময়ে মহাআন্দোলনের সৃষ্টি করা যাইত। তা' যে সম্ভব নয়, এও কি বুঝাইতে হইবে?

আমাদের এই গুরুবাদের দেশে গুরু একজন চাই-ই —থাকা মন্দও নহে। গুরুর পদে আমাদের ভক্তি অচলা —গুরুর নিকট অনেক বিষয়ে অনেক পরিমাণে জাতি আত্মসমর্পণ করে, এ-ও সত্য। কিন্তু গুরুর সকল মতই জাতি মানিয়া লয়, ইহা সত্য নহে। প্রমাণ অ-সহযোগ। মহাত্মা ঠিক যেমনটি চাহিয়াছিলেন, তেমনটি পাইয়াছিলেন কি? আর অ-সহযোগের মূল বিষয়গুলি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের আন্দোলনেও কি বিদ্যমান ছিল না? ঐ জন্যই বলি, জাতির পথনির্দ্দেশ করে সে নিজে।

চারিদিকে নৈরাশ্যের চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছি। যেন সব গেল, সব গেল ভাব! কিন্তু মানুষের জীবনের ন্যায় জাতির জীবনেও উত্থান-পতন আছে। কোনও দেশে কোনও আন্দোলনই এক ভাবে বহু বৎসর থাকে নাই। কেন থাকে না, বোঝা শক্ত নহে—অতিরিক্ত উৎসাহের পর অবসাদ আসিবেই। কিন্তু এই অবসাদের দিনে যদি কাহারও হৃদয়ে এ আশঙ্কা জাগিয়া থাকে যে, যে আলো জ্বলিয়াছিল তাহা চিরকালের জন্য নিভিয়া গিয়াছে; তাহাকে জোর করিয়া বলিতে চাই, ঐ আশঙ্কা অমূলক। কবি মিথ্যা লেখেন নাই। অবসাদ আর অবসান এক কথা নহে। স্বাধীনতার আন্দোলনের মৃত্যু নাই।

তিনটি মহা আন্দোলন আমার চক্ষুর সম্মুখে ঘটিয়াছে—তিন বার গণ-জাগরণের আমি সাক্ষী। আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বলিতে পারি, বিস্তৃতি ও গভীরতায় জাতীয় আন্দোলন ক্রমে দৃঢ়তর হইতেছে। আমরা পরাভূত হইয়াছি, নির্য্যাতিত হইয়াছি। কিন্তু পরাভবের অপমান ও নির্য্যাতনের বেদনার মধ্যে আশার কথা এই—"নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে।" দিনে দিনে না হউক, পাঁচ বৎসরে, দশ বৎসরে বাড়ে। সে-ও কি কম কথা!

কেহ বলিতেছেন, সরকারের উদ্যতখড়্গ সংবাদপত্রকে সন্ত্রস্ত করিয়া জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়াছে। আইনের নির্ম্মমতা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। প্রচার উৎকৃষ্ট জিনিষ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু উহা না থাকিলেই জাতি চিরকালের জন্য পঙ্গু হইল, এ ভয় আমি করি না। দেখিতেছি—লোক-চক্ষুর অন্তরালে, বুঝি মনেরও অগোচরে, অজ্ঞাত কারণে, অজানিত শক্তির প্রেরণায়, হৃদয়ে হৃদয়ে বিজলী খেলে, দেশদেশান্তরে ভাবের প্রবাহ বহে।

যখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে প্রেমের বন্যা বহাইয়াছিলেন, তখন ভারতের অপর প্রদেশে এবং ইউরোপেও ধর্ম্ম-সংস্কারের আন্দোলন চলিতেছিল। ঐ সকল আন্দোলনের সকল কথা এক নহে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় মূল কথা এক। ঐ পৃথিবীব্যাপী মহান্দোলনের সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? তখন না ছিল রয়টারের তার-বার্ত্তা, না ছিল সংবাদপত্র—না ছিল লোক-চলাচল, ভাবের আদান-প্রদান!

ইউরোপে, বিলাতে, শ্রমিক আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করিল কেমন করিয়া? কয়খানি সংবাদপত্র ছিল নিঃস্ব শ্রমিকের হাতে? যতই চিন্তা করি, ততই মনে হয়, ভাব-জাগরণের মধ্যে মানব-বুদ্ধির অতীত, মানব-গণনার বহির্ভূত অনেকখানি বস্তু আছে।

কেহ আমাকে বুঝাইতে পারেন, অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে হাজার হাজার শ্রমিক আসামের চা-বাগিচা ছাড়িয়া চাঁদপুরে মরিতে আসিয়াছিল কেন? চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু আমি নই, আসামের গভর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টও কারণ খুঁজিয়াছিলেন। পাইয়াছিলেন কি? বেশ মনে আছে, দুই খানি ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহাতে লিখিত ছিল,

ভারতের ভাগ্য-বিধাতা কবে সুপ্রসন্ন হইবেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু অতীতের ইঙ্গিত স্পষ্ট। ঘুরিয়া ফিরিয়া গণ-জাগরণ আসিবেই। কে বলিতে পারে, এইরূপ কত জন্মের পর মুক্তি? যা'হোক, প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। যতদিন গণ-দেবতা আবার মুখ তুলিয়া না চাহেন, ততদিন ভাবুকের কাজ ব'সে ব'সে শোনা আপন মর্ম্মবাণী; আর সাধকের কাজ, একাগ্র প্রার্থনা, অদ্বৈত মহাপ্রভুর ন্যায় তন্ময় কামনা—প্রকাশ হও, হে প্রাণের ঠাকুর, প্রকাশ তোমার চাই!

পথ-হারার পথনির্দ্দেশের ক্ষমতা ইহার অধিক নাই।

...য দুষ্ট "এজিটেটরের" দুরভিসন্ধিতেই অমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

কিন্তু প্রমাণ? প্রমাণ হিসাবে আসাম-গভর্ণমেণ্ট উল্লেখ করিয়াছিলেন জনৈক বক্তার গোটা দুই বক্তৃতার কথা। ...ক তিনি তখনও চিনিতে পারি নাই, এখনও চিনি না। কিন্তু সেই অজ্ঞাত-কুল-শীল, স্ব-নামধন্য বক্তার বক্তৃতায় যদি এমন অঘটন ঘটিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে আমি দেবতা-স্থানে পূজা করিতে রাজী আছি। কিন্তু তাহা হয় নাই। অত সামান্য কারণে অমন ঘটনা ঘটে না। কেন ঘটিয়াছিল তাহা বুঝি নাই, বুঝাইতে পারিব না। কবির কথায় এই মাত্র বলিতে চাই যে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে অনেক জিনিষ আছে মানুষের দর্শন যাহার কল্পনাও করিতে পারে না।

শ্রী...চন্দ্র নাগ

লিবার্টী পাব্লিশিং লিমিটেড

[শ্রীগোপাল লাল সান্যাল]
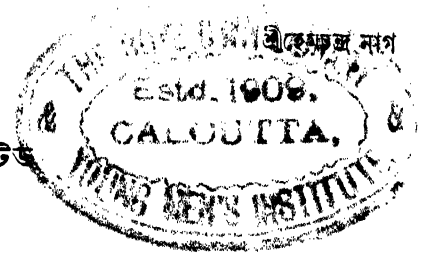
বুধবার ১লা মে ১৯২৯, বাঙ্গলা ১৮ই বৈশাখ ১৩৩৬ দৈনিক 'বঙ্গবাণী' প্রথম সংখ্যা ১৯ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় দুইটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা হইতে বর্ত্তমানের ইংরাজী দৈনিক পত্র 'লিবার্টী', বাঙ্গলা দৈনিক 'বঙ্গবাণী' এবং বাঙ্গলা সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। নিম্নে আমরা দুইটি বিবৃতিই প্রকাশিত করিলাম:—

"ফরওয়ার্ড পাব্লিশিং লিমিটেড
পরিচালকগণের ঘোষণা

আমাদের স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ফরওয়ার্ড পত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যে উহা 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' ও 'আত্ম-অনুভূতির' আদর্শ লইয়া দেশের জাতীয় আন্দোলনের মুখপত্র হইবে। সেই দুঃসময়ে তাঁহাকে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দেশবন্ধুর ঐকান্তিকতা ও বিশ্বাস ফরওয়ার্ডের অসামান্য সাফল্য আনয়ন করিয়াছিল। তাঁহার সহিত একত্র এবং তাঁহার উপদেশমত কাজ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল; তখন আমাদিগকে সামান্য কাজই করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করিল—কিন্তু আমরা সাধ্যমত তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছি—ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা। আমরা দেহ, মন ও অর্থের দ্বারা তাঁহার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিতে যত্নের ক্রটি করি নাই। কিন্তু আজ এমন অবস্থা উপস্থিত

৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

হইয়াছে যে 'ফরওয়ার্ড পাব্লিশিং কোম্পানীর কাগজ তিনখানির—(১) ফরওয়ার্ড ইংরাজী দৈনিক,—(২) বাঙ্গলার কথা—বাঙ্গলা দৈনিক ও (৩) আত্মশক্তি—বাঙ্গলা সাপ্তাহিক—ইহাদের প্রকাশ

বন্ধ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। আমরা যে কিরূপ দুঃখে এই কথা জানাইতেছি, তাহার প্রকাশের ভাষা নাই।

গত ছয় বৎসর কাল আমাদের পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক, এজেন্ট, বন্ধু ও হিতৈষিগণ আমাদের যে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন তাহার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

জ্ঞাপন করিতেছি; আমাদের প্রার্থনা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় দেশবাসী তাহাদের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই পরিচালন করিবেন।

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা।"

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

অপর বিবৃতিটী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাক্ষরিত। উহা নিম্নে দেওয়া হইল।

"বন্দেমাতরম্

কয়েক জন বন্ধুর অনুরোধে ও সহযোগিতায় আমি নিম্নলিখিত তিনখানি নূতন সংবাদপত্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করিলাম:— (১) নিউ ফরওয়ার্ড। (২) বঙ্গবাণী—বাঙ্গলা দৈনিক ও (৩) নবশক্তি—বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। আমি কি গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি তাহা জানি; কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অনুপ্রেরণা এবং সকল দেশবাসীর সাহায্য ও উৎসাহ আমাকে এই কার্য্যগ্রহণে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়—যখন চারিদিকে চণ্ডনীতির প্রকোপ চলিতেছে, বহু গভীর সমস্যা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত। বাঙ্গলার ও আসামের ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন সমীপবর্ত্তী—তখন যদি আমি আমার স্বর্গগত গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট সংবাদ-পত্র-পরিচালনের যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করি, তাহা হইলে আমি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি বলিয়াই নিজে মনে করিব। দেশবন্ধুর স্মৃতি আমাকে এই নূতন কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিবে এবং দেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য এই সংবাদপত্রগুলিকে সাফল্য দান করিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস ও প্রার্থনা। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, কলিকাতা, ৩০শে এপ্রিল ১৯২৯।"

ইহাই আমাদের পত্রিকা তিনখানি প্রতিষ্ঠার আদি কথা।

দুইদিন পরে এডভোকেট জেনারেলের আবেদনে হাইকোর্ট হইতে "নিউ ফরওয়ার্ড" নামে কোনও পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরদিন হইতে নিউ ফরওয়ার্ড-এর পরিবর্ত্তে 'লিবার্টী' দৈনিক পত্র প্রকাশ সুরু হয়।

তদবধি 'লিবার্টী' 'বঙ্গবাণী' ও 'নবশক্তি' 'লিবার্টী নিউজ পেপার কোম্পানীর" এই তিনখানি কাগজ চলিতেছে। তার আট মাসকাল পরে উক্ত কোম্পানী লিমিটেড করা হয় এবং শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, শরৎচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, দেবেন্দ্রলাল খাঁ, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু—ইঁহাদের লইয়া ডিরেক্টর-বোর্ড গঠিত হয়। প্রথমাবধি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ম্যানেজিং-ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁহাকে গত ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অতর্কিতে তিন আইনে বন্দী করিবার দুই মাস পূর্ব্বে তিনি ম্যানেজিং-ডিরেক্টর পদ পরিত্যাগ করেন। তদবধি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ম্যানেজিং-ডিরেক্টর আছেন। বর্ত্তমানে 'লিবার্টীর' সম্পাদন-ভার অর্পিত আছে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নাগের উপর। 'বঙ্গবাণীর' সম্পাদক শ্রীগোপাললাল সান্যাল ও 'নবশক্তি' সম্পাদক শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী। ঠিকানা—৩২ নং আপার সার্কুলার রোড, লিবার্টী হাউস, কলিকাতা।

"জ্ঞানের, কর্ম্মের, অর্থের—সকল প্রকার দারিদ্র্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে।"

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কাহার কি করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করা সহজ নয়। তা'ছাড়া সকলের উপদেশই যে সকল সময়ে পালনীয়, এমন কথাও সত্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে কোনও "জাতীয় সমস্যা" সম্পর্কে গুরুগম্ভীর উপদেশাবলী ত্যাগ করিয়া দেশসেবার অন্যতম কর্ম্মী হিসাবে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সমস্যা ও প্রসঙ্গের আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। "প্রবর্ত্তক" সম্পাদক মহাশয় দেশের সকল সাংবাদিক ও কর্ম্মীকে এই আলোচনার সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদের সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীগোপাল লাল সান্যাল

বিগত অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে—অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ বছর হইল বিশেষ করিয়া দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত এবং সাধারণ ভাবে দেশের সকল প্রকার সংস্কার-ও-উন্নতিমূলক কার্য্যাবলীর সহিত নানাভাবে জড়িত আছি। কোথাও বা নিবিড়ভাবে নেতৃবর্গ ও কর্ম্মীদলের সহিত মিশিয়াছি, কোথাও বা পরোক্ষে তাঁহাদেরই সহায়ক রূপে কাজ করিয়াছি। হিংসাবাদী অহিংসাবাদী, পরিবর্ত্তনপন্থী বা পরিবর্ত্তন-বিরোধী, উদারনৈতিক বা উগ্র রাজনীতিক স্বাধীনতাবাদী, সকলকেই নিবিড়ভাবে জানিয়াছি, একথা বলিতে না পারিলেও স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি, তাঁহাদের মতবাদ, চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রণালী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। আজ প্রায় দশ বৎসর হইল সাংবাদিকবৃত্তি চালাইতেছি—বিশেষ করিয়া এমন সকল সংবাদপত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আছি, যেগুলি দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সকল প্রকার মতবাদ ও কর্ম্মধারা মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়া আসিয়াছে এবং এই স্পষ্ট মতপ্রকাশ এবং সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মধারা-প্রচারের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে সকল প্রকার নির্য্যাতন বরণ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হয় নাই।

১৯২২ সালের শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত দৈনিক "বাঙ্গলার কথায়" সাংবাদিকজগতে আমার প্রথম প্রবেশ ও পরিচয়। তাহার পর পুনরায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্রের সাপ্তাহিক "আত্মশক্তি"—পরবর্ত্তী কালে দেশবন্ধুর অনুষ্ঠিত "ফরওয়ার্ড পাব্লিশিং লিমিটেড" কর্ত্তৃক পরিচালিত বাঙ্গলার বৃহত্তম সাপ্তাহিক "আত্মশক্তি"—এবং পরবর্ত্তীকালে দৈনিক "বাঙ্গালার কথা" এবং বর্ত্তমানে দৈনিক "বঙ্গবাণী"—এই কয়েকখানি সংবাদপত্রের সহিত দীর্ঘ কাল নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকায় দেশের জ্ঞানী, গুণী ও সুধীজনের সান্নিধ্যে আসিবার যেরূপ সুযোগ ঘটিয়াছে তাহা নেহাৎ তুচ্ছ নহে।
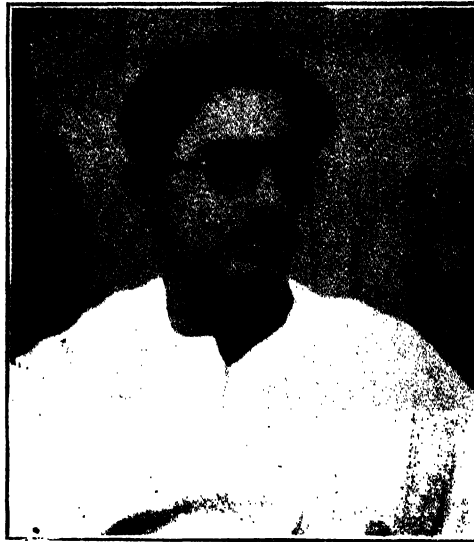
— কিন্তু —

—কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকার বা ভবিষ্যতের বিরাট্ জাতিগঠনের সুমহান্ সঙ্কল্প সত্যে পরিণত করিবার সুখস্বপ্ন সত্বর সফল হইবেই, এরূপ আশা পোষণ করিতে পারিতেছি না।

কেহ হয়ত বলিবেন—আমিও অনেক 'ঝুনো' সাংবাদিকের ন্যায় নৈরাশ্যবাদী হইয়া পড়িয়াছি এবং এই জন্যই নিজের অন্ধকার মনের প্রতিচ্ছায়া জাতীয়-জীবনেও কল্পনা করিতেছি। ইহা সত্য নয়। আমি যে নৈরাশ্যবাদী নই, একথা জানি বলিয়াই আমাদের দুর্গতির

কারণ নির্দ্দেশ ও প্রতিকারের পন্থা আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি ; নৈরাশ্যবাদী হইলে, "এ জাতির কিছু হইবে না"—এই কথা বলিয়াই এ প্রসঙ্গ সাঙ্গ করা চলিত।

প্রকৃত কথা এই যে, বর্ত্তমানকালে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি যে কিরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমাদের দেশের অধিকাংশ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি হয় উপলব্ধি করেন না কিংবা উপলব্ধি করিলেও, যে কারণেই হউক, তাহা স্বীকার করিতে চান না। ফলে রাজনীতি অর্থে কেহ হয়ত বুঝেন, বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতি ও সরকারী কর্ম্মচারীর নিন্দাবাদ করা ; অর্থনীতি বলিতে কেউ বা বুঝেন, বৈদেশিক ব্যবসায়িগণের শোষণনীতির শোচনীয় ফলাফল ; আর সমাজনীতি বলিতে কেহ বা বুঝেন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অশোভন ভেদ-সৃষ্টি ! এই ভাবে এক-একটী সমস্যাকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া পৃথক্ রূপে দেখিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া নেতৃবর্গ অতি হাস্যকর দলাদলির সৃষ্টি করিতেছেন। কারণ, অনেক সময়েই দেখা যাইতেছে, যিনি বর্ত্তমান রাজনীতি বা রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার অন্যায় স্বীকার করেন এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করেন, তিনি হয়ত সমাজ-ব্যবস্থার অসঙ্গতি স্বীকার করেন না ; এমন কি; অনেকস্থলে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার স্বপক্ষে এবং অন্য সংস্কারকামীর বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হন। এই ভাবে সমাজ-সেবক, রাজনীতিবিৎ এবং অর্থনীতিক নেতা জাতির প্রধান সমস্যাগুলির মাত্র একাংশ উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিকার কল্পে চেষ্টা করেন এবং অপরদিকের দোষ যে কারণেই হউক, অস্বীকার করিয়া শুধু যে চুপ করিয়া থাকেন তাহা নয়—যাঁহারা উহার সংস্কারে ব্রতী হন, তাঁহাদেরও বিরোধিতা করেন। এই ভাবে প্রকৃত সমস্যা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইঁহারা নিজের ইচ্ছায় যেটুকু উপকার করিতে যান, তাহাতে অপকার হয় অধিক এবং অন্য যাঁহারা ভাল কাজ করিতে চান, তাঁহাদের গতিও রুদ্ধ হয়।

আজ এ কথা আমাদের স্পষ্ট এবং পূর্ণ-ভাবে বুঝিবার সময় আসিয়াছে, যে এ দুঃখ-কষ্ট-দৈন্য-ক্লান্ত দেশের সকল সমস্যা এক কারণ, আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধোগতিই রাজনৈতিক দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যদি সত্যই সকল দুর্দ্দশা মোচন করিতে হয়, তবে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের যত স্থানে, যত জঞ্জাল জমা হইয়া আছে, সেগুলিকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বিদায় দিতে হইবে। দেশের স্বাধীনতার্জ্জনের যেমন কোনও নির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই, জাতির বৈশিষ্ট্যার্জ্জনেরও তেমনি মসৃণ পথ নাই। গোঁজামিল বা ধাপ্পাবাজীতে ভুলিয়া চোখ বন্ধ করিয়া থাকিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। যত দিন আমরা সামাজিক ও আর্থিক দুর্গতি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প না হইতেছি, তত দিন মাত্র বিদেশী ব্যবসায়ী বা বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে বিযোদ্গার করিলে কিছুই হইবে না। আমাদের দুর্ব্বলতা ও দারিদ্র্যে যাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করিতে হইলে আমাদের দারিদ্র্য ও দৌর্ব্বল্য দূর করিতেই হইবে—তাহা যে ক্ষেত্রেই থাকুক না কেন।

এইজন্য আমার মনে হয়, বর্ত্তমানে দেশহিতকর কোনও কার্য্য করিতে হইলেই চাই ব্যাপক কর্ম্মবিধি। শুধু চরকা ও খদ্দর প্রচার নয়, শুধু হরিজন-সেবা নয়, আইন-অমান্যও নয়। এ সকল কার্য্য যেমন করা যাইবে, প্রয়োজন হইলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইনের অধিকার গ্রহণ করিয়া তাহার প্রয়োগে দেশের সামান্য উন্নতি-সাধন সম্ভব হইলে তাহাও করিতে হইবে। জীবনে বিরোধ ও সংগ্রাম কখনই শেষ হইবে না—যত দিন জীবন, তত দিন সংগ্রাম আছেই, চির বৈর-ভয়ে উচিত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখিয়া যদি আমরা যে কোনরূপ কার্য্যে অগ্রসর হই, তবে সাফল্য লাভ হইবেই হইবে। এই শ্রদ্ধা ও শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে, সকল প্রকার দারিদ্র্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। জ্ঞানের দারিদ্র্য, কর্ম্মের দারিদ্র্য, অর্থের দারিদ্র্য—এই সকল দারিদ্র্য হইতেই মনের দুর্ব্বলতা এবং মনের দুর্ব্বলতা হইতে কাপুরুষতা ও জীবন-সংগ্রামে ভয়ের সৃষ্টি হয়। জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রতিযোগিতা ও প্রতিষ্ঠাসাধনমূলক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া শক্তিবৃদ্ধি করা প্রয়োজন—এইরূপ শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস বর্দ্ধিত হইবে এবং তাহা হইলেই জাতির মুক্তিপথের সন্ধান মিলিবে।

শ্রীগোপাল লাল সান্যাল

* * *

"বাংলার সমস্যা ভারত হইতে পৃথক্ করা সাংঘাতিক ও জাতীয়তা-বিরোধী"

শ্রদ্ধাস্পদ প্রবর্ত্তক-সম্পাদক মহাশয় জানেন, তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার অসাধ্য। কিন্তু জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটের দিনে, আমাদের মত অতি সাধারণ ব্যক্তির কোন "পথনির্দ্দেশের" কি শক্তি আছে? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, রোগে-শোকে দৈন্যে-দুর্দ্দিনে ক্লিষ্ট জাতির চিত্তে যে সকল বেদনা অহরহ উন্মথিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা লইয়া বিলাপ করিতে পারি, মতামত প্রকাশ করিতে পারি মাত্র।

জাতীয় জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলির মূলে রহিয়াছে, দুইটি কারণ। এক—রাজনৈতিক পরাধীনতা; দুই—আমাদের আদর্শভ্রষ্ট জীবনের গ্লানি। এ দুইএর কোনটাই উপেক্ষার নহে। যাঁহারা বলেন, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা দূর না হইলে কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না, বরং দিনে দিনে সমস্যা জটিলতর হইবে; যাঁহারা বলেন, অন্য সমস্ত সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা স্থগিত থাকুক, ক্ষতি নাই, অগ্রে এই মহা-সমস্যার সমাধান করিয়া লও—আর যাঁহারা বলেন, যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা তুমি মোচন করিবে, কি শক্তি-বলে? তোমার সংহতি কই? তোমার ঐক্য কই? দেশের কোন কেন্দ্রে তুমি কি শক্তির উদ্বোধন করিয়াছ, যাহার বলে তুমি দুর্ল্লভ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে? যাঁহারা বলেন, গঠনমূলক কাজ চাই; নূতন নীতি, নূতন আদর্শে, নবযুগের উপযোগী করিয়া জাতীয় জীবন সৃষ্টি করিতে হইবে—এই দুই পৃথক চিন্তাধারার কোনটাই উপেক্ষার নহে। এবং এই দুই ধারায় দেশের চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালী পাশাপাশি চলিয়াছে। একে অন্যের বিরোধী নহে—পরস্পরের পরিপূরক রূপে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
সম্পাদক, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'

আমরা সংবাদপত্রসেবী রূপে এই উভয়ধারার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া দৈনন্দিন কর্ত্তব্য পালন করি। যাঁহারা দেশের চিত্তে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতেছেন, জাতির আত্মসম্মোহিত মনে মর্য্যাদাবোধ জাগাইয়া তুলিতেছেন, আঘাত সংঘাতের মধ্যে দাঁড়াইয়া দুঃখ বরণ করিতেছেন; আর যাঁহারা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের আবর্ত্ত হইতে একটু দূরে সরিয়া গঠনমূলক কার্য্য করিতেছেন, ব্যক্তিগত আরাম, আয়াস, যশোলিপ্সা পরিহার করিয়া বিবিধ কল্যাণ-কর কার্য্যে নিঃশেষে আত্মদান করিতেছেন—এই দুই শ্রেণীর দেশকর্ম্মীই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। ইঁহাদের ভাবধারা প্রচার, ইঁহাদের কর্ম্মের সহিত দেশের পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়াই সংবাদপত্রসেবীর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

আজিকার দিনে বাংলা দেশের চিত্তে একটা নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ অবসাদ দেখা দিয়াছে. তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমাদিগকে কোন পথে লইয়া যাইবে, এখনও স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না। মানসিক অবসাদ কর্ম্মীর পক্ষে, জাতির পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটের কাল! এ অবস্থায় দুরূহ উদ্যমকে দীর্ঘকাল বহন করিবার ধৈর্য্য থাকে না। উপায়কে সম্যক্ রূপে প্রয়োগ করিবার ত্রুটি, ভুল ও শক্তির অপূর্ণতার কথা বিস্মৃত হইয়া উপায়কেই ব্যর্থ ও নিষ্ফল বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, সহজে কার্য্যসিদ্ধির সস্তা ফাঁকী যাহারা

চালাইতেছে, তাহারাই বুঝি জয়ী হইল। মানুষ ভুলিয়া যায়, ক্ষুদ্র লাভের তুচ্ছ লোভে তাহার বিচলিত হওয়া শোভা পায় না। কোন একটি বিশেষ ব্যবহার সংশোধন বা কোন সাময়িক অন্যায়ের প্রতিকার তাহার লক্ষ্য নহে। সকল অসামঞ্জস্য, সকল অন্যায়ের মূলীভূত যে কারণ, তাহার সহিতই অদ্যকার সংগ্রাম। ইহার সার্থকতা বা ব্যর্থতা সাময়িক কোনও ঘটনার দ্বারা নিরূপিত হয় না।

বিরুদ্ধ শক্তি প্রবল, সঙ্ঘবদ্ধ এবং সচেতন। তাহার বাধা সামান্য নহে, যে অল্পায়াসে আমরা অতিক্রম করিয়া যাইব। বাধা সম্বন্ধে মানুষের মনে যে অস্পষ্ট ধারণা থাকে, সত্য সত্যই যখন বাধার সম্মুখীন হইতে হয়, তখন তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি অন্য প্রকারের। জাতীয় আন্দোলনের গতিপথে আজ যে সকল বাধা দেখিয়া আমরা নিরাশ হইতেছি, সেগুলি আসিতে পারে, এ ধারণা পূর্ব্বেও ছিল। অথচ আজ বাধাগুলিকে সম্মুখে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছেন, যে পথটাই ভুল হইয়াছে, এমন বাধা আসিবার কথা ছিল না। কিন্তু তাঁহারা যে পথের যাত্রী, সে পথ চিরদিনই দুর্গম পথ।

আজিকার বাধা জাতিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা আমরা স্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই বাধা আজ আর কেবল বাহিরের বাধা নহে। ইহা আত্মবিরোধের মূর্ত্তিতে আমাদের ভিতর হইতেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে আমরা হিন্দু-মুসলমান মিলন যত সহজ মনে করিয়াছিলাম, আজ দেখিতেছি, তাহা অতি কঠিন। সরোবরের উপরের নির্ম্মল জল দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম, নিম্নের পঙ্করাশির খোঁজ করি নাই। সরোবরে নামিয়া যখন নির্ম্মল জল দেখিতে দেখিতে আবিল হইয়া উঠিল, তখন যদি কেহ বলেন, সরোবরে নামাই উচিত ছিল না, তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কথা বলেন না। এই যুগসঞ্চিত পঙ্ক আমাদের জাতীয় চরিত্রের সমস্ত ভ্রষ্টতার মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া ছিল; আলোড়ন আসিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার পরিচয় পাইলাম এবং সত্য করিয়া জানিলাম যে, কেবল হিন্দু-মুসলমান নহে, হিন্দুতে হিন্দুতেও অনেক ভেদ। মনোবৃত্তির ভেদ, স্বার্থের ভেদ। অখণ্ড ভারতীয় জাতি-গঠনের যে যুগ-স্বপ্ন আমাদের মনে ছিল, তাহা অতি রূঢ় আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা আমাদের সত্যই চৈতন্য দিয়াছে। আমাদের দৌর্ব্বল্যকে আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

ইহার উপর আর এক প্রকাণ্ড বাধা জাতি-গঠনের অন্তরায় হইতে চলিয়াছে। জানি, অনেকে ইহা লইয়া আমার সহিত এক-মত হইবেন না; তথাপি আমি সাহসপূর্ব্বক বলিব—সকলের চেয়ে ক্ষতিকর এক সঙ্কীর্ণ ভাব দেশের চিত্তে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহার নাম "প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য।" কাব্যে, সাহিত্যে ধর্ম্মে, এমন কি সামাজিক জীবনেও এক শ্রেণীর প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা ও চিত্তবিনোদন করা যাইতে পারে; আমরা তাহা অনেক করিয়াছি। বোধ হয় বাঙ্গালীর মত আর কেহই তাহা করে নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে ও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে এই ভেদবুদ্ধি সাংঘাতিক। আমরা দেখিতেছি, জাতীয়তাবিরোধী যাঁহারা, যাঁহারা চিরকাল জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা অথবা তাহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই সারা ভারতের সমস্যা হইতে বাংলার সমস্যাকে পৃথক্ করিয়া লইবার জন্য বদ্ধপরিকর। এমনতর একটা ভুয়া মিথ্যা কথা রটনা করা হইতেছে যে, অ-বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের কোণঠাসা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে বাংলাকে বাদ দিয়া, কোন বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি আর সমস্ত প্রদেশ এক হইতে পারিত, তাহা হইলে দুঃখের হইলেও, সে দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দেখিতাম। তাহাও একটা ঐক্য তো বটে! কিন্তু আসল কথাটা কি? কতিপয় প্রতিষ্ঠাভ্রষ্ট, ইংরাজদরবারে কৃপা-প্রত্যাশী মডারেট এবং লুব্ধ ব্যবসায়ী এই জাতীয়তা-বিরোধী মিথ্যার জন্মদাতা। এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই ভিত্তিহীন মিথ্যা সাময়িক ভাবে আমাদের চিত্তহরণ করিতেছে।

বাংলাদেশের যাঁহারা আদর্শপুরুষ তাঁহারা ভারতের সমস্যাকেই মুখ্য ও অখণ্ড রূপে দেখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত তুলিয়া পুঁথি বাড়াইব না। হায়, বিবেকানন্দ যে

সেদিনও বলিয়া গেলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"; তাঁহার মর্ম্মকথা কি আমরা ভুলিয়া গেলাম! যে মহাপুরুষ বর্ত্তমানে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সমগ্র ভারতবর্ষের কল্যাণৈক-লক্ষ্য হইয়া অসীম সাহসের সহিত কার্য্য করিতেছেন, সেই নিঃস্বার্থ, নির্ভীক, তপোবলসমন্বিত মহাপুরুষের স্বার্থলেশহীন জাতি-সেবার মধ্যেও, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিসন্ধি আরোপ করিয়া বলিতেছেন—বাংলা দেশকে বঞ্চিত করিবার জন্য তিনি কার্য্য করিতেছেন। এবং তাঁহার কোন কথা বা কোন কার্য্যের ছল ধরিয়া ও অপব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টারও ত্রুটি দেখিতেছি না।

এই জাতীয়তা-বিরোধী মনোবৃত্তি যে নৈরাশ্যজনিত অবসাদের ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জাতির চিত্তে যখন আদর্শ মলিন হইয়া উঠে, যখন মানবজীবনের বা জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার, দুর্ল্লভ সিদ্ধির পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র লোভে সে বিচলিত হয়, তখনই এমনতর সর্ব্বনাশী দুর্ব্বুদ্ধি তাহাকে পাইয়া বসে!

আমরা যাহা চাহিয়া আসিতেছি, পাই নাই। যাহা পাইতেছি, অর্থাৎ যাহা আমাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আমাদের ঘরে আনিয়া জমা করা হইতেছে, তাহা আমরা চাহি নাই! এই সঙ্কটের মধ্যে যাঁহারা আপোষ করিতে চাহেন, তাঁহারা আদর্শবাদীও নহেন, জাতীয়তাবাদীও নহেন। আলো ও অন্ধকারের মাঝামাঝি যেমন কোন বস্তু নাই, তেমনি সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি কোন পদার্থ নাই। জাতীয়তার ইহাই বাণী। আমরা পাই নাই, সে জন্য দুঃখ নাই; কিন্তু যাহা চাহি না, তাহাকে গ্রহণ করিবার ভান করিয়া যেন আত্মাবমাননা না করি। এই ভণ্ডামী হইতে ভারতের ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

আনন্দবাজার পত্রিকার ইতিবৃত্ত

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

'আনন্দবাজার পত্রিকা' সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই আছে। কিন্তু সকল কথা বলিবার অবসর ও স্থান ইহার মধ্যে হইবে না। আপনি গত দ্বাদশ বর্ষ কাল ধরিয়া আমাদের পত্রিকার কার্য্য দেখিতেছেন। তাহার উপর আনন্দবাজারের কর্ম্মী যাঁহারা, তাঁহাদের অনেকের সহিতই আপনার সুদীর্ঘ কালের পরিচয় আছে। বাংলাদেশে একখানি আদর্শবাদী পত্রিকার প্রয়োজন আমরা অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু একখানি দৈনিক কাগজ করিতে হইলে যে সঙ্গতি ও উপকরণ আবশ্যক তাহা আমাদের ছিল না। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং আমরা কয়েকজন বন্ধু এবিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করিতাম। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার কোন দেশীয় রাজ্যের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। অমৃতবাজারের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সম্মতি ও উৎসাহ আমরা পাইলাম। অসম সাহসে নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত সুরেশবাবু উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের শেষ অঙ্কে যেদিন মহাত্মা গান্ধী ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, সেই সংবাদ লইয়া ১৯২২ এর মার্চ্চ মাসে দোলপূর্ণিমার দিন দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাহির হইল।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু, যতীন ভট্টাচার্য্য এবং আমি সম্পাদকীয় বিভাগের ভার গ্রহণ করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের একটা অংশে আফিস বসিল। কাগজ চলিতে লাগিল বটে; কিন্তু অর্থাগম হইল না। ক্রমে ঋণ বাড়িতে লাগিল। অভাব, অনাটন—আমাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। সে এক উৎসাহ ও উন্মাদনার দিন। ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবজনিত সকল রকম ত্রুটিই জাগিতে লাগিল। এমন সময়ে বিখ্যাত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি ও কুশলতায় আনন্দবাজারের বলবৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু বিশেষ স্বচ্ছল অবস্থা হইল না। তথাপি মাখনবাবু কি উৎসাহে, কি ধৈর্য্যে, কত কটু কথা শুনিয়া, কত দায়িত্ব লইয়া অসীম উদ্যমে দিনের পর দিন কার্য্য করিয়াছেন, সে কথা বলিবার নহে। কেবল কি অর্থাভাব? বিরোধিতাও কম আসে নাই, শাসকগণের বিরোধিতা ও স্বদেশবাসীর বিরোধিতা, এ দুইই পর পর আসিয়াছে। আমরা কিছুতেই নিরুৎসাহ হই নাই। যখন মনে হইয়াছে—আর চলে না, তখনও সে নৈরাশ্য আমরা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছি। কলিকাতা সহর হইতে নহে—উৎসাহ আসিয়াছে মফঃস্বল হইতে। আমাদের সকলের চেয়ে উৎসাহ-দাতা বান্ধব—পত্রিকার গ্রাহকগণ। আমাদের এক

ভরসা ছিল, যে উপক্রত, দীন দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করিতেছি, দেশের জ্ঞানী, গুণী ও কর্ম্মীদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাসম্ভার প্রচার করিতেছি, এই শ্রেয়ঃ-কার্য্য কখনও নিষ্ফল হইতে দিব না। একদিন সাহায্য সমর্থন আসিবেই। সেবার বিনিময়ে আমরা দেশের চিত্তে স্নেহের আসন পাইবই।

আজিকার 'আনন্দ বাজার' একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, ইহা তিলে তিলে গড়িয়াছে। আরো বহু সেবক ইহাতে যোগ দিয়াছেন। আজ প্রকাণ্ড রোটারী মেশিনে এক সুবৃহৎ পত্রিকা প্রতিদিন ৩৫।৪০ সহস্র মুদ্রিত হইতেছে। সমস্ত ভারতে আজ এত বড় জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র আর নাই। আনন্দবাজার কার্য্যালয়ে দুইশত কর্ম্মী এবং তিনশতাধিক ব্যক্তি কাগজ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। সহরের বাহিরেও পাঁচ শত এজেন্ট রহিয়াছেন। ইহার উপর বিজ্ঞাপন-সংগ্রহ করিতে অনেকে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আজ ইহার বৃহৎ কর্ম্মশালা, সর্ব্বদা যন্ত্র ও মানবের কোলাহলে মুখরিত। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালী জাতিই গঠন করিয়াছে। এত স্নেহ, এত সহানুভূতি, এত দয়া চারি দিক্ হইতে আনন্দবাজার পাইয়াছে যে, তাহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। ১৯৩০এ প্রেস দমন আইনের প্রতিবাদ-কল্পে আমরা যখন কাগজ ছয় মাসের জন্য বন্ধ করিয়াছিলাম, তখন অনেক হিতৈষী বলিয়াছিলেন—"এ ক্ষতি সহ্য করিয়া আর তোমরা দাঁড়াইতে পারিবে না।" আমরা উত্তর দিয়াছিলাম—"আনন্দবাজারের প্রচার, প্রতিপত্তি জাতীয় সম্পদ। গচ্ছিত ধনে আত্মবৃদ্ধি হইবে, এমন দুর্ম্মতি যেন আমাদের না হয়। জাতির যদি প্রয়োজন থাকে, তবে জাতিই তাহার প্রিয় 'আনন্দ-বাজার' গড়িয়া লইবে।" এই কথা বলিয়া আনন্দবাজারের বিশিষ্ট কর্ম্মীরা হাস্যমুখে কারাগারে চলিয়া গেলেন।

এত বড় প্রতিষ্ঠান, এত বড় সংবাদপত্র, কিন্তু কি বন্ধনের মধ্যেই না আজ আমরা অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে মিনতি জানাইতেছি! সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আজ সঙ্কুচিত। যে কথা বলিতে চাই তাহা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাসে বাতাসে মিলাইয়া যায়। লিখিবার সময়ে মনের চিন্তাকে সমগ্র ভাবে প্রসারিত করিবার বাধার যে বেদনা নিত্য পীড়া দেয়, তাহার চেয়ে অধিক বেদনা মানুষের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? দেশ-সেবা, জাতির সেবা একটা মহান্ ব্রত। এই সাধনায় মানবের স্বভাব-দৌর্ব্বল্যের মধ্যে তেমন একাগ্র নিষ্ঠা কোথা পাইব? অনেক ত্রুটি, অনেক ভুল, দৌর্ব্বল্য লইয়াও আনন্দবাজারের সেবকগণ ইহাই মনে করেন, যে চিন্তায় কল্পনায় যাহা ভাল তাহাই আমরা দেশবাসীর সম্মুখে পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ অপেক্ষা দেশবাসীর স্বার্থকে যেন সর্ব্বদাই বড় করিয়া দেখিতে পারি—এই অভয়
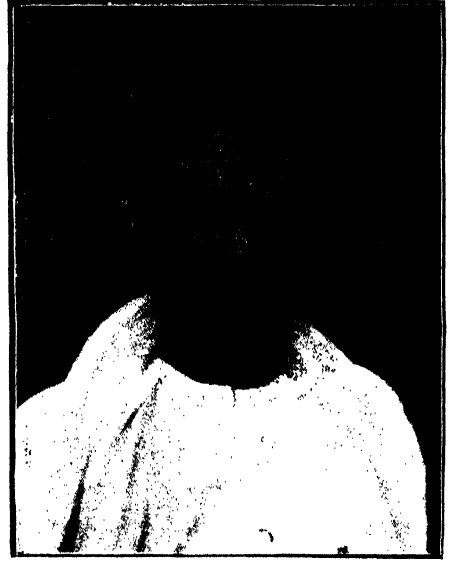
শ্রীমাখনলাল সেন

আশীর্ব্বাদই সতত প্রার্থনীয়। আনন্দবাজার দীনের, দরিদ্রের, পতিতের, নিপীড়িতের মুখপত্র হইয়া তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চলিয়াছে। প্রবলের রুষ্টদৃষ্টি, ধনীমানীর অনুগ্রহ-লোভ, এই দুই সঙ্কট দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা জাতীয়তার বাণী, ঐক্যের বাণী, সমষ্টি-মুক্তির বাণী সামাজিক সমুন্নতির বাণী—ভারতবর্ষের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিবার ব্রত হইতে যেন ভ্রষ্ট না হয়—দেশবাসীর নিকট আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

* * *

"সনাতন পথই মানব-সভ্যতার একমাত্র কল্যাণের পথ"

"প্রবর্ত্তক" সম্পাদক মহাশয় আমাদের মর্ম্মকথা জানাইতে বলিয়াছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ গত ৫৩ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, অভাব, অভিযোগ আমরা নিবেদন করিয়া আসিতেছি। আমাদের পাঠকদের সহিত যদি কোনও যোগসূত্র হৃদয়ে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া থাকিতে পারি, তবে নূতন আর কি বলিব? আর যদি তাহা না পারিয়া থাকি, তবে সম্পাদকের কথায় "পথ নির্দ্দেশ" করিয়া বলিবই বা কি?

বর্ত্তমানের বাঙ্গালী সাধারণ জানেন যে, "বঙ্গবাসী" সনাতন-পন্থী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সনাতন পন্থাটা কি, তাহা আজ হিন্দুসন্তানকে নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। দুর্ভাগ্য বলিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে অবহেলা করিব না। সনাতন অর্থে তাহাই, যাহা চিরস্থায়ী, কালজয়ী, শাশ্বত, নিত্য, সত্যাধিষ্ঠিত। জগতের অন্য সকল সভ্য দেশ নাটকের পটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির জীবন-রঙ্গমঞ্চে নানা চরিত্রের নানা ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে; একমাত্র এই ভারত কোন্ যুগযুগান্তের অতীত তত্ত্বোপোদ্‌ঘাতের ইঙ্গিতে জীবনপথের মূলসূত্র ধরিয়া তাহার জীবন-রঙ্গমঞ্চে নটনাথের শুভাশীর্ব্বাদ-লাভের আকাঙ্ক্ষায় একই ভূমিকার অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। একটা বিরাট্ নাটকের রসসৃষ্ট অবিরাম চলিতেছে। আমরা সেই নাটকের ক্ষুদ্রতম অভিনেতা মাত্র।

এই বিশ্বাস এবং এই ধারণা লইয়া "বঙ্গবাসী" দিনের দিন জানাইতে চায়, ভারতের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ বাণী "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান এত বড় আশ্বাসবাণী নিজ শ্রীমুখে বলিয়া দিয়াছেন, আবার স্ত্রী, শূদ্র, নীচযোনি সকলেরই গতির জন্য বলিয়া দিয়াছেন—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" তবে মানুষ তাহার মত অপরের প্রতি চালাইবার জন্য, নিজের মতকেই বলবৎ করিবার জন্য জগতে এত অশান্তি আনয়ন করে কেন? আজ দেখিতেছি, ইউরোপের মহাযুদ্ধের পর তথাকার শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকরা স্বীকার করেন—জগতের শান্তির একমাত্র পন্থা, ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে স্বতন্ত্র চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। আজ দেখিতেছি, ত্রিবর্ণের দ্বিজত্ব রক্ষা হয় অন্তর-সম্পদে, জাতিরক্ষায় ও ধনার্জ্জনে, এই তত্ত্ব প্রসিদ্ধ দার্শনিক হুগো মুনষ্টারবার্গ বুঝিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজ দেখিতেছি, "অন্নাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই তত্ত্বের উপর যে সমাজ গড়িবার চেষ্টা রুষিয়ায় হইল, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, "আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"। তাহা না ভুলিলেই স্বীকার করিতে হয়, বর্ণাশ্রম ও ভূদেব ব্রাহ্মণ। আজ দেখিতেছি—ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক এমিল সেনাঢ় সারা জীবন গবেষণা করিয়া স্বীকার করিতেছেন যে, জাতিভেদ ও হিন্দুধর্ম্ম ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। আজ দেখিতেছি, জর্ম্মাণ দার্শনিক স্পেঙ্গলার নিয়তি ও সাধনার বাণী প্রচার করিয়া পৌরাণিক সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুক্রম প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। আজ দেখিতেছি, ইউরোপ ছিন্নমস্তার বিভীষিকায় আতঙ্কিত। উপায় না পাইয়া ডাঃ নরম্যান হেয়ার বিধান দিতেছেন—ঋতুসমাগমেই নারীকে পুরুষ-সংসর্গ দাও; এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ বিবাহ-বিচ্ছেদকে বীভৎস ঘৃণা করিতেছেন; লাস্কি বিবাহবিচ্ছেদের আইনকে প্রহসন ও ভণ্ডামি বলিতেছেন। আজ দেখিতেছি, হিট্‌লার হয়ত 'সঙ্করো নরকায়ৈব' মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন; তাই নারীকে স্কুল-কলেজ ও কল-কারখানা হইতে গৃহে ফিরাইবার জন্য রুদ্র-রূপ ধরিয়াছেন।

এই সব দেখিয়া "বঙ্গবাসী" স্থিরবিশ্বাস করিয়াছে—আমাদের কথা প্রাচীন কথা মাত্র নহে, ইহা "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি", ইহাই মানব-সভ্যতার একমাত্র কল্যাণের পথ। আমরা এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছি, আর শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা, যেন এই পথ হইতে কোনও দিন না ভ্রষ্ট হই।

শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য্য
"বঙ্গবাসী"

"বঙ্গবাসী" ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা

[শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য্য]

"বঙ্গবাসী"র বয়স ৫৩ বৎসর চলিতেছে। বাঙ্গালা সন ১২৮৮ সালে বর্দ্ধমান জেলার দামোদর-নদ-তীরবর্ত্তী বেড়ুগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তখন যুবক; কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। ১২৮৮ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার কলিকাতা হইতে "বঙ্গবাসী" বাহির হয়।

সংবাদপত্র বলিতে যাহা বুঝায়, বাঙ্গালায় তখন ঠিক সে ভাবের কাগজ ছিল না। বাঙ্গালা সংবাদপত্র যে রাষ্ট্রের একটা শক্তি

৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। "বঙ্গবাসী"কে সাধারণের সেবায় নিয়োজিত করিয়া তিনি সেই শক্তি-সংগ্রহের চেষ্টা করেন। "বঙ্গবাসী" প্রকাশ করিয়া যোগেন্দ্র চন্দ্র শক্তিসম্পন্ন সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং "বঙ্গবাসী"র সাহায্যে ইহাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, দেশের জন-সাধারণই দেশের সর্ব্বস্ব, তাহারাই দেশ, তাহাদের জন্যই দেশ, তাহাদের দাবীই দেশের দাবী। জনমত বলিয়া তখন কিছু ছিল না; তাই তিনি সংবাদপত্র-সাহায্যে এদেশে জনমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা এবং দেশের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া "বঙ্গবাসী" পল্লীগ্রামে গমন করিত, আবার তাহাদের দুঃখ, যাতনা, অভিযোগ ও আবেদন বহন করিয়া রাজদ্বারে উপনীত হইত। অনুনয়, বিনয়, প্রয়োজন হইলে বিতর্ক পর্য্যন্ত করিয়া "বঙ্গবাসী" বঙ্গবাসীর জন্য রাজপুরুষের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষাও করিয়াছে; আবার রাজনীতি, ধর্ম্ম ও সমাজক্ষেত্রে তাহাদের অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভীকভাবে রাজপুরুষের সহিত দ্বন্দ্বেও প্রবৃত্ত হইয়াছে। একদল ভারতের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া জীবনের আদর্শ সুদূর পাশ্চাত্যে নিবেশিত করিতে চাহিতেন। "বঙ্গবাসী" তাহাদের সেই মতের সহিত বিরোধ ঘটাইল। সেই বিরোধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনাদর্শের বিরোধ। "বঙ্গবাসী" এই ৫৩ বৎসর ধরিয়া ভারতের জীবনাদর্শের পথে স্বদেশকে নিয়োজিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে।

"বঙ্গবাসী" এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তার জন্য অভাবনীয় স্বল্পমূল্যে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থরাজি প্রচার করিয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালী সাধারণের পরিচয় ঘটাইয়াছে এবং ভারতেতিহাসের সম্যক্ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য অনেকপ্রকার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে। একই উদ্দেশ্যে, "হিন্দী বঙ্গবাসী" আজও ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত। প্রচারের সুবিধার জন্য 'দৈনিক' ও ইংরেজী সান্ধ্য দৈনিক "টেলিগ্রাফ" পত্রও প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ হইলে গ্রামে গ্রামে সম্পাদককে পাঠাইয়া দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রকাশ করেন এবং সেই বিবরণী পাঠে সরকার পক্ষও বিচলিত হন। দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য সাহায্যও করা হয়।

ইংরেজি ১৮৯১ সালে যখন সহবাস-সম্মতি আইনের প্রস্তাব আসে, তখন "বঙ্গবাসী" ঐ আইনের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন চালাইয়াছিল। "বঙ্গবাসীতে" ক্রমান্বয়ে "আমাদের অবস্থা", "ইংরেজের প্রকটমূর্ত্তি" এবং "পরিণাম কি" নামে তিনটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, হাইকোর্টের দায়রায় "রাজদ্রোহ" অপরাধে "বঙ্গবাসী"র বিচার হয়। স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মিঃ জ্যাকসন "বঙ্গবাসী"র পক্ষ সমর্থন করেন। যোগেন্দ্র চন্দ্রের পরলোকগমনের পর "বঙ্গবাসী"র জীবনে রাজশক্তির হস্তে দ্বিতীয় লাঞ্ছনা হয় ইং ১৯১৮ সালে। বাংলা ১৩২৩ সালের ২৮শে পৌষ ও ২৫শে ফাল্গুন তারিখে রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম হইতে ২৩ মাইল দূরে চিলমারির হাটলুণ্ঠনের তদন্তে তথাকার মুসলমান প্রজাদিগের উপর পুলিশের অত্যাচার জানাইতে "বঙ্গবাসী"কে দুইটী বিবরণী বাহির করিতে হয়। কলিকাতা হাইকোর্টে পুলিশ-ইনস্পেক্টর গবর্ণমেন্টের সাহায্যে মানহানির দরুণ খেসারতের দাবী আনেন। সেই মামলায় সুদূর পল্লীগ্রামে সরকারী এডভোকেট-জেনারেলকে লইয়া গিয়া

কমিশনে সাক্ষী জবানবন্দী লওয়া হয়। তিন বৎসর মামলার পর "বঙ্গবাসী"র নামে পুরা ডিক্রী হয়। সেই মামলায় সরকার পক্ষ খরচ করেন প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং "বঙ্গবাসী"র খরচ হয় ৭৩ হাজার টাকা। তাহার পর কলিকাতায় প্রথম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিলে গত ১৩৩৩ সালে 'বঙ্গবাসী'র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ ও জাতি-বিদ্বেষের মামলা আনিয়া তাহার সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে দণ্ডিত করা হয়। আবার ইং ১৯২৮ সালে সুদূর পাঞ্জাবে এক আর্য্যসমাজী নাকি পুনরায় হিন্দু হইয়াছেন, এই খবর অন্ত কাগজ হইতে উদ্ধৃত করায় অপরাধে মানহানির দণ্ড ভোগ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, যে কাগজে প্রথম ঐ খবর বাহির হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে কোনও নালিশ দায়ের হয় নাই। এই সকল মামলা মোকদ্দমায় "বঙ্গবাসী"র যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন হইয়াছে, তাহা অবশ্যই অপূর্ব্ব। "বঙ্গবাসী"র এই ৫৩ বৎসরের বহুদর্শিতার ও সাধনায় একটা অতুলনীয় মূল্য আছে—বাঙ্গালী কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবে?

* * *

"বাঙ্গালীর বিশেষ সমস্যা বাঙ্গালীকেই সমাধান করিতে হইবে"

দেশে যে দেশাত্মবোধের ভাব আজ ভাগীরথীর পাবনী ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা যখন প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে, তখন সেই ভাবপ্রচারের জন্য 'হিতবাদী' প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

তদবধি আজ পর্য্যন্ত 'হিতবাদী' সেই ভাবপ্রচারেই আত্মনিয়োগ করিয়া আছে। স্বরাজ যে জাতির জন্মগত অধিকার—জাতিকে এই বিশ্বাসে দৃঢ় করিয়া, তাহাকে নিয়মানুগ পথে জয়যাত্রা করিয়া, বিঘ্নকঙ্কর-কণ্টকিত পথ অতিক্রম করিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে প্রবুদ্ধ করাই 'হিতবাদীর' উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের যে সব সমস্যা আজ সমাধানের জন্য উপস্থিত হইয়াছে, সে সকল ব্যতীত বাঙ্গালার কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে।

বাঙ্গালার শিক্ষা-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, এ সকলে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য স্বপ্রকাশ। এই নদীমাতৃক দেশের জলপথ-সমস্যা আজ জটিল ও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। 'হিতবাদী' এই সকল সমস্যার প্রতি দেশবাসীর ও দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সকলকে এই সকলের সমাধানে সচেষ্ট করিয়া থাকে।

বাঙ্গালার সংবাদপত্রে যাহাতে বাঙ্গালীর লোকমত প্রতিফলিত হয়—বাংলার আশা ও আকাঙ্ক্ষা স্ফূর্ত্ত হয়, 'হিতবাদী' সর্ব্বদাই সে বিষয়ে অবহিত।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'হিতবাদী'র প্রতিষ্ঠা

[শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

এদেশে যখন ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া একটি জাতীয় প্রতিনিধি-সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপলব্ধ হয় এবং তাহার ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও বাঙ্গালায় যে সকল বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছিল সে সকল এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হইবার আগ্রহ দেখায় নাই; কোন কোন পত্র ইহার বিরুদ্ধাচরণও করিয়াছিলেন। সেই জন্য দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ নবজাগ্রত জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবার জন্য একটি কোম্পানী গঠিত করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'হিতবাদী' প্রচারিত হয়। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার আর, এস, দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই কোম্পানীর অংশী ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহার প্রথম সম্পাদক।

দুই বৎসর পরে 'হিতবাদী' সম্বন্ধে পরিচালকগণ যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহা হইতে একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"The Hitabadi Printing and Publishing Co. ..

formed in order to check the pernicious influence of rabid and irresponsible newspapers, and to impart a healthy tone to vernacular journalism; and for that object the *Hitabadi* newspaper was started. Thus *patriotism* and not *profit* was the one object of the Co.……"

পণ্ডিত ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

কিন্তু ইহাতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় যখন ইহা বন্ধ করিবার প্রস্তাব হয়, তখনও পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহার সোদরোপম সুহৃদ্ কবিরাজ ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন ও ৺উপেন্দ্রনাথ সেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত একযোগে ইহা গ্রহণ করেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় ইহার সম্পাদক হইয়া ইহাকে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সংবাদ-পত্রে পরিণত করেন এবং ইহার প্রচার বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের সকল পত্রের প্রচার অপেক্ষা অধিক হয়। জাতীয় ভাবের প্রচার-বেদীরূপে 'হিতবাদী' দেশে আদর লাভ করে।

'হিতবাদী' নিয়মানুগ ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ধারায় দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছে। ইহার মূলমন্ত্র—"স্বরাজে দেশবাসীর অধিকার তাহার জন্মগত অধিকার।"

দেশবাসীর রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা 'হিতবাদী'র রচনায় প্রকাশিত হইবে, ইহাই ইহার পরিচালকদিগের অভিপ্রেত। প্রবর্ত্তনাবধি 'হিতবাদী' কংগ্রেসের ভাব প্রচার করিয়া আসিতেছে; কিন্তু কংগ্রেসে কোনরূপ অনাচার বা গণতন্ত্রবিরোধী ভাব দেখিলে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

কোনরূপ অত্যাচার ও অনাচার কোন ক্ষেত্রেই—'হিতবাদী' সহ্য করে নাই।

সংবাদপত্রের উচ্চ আদর্শ—দেশসেবা, লোককে শিক্ষা ও সংবাদ প্রদান—অক্ষুণ্ন রাখিতে সর্ব্বদা প্রয়াসী থাকিয়া ইহা দেশে আদর লাভ করিয়াছে। ইহার দ্বারা বাঙ্গালায় সৎসাহিত্য-প্রচার কার্য্যও পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে। "হিতবাদীর" আন্দোলন-ফলে অনেক অভিযোগের প্রতীকার হইয়াছে এবং দেশের লোক অনেক নূতন ভাবধারার সন্ধান পাইয়াছে। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৺সখারাম গণেশদেউস্কর প্রভৃতি মনীষীর রচনায় পূর্ব্বে যেমন 'হিতবাদী'র গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে, বর্ত্তমানেও তেমনই বহু প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্, সংবাদিক ও সাহিত্যিক ইহার সেবায় নিযুক্ত আছেন। 'হিতবাদী' আপনাকে দেশের ও দশের প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া নির্ভীক ভাবে কর্ত্তব্যপালনই তাহার জীবন-ব্রত বলিয়া বিবেচনা করে।
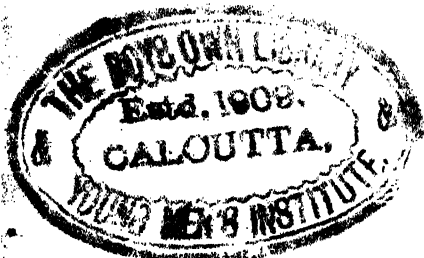
"ভারতে আদর্শ জাতিগঠন করিতে হইবে"

ভারতবর্ষে জাতি-সংগঠনের আন্দোলন হইতেছে। কি উপায়ে বিরাট্ ভারতবর্ষে জাতি-গঠন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নানা জন নানা মত প্রকাশ করিতেছেন।

যে দেশে নানা ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীর বাসস্থান, এক ধর্ম্মাবলম্বী নরনারী নানা ভাষায় কথা কহে, সে দেশে জাতিগঠন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

তথাপি অসাধ্য সাধন করিতে হইবে।

কেবল কতকগুলি নরনারীর সমষ্টিতে জাতি হয় না। যে জাতির অধিকাংশ নরনারী বিশ্বাস করেন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এক, সমস্ত নরনারী তাঁহারই সন্তান এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব জীবনে প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস করেন, দেশ বিদেশ হইতে জ্ঞানার্জ্জনে ব্যস্ত হন; সমস্ত মানবকে প্রীতি করিতে ও স্ব স্ব চরিত্রকে পুণ্যময় করিতে চেষ্টা করেন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে দৃঢ় এবং জাতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধি করিতে ব্যাকুল হন, তাঁহাদের দ্বারাই আদর্শ জাতিগঠন সম্ভব।
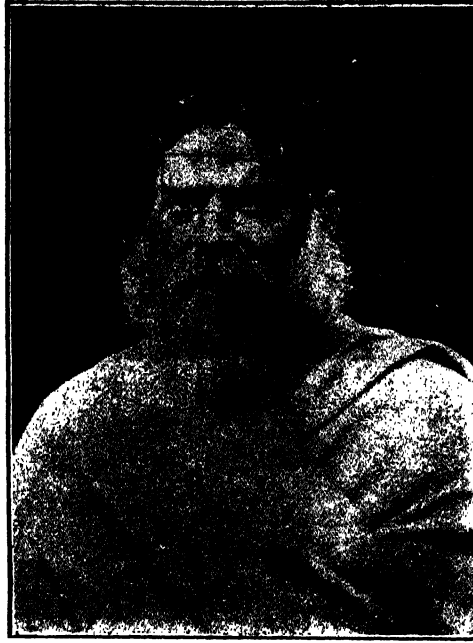
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র—সম্পাদক, 'সঞ্জীবনী'

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

সঞ্জীবনীর ইতিবৃত্ত

[শ্রীসুকুমার মিত্র]

১৮৮৩ সালে যখন ভারতময় ইলবার্ট বিল লইয়া ভীষণ আন্দোলন হয়, তখন ভারতবাসীর মান-মর্য্যাদারক্ষার জন্য সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা লইয়া সঞ্জীবনীর জন্ম হয়। ভারতবাসীকে তাহাদের জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য লর্ড রিপণের সময়ে যখন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, সঞ্জীবনী তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবাসী ভারত-শাসনের অধিকার লাভ করিবে, এই মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া তদবধি সঞ্জীবনী কার্য্য করিতেছে। ১৮৮৪ সালে কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অধিকাংশ সংবাদপত্র ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া ঘৃণার সঞ্চার করেন, তখন সঞ্জীবনী প্রায় একাকী কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করেন।

সঞ্জীবনী আসামের চা-করদের ভীষণ উৎপীড়ন হইতে কুলীদের রক্ষার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট দাসত্ব-প্রথা রহিত করিতে বাধ্য হন। আলিগড়ের সার সৈয়দ আহাম্মদ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া হিন্দু মুসলমানে বিরোধ জন্মাইবার প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলেন। সঞ্জীবনী সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে সম্মিলিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। সঞ্জীবনীর আন্দোলনে, গভর্ণমেণ্ট খোলা ভাটি স্থাপন করিয়া পল্লীর নরনারীকে মাতাল ও দরিদ্র করিতেছিলেন, তাহা বন্ধ হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী প্রচারে সঞ্জীবনী অগ্রণী ছিলেন। তখন সঞ্জীবনীর সম্পাদককে দেশান্তরিত করিয়া বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইহা ব্যতীত অনেক অশুভ আইনের বাধা আসিয়াছে। সঞ্জীবনী অন্তঃপুরে নারীনির্য্যাতন, সমাজের দুর্নীতি প্রভৃতি দূর করিতে ও বর্ত্তমানে নারীনিগ্রহ বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে গত দশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে বিশেষ আইন প্রণয়ন দ্বারা এই পাপ দেশ হইতে দূর হয়, তাহার জন্য জনসাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। একাদিক্রমে একই সম্পাদক সঞ্জীবনী ৫১ বৎসর ধরিয়া সম্পাদকতা করিতেছেন, ইহা ভারতের সংবাদপত্র-মহলে এক নূতন ব্যাপার।

* * *

"বাংলার হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তপস্যা করিতে হইবে"

"বসুমতীর" প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, বাঙ্গালার আদর্শ, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালীর ভাবধারা বাঙ্গালীর প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া জাতীয় জীবনে বাঙ্গালীকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা ও জাতির শক্তিসাধনে বাঙ্গালীর নেতৃত্ব ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। প্রতীচ্য সভ্যতার প্লাবনে প্রাচ্য সভ্যতা ও শিক্ষা দীক্ষা যাহাতে ধ্বংস না পায়, পশ্চিম দিগ্বলয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রাচী গগনের মধুর সমুজ্জ্বল দীপ্তিকে উপেক্ষা না করে, বাঙ্গালী জাতিকে সে বিষয়ে অবহিত রাখাই "বসুমতীর" জীবন-ব্রত। চারিদিক্ হইতে বাঙ্গালার হিন্দু আঘাত পাইতেছে, সে আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে হিন্দুকে তপস্যা করিতে হইবে—"বসুমতী" এই কথাই মুক্তকণ্ঠে বলিয়া আসিতেছে। বিক্ষিপ্ত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইলে বাঙ্গালার হিন্দু জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবে না। জীবন যাত্রার বিভিন্ন বিভাগ হইতে বাঙ্গালী বিতাড়িত হইতেছে চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ। বাঙ্গালীকে—আত্মবিস্মৃতি হইতে জাগ্রত বাঙ্গালী জাতিকে নব উদ্যমে আত্মরক্ষায় অবহিত হইতে হইবে—ইহাই "বসুমতীর" জীবনধারার মর্ম্মকথা।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বসুমতীর ইতিহাস

আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্ম ও জাতীয়তা প্রচারের উপযুক্ত একখানি পত্রিকার অভাব দেখিয়া বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য-রক্ষার নিমিত্ত একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে ও পরিচালনায় "বসুমতী" প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমে কথা হয়, যে বেলুড় মঠ হইতেই "বসুমতী" প্রকাশিত হইবে, কিন্তু শেষে ৩নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে স্বর্গীয় ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "বসুমতী" ১৮৮০ অব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তখন স্বামীজীর অনেক লেখা বসুমতীতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

জাতি তখন বিদেশীর মুখাপেক্ষী, সমাজ তখন ইংরাজীভাবাপন্ন, ধর্ম্ম তখন প্রাণহীন। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, ভারতের বৈশিষ্ট্যের কথা প্রতি বাঙ্গালীর কুটীরে উপস্থিত করিতে। তাই তিনি গুরু-ভ্রাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এই কার্য্যের সমগ্র ভার প্রদান করেন। স্বামীজীর নির্দ্দেশে উপেন্দ্রবাবু ধর্ম্ম-গ্রন্থ ও সৎসাহিত্য প্রচারের সহিত বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে ধর্ম্ম-কথা ও সংবাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় এক দিকে যেমন "পঞ্চদশী" প্রভৃতি বৈদান্তিক শাস্ত্র-গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল, অন্যদিকে সংবাদযোগে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ব্যবহারিক বেদান্ত-বোধ জাগ্রত করিবার তেমনি চেষ্টা হইতে লাগিল। স্বামী বিবেকানন্দ ও উপেন্দ্রনাথ জাতির নব-জাগরণের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রভাব প্রচারিত করিতে লাগিলেন।

৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ যেন মনে করেন, যে যুগাবতার রামকৃষ্ণ দেব স্বীয় ভা[ব] প্রচারই তাঁহার কার্য্য নিরূপণ করিয়া দেন। তাই তিনি সর্ব্বতোভা[বে]

সৎসাহিত্য-প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। শাস্ত্র ও সাহিত্য তখন মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী পাঠ করিবার সুযোগ পাইত, যে দুই চারিখানি গ্রন্থ ছাপা হইত তাহা এত দুর্ব্বোধ্য ও দুর্মূল্য ছিল যে, সাধারণ পাঠক তাহা পাঠ করিবার যেমন সুযোগ পাইত না, তেমনি বিশিষ্ট লেখকগণও প্রচারের অভাবে অপরিচিত রহিয়া যাইতেন। "বসুমতী" প্রতিষ্ঠান তাহার সংবাদপত্র-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কৃতী লেখকদের গ্রন্থাদির বহুল প্রচার করিতে লাগিলেন। শব্দকল্পদ্রুম, কালিপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থও সাধারণের পক্ষে সহজপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। বাঙ্গালাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতির রচনাগুলি এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টাতেই যে অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল ইহা সকলেই স্বীকার করিবে।

এই সময়ে বাঙ্গালার জনসাধারণ সংবাদপত্রের আর এক নাম দিয়াছিল "বসুমতী"। সংবাদপত্র বলিতে সকলে বুঝিত না, "বসুমতী" বলিলেই বুঝিত সংবাদপত্রের কথা বলা হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর তাঁহার প্রিয় সৃষ্টি "বসুমতী" উপেন্দ্রবাবু পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ৩নং বিডন ষ্ট্রীটের ভবন হইতে হরিমোহন বসু লেনে আফিস উঠিয়া আসে। ৯৬ নং বিডন ষ্ট্রীটের আফিসে স্বর্গীয় কালিকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদনা করেন। ১১৫।২ গ্রে ষ্ট্রীটে যখন আফিস উঠিয়া আসিল, তখন স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক হন। পাঁচকড়ি বাবুর পর, শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বাবু ক্ষেত্র মোহন সেনগুপ্তের সহিত সম্পাদনা করিতে থাকেন। ১১৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীটের আফিসে 'বসুমতীর' সম্পাদক হন শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ও তাঁহার পর স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

'দৈনিকের জন্ম'

১৯১৪ অব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে সমাজপতি মহাশয়ের সময়েই 'বসুমতীর" ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের ভবনে আফিস উঠিয়া আসে। এই সময়ে "বসুমতীর" দৈনিক সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়। মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের সংবাদ প্রত্যহ বাঙ্গালীকে বিতরণ করিবার জন্য "দৈনিক বসুমতী" বাহির করা হয়। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে দৈনিকের সম্পাদনা করেন শ্রীযুক্ত হরিপদ অধিকারী মহাশয়। কিন্তু নিয়মিত ভাবে বর্ত্তমান আকারে দৈনিক পত্রিকা প্রথম সম্পাদন করেন স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমাজপতির পর কিছুদিন শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় দৈনিকের সম্পাদক হন, তাঁহার পর যথাক্রমে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু। সত্যেন বাবুর পর পুনরায় হেমেন্দ্রবাবু সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। তৎপর হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দৈনিক বসুমতীর ও সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদনা করিয়া আসিতেছেন।

মাসিক বসুমতী

মাসিক বসুমতী ১৩২৯ সালে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপর সম্পাদক হন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বর্ত্তমানে উহা সতীশবাবু ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইতেছে।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাধনা মাত্র বাঙ্গালায় নহে, সমগ্র ভারতের নিকট গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে একদিন এই প্রতিষ্ঠান প্রাচ্য-বরেণ্য হইতে সমর্থ হয়। ১৯১৩ অব্দে বিলাতের প্রসিদ্ধ Statesman Year-Book'এ লিখেন—"The weekly with the largest circulation is the Basumati of Calcutta."

উপেন্দ্রবাবুর দেহরক্ষার সময়ে "বসুমতী" প্রতিষ্ঠান ভারতের অন্যতম জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেই আপন পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বামীজীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করেন। স্বামীজীর পর ৺রাখাল মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের পরিচালনভারের সঙ্গে 'বসুমতীর' নীতি ও কার্য্যও নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুণ্য উপদেশ ও তাঁহার দেহত্যাগের পর "মহাপুরুষের" কৃপা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া সতীশবাবু বর্ত্তমানে যে ভাবে এই প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকাগুলির সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানমাত্রেরই অনুকরণীয়।

* * *

"সাধকের সাধনার আলোকে পথ দেখিয়া চলিতে হইবে।"

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিবার কালে ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনাও বুঝি অসম্ভব। অতীতের সহিত সাদৃশ্য-শূন্য বর্ত্তমান হইতেও ভবিষ্যতের পার্থক্য যে কত বড় হইবে, আজ তাহার হিসাব না করিলেই ভাল হয়। ভারতের মহাশ্মশানে বাধা বিপত্তির বাত্যাকম্পিত আশার যে স্তিমিত আলোকের ক্ষীণরশ্মি ভবিষ্যতের পথে জাতিকে অগ্রগমনের সুবিধা করিয়া দিতেছে, কোন্ প্রতিকূল অবস্থার পীড়নে সে আশার প্রদীপ নির্ব্বাপিত

করিয়া দিয়া অন্ধকারের দুর্গম পথে পরিচালিত করিতে বাধ্য করিবে কে জানে? বর্ত্তমানের অবস্থা-পর্য্যালোচনায় জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইবার দুর্ভাবনায় বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া লাভ নাই। ব্যথার বন্ধন-মুক্ত হইবার কোন ধারাবাহিক নিয়ম থাকিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কর্ম্মের পথে, অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রয়োজন-মত পথ-পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হওয়া জাতীয় জীবনে সজীবতার লক্ষণ। সাধকের সাধনার আলোকে পথ দেখিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে সিদ্ধি অনায়াসে লব্ধ হয়, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ সহস্র বৎসরের ব্যথার বোঝা বুকে লইয়া আজ একজন মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণে ভবিষ্যতের পথে অভিযান করিয়াছে। এমন মহান্ যাত্রা বোধহয় কোন জাতির ভাগ্যে কখন ঘটিয়া উঠে নাই, পৃথিবীর সুসজ্জিত আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে অর্দ্ধ-নগ্ন একজন রিক্তহস্ত সন্ন্যাসীর নিরস্ত্র অভিযান অদ্ভুত। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও স্বার্থকে একত্র সঙ্ঘবদ্ধ রাখিয়া মানুষের অধিকার বুঝিয়া লইবার এত বড় আয়োজন পৃথিবীর কোন দেশে, কোন কালে আর কখনও সম্ভব হইয়াছে বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। মহামানবের সাধন-শক্তি সমগ্রজাতির প্রাণে যে প্রেরণা আনয়নে সমর্থ হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। যাহারা ক্ষণকালের চিত্ত-চাঞ্চল্যে বিভ্রান্ত হইয়া মহাত্মার সাধনশক্তি উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তাহাদের ব্যক্তিগত হিংসার প্রচেষ্টা যে জাতীয়তার পথকে কতখানি বিঘ্ন-সঙ্কুল করিয়া তুলিতেছে তাহা বুঝিবারও তাঁহাদের শক্তি নাই দেখিয়া দুঃখ হয়। আজকাল কিম্বা দূর ভবিষ্যতে ভারতের স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে হইলে অহিংসার পথ ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে সংহতিশক্তি প্রতিষ্ঠার আশা নাই। বর্ত্তমান ভারতের বুকে এমন একটা ভাবের আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহার প্রভাবে সাধারণের প্রাণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাতিকে অহিংসার পথে সিদ্ধির মন্দির-দুয়ারে পথ ছাড়িয়া দিতে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। আজিকার কর্ত্তব্যের বোঝা ঘাড়ে করিয়া ভবিষ্যতের রাষ্ট্রীয় রূপের পরিকল্পনা না করিলেই ভাল হয়।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহরায়

নায়কের জীবন

৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথী ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক "নায়ক" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালের প্রবাহে বিভিন্ন গতিপথে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া নায়ক পত্রিকা ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে দেশবন্ধুর প্রিয়তম সেবক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের পরিচালনাধীনে নূতন রূপ ও মতবাদ লইয়া বাঙ্গালার রাজনৈতিক জীবনের সহিত নিজের ভাগ্যসূত্রকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। ১৯২৫ সালে নায়ক পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করার পরে ৩০শে আগষ্ট রাজদ্রোহ অপরাধে জেলে যাওয়াতে ডাঃ গুহরায়ের স্থলে বাঙ্গালার অন্যতম জননায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় নায়কের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কারামুক্ত ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় মহাশয় অন্যতম শ্রেষ্ঠরথী শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গুহরায় মহাশয়ের সহযোগিতায় নায়ক-সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। এইখান হইতে নায়কের মালিকানা স্বত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডী কাটাইয়া 'স্বদেশ লিমিটেড্ কোম্পানীর" হস্তে ন্যস্ত হয়। ৺পাঁচকড়ি বাবুর প্রবর্ত্তিত হাস্যরসের পথ পরিত্যাগ করিয়া নায়ক পত্রিকা এই সময় হইতে রাজনৈতিক দুরূহ প্রশ্ন সমাধানের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে করিয়া দেশসেবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। রাজরোষের প্রবল প্রকোপে নায়কের গতিপথ প্রতিপদে ব্যাহত হইলেও কিছুদিন পরে পাঁচকড়ি বাবুর

সম্পর্কশূন্য হইয়াও নায়কের নির্ভীক সম্পাদক ডাঃ গুহরায় সমস্ত নির্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া, টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে দিয়াও নায়ককে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় পত্রিকার সম্মানের আসনে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টদেবতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে নায়ক আজ বন্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় নায়ক পরিচালনা করিতে হইলে নায়কের মতপরিবর্ত্তনের মত শোচনীয় দুর্দ্দশার পথে পদার্পণ করা ভিন্ন গত্যন্তর না থাকাতে নায়কের সম্পাদক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় "মর্ম্মবাণী" নামে নূতন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "মর্ম্মবাণী" জাতির মর্ম্মবেদনার কথা বুকে লইয়া জাতিকে নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইতেছে। ডাঃ গুহরায়ের প্রাণের স্পন্দনে তাঁহার "মর্ম্মবাণীর" আকুল আহ্বান জাতিকে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইলে তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইবে।

* * *

"সঙ্কীর্ণ, অদূরদর্শী সাম্প্রদায়িক মন লইয়া দেশ কখনও বড় হইতে পারে না।"

ভারতবর্ষের মতো এত বড় একটা দেশকে ভালবাসা মানে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করা। এখানে স্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্র যেমন বিশাল, স্বদেশপ্রেমিকের হৃদয় তেমনি উদার হওয়া দরকার। কিন্তু দুঃখ হয়, যে যাহারা বলে দেশের স্বাধীনতা লাভ করা তাহাদের কাম্য, তাহারাও সকলে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক নয়। যাহারা বলে দেশকে ভালবাসে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই দেশের মানুষকে ভালবাসে না। দেশপ্রেমের কাছে সত্য ও উদারতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সত্যের অভাবে দেশ কখনো মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যেখানে উদারতা নাই সেখানে মানুষের মন গভীর ও উন্নত হইতে পারে না। অথচ এই দুটি বস্তুর অভাব আমাদের দেশে খুবই বেশী। জীবনে সত্য লইয়া কারবার করে অতি অল্প লোকে। সত্যকে সহ্য করাও অনেকেরই পক্ষে কঠিন। সে কথা উদারতা সম্বন্ধেও খাটে। এমন অসংখ্য লোক প্রতিদিন দেখা যায়, যাহারা মুখের কথায় দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কাজের সময়ে সমাজজীবনকে হীন সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। এরূপ সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ করে মনের সঙ্কীর্ণতা ও অদূরদর্শিতা। তেমন মন লইয়া দেশ কখনো বড় হইতে পারে না। যাহারা দেশের সেবা করিবার ইচ্ছা রাখে, তাহারা যেদিন সত্যকে আপনাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাজের দ্বারা তাহার পরিচয় দিতে পারিবে এবং কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনকে আপনাদের কাছ ঘেঁসিতে দিবে না, সেই দিন ভারতবর্ষ তার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অনেক উপরে উঠিয়া যাইবে। যাহারা দেশের ক্ষতি না করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের উপকার করে তাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু নিজের সুবিধার জন্য অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি ঘটাইবার যে প্রবৃত্তি প্রায়ই দেখা যায়, আশা করি, তাহা অচিরে দূর হইয়া যাইবে।

মুজীবর রহমান—সম্পাদক, 'মুসলমান'

মুজীবর রহমান

"মুসলমানের" প্রতিষ্ঠা

"মুসলমান" বঙ্গ-ভঙ্গ তথা স্বদেশী আন্দোলনে লীলায়িত যুগশক্তিরই অন্যতম প্রকাশ। সেদিন জাতীয়তার ভাবে ভাবুক মুসলমান নেতৃগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের মর্ম্ম-কথা প্রচার ও যুগোপযোগী শিক্ষায় মুসলেম বঙ্গকে গড়িয়া তুলিবার জন্য এরূপ একখানি জাতীয় মুখপত্রের অভাব উপলব্ধি করিয়া একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করেন। এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করার ভার গ্রহণ করেন প্রাতঃস্মরণীয় ৺আবদার রসুল, মিঃ এ-এইচ-গজনভী, মৌলভী আবুলকাসেম এবং মৌলভী মুজীবর রহমান। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর মৌলভী আবুল কাসেমের সম্পাদকত্বে এবং স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ প্রমুখ হিন্দু নেতৃগণেরও শুভেচ্ছা লইয়া "মুসলমান" ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই মৌলভী কাসেমের অসুস্থতা নিবন্ধন পত্রখানির যুগপৎ সম্পাদনা ও পরিচালনার সমগ্র ভার মৌলভী মুজীবর রহমানেরই উপর আসিয়া পড়ে। মিঃ গজনভী ৬।৭ মাস এই পত্রের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ইহার পরিপোষণে যথেষ্ট অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তিনি ইহার সহিত সকল সম্পর্ক বিযুক্ত করেন। তখন ৺রসুল ও মুজীবর রহমানই সংযুক্ত ভাবে ইহার গুরু দায়িত্বভার বহন করিতে লাগিলেন। মিঃ রসুল ইহার সম্পাদনা ও ব্যয়ভার বহনে সহায়তা করার সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্য্যালয়ও নিজ ভবনে স্থানান্তরিত করেন।

"মুসলমানকে" জন্মকাল হইতেই আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইয়াছে। প্রথম বৎসরেই ৭০০৲ টাকার অধিক ঋণ হয়। ইহার অধিকাংশ মিঃ রসুল পরিশোধ করেন, এবং দিনের পর দিন ইহার গ্রাহকবর্গের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থাগমের সম্ভাবনা না দেখিয়া অবশেষে অতি দুঃখের সহিত একদিন মৌলভী মুজীবর রহমানের নিকট ইহা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। মিঃ মুজীবর রহমান তদবধি দারুণ অর্থকষ্টে পড়িয়াও, আর বন্ধুবর রসুলকে ইহার জন্য চিন্তা করিতে দিতেন না, সে অভাবের কথা তাঁহাকে শুনাইতেন না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ রসুল ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবশ্য পত্রিকার আন্তরিক শুভানুধ্যানে একদিনের জন্যও তিনি বিরত হইতে পারেন নাই।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিসেস রসুলের স্বত্বাধিকারিত্বে একটী মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, "মুসলমান" সেইখানেই মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। মৌলভী মুজীবর রহমান এই সময়ে সর্ব্বতোভাবে পত্রিকার সেবায় আত্মদান করেন ও প্রেসের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করেন। তৃতীয় বৎসরে "মুসলমানের" গ্রাহকসংখ্যা ১০০০ হয়। ইহা পরে আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৭০০ তে উন্নীত হয়। পরে পত্রিকার কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি করা মাত্র এই সংখ্যা আবার পড়িয়া ১২০০ হয়।

মহাযুদ্ধের সময়ে তুর্কীর যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখায় "মুসলমানের" সম্পাদক বারম্বার গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সতর্কতা-পত্র পাইয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সেন্সরের আদেশক্রমে পত্রিকাপ্রকাশের পূর্ব্বে প্রাপ্ত দেখাইয়া লইবার কথা উঠিলে, তিনি ইহার পরিবর্ত্তে বরং কাগজ বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ করেন। পাঁচ সপ্তাহ পরে, সেন্সর উঠিয়া গেলে পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হয়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে মৌলভী মুজীবর রহমান ধৃত ও এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই সময়ে মৌলভী রফিকর রহমানের তরুণ স্কন্ধে পত্রিকা চালনার সমুদায় ভার পড়ে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মৌলভী মুজীবর কারামুক্ত হইয়া পুনরায় সম্পাদন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তখন পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা ১৯০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ টাকা মূলধনে একটী পাব্লিশিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত এবং পত্রিকা ও প্রেস উহাদের সম্পত্তিভুক্ত করা হয়। "মুসলমান" এই সময় হইতে সপ্তাহে তিন দিন বাহির হইতে থাকে। সম্প্রতি 'মুসলমান' চির-বাঞ্ছিত জাতীয় দৈনিকে পরিণত হইয়াছে।

---

*অতিশয় দুঃখের বিষয়, "মুসলমান"-সম্পাদক আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুজীবর রহমানের নিকট হইতে তাঁহার অভিমত ও মুসলমান কাগজের বিবৃতি পাইবার পর মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র এই জাতীয় দৈনিক বন্ধ হইয়া গেল, ইহা বাঙ্গালী জাতির, বিশেষভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যের কথা।

* *
*

"যে কোন প্রকারে হউক, কংগ্রেসকে সজীব রাখিতে হইবে"

দমননীতির ফলে দেশে আজ সকল কাজই বন্ধ রহিয়াছে; দেশের যুবকগণের সম্মুখে আজ কোন একটা আশাপ্রদ আদর্শ স্থাপন করাও সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রচণ্ড দমননীতি, বেকার সমস্যায় ও পৃথিবীব্যাপী অর্থনীতিক সঙ্কট আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের জীবনে সংঘাতের পর সংঘাত সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা জাতির জীবন-সমস্যাকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত
প্রেসিডেণ্ট, ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েসন

যাহারা Constitutional agitation ও reasoned persuation দ্বারা ভারতের স্বরাজ লাভ করিবেন মনে করিতেছিলেন তাঁহারা "White Paper" ও "Joint Parliamentary Select Committee"র আলোচনার পর বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান হইয়াছেন। বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে।
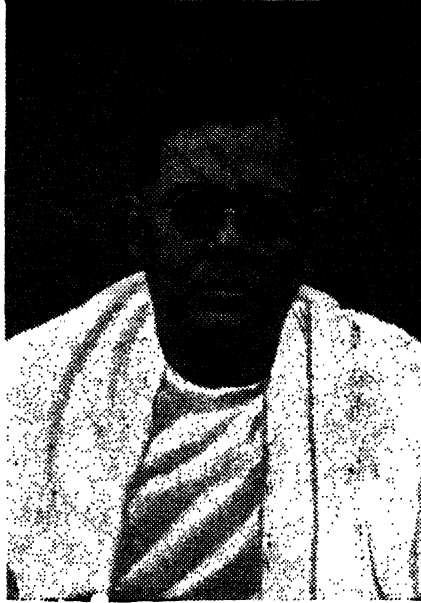
এই গুরুতর সঙ্কটকালে যে কোন রকমেই হোক কংগ্রেসকে সজীব রাখিয়া কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট প্রথাটী অনুসরণ করিতে হইবে। ত্যাগ, সেবা এবং সৎসাহস মাত্র সম্বল করিয়া জাতীয় জীবন-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই একমাত্র পথ। নিদারুণ দুঃখ, অসীম অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও কষ্টভোগের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া সমগ্র দেশবাসীর নিকট কংগ্রেস তাহার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অন্য কোন দল গঠন করিয়া স্বাধীনতাসংগ্রাম চালাইবার কোনরূপ চেষ্টা একেবারে যে সমীচিন নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

শাসন-সংস্কার এখনও বহুদূরে, এখন Swaraj Party ও Council Entryর কথা কোন মতেই উঠিতে পারে না এবং তাহা লইয়া যাঁহারা এখন মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহারা দেশের প্রকৃতি পরিচয় রাখেন না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত

ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন

ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি বা "ইণ্ডিয়ান জার্ণ্যালিষ্ট এসোসিয়েশনের" প্রতিষ্ঠা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনার্থে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে:—

(১) সাংবাদিক বৃত্তি এবং এই সাংবাদিক সমিতির সভ্যবৃন্দের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সমুন্নতি বিধান, এবং তজ্জন্য (ক) সাংবাদিক বৃত্তিগত কর্ত্তব্য সাধনে বাধাস্বরূপ কোনও রাজবিধি প্রণীত হইল কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখা, স্বাধীনভাবে লোক-মত প্রকাশ করার জন্য তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সংক্রান্ত আইনের সংশোধন প্রয়াস। (খ) সভ্য ও অন্যান্য বৃত্তিগ্রহণাভিলাষীগণের সহিত নিয়োজকমণ্ডলীর সংযোগ রক্ষা করা (গ) বার্দ্ধক্য, ব্যাধি, মৃত্যু, কর্ম্মচ্যুতি ও দুর্দ্দৈবজনিত দুরবস্থার প্রতিকারে সহায়তা ও তদ্বিষয়ে উৎসাহ দান করা (ঘ) পরস্পর সাহায্যকারী অর্থভাণ্ডার প্রবৃদ্ধ করা (ঙ) সাংবাদিক বৃত্তির সকল শাখার উন্নতিবিধান ও সাংবাদিকদের সুনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি নির্দ্ধারণ করা (চ) ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলে অনুরূপ সমিতি ও শাখামণ্ডলী অন্তর্ভুক্ত করা (২) অধ্যাপনা, পত্রবিনিময় ও অন্যান্য উপায়ে সাংবাদিক কার্য্যে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা (৩) সাংবাদিক বৃত্তিধারিগণের ব্যবহার ও উপকারার্থে সংবাদাদি সংগ্রহ, সমাহার ও প্রকাশ করা (৪) সমিতির সভ্যবৃন্দের ব্যবহারার্থে লাইব্রেরী স্থাপন ও পরিচালনা

(৫) দেশের মঙ্গলার্থে সাংবাদিকগণের মধ্যে সংযুক্ত কার্য্যে উৎসাহ দান করা।

সমিতি এই কয়েক বৎসর ধরিয়া উক্ত উদ্দেশ্যানুযায়ী সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের ঘোরতর অন্তরায় প্রেস অর্ডিন্যান্সের কবল হইতে আত্মরক্ষা কল্পে তীব্রভাবে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতে জামিন গ্রহণের অনুচিত নীতির তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছে, প্রেস সেন্সরসিপ প্রথার ফলে যে অধিকার-সঙ্কোচ তাহা হইতে পরিত্রাণের প্রয়াস করিয়াছে, প্রেস-টেলিগ্রামের ব্যয়-বৃদ্ধির প্রতিকার করিতে চাহিয়াছে। এসকল যে একেবারেই নিরর্থক হইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র এখনও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ইহা বলা যায় না। মোটের উপর, এক একটী সংবাদ-পত্রের পক্ষে স্বার্থ সংরক্ষণের যে প্রয়াসে বিন্দুমাত্র সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিল না, তাহা এই মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠার ফলে সমধিক সুসাধ্য হইয়াছে। ইহার পরিতুষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধির উপরে ভারতীয় লোক-মতে অনেকটা সুদৃঢ়তা-লাভ ও স্বাধিকার অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

* * *

"সংবাদসংগ্রহ প্রতিষ্ঠান লোক-শিক্ষার একটি বড় সহায়"

অন্যান্য দেশের তুলনায়, যে দেশের সংবাদপত্র ও সংবাদ-পত্র পাঠকের সংখ্যা আজও নগণ্য রহিয়া গিয়াছে, সংবাদসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সে দেশের লোকের ধারণাও যে নিতান্ত অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার মত কিছুই নাই। আমার বিগতকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা বলিতে পারি যে, যদিও লোকশিক্ষার এই প্রধান উপায়টীর প্রতি আমার দেশবাসীর দৃষ্টি এখনও আশানুরূপ ভাবে নিপতিত হয় নাই, তথাপি আমার ভরসা আছে, অদূর ভবিষ্যতে আশাতীত রূপে দেশবাসী এই প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবেন।

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত

সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করার সার্থকতা কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার। পুরাতনকে বিস্মৃত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে নূতনের সন্ধান পাওয়ার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বাল্যকালে গল্প শুনিবার দুর্নিবার ইচ্ছা তাহার পরিচয়। বাল্যকালের এই ইচ্ছাই পরবর্ত্তী জীবনে মানুষের নিত্য-নূতন কাহিনী শ্রবণের প্রবৃত্তি জাগ্রত করে। প্রকৃত পক্ষে, বাল্যকালের গল্প শুনিবার ইচ্ছাটাই অন্য আকারে বয়স্ক লোকের মধ্যে থাকিয়া যায়। কল্পনা বা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত কাহিনীর পরিবর্ত্তে সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত কাহিনীর জন্য বয়স্কলোকের শিক্ষিত মন উন্মুখ হইয়া উঠে। সংবাদের মূল্য তাই এত বেশী এবং সংবাদ-পত্র পড়িবার আগ্রহও সভ্যসমাজে তাই এত বিপুল। সভ্য-সমাজের এই প্রতিদিনকার ক্ষুধা যাহারা নিবৃত্ত করে তাহাদের কর্ত্তব্যও তাই এত দুরূহ।

সংবাদ-সরবরাহ-কারী প্রতিষ্ঠানই প্রকৃতপ্রস্তাবে সংবাদপত্রের 'ভরণ পোষণ' করিয়া থাকে। কোনও বিশেষ সংবাদপত্রের পক্ষে এই বিশাল পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করা সম্ভব নহে। সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের তাই প্রয়োজন। এইরূপ প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নূতন হইলেও, পাশ্চাত্যদেশে অনেকদিন হইতেই ইহার কাজ চলিয়া আসিতেছে। ইহার আবশ্যকতা কত বেশী, তাহা পাশ্চাত্যদেশ বিশেষভাবে বুঝে বলিয়াই অনেক সংবাদ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরাট্ অর্থব্যয়ের

কতক অংশ সেই সেই দেশের রাজভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেশের জনসাধারণ যাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে, দেশের রাজভাণ্ডার যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা করে, কর্ত্তব্য-সম্পাদন তার পক্ষে কষ্ট-সাধ্য নহে। তাই দেখিতে পাই, রয়টার, সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি, ব্রিটিশ ইউনাইটেড্ প্রেস, উলফ্স্ বুরো, আমেরিকান ইউনাইটেড্ প্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সগৌরবে আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া সভ্যদেশে সংবাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেছে।

কিন্তু যে দেশের লোকের ধারণা অস্পষ্ট, আর্থিক শক্তি সীমাবদ্ধ এবং রাষ্ট্র পরহস্তগত, সে দেশে সংবাদ-সরবরাহ-কারী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি একেবারে কল্পনাতীত বলিয়াই মনে হয়। প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যখন সম্পূর্ণ নূতনরূপ পরিগ্রহ করিতে উদ্যত হইল, তখন ভারতীয় সংবাদিকগণ সংবাদ-সরবরাহ-কারী একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত অর্থ ও সহানুভূতি পাওয়া যায় নাই।

আমার স্মরণ হইতেছে, নয় বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উৎসাহে ও সদানন্দের প্রেরণায় 'সার্ভেণ্ট' কার্য্যালয়ের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একখানি টেবিল আর একখানি চেয়ার মাত্র সম্বল করিয়া যে দিন "ফ্রী প্রেসের" কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেদিন সহস্র প্রকার নৈরাশ্যের মধ্যে শুধু এই চিন্তাই আমাকে ভরসা এবং সান্ত্বনা দিয়াছিল যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের "Youngmen's Christian Association"ও একদিন স্কট্‌ল্যাণ্ডের একটি অখ্যাত গোগৃহেই জন্মলাভ করিয়াছিল। আমার সে স্বপ্ন বিফল হয় নাই।

'রয়টার' এবং 'এসোসিয়েটেড্ প্রেস' নামক দুইটি সংবাদ-সরবরাহ-কারী প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান থাকিতেও ফ্রী প্রেসের কি প্রয়োজন ছিল, তাহা বোধহয় আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। সংবাদ-পত্র কিম্বা সংবাদ-সরবরাহ-কারী প্রতিষ্ঠান—উভয়ই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী, ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগও তাহাদের অনন্ত। যে সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার রীতি এমন লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যাহাদের স্বার্থের সঙ্গে দেশবাসীর স্বার্থের যোগাযোগ নাই, সে সব প্রতিষ্ঠানের প্রচারিত সংবাদে দেশের লোক পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। "ফ্রী প্রেস" জাতির সত্যিকার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা দেশবাসীকে শুনাইয়াছে—নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়াও আত্মবিস্মৃত হয় নাই। "ফ্রী প্রেস" তাই দেশের এত সহানুভূতি ও এত শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু "ফ্রী প্রেসের" ন্যায় আরও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। তাই "ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া"র প্রতিষ্ঠা। ইউনাইটেড প্রেস এখনও শিশু। কিন্তু আমার ভরসা আছে যে, দেশবাসীর সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত এই নব উদ্যমকে অচিরেই গৌরব-মণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত
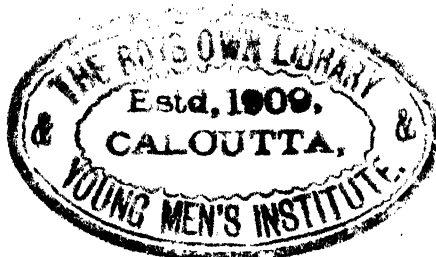
প্যাক্টের পথে

শ্রীঅনাথ নাথ রায়

১৯০৭-১৯১০ খৃষ্টাব্দের জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের পুরস্কার ও মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কারে—'Concession of communal representation' (সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে স্বতন্ত্র অধিকার) লাভে স্থির ছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বল্কান যুদ্ধে রুশের বাদশার দুর্দ্দৈবে ভারত-মুসলমানের চিত্ত প্রথম অস্থির হয়। মুসলমান-ভারত আশা করিয়াছিল, ইংরাজ সরকার তুরস্কের সাহায্যে আগুয়ান হইবেন। দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গ যুক্ত হওয়ায় মুসলমানদের রাজভক্তি কথঞ্চিৎ শিথিল হয়। ইহার পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক সুলতানের সাহায্যার্থে ভারতের প্যান-ইসলামবাদী মুসলমানগণ আঞ্জুমান-ই-খুদামি-কাবা নামক সঙ্ঘ গঠন করিয়া বল্কানে Medical Mission প্রেরণ করে ও প্রচার করে "That the first duty of Muslims is allegiance to the Khalif." মুসলমান রাজভক্তির স্রোতে এই ভাবে ভাঁটা পড়িবার উপক্রম হইলে, কানপুরের দাঙ্গা সে ভাঁটার স্রোতের গতি কথঞ্চিৎ রুদ্ধ করে। তুরস্কের আড্রিয়ানোপল উদ্ধার, বল্কানে শান্তি-প্রতিষ্ঠা, এবং কানপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাবে পুনরায় রাজভক্তির স্রোতে উজান বহে।
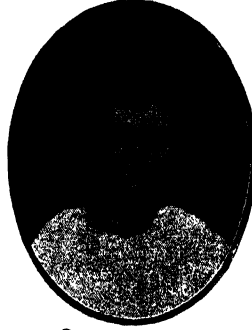
শ্রীঅনাথ নাথ রায়

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে প্যান-ইসলামবাদী মুসলমানেরা তুরস্কের পরাজয়-সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া উঠে। মরক্কো ও পারস্যে মুসলমান-সাম্রাজ্যের অবস্থাও মুসলমান-ভারতের মনে প্যান-ইসলামের দুর্দ্দিনের সূচনাই আতঙ্ক সৃষ্টি করে। প্যান-ইসলামবাদী মুসলমানগণ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এক ধর্ম্মনেতার অধীনে, অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকার আশ্রয়ে যে বিরাট মুসলমান-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা খালিফের অন্তর্দ্ধানে ধূলিসাৎ হইয়া যায়—কাজেই তাহাদের দৃষ্টি সুদূর রুমের বাদশার ধর্ম্ম-সিংহাসন হইতে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে ফিরিয়া আসে। ফলে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের মুসলমান রাজনীতিবিদ্‌গণ কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় নেতাদের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সেই ব্যাকুলতার ফলে ঐ বৎসর ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগের যুক্ত অধিবেশন হয়। বাংলা সম্বন্ধে নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে হিন্দু মুসলমান সংখ্যা-নির্দ্দেশে একমত হইতে না পারায় যুক্ত কমিটীর অধিবেশন স্থগিত থাকে এবং ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পূর্ব্বদিন লক্ষ্ণৌ নগরীতে পুনরায় সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কংগ্রেস-লীগ কমিটীর যুক্ত অধিবেশন হইয়া হিন্দু মুসলমানের যে রফা-নামা প্রস্তুত হয় তাহাই 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট'।

লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট

(1) The members of Councils should be elected directly by the people on as broad a franchise as possible.

(2) Adequate provision should be made for the representation of important *minorities by election.* (3) The *Mahammedans* should be represented through *special electorates* on the Provincial Legislative Councils in the following proportions :—

Punjab—One half of the elected Indian members.

U. P.— 30%	,,	,,
Bengal—40%	,,	,,
Behar—25%	,,	,,
C P.—15%	,,	,,
Madras—15%	,,	,,
Bombay—One third	,,	,,

4. Provided that no Mahommedan shall participate in any of the other elections to the Imperial or Provincial Legislative Councils save and except those electorates representing special interests. স্বাধীনতা-সংগ্রামে মিলনের আশায় সাম্প্রদায়িকতাবাদীর অন্যায় দাবী স্বীকারে রফা ও আপোষের মধ্য দিয়া যে চুক্তি তাহাই প্যাক্ট। লক্ষ্ণৌএ এই চুক্তির ফলে কংগ্রেস ও লীগ স্বরাজের যুগ্ম দাবী উপস্থিত করেন। এই যুক্ত দাবী ভিত্তি করিয়াই মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্ম প্রকাশিত হয়। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্ম প্রকাশিত হইবার পর প্যাক্ট কত দিন এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা সত্য যে, শাসনসংস্কারের প্রাক্কালে যে প্যাক্টকে আমরা প্রথম ভূমিষ্ঠ হইতে দেখি তাহা পুনরায় আসন্ন শাসনসংস্কারের দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিলের অধিবেশনে জন্ম গ্রহণ করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করে।

১৯২১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী রাজকীয় ঘোষণায় প্রকাশ হয়—"For years, it may be for generations, patriotic and loyal Indians have dreamed of Swaraj for their motherland. To-day you hear the beginning of Swaraj within my Empire, and widest scope, and ample opportunity for progress to the liberty which my other dominions enjoy." ১৯২১ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত ভারতের শাসনতন্ত্র মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার অনুযায়ী চলিয়া আসিতেছে। ইহার পর ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কারের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রথম রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। উক্ত কনফারেন্সে Minority Sub-Committee'র যে অধিবেশন হয়—মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড উহার সভাপতিত্ব করেন। Minority Sub-Committee'র অধিবেশনে ইহাই ধার্য্য হয়—"That the Conference should register an opinion that it was desirable that an agreement upon the claims made to it should be reached and that the negotiations should be continued between the representations concerned, with a request that the result of their efforts should be reported to those engaged in the next stage of these negotiations. ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় রাউণ্ডটেবিলের যে অধিবেশন হয় তাহাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু ও মদনমোহন মালব্য যোগদান করিয়াছিলেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে Minority Sub-Commitee'র অধিবেশন ৭ দিনের জন্য স্থগিত থাকে। সাত দিন গত হইলে মহাত্মাজী সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসায় তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া বলেন—"I am opposed to the special representation of the untouchables. I am convinced that it can do them no good, and may do much harm." ইহার পর মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের অনুরোধে উক্ত কমিটীর অধিবেশন স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়েরা একত্র হইয়া পর পর এক চুক্তিনামা সহি করেন; ইহাই Minority Pact। স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল ইহার উদ্যোক্তা এবং বর্ত্তমানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া খ্যাত ডাঃ আম্বেদকর ইহার প্রধান হোতা। মুসলমানদের মাননীয় মিঃ আগা খাঁ, অনুন্নতদের ডাঃ আম্বেদকর, ভারতীয় খৃষ্টানদের রায় বাহাদুর পান্নীর সেলভাম্‌, এঙলো ইণ্ডিয়ানদের স্যার হেন্‌রী সিড্‌নী এবং ইউরোপীয়ানদের স্যার হিউবার্ট কার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে ইহাতে স্বাক্ষর করেন। মাননীয় মিঃ আগা খাঁ উক্ত প্যাক্ট Minority Sub-committeeর সমক্ষে উপস্থিত করেন।

মাইনরিটী প্যাক্ট

মুসলমানদিগের বিশিষ্ট দাবী :—

১। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গভর্ণরের অধীনে গঠন করা এবং উহাতে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা শতকরা ১০ জনের অধিক হইবে না।

২। সিন্ধু প্রদেশ বোম্বাই হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গভর্ণরের শাসনাধীনে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা।

৩। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে মুসলমানদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ নির্দ্দিষ্ট করা এবং প্রাদেশিক শাসন-পরিষদে সংখ্যানুপাতে নিম্নলিখিতরূপে হইবে :—

প্রদেশ	মোট সদস্য সংখ্যা	মুঃ	অনুঃ	হিঃ	ইউঃ	এংলোঃ	খৃঃ
১। আসাম	১০০	৩৫	১৩	৩৮	১০	১	৩
২। বাঙ্গালা দেশ	২০০	১০২	৩৫	৩৮	২০	৩	.২
৩। বিহার ও উড়িষ্যা	১০০	২৫	১৪	৫১	৫	১	১
৪। বোম্বে	২০০	৬৬	২৮	৮৮	১৩	৩	২
৫। মধ্যপ্রদেশ	১০০	১৫	২০	৫৮	২	২	১
৬। মাদ্রাজ	২০০	৩০	৪০	১০২	৮	৪	১৪
৭। পাঞ্জাব	১০০	৫১	১০	১৪	২	১	১
						শিখ	২০
৮। সংযুক্ত প্রদেশ	১০০	৩০	২০	৪৪	৩	২	১

সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল এই—"Weightage similar to that enjoyed by the Mussulmans in the provinces in which they constitute a minority of the population shall be given to the Hindu minority in Sindh and to the Hindu minority in the N. W. F. Province." ইহা ভিন্ন প্যাক্ট এংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য স্বতন্ত্র অধিকার এবং ইউরোপীয় সমাজের জন্য বর্ত্তমানে তাহার যে অধিকার ভাগ করিয়া থাকে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার দাবী করেন।

মাইনরিটী প্যাক্ট প্রধান মন্ত্রীর সমক্ষে উপস্থিত করা হইলে মহাত্মা গান্ধী বলেন—"I would express my dissent from the view that you put before this Committee that the inability to solve the communal question was hampering the progress of constitution-building .... I can understand the claims advanced by other minorities *but the claim advanced on behalf of the untouchables, that to me is the "unkindest cut of all.* It means the perpetual barsinister."

তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের পৃথক্ দাবী সম্বন্ধে মহাত্মাজীর যে অভিমত আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি উহাই শেষ নহে; মহাত্মাজী পুনরায় বলিতেছেন—"I would not *sell the vital interest of the untouchables* even for the sake of winning the freedom of India. Let the Committee and let the whole world know that to-day there is a body of Hindu reformers *who are pledged to remove this blot of untouchability*...... ...I will not bargain away their rights for the kingdom of the whole world. We do not want on our register and on our census untouchables classified as a separate class.... .It will create a division in Hinduism which I cannot possibly look forward to with any satisfaction whatsoever... Those who speak of the political right of the untouchables do not know their India, do not know how Hindu society is to-day constructed, and therefore I want to say with all the emphasis that I can command, that if I *was the only person to resist this thing, I would resist it with my life.*"

উক্ত মাইনরিটী প্যাক্ট সম্বন্ধে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং বলেন—"An agreement of a so-called 46% of the population of the minorities is a sort of camouflage ..···It seeks to encourage those who have been most unreasonable. It seeks to encourage the communities, who have in fact stood out against India's advance to stick to their demands and it will in that way make a solution of this problem impossible."

শ্রমিক নেতা যোশী, বাংলার প্রভাসচন্দ্র, পাঞ্জাবের রাজা নরেন্দ্রনাথ, ভারতীয় খৃষ্টানদের প্রতিনিধি ডাঃ এস্, কে, দত্ত, হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে, মহিলা সদস্য শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও মিসেস্ সুব্বারায়ণ—ইঁহারা সকলেই মাইনরিটী প্যাক্টের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অভিমত জ্ঞাপন করেন।

প্রধান মন্ত্রী বলেন—"That the agreement in question was not regarded as ***acceptable*** by the Hindu or Sikh representations and that there seemed no prospect of a solution of the communal question as the result of negotiations between the parties concerned."

মাইনরিটী প্যাক্ট সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে বাংলায় উক্ত প্যাক্ট অনুযায়ী হিন্দুরা লোকসংখ্যানুপাতে শতকরা ১৮·৩ প্রতিনিধির অধিকার পান, অনুন্নতগণ ২৪·৭

মুসলমান ৫৪'৯ প্রতিনিধিত্বের অধিকার পান—রাউণ্ড টেবিলের দ্বিতীয় পর্ব্ব প্যাক্টের মূষল প্রসব করে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিলের সভ্যদের যে বিদায়াভিনন্দন দেন তাহাতে বলেন—"If the different communities of India failed to arrive at an agreement amongst themselves, the mere fact of such a failure would not be allowed to stand in the way of their political advancement and His Majesty's Government would try themselves to arrive at a settlement satisfactory to the parties concerned."

ইহার পর মার্চ্চ মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট জানান, যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করিতে অক্ষম হওয়ায় শাসনসংস্কারের ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটিতেছে; সুতরাং প্রধান মন্ত্রীকেই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা

ভারতের ইতিহাসে প্রধান মন্ত্রীর বাটোয়ারা অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু-ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করে। প্রধান মন্ত্রী ইহাই বলেন—"Our main objects in the case of the depressed classes have been while securing to them spokesmen of their own choice in the legislatures of the provinces, where they are found in large numbers, at the same time to avoid electoral arrangement which would perpetuate their segregation; consequently depressed class voters will vote in general Hindu constituencies and an elected member in such a constituency will be influenced by his responsibility to this section of electorate, but for the next 20 years seats will be filled from special depressed classes electorates in areas where these voters chiefly prevail".

বাঙ্গলা ব্যবস্থাপরিষদ্ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী ব্যবস্থা করিয়াছেন—

Premier's Award Bengal Council—Total 250

General seats—80 (including - women)

Depressed classes—Pending further investigation no number has been fixed for members to be returned from special Depressed class constituencies in that province. It is intended that Depressed classes should obtain not less than 10 seats.

Mahommedans—119 (including 2 women)
Indian Christians—2 (including 1 woman)
Anglo-Indians—4 (including 1 woman)
Europeans—11
Commerce—19 (14 European, Indian 5)
Landholders—5
University—2
Labour—8

(1). Seperate electorates to Mahommedan, Sikh, Indian Christian, Anglo-Indian and European constituencies.

(2) The members of the Depressed class will vote in the general constituencies but certain special constituencies will also be created for them which would last for 20 years if not abolished previously by the consent of the community.

(3). Women will be elected by special constituencies by votes on communal basis.

Labour seats will be filled up from non-communal constituencies.

ফলে, মুসলমান সম্প্রদায় যে স্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ, তথায় তাহার বর্ত্তমান weightage পাইবে।

পাঞ্জাবে হিন্দু শত-করা ২৩¾, শিখ—১৮'৮, মুসলমান—৪৮'৪ ও জমিদার ৩—ইহাতে মুসলমানের মোট সংখ্যা শত-করা ৫১ হইল। বাঙ্গালায় মুসলমান শত-করা ৪৮'৪ ও হিন্দু ৩৯'২ এবং ইউরাপীয়ান ১০ প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল।

২৫ শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ উক্ত Award সম্বন্ধে বলেন—"My advise to my countrymen is that they should ignore this award......"

১৮ই আগষ্ট মহাত্মা গান্ধী প্রধান মন্ত্রীকে পত্র লেখেন,

যে তিনি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা প্রাণ দিয়া বাধা দিবেন। কোনও মীমাংসা না হওয়ায় মহাত্মাজী উপবাসে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেন। নিখিল ভারত মহাত্মাকে হারাইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শান্তিনিকেতন কবি-নীড় ত্যাগ করিয়া যারবেদার বন্দী-নিবাসে যাত্রা করিলেন। জনৈক ঠক্কর, মিঃ ঘনশ্যামদাস বিরলা বাঙ্গালার প্রতিনিধি সাজিয়া মহাত্মা-সকাশে সমুপস্থিত হইলেন। এই উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া মহাত্মার জীবন-রক্ষার জন্য যে রাজনৈতিক Testament রচিত হইল তাহাই পুণা-প্যাক্ট। লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট ভারতের হিন্দু মুসলমানে বিভেদ ঘটাইয়াছে, মাইনরিটী প্যাক্ট ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, আর পুণা প্যাক্ট হিন্দু-ভারতকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া হিন্দুর সংহতিশক্তি চূর্ণ করিয়াছে।

পুণা প্যাক্ট

২৪শে সেপ্টেম্বর Pact স্বাক্ষরিত হয়। পরদিন প্রধান মন্ত্রী Pact স্বীকার করেন এবং ২৬শে তারিখে মাননীয় মিঃ হেগ্ ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদের সিমলা অধিবেশনে ঘোষণা করেন—যে হেতু অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, অতএব প্রধানমন্ত্রীর পূর্ব্বঘোষণানুযায়ী গভর্ণমেণ্ট প্যাক্ট গ্রহণ করিলেন।

Poona Pact

(Poona 24th September)

1. In Central Legislature 18 per cent of seats of general electorate in British India will be reserved for them.

2. Seats in the Provincial Legislature shall be distributed as follows

Madras—	30
Bombay with Sindh—	15
Punjab—	8
Behar & Orrisa—	18
C. P.—	20
Assam—	7
Bengal—	30
U. P.—	20
Total	148

3. Election to all these reserve seats shall be joint electorate, subject to the following procedure :--

All the members of the "Depressed classes" registered in the General Electoral Roll will form electoral College which will elect panel of 4 candidates for each reserved seat by method of a single vote. Four persons getting the highest number of such votes in the primary election shall be candidates for election by general electorate. Reservation of seats shall continue until determined by mutual agreements between the communities concerned in settlements. The system of special method of primary election shall automatically cease on the expiry of 10 years, if not earlier, along with the system of reservation.

4. In every province out of educational grants an adequate sum shall be earmarked for providing educational facilities for them.

প্যাক্টের ত্রিধারা

ভারতে জাতীয় আন্দোলন প্যাক্টের ত্রিধারায় পূত হইয়া হিন্দু ভারতকে কি ভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিকদের প্রণিধানযোগ্য। উদার হিন্দু জাতি ত্যাগের গরিমায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে—লক্ষ্ণৌ-এ রাজ্য, ইংলণ্ডে রাজমহিষী ও পুণায় রোহিতাশ্বের অপমৃত্যু হিন্দুসমাজকে ত্যাগে মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ করিয়াছে—অদৃষ্টবাদী হিন্দু আশায় বসিয়া আছে, সে তার অতীতের সমস্ত গৌরব ও স্বার্থ প্যাক্টের দানে ফিরিয়া পাইবেই।

বাংলায় এই প্যাক্টের আগমনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ভবিষ্যৎ শঙ্কাজনক। Joint Parliamentary Committeeতে সম্মিলিতবাংলার প্রতিনিধিরা এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা

বাঙালী মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ একদিন পুণা প্যাক্টের জয়গানে মুখর হইয়াছিলেন, আজ তিনিও ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন—"At that moment a situation had been created which was extremely painful not affording in the least time or peace of mind to enable to think quietly about the possible consequences of the Poona Pact, which had been affected before my arrival when Sapru and Jayakar had already left, *with the help of members among whom there was not a single responsible representative from Bengal*"

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা প্রদান কালে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা ছিল : "His Majestey's Govt. wish it to be distinctly understood that they themselves......... ..will not be prepared to give consideration to any representation aimed at securing modification *of it which is not supported by all parties affected.*"

পুণা চুক্তির অপকারিতা এতদিন বাঙ্গালার হিন্দু বুঝিতে চাহে নাই, কারণ মহাত্মার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতাগণকে মহাত্মা সমর্থিত পুণা চুক্তির সমালোচনা নিরস্ত করিয়াছিল। পুণার ৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মাজী মডার্ণ রিভিউ পত্রের সমালোচনার উত্তরে বলিয়াছেন..."সেপ্টেম্বর মাসের উপবাসে কোনরূপ অবিচারমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশ যদি তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা বিশেষ ক্ষেত্র রূপে গণ্য করিতে হইবে। কোন ক্ষেত্রেই জোর জবরদস্তির কোন ধারণা ছিল না।"

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন "......I have not the least doubt now that such an injustice will continue to cause mischief to all parties concerned keeping alive the spirit of communal conflict in our province in an intense form, making peaceful government perpetually difficult."

গত বৎসর ১৪ই ডিসেম্বর বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে ২৫ জন হিন্দু সদস্য Joint Parliamentary Committeeর সদস্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে তার-যোগে জানান—"Poona Depressed Classes Pact made without consulting Bengal Hindus—...It introduces revolutionary changes cutting at the roots of normal progress of Hindu society in Bengal." ইহার পর ভারতের রাষ্ট্রপরিষদ্ ও ব্যবস্থাপরিষদের সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দু সদস্য প্রধান মন্ত্রীকে জানাইতেছেন "Poona Pact is allowing 30 seats to depressed classes in Bengal, number being equal to seats allowed to Madras cannot be justified."

অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন না থাকিলেও, বর্ত্তমান বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায় মেদিনীপুর হইতে মেথর-সমাজের শ্রীযুক্ত হোসেনী রাউথ, নমঃশূদ্র সমাজের শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বল, শ্রীযুক্ত ললিত বল, শ্রীযুক্ত অমূল্য ধন রায়, রাজবংশী জাতির রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়, কোচজাতি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকর রায়বাট—অনুন্নত সম্প্রদায়ের এই সপ্ত প্রতিনিধি বাংলার বর্ণ-হিন্দুকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের যে প্রস্তাব প্রধান মন্ত্রীর বাটোয়ারায় হইয়াছিল এবং পুণা-চুক্তিতে যাহার সংখ্যা বাঙ্গালায় ৩০টী ধার্য্য হইয়াছে, ভবিষ্য-বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় এই চুক্তি অনুযায়ী নির্ব্বাচন হইলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীর আগমনে জাতীয় আন্দোলন এবং ভবিষ্য বাংলার স্বরাজলাভ যে সুদূর পরাহত তাহা অস্বীকার করা চলে না।

যুক্ত পার্লামেণ্টারী কমিটীর সদস্য মার্কুইস অব জেট্‌ল্যাণ্ড পুণা-চুক্তি-সমন্বিত প্রধান মন্ত্রীর বাটোয়ারা বাঙ্গালার হিন্দুর প্রতি যে অবিচার করা হইতেছে, তাহা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। অতীত বঙ্গভঙ্গের ন্যায় চতুর সম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই চুক্তি বাটোয়ারাকে settled fact করিবার বিফল চেষ্টা করিয়াছিল—অথচ পার্লামেণ্টারী কমিটীর হিন্দু সদস্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের প্রচারের ফলে যুক্ত পার্ল্যামেণ্টরী কমিটী স্বীকার করিয়াছেন যে, এই চুক্তি পুনর্বিবেচিত হইবে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১২ জন মনোনীত সদস্য লইয়া বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই সভা সম্প্রসারিত হয় এবং এক প্রকার indirect system of election লাভ করে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সভ্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া ৫০ হয় এবং তাহার মধ্যে ২৮জন নির্ব্বাচিত হন—১৯১২ খৃষ্টাব্দে মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কারে কাউন্সিলের সভ্য-সংখ্যা ১৩০ নির্দ্দিষ্ট হয় এবং নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়—পুনরায় মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসনসংস্কার অনুসারে সদস্য-সংখ্যা ১৪৪ নির্দ্ধারিত হয়, ইহার মধ্যে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় ৩০ জন। আসন্ন শাসনসংস্কারের বিশিষ্টতা এই যে, এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে মনোনয়ন চলিতেছিল ব্যবস্থাপরিষদ্গঠনে সেই মনোনয়ন-প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমস্ত সদস্যকেই নির্ব্বাচিত হইতে হইবে—জনমতের সমর্থন না লাভ করিলে তাহাদের প্রতিনিধি হওয়া যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আসন্ন শাসনসংস্কারে নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলেও, যে দুই নূতন মত গৃহীত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালায় শান্তিপ্রতিষ্ঠার অন্তরায় হইবে। প্রথম, মুসলমানদের অত্যধিক আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া—"perpetual Moslem majority unalterable by any appeal to the electorate"—সাইমন কমিশনের মূলনীতি পরিত্যাগ করা হইয়াছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য weightage-এর ব্যবস্থা এক বাঙ্গালাতেই হইয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ বাঙ্গালার হিন্দু তাহাদের সংরক্ষিত আসনের অধিক তো পায় নাই, উপরন্তু তাহাদিগকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সংহতিশক্তির হ্রাস করা হইয়াছে। হিন্দু বাঙ্গালা স্বকীয় ন্যায্য অধিকার পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করিয়া, চুক্তির পর চুক্তিতে রাজী হইয়া যে মহামিলনের আশায় বসিয়াছিল তাহা বহু দূরে। কেবল যে, এই চুক্তির ফলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ হইয়াছে তাহা নহে, হিন্দুসমাজেও বিদ্বেষ-বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে। যুক্তি ত্যাগে চুক্তি গ্রহণে জাতির যে ক্ষতি, তাহা উপলব্ধি করিবার দিন আসিয়াছে। আজ কোথায় বাঙ্গালার সেই অগ্নিময় দুর্জ্জয় প্রাণ, যাহা এই সন্ধিক্ষণে, এই জাতীয় দুর্দ্দিনে সিংহ-বিক্রমে লাঞ্ছিত, অবমানিত, ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুর সংহতি রক্ষা করিবেন ?

* * *

আশ্রম সংবাদ

স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাপ্রয়াণ

পূজার আগমনী না বাজিতেই, মায়ের সন্তান, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অন্যতম-সাধক ও চিরতপস্বী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মাই বুঝি ডাকিয়া লইলেন। নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী—গত ৩রা আশ্বিন পুণ্য মহালয়া তিথিতে, বেলা ১২ ১৫ মিনিটের সময়ে যাদবপুর হাসপাতালে, জীর্ণ দেহবাস ত্যাগ করিয়া, মহাদেবীর শান্তি-ক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। কলিকাতার কেওড়াতলার শ্মশানে সহতীর্থমণ্ডলীর গভীর ব্রহ্মনাম-ধ্বনির মধ্যে তাঁহার নশ্বর জড় মূর্ত্তির সংকার করা হয় এবং পুণ্য চিতাভস্ম বিপুল শোভাযাত্রা করিয়া চন্দননগর যোগ মন্দিরে নীত হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবন-পণ ত্যাগ ও তপস্যা তাঁর অমর আত্মাকে ঘিরিয়া নবীন জাতির জীবনে চিরদিন আলো ও অমৃত সঞ্চার করিবে।

তাঁর সবিস্তার জীবন-কথা আমরা বারান্তরে "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশ করিব।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !! ওঁ হরি ওঁ !!!

স্মৃতির পাতা

শ্রীসত্যানন্দ বসু এম-এ, বি-এল
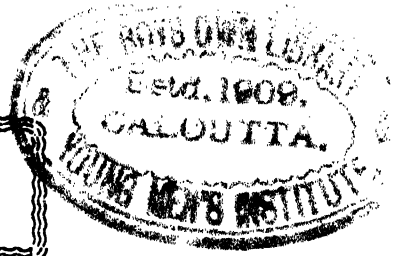
কংগ্রেস আজ মুমূর্ষু, লুপ্তপ্রায়। মহাত্মা গান্ধী নিজেই তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ইহার অস্তিত্ব এখন সূক্ষ্ম অদৃশ্যসূত্রে ঝুলিতেছে—তাহাও কোন দিন শেষ আঘাত-টুকুর স্পর্শেই না একেবারে চিরদিনের তরে ছিঁড়িয়া যায়! আমার চক্ষের উপরে এই বিরাট্ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটী যেন স্বপ্নের মত ভাসিয়া উঠিল, আবার লোপ পাইতে চলিল!

দীর্ঘ ৪৮ বৎসরের ইতিহাস—একটা বিশাল জাতির রাষ্ট্র-চেতনার উদ্বোধনের রহস্য-লীলায় পরিপূর্ণ। ইহা জাতীয় জীবন-সাধনার একান্ত বহিরঙ্গ পরিচয় হইলেও, অব্যর্থ ব্যারো-মিটারের মত এই রাষ্ট্র-মহাযন্ত্রের উঠা-নামা আমি গোড়া হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। আমি ইহার সহিত আরম্ভ থেকেই সংশ্লিষ্ট থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে আমার এই সম্বন্ধ-সূত্র বাহিরে দিক্ হইতে ছিন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু এই জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠানের মঙ্গলামঙ্গল আমার ভাবনা থেকে মুছিয়া যায় নাই। আজ কংগ্রেসের শেষ পরিণতির কথা ভাবিলে একটু যে বিরলে অশ্রুপাত না করি তাহা বলিতে পারি না।
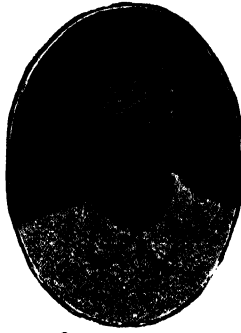
শ্রীসত্যানন্দ বসু

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন আমার বয়স ১৫ বৎসর, কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া আমি ব্রাহ্ম সমাজের ও সুরেন্দ্রনাথের নূতন movement-এ যোগদান করিতে উৎসুক হই। সেইখানেই আমি প্রথমে শুনি—সুরেন্দ্র-নাথের বক্তৃতা। এই আমার প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা শোনা। স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তরুণপ্রাণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিল—মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য। পিতার এক মাত্র সন্তান—আমায় কলিকাতায় আসিতে তাঁহারা দিলেন না।

ব্রাহ্ম সমাজের পলিটিক্যাল মিটিং-এ যোগ দেওয়ার যেমন সুযোগ ঘটিয়াছিল, তেমনি সমাজসংস্কারের প্রেরণাও কিছু কিছু মনে জাগিত না তাহা নহে। তখন লর্ড রিপণের যুগ। "ইলবার্ট বিল" লইয়া ঘোরতর আন্দোলন দেশে সুরু হইয়া গেল। এই সময়েই সুরেন বাবুর জেল হইয়াছিল। এই আন্দোলনে active part লইয়া হৈ-চৈ করিয়া বেড়াইতাম। কৈশোরের স্মৃতি এই সকল ঘিরিয়াই ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বিবাহ হইল—বড়লোকের ঘরে। আমি তখন বি-এ পাশ করিয়াছি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ দিই। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বেই কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে—বম্বেতে। সেই সময়ে সুরেন্দ্র বাবু একটী Bengal Conference আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন আমি 3rd Year'এ পড়িতেছি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরজী। টাউন-হলে এই কংগ্রেস হয়।

১৮৯০ সালে যে কংগ্রেস হয়, আমি তাহাতে ভলাণ্টীয়ার হইয়াছিলাম। ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—দেশে একটা আগুনের প্রবাহ বহিয়া গেল। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে দুইটী পার্টি দেখা দিল—৺ফিরোজ সা মেটা ও ৺তিলক ছিলেন এই দুই দলের নেতা। বাংলায় তিলকের follower ছিলেন: বিপিনবাবু, অশ্বিনীবাবু, মতিবাবু, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়। সুরেন্দ্র বাবু, ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জী, গোখ্‌লে ইহারা ফিরোজ সার দলে ছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আবার কলিকাতায় কংগ্রেসের খুব বড় অধিবেশন হয়। এবারও তাহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন—নৌরজী। "স্বরাজ"-মন্ত্রের ধ্বনি তাঁহারই মুখ থেকে প্রথমে উদ্ঘোষিত হয়। এই কংগ্রেসে আর আর যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী, বয়কট—এইগুলি স্মরণীয়। যে ভিক্ষানীতি (pray, please and protest) লইয়া কংগ্রেসের আরম্ভ, এই কংগ্রেসেই সেই নীতি একেবারে পাল্টাইয়া যাইবার সূচনা দেখা দিয়াছিল, অবশ্য মূল তত্ত্বে দুই দলে খুব ঐকান্তিক পার্থক্য ছিল না। এই কলিকাতা কংগ্রেসের সঙ্গে একটী বিরাট্ স্বদেশী প্রদর্শনীও হইয়াছিল।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেস হয়। প্রেসিডেন্ট—৺রাসবিহারী ঘোষ। জাতীয় পক্ষের সভাপতি করার ইচ্ছা ছিল—লোকমান্য তিলককে। উহা লইয়া গোলযোগ ক্রমে পাকিয়া উঠিয়াছিল। রাস বিহারী বাবু বক্তৃতা আরম্ভ করিবা মাত্র গোলমালে সভা বন্ধ হয়। এইরূপে পাকাপাকি দুইটি "পার্টির" সৃষ্টি হইয়া গেল। তার পর, Convention হইল। ১৯০৮'এ কংগ্রেসের Constitution হইল। তিলক জেলে গেলেন। তার পর থেকে কংগ্রেসে আর ৩০০।৪০০'এর বেশী ডেলিগেট হইত না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বম্বেতে কংগ্রেস হয়, তার পরবৎসর লর্ড সিংহ Self-Government'এর কথা তুলিলেন। ১৯১৬ সালে তিলক বাহির হইয়া কংগ্রেস ও Extremist দলে প্রবেশ করিলেন লক্ষ্ণৌতে। ১৯১৭ এ কলিকাতা অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন মিসেস এনী বেশান্ত এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন বৈকুণ্ঠ বাবু। এই বৎসরেই সি-আর-দাশ Provincial Autonomeyর কথা প্রথম তুলিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবুও দাশের সঙ্গে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

Congress-League স্কীম কলিকাতাতে পাশ হইল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী প্রাদেশিক কন্‌ফরান্স হয়। উহার প্রেসিডেন্ট বৈকুণ্ঠ বাবু। তখন কংগ্রেস ও Provincial Conference স্বতন্ত্র ছিল।

ইহার পর মিঃ মণ্টেগু ভারতে আসিলেন। ভূপেনবাবু সুরেন বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা করাইয়া দিলেন। তারপর থেকেই সুরেনবাবু আর সি-আর দাশের সঙ্গে মতের মিল হয় নাই Provincial Autonomyর কথা উড়িয়া গেল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে Government of India Act পাশ হইল। সুরেন বাবু এই Reform সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেন—কংগ্রেস বিরোধী হইল। তখন লিবারেল পার্টির সৃষ্টি হইয়াছে। তিলক বিলাতে গিয়া agitation করিলেন। ফল কিছু হইয়াছিল, খানিকটা modification দেখা গেল।

তার পর, জালিওয়ানওয়ালাবাগ ও খিলাফৎ আন্দোলন। গান্ধী তখন পর্য্যন্ত ছিলেন একজন Social worker, ৺গোখলেকে ইনি political guru ভাবে মানিতেন। ক্রমে Practical Politics'এ নামিলেন। এইরূপ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নূতন ভাবে স্বরাজ আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। ভারতের সৌভাগ্য, যে মহাত্মা গান্ধীর মত লোক এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, যে তিনি বাধ্য হইয়া practical politicsএ যোগ দিলেন। সি-আর-দাশ ও মতিলাল নেহেরু সব ছাড়িলেন, পরিপূর্ণরূপে অসহযোগপন্থী হইলেন।

পরবর্ত্তী যুগে দেশবন্ধু একটু পিছাইয়া স্বরাজ-পার্টি গঠন করিলেন। যখন প্রিন্স-অফ-ওয়েল্‌স ভারতে আসেন কংগ্রেস-পক্ষ তাঁহাকে বয়কট করিলে, লর্ড Reading বয়কট বন্ধ করিলে political concession recommend করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু গান্ধী রাজী হইলেন না। সি, আর, দাশের কথা মহাত্মা শুনিলেন। অবশেষে দাশকে স্বরাজ আন্দোলন অবাধে চালাইতে দিয়া নিজে A. I. S. A. গড়িয়া খাদির মধ্য দিয়া স্বরাজ আনিবার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেস হয়। তখন মহাত্মা আমাকে বলেন, আমি politics আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়াছি; স্থির করিয়াছি, এই কংগ্রেসে আর কোনও active part লইব না। কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কথায় আমি এখানে আসিয়াছি। কংগ্রেসে স্থির হয়, যদি এক বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট Nehru Report গ্রাহ্য না করেন, কংগ্রেস Civil Disobedience যুদ্ধ আরম্ভ

করিবে। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার সুভাষচন্দ্রের সহায়তায় মতিলাল নেহেরুর বিরুদ্ধবাদী হইলেন। মহাত্মার নিজের এক বৎসর পরে যুদ্ধ ঘোষণা করার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সত্য রক্ষা করিতে গিয়া তিনি ডাণ্ডি মার্চ্চ আরম্ভ করেন। গান্ধীজি চিরদিন আদর্শবাদী, তিনি ঠিক pratical politician নহেন। এ হিসাবে, খাঁটি political statesman ছিলেন গোখ্‌লে। সুরেন্দ্রবাবুর idealism ও practical statesmanship দুই ছিল। ভূপেন্দ্র বাবু ছিলেন পাকা politician।

সুরেন্দ্রবাবু যখন Minister হইয়া মাহিনা কম লইতে রাজী হন নাই, চিন্তামণি টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাকে মাহিনা কম লইতে নিষেধ করেন। আমরা এখান থেকে মাহিনা কম লইতে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এবং ইহা লইয়াই তাঁহার সহিত মতভেদ হয়। এই Indian Association'এর সি-আর-দাশ প্রভৃতি মেম্বর ছিলেন। Association'এর উদ্দেশ্য বৈধ ভাবে দেশ-সেবা করা—"to work for the country by legitimate means".

মনে পড়ে, ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ দিনে একটী Federation Hall স্থাপন করার চেষ্টা হইয়াছিল—East and West Bengalকে এক করিবার জন্য। এবং সেই সময়ে একটী National Fund খোলা হয়। একদিনেই এক লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল। ৺পশুপতিবাবুর বাড়ীতে National Fund তোলা হয়। ঐ সময়ে স্বদেশী মিল করার প্রস্তাবনা হয়। "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে"র প্রতিষ্ঠা হয়, ইহারই ফলে।

সেই সময়ে এত টাকা আসিতে লাগিল, যে আমাদের দশ লক্ষ দরকার—টাকা লওয়া বন্ধ না করিলে, ৩০ লক্ষ টাকাও অনায়াসে আসিয়া পড়িত। দেশ খুব টাকা দিয়াছে। "বঙ্গলক্ষ্মী"র ৫০০০ অংশীদার। তার মধ্যে ১৬ জন লোকও ডিরেক্টর হওয়ার উপযোগী ছিলেন না। National Bank হইল। ভূপেন্দ্রবাবু ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯০৫ সালেই National Council of Educationও হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষাকে বয়কট করিয়া নূতন স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইবার চেষ্টা হইল।

১৯০৫ হইতে ১৯১১—বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। দেশে নূতন জাগরণ হইল ও নূতন ভাবে কাজ চলিল। জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইল। জাতীয়তামূলক কর্ম্মপ্রেরণা চারি দিকে জাগিয়া উঠিল। জাতীয় শ্রমশিল্প, জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় ব্যাঙ্ক সকলের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। "বঙ্গভঙ্গনীতি" "Settled Fact" ছিল তাহা "Unsettled" হইল। সুরেন্দ্রনাথের জীবনের চরম কীর্ত্তি ইহাই বলিতে হইবে।

১৯১৩ হইতে আবার জাতীয় জীবনপ্রবাহ মন্দীভূত হইল। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। অসহযোগ-যুগে আমি এই Congress হইতে সরিয়া আসিয়াছি।

আমাদের দেশে স্বরাজ হইতে দেরী আছে। এ জাতির, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের চরিত্রগত আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে political freedom-এর আশা বড় কম। বাঙ্গালা দেশের তরল চিন্তার ধারা, ভাবপ্রবণতা ও উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলন সর্ব্বনাশ করিল। তিন মাস তিন জন লোক একত্র হইয়া কাজ করিতে পারে না। দেশের ও জাতির উন্নতির চেয়ে খবরের কাগজে স্ব স্ব কর্ম্মপ্রাধান্য ও নাম প্রচার করাই অনেকের অধিক ইচ্ছা দেখা যায়। Love of advertisment—একটা বিষম দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর সঙ্কল্পশক্তির মূল আদৌ দৃঢ় নহে। পরিশ্রম করিতেও সে পারে না। সহিষ্ণুতা নাই। প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করার শক্তি (combative power) আমাদের একেবারেই নাই, এই কারণে বাংলার সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে আমরা পিছাইয়া পড়িতেছি।

উদরান্নের জন্য বাঙ্গালীকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। উর্ব্বর ক্ষেত্র হইতে আমরা সহজেই শস্য উৎপাদন করিতে পারি, সেইজন্যই আরামপ্রয়াসী ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি। যখন নিজেদের দেশে নিজেরা শুধু ছিলাম—তখন আমাদের জীবনোপায়ের ভাবনা ছিল না। এখন

প্রতিযোগিতার দিনে আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। ষড়ঋতুসেবিত বাংলায় জীবনোপায় সহজ সাধ্য ছিল বলিয়া সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা ও ধর্ম্ম বাঙ্গলা দেশে খুব প্রসারণ লাভ করিতেছিল।

আমরা যে এত ধর্ম্মভাবাপন্ন, ইহার প্রধান কারণ আমাদের চিত্ত-দৌর্ব্বল্য। সংসারের দুঃখে কষ্টে হতভম্ব হইয়া, ধর্ম্মের দিকে শান্তি ও সুখের জন্য দৌড়িয়াছি। এবং গুরুর আশ্রয় লইয়া, তাঁহার পদে লুটাইয়া পড়ি। অনেক স্থলে গুরুর উপর মুক্তির জন্য আমোক্তার দিয়া নিজে বসিয়া থাকি।

আজকাল আবার আমাদের দেশে এই ভাবপ্রবণতা বাড়াইয়া দিবার আয়োজন চতুর্দ্দিকে। নৃত্যগীত, কীর্ত্তন, সিনেমা, অভিনয় ও কামাসক্তি-পূর্ণ লঘু কথাসাহিত্য—ইত্যাদির বাহুল্য। ইহাতে আমরা আরও স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি।

মনের শক্তি দেশের লোকের বৃদ্ধি না পাইলে—রাষ্ট্রীয় শক্তিও পাইব না পাইলেও তাহা ঠিক ভাবে চালাইতে পারিব না। দাস-মনোবৃত্তি থাকিয়া যাইবে। Indian Civil Service আমাদের কাণে ধরিয়া ঘুরাইবে—যদিও আমরা রাজনৈতিক উচ্চ অধিকার ও সুবিধা কোন রকমে পাই। আমাদের শাসনপরিষদের মন্ত্রীদের দুর্দ্দশা ইহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

মনের জোরের অভাবে আমরা জাতীয় শিল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। কেবল 'চাকুরী' 'চাকুরী' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই। ব্যবসাবাণিজ্য, শ্রমশিল্পে চাই খুব পরিশ্রম, খুব সহিষ্ণুতা ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম। তাহা আমরা করিতে পারি না।

আমাদের চরিত্রে সাহস গুণটা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে ভাবাবেগ দ্বারা প্রণোদিত এবং সেইজন্য ক্ষণস্থায়ী। অল্প পরিশ্রমে ও অল্পদিনের জন্য খুব দুঃসাহসের কাজও করিতে পারি। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া, আশুফলের প্রত্যাশী না হইয়া দিনের পর দিন সাহসের ও পরিশ্রমের সহিত কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে তেমন পারি না।

হিন্দু-মোসলেম সমস্যা শীঘ্র মিটিবে না। মুসলমানদের মধ্যেও উচ্চ শিক্ষার খুব প্রসারণ চাই। তাহাদের অভাব অভিযোগ বৃদ্ধি পাইলে কোন গবর্ণমেণ্টই তাহা মিটাইতে পারিবে না—তখন political discontent বাড়িয়া উঠিবে এবং জাতির কল্যাণ চিন্তা তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে। এখনই তাহার সূচনা দেখিতে পাই। হিন্দুদেরও "bear and forbear" এই মন্ত্রে কাজ করিতে হইবে। মুসলমানদের উপর ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার ভাব হিন্দুদের দূর করিতে হইবে। অনুন্নত শ্রেণীর সঙ্গেও এই ভাবে ব্যবহার করিলে তাদের ও দেশের উন্নতি হইবে। Education is the real instrument of progress.

আমাদের মানসিক বল-বৃদ্ধি করিতে হইলে ছেলেবেলা থেকে নূতন ভাবে শিক্ষার প্রয়োজন। শ্রমকঠোরতা ও দুঃখ বিপর্য্যয়ের মধ্যে ছেলেদের জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। দৃঢ়, সরল, সংযত ও নিয়মানুগ জীবন-শিক্ষা অল্প বয়স হইতেই তাহাদের দিতে হইবে।

আমাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে দেশের কোন আশা নাই। এই বিশ্বাস আমার চল্লিশ বৎসরের public life-এর অভিজ্ঞতায় হইয়াছে। পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা এবং আত্মশ্লাঘা, meanness and love of self-adverstisement—আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। সেই জন্য public life-এ এত ঝগড়া বিবাদ এবং ঐক্যের এত অভাব। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভও আমাদের সেই জন্য বেশী হইতেছে না। এটা অতি সত্য কথা যে No Government can be better than that of the people. যতটা আমরা চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিব, সেই পরিমাণে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও অধিকার পাইতে কেহ আমাদের বঞ্চিত করিতে পারিবে না। *

* স্নেহের দাবী দিয়াই শ্রদ্ধেয় সত্যানন্দবাবুর নিকট হইতে এই বিবৃতি আদায় করিয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবন নীরবেই কর্ম্ম করিয়াছেন, সে কর্ম্মের প্রচার ও কোন প্রকার অভিব্যক্তি দেওয়া তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ—প্রঃ সঃ।
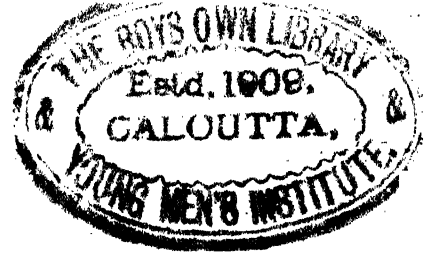
মামাশ্বশুরের বাড়ী

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

মদের দোকানকে লোকে বিদ্রূপ করিয়া "মামার বাড়ী" এবং জেলখানাকে "শ্বশুর-বাড়ী" বলে, কিন্তু "মামা-শ্বশুরের বাড়ী" বলিলে লোকে মদের দোকান বা জেল-খানা কিছুই মনে করে না—শাশুড়ীর পিত্রালয় বলিয়াই মনে করে। তাই আমি নির্ভয়ে আজ আমার মামাশ্বশুরবাড়ী যাত্রার কথা বলিব।

কাহিনীটা সে কালের, সুতরাং পাঠকগণকে পূর্ব্ব হইতেই অভয় দিয়া রাখিতেছি যে, এই কাহিনীর মধ্যে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন গুরু-গম্ভীর আলোচনা দেখিতে পাইবেন না এবং কাহিনীটি বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিতেছি বলিয়া পাঠকগণ ইহা মনে মনে ইংরাজীতে অনুবাদ না করিয়াও বুঝিতে পারিবেন, এ ভরসা আমার আছে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সে অনেক দিনের বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমার মামাশ্বশুরের বাটী হইতে পিতৃদেবের নামে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিল। পত্রখানি লাল বা গোলাপী রঙ্গের চকচকে বিলাতী কার্ডে ছাপান নহে, পত্রের অনুযায়ী বর্ণের সুদৃশ্য মোড়কে মোড়া নহে, হলুদে রঙ্গের তুলট কাগজে, লাল কালিতে হাতে লেখা পত্র। পত্রখানি ডাকঘরের মোহরাঙ্কিত হইয়া ডাকযোগে আসে নাই, আসিয়াছিল মামাশ্বশুর-বাটীর পাইক বনমালী সর্দ্দারের হাতে। বনমালী সর্দ্দার আমার ফুলশয্যার দিন এক বোঝা আখ মাথায় করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল বলিয়া তাহাকেই পত্রবাহক হইয়া আসিতে হইয়াছিল, কারণ সে আমাদের বাটী চিনিত।

নিমন্ত্রণ-পত্রে আমার পিতাকে "সপরিবারে" নিমন্ত্রণ করা হইলেও, বনমালী সর্দ্দার বাবার হাতে পত্রখানি দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল "জামাই বাবুকে সঙ্গে করে' নিয়ে যাব বলে' কর্ত্তা আমাকে পাঠিয়েছেন।" বলা বাহুল্য, যে "সপরিবারে" নিমন্ত্রণ-রক্ষার ভারটা আমাদের পরিবারস্থ অন্য সকলকে বাদ দিয়া একমাত্র আমার উপরই পড়িল।

পূর্ব্বে মামাশ্বশুরের বাড়ীতে কখনও যাই নাই; শুনিয়াছিলাম, রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক অখ্যাতনামা পল্লীগ্রামে আমার মামাশ্বশুরের বাড়ী। মামাশ্বশুরদের অবস্থা ভাল; প্রায় পাঁচশত বিঘা ধান জমি তাঁহাদের খাস আবাদে আছে আর প্রায় হাজার বারশ' বিঘা ভাগে বিলি অথবা প্রজা-বিলি আছে। ইহার উপর তাঁহাদের ধান চালের ব্যবসা এবং তেজারতি আছে অর্থাৎ এক কথায়, ইহারা পল্লীগ্রামের বেশ এক ঘর সমৃদ্ধিশালী কৃষক।

আমাদের বাড়ী জেলার সদরে অর্থাৎ সহরে, তাহার উপর আমি তখন বি, এ, পড়িতেছিলাম; সুতরাং আমার

মেজাজটা তখন কিরূপ ছিল, তাহা আপনারাই অনুমান করিয়া লইবেন, নিজমুখে সে কথা আর নাই বা ব্যক্ত করিলাম। সহুরে under-graduate জামাই পাড়াগাঁয়ে কৃষক কুটুম্বের বাড়ীতে যাইতেছি, সুতরাং আমাকে একটু প্রস্তুত হইয়া যাইতে হইল। একটা বড় গ্ল্যাড্ষ্টোন ব্যাগে তিন চারিখানা কাপড়, তিন চারি প্রস্ত জামা, তিন জোড়া মোজা, আধ ডজন রুমাল, একখানা জার্ম্মান আয়না (তখন কলিকাতার বাজারে নূতন আমদানী), চিরুণী, বুরুশ, দুই শিশি এসেন্স, একটা টুথ-ব্রাশ, এক কৌটা বিলাতী মাজন, খান তিনেক তোয়ালে প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইলাম। কিছু চা লইতেও ভুলিলাম না, কি জানি পাছে সেই সুদূর পল্লীগ্রামে ঐ দেব ভোগ্য দ্রব্যটা না পাই। বিলাতী দুধের কৌটাটা আর লইলাম না; কারণ, পল্লীগ্রামে আর যাহাই অভাব হউক না কেন, নির্জ্জলা খাঁটি দুধের অভাব হইবে না, তাহা জানিতাম।

পর দিন প্রাতঃকালেই যাত্রা করিলাম, কারণ ফাষ্ট ট্রেণে না যাইলে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে অনেক বেলা হইবে। যাইবার সময়ে মা কয়েকটা টাকা দিয়া বলিয়া দিলেন "ঠাকুরকে দুটি টাকা দিয়া প্রণাম ক'র আর আস্‌বার সময় বাড়ীর চাকর চাকরাণী, কৃষাণ রাখাল, পাইক পেয়াদাকে আট আনা করে' বখশিস দিয়ো।" মা বনমালীকে একখানা নূতন কাপড় দিয়া আপ্যায়িত করিলেন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ব্যাগ গুছাইবার সময়ে আমার বি, এ, ক্লাসের পাঠ্য দুই একখানা পুস্তকও ব্যাগের মধ্যে লইয়াছিলাম। যদিও আমার ধারণা ছিল যে, সেখানে ঐসকল পুস্তক পাঠ করিবার অবসর মিলিবে না, তথাপি কি জানি যদি দুই একজন এণ্ট্রান্স-পাশ কি এল, এ-ফেল (তখন এফ, এ, জন্মগ্রহণ করে নাই, ইণ্টারমিডিয়েট ত দূরের কথা) ইংরাজীওয়ালাকে পাই, তাহা হইলে কার্লাইল, ইমার্শন, মিল্টন, সেক্সপীয়ার শুনাইয়া তাহাদিগকে তাক্ লাগাইয়া দিব।

(২)

বেলা প্রায় ৯টার সময়ে গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ট্রেণ হইতে নামিবার পূর্ব্বে একবার বুরুশ দিয়া মাথাটা আঁচড়াইয়া ও জামা ঝাড়িয়া লইলাম। গাড়ী থামিবামাত্র বনমালী আমার কক্ষের সম্মুখে আসিয়া আমার ব্যাগটা নামাইয়া লইল। বাবা আমাকে ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সেকেণ্ড ক্লাস রিটার্ণ টিকিট কিনিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, কুটুম্ববাড়ীর লোকদিগকে কোন রূপে জানাইয়া দিব যে, জামাইবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন। পকেটে আধখানা টিকিট দেখিতে পাইলে, টিকিটের রং দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিবে, যে এ দেড়া মাশুলের টিকিট নহে।

গেটে টিকিট দিয়া বনমালীর সঙ্গে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি পাল্কী ও গরুর গাড়ী যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বনমালীকে দেখিয়া চারি জন বেহারা একটা পাল্কী লইয়া অগ্রসর হইল। বনমালী পাল্কীর মধ্যে আমার ব্যাগটা রাখিয়া আমাকে পাল্কীতে উঠিতে বলিল। আমি পাল্কীতে উঠিলাম, বেহারারা আমাকে লইয়া গ্রাম্য পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।

গ্রাম পার হইয়া মাঠে আসিয়া পড়িলাম। দুইধারে মাঠ, সবুজ ধানে ছাইয়া আছে। দূরে দূরে দুই একটা বট গাছ বা তাল ও খেজুর গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া-আছে; আরও দূরে বাঁশঝাড়ে বেষ্টিত গ্রামগুলি যেন পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে। শরৎকালের বাতাসে সবুজ রঙ্গের ধানক্ষেতে যেন ঢেউ খেলাইয়া যাইতেছে। আকাশের কোলে সাদা সাদা বক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উড়িয়া চলিয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য! প্রথম যৌবনের সেই চিত্র এই বৃদ্ধ বয়সে যখন মনে পড়ে, তখন সত্যই আনন্দে আত্মহারা হই। এখনও সেইরূপ সবুজ ধানক্ষেত আছে, তাহাতে শরৎসমীরণ-স্পর্শে আন্দোলন আছে, সেই-রূপ গ্রাম্য পথও আছে, কিন্তু তখনকার সে আনন্দ কোথায় গেল? সেটা কি যৌবন-সুলভ আনন্দ? বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া কি এতই নীরস হইয়াছি যে, সে আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তিও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, না সত্য সত্যই দেশ হইতে সেই প্রাণভরা আনন্দ বিলুপ্ত-প্রায় হইতে বসিয়াছে?

বেলা প্রায় ১০টার সময়ে বেহারারা একটা বটগাছের তলায় পাল্কী নামাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। পাল্কীর

নিম্নদেশ হইতে তাহারা একটা পুঁটুলি বাহির করিয়া তাহা হইতে কলিকা, কিছু তামাক ও কয়লা বাহির করিল। ততক্ষণ আর একজন বাহক চকমকি ঠুকিয়া সোলাতে আগুন ধরাইল এবং সোলার আগুনে কয়লা ধরাইয়া ধূম-পানে প্রবৃত্ত হইল। বটগাছের অদূরে একটা বড় পুষ্করিণী ছিল, ধূম-পানের পর তাহারা সেই জলাশয়ে গিয়া হাত পা ধুইয়া জল পান করিল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল পাল্কীর মধ্যে বসিয়া থাকাতে আমার কোমর ধরিয়া গিয়াছিল, আমি পাল্কী হইতে বাহির হইয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। বনমালীকে দেখিতে না পাইয়া একজন বেহারাকে তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করাতে সে করযোড়ে বলিল—

"এজ্ঞে, তিনি রেলের রাস্তা ধরে' সোজা পথে এগিয়ে খবর দিতে গেছে। আমরা একটু ঘুরে যাব কি না!"

প্রায় পনর মিনিট বিশ্রামের পর তাহারা পাল্কী উঠাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এত ক্ষণ পাল্কী মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, এইবার পথের পার্শ্বে দুই একখানা গ্রাম পাওয়া যাইতে লাগিল। সেই গ্রাম্যপথ কোন কোন গ্রামের ভিতর দিয়াই গিয়াছে। গ্রাম পার হইয়া আবার মাঠে পড়ে, মাঠ পার হইয়া আবার গ্রামে প্রবেশ করে, পাল্কী এই ভাবে চলিতে লাগিল।

যখন পাল্কী গ্রামের ভিতর দিয়া যায়, তখন কোন কোন গ্রাম্য কৃষক জিজ্ঞাসা করে "কোন গাঁয়ে যাবে?" বেহারারা বলে—"সুদর্শনপুরে মিত্তিরদের বাড়ী।" কোথাও বা গ্রাম্য বধূরা অঙ্গুলী দ্বারা অবগুণ্ঠন ঈষৎ তুলিয়া সকৌতূহল দৃষ্টিতে পাল্কীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অর্দ্ধ উলঙ্গ কৃষ্ণকায় বালকেরা খেলা করিতে করিতে কখনও বা অবাক্ হইয়া পাল্কীর মধ্যস্থ পনর-টাকা জলপানি-প্রাপ্ত, ফ্রী-চার্চ্চ-কলেজের এই উদীয়মান প্রতিভার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। আহা! অবোধ মূর্খগণ জানে না যে, পাল্কীর মধ্যে যে ব্যাগ আছে উহার মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও প্রবন্ধলেখকদিগের রচিত কি অমূল্য সম্পদ্ আছে! আর ফ্রী-চার্চ্চ-কলেজের এই উদীয়মান প্রতিভা সেই সকল সম্পদ্ আত্মসাৎ করিবার জন্য কত কঠোর পরিশ্রমই না করিতেছেন!

অনেকগুলি ছোট বড় গ্রাম ও মাঠ পার হইয়া পাল্কী বেলা ১১টার পর একটা গ্রামে প্রবেশ করিল। একজন কৃষক বেহারাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"জামাইবাবু এয়েচে?"

আমি "জামাই বাবু" শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম, যে এই আমার গন্তব্য গ্রাম সুদর্শনপুরে উপস্থিত হইয়াছি। দেখিলাম, গ্রামটি বেশ বড়, পথে যাইতে যাইতে পাঁচ সাত-খানি বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গা-প্রতিমা দর্শন করিয়া বুঝিলাম, যে গ্রামে অনেকেরই অবস্থা ভাল এবং ভদ্রলোকের বাস আছে। দূরে একটা দ্বিতল অট্টালিকার ছাদ দেখা যাইতেছিল, পথের ধারেও দুই একখানা পাকা বাড়ী দেখিলাম। পাল্কী ঘুরিয়া ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে সেই দ্বিতল অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইল।

(৩)

বেহারারা পাল্কী নামাইলে আমি পাল্কী হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম, বনমালী আমার পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি পাল্কী হইতে বাহির হইবামাত্র সে আমার ব্যাগটি লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এমন সময়ে আমার মামাশ্বশুর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র অগ্রসর হইয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস, বাবা, এস! তুমি একলা এলে, বেয়াই মশাই এলেন না? তোমার ছোট ভাই, কি তার নাম? সত্যেন? তাকে আন্‌লে না কেন?"

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "বাবার শরীর বেশ ভাল নাই, তিনি বড় আর কোথাও যেতে পারেন না। আর সত্যেন বাড়ীতে না থাক্‌লে বাবার কিছু অসুবিধা হয়। আরও পাঁচ সাত জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষা" ইত্যাদি।

উঠানে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, বাম পার্শ্বে চণ্ডী-মণ্ডপে প্রতিমা। চণ্ডী-মণ্ডপটি তৃণচ্ছাদিত, কিন্তু উঠানের অন্য তিনদিকের ঘরগুলি পাকা অর্থাৎ ইষ্টক-নির্ম্মিত। উঠানটিও শান-বাঁধান। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়া খুব উচ্চ, বোধ হয় তিন হাত হইবে। সোলার ও কাগজের ফুলে এবং লতাপল্লবে চণ্ডীমণ্ডপটি সাজান হইয়াছে। সে দিন সপ্তমী।

সে বৎসরে বেলা নয়টার মধ্যেই বিহিত সপ্তমী পূজার ব্যবস্থা ছিল ; সুতরাং আমার উপস্থিতির পূর্ব্বেই পূজা শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমি জননীর নির্দ্দেশ-মত চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দুইটি টাকা দিয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিলাম। মামা বলিলেন—

"এখনই এত তাড়াতাড়ি কেন? বাড়ীর ভিতরে চল, বেলা অনেকটা হয়ে গেছে। তোমরা স্কুলে কলেজে যাও, সকালে সকালে খাওয়া অভ্যাস। চল বাড়ীর মধ্যে।"

আমি মামার সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মৃদুস্বরে উত্তর দিয়া আমাদের বাটীর কুশল সংবাদ লইলেন এবং একটি যুবতীকে ইঙ্গিত করিয়া একটা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরে জানিলাম, সেই যুবতী আমার মামাশ্বশুরের কন্যা কুসুম। তিনি আমাকে লইয়া উপরের একটা কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন—"চা খাবে?"

আমি বাটী হইতে চা-পান ও জলযোগ করিয়া আসিয়াছি শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তবে একটু জিরিয়ে স্নান করো। পুকুরে নাইবে না বাড়ীতে নাইবে?"

আমার বাটীতেই স্নান করা অভ্যাস ছিল। সুতরাং বলিলাম, বাটীতে স্নান করিব। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী একটা কক্ষ দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ ঘরে নাইবার জল আছে, পাশেই হাতমুখ ধুইবার জায়গা আছে।"

ছয়টার পূর্ব্বে বাটী হইতে বাহির হইয়া বেলা ১১টার পর সুদর্শনপুরে উপস্থিত হই ; কথাবার্ত্তায় প্রায় দ্বিপ্রহর হইল দেখিয়া আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমি পাল্কী হইতে অবতরণ করিবামাত্র শিশু, বালক, বালিকা প্রায় বিশ পঁচিশ জন আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। আমি উপরে আসিলেও, প্রায় দশ বার জন আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরে আসিয়াছিল। বুঝিলাম, তাহারা এই বাটীরই অথবা পূজা উপলক্ষে সমাগত আত্মীয়দের সন্তানসন্ততি। কুসুমদিদি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এখন সবাই নীচে যাও, নরেন স্নান আহার করুক, তার পর তোমরা কাছে এস।"

কুসুমদিদি তাহাদিগকে লইয়া নীচে চলিয়া যাইলে, আমি হাত মুখ ধুইবার জন্য স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। ঘরের একপার্শ্বে এক-খানা জলচৌকী পাতা, তাহার নিকটে বড় বড় কয়েকটা জলপাত্র জলপূর্ণ রহিয়াছে। ঘরের অন্যদিকে একটা টেবিলের উপর তিন চারি প্রকার সুগন্ধি সাবান, ফুলেল তৈল, নারিকেল তৈল, একখানা নূতন গামছা, একখানা তোয়ালে। টেবিলের পার্শ্বে একখানা বড় আয়না, চিরুণী-বুরুশ, মাজনের কৌটা, দাঁতন। নিকটেই দেওয়ালে একটা ব্র্যাকেট-আলনায় একখানা কোঁচান কাপড় ও একটা কামিজ, নীচে একজোড়া কার্পেটের নূতন চটি জুতা। পাড়াগাঁয়ে যে সকল দ্রব্যের অভাব অনুমান করিয়া আমি ব্যাগ ভর্ত্তি করিয়া আনিয়াছিলাম, দেখিলাম, তাহার সমস্তই বরং তাহা অপেক্ষা বেশী প্রসাধনের দ্রব্য সেই ঘরে

আমি স্নান শেষ করিয়া পূর্ব্ব কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কুসুমদিদি ও আর একটি তরুণী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা আমাকে লইয়া উপরের আর একটা কক্ষে প্রবেশ করিলে দেখিলাম, তথায় পাঁচ ছয় জন যুবক দাঁড়াইয়া আছে, কেহ বা আমার সমবয়স্ক, কেহ বা কিছু ছোট, কেহ বা কিছু বড়। ঘরের মেঝেতে অনেক-গুলি আসন পাতা, সকল আসনের সম্মুখেই অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত। ভোজনকালে কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, সমবেত যুবকগণের মধ্যে কেহ বা বাড়ীর ছেলে, কেহ বা জামাই। আহারান্তে কুসুমদিদিকে বলিলাম—

"আমাদের ত খাওয়া হ'ল, আপনারা কখন খাবেন?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "কাজের বাড়ীতে কি আর আমাদের খাওয়া দাওয়া আছে? আমাদের খেতে সেই বেলা পাঁচটা। কুসুমদিদি চলিয়া গেলে একজন যুবক—পরে পরিচয় পাইলাম আমার মামাশ্বশুরের বড় ছেলে—অবিনাশ বলিলেন—"কলেজের ছেলে, নিশ্চয়ই দিনে ঘুমাও না। যদি না ঘুমাও, তবে চল বৈঠকখানায় গিয়া একটু গল্প করা যাবে।"

তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে বৈঠক-খানাতে গমন করিলাম।

(৪)

আমরা অন্দর মহল হইতে আবার সদর বাড়ীতে সেই চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া অপর দ্বার দিয়া অন্দরমহলের বিপরীত দিকে চলিলাম। চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে তখন লোক-খাওয়ান হইতেছিল। গ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ভোজনে বসিয়াছে। আমরা পূজাবাড়ী হইতে বাহির হইয়া যেখানে গিয়া পড়িলাম, সে স্থানের দৃশ্য আমি বোধ হয় জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। প্রায় দুই বিঘা জমি লইয়া একটি ফুল-বাগান, বাগানের চারিদিকে অসংখ্য স্থলপদ্মের গাছে অসংখ্য স্থলপদ্ম ফুটিয়া আছে। এত অধিক স্থলপদ্ম আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। আমার বিস্ময় দেখিয়া অবিনাশ বলিলেন—"এই বাগানের ফুলে গ্রামের লোকের ঠাকুর-পূজা হয়। সকালে বোধহয় পঁচিশ ঝুড়ি ফুল তোলা হইয়াছে। আমাদের গ্রামে তেরখানা পূজা হয়, সমস্ত পূজার ফুল এই বাগান হইতে যায়। বাবার হুকুম, পূজার জন্য যে যত ইচ্ছা ফুল তুলিতে পারে। এ বাগানে কেবল পূজার জন্যই ফুল গাছ রাখা হইয়াছে।"

কেবলই কি স্থলপদ্ম? বড় বড় দোপাটি ও গাঁদার ক্ষেত দেখিলাম, সাদা ও লাল দোপাটি মিলিয়া যেন একটি সুন্দর কার্পেট বুনিয়া রাখিয়াছে। গাঁদা ফুল তখনও ফোটে নাই। সাদা, লাল ও গোলাপী রঙ্গের শত শত করবী গাছে হাজার হাজার ফুল ফুটিয়া আছে।

আমরা সেই ফুল-বাগান পার হইয়া বৈঠকখানাতে উপস্থিত হইলাম। আমি অনুমান করিয়াছিলাম, যে গ্রাম্য ধনবান্ কৃষকের বৈঠকখানাতে, ডুগি, তবলা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র, তামাক, টিকা, হুঁকা কলিকার ছড়াছড়ি এবং তাস, পাশা প্রভৃতি নিষ্কর্ম্মার চিত্তবিনোদনের উপকরণ দেখিতে পাইব। কিন্তু বৈঠকখানাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড হল, চারিদিকে দেওয়ালের গায়ে সারি সারি গ্লাস-কেস পুস্তকে পরিপূর্ণ। গৃহস্থের বাটীতে এত বড় লাইব্রেরী আমি কোথাও দেখি নাই। বোধ হইল, সেই লাইব্রেরীতে আট দশ হাজার পুস্তক আছে। আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"এত বই কার!"

অবিনাশ বাবু হাসিয়া বলিলেন "অধিকাংশই বাবা সংগ্রহ করেছেন, আমিও কিছু কিছু আনিয়েছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মামা কখন এত বই পড়েন?"

তিনি বলিলেন "বাবা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন, তখন হইতেই এই সকল পুস্তক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এম, এ, পরীক্ষা দিয়া কলেজ ছাড়িলেন, কিন্তু পড়াশুনা ছাড়িতে পাড়িলেন না। যখনই কলিকাতায় যান, তখনই দু'শ একশ টাকার বই কিনিয়া আনেন। বাবার ঐ ঝোঁকটা উত্তরাধিকার-সূত্রে আমিও একটু পাইয়াছি। আমার এম, এ, পরীক্ষার সময় এই সকল বই আমার বড়ই কাজে লাগিয়াছিল। বাবার কাছে না পড়িলে আমি বোধহয় ফার্ষ্ট‌ক্লাসে পাশ হইতে পারিতাম না।"

আমি ত অবাক্! পাড়াগাঁয়ের এই কৃষক ফার্ষ্ট ক্লাস এম, এ,? এক পুরুষে নহেন দুই পুরুষে? আমি তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কিসে এম, এ,? মামা বাবুই বা কোন বিষয়ে এম, এ, পরীক্ষা দিয়াছিলেন?"

অবিনাশ বাবু বলিলেন "বাবা প্রথমে ইংলিশে এম, এ, দিয়া দুই বৎসর পরে সংস্কৃতে এম, এ, দিয়াছিলেন। আমিও ইংলিশ লইয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে, আগামী বৎসরে ফিলজফিতে এম, এ, দিব। বাবার কাছে বাড়ীতেই ফিলজফি পড়িতেছি।"

এই বাড়ীতে আমি বিদ্যা ফলাইবার জন্য ব্যাগের ভিতরে দুই চারিখানা বি, এ,র পাঠ্য পুস্তক আনিয়াছি! অবিনাশ বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে আমার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, ভাগ্যে ইঁহাদের কাছে সেক্সপীয়ার বা মিল্টনের দুই চারিটা বুলি কপচাই নাই। আমি বিদ্যাজাহির করিতে যাইলে, ইঁহারা কি মনে করিতেন?

(৫)

সান্ধ্য আহারের পর আমি মামার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়াছিলাম। সন্ধ্যারতি হইয়া গিয়াছে। আরতি-

দর্শনার্থী স্ত্রী পুরুষ সকলে চলিয়া যাওয়াতে বাড়ীটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বোধ হইতেছিল। আমি বসিয়া বসিয়া ইঁহাদের লাইব্রেরী, বিদ্যাচর্চ্চা, উচ্চ শিক্ষার কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে কুসুমদিদি ও তাঁহারই সমবয়স্কা চারি পাঁচটি মহিলা আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কুসুমদিদি বলিলেন "ভাই, এতক্ষণে আজিকার মত ছুটী পেলাম; আবার কাল সকালে উঠে অষ্টমী-পূজার জন্য কোমর বাঁধ্‌তে হবে।"

কুসুমদিদি তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। একজন সম্বন্ধে তাঁহার ভাজ, দুইজন তাঁহার পিতৃব্য-কন্যা অর্থাৎ আমার ছোট মামা-শ্বশুরের কন্যা এবং অবশিষ্ট সকলে প্রতিবেশিনী। কথায় বার্ত্তায় কুসুমদিদির নিকট শুনিলাম, তাঁহার পিতা অর্থাৎ আমার বড় মামাশ্বশুর চাকরী করাকে বড়ই ঘৃণা করেন; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী হইয়াও কৃষক, কৃষি-কার্য্যেই তাঁহার একান্ত আগ্রহ। অবিনাশ বাবুও কৃষিকার্য্যে পিতার সহকারী। আমার ছোট মামাশ্বশুরও এম, এ, পাশ; কিন্তু তিনি বড়লাটের দপ্তরে চাকরী করেন। ছুটী নাই বলিলেই হয়, পূজার সময়েও বাটীতে আসিতে পারেন না। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বড়টি উকীল, ছোটটি ডাক্তারী পড়িতে বিলাতে গিয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কুসুমদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি এ বছরে বি, এ, দিবে?"

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলে, বলিলেন "এ, কোর্স নিয়েছ না বি, কোর্স নিয়েছ?"

কি সর্ব্বনাশ! কুসুমদিদিও এম, এ, নাকি? তবেই ত গেছি! আমি বলিলাম "এ, কোর্স।"

আমাদের সময়ে বি, এস, সি, বা এম, এস, সি, পরীক্ষা ছিল না। যাহারা বি, এ, পরীক্ষায় গণিত ও বিজ্ঞান লইত তাহারা বি, কোর্স্এর ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইত।

ভগবান রক্ষা করিলেন, কুসুমদিদি আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

রাত্রিতে আমার বালিকাপত্নীর মুখে শুনিলাম, কুসুম-দিদি কোন স্কুলে না পড়িলেও বাড়ীতে অনেক ইংরাজী ও সংস্কৃত বই পড়িয়াছেন। আমার বড় মামীশাশুড়ী ইংরাজী সামান্যই জানেন; কিন্তু সংস্কৃত ভাল রকমই জানেন। আমার শাশুড়ীও কিছু কিছু ইংরাজী ও সংস্কৃত জানেন। আমি বলিলাম "মা, দিদি, মামীমারও কথা বলিলে, তোমার নিজের কথা কিছু বলিলে না?"

সে বলিল "আমি কিছু জানি না। তুমি আমাকে পড়িও। মা, মামীমা, দিদিরা, সবাইকে বড় মামা বাবু বাড়ীতে পড়িয়েছেন। তুমি আমাকে পড়াবে ত?"

বাংলার হিন্দু

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ এম, এল্, সি

বহু কষ্টে অর্জ্জিত এবং বহু যত্নে সঞ্চিত অর্থ অপহৃত হইলে গৃহস্থ প্রথমে আর্ত্তনাদ করিয়া পাড়া মাতাইয়া তোলে; পরে ভাবিতে আরম্ভ করে, যে কি করিলে তাহার ঘরে চুরি হইত না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথায় অনেক ফন্দীই গজাইয়া উঠে এবং তখন বুঝিতে পারে যে, এমন সমস্ত সহজ উপায় ছিল যাহা অবলম্বন করিলে চোরের পক্ষে তাহার অর্থ অপহরণ করা অসম্ভব হইত। প্রবাদ-বাক্যে ইহাকেই বলা হয় "চোর পালালে বুদ্ধি যোগায়।" এমন বুদ্ধি সকল দেশে সকল কালে প্রায় সকল শ্রেণীর গৃহস্থের মাথায় আসিয়াছে; কিন্তু তখন নিরুপায়। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, সম্পদ্ অপহৃত হইবার পূর্ব্বে চোরের আগমন নিবারণ কল্পে কেহ চিন্তা করে না। না করার ফলে বহু জনের বহু অনিষ্ট হইয়া যাইতেছে। এ কথাটা ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন খাটে, সমাজ এবং দেশ সম্বন্ধেও তেমনি খাটে। সমাজ বা দেশ যখন সম্পন্ন, তখন সম্পদ্রক্ষা করিবার জন্য বড় কেহ চিন্তা করে না; কিন্তু সে সম্পদ্ হারাইয়া যখন হৃত-সর্ব্বস্ব গৃহস্থের ন্যায় সমাজকে দৈন্য-দশাপ্রাপ্ত হইতে হয়, তখন চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। আমাদের দেশে এবং সমাজে বিশেষভাবে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের অবস্থা ঠিক এরূপই হইয়াছে এবং তাহার ফলে বাঙ্গালী হিন্দু হৃত-সর্ব্বস্ব দীনের ন্যায় বিশ্ব-সমক্ষে দাঁড়াইয়া নিজের দুর্দ্দশার লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতেছে। আমাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, নিজের বলিতে জগতে আর কিছুই নাই; কাজেই এখন আমরা কখনও কখনও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি, যে কোন্ দিকে সাবধানতা অবলম্বন করিলে আমরা রক্ষা পাইতাম। ভাবিতেছি বটে এবং বুদ্ধিও যে কখনও কখনও যোগাইতেছে না তাহা নহে; কিন্তু তথাপিও তেমন সাবধান হইতে পারিতেছি না।
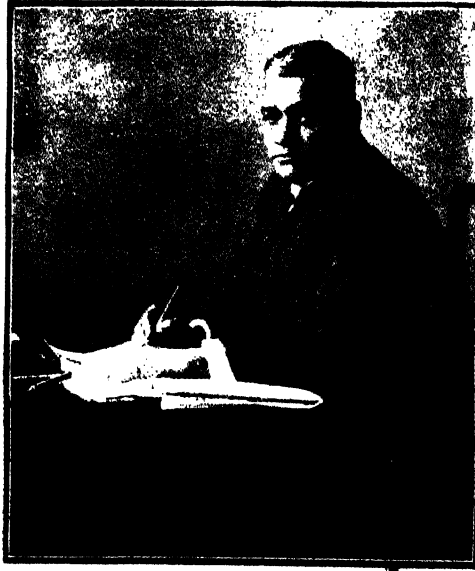
শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ, এম, এল, সি

বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্ম গিয়াছে, সমাজ-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, ব্যক্তিত্ব গিয়াছে, এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালীর বাণিজ্য গিয়াছে, ব্যবসা গিয়াছে, শিল্প লোপ পাইয়াছে এবং গৃহে অর্থাগমের সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়াছে। বাংলার চাষবাস গিয়াছে, ক্ষেত খামার লোপ পাইয়াছে; সুতরাং পল্লী শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জমিদারী নাই, মহাজনী নাই, মুৎসুদ্দীগিরি নাই, এমন কি দালালীও নাই। বাঙ্গালীর গৃহে অন্ন নাই, প্রাঙ্গণে তুলসী বৃক্ষ নাই এবং শালগ্রামশিলা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। নাই, নাই, কিছুই নাই, সর্ব্বস্ব গিয়াছে! যাহার নিজস্ব কিছুই নাই তাহার ন্যায় কৃপাপাত্র জগতে আর কে আছে? হৃত-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী হিন্দু আজ জগতে সর্ব্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও ঘৃণিত।

তাহার সর্ব্বস্ব চুরি হইয়া গিয়াছে; তাই আজ সে ভাবিবার অবকাশ পাইতেছে, যে কি করিলে, কোন সাবধানতা অবলম্বন করিলে তাহার এমন সর্ব্বনাশ হইত না! বুদ্ধি যোগাইতেছে অনেক; কিন্তু যাহা গিয়াছে তাহা ত এখন আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই! তবে কি বাঙ্গালার হিন্দু মরিবে? জগৎ হইতে বাঙ্গালী হিন্দুর নাম লোপ পাইবে? ভগবান জানেন।

কবি গাহিয়াছেন—"জগৎ জুড়িয়া বাজিছে বিষাণ, কৈরে বাঙ্গালী কৈ?" নাই, নাই—বাঙ্গালী কোথাও নাই। থাকিবে কেমনে? বাংলার হিন্দু ত অনেক দিন মরিয়াছে। যে দিন সে নিজের সর্ব্বপ্রকারের বৈশিষ্ট্যকে কুসংস্কার বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়া পরকীয় সজ্জায় সজ্জিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিনই ত বাঙ্গালীর মৃত্যু হইয়াছে। সে দিন যে চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সেই অগ্নিতে বাঙ্গালীর পল্লী, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বঙ্গের সমাজ ও হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এখন যাহারা বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেয়, তাহারা দগ্ধীভূত বাঙ্গালী হিন্দুদিগের প্রেতাত্মা এবং তাহারা প্রেত-যোনি-প্রাপ্ত অমানুষ-জন-সুলভ কার্য্যে আনন্দ পায়। অসহায় এবং নিরস্ত্রদিগকে বধ করিয়া তাহারা সাহসের পরিচয় দেয়, পরধন লুণ্ঠন করিয়া তাহারা গর্ব্ব অনুভব করে এবং অস্বাভাবিক এবং অকারণ চীৎকার তাহাদের সুখের বস্তু। অনুকরণে তাহাদের আনন্দ এবং পর-পদ-লেহনে তাহাদের তৃপ্তি। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার গর্ব্বে তাহারা গর্ব্বিত এবং শীতল-ছায়াপ্রদ বটবৃক্ষের পরিবর্ত্তে সরল রেখার ন্যায় পাম-বৃক্ষে জলসিঞ্চনে তাহাদের শ্রম পর্য্যবসিত। জীবনের কোন লক্ষ্য নাই; স্ব-জাতি, স্ব-ধর্ম্ম, স্ব-দেশ এবং স্ব-সমাজের প্রতি তাহাদের কোন মমতা নাই। হৃত-স্বর্ব্বস্ব ও লক্ষ্মী-ছাড়া পথের ভিখারীর মত তাহারা আজ স্বদেশে উপেক্ষিত এবং বিদেশে ঘৃণিত—কোথাও আজ বাঙ্গালী হিন্দুর স্থান নাই। ভারতের জাতীয় মহাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর নাম অনুবীক্ষণ যোগেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; আর সাগরপারে রাউণ্ড টেবিল সভায় কথা বলিতে উঠিলেই বাঙ্গালী হিন্দুকে ধমক খাইয়া বসিয়া পড়িতে হইয়াছে। বাংলার হিন্দু পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী জাতীয় আন্দোলনে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোককে সর্ব্ব প্রথমে উদ্বোধিত করিয়াছিল; কিন্তু আজ ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই সে আন্দোলনের কেন্দ্র হইতে বাঙ্গালী হিন্দুকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি ভারতবর্ষে বাঙ্গালী হিন্দুই স্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু আজ সেই ইংরেজ বাঙ্গালী হিন্দুর নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে, বাঙ্গালী হিন্দু তাহার চক্ষুশূল। কেন এমন হইল? একমাত্র উত্তর এই যে, যে জাতি নিজের সর্ব্বপ্রকারের বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করিয়া পরকীয় সাজে সজ্জিত হয়, সে জাতির প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। আত্ম-সম্মান-বোধ যাহার নাই, সে সর্ব্বজন-ঘৃণ্য। এই সার্ব্বজনীন ঘৃণা ও উপেক্ষার ফলে বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থা শোচনীয়তর হইতেছে এবং অচিরে সে এমন অবস্থায় পৌঁছিবে যে, তখন সে "ধোপীকা কুত্তাকা মাফিক ন ঘাটকা, ন ঘরকা" হইয়া জগতের যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইবে। প্রাচীন য়িহুদী জাতি যেমন নিজের সর্ব্ববৈশিষ্ট্য হারাইয়া "ভ্রাম্যমান য়িহুদী" (Wandering Jew) বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থাও ঠিক তেমনই হইবে। সে দিনের যে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। আর সে দিন যত শীঘ্র আসে তাহার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করিতেছি। নিজেদের কিছুই নাই, আপনার বলিয়া কোন কিছুর প্রতিই মমতা নাই; তাই যে যাহা দিতেছে তাহাই মাথা পাতিয়া লইতেছি। তেমন দুর্ব্বুদ্ধিই যদি না হইবে, তবে যে দেশের পিতামহী প্রপিতামহীরা চরকার দৌলতে দুয়ারে হাতী বাঁধিবার স্পর্দ্ধা করিতেন, সে দেশের লোক চরকার চেহারা দেখিবার জন্য গুজরাট ছুটিয়া যাইবে কেন? শ্লাঘা করিবার মত তেজঃ থাকিলে জননীর সহস্র সহস্র তন্তুবায় সন্তানের বিশ্ব-জন-বিশ্রুত শিল্প হেলায় ঠেলিয়া ফেলিয়া খাদির প্রলোভনে জাপান ও গুজরাটের বণিক্‌দিগের পদে আত্ম-সমর্পণ করিবে কেন? যে দেশে নদীয়ার মহাপ্রভুর শিক্ষায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে অস্পৃশ্যতা প্রায় লোপ পাইয়াছিল, যে দেশের লোকেরা "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ"

বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিত, সে দেশের লোক আজ "হরিজনের" সেবাব্রত শিক্ষা করিবার জন্য নূতন করিয়া পাঠ গ্রহণ করিতে চাহে, ইহা কি প্রকৃতির নির্ম্মম প্রতিশোধ নহে? যে ইংরেজ বাঙ্গালী হিন্দুর সাহায্যে রাজ্যস্থাপন করিয়াছে, সেই ইংরেজ বাঙ্গালী হিন্দুর সর্ব্বপ্রকারের প্রাধান্য লোপ করিবার জন্য ব্যস্ত। যে মুসলমান হিন্দুর সহিত যুগ যুগান্তর হইতে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে মিশিয়া রহিয়াছিল, সেই মুসলমান আজ বাঙ্গালী হিন্দুকে অন্ধ-কূপে ঠেলিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর। আর যে বাংলায় অস্পৃশ্যতা কথার কথা মাত্র, সেই বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক 'হরিজন' না থাকিলে নাকি স্বরাজ-লাভ হইবে না! আর কিছু বাকী আছে কি? সর্ব্বস্বই ত চুরি হইয়া গিয়াছে এবং নিজ কর্ম্মদোষে বাঙ্গালী হিন্দু সর্ব্বত্র ঘৃণ্য, সর্ব্বত্র উপেক্ষিত—এখনও বুদ্ধি যোগাইবে কি?

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ-কাল হইতে এ পর্য্যন্ত এদেশের লোক যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল তাহা আর চলিবে না, চলিতেই পারে না। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দু ইংরেজের হৌসে দালালী-গিরী, মুচ্ছুদ্দি-গিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এবং সঞ্চিত অর্থ দ্বারা জমিদারী খরিদ করিয়া দেশে গণ্যমান্য হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পরে সহস্র সহস্র হিন্দু সন্তান পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভূষিত হইয়া উকীল হইয়াছে, হাকিম হইয়াছে, কেরাণী বনিয়াছে। তাহার ফলে বহু হিন্দু-সন্তানকে কর্ম্মোপলক্ষে সহরে বন্দরে বাস করিতে হইয়াছে এবং ক্রমে পল্লীগ্রামের সহিত তাহাদের সম্পর্ক রহিত হইয়াছে। সর্ব্বনাশের সূত্রপাত এইখানেই আরম্ভ। পল্লীগ্রামগুলি জনশূন্য হইবার ফলে বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্ম-বন্ধন, সমাজ-বন্ধন এবং স্বজন-প্রীতি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে। যাহারা সহরে আসিয়া সর্ব্ব বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা ভোগের মোহে মজিয়াছে, তাহারা আর পল্লী-সমাজের বাঁধনের মধ্যে ফিরিয়া যায় নাই। সহরের এই অবাধ স্বাধীনতা এবং পল্লীর হীন অবস্থাই বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশের কারণ। সহরে এ বাড়ীর লোক কি করে, ও বাড়ীর লোক তাহার খোঁজ রাখে না। সহরে ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই, সমাজ-সামাজিকতার কোন কথাই উঠে না। কাজেই মানুষ ধীরে ধীরে সর্ব্ব-প্রকারের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া যায়। ইহাতে যে স্বাধীনতার মোহ আছে, তাহাতেই ক্রমে ক্রমে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। উচ্ছৃঙ্খলতা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে যেমন পরিস্ফুট, তেমন আর কোন শ্রেণীর লোকের জীবনে নহে। দেশের অবস্থা যদি তেমনই থাকিত, বাংলার হিন্দু সন্তান যদি তেমনই সহজে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সহরবাসী হইয়া থাকিতে পারিত, তাহা লইলে হয়ত সমাজ ও ধর্ম্ম লইয়া কেহ বড় একটা মাথা ঘামাইত না। দেশ যদি ইংরেজ পূর্ব্বের মত শাসন করিত, তাহা হইলে হয়ত বাঙ্গালী কোন ভাবনা না ভাবিয়া ওকালতী, হাকিমী বা কেরাণীগিরি করিয়া ক্রমে ক্রমে মরিতে পারিত, কিন্তু "তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।"

হিন্দু আত্মবিস্মৃত হইয়া, কেবলমাত্র পরকীয় সজ্জায় সজ্জিত হইয়াও আজ অন্নের জন্য লালায়িত। আজ চাকুরী তাহার পক্ষে প্রায় অলভ্য; ব্যবসা বাণিজ্য সে শিক্ষা করে নাই, কাজেই সে পন্থায় অর্থোপার্জ্জন তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে স্ব-ইচ্ছায় পল্লী ধ্বংস করিয়াছে, কাজেই কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব নহে। সংক্ষেপতঃ, তাহার পক্ষে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকার উপায় উদ্ভাবন করাই এক মহা সমস্যার কথা হইয়া পড়িয়াছে। তারপর রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে ইংরেজ ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে; সুতরাং দেশের লোক যে কেবল জীবন-ধারণোপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কোন রকমে বাঁচিবে তাহাও আর সম্ভব নহে। কাজেই দেশের লোকের সম্মুখে গভীর সমস্যা উপস্থিত। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে হিন্দুকে যেমনই ব্যষ্টির জীবন রক্ষা করিবার উপায় বাহির করিতে হইবে, তেমনই সমষ্টির স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। এখন যদি হিন্দু আবার হিন্দু হিসাবে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতে না পারে, তবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই বিনাশ অনিবার্য্য। ইংরেজ যখন অভিভাবক হিসাবে জাতি ও ধর্ম্মের কোন ধার না ধারিয়া যাহার সাহায্যে তাহার কার্য্য হাসিল হইয়াছে তাহাকেই যত্ন আদর করিত, তখন দিন

চলিত; কিন্তু এখন আর চলিবে না। কেন না, এখন ইংরেজ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই বলিতেছে—"তোমরা এখন যে যাহার কড়া গণ্ডা বুঝিয়া লও।" এই ডাকে যদি হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধভাবে সাড়া না দিতে পারে, তবে তাহাকে বাঁচাইবার কেহ নাই। তাই এত দিন পরে আবার হিন্দুকে হিন্দু হিসাবে দাঁড়াইতে হইবে। তাহা সম্ভব হইবে কি?

প্রতিবেশীর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হিন্দুর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গদেশে শতকরা ৫৪ জন মুসলমান আর ৪৫ জন হিন্দু, বাকী ১ জন অন্যান্য-ধর্ম্মী লোক। এই ৪৫ জন হিন্দুর মধ্যে বোধহয় ৫ জনও এমন নাই, যাহারা হিন্দুর ধর্ম্মে, বৈশিষ্ট্যে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত। পক্ষান্তরে, ৫৪ জন মুসলমানের মধ্যে নিশ্চিত ৫৩ জন সর্ব্ব-হিসাবে মুসলমান। তাহারা স্বীয় ধর্ম্মে আস্থাবান্, পূর্ব্বপুরুষদিগের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মুসলমান জাতীর বৈশিষ্ট্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ, পল্লী-বাসী, কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যে রত এবং দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রগামী হইতে চেষ্টিত। হিন্দু পল্লীতে এখন আর সন্ধ্যায় দেবতার আরতি হয় না; কিন্তু মুসলমান-পল্লীতে সন্ধ্যার 'ওয়াজ' ডাকে, যে যেখানে থাকে সাড়া দেয়। হিন্দু আর ত্রিসন্ধ্যা করে না; কিন্তু মুসলমানের পাঁচবার নমাজের ভুল হয় না। চাকুরী-জীবী হিন্দু ইংরেজের আফিসে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কলম পিশে; কিন্তু চাকুরীজীবী মুসলমান কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জুম্মা-নমাজের জন্য আফিস হইতে বাহির হইয়া যায়। ইংরেজীতে প্রবাদ-বাক্য আছে—"God helps them who help themselves."—মুসলমান-দিগের পক্ষে এ প্রবাদ-বাক্য সফল হইয়াছে। সমাজের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য দরদী মুসলমান যাহা চাহিতেছে তাহাই পাইতেছে। সরস্বতী পূজার দিনে কলম ছুঁইবে না, এ প্রতিজ্ঞা হিন্দু করিলে ইংরেজ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে; কিন্তু "শুক্রবার বেলা ২ টার সময়ে আমি সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া নমাজ পড়িব", মুসলমানের এ প্রতিজ্ঞা যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য ইংরেজ আইন আদালতের কার্য্য পর্য্যন্ত ঐ সময়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সঙ্ঘবদ্ধ, স্বধর্ম্মানুরাগী, স্বীয় বৈশিষ্ট্যরক্ষণে কৃতসঙ্কল্প সামাজিক মুসলমান যাহা চাহিতেছে তাহাই পাইতেছে—আর হিন্দু?

শাসন-সংস্কারে ভাগ-বাটোয়ারার যে ফিরিস্তি বাহির হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর যে অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া অনেক মহারথীর আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে এবং উহার রদ বদল করিবার জন্য অনেকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হইবে না, কিছুই হইবে না, হইতেই পারে না। যাহার ব্যক্তিত্ব, যাহার সমাজ, যাহার ধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই এবং যাহার জাতীয়ত্বই নাই, তাহার কথা কেহ শুনিবে না। ইংরেজ জানে যে, বাঙ্গালী হিন্দু মরিয়াছে; তাহার সমাজ নাই, সংহতি নাই, একনিষ্ঠা নাই এবং তাহাকে উপেক্ষা করিলে কোন আশঙ্কার কারণ নাই—কাজেই তাহার আবেদন নিবেদনের কোন মূল্যও নাই। এমন লক্ষ্মীছাড়ার দলকে উপেক্ষা করিবে না কেন? পক্ষান্তরে মুসলমানের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলা দেশের মাত্র দুইজন হিন্দু মাতব্বর বিলাতে যাইয়া মিলিত ভাবে কোন কথা বলিতে পারেন নাই; পক্ষান্তরে মুসলমানদের পক্ষে মাননীয় আগা খাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া অছিমদ্দী, করিমদ্দী পর্য্যন্ত একই সুর ভাঁজিয়াছেন। তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিবার মত সাহস কাহার থাকিতে পারে? কাজেই হিন্দু যতই লম্বা বক্তৃতা করুক, যতই গবেষণাপূর্ণ প্রসঙ্গ লিখিয়া রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিক্ এবং যতই ইংরেজের অবিচারের কথা বলিতে বলিতে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করুক, কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করিবে না। হিন্দু ব্যক্তিগত এবং বড় জোর দলগত ভাবে করিতেছে **ভিক্ষা**; আর মুসলমান ব্যক্তিগত, দলগত, সমাজগত এবং ধর্ম্মগতভাবে করিতেছে **দাবী**। ভিক্ষার চাল কাড়া কি অকাড়া, ভিক্ষুক তাহার বিচার করিতে বসিলে গৃহস্থ তাহাকে প্রাঙ্গন হইতে দূর করিয়া দেয়; কিন্তু দাবীদার যদি প্রাপ্ত চাউলের প্রত্যেকটি পরীক্ষা করিয়া লইতে চাহে, তবে দেনদার তখনই কুলা হাতে করিয়া চাউল ঝাড়িতে বসিয়া যায়। বাংলার হিন্দুর পক্ষে হিন্দু হইতে না পারিলে, স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ হইতে না পারিলে, স্ব-সমাজ সমৃদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প না হইলে, স্বীয় বৈশিষ্ট্যে গৌরব বোধ করিতে না শিখিলে,

তাহার আর কোন আশা নাই। যাহার ধর্ম্মনীতি নাই ও সমাজনীতি নাই, তাহাকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে কেহ আর গ্রাহ্য করিবে না। কাজেই এই দেড় শত বৎসর কালের দিনে দিনে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে আমরা যাহা হেলায় হারাইয়াছি তাহা যদি ফিরাইয়া আনিতে না পারি, তাহা হইলে বাংলার হিন্দু চিরদিনের জন্য গেল। অধর্ম্মী, অসামাজিক, সংহতিহীন, পরকীয় সাজে সজ্জিত হিন্দু জগতের বিভিন্ন দেশে যাইয়া হয়ত কোনরূপে বাঁচিবে এবং স্বদেশে যাহারা থাকিবে তাহারাও হয়ত কোনরূপে জীবন ধারণ করিবে; কিন্তু জাতি-হিসাবে কেহ কোথাও তাহাকে গ্রাহ্য করিবে না। মুখ ফিরাইতে না পারিলে বাঙ্গালী হিন্দুর দশা য়িহুদীর মতই হইবে। পত্রান্তরে লিখিয়াছিলাম—"Jews are good citizens everywhere in the world, but as a people they have no *locus standi* either at Palastine or anywhere else." বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থাও তাহাই হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কি করিলে বাঙ্গালী হিন্দু বাঁচিতে পারে? সময়ান্তরে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রবর্ত্তক

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়
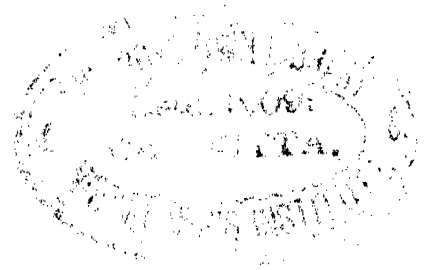
ভারতের প্রাণ লোকে হে বাণীর শ্রেষ্ঠ দেবদূত
তব দীপ্ত আবির্ভাবে শুনিয়াছি বারতা অদ্ভুৎ
জীবনের সাধনার; এ জাতির আত্মবিস্মৃতিতে
চেতনার শঙ্খরোল তুমি দিলে কথার সঙ্গীতে!
শাশ্বত যে প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞান গরীমায়
অতীত যে প্রাণ-তন্ত্রী সত্যের আহ্বানে মুখরায়!
তারে তুমি বুঝায়েছ তব তীব্র বাণীর কল্লোলে
তোমারি অমৃত স্পর্শে সুপ্ত সিংহ কেশর আন্দোলে!
লভিতে অপার মুক্তি রাষ্ট্রের নিগূঢ় অর্থখানি
অক্ষরে অক্ষরে তব পলে পলে হয়ে ওঠে বাণী!
অন্যায় করিতে লুপ্ত বল-ক্ষিপ্ত তব অভিযান
আজি গায় প্রাণে প্রাণে জ্যোতির্ম্ময় আলোকের গান!
সত্য শিব সুন্দরের তপস্যার তুমি প্রবর্ত্তক
নির্ভীক উদাত্ত তব কণ্ঠধ্বনি বিধুনিত হোক!

নীতির মর্ম্মের মূলে দলিত এ জীবনের পরে
তোমার কল্পনা যেন নিত্য নব আদর্শ বিতরে!
বিভ্রান্ত মোদের পথে কল্যাণের জয়পথ ধরি
নীরন্ধ্র জীবনাকাশে সূর্য্য হয়ে নাও অপহরি!
শূন্যতা, ক্ষুদ্রতা আর ধর্ম্মনামে অধর্ম্মের ভার
হে জাতির জ্ঞান-যোগ মৃত্যু হতে সুধার উৎসার!
তুমি আন তৃষ্ণার্ত্ত এ আমাদের অন্তর সম্মুখে
বিপুল বিশ্বাস দাও আত্মোপলব্ধি ভরা বুকে!
শক্তি দাও সব কাজে হে বাঙ্ময়, তব বাণী দিয়া
জীবন্ত মৃত এ জাতি নব প্রাণে তোলো সঞ্জীবিয়া!
নব জীবনের প্রাতে সকল ভীরুতা যাক্ দূরে;
বাজুক ভারবোধ মহাশিব ডমরুর সুরে!
প্রবর্ত্তক মন্ত্র দাও, দীক্ষা দাও মায়ের মন্দিরে,
মুক্তি দাও বন্ধনেরে, প্রাণ দাও মরণের শিরে!
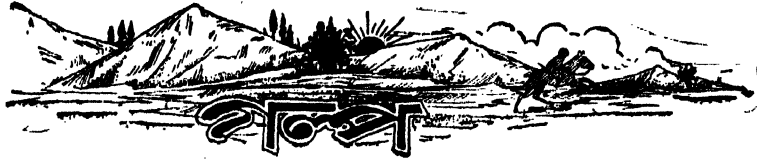
সময়-সমুদ্র

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নতুন ডাক্তার হ'য়ে বৌবাজারে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে বসেছি। পসার না বাড়লেও প্রসার হয়েছে প্রচণ্ড, অর্থাৎ আত্মীয় থেকে সুরু করে' সামান্য মুখ-চেনাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে গিয়ে দু' বেলা রুগী দেখা আসতে হচ্ছে। হাসপাতালে কা'র জন্যে বেড্ জোগাড় করে' দিতে হ'বে, কা'র দিতে হ'বে চশমার পাওয়ার ঠিক করে', কা'র ছেলে ক'বার বেশি হেঁচেছে—আমাকে ডাকলেই হ'লো, আমি এক পায়ে খাড়া আছি। বলতে কি, পেট্রোলের দামটাও আমার পোষাতো না, কিন্তু আপত্তি করে'ও বিশেষ লাভ নেই। অন্ততঃ একশোটা রুগীর না গতি করলে ধন্বন্তরী হওয়া যায় না, তারি অভিজ্ঞতা কুড়োবার জন্যে বিনি পয়সায় অনেকটা ক্ষেত্র অধিকার করে' বসেছিলুম। তবে দুঃখ এই, তেমন একটা সৌভাগ্যের সুযোগ হাতের কাছে এসে পড়লেও, শেষ পর্য্যন্ত যশটা অন্য হাতে চলে' যেতো। অর্থাৎ রুগীর একেবারে নাভিশ্বাসের জোগাড় হ'লে ডাক পড়তো বড়ো ডাক্তারের; আমি মিনিটের কাঁটার মতো বাট ঘর ঘুরে এলে উনি এসে দয়া করে' ঘণ্টা বাজিয়ে যেতেন।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এমনি এক কল্-এ সেদিন দর্জ্জিপাড়ায় যেতে হয়েছিলো। আমার মা'র কোন এক গ্রাম্য সখী—ছেলেবেলায় তাঁকে নাকি মাসীমা বলতুম—সেই অপরাধে তাঁর ছোট ছেলেকে গিয়ে দেখে আসতে হ'বে। ভজহরির আজ সাত দিন ধরে' এক নাগাড়ে জ্বর—একজন ডাক্তার না দেখালে নাকি আর চলছে না।

গেলুম সেই দর্জ্জিপাড়া—আমার বেবি-অস্‌টিন্‌টা বহু কষ্টে সেই অপরিচ্ছন্ন সরু গলিটায় এসে ঢুকলো। পথ চিনে ডাক্তার আসতে পারলেও, মৃত্যু যে আসতে পারবে না তা নিঃসন্দেহ। বাইরে এখনো দিব্যি খটখট করছে রোদ, কিন্তু এরি মধ্যে এ অঞ্চলে রাত নেমে এসেছে। মাটির সঙ্গে সমতল বাড়ীটার ভিৎ, সকাল-বেলাকার বৃষ্টির জল এখনো উঠোন থেকে সরে' যায় নি। চাপা, বন্ধ, হুমড়িখাওয়া একটা বাড়ী, দেয়ালে যা দুয়েকটা ফোকর আছে সব সময়েই বন্ধ করে' রাখতে হয়, কেননা জানলা খুললেই ওপারে একটা আস্তাবল। ছাতে এদের দরকার নেই, ছাত নিতে হ'লে নাকি আরো সাড়ে তিন টাকা বেশি লাগবে—আলাদা কল আর পাইখানা যে পেয়েছে তাই তাদের কাছে স্বর্গ, কেননা ও-অঞ্চলে ঐ দুটো উপস্বত্ব নাকি এজমালিতে ভোগ করতে হয়। বাড়ীর চেহারা দেখে তক্ষুনি পালিয়ে যেতুম হয়তো, কিন্তু—বাড়ীতে ঢোকবার আগেই তাড়াতাড়িতে বাড়ীর ভিতরকার চেহারাটা বর্ণনা করে' ফেলেছি।

কড়া নাড়ছি, দরজা খুলে ফেলেই কিশোরী একটি বৌ ত্রস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি এঁটো, নোংরা হাতে বুকের উপর একহাত ঘোমটা টেনে দিলো।

হ্যাঁ, সেই কথাটাই আগে সেরে নেয়া দরকার।

অপ্রতিভ হ'য়ে মাসিমার কথা জিগগেস করলুম; বললুম—এইখেনেই কি তিনি থাকেন?

বৌটি তার ঘোমটা সঞ্চালন করে' সামনের খোলা কলতলায় বাসনের পাঁজা নিয়ে বসলো।

মাসিমাকে ডেকে দেবার দরকার ছিলো না, তাঁর ঘরের উপরেই প্রায় সদর। ব্যস্ত হ'য়ে তিনি ডাক দিলেন: আয় মহিম, ভেতরে চলে' আয় সোজা।

অন্ধকার যে শুধু আলোর একটা সাময়িক অভাব নয়, একটা স্পর্শসহ স্থূল উপস্থিতি—সেই ঘরে ঢুকে প্রথম অনুভব করলুম। মেঝের উপর মাদুর পেতে ছ'-সাত বছরের একটি রোগা ছেলে আগাগোড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, পাশে বসে' মাসিমা পাখা করছেন।

পা দুটো লম্বা করে' কোনোরকমে এক পাশে বসে' পড়লুম। বললুম—এরি জর বুঝি?

মাসিমা বললেন—হ্যাঁ। এমনিতে তো আর আসবিনে, তবু যদি রুগীর গন্ধ পেয়ে তোদের একটু কর্ত্তব্যজ্ঞান হয়।

অকালে ল্যাম্প জেলে ছেলেটিকে আগাগোড়া পরীক্ষা করলুম। বললুম—কোনো ভয় নেই, আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, সেরে যাবে।

—দেখবো কেমন পাশ করেছিস।

বললুম—একখানা কাগজ দাও দিকি?

মাসিমা চারিদিক চাইতে চাইতে বললেন—কাগজ কোথায় পাবো? ও সব আর তোর কষ্ট করে' লিখতে-টিকতে হবে না, মনে করে'ই রাখ্। কাল একেবারে ওষুধ তৈরি করে' নিয়ে আসবি, কেমন? বলে'ই তিনি কলতলাকে সম্বোধন করে' লম্বা গলায় হাঁক দিলেন: তোমার দেখি এখনো বাসন মাজাই শেষ হ'লো না। কখন উনুন ধরিয়ে মহিমকে এক পেয়ালা চা করে' দিতে পারতে। এতো বড়ো একটা ডাক্তার আজ তোমার বাড়ি এসেছে—

চায়ের জন্যে পরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে' উঠতে-উঠতে বললুম—বেশ, কালকেই আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেবো। দিন দুই পরে আমাকে আবার খবর দিয়ো। কিন্তু, গলা খাটো করে' বললুম—এই বাড়িটা ছাড়ো, মাসিমা।

—কেন? মাসিমা প্রশ্নের তাৎপর্য্য যেন কিছুই অনুধাবন করতে পারলেন না।

ডাক্তারি গলায় বললুম—একদম আলো হাওয়া আসতে পারেনা, এমন বাড়িতে থাকলে রোগ যে তোমাদের কিছুতে ছাড়বে না।

—তাই বল্। মাসিমা আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন—আমি ভাবলুম বুঝি ভূতের বাড়ি-টাড়ি হ'বে।

—তা ছাড়া আবার কী! রোগই তো আমাদের জীবনে জ্যান্ত ভূত।

—কী যে বলিস্! মাসিমাও উঠে পড়লেন: দস্তুর-মতো আঠেরো টাকা ভাড়া। আলাদা কল-পাইখানা, সব আমাদের একলার। এতোখানি সুবিধে এতো অল্প টাকায় কোথায় আর পেতুম শুনি? নরহরি যে এতো-দিনে চাকরি পেয়ে কলকাতায় বাসা ভাড়া করে' আমাদের খাওয়াতে-পরাতে পারছে তাই ঢের। বাড়ি—বাড়ি নিয়ে বাবুগিরি করে' কী হ'বে? মিছিমিছি কতোগুলি টাকা জলে ফেলা দেয়া শুধু।

আর কিছু না পেয়ে বলে' বসলুম: ঐ বুঝি নরহরির বৌ?

—হ্যাঁ, বছর দুই হ'লো ছেলেটার বিয়ে দিয়েছি যে। তা ছেলের ভাগ্য ভালো, বিয়ে করতে-না-করতেই চাকরি পেয়ে গেছে। কিন্তু অলক্ষ্মীটা এখনো স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে পেলো না।

কথাটার কোনো কিনারা করতে পারলুম না। জিগ্গেস করলুম: তার মানে?

অর্থটা মাসিমা বিশদ করে' দিলেন: গোড়াতে নরহরির তো কলকাতাতেই কাজ হয়েছিলো, কয়েক মাস, তারপরই ঠেলেছে ওকে সেই অমৃতসর। ক্যান্ভাসারের কাজ কিনা, ছুটি নেই। তা, ছেলে মাস-মাস টাকা পাঠাচ্ছে ঠিক।

বললুম—তার জন্যে বৌ তোমার অলক্ষ্মী হ'য়ে গেলো? ওর জন্যেই তো নরহরির এই চাকরি, ওকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেই পারো।

মাসিমার কণ্ঠস্বরে তাঁর মুখবিকৃতিটা টের পেলুম: আহা, আর রোগা স্বামী-পুত্র নিয়ে আমি এখানে ফ্যা-ফ্যা করি। কী একখানা সোহাগের কথাই বল্‌লি, মহিম।

নিতান্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলুম, বাসন ফেলে কলের জলে হাত ধুয়ে সেই বৌটি হঠাৎ আমার সামনে এসে পথরোধ করে' দাঁড়ালো। মাসিমার দিকে চেয়ে প্রখর গলায় বল্‌লে—বাড়িতে তো খুব বড়ো ডাক্তার এসেছে বললেন, এক পয়সা ভিজিট লাগ্‌বে না, আমাকে দয়া করে' একবারটি দেখতে বলুন না।

আকস্মিক সেই কথার দীপ্তিতে মাসিমার যেন কেমন ধাঁধা লেগে গেলো। এক সেকেণ্ড চুপ করে' থেকে তিনি ঝাঁজিয়ে উঠলেন: বাবাঃ, কী নির্লজ্জ জাঁহাবাজ মেয়ে! কী একখানা তেজ!

বৌটি নির্ভীক, নিষ্ঠুর গলায় বল্‌লে—বাঃ, অসুখ হ'লে ডাক্তারকে বলবো না? আর সেই ডাক্তার যখন বিনি-পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে?

মাসিমার দিকে চেয়ে অভিভূতের মতো বললুম—কী অসুখ?

—হিষ্টিরিয়া, হিষ্টিরিয়া—ধরন-ধারন দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না? মাসিমা মুখ বেঁকিয়ে বললেন: আজ-কালকার বৌয়েদের যা ঢঙ হয়েছে। একটুতেই তাঁদের বুক ধড়ফড় করে, চোখে অন্ধকার দেখেন, মাথা ঘুরে পায়ে-পায়ে পাক খেয়ে টলে'-টলে' পড়ে' যান। আক্রোশটা দাঁত দিয়ে চেপে রেখে তিনি ফের বললেন—ত্যাখ দিকি ওর হাতটা, ডাক্তার না দেখালে সোহাগিনীদের আর সখ মেটে না। বলে' আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি চোখ টিপে দিলেন।

ইঙ্গিতটা আমার বুঝতে দেরি হ'লো না। বৌটির দিকে ডাক্তারি ভঙ্গিতে আধখানা হাত বাড়িয়ে দিলুম।

আমার হাতের মধ্যে বৌটি সহজ অসঙ্কোচে তার হাতখানি ফেলে দিলো। অন্ধকারে তার মুখের চেহারা চোখে ধরা পড়ছিলো না, কিন্তু সেই ভেজা, শিথিল-স্তিমিত স্পর্শে তাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম। তার নাড়ির সেই মৃদুল চাঞ্চল্যে শুনতে পেলুম যেন তার দুর্ব্বল দীর্ঘনিশ্বাস। তার স্রোতহীন বন্দী জীবনধারা যেন শুকিয়ে শীর্ণ হ'য়ে এসেছে। মনে হ'লো খাঁচার মধ্যে ভীরু একটা পাখি দেয়ালে পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছে।

একপাত পাংশু শীর্ণতা, সেই স্পর্শে তার শরীর যেন সহসা উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। হাতটা ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারি নিষ্প্রাণ গলায় বললুম—কিছু না।

মাসিমা খুসিতে বিস্ফারিত হ'লেন: বেহায়া বৌদের এ-সব হালি ফ্যাসান্। কেমন, হ'লো তো এবার? এ তোমার হাতুড়ে নাপ্‌তে-ডাক্তার নয়, দস্তুরমতো ছুরি-কাঁটা চালানো পাশ-করা ডাক্তার। এদের মুখের একেকটা কথা বেদবাক্যি, বুঝলে? যাও, এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘর-কন্না করো গে যাও।

বৌটি আবার তার বাসন নিয়ে বস্‌লো।

বাড়ি থেকে বেরোতে যাচ্ছি, পেছন থেকে বৌটি বলে' উঠলো: দাঁড়ান, দরজাটা বন্ধ করে' দি।

দরজার ও-পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আমার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে' দিতে-দিতে বৌটি চাপা, ক্রুদ্ধ গলায় বল্‌লে—ছাই ডাক্তার! নাড়ি টিপে হার্টের অসুখ বোঝেন। আমি বলে কিনা রাত-দিন ছটফট্ করে' মরছি, আর উনি বললেন কিনা কিছুই হয়নি। চোখ থাকলে তো বুঝবেন। পাশ করা না হাতি!

দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো। স্তম্ভিতের মতো সেদিকে চেয়ে রইলুম।

ভজহরির ওষুধটা নিয়ে পরদিন আমাকেই যেতে হ'লো। দুপুর বেলা—বোধহয় আকাশের আলো ও-বাড়ির সঙ্কীর্ণ অবকাশে এখনো একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় নি। চোখ যে আছে, সে-কথাটা সপ্রমাণ করতে হ'বে।

স্বর্ণই এসে দরজা খুলে দিলো। তেমন চোখ যে মানুষের হ'তে পারে প্রত্যক্ষ দিনের আলোয় তা কোনো সুস্থ লোকের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত পিপাসা যেন সেই দুই চোখে জমে' পাথর হ'য়ে আছে। সেই কাঠিন্যে ঘা খেয়ে আমার চোখের দৃষ্টি যেন ব্যথায় টন্‌টন্ করে' উঠলো। বললুম,—মাসিমা কোথায়?

সুবর্ণ ফিরে যেতে-যেতে বললে,—তাঁর প্রাত্যহিক দিবা-নিদ্রা দিচ্ছেন।

উঠোনটা পেরিয়ে আসতে-আসতে বললুম,—তোমার শ্বশুরমশাই ?

—তিনিও তথৈবচ।

জিগ্‌গেস না করে' পারলুম না : আর তুমি ঘুমোও নি যে ?

তার সেই শুষ্ক, শাণিত চোখ দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত বিদ্ধ করে' সে বল্‌লে,—আমাকে দেখে আপনার মনে হয় আমি কোনোদিন একফোঁটা ঘুমুতে পারি ? নাড়ি দেখে হার্ট বুঝতে পারেন, আর চোখ দেখে এটা বুঝতে পারেন না ?

বলে' শরীরময় রুক্ষ ক'টি রেখার তীক্ষ্ণ ফলায় আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে' দিয়ে সুবর্ণ পাশের ঘরে অন্তর্ধান করলে।

ঘরে গিয়ে মাসিমাকে জাগালুম। ভজহরির জ্বরটা আজ বেড়েছে দেখছি। বল্‌লুম,—গ্লাশ নেই, অন্তত চায়ের একটা পেয়ালা দাও, ওষুধ একদাগ খাইয়ে দি। চার ঘণ্টা অন্তর ওষুধটা বার তিনেক খাইয়ে দিলেই জ্বরটা পড়ে' যাবে দেখো।

পেয়ালার উদ্দেশে মাসিমা সুবর্ণকে ডাকতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও তার কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

—সুন্দরী বোধহয় জানলায় উদাসিনী হ'য়ে বসে' আছেন।

কিন্তু উদাসিনী বলে' তাকে আর অবহেলা করা গেলো না। হঠাৎ পাশের ঘরে অসহায় কান্নার চাপা একটা গোঙানি শুনতে পেলুম। মনে হ'লো কে যেন আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করতে যাচ্ছে, আর কে ধরেছে দুই হাতে সজোরে তার মুখ চেপে। কান্নার চেয়ে তার সেই প্রাণ খুলে কাঁদতে না-পারার অক্ষমতাটাই যেন অসহ্য লাগছিলো।

—ন্যাকামো করে' এখন কাঁদবার কী হয়েছে! মাসিমা ধম্‌কে উঠলেন।

কিন্তু সাধারণ কান্নার মতো এ শোনাচ্ছে না, তার চেয়ে এ যেন অনেক শোকাবহ। মানুষের একেকটা কৃত্রিমতা অনেক প্রত্যক্ষ সত্যের চাইতে গভীর।

মাসিমা নিজেই পেয়ালা আনতে পাশের ঘরে গেলেন। সুবর্ণকে শাসন করবার পর্য্যন্ত তাঁর সময় হ'লো না, গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন : শিগগির দেখে যা মহিম, বৌ কী রকম করছে ছাখ্ এসে।

যেন এই মুহূর্ত্তটিরই প্রতীক্ষা করছিলুম। কিন্তু যা দেখলুম, ক্ষণকালের জন্যে পৃথিবীর স্বাভাবিক অনুপাত গেলুম ভুলে, চেতনার দৃঢ় মানদণ্ডটা যেন ভেঙে গেলো। দেখলুম সুবর্ণ তার ছেঁড়া ময়লা সাড়িতে অনাবৃত পিঠে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে, তার এক রাশ চুল ধুলোয় রয়েছে এলোমেলো, হাত-পা ছুঁড়ে ঘরের জিনিস-পত্র সব তছ্‌নছ্, ছত্রখান করে' দিয়েছে। দেখে মনে হ'লো সমস্তটা দৃশ্য তার নিজের হাতে সাজানো, তার বেশের এই দীনতা, তার কান্নার এই কাকুতি, তার চারপাশের এই বিশৃঙ্খলা। রূঢ় নির্লজ্জতায় নিজেকে উদ্ঘাটিত করে' দেবার জন্যে যেন সে হঠাৎ মরিয়া হ'য়ে উঠেছে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সুবর্ণ আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লো : দেখুন, দেখুন এসে শরীরটা আমার কেমন করছে। আমি আর বাঁচবো না। দয়া করে' আমার মাকে একবারটি খবর দিন্, বিয়ে হওয়ার পর থেকে তাঁকে আমি একটিবারো এখনো দেখি নি। এই কাশীপুরেই তাঁরা থাকেন, একবার, মরবার আগে শুধু একটিবার তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

সঙ্কোচ বা সৌজন্যে নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলুম না। ষ্টেথিস্কোপ লাগিয়ে তার হার্ট পরীক্ষা করতে বসলুম।

কিন্তু যা দেখবার তা আমি আগেই দেখে নিয়েছি। সুবর্ণ তার বিবাহিত জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠা নিখুঁত অক্ষরে আমার চোখের সামনে মেলে ধরেছে।

দেখলুম তার বুকের পাঁজর ক'খানা শুকনো য়্যানাটমির একটা পৃষ্ঠা, তাতে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নে তার জীবনের ইতিহাস রয়েছে মুদ্রিত। আজ আর চোখ নেই বলে' সুবর্ণ আমাকে বিদ্রূপ করতে পারবে না। আমি নাকি

ডাক্তার, লোকের শারীরিক ক্লেশমোচনই নাকি আমার ব্রত, তবে কী বলে' আমি এই উৎপীড়ন সহ্য করবো?

মাসিমা উদ্বিগ্ন হবার ভাণ করে' বল্‌লেন—কেমন দেখলি?

বলে' কালকের মতো আবার তিনি চোখ টিপতে যাচ্ছিলেন, স্বর্ণ উঠে বসে' একেবারে আমার মুখের উপর ঝাঁজিয়ে উঠলো: বলুন, কিছু নয়? বলুন, আমি দিব্যি ভালো আছি?

—কিছু নয়ই তো। মাসিমা উঠ্‌লেন খেঁকিয়ে: ভালো না থাকলে রুগী আবার অমনি লাফ দিয়ে উঠে বসতে পারে নাকি? তুমি পাশ-করা ডাক্তারের চোখে ধুলো দিতে পারবে ভেবো না। সঙ্কেতে চোখদুটো তীক্ষ্ণ করে' মাসিমা আমার দিকে চাইলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বললুম—না, হার্টের অবস্থাটা বিশেষ ভালো দেখলুম না। দিন কতক ওর বিশ্রাম দরকার।

স্বর্ণের শরীরে যেন খুসির বাতাস দিলো, মুখে এসে পড়লো এক ঝলক ঝিল্‌মিলে রোদ। তাড়াতাড়ি গা-ময় আঁচল রাশীভূত করে' সানন্দ লজ্জায় সে বিহ্বল হ'য়ে উঠলো।

মাসিমা মুখ বেঁকিয়ে বললেন—তোদের যেমন বড়ো-বড়ো সব কথা। বইয়ের থেকে রাজ্যের কতোগুলি বুলি মুখস্ত করে' রেখেছিস। জ্বর নেই জারি নেই, জ্যান্ত লোকটা দিব্যি হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে, ওর আবার ভালো দেখ্‌লি না কী?

স্বর্ণ মুচ্‌কে হেসে বল্‌লে—পাশ-করা ডাক্তার যে, মা। ওঁদের রোগ দেখা কি কখনো ভুল হ'তে পারে?

গলায় আরো জোর দিয়ে বললুম—সত্যি মাসিমা, শরীর ওর ভালো নেই। দম না থাকলে ঘড়ি যেমন বন্ধ হ'য়ে যায়, তেমনি বিশ্রাম না পেলে ও-ও একদিন বন্ধ হ'য়ে যাবে।

—তা গেলে তো বুঝতে পারি। মাসিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: কিন্তু দিব্যি জলজ্যান্ত লোকটা, দু' বেলা পেট পুরে ভাত খাচ্ছে, হজম করছে, তার আবার শরীর ভালো নেই কী? দাঁড়াও না, মাসিমা এবার স্বর্ণকে লক্ষ্য করে' বললেন—তোমাকে ভালো করছি। দু'দিন খাওয়া বন্ধ করে' দিলেই তোমার সমস্ত রোগ সেরে যাবে।

—তা লোক মরে' গেলে তার সমস্ত রোগ একদিনেই সেরে যায় বৈ কি। স্বর্ণ কথাটা বলে' ফেলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

—তুমি বুঝছ না মাসিমা, বিছানা যদ্দিন ও নিচ্ছে না, ততোদিনই ও কোনোরকম টিঁকে আছে, স্বর্ণর জন্যে ম্লান কণ্ঠে অনুনয় সুরু করলুম: কিন্তু বিছানা একবার নিলে আর ওকে তুলতে পারবে না। আমি বলি কি, দিন কয়েকের জন্যে ওকে আর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

মাসিমা গর্জ্জন করে' উঠলেন: আর ওকে বাপের বাড়ি যেতে দেবো?

—কেন, ওর বাপের বাড়ি কী দোষ করলো?

—কী দোষ করলো! মাসিমা সর্ব্বাঙ্গে যেন দগ্ধ হ'তে লাগলেন: তুই তো আর কিছু জানিস না মহিম, শুধু গায়ে পড়ে' আদর দেখাতে আসিস্‌। ওর বাপ কী জোচ্চুরিটাই না আমাদের সঙ্গে করলে। দেখালে ফর্সা মেয়ে আর সভায় আনলে কি না এই শ্রীমতীকে। পাওনা-থোয়ার ব্যাপারেও দেখালে কাঁচকলা। মেয়ের গায়ে না দিলো একখানা গয়না, বাক্সে না দিলো একখানা সাড়ি। শুধু শাঁখা আর সিঁদুর দিয়ে মেয়েকে বিদেয় করলে গা। সেই চামার বাপের বাড়ি আবার আমি ওকে কোনোদিন যেতে দেবো ভেবেছিস?

বললুম—পাওনা-থোয়া নিয়ে আর কী করবে, মাসিমা? শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে স্বয়ং লক্ষ্মী তোমার ঘরে এসেছে, ওর ছোঁয়া লাগতে-না-লাগতেই তোমার নরহরির চাকরি হ'য়ে গেলো—

মাসিমা বললেন—ডাক্তারি করছিস্‌ কর্‌, এর মধ্যে আবার ওকালতি করতে আসিস্‌ কেন?

—হ্যাঁ, আগাগোড়া ডাক্তারিই তো করছি, মাসিমা। কয়েক দিনের জন্যে ওকে ওর মার কাছে রেখে এসো। বিয়ে হবার পর থেকে এখনো মা'র কাছে যেতে পাচ্ছে না, পরের বাড়িতে কয়েদীর মতো আটক হ'য়ে আছে, শরীর তাতে টিঁকবে কেন বলো? ফুস্‌ফুসের অবস্থাও খুব

খারাপ, যে কোনোদিন ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর দেখা দিতে পারে, মাসিমা।

—পরের বাড়ি, সোয়ামির ঘর তার পরের বাড়ি হ'লো? মাসিমা ঝল্‌সে উঠলেন: খুব বিদ্বান হয়েছিস যা-হোক্‌। নিজে বিয়ে করিস্‌ নি কিনা তাই খুব ফুটুনি করছিস্‌। বেশ তো—ঐ মা-মাগী আসুক না আমার বাড়ি, পায়ে ধরে' ক্ষমা চাক্‌ এসে, সব পাওনাপত্তর-কড়ায়-ক্রান্তিতে মিটিয়ে দিয়ে যাক্‌, নিয়ে যাক্‌ তাদের মেয়ে—কে চায় তাকে ধরে' রাখতে, নরহরিকে আবার আমি বিয়ে দিতে পারি না?

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—তা, বেশ, নরহরির কাছেই তো পাঠিয়ে দিতে পারো।

—আমাদের ছেলেরা তোদের মতো অতো বাবু হ'য়ে ওঠেনি মহিম, যে, বাপ-মা ফেলে বৌ মাথায় করে' নাচবে। কিছু কিছু তাদেরো আমরা শিক্ষা দিয়েছি।

তর্ক করা বৃথা, ভজহরি সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হ'লুম।

আমার যাবার জন্যে দরজা যেটুকু খোলা ছিলো, দেখলুম তারই ফাঁক দিয়ে স্বর্ণ যেন দূরতম দিগন্তের আভাস খুঁজছে। পৃথিবী এখনো ঘুরে চলেছে কিনা এইটেই যেন তার জান্‌বার বিষয়।

অন্ধ যেন তার চোখের নির্জ্জীব স্নায়ুগুলিকে অকারণ তীক্ষ্ণ করবার চেষ্টায় শ্রান্ত হ'য়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তেমনি শূন্য, বিবর্ণ চোখে তাকিয়ে স্বর্ণ বল্‌লে—রোগ নির্ণয় তো করলেন, দয়া করে' এখন তার প্রতীকারের ব্যবস্থা করুন।

বলে'ই হঠাৎ আমার খুব কাছে ঘেঁসে এসে সে আমাকে একটা রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর দিলে। বল্‌লে—ঐখেনেই আমার মা আছে, কাকারা আছে, আমার ছোট বোন ঝুমঝুমি আছে। তাদের সঙ্গে যদি আপনার কোনোদিন দেখা হয় তো বলবেন তাদের স্বর্ণর কোনো দুঃখ নেই। বলতেই তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুর দু'টি ধারা নেমে এলো।

আমি এর আগে এমন অশ্রুসিক্ত নিষ্ঠুর মুখ কখনো দেখি নি।

শুনতে পেলুম মাসিমা গর্জ্জন করে' উঠেছেন: ঠাট করে' তোমাকে আর সদর দিতে হ'বে না। এমন বার'মুখো বৌ বাবা, বাপের জন্মে দেখি নি। দিনে-দুপুরে কী কাণ্ডটাই না করলে! লজ্জায় আমারই মরে' যেতে ইচ্ছে করছে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে সেই স্যাঁতসেঁতে গলিটা থেকে বেরিয়ে এলুম।

কিন্তু কী আমি এর প্রতীকার করতে পারি?

'রোগ নির্ণয় তো করলেন, এখন দয়া করে' তার প্রতীকারের ব্যবস্থা করুন।' কথাটা সমস্ত দিনরাত্রি আমার রক্তে হাহাকার করতে লাগলো। কিন্তু কী আমি করতে পারি? সমস্ত মরুভূমি ঘুরে এককণা তৃণের এতটুকু ছায়া পেলুম না। নরহরিকে একটা চিঠি লিখলে পারি, কিন্তু তার বাপ-মা তাকে গৌরব করবার মতো শিক্ষা দিয়েছেন, তাই ভরসা হ'লো না। আর-এক, সেই রাস্তার ঠিকানায় খবর দিয়ে এলে হয়। কিন্তু খবরটা তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই নতুন নয়! মেয়ের বিয়ে দিয়ে এমন দু' চারটে যে অশান্তি ভোগ করতে হয় তা জেনে তাঁরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন।

কিন্তু প্রতীকার একটা করতেই হ'বে। তার সেই উগ্র, উন্মাদ চাহনি যেন আমাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নিতে দিচ্ছে না। চলতে-ফিরতে সেই পিপাসিত দৃষ্টি যেন সর্ব্বাঙ্গে দংশন করছে।

উপরে এককণা আকাশ নেই, চারপাশে নেই একবিন্দু বাতাস, দিনের পর দিন সেই মুহূর্ত্ত গণনার ক্লান্তি জগদ্দলন পাথরের মতো সারাক্ষণ আমার বুক চেপে রইলো। মনে হ'লো আমিই যেন দিনের পর দিন স্বর্ণের মতো হাতড়ে-হাতড়ে ঘরের কঠিন দেয়ালে আকাশ খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমার উপরে যেন সময়ের একটা বিশাল পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে।

কিন্তু সঙ্কীর্ণ একটা উপায় শেষ পর্য্যন্ত বা'র করে' ফেল্‌লুম যা হোক।

পরদিন দুপুর বেলা সময় বুঝে দর্জ্জিপাড়ায় গিয়ে হাজির হলুম। দরজার উপর আজকের করাঘাতটা মৃদুতরো হ'লো। উপস্থিতিটা শেষ পর্য্যন্ত উচ্চারিত হ'লে না-হয় ভজহরির খোঁজ নেয়া যাবে।

দরজার উপর আঘাতের শব্দ শোনবার জন্যেই যেন স্বর্ণ দিন-রাত দেয়ালে কান পেতে থাকে।

স্বর্ণ এসে দরজা খুলে দিলো। আর যে আমাকে সে এ-বাড়ি দেখতে পাবে ঘুণাক্ষরেও যেন তা সে কল্পনা করতে পারতো না। ভীষণ অবাক হ'য়ে গিয়েছে দেখলুম।

খাটো গলায় বললুম—মাসিমা কোথায়?

স্বর্ণ দরজা আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বল্লে—তিনি প্রাত্যহিক দিবা-নিদ্রা দিচ্ছেন।

—তোমার শ্বশুরঠাকুর?

—তিনিও তথৈবচ।

—আর তুমি কী করছিলে?

—জান্লায় উদাসিনী হ'য়ে বসে' ছিলুম। বসে'-বসে' দেয়ালে পিঁপড়ে গুনছিলুম, কিন্তু, স্বর্ণ হঠাৎ যেন পথরোধ করে' দাঁড়ালো: আপনি আর কী করতে এসেছেন? আপনার এক দাগ ওষুধেই ঠাকুরপোর জর ছেড়ে গেছে। আর আমি তো ওষুধ না খেয়েই দিব্যি ভালো আছি।

হঠাৎ বলে' বসলুম: তোমার মা-কে একবার দেখতে যাবে?

—মা-কে? স্বর্ণ এমন করে' কথাটা বল্লে যেন তেমন কথা মানুষের শরীর নিয়ে বিশ্বাস করা যায় না।

বললুম,—হ্যাঁ, যদি বলো তো, আমার গাড়ি আছে, তোমাকে তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করিয়ে নিয়ে আসি। যেতে-আসতে কতোক্ষণ আর লাগবে, ততোক্ষণে ওঁদের কারুর ঘুমও ভাঙবে না। নিশ্চিন্ত আবার চুপি-চুপি তোমাকে এইখানে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

—মা'র সঙ্গে দেখা হ'বে? এ আপনি সত্যি বলছেন?

—হ্যাঁ, এ কী একটা এমন্ বেশি কথা, কাশীপুর এখান থেকে কতোটুকুনই বা রাস্তা। বড়ো জোর মিনিট দশেক। যাবে?

—যাবো। স্বর্ণ সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের বিচিত্রিত একটা পেখম মেলে ধরলো। সঙ্কল্প করতে তার একমুহূর্ত্তও দেরি হ'লো না। বল্লে,—আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

গাড়িতে বসে' আছি, কিন্তু ধারে-পারে স্বর্ণর আর দেখা নেই। তার যেমন ভাগ্য, হয়তো মাসিমা জেগে উঠেছেন। হয়তো ভজহরি বেয়াড়া একটা কোনো ফরমাজ করে' বসেছে।

হয়তো মাতা-পুত্রীর সেই অশ্রু-উত্তপ্ত মিলনের প্রথম শিহরণটা আমি আমার স্নায়ু ভরে' আস্বাদ করতে পারলুম না।

কিন্তু না, কতোক্ষণ বাদেই স্বর্ণ এসে হাজির। তার দিকে চেয়ে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, তায় এতো ঘটা করে' সাজবার কী হয়েছিলো?

দরজাটা খুলে দিতেই সে আমার পাশের সিটে এসে বসলো। ষ্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে গলির মোড় ঘুরিয়ে বড়ো রাস্তায় নিয়ে এসে জিগ্গেস করলুম: এতো দেরি করলে কেন?

গতির প্রাবল্যে তার শরীর থেকে দীপ্তি যেন উছলে পড়েছে। হাসিতে ঠোঁট দুটি পিছল করে' স্বর্ণ বল্লে,—বা, এতোক্ষণ বসে' সাজলুম যে।

—কিন্তু এই কি তোমার সাজবার সময়?

—বা, চোখ দুটো একটু নাচিয়ে স্বর্ণ বল্লে,—কতোদিন পর এই বাইরে বেরুলুম বলুন তো। একটু সাজতে ইচ্ছে করে না?

গাড়িটা ধাবমান একটা তীরের মতো ছুটিয়ে দিলুম। বললুম,—বাড়ি ফিরেই কিন্তু তাড়াতাড়ি এই সব কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলো। মাসিমা যেন তোমাকে এই পোষাকে না দেখতে পান্।

ঠোঁট উল্টে স্বর্ণ বল্লে,—দেখতে পেলে তো আমার বয়ে' গেলো। আর আমি ওঁদের কেয়ার করি কিনা।

হ্যাঁ, স্বর্ণর শরীরে-মনে হঠাৎ একটা ফূর্ত্তির হঠকারিতা এসেছে। হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে তার ঘোম্টা, চুল হয়েছে বর্ষার মেঘের মতো এলায়িত। সে যেন

একমুঠো চঞ্চল হাওয়া, আমার পাশে বসে' অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। ছুঁড়ে মারছে তার কণা-কণা কথার কুচি, ছিটিয়ে দিচ্ছে তার রাশি-রাশি হাসির পাপড়ি। তার শরীরে আর একটিও নিষ্প্রভ, বিষণ্ণ রেখা নেই, হাসির শানে ছুরির ফলার মতো সব ঝক্‌ঝক্ করে' উঠেছে। নমনীয় এক পাত ইস্পাত, লীলায় সে পিছল হ'য়ে উঠেছে। নিজের মাঝে নিজে যেন সে আর আঁটছে না। কেন যে সে হাসছে তা সে নিজেই জানে না, কেন যে কইছে কথা তার কোনো কারণ নেই, একসময় হঠাৎ আমার মুখের কাছে মুখ এনে সে জিগগেস করলে: আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

—বা, বেশ মেয়ে যা হোক্। জানো না কোথায় যাচ্ছ ?

—না, সত্যিই জানি না।

—বা, তোমার মা'র কাছে। তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

—মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি? স্বর্ণ হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠলো: কিন্তু মা'র সঙ্গে দেখা করে' কী হ'বে ?

চম্‌কে তার মুখের দিকে তাকালুম। বললুম,—সে কী কথা ? তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

স্বর্ণ গতির উত্তালতায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, —জানি না কোথায় যাচ্ছি। যাচ্ছি, যাচ্ছি—শুধু এইটুকু আমি জানি। সব ফেলে, ছড়িয়ে, ছত্রখান করে' দিয়ে চলে' যাচ্ছি। আর থামবো না, আর ফিরবো না, একটানা এগিয়ে চলেছি শুধু।

—আর ফিরবে না কী বলছো তুমি ?

—না, সত্যি আর ফিরবো না। ফিরে কী আর হ'বে? স্বর্ণ অস্থির হ'য়ে উঠলো: এ কী, গাড়ি স্লো করে' আনলেন কেন ?

নিতান্ত অপ্রতিভের মতো জিগগেস করলুম: আর ফিরবে না মানে ?

আবার গাড়ি চলতে দেখে স্বর্ণ হাততালি দিয়ে উঠলো। বললে,—ফেরবার আর জায়গা কোথায়? জায়গা নেই, জায়গা আমি আর চাইও না। একবার বেরিয়ে যখন এসেছি, তখন আর ফেরা নেই। ফিরলেও আবার সেই বেরিয়ে আসতেই হ'বে।

অত্যন্ত ভীত, দুর্ব্বল বোধ করতে লাগলুম; বল্লুম, —বেরিয়ে এসেছো, ফিরবে না—বলছ কী এ-সব? তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করবে না ?

—যার জন্যেই বেরোই, সেই বেরিয়ে আসাই তা হ'লো। স্বর্ণর যেন নেশা লেগেছে: রাস্তায় পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার পেছনে ঘরের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে। হোক্ বন্ধ, কে আর ফিরতে চায় সেখানে? পৃথিবীতে আমাদের কতো জায়গা। গাড়ির মধ্যে ছোট-ছোট ছুটো লাথি মেরে নিতান্ত শিশুর মতো আবদারের সুরে স্বর্ণ বল্‌লে,—চালান্, আরো জোরে চালান্। আপনি এমনি মিইয়ে গেলেন কেন ?

গাড়িটা তাড়াতাড়ি অন্য রাস্তায় সোজা উল্‌টো দিকে ঘুরিয়ে নিলুম। উড়ে চললুম অগ্নিময় একটা স্খলিত নক্ষত্রপিণ্ডের মতো। মনে হ'লো পেছনে একটা অতিকায় কালো দৈত্য যেন আমাকে তাড়া করেছে।

সেই বেগের আবেগে সমস্ত শরীর থেকে কঠিন দীপ্তি বিকীরণ করতে-করতে প্রখর গলায় স্বর্ণ বলতে লাগলো: এতোদিন পরে আজ আমার ছুটি মিললো। কোথায় গেলো আমার বুকের ব্যথা, কোথায় রইলো আমার বাসন-মাজা। এক নিশ্বাসে সমস্ত জেলখানাটাই তাসের ঘরের মতো উড়ে গেলো।

তার একটি কথারো আমি উত্তর দিলুম না।

স্বর্ণ ফের বল্‌লে,—আমি আর কিছু জানি না, আমি ডাক্তারের কাছে ওষুধ চেয়েছিলুম, তিনি আমাকে এই খোলা হাওয়া ও ফাঁকা আকাশের দেশে নিয়ে এলেন, দেখতে-দেখতে আমি সেরে গেলুম। আমি আর কিছু জানি না, এখন সব আপনি জানেন। মানুষের দুঃখ দূর করবার ভার নিয়েছেন, বড়ো কঠিন কাজ, ডাক্তারবাবু।

প্রাণপণে গাড়িটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চললুম।

স্বর্ণ দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌লে,—আমি এমনি ছুটতে চাই, দিনের পর দিন ঘরের কোণে বসে' দেয়ালের পিঁপ্‌ড়ে গুনতে চাই না।

আশ্চর্য্য, মা'র কথা স্বুবর্ণ একদম ভুলে'ই গেছে। তাকে আর এখন তা মনে করিয়ে দেবারো সময় নেই।

গাড়িটা ফের গলিতে বাঁক নিতেই স্বুবর্ণ হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে' উঠলো: এ কী, কোথায় নিয়ে এলেন?

নির্ম্মম, তিক্ত গলায় বললুম,—কেন, তোমার পুরোনো সেই বাড়ি? চিনতে পাচ্ছ না?

স্বুবর্ণর মুখ চুপ্‌সে ছাইয়ের মতো শাদাটে হ'য়ে গেলো: সে কী কথা? তেমন তো কোনো কথা ছিলো না।

ধম্‌কে উঠলুম: কোনো কিছুরই কথা ছিলো না, তুমি এবার নামো।

—বা, আমি তবে এতো সাজলুম কেন?

—আমার গাড়ি ছেড়ে দাও বলছি, নইলে মাসিমাকে ডেকে আনবো।

স্বুবর্ণ শূন্য চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো: কিন্তু এখানে আমি কোথায় এলুম?

বললুম,—দরজা খোলা আছে, ঢুকে পড়লেই বুঝতে পারবে।

—কিন্তু আমাকে না আপনি মা'র কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

তার মুখের উপর শব্দটা আমার একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো: না। তুমি এবার ভালোয়-ভালোয় বাড়ি যাও বলছি। চেঁচামেচিতে মাসিমা এখুনি উঠে পড়বেন।

দরজাটা খুলে একরকম জোর করে'ই তাকে নামিয়ে দিলুম। সে বাড়িতে ফের ঢুকলো কিনা তা দেখবার জন্যে সেখানে আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়ালুম না।

যুগের বাংলা

— ১ —

বাঙ্গালীর প্রাণ জাগিয়াছে, এই প্রাণকে দিব্য করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পথ ভোগ নহে, পরন্তু ত্যাগ, অনির্ব্বাণ অনাবিল উৎসর্গ। বাংলার তরুণকে এ কথা নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

একটা জাতি এই ত্যাগ ও উৎসর্গের দীক্ষা লইয়া জাগিতেছে—এ বড় অপূর্ব্ব, অপার্থিব দৃশ্য। জগতের ইতিহাসে এ এক বিরল, অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা।

যুগের বাংলা এই অলৌকিক ত্যাগ ও উৎসর্গ মন্ত্রে দীক্ষিত জীবন, অসাধারণ চরিত্র লইয়াই ধীরে ধীরে অন্ধকারের বুক হইতে মাথা তুলিতেছে। এ অভ্যুত্থান দৈব, ভাগবত প্রেরণা-সম্ভূত; তাই বাঙ্গালীর গতি জীবন থাকিতে কখনও স্তব্ধ হইতে পারে না।

চলিয়াছি কোথায়—এ প্রশ্ন আজি ভাবিবার নয়। গতির পথেই চলার পথ-নির্দ্দেশ হয়। উৎসর্গের আগুন যেমন জীবনের কলুষ ভস্মসাৎ করে, তেমনি সম্মুখের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পথও সমুজ্জল করিয়া ধরে। চলিতে চলিতেই গতির বেগ যত ক্ষিপ্রতর হয়, ততই গন্তব্য লক্ষ্যও সুপরিচ্ছন্ন হইয়া চক্ষের আলোক-রূপে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। বিশ্বাস, জীবনের জয়যাত্রাই অবধারিত মুক্তির তোরণ-দ্বারে এ জাতিকে পৌছাইয়া দিবে।

বাঙ্গালীর প্রথম, নিগূঢ় সঙ্কল্প—জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা। যুগশক্তি আহুতি চাহিয়াছে। এ ডাক কোনও মানুষের নয়, যুগদেবতারই। নর নারী অকুণ্ঠ প্রেরণায় এই আহ্বান শুনিয়া চলিয়াছে। শক্তি-প্রয়োগেই শক্তিবৃদ্ধি—গতির পথেই জীবনের গ্রন্থী খুলিয়া যাইতেছে, বন্ধন খসিয়া পড়িতেছে। ইহা মুক্তির অভিযান—দলে দলে, কাতারে কাতারে সারি দিয়া মুক্তি-সেনা ছুটিয়াছে।

আহুতির পর আহুতি পড়িয়াছে। মরণ-দানেও দেশকে, জাতিকে জাগাইতে ও বাঁচাইতে বাঙ্গালী কাতর হয় নাই। যুগের সাধনায় ঋষি দিয়াছিলেন সিদ্ধ মন্ত্র, কবি ভাব ও ভাষা, বাংলার তরুণ ঢালিয়া চলিয়াছে তাজা প্রাণ। এই আত্মোৎসর্গের হোমশিখা জালিয়া অনাবিষ্কৃত পথের সন্ধানে যুগে যুগে বাঙ্গালী যে অভিজ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে তাহাই শেষ দিন পর্য্যন্ত সারা ভারতের মুক্তি-যাত্রা আলোকিত করিয়া তুলিবে।

বাঙ্গালী চাহিয়াছে মুক্তি—প্রাণের বিনিময়ে। এ আত্মদান নিরর্থক নয়। মরণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াই অমৃতত্বের সন্ধান মিলে—এই প্রত্যয়টুকুই যথেষ্ট। এমন স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের অধিকারী ঈশ্বরবিশ্বাসী জাতিই বাংলার মেরুদণ্ড, আশা-কেন্দ্র, ভবিষ্যৎ। ইহারাই যুগের বাংলার নির্ম্মাতা, সেবক ও পূজারী।

প্রাণ দিয়াই মহাপ্রাণ গড়িয়া উঠে। ব্যক্তির, বহুর জীবনাহুতি সমষ্টীকৃত হইয়াই গড়িয়া তুলে জাতির অখণ্ড, বিরাট্ মহাজীবন। ধ্বংসের মধ্য দিয়াও চলিয়াছে নির্ম্মাণ

—এই জাতি-শক্তিরই। ইহাই এ যুগের আরাধ্য বস্তু। বাঙ্গালী এই জাতি-সাধনার অগ্রদূত, মন্ত্রদ্রষ্টা—যুগোচিত সাধনায় সারা ভারতেরই সে পুরোগামী পথপ্রদর্শক। বাংলার জাতি-গঠন-যজ্ঞ সুসিদ্ধ না হইলে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম চরম লক্ষ্য-তীর্থে উপনীত হইতে পারিবে না।

জাতি-সাধনা স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়। স্বপ্নকে সিদ্ধ করিতে, কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বাংলার যৌবন-শক্তি অকাতরে আত্ম-বীর্য্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠা করিবে না। বাঙ্গালী কোন দিন কোথাও আত্মদানে কার্পণ্য করে নাই—প্রাণ দেওয়ার দুর্ভিক্ষ এ যুগের বাংলায় কোনও ক্ষেত্রে কখনও দেখা যায় নাই।

যুগের বাংলা গড়িতে আসিয়াছেন—একে একে যুগ-সাধক রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। দেওয়ার খেলায় ইঁহারা যখন নিঃশেষ হইয়াছেন তখন আসিলেন শ্রীঅরবিন্দ। ভবিষ্যতের জন্য দান রাখিয়া আজ ইঁহারও জাতীয়তার বীণা নীরব নিস্তব্ধ। বাংলায় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মী—বহু কৃতী ও প্রতিভাশালী পুরুষ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মিলিত প্রেরণার দ্যোতনায় বাঙ্গালীর জাতি-সাধনার নানা দিক্ পরিস্ফুট, জাতীয় জীবনের নানা অঙ্গ সমলঙ্কৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যুগের বাংলার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারেন, এমন কোনও যুগ-নেতাই আজ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। নেতৃহীন বাঙ্গালী আজ আপন আপন অন্তরের প্রেরণা অনুসরণ করিয়াই মুক্তি-পথে আগুয়ান হইয়াছে। এ দুর্গম অভিযানে একমাত্র উৎসর্গের আলোই তাহার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া, পথের নিখুঁৎ ও অভ্রান্ত সঙ্কেত দেখাইয়া দিতে পারে।

তাই যুগের সত্য দীক্ষা—যুগশক্তিরই পূর্ণানুসরণে। ইহাই আত্মসমর্পণ মহাযোগ। জীবন-শিল্পের ইহাই শ্রেষ্ঠ ও সহজ সাধন। আজ বাঙ্গালী জাতির একমাত্র অধিনেতা —জগদ্ধাত্রী মহাদেবী। যুগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত বাঙ্গালী আজ জয়কণ্ঠে মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়া অসীমের অভিসারে জীবন-তরণী ভাসাইয়াছে—তাহার "এ তরীর কর্ণধার স্বয়ং জননী।"

যুগশক্তির প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ—সমষ্টি বা সঙ্ঘসাধনা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বেদনার প্রতিঘাতে, মিলনের রাখীসূত্র

"ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই"

আর কোটী কণ্ঠ একত্র মিলাইয়া ঘোষণা করিল—

"এক দেশ, এক ভগবান,
এক জাতি, এক মনোপ্রাণ"

—সে পাইয়াছিল সংহতি-সাধনারই নির্দ্দেশ; জাতি-সত্তার এই অভ্রান্ত প্রেরণাই তাহার প্রথম প্রাণ-স্পন্দনের সঙ্গে অনুভূতি-ক্ষেত্রে ধরা পড়িল। যুগের বাংলা নানা ছন্দে, নানা আকারে এই সংহতি-প্রেরণা অনুবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। উৎসর্গীকৃত জীবনের এই মিলিত সমষ্টি গড়িয়া তুলিতেই তাহার আন্তরিক সঙ্কেত তাহাকে স্বতঃ তপস্যায় নিযুক্ত করিয়াছে। স্বদেশ-প্রেমের মহাশক্তি-প্লাবনে এইরূপ শত শত মিলনের যজ্ঞবেদী দিকে দিকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল শক্তি-পীঠে রাষ্ট্র-মুক্তি লক্ষ্যে রাখিয়া বাঙ্গালী দেহ মনের বল-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সংহত-জীবনগঠনে উদ্যত হইয়াছিল। রাজশক্তির শ্যেন-দৃষ্টি ইহা এড়াইল না। এই সকল সভা-সমিতি রাষ্ট্রীয় সাধনার উৎস-কেন্দ্র বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অচিরেই উহাদের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্ছ্বসিত দেশপ্রীতি আত্ম-প্রকাশের মুক্ত, সরল, প্রশস্ত পথ না পাইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে গা ঢাকিল; কিন্তু তরুণের হৃদয় হইতে মিলন-প্রেরণা নিশ্চিহ্নে মুছিয়া গেল না। একদিকে ঘোর রুদ্র বিপ্লব যজ্ঞ, অন্য দিকে স্বচ্ছ, শুদ্ধ আত্মগঠনের প্রেরণা—তপোজ্জ্বল, উৎসর্গ-চরিত্র বাংলার যৌবন দ্বিধা-বিভক্ত জাতি-সাধনায় খণ্ডিত হইয়া গেল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩—এই দীর্ঘ ১৯ বৎসর কাল বাঙ্গালীর মুক্তিসংগ্রাম এই দুইটী সুস্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। বৈপ্লবিক বা গঠন-সাধনা, উভয়েই সংহতি-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হইলেও, গৌণ ও মুখ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে উহা পরিগৃহীত হইয়াছে। গঠন-সাধনায় সঙ্ঘসৃষ্টি নির্ম্মাণেরই বিশুদ্ধ নীতি রূপে অনিবার্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সঙ্ঘত্বের ইহা বিশিষ্ট ও মৌলিক পরিণতি। যুগের বাংলা এই সঙ্ঘ-বীর্য্য আশ্রয় করিয়াই জাতি-সাধনার অচল অটল ভিত্তিপাত করিতে পারিয়াছে। সঙ্ঘশক্তিই যে যুগশক্তি—ইহা আজ এই নবীন বাংলার জীবনে শুধু স্বীকৃত নয়, প্রমাণ-সিদ্ধ হইবে।

যুগের বাংলা নানা দিক্ দিয়া আপনিই গড়িয়া উঠিতেছে, এ গতি-স্রোতঃ অনিবার্য্য। জাতি-শক্তি ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ-সেবা—সর্ব্বক্ষেত্রে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতে চায়। জীবনই নীতি—প্রবুদ্ধ ক্ষুরধার জীবনশক্তি সম্মিলিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পরিচালিত করিয়া বাঙ্গালীর জীবন-সমস্যা সমস্তই নিরাকৃত হইলে। বাঙ্গালীকে চলিতে হইবে—দুর্জ্জয়, অশ্রান্ত মহাপ্রাণ লইয়া।

প্রতি মুহূর্ত্তে মরণের সহিত সংগ্রাম বাধিবে। মরণমুখী জাতিকে অন্ধতা ও আত্মক্ষয়ের পথ হইতে মুখ ফিরাইতে হইবে। বাঙ্গালীর জীবন-কেন্দ্রে মহাশক্তির আশীর্ব্বাদ স্পর্শ করিয়াছে। তাই বিদ্যুচ্চাঞ্চল্যে তাহার হৃদয়খানি কম্পিত, দুরু দুরু আবেগে সংবেগে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহার চারিদিকেই ঘোর অন্ধকার—নিঃসাড়, জমাট বাঁধিয়া ঘেরিয়া আছে। এই অন্ধকার, মরণ-তুল্য নিঃসাড়তা জীবনের তাপেই গলাইতে ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরিয়া দিতে হইবে। এক মুঠা বিদ্যুৎ-ভরা জীবন লইয়া সত্ত্ব-বীর্য্য অগ্নিময় বোমার ন্যায় জাতির বুকে আছড়াইয়া পড়ুক—জীবনের সহস্র সহস্র বিদ্যুৎ-কণা সমাজ, দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করুক। বাঙ্গালীর বাস্তব জীবন আজ সহস্র-ধারা নায়েগ্রার ন্যায় বাঁচার মন্ত্রে মুখরিত, দিগন্তপ্লাবী উৎসবময় হইয়া উঠুক। আজ যেখানে অন্ধকার সেইখানেই আন জ্ঞানের আলো, যেখানে অশক্তি, অক্ষমতা সেখানে বার বার ধাক্কা মারিয়া সুপ্ত

—২—

বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক জয়—লর্ড কর্জ্জনের খণ্ডিত বঙ্গকে সংযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয়; কিন্তু তাহা যে সকল বঙ্গভাষা-ভাষীকে এক করিতে পারিল না, এদিকে তখন সম্যক্ লক্ষ্য দিবার অবসর ছিল না। শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়াল-পাড়ার বাঙ্গালী এই নবগঠিত অখণ্ড বঙ্গে স্থান পায় নাই; বিচ্ছিন্নতার এ ক্ষত-চিহ্ন আজও জাতির মর্ম্মক্ষেত্র হইতে মুছিয়া যায় নাই। বাংলার বিচ্ছিন্ন কন্যা মানভূমের মর্ম্মে মর্ম্মে আজও ব্যথার রাগিণীই ঝঙ্কৃত হইতেছে। অধ্যাপক রাধাকমল অতি দরদের দৃষ্টি দিয়া বাঙ্গালীর বিলোপ-সম্ভাবনার নানা সমস্যা চিন্তা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"কলিকাতা নগরী এখন একটা বিরাট্কায় অক্টোপাসের মত অসংখ্য শুঁড় বিস্তার করিয়া চারিদিকে পল্লীসমাজকে শোষণ ও রিক্ত করিতেছে, ধ্বংসের স্তূপের মধ্যে তাহার সৌধমালা উঠিতেছে আকাশকে স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধায়। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের কৃষি ও শিল্প-সম্পদের ভার-সাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হইত না, যদি মানভূম অঞ্চল, যেখানে খনিজ পদার্থ সমুদায় একটা নূতন বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে কাড়িয়া লইয়া বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা না হইত। বঙ্গ-বিভাগ এখনও রদ হয় নাই। এই অঞ্চলে অনেক বাংলা-ভাষা-ভাষী ও অনেক বাঙ্গালী আছে—তাহারা এখন বাংলার বাহিরে। এই প্রদেশ হইতে নানা আদিম জাতিও আসিয়া পশ্চিম বঙ্গে চাষ বাস করিতেছে। অনেকগুলি বাঙ্গালী জনপদ এই এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত, অনেক কারখানায় এবং খনিতেও বাঙ্গালীর সুপ্রতিষ্ঠা। এই অঞ্চল বাংলাকে প্রত্যর্পণ করিলে পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের অবনতি ও শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণীর বেকার ও দারিদ্র্য সমস্যার কিছু প্রতিকার হইত।" যুগের বাংলা "এক পণ, এক আশা, এক ভাব, এক ভাষা" লইয়াই অখণ্ড জাতিরূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চায়।

অখণ্ড বঙ্গভাষাভাষীকে এক সুদৃঢ় জাতীয়তা বোধ-সম্পন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার প্রতিপক্ষে যে রাষ্ট্রীয় ভেদ-বুদ্ধির অস্ত্র অন্তরায়-স্বরূপ শাসকবর্গ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সে তীক্ষ্ণ শেল বাঙ্গালীর জাগ্রত শুভবুদ্ধি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে সফলকাম হইলেও, বাংলার সামাজিক ভেদ-বুদ্ধি এখনও বাঙ্গালীর স্বাভাবিক সম্মিলনের পথে দুর্ভেদ্য বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে,

ইহাকে ধূলিসাৎ করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বিধি সুপ্রযুক্ত হইবে না। বঙ্গ-বিভাগের মূলে এক দেশবাসী ও এক-ভাষাভাষী ৫ কোটী ৪০ লক্ষ হিন্দু ও ২ কোটী ৭০ লক্ষ মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত করিয়া পশ্চিম বঙ্গকে হিন্দুপ্রধান ও পূর্ব্ববঙ্গকে মুসলমানপ্রধান করার গূঢ় কৌশল ছিল; সে চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের অন্তর-কলহ নিবৃত্ত হয় নাই। ইহার প্রতিকার একমাত্র যুগশক্তিই করিতে পারে। হিন্দু মুসলমানের জন্য আলোচনা করিয়া থাকেন। এই হিসাব-বুদ্ধি যুগের তরুণকেও স্পষ্টভাবে মাথায় রাখিতে বলি—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভেদকে প্রখরতরভাবে জাগাইয়া ইন্ধন ও প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে, পরন্তু কোন গভীর সাধনায় যুগশক্তির উদ্বোধন করিলে, একই মহাশক্তির পূজায় বাংলার হিন্দু মুসলমান একত্র হৃদয়ের অর্ঘ্য ঢালিতে পারে তাহারই সূত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য। এই সূত্রের আবিষ্কার অকপট হৃদয় হইলেই মিলিবে।

মানভূম, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়ার বাঙ্গালীরা বাংলার মধ্যেই থাকিতে চায়

ধর্ম্মগত বিরোধের বীর্য্য দীর্ঘ সাত শতাব্দী-ব্যাপী সংঘর্ষ ও একত্র বাসের পরেও যদি এখনও অনিঃশেষিত হইয়া থাকে, তবে তাহার সুমীমাংসা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি দৃষ্টিগোচর হয় না। চাই একটা অসাধারণ শক্তির উন্মেষ—জাতির মধ্যে। যুগের বাংলার দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে এই শক্তি-সাধনায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

বিদেশী রাজশক্তি খুব তীক্ষ্ণ ও নিখুঁৎ ভাবেই এই ধর্ম্ম-বিরোধের জটিল সমস্যা নিজেদের নখদর্পণে রাখিবার

বর্ত্তমান বাংলার ধর্ম্মানুগত লোক-পরিস্থিতি ইংরাজ দিতেছেন—

"সারা বাংলার লোকসমষ্টির শতকরা ৫৪ অংশ মুসলমান অধিবাসী, এবং ইহারা প্রধানতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের যথাক্রমে শত-করা ৭১ ও ৭০-৮ অংশ অধিকার করিয়াছে। মধ্য বঙ্গের অর্দ্ধেক মুসলমান এবং পশ্চিম বঙ্গেরও শত-করা ১৪ জন এই ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা সমগ্র বঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া, ১৮৮১

খৃষ্টাব্দে যখন তাহারা শত-করা ৫০'এরও ন্যূন ছিল তাহা হইতে বর্ত্তমান বৃদ্ধির হারে উপনীত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব বঙ্গে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত ক্রমে সমগ্র অধিবাসীর শত-করা ৬৪'৫ অংশ হইতে বর্ত্তমান ৭১ অংশে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। মধ্য বঙ্গে মুসলমান কিছু ক্ষয় পাইয়াছে—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শত-করা ৪৯ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শত-করা ৪৭'২ তে দাঁড়াইয়াছে; এবং উত্তর বঙ্গে ১৮৮১ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সামান্য কিছু অধোগতির পর, যখন তাহাদের সংখ্যা ছিল শত-করা যথাক্রমে ৫৯'৬ ও ৫৯'১, ঐ সংখ্যা উপস্থিত বৃদ্ধির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে হিন্দু তাহাদের সংখ্যা শুধু ঠিক রাখে নাই, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শত-করা ১৩ জন হইতে বর্ত্তমান লোকগণনানুযায়ী তাহাদের সংখ্যা উঠিয়াছে শত-করা ১৪ জনে। সারা বাংলার বর্ত্তমান হিন্দু-সংখ্যা শত-করা ৪৩'৫ জন এবং ইহাদের সংখ্যা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমশঃ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কমিয়াই আসিয়াছে—উক্ত খৃষ্টাব্দে তাহারা ছিল শত-করা ৪৮'৮ জন অর্থাৎ মুসলমানদের চেয়ে শত-করা ১জন কম। হিন্দু পশ্চিম বঙ্গেই বেশী, সেখানে তাহারা সংখ্যায় এখন শত-করা ৮২'৯ জন—এই সংখ্যা ছিল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শত-করা ৮২'৩ এবং তাহারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণনায় আরও বেশীই পাওয়া গিয়াছিল, এমন কি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উহা ছিল শত-করা ৮৪ জন। মধ্য বঙ্গে হিন্দু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শত-করা ৪৯'৮ জন সংখ্যা ঠিকই রাখিয়াছে এবং তদবধি ক্রমশঃ বাড়িয়া তাহারা এক্ষণে শতকরা ৫১½ জনে উঠিয়াছে। উত্তর বঙ্গে তাহারা সমগ্র লোক-সংখ্যার শত-করা ৩৫'৫ জন ছিল ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, তাহা ছিল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শত-করা ৩৭'৪ এবং আরও পূর্ব্ব হইতে কমিয়াই আসিতেছে; ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ছিল শত করা ৪০.১ জন। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু জন-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের সামান্য বেশী, এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাহারা যখন ছিল শত-করা ৩৩'৬, তাহা হইতে কমিয়া কমিয়া এখন তাহাদের অংশ শত-করা ২৭'৩৭ মাত্র।
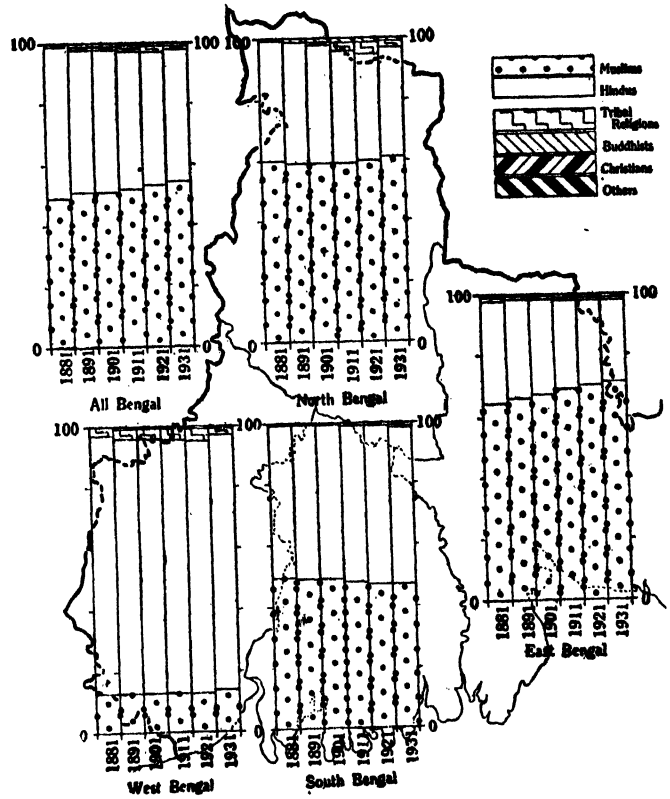
রেখাচিত্রে বাংলার বিভিন্ন ধর্ম্মীর সংখ্যা

হিন্দু মুসলমান ছাড়া বর্ত্তমান বাংলার লোক-গণনানুযায়ী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সংখ্যায় শত-করা ১½ জন, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে উহারা ছিল শত-করা ১ জন মাত্র।

অন্যান্য ধর্ম্মীর সংখ্যাও মোটামুটি শত-করা ১ জনের বেশী দেখা যায় না।''

তরুণ জাতি—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক—বাঙ্গালী বলিয়া, একই মায়ের সন্তান বলিয়া, একই যুগ-দেবতার আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া—এখনও ইচ্ছা করিলে, যোগ্য তপস্যায় উদ্‌যুক্ত হইলে, অখণ্ড জাতীয়তার বেদী উভয়ে মিলিয়াই গড়িয়া তুলিতে পারে; পরন্তু তাহা যদি একান্তই অসম্ভব হয়, যুগস্রোতঃ বারণ মানিবে না—হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে যে কোনও শুদ্ধ সমষ্টি আশ্রয় করিয়া অলৌকিক মহাশক্তিই বাংলায় জয়চ্ছত্র উড়াইয়া দিবে, সে মুক্ত জাতি-বীর্য্যের পতাকাতলে হিন্দু মুসলমান উভয়-শক্তিকেই অবনত শিরে স্বীকৃতির মন্ত্র কণ্ঠে দাঁড়াইতে হইবে।

বাংলায় ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতাও মুমূর্ষু, আভিজাত্যের জীর্ণ গর্ব্ব আজ আর যুগের প্রবাহে তাহাকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেয় না। ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বিদ্রোহী বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবকে বিজয় করিয়া যে শক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল বৌদ্ধধর্ম্মেরই মূলক্ষয়; সেই জীর্ণ-মূল মহাবটকে বিধর্ম্মী মুসলমান-শক্তির সহিত একস্বার্থতায় অংশতঃ সংযুক্ত হইয়া বাংলার ব্রাহ্মণসমাজ বৌদ্ধধর্ম্মকে উৎখাত করিতে পারিয়াছিল। আজ আর সে বীর্য্যও তাহার নাই। বাংলায় আজ ১৫ লক্ষ ব্রাহ্মণ, তাহার অনুগামী হইলেও হইতে পারে বড় জোর ১৫ লক্ষ কায়স্থ ও ১ লক্ষ ১০ হাজার বৈদ্যজাতীয় হিন্দু; কিন্তু তাহাদের ঘেরিয়া যে দ্বিগুণ বা ততোধিক বিরাট্ বিশাল জনসমুদ্র, তাহারা উপেক্ষা, ঘৃণা ও আচারগত অস্পৃশ্যতার নানা পর্য্যায়ে নিক্ষিপ্ত ও হিন্দুত্বের স্বাধিকার-বঞ্চিত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতারই ভিত্তি-মূল শিথিল করিয়া তুলিতেছে—উচ্চ শ্রেণীর বর্ণ-হিন্দুর সঙ্কীর্ণ সমাজ-নীতি আজ আর হিন্দুর হিন্দুত্বকেই বাংলায় সুদৃঢ় ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

বাংলায় উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু উপজাতি-গুলির সংখ্যাগত তারতম্য এই তালিকায় প্রদর্শিত হইতেছে:—

হিন্দুসংখ্যার অনুপাতে প্রতি হাজারে

স্থান বিভাগ ও জেলা	ব্রাহ্মণ	কায়স্থ	নমঃশূদ্র	মাহিষ্য	রাজবংশী
ইংরাজাধিকৃত বাংলা	৬৫	৭০	৯৪	১০৭	৮১
বর্দ্ধমান-বিভাগ	৭৭	২৫	১০	১৯২	৭
বর্দ্ধমান	৯৫	২৭	১২	১৬	৩
বীরভূম	৭৩	২০	৩	৮	৭
বাঁকুড়া	১০২	১৮	১	২০	৭
মেদিনীপুর	৪৮	২২	১৫	৩৫৪	৪
হুগলী	৯১	৩১	৭	১৯০	৮
হাওড়া	৯৩	৪০	১৬	৩১৮	২০
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৮৩	৬৮	১০০	১২০	২৩
২৪ পরগণা	৬২	৩০	১৮	১৮৯	২৬
কলিকাতা	১৯২	১৯১	৫	৫৬	২
নদীয়া	৭৬	৪৯	৫১	১৭৩	২৬
মুর্শিদাবাদ	৬০	২৫	১৯	১২৭	৪১
যশোহর	৫৯	৭৯	২৭৪	৫৯	৬
খুলনা	৫৭	৫৪	৩২৪	৪০	৩০
রাজশাহী বিভাগ	২৯	২৪	৬১	৩৯	৩৩৭
রাজশাহী	৬১	২৫	৬৪	১৬২	৮১
দিনাজপুর	১৫	১২	৫	৩৪	৪৬৪
জলপাইগুড়ি	১৩	১২	৩	৩	৪৯৯
দার্জ্জিলিং	৩৭	৫	০·২	১	১১৪
রঙ্গপুর	২৪	২৩	৪৯	২৪	৫৯১
বগুড়া	৩৯	৩৭	৫১	৯৮	৫১
পাবনা	৭০	৯৯	১৩২	৫২	৪৯
মালদহ	২৩	৯	৩	২২	৯৫
ঢাকা বিভাগ	৬৪	১৩৩	৩০৬	৪১	১৮
ঢাকা	৬৩	১২৮	২৫৪	২৯	২৪
মৈমনসিংহ	৫৬	১২৯	১২২	৭৮	২৫
ফরিদপুর	৬৫	১১২	৫০৫	২২	১৫
বাখরগঞ্জ	৭৭	১৬৯	৪৩৮	২৪	১
চট্টগ্রাম বিভাগ	৬৩	২৫৬	১০৮	৪৮	২
ত্রিপুরা	৬১	১৭৮	১৭০	৫৩	৪
নোয়াখালি	৫৩	২০৭	৯৮	৮৯	১
চট্টগ্রাম	৮	৪৭১	১০	৩	১
চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ	৮	৪৬	২	০	০
দেশীয় রাজ্য	১৫	২০	১৪	৫	৪৯৭
কুচবিহার	১৪	১৫	১০	৫	৪৩৯
ত্রিপুরা	১৬	২৮	১৯	৫	০·৩

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ব্যাকুল হৃদয়োত্থিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াই চিন্তাশীল তরুণ জাতিকে এই সমস্যার সমাধানের জন্য নিবিড় চিত্তে অনুধাবন করিতে বলি—

"এরূপ নির্দ্দেশ করা যায়, যে আরও ৫০ বৎসর পরে, পূর্ব্ব বঙ্গে প্রতি ১০ জন লোকের মধ্যে ৮ জন মুসলমান, ও বাকী ২ জন হিন্দুর মধ্যে ১ জন নমঃশূদ্র দেখা দিবে। সমগ্র বঙ্গদেশে ৫০ বৎসর পরে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জন উচ্চজাতির হিন্দু, ৬ জন মুসলমান এবং আর ৩ জনের মধ্যে ১ জন মাহিষ্য, ১ জন নমঃশূদ্র, ১ জন রাজবংশী অথবা ১ জন অপর কোন জাতি পাওয়া যাইবে।"

বাংলার বর্ণ-হিন্দুকে, বিশেষ ব্রাহ্মণ্যসমাজকে জাপানের ক্ষত্রিয় সামুরাই সমাজের মতই হয় আপনার উচ্চ আভিজাত্য ও অহংকার বলি দিয়া জাতীয়তার হিন্দু-বনীয়াদ রক্ষা করার শুভ-বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন ও সমাজ-নীতির প্রসার ও পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে, নতুবা যুগের আগতপ্রায় বন্যাপ্লাবনে হিন্দুর হিন্দুত্ব বাংলার বক্ষ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে, এই ধ্বংসের সর্ব্বগ্রাসী করাল কবল হইতে যুগের বাংলার হিন্দু কাঠামোখানি বাঙ্গালী আর কোনমতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না।

তারপর, বাংলায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনও ইহারা নগন্য, কিন্তু রাজধর্ম্মের প্রভাব ও প্রসার স্বতঃসিদ্ধ; তাহার উপর অসংখ্য খৃষ্টীয় প্রচারকমণ্ডলী তাহাদের অগাধ ধনবল ও সংহতি-বল লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইলে, প্রগতিশীল মুসলমানধর্ম্মীর পাশাপাশি ইহাদেরও দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি অসম্ভাবিত ব্যাপার নহে। সারা বাংলায় কলিকাতা সহরের বাহিরেই যতগুলি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলী যে যে জেলায় প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত তাহাদের একটা তালিকা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

এংগ্লিক্যান—

চার্চ্চ অফ ইংলণ্ড জেনানামিশন- বর্দ্ধমান, হাওড়া, ২৪ পরগণা।

চার্চ্চ অফ ইংলণ্ড মিশন—মেদিনীপুর, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং ও চট্টগ্রাম
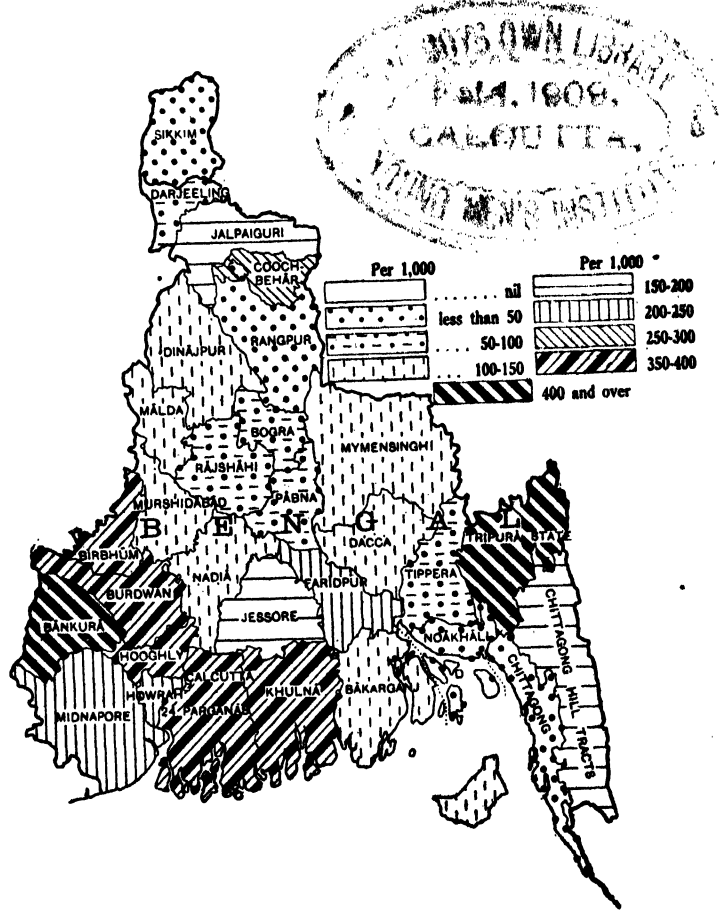
বাংলায় অনুন্নত সম্প্রদায় উচ্চবর্ণ-হিন্দুর চেয়ে দ্বিগুণের বেশী

চার্চ্চ মিশন সোসাইটী—হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, রঙ্গপুর

অক্সফোর্ড মিশন—২৪ পরগণা, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ

সেণ্ট এণ্ড্রুস মিশন—২৪ পরগণা, মৈমনসিংহ

সোসাইটী ফর প্রপাগেশন অফ গসপেল মিশন—২৪ পরগণা

সেণ্ট জোসেফ্স মিশন—মালদহ

ব্যাপ্টিষ্ট—

আমেরিকান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন—মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা বাখরগঞ্জ

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন—মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, খুলনা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ

বঙ্গ-বিহার ব্যাপ্টিষ্ট ফরেণ মিশন—মেদিনীপুর

লণ্ডন ব্যাপ্টিষ্ট মিশন—যশোহর, দিনাজপুর

অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন—পাবনা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, ত্রিপুরা

নিউজীল্যাণ্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন—ত্রিপুরা

কংগ্রিগেশন্যাল—

ফ্রী চার্চ্চ মিশন অফ্ ইংলণ্ড—দার্জ্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড চার্চ্চেস—

চার্চ্চ অফ স্কটল্যাণ্ড মিশন—বর্দ্ধমান, হুগলী, ২৪ পরগণা, জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিঙ

প্রেসবিটিরিয়েন মিশন—হাওড়া

লণ্ডন মিশন সোসাইটী—২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ

ইংলিশ প্রেসবিটিরীয়ান মিশন—রাজশাহী

লুথারেণ—

সাঁওতাল মিশন অফ নর্দ্দান চার্চ্চেস—বীরভূম, রাজসাহী, দিনাজপুর

লুথারেন মিশন—মালদহ

সুইডিশ মিশন—কুচবিহার

মেথডিষ্ট—

মেথডিষ্ট এপিস্কোপল মিশন—বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা

ওয়েসলিয়েন মেথডিষ্ট মিশন—বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা

আমেরিকান মেথডিষ্ট মিশন—বীরভূম

মাইনর এণ্ড আনস্পেসিফাইড প্রোটেষ্ট্যাণ্ট—

আমেরিকান চার্চ্চ অফ গড মিশন—হাওড়া, বগুড়া, রঙ্গপুর

প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মিশন—২৪ পরগণা

খৃষ্টান মিশন সোসাইটী—নদীয়া

সেভেন্থ-ডে-এডভেন্টীষ্ট মিশন—নদীয়া, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ

ইণ্ডিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন—যশোহর

সিন্ধুরিয়া কুটী মিশন—যশোহর

চার্চ্চ অফ নাজারিন মিশন—মৈমনসিংহ

ইভাঞ্জিলিষ্ট মিশন—ফরিদপুর

নর্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া জেনারেল মিশন—চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশ।

রোম্যান ক্যাথলিক (ল্যাটিন রাইট)—

রোম্যান ক্যাথলিক মিশন—হুগলী, ২৪ পরগণা; নদীয়া, খুলনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং, রঙ্গপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম।

বাসন্তী ক্যাথলিক মিশন—২৪ পরগণা।

কংগ্রিগেশন অফ হোলিক্রশ, ক্যানাডা চট্টগ্রাম

সেলভেশনিষ্ট—

সেলভেশন আর্ম্মী—যশোহর, রংপুর।

ইংরাজ-শাসন-সুপ্রতিষ্ঠা ও ইংরাজী শিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-স্রোতঃ খরতর বেগেই বাংলার হিন্দু সমাজকে ভাসাইয়া লইত, যদি না বিরাট্ মহীধরের ন্যায় যুগপুরুষ রাজা রামমোহন পৃষ্ঠ দিয়া তাহার গতি-বেগ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতেন। বাংলায় আজ ব্রাহ্মধর্ম্মী মাত্র ২,১৬৫ জন মাত্র; ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যায় ছিল ৩,২৮৪। এই হিসাবে আসল ব্রাহ্মের সংখ্যা হয়ত ঠিক পাওয়া যাইবে না; কেন না, অনেক ব্রাহ্ম হিন্দু বলিয়াই আপনাদের নাম লোকগণনায় ধরিয়াছেন। আজ রামকৃষ্ণ মিশন ও হিন্দু মিশন যুগযুগব্যাপী জড়তা কাটাইয়া হিন্দুকে প্রগতিশীল করিয়া তুলিতে প্রযত্নপরায়ণ হইয়াছেন। বাংলা, বিহার, আসামে যে সকল লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল, গারো, ডালু, বানাই, খাসিয়া, ওড়াং, মুণ্ডা, মিকির, মিরি, মিস্‌মি, লুসাই, কুকী, লালুং, কাছাড়ী, রাভ, মেচ প্রভৃতি নরনারী কোন আদিম যুগ হইতে বাস করিতেছে, তাহারাও যে হিন্দুস্থানের অধিবাসী, এই দেশই তাহাদের জন্মভূমি, মাতৃভূমি—ইহাদের মূলতঃ হিন্দু বলিয়াই পরিগণ্য করা উচিত।

ইহাদের মধ্যে ও অন্যত্র হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রচার করিয়া, তাহাদিগকে সমাজের গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে বা অন্তর্ভুক্ত করিতে মিশন এ পর্য্যন্ত যে প্রচেষ্টা বাংলায় করিয়াছে তাহা কতটুকু সফল হইয়াছে তাহার পরিচয় সেন্সাস-কমিশনরই দিতেছেন—

"The reports of the mission recount from time to time the numbers of conversions made amongst primitive tribes, Indian Christians and Bengali Muslims, and the cases in which 'sarvajanin mohotsovas' or 'Durga-utsavas' have been celebrated with a view to consolidating the Hindu community The account of conversions are perhaps somewhat optimistic, but the figures for tribal religion show a pronounced decline since 1921, although a comparison with the total figures of selected groups of primitive peoples shows a marked increase during the last decade, and it is therefore clear that there has been a considerable access to the Hindu community of persons who by birth belong to the primitive tribes."

জঙ্গলের মাওলী জাতিকে লইয়া শিবাজীর সৃষ্টি-প্রতিভা মহাশক্তি মারাঠী জাতিকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সকল পার্ব্বত্য ও অরণ্যচারী বাংলার আদিম অধিবাসীর মধ্যেও নবজাতি-গঠনের প্রচুর ও শক্তিশালী উপাদান নিহিত আছে। যুগের বাংলার সৃষ্টিধর গঠন-বীর্য্য এইখানে নিয়োজিত হইলে, ইহাদেরও অগ্নিপ্রাণ মহাজাতিতে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে।

— ৩ —

দেশ ও জাতির বাস্তব চিত্র আজ সত্যই বড় ভয়াবহ। এখানে মৃত্যুর আতঙ্কেই পদে পদে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সুগঠিত সংহত জাতি-জীবনের সুনিয়ন্ত্রিত প্রাণ-স্পন্দন ও তাহার ব্যাপক অভিব্যক্তি বাঙ্গালীর সার্ব্বাঙ্গীন জীবনক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর প্রতিভা আছে, কিন্তু তার অনেকখানিই আজ ভাববিলাসিতায় সম্মোহিত। চারু শিল্পে, দুনিয়ার দরবারে সে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু দারু-শিল্পে সেদিনেরও 'আফিং-খোর' চীনামিস্ত্রী তাকে নিজের ঘরেই কোণঠাসা করিয়াছে। বাংলায় নৃত্য আছে, কবিতা আছে, সঙ্গীত আছে, চিত্রশিল্প আছে; নাই ক্ষুধায় অন্ন, নাই বাস্তব-জীবনে
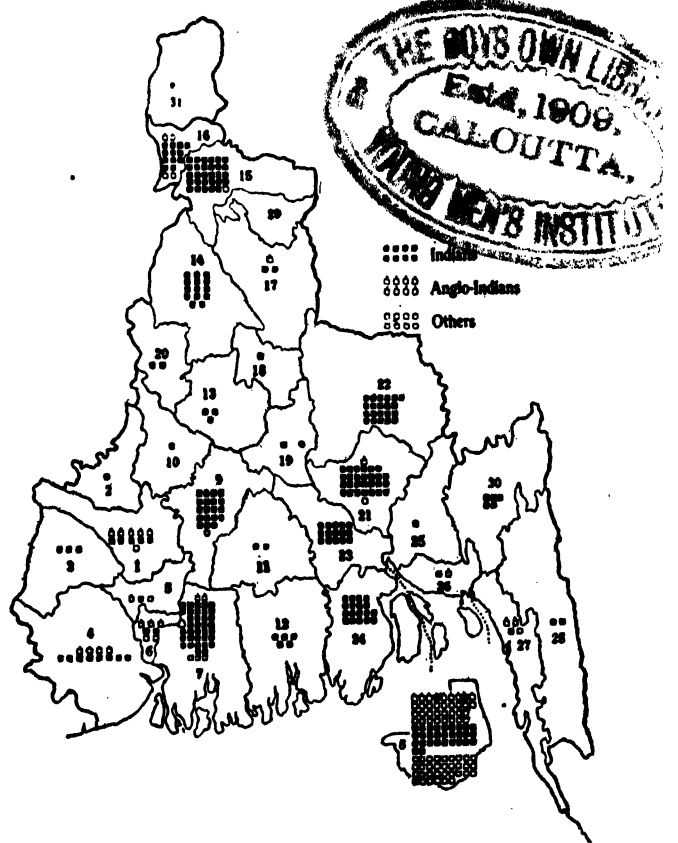
বাংলায় খৃষ্টাবলম্বীর সংখ্যা কি হারে বাড়িতেছে

তৃপ্তি-তুষ্টি-শান্তি-সান্ত্বনা। বাংলায় আছে বসু-সাহা, কিন্তু নাই হেনরী ফোর্ড। বাঙ্গালী কাপড় পরিধান করে, মটর-সাইকেলে চাপে; কিন্তু তাহা জোগান দেয় জাপান, ম্যানচেষ্টার, ল্যাঙ্কাশায়ার ও মার্কিণ। বাঙ্গালী মায়ের আছে কেবল বুকভরা স্নেহ-প্রীতি, কিন্তু তার শিশু-সন্তানকে সান্ত্বনা দেয় 'ক্ষুদ্র সে জাপান'। বাঙ্গালীর রুচি

আছে, সখ আছে, ভব্যতা আছে; কিন্তু তার সে বিলাস, দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজন পূর্ত্তি করে জাপান, জেকোশ্লোভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতির বিদেশী জাতি। বাঙ্গালীর চা-পাট-কয়লা-তুলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের কোন কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু নাই তাহার নিয়ন্ত্রণের, ব্যবহারোপযোগী করিবার দক্ষতা ও শক্তি। বাংলায় আছে অবাধ আঢালা ভু-সম্পদ্, সরস সুফলা মাটি, আর

বাংলার আদিম-জাতি

বাঙ্গালী দু'মুঠা অন্নের অভাবে করে আত্মহত্যা! আছে অদৃষ্ট—নাই পুরুষকার !!

বাঙ্গালীর দর্শন আছে—নাই জীবন। তার হৃদয়ের মণিকোঠায় বিশ্বজয়ী সমুজ্জ্বল ধর্ম্মবীজ আছে—কিন্তু দেহ-প্রাণের ক্ষেত্রে নামে নাই বলিয়া মর্ত্ত্যের বুকে অঙ্কুরিত হইয়া শ্রী-শোভা-আলো পরিবেশন করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর একদা ছিল গৌরবময় অতীত, কিন্তু নাই তার সমতুল্য বর্ত্তমান। আছে তার মহিমাময় পূর্ব্ব-পুরুষার্জ্জিত সম্পদ্। কিন্তু উহার উত্তরাধিকারিত্বের প্রতিভা আজ ম্লান মুহ্যমান। ইতিহাস তার অস্পষ্ট। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত এক মহাজাতি। ঘুমঘোরে তার বৈশিষ্ট্য আজ অন্তর্হিত।

বাংলার সপ্তগ্রাম আজও আছে—কিন্তু নাই চাঁদসদাগর, তাহার মধুকর সপ্তডিঙ্গি আর বাণিজ্য-যাত্রা করে না। বাঙ্গালী আজও মরিয়া নিশ্চিহ্ন হয় নাই, কিন্তু নাই বিজয়-সিংহ—নাই তার সে দিগ্বিজয়ী প্রাণচঞ্চলতা। 'সিংহল' অতীত বাংলার বিজয়-স্মৃতি-স্তম্ভ! বাণিজ্য-প্রতিভাহীন সে ছিল না, কিন্তু হইয়াছে। এই বাংলার বন্দর হইতেই সে কোন সুদূর অতীতে, বুদ্ধদেবেরও জন্মের কত পূর্ব্ব হইতে বাণিজ্য-তরী সাগরবক্ষে পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আজ বাঙ্গালী কোথায়? ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প, আর্থিক-অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই নাই—নাই রাষ্ট্র—নাই স্বাস্থ্য—নাই সম্পদ্। বস্তুতন্ত্র জীবন-সংগ্রামে সে আজ সর্ব্বত্র পশ্চাৎপদ। ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব্ব স্বাধীন ক্ষেত্রে সে আজ হটিয়া যাইতেছে; আর অ-বাঙ্গালী তার স্থান অধিকার করিতেছে। বাংলার বক্ষে আজ যত কলকারখানা গজাইয়া উঠিতেছে, তার পিছনে আছে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক; কিন্তু প্রবুদ্ধ হইতেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-বাঙ্গালী। ভাগীরথীর দু'কূল ছাপাইয়া দিনের পর দিন যে সকল কল-কারখানা ভীড় পাকাইয়া তুলিতেছে তার মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান তো দৃষ্ট হয় না।

গৌরবহীন বুভুক্ষিত বাংলা আজ হাহাকারে প্রপীড়িত। ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী আজ ছুটিয়া চলিয়াছে মরণের পথে। যৌবনের প্রাণময়ী উদ্দীপনা আজ স্তিমিত। বাঙ্গালীর পরিচয় দাস্যবুদ্ধিতে, কেরাণীগিরির অভিশাপগ্রস্ত জীবনে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বাণিজ্যকেন্দ্রে হ্যাট-পাগড়ীর ভীড়ের মাঝে বাঙ্গালীর টিকি মিলে না; কিন্তু বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রাসাদোপম অফিসে বিজলীপাখার নীচে হেঁট মুণ্ডে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কলম চালাইতে বাংলার তরুণের শ্রান্তি আসে না। প্রতিভার এত বড় অমানুষিক অপমান বোধহয়

বাংলার বাহিরে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। বাংলার সবুজ তরুণ-প্রাণ বুকভরা যৌবনের স্বপ্ন লইয়া যখন সাধের সারস্বত মন্দিরাঙ্গনের মোহ কাটাইয়া বাস্তব সংসারক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনই চারিদিকে নৈরাশ্যের জমাট আঁধার ঘিরিয়া ধরিয়া তার সে স্বপ্ন-রঙীন জীবন-যৌবনকে মুষড়িয়া ফেলে। কদাচিৎ যারা কোন উপায় খুঁজিয়া পায়, তাদের অধিকাংশই যৌবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীর্য্য ও উৎসাহ ব্যয় বা পিতামাতার কষ্টোপার্জ্জিত শেষ সম্বল ক্ষয় করিয়া যে বিদ্যার্জ্জন করে তাহা অকালে অজ্ঞাতে অসহায়ে নির্ম্মম সমাধি দেয়, আর বাকী মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসে 'এখন কি করি!' অধিকাংশ শিক্ষিতের অর্দ্ধশিক্ষিত বা অ-শিক্ষিতেরও ঐ একই সমস্যা!—'কি করিয়া দু'মুঠা অন্নের সংস্থান করা যায়!' বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত, ভদ্রসন্তানের আজ জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকাই দায় হইয়া পড়িয়াছে। শুধু মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ নয়, বর্ত্তমান সমাজের ছোট-বড় শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকল পর্য্যায়ের সমস্যা ঐ একই। বাংলার ভূস্বামীদের দুরবস্থা কল্পনাতীত। সময়-মত লাটের খাজনা দাখিল করিতে না পারায় কত ছোট বড় তালুক যে নীলাম হইয়া গিয়াছে বা নীলামে চড়িয়া আছে, তাহার তালিকা শোচনীয় ভয়াবহ। বাংলার জমিদারবহুল জেলা মৈমনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতির জমিদারগণের পুনঃপুনঃ সময় দেওয়া সত্ত্বেও লাটের খাজনা দাখিল করিতে অসামর্থ্য জমিদারদের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথাই সপ্রমাণ করে। বাংলার অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রতিভূ ভূস্বামীবংশ যে অনুপাতে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে বাংলার জমিদারী বাঙ্গালীর হাতে আর থাকিবে না। ইতিমধ্যেই অনেক জমিদারী বিদেশীর, বিশেষ করিয়া মাড়োয়ারীর হস্তগত হইয়াছে এবং শতকরা নিরানব্বইটাই বোধহয় ঋণদায়ে বন্ধকগ্রস্ত। অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে বিদেশীর বিপুল প্রভাব ক্রমশঃ আজিকার অর্থসঙ্কট আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীকে স্ব-গৃহে পরবাসী করিতে চলিয়াছে। বাংলার এ শোচনীয় পরিণাম ভাবিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। 'জমিদারের ঋণ' বাংলায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। এই ঋণের পরিমাণের অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে ১৩৩৮ সালের ওয়ার্ড ষ্টেট পরিচালন সম্পর্কীয় কার্য্য-বিবরণীতে। উহাতে প্রকাশ, যে আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের পরিচালনাধীন ৯৮টি ষ্টেট ছিল এবং ১৩৩৮ সনে ১১টি নূতন ষ্টেট যুক্ত হইয়াছে। ঐ বৎসরে মাত্র ১টী ষ্টেট খারিজ হইয়াছে। বছরের শেষে ষ্টেটগুলির কর্জ্জের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। তৎ-পূর্ব্ব বৎসর ছিল—২ কোটি ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। বিস্ময়ের বিষয়, গভর্ণমেণ্টের এই সম্পত্তিগুলি পরিচালনা করিতে খাজনা ও সেসের মোট আদায়ের হাজারকরা ৯৫৲ ব্যয় হইয়াছে। কেবল মাত্র এক মোকদ্দমা খরচ বাবদই আলোচ্যবর্ষে ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। অর্থ-সঙ্কটের দরুণ এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সবিশেষ হ্রাস পাওয়ার ফলে রায়তের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বকেয়া ও হাল খাজনা আশানুরূপ আদায় হইতে পারে নাই। মোকদ্দমা করিতে কোন ক্রটি করা অবশ্যই হয় নাই; কিন্তু দাতার দিবার সামর্থ্য যখন চরমে পৌঁছায় তখন মামলা মোকদ্দমাও বৃথা অপব্যয় ছাড়া আর কি! অনেক ক্ষেত্রে সরকারী খাজনা ও অডিট খরচা পর্য্যন্ত এই ওয়ার্ড ষ্টেটগুলি দিয়া উঠিতে পারে নাই। যদি সরকারী তত্ত্বাবধানেই জমিদারী পরি-চালনে এইরূপ কঠিনতা উপলব্ধি হয়, তবে বে-সরকারী জমিদারদের দুর্দ্দশা সহজেই অনুমেয়। ইহার কারণ, অদূরদর্শী ভূস্বামীদিগের প্রজাদের সহিত সহজ-সম্বন্ধ-বিযুক্ত-হইয়া প্রমোদ-নগরীতে আলস্য-বিলাস-স্রোতে গা-ঢালিয়া দেওয়া বা এমন আরও অনেক কারণ দেখান হইয়াছে। বাংলার বুকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের আশীর্ব্বাদ ইংরাজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেও, অভিসম্পাতের মতই ইহার পরিণাম বিষময় হইয়াছে। জমিদারদের শত ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইহা ধ্রুব সত্য, যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকারী রাজস্ব দিয়া জমিদারদের বেশী কিছু থাকে না। যদিও প্রজার নিকট হইতে আদায়ী রাজস্ব ও দেয় সরকারী খাজনার মধ্যে আপাত ব্যবধান যথেষ্টই দৃষ্ট হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট 'পথকর' 'সেস' প্রভৃতির ভিতর দিয়া জমিদারদের নিকট হইতে ষোল আনার উপর আঠার আনা পোষাইয়া লন। খাজনার পরিমাণের অপেক্ষা

অনেক ক্ষেত্রে 'সেস' পথকরের পরিমাণ অধিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ও অন্যান্য রাজস্বের নিয়মানুযায়ী জমিদারদের প্রজার খাজনা-বৃদ্ধি বা 'সেস', 'পথকর' প্রভৃতিও অনুপাতাধিক বৃদ্ধি করিবার উপায় নাই। তদুপরি সরকারী সেলাম, জমিদারোচিত ঠাট বজায় রাখা, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতিতে জমিদারদের প্রাণান্ত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায়

অ-বাঙ্গালী শ্রমিক

জমিদারদের নিছক জমিদারীর আয়ের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক কায়দায় চলিতে হইলে ঋণগ্রস্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। বাদশাহী আমলের তালুকদারদের ও ইংরাজ-সৃষ্ট জমিদারদিগের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জমিদারীর বাহ্য মোহ, চাকচিক্য ও সম্মান বাংলার ব্যবসায়িকুলকে বাণিজ্য ছাড়াইয়া বাবু, রাজা, মহারাজা বানাইয়াছে,

সত্য; কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্র হইতে এই ধনিক ও ধনের অপসরণ বাংলার অর্থাগমের ক্ষেত্রে যে সেদিন নির্ম্মম কুঠারাঘাত করিয়াছিল, তাহাও বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান নিরতিশয় দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ। ইংরেজ বণিক্-জাতি—রাষ্ট্রাধিকার তাদের বাণিজ্য-প্রসারের উপায়স্বরূপ। তাই ব্রিটিশরাজ্যের গোড়াপত্তনের প্রারম্ভ হইতেই একদা

বাংলার বিশ্ববিশ্রুত চারুকলা, কারুশিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর জ্ঞানে অজ্ঞানে যে অত্যাচার উৎপীড়নের স্রোতঃ বহিয়াছিল, তাহার ফলে, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া বাংলার সে সমুজ্জ্বল সম্পদ্ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। আজ বাংলার কুটীরশিল্প পুনঃ সঞ্জীবিত করিবার যে প্রচেষ্টা, বাঙ্গালীর অর্থ-

নৈতিক জীবনে যে জাগরণের চাঞ্চল্য ধীরে জাগিতেছে, তাহা যে একদিন বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে না ছিল এমন নয়; কিন্তু বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির পশ্চাতে পশ্চিমের যুগশক্তির বাহন তার চমকপ্রদ শিক্ষা-সভ্যতা-শিল্প-বাণিজ্য-সম্পদ্ বাংলার দরজায় যেদিন সাড়ম্বরে হানা দিল সেদিন মোহবিভ্রান্ত হইয়াই বাঙ্গালী আপন শ্রীহীন সন্তানকে নির্ম্মম করে স্বীয় অঙ্ক হইতে নামাইয়া, সেই যে প্রতীচ্যের সজ্জিত দুলালকে স্নেহাদরে আপনার বক্ষপুটে তুলিয়া লইল তাহার পর হইতেই বাংলার শ্রীমন্ত শিল্প-সম্পদ্ অনাদরে উপেক্ষায় তিলে তিলে আত্মহত্যার পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

শুধু শিল্পে নয়, জীবনশিল্পের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী অবহেলায় বিমুখ হইল। মস্তিষ্কের প্রখরতায়, হৃদয়াবেগে, ভাবসম্পদে বাঙ্গালী বিশ্বের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নয়। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে, আইন-ব্যবসায়ে, স্থাপত্য-বিদ্যায়, হিসাবের কাজে, সাহিত্যে, কবি-প্রতিভায়, চিত্রশিল্পে, বিজ্ঞানে, দর্শনে বাঙ্গালীর মেধা ও প্রতিভা অনিন্দনীয়। কিন্তু বাঙ্গালী শূন্যগর্ভ পল্লবগ্রাহী লেখা-পড়ার মোহে মজিয়া, বংশপরম্পরাগত পেশার সহজ দক্ষতা অবহেলায় উপেক্ষা করিয়া মরিতে বসিয়াছে। "লেখাপড়া শিখে যে গাড়ীঘোড়া চড়ে সে", প্রচলিত প্রবাদবাক্য সার্থক হইত, যদি শিক্ষা তাকে 'বাবু' না করিয়া অর্থোপার্জ্জনের দক্ষতা দিতে পারিত। তাই দেখা যায়, বাংলায় তথাকথিত ছোট ছোট কাজে অ-বাঙ্গালীরাই একচেটিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বাংলায় পাচক উড়িয়া, চাকর হিন্দুস্থানী, ধোপা-নাপিত-বেহারা-কুলী-মুটে মজুর পশ্চিমা, ব্যবসায়ী কাঁইয়া-মাড়োয়ারী, উত্তমর্ণ জুলুমী কাবুলী, ফলওয়ালা পেশোয়ারী, বাসচালক পাঞ্জাবী, ছুতার মিস্ত্রী চীনা, রাজমিস্ত্রী বেহারী, ফেরিওয়ালা বিদেশী, করাতী সিন্ধি, গুজরাটী, নেপালী, গুর্খা, মেথর-মুচি-ডোম-মুদ্দফরাস উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী। এই সব দেহশ্রমের কার্য্যে সরকারী-বে-সরকারী বা নিয়োগ-ত্যাগের কথা নাই, কেবলমাত্র বৃত্তিগত কার্য্যদক্ষতা ও মিথ্যা-মর্য্যাদামুক্ত হইলেই যথেষ্ট।

তারপর, সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া প্রতীচ্যের মোহ-যাদু-স্পর্শে বাঙ্গালী ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে হৃতসর্ব্বস্ব জাতির ঘুমঘোর সত্যই যখন টুটিতে সুরু করিল, তখন একান্ত রাষ্ট্রকে পুরোভাগে রাখিয়াই সে জাগরণের সাড়া পড়িল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার রাষ্ট্রনীতি যেদিন আবেদন নিবেদনের খাত হইতে মুখ ফিরাইয়া বর্জ্জন-নীতির অবলম্বনে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, সেদিনও এই ভাঙ্গন-নীতির মধ্যে গঠন-সাধনাকে বাংলার প্রাণ নিতান্তই গৌণভাবে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অর্থনীতি-ক্ষেত্রে সম্পদ্-সৃজনের বীজ শতদল ফুটাইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। অবশ্য ভাঙ্গনের সে মহাপ্রলয়ের যুগে যে গঠন-মন্ত্রের বীজপ্রেরণা জাগিয়াছিল তাহা নিছক ব্যর্থ হয় নাই। বিশেষ করিয়া বস্ত্রশিল্পে আজ বাঙ্গালীর যতটুকু সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারও মূল বীজ আছে সেই বহিষ্কার-মন্ত্রেরই মাঝে। কুটীর-শিল্পে ও বিভিন্নমুখী আর্থিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইবার যে প্রেরণা দীর্ঘদিনের স্তিমিত আড়ষ্ট বাংলার মরা জীবন-নদাশ্রয়ে জোয়ারের জলের মত নামিয়া আসিল, অতীতের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা ও শক্ত জাতীয় চরিত্রের অভাবে উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে ভাঁটা ধরিল। শিল্প-বাণিজ্যকে জীবনের মুখ্য ব্রত স্বরূপ সে যুগে কেহ গ্রহণ করে নাই বা জাতীয় মুক্তি-সাধনায় উহার অপরিহার্য্য আবশ্যকতাও কোন রাষ্ট্র-নেতার হৃদয়ে উপলব্ধ হয় নাই। জাতির বহির্দৃষ্টি একান্ত রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছিল বলিয়াই নেতৃত্বের গৌরব ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পর্য্যবসিত হইত কংগ্রেসের কি জনকোলাহল-পরিপূরিত রাষ্ট্রমঞ্চের বাগ্মিতায়। অবশ্য বাংলার তরুণপ্রাণ জাতীয় পুরোহিতের সঙ্কেতে রাষ্ট্র-যজ্ঞের বেদীমূলে অকুণ্ঠ আত্মবলি দিতে কোনদিনই সঙ্কুচিত বা পশ্চাৎপদ হয় নাই। প্রতীচ্য সভ্যতার যে চমকপ্রদ রাষ্ট্রীয় রূপ তাহা সমস্ত উজ্জ্বলতা লইয়া সেদিন সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল মুক্তিকামী বাঙ্গালীর সম্মুখে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক কাঠামো, তার কায়দা-কানুন-ধারার হুবহু অনুবর্ত্তন করার একটা প্রচেষ্টা সে যুগের রাষ্ট্রীয় চে

যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ফরাসী বিদ্রোহেতিহাস, ইউরোপীয় বিদ্রোহমূলক সাহিত্য-প্রভাব ও মধ্যযুগের বীরত্বকাহিনী বাংলা সাহিত্যে এবং ভাবধারায় তখন একটা মুক্তির আলোর পরশ দিয়া জাতির চিত্তে যেন অভিনব আলোড়ন ও পন্থার নির্দ্দেশই দিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তির প্রেরণা ও পথ-নির্দ্দেশ বহুলভাবেই লক্ষিত হয়। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের অগ্নিবীজ যুগের ঋষি-সাহিত্যিক বঙ্কিমের বজ্রলেখনী আশ্রয় করিয়া বাংলার তরুণ সন্তানের প্রাণে সেদিন খাণ্ডবদাহন সৃষ্টি করিয়াছিল। আবেদন-নিবেদন নীতি আশ্রয় করিলেও, ভারতীয় কংগ্রেসই ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত বাংলার বা ভারতের ছিল একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান—সে কথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত অগ্নিযুগ। ১৯২০ সাল হইতে মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন মুখ্য-ভাবে সারা রাষ্ট্র-ভারতকে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিতেছে। ঠিক এমনি মুহূর্ত্তে মহাযুদ্ধের অবসানে ইউরোপের রাষ্ট্র ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এক তুমুল বিপর্যয় সংঘটিত হয়। কোটি কোটি জীবনবলির রক্ত-সাগর মথিত করিয়াই প্রাচ্যের সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রীর হইল জাগরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় ধনিকতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ মাথা তুলিল নিঃস্ব, নিরন্ন, চিরদিনের অবহেলিত, পদদলিত জনসাধারণ, শ্রমিকের দল। এই সুপ্ত শক্তির জাগরণ চরম রূপ লইয়াছে রুশিয়ার বলশেভিক্-বাদে, যাহা আজ দুনিয়াকে একান্ত ভাবে চিন্তাপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

পাশ্চাত্যের সকল আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের গভীর অতলে ছিল আর্থিক-অর্থনৈতিক ভাঙ্গা-গড়ারই একটা নিগূঢ় প্রবাহ। মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের উপর যে নবসৃষ্টি গড়িয়া উঠিবার বিচিত্র দ্যোতনা বিভিন্ন জাতীয় জীবন কেন্দ্র করিয়া প্রকাশ পাইল, তাঁহার মূলে ছিল এই শিল্প-বাণিজ্যের অবাধ সম্প্রসারণ-প্রেরণা। এই সময় হইতেই বাণিজ্যজগতে ব্রিটিশের একচেটিয়া অধিকার বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করে এবং প্রতীচ্যের রাষ্ট্র-মূলক জাতীয়তা অর্থনৈতিকতায় দ্রুত রূপান্তরিত হইতে থাকে। মধ্য [illegible] ইউরোপে ধনতন্ত্রবাদ সুস্পষ্ট রূপ লইয়া প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ ইহার প্রভাব এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, সকল ধর্ম্মনীতি-শাসনের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রতীচ্যের চিত্ত-মনকেও উহা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। পাশ্চাত্যের এই অর্থ-নীতির ধারাকে রাষ্ট্র-শক্তিও আর বেশী দিন দূর হইতে উপেক্ষা করিতে পারে নাই; দিনের পর দিন উভয়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর প্রতিষ্ঠা পায়। ইহার চূড়ান্ত পরিণতি আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিকতা। এই আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক মতবাদ (economic cosmopolitanism) ইউরোপে আজও অনেকখানি কথার কথাই (utopia)। ইহার বাস্তব যেটুকু প্রয়োগ হইয়াছে তাহারই ফলে ইউরোপে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আসলে অর্থনৈতিক জাতীয়তা-বোধেই (economic nationalism) এখনও যে ইউরোপের রক্ত-মাংস-মজ্জা ডুবিয়া আছে তাহা দেশের পর দেশ যে সংরক্ষণনীতির প্রাচীর উঠাইয়া, বৈদেশিক অবাধ বাণিজ্যকে প্রতিহত করিয়া দেশীয় শিল্প-রক্ষার উৎকট প্রয়াস করিতেছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। এই জাতিগত স্বার্থ-সংরক্ষণের সংকীর্ণ মনোবৃত্তির ফলেই লণ্ডনের এত মহাড়ম্বরপূর্ণ বার্ত্তিক বৈঠক সেদিন নিছক নিষ্ফল হইয়াছে। যুক্ত রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি বিশ্বের কল্যাণকে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে। এই সম্বন্ধে আইরিশ রাষ্ট্রপতি ডি, ভেলেরার উক্তি প্রতীচ্যের স্বার্থসঙ্কীর্ণ জাতীয়তা-বোধকে আরও স্পষ্ট করিয়াই প্রকাশ করে—"Each nation should depend on its own resources, not international trade. The United States should adopt a policy of self-sufficiency, for that great country has all the resources for it. Only what a country cannot use for itself should be sold abroad. Nor should any country buy from foreigners what it can make itself." সাধারণভাবে কথাটা শুনিতে লাগে ভাল, হয়তো জাতির ক্রমগঠনের যুগে ইহার প্রয়োজনও আছে; কিন্তু মানুষের বুভুক্ষার তো অন্ত নাই। অতিরিক্ত মালের উৎপাদন যাহা প্রতীচ্যের প্রতি

দেশেই মহাযুদ্ধের পরে শ্রমশিল্পের বিদ্রোহের ফলে দিনের পর দিন সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার কাট্‌তির জন্য তো বহির্বাজারে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবেই। তাই অনেকে বলেন, প্রতীচ্যের এই উৎকট জাতীয়তা বোধই নাকি আজিকার এই বিশ্বব্যাপী আর্থিক-অর্থনৈতিক অনর্থের মূল। দুনিয়ায় বর্ত্তমানের যত কিছু চাঞ্চল্য, রাষ্ট্রে-সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসামঞ্জস্য, প্রাচুর্য্যের মাঝে অগণিত নর-নারীর উপবাসী থাকা—এই সমস্তের গোড়ার কথা এই অর্থনৈতিক স্বার্থ। প্রতীচ্যের সকল রাষ্ট্রীয়াভিযানে, দুনিয়াব্যাপী আসুরিক লুট-তরাজ, সব কিছুরই মূলে আছে এই স্বার্থমলিন অর্থনৈতিক সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা।

বাংলার অগ্নিযুগের পূর্ব্বে, জ্ঞানতঃ বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে পাশ্চাত্য কূট রাষ্ট্রনীতির এই গূঢ়তর প্রেরণা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নাই, পড়িবার কথাও নয়; কারণ বাংলা কি ভারতে, বাদশাহী কি তৎপূর্ব্ব আমল হইতে সমাজসংস্থার মাঝে পাশ্চাত্যের এই ধরণের বিপুল যন্ত্র-চালিত বার্ত্তিক প্রেরণা কোনদিনই ছিল না। ইংরেজ-রাজ্যের গোড়াপত্তনের কিছুদিন পরে, প্রতীচ্যের যুগশক্তি এদেশে যাহা বহিয়া আনিয়াছিল, তাহা হইতেছে সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা। তারপর, উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগ হইতেই ইউরোপীয় অনুকরণে আমদানী হইয়াছিল স্বাদেশিকতা, যাহা কংগ্রেসকে আশ্রয় করিয়া এই অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রতীচ্যের সমসূত্রপাতে জাতীয়তা (nationalism) আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রীয়াধিকারের পশ্চাতে সেই বাণিজ্যমূলক আদি-প্রেরণা কোন দিনই ম্লান হয় নাই। একে একে বাংলার কুটীর-শিল্পের ধ্বংস, রেশম বা তুলার বিশ্ববিখ্যাত চারু বয়নশিল্প লোপ পাইতে বসিল। বাংলার সওদাগরগোষ্ঠী ইংরাজের সুশাসনাধীন নিরাপদ্ ভূমি-সম্পদ্ খরিদ করিয়া বাণিজ্য-ক্ষেত্র হইতে ক্রমাপসারিত হইয়া হইল ভূস্বামী; আর অন্য দিকে ইংরাজের বাণিজ্যপ্রসার অপ্রতিহত গতিতে চলিল। এক সময়ে নীলের চাষ বাংলার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের বুকে বস্ত্র-শিল্পের বিরাট্ কারখানা গজাইয়া উঠিল নগ্ন বাংলা তথা ভারত-বাসীকে কাপড় যোগান দিবার জন্য। ভারতে এই বস্ত্রশিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মজ্জাগত ব্যবসায়ী ইংরেজের বুদ্ধিতে তিন শো বছর পূর্ব্বেই স্থান পাইয়াছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ইংরেজ-রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্বেই সুরাট, মসলিপট্টম প্রভৃতি স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তুলা চালান দিত। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে আমবয়িনা হত্যাকাণ্ডের পর এই কারবার বন্ধ হইয়া যায় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারত হইতে ইংলণ্ডে সোজা তুলা-চলানীর কার্য্য সুরু হয়। ভারতীয় তুলার সঙ্গে ইংলণ্ডের সেই সময়কার উলের রঞ্জন-শিল্পের বিপুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেও, অবশেষে তুলার কারবারই প্রাধান্য লাভ করে এবং বিলাত হইতে সেই সময়ের পর ক্রমশঃ উল, রেশম প্রভৃতি রঞ্জন-শিল্পের ব্যবসা হ্রাস পাইতে থাকে। তুলার কারবারের অবাধ প্রসারের জন্য ক্যালিকোর উপর যে আইনের নিষিদ্ধ-চাপ দেওয়া হয় তাহা দুনিয়ার বাণিজ্যেতিহাসে অন্যত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। "The Calico Act of 1721 prohibited the use and wear of all printed, painted, flowered or dyed Calicoces in apparel, household stuffs, furniture or otherwise"—তাহা দেশজাতই হউক বা বিদেশ হইতেই আমদানী হউক। ইংলণ্ডের কেহ এই ক্যালিকো পোষাক পরিধান করিলেও, তাহার ২০ পাউণ্ড জরিমানা হইত। প্রথম প্রথম লিনেন, উল প্রভৃতির সঙ্গে তুলা মিশাইয়া বয়ন-কার্য্য চলিত বলিয়া খাঁটি তুলাজাত শিল্পের অসুবিধা হওয়ায় ভারতীয় তুলার বণিক্‌সম্প্রদায় উহার নিরোধের জন্য পার্ল্যামেণ্টে দরখাস্ত করে এবং তাহার ফলে ১৭৫৩ সালের "ম্যানচেষ্টার এক্ট" পাশ হয়। "The result was that the English Industry, securely protected against the competition of the Indian fine cottons, grew with extreme rapidity." কি দ্রুত হারে বিলাতের বস্ত্রশিল্প বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল তাহা নিম্নের অঙ্ক হইতেই অনুমিত হইবে :—

সাল	কাঁচা তুলার আমদানীর পরিমাণ		তুলাজাত শিল্পের রপ্তানীর মূল্য
১৭২০	১,৫০,০০০	পাঃ	১৬,০০০ পাঃ
১৭৭৬	৬,৭০০,০০০	,,	৩৫৫,০০০ ,,
		,,	(১৭৮০ সালে)
১৮৮৪	১,৭৯১,৬০০,০০০	,,	৭২,৭০০,০০০ ,,
১৯২৯-৩০	...	...	২২,৭৬০,০০০ ,,
১৯৩২-৩৩	...	...	৮১,৩১০০০ ,,

উনবিংশ শতাব্দী হইতে এখন পর্য্যন্ত ম্যানচেষ্টার প্রধানতঃ বহির্ভারতীয় ঈজিপ্ট প্রভৃতি স্থান হইতে তাহার তুলার চাহিদা মিটাইয়া আসিতেছে, যদিও তৈয়ারী মালের অধিকাংশই ভারতীয় বাজারেই বিক্রয় করা হয়। গত অটোয়া চুক্তি অনুযায়ী ভারতের তুলা ম্যানচেষ্টার খরিদ করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে চুক্তিরও কোন মর্য্যাদা দিতে পারে নাই। ভারতের তুলার সাধারণতঃ জাপান, চীন, জার্ম্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতিই প্রধান খরিদদার।

রাষ্ট্রীয়াধিকার ইংরেজের হাতে থাকায় শুল্ক-নীতির মারপ্যাচে ম্যানচেষ্টারের এই বস্ত্রশিল্পকে প্রবৃদ্ধ করা ও ভারতীয় তুলাজাত অপূর্ব্ব বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার পথে বিশেষ কোন বাধা-বিঘ্ন হয় নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের সময়ে বরং শতকরা পাঁচ ভাগ এড্ ভোলারেম কর উঠাইয়া দিয়া ভারতে বিলাতের বস্ত্র-বিক্রয়ের পথ আরও সুগমই করা হয়। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাসে ভারতের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উঠে নাই বলিয়াই বর্ণিত আছে। ইহাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে যুগের ভারতের অচেতনা ও বাংলার অদূরদর্শিতার বিষয় সম্যক্ উপলব্ধ হয়। ১৮৯৬ সালে লর্ড এলগিনের শাসনকালে রাজস্ব ভাণ্ডারের অর্থকৃচ্ছ্র তার দরুণ আমদানী মালের উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা ধার্য্য করা হয়; কিন্তু উহার যোল আনাই উশুল করিয়া লওয়া হয় ভারতীয় তুলার উপর সমপরিমাণ কর বসাইয়া। ইহাতেও ভারতীয় তুলার ব্যবসায়ীর বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়। মাত্র গত যুদ্ধের সময়ে, যখন শতকরা সাড়ে সাত টাকা আমদানী-শুল্ক বসান হয়, তখন বিলাতী তুলাজাতশিল্প এমনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে যে তাহাতে উহার বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আর উহাতে বাংলার বাহিরে আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কলগুলিই অধিকতর প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। স্বদেশীযুগের প্রেরণায় বাংলায় গুটিকতক নিজস্ব কল স্থাপিত হইলেও, এখন পর্য্যন্ত খাঁটি সুতার কল চাহিদা অনুযায়ী অপ্রচুর বলিতে হইবে। 'বিদেশী-বর্জ্জন-নীতি'র মুখ্যোদ্দেশ্য রাষ্ট্রগত কারণ থাকিলেও, ইহার প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড ওলট পালট আনিয়া দিয়াছে। তার উপর জাপানের শিল্পযাদুর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ম্যানচেষ্টারের আধুনিক কাপড়ের বিরাট্ গর্ব্বোন্নত কল-কারখানা ও গুদাম সকল বজ্রাহত বিশাল শাল্মলী তরুর মতই স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়াছে। কত কর্ম্মহীন নরনারীর মর্ম্মন্তুদ হাহাকারে আজ সেখানকার বাতাস বিষাইয়া উঠাইতেছে। জার্ম্মানীতে কৃত্রিম-রং-উদ্ভাবনের পর হইতে ইংরেজের নীলের ব্যবসার চিরাবসান হয়। এখনও বাংলার নিরালা পল্লী-বুকে শীর্ণ নীল কুঠীগুলি অত্যাচারপ্রপীড়িত সে অতীত স্মৃতি মৌনবেদনায় বহন করিতেছে।

প্রতীচ্য সভ্যতার অন্তরালে এই যে অত্যুগ্র দানবীয় ভোগলিপ্সার উৎকট বীজ লুক্কায়িত আছে, তাহার রাষ্ট্রীয় পাশবিকতার সভ্য ভব্য ঠাট্ পরিগ্রহ করিয়া বাংলার শ্যামল বক্ষ দলিয়া অর্থনৈতিক রসহরণের রোমাঞ্চকর আখ্যান কেবলমাত্র বস্ত্র-শিল্পেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। এখানে নমুনা-স্বরূপ তুলাজাত শিল্পকাহিনীই একটুখানি বিবৃত হইল; বিনাইয়া বিনাইয়া বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংসের ইতিবৃত্ত লিখিতে গেলে একখানা সাতকাণ্ড রামায়ণ হইয়া যাইবে। বাংলার এ করুণ-কাহিনী কাহারও অবিদিত নয়; জাতীয় পরাধীনতার চাপে অসহায়, নিষ্পিষ্ট ও যন্ত্রদানবের অত্যাচারপ্রপীড়িত অতীত বাংলার সে অপূর্ব্ব শিল্প-সংহার অনুস্মরণেও হৃদয় বেদনায় মুষড়িয়া পড়ে। বাংলার প্রতি গৃহাঙ্গনে বার মাসে তের পার্ব্বণাশ্রয়ে তুচ্ছ আলিপনার মাঝে যে চারুশিল্পের অমর সৌন্দর্য্যারাধনা চলিত, সহজ স্বচ্ছন্দ গার্হস্থ্যজীবনভঙ্গীর মাঝেও যে দারু-মৃণ্ময়-বয়ন প্রভৃতি কারুকলানুশীলনে বাংলার আবালবৃদ্ধ

বণিতার অন্তর বিকশিত ও উপজীবিকার সংস্থান হইত, তাহা আমাদের মূঢ় অজ্ঞতায় ও পাশ্চাত্যের নির্ম্মম অর্থনীতির ফলে আজ লুপ্তপ্রায়।

বাংলার কূলে অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রথম ঢেউ লাগে অগ্নিযুগে। সে ১৯০৫ সালের কথা। কোন বিশিষ্ট নেতাকে আশ্রয় করিয়া এই অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রেরণা বাংলায় জাগে নাই; পরন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতই জাতীয় চিত্তে সেদিন অন্তঃসাড়া তুলিয়াছিল। বিদেশী পণ্য-বর্জ্জনমূলক স্বাদেশিকতার মন্ত্র বোধ হয় বাংলার কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনি তুলিয়াছিল; কিন্তু সে মন্ত্র-বীজকে সঙ্ঘবদ্ধ গঠনকরী স্থায়ী প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালী দিতে পারে নাই। সে রূপ দিয়াছিল বোম্বেওয়ালা, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গালী প্রতীচ্য শিক্ষার আলোকও বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম পায়। তাই দেখা যায়, বাঙ্গালীর মনীষা, প্রতিভা ইংরেজ-রাজ্য-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বাহিরেও সর্ব্বক্ষেত্রে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আর বাংলার বাহির হইতে অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত অ-বাঙ্গালী বাংলার শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ভীড় পাকাইয়া বসিল।

দেশের এই আর্থিক দুরবস্থার ও অর্থনৈতিক দুর্য্যোগের দিনে বাঙ্গালীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, শুধু ব্রিটিশ বা বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের কথা নয়, পরন্তু ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশের পণ্য সম্বন্ধেও। প্রত্যেক প্রদেশ সেই প্রদেশবাসীর জন্য, কেবল বাংলা সকলের জন্য! বাঙ্গালীর যদি আজ দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের যোগাড় থাকিত, তবে সে আজ এই নিদারুণ অহিংসাবর্জ্জিত বাণী মুখ দিয়া বাহির করিত না; কিন্তু জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আজ সে সমুপস্থিত, দুর্য্যোগরাত্রির নিবিড়ঘন আঁধার যে আজ তাকে দিশাহারা করিয়াছে, জীবনসংগ্রামে বাঁচিয়া থাকার মত শেষ সংস্থাটুকুও যে আজ তার পায়ের নীচে হইতে দ্রুত অপসারিত হইতেছে। তাইতো এই দিনের শেষে তার কণ্ঠ চিরিয়া বড় দুঃখে বাহির হয়—'Buy Bengali'. বাঙ্গালী ভাবে কিন্তু বাংলার সোণা-রূপা-অর্থসম্পদ্ যায় সাগরপারে, বাংলার টাকা যায় বোম্বাইয়ে, পাঞ্জাবে, বেহারে, মাদ্রাজে আর বাঙ্গালী টাকার অনটনে ঘরে শুকাইয়া মরে। তাই আজ বাঙ্গালীর চিন্তা বাংলার প্রয়োজনীয় পণ্য বাঙ্গালী যোগাইবে, বাঙ্গালী তৈয়ারী করিবে, বাঙ্গালীই ব্যবহার করিবে। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য রায় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার 'হোম চার্জ্জে' যে টাকা ব্যয়িত হয় তার তিনগুণ পরিমাণ অর্থ (১২০ কোটী টাকা) ভারতের অপরাপর প্রদেশে বাংলা হইতে প্রতি বৎসর বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী জাতীয়তায় মাতোয়ারা হইয়া বাগ্মিতার শ্রাদ্ধ করিয়া মরে; আর অ-বাঙ্গালী ভারতবাসী ও বৈদেশিকেরা বাঙ্গালীর রক্তমোক্ষণ করা পয়সায় উদরপূর্ত্তি করে। দুই একটা উদাহরণ দিলেই ঘটনাটি যে অমূলক নয়, তাহা বুঝা যাইবে।

কয়েক বছর পূর্ব্বে মরিসস, জাভা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে ভারতে প্রায় ৬-১০ লক্ষ টন চিনি আমদানী হইত। সম্প্রতি আগামী ১৫ বৎসরের জন্য আমদানী চিনির উপর সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় চিনির ব্যবসায়ের প্রতি ভারতের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। একমাত্র ১৯৩৩ সালে ৪৬টা নূতন চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। আধুনিকী যন্ত্রগুলি ঠিকমত চলিতে সুরু করিলে অভিজ্ঞেরা আশা করেন, যে আগামী ২।১ বছরের মধ্যেই ভারতের সর্ব্বমোট ব্যবহৃত চিনির পরিমাণের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ভারতেই উৎপন্ন হইবে। ১৯৩২-৩৩ সালে সারা ভারতে ৯২৮৬০৭ টন চিনি ব্যবহৃত হইয়াছিল; তন্মধ্যে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলারই সাদা চিনির ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গড়ে বাংলাদেশে প্রায় দেড় কোটি টাকার চিনি বিক্রীত হয়, অথচ বাংলাদেশে আজ পর্য্যন্ত একটাও আধুনিক চিনির কল স্থাপিত হয় নাই। ইক্ষু হইতে সোজাসুজি চিনি প্রস্তুত করার কারখানা বাংলায় ছোটখাট ধরণের মাত্র একটি আছে; কিন্তু যুক্ত প্রদেশে আছে ৪২টী, বিহার উড়িষ্যায় আছে ৩১টি, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ৫টি করিয়া। গুড় হইতে পরিষ্কার চিনি প্রস্তুত করার কারখানা যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে যথাক্রমে ৫টি, ২টি ও ২টি আছে; কিন্তু বাংলার অঙ্ক লজ্জাকর শূন্য। ইহার জন্যই বিদেশে ও অন্যান্য প্রদেশে বাংলা হইতে চিনির দরুণ প্রায় দেড় কোটি টাকা প্রতি বৎসর বাহির হইয়া যাইতেছে ও ভবিষ্যতেও যাইবার সম্ভাবনা।

দুনিয়ার মধ্যে পাট বাংলার একচেটিয়া কৃষিজাত সামগ্রী। সারা ভারতের ন্যূনাধিক এক শত পাট-কলের মধ্যে একমাত্র বাংলার বুকের উপর ভাগীরথীর দু'কূল শোভিত করিয়া ৯৩টি মিল দণ্ডায়মান। এই সকল মিলের অধিকাংশেরই মালিক অ-ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া স্কটিশ কোম্পানী; সামান্য গোটাকয়েক মিল মাত্র অমিশ্র ভারতবাসীর মূলধন দ্বারা পরিচালিত। দুঃখের বিষয়, এত দিন পর্য্যন্তও বাংলার নিজস্ব বলিয়া একটি মিলও ছিল না। সম্প্রতি ভাগ্যকুলের ধনকুবের রাজা শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের উদ্যোগে 'প্রেমচাঁদ' জুটমিল স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল পাট-শিল্পের কারখানায় সর্ব্বমোট প্রায় ২৭৬, ৫৩০ জন লোক নিযুক্ত আছে; তন্মধ্যে জনকয়েক কেরাণী ও সামান্য কয়েক জন সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া প্রায় সকলই অ-বাঙ্গালী। বাংলার এই পাটের দরুণ যে বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা আমদানী হইতেছে, তার খুব কম অংশই বাংলার নিজ ভাণ্ডারে থাকে। দিনের পর দিন আশায় বুক বাঁধিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে বাংলার নগ্ন নিরন্ন চাষী উহা উৎপন্ন করে, তাহারা যাহা পায় তাহাতে অধিকাংশ বছরেই তাদের মজুরীও পোষায় না। পাট ও পাটজাত শিল্পের অন্তর্বাণিজ্যে কি বহির্ব্বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে সকল বাঙ্গালী নিযুক্ত আছে তাহার মধ্যে সত্যকার ব্যবসায়ী নাই বলিলেও চলে; যাহারা আছে তাহারা আড়তদার, ফড়ে, দালাল অথবা ডেভিড্ প্রভৃতি বৈদেশিক কোম্পানীর পাট-খরিদের কমিশন-এজেণ্ট। চাষীর হাত হইতে রপ্তানী-মহাজন বেলোয়ারদের হাতে মাল পৌছাইতে যে অনেকগুলি মধ্যস্থ ব্যক্তির হাত দিয়া পাটকে যাইতে হয় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই দুনিয়ার বাজারের বা বহির্ব্বাণিজ্যের কোন সংবাদ রাখে না বা রাখিবার মত তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতাও নাই। এই ত্রুটির জন্যই, যদিও তাহারা পূর্ব্বেকার 'নর্মাল মার্কেটের' সময়ে যাহা কিছু ধনসঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা গত ১৩৩৬ সনের পর হইতে পাটের বাজারে অনিশ্চয়তা ও অনবরত উঠ্‌তি-পড়্‌তির দরুণ নিঃশেষ তো হইয়াছেই, পরন্তু অনেক মহাজন-গদিয়ানই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে ও হইতে বসিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতিপুষ্ট বৈদেশিক বণিক্‌সঙ্ঘের দ্বারাই এই পাটশিল্প সম্পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রিত। দুঃখের বিষয়, এত বড় একটী আয়কর শিল্পের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের কোন সমবায় বা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত বাংলায় গড়িয়া উঠে নাই। পাট-রপ্তানী শুল্কের যে বিপুল আয় তাহারও প্রায় সবখানিই ভারত-গভর্ণমেণ্টের তহবিল স্ফীত করে, অথচ বাংলার একান্ত গঠনকরী বিভাগগুলি দিনের পর দিন নিরম্বু শুকাইয়া মরিতেছে। এই অসহনীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাংলার এড্‌ভোকেট-জেনারেল শ্রীযুক্ত এন্ এন্ সরকার লণ্ডনের যুক্তকমিটিতে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেশের দৃষ্টি এই দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার দেখাইয়াছেন, যে ১৯:৬ সাল হইতে ভারতীয় কেন্দ্রী-গভর্ণমেণ্ট এই পাটের শুল্ক বাবদ ৫০ কোটী টাকার উপর আদায় করিয়াছেন। বর্ম্মা বাদে ভারতের সর্ব্বমোট রপ্তানী-শুল্কের শত-করা ৯৯ ভাগই পাটশুল্ক হইতে আদায় হয়। ১৯২৫-২৬ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বমোট রপ্তানী-শুল্ক বাবদ পাইয়াছিলেন ৩,৬৪,০০,০০০ টাকা; তন্মধ্যে তিন কোটি টাকার উপর পাটশুল্কের দরুণ আদায় হইয়াছিল। এমন দিনে-দুপুরে ডাকাতি বোধ হয় বাংলা ছাড়া দুনিয়ায় অন্যত্র দৃষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালীর অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া ইহা আর কি!

বাংলার চা-বাগিচার মধ্যে বড় বড় সবগুলিই বিদেশী, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয়দের হাতে এবং উৎপন্ন চা'য়ের বিক্রয়-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবেই কতিপয় ইংরেজব্যবসায়ীর হাতে।

কয়লা বাংলার অন্যতম প্রধান সম্পদ্। বাঙ্গালী পরিচালিত ৫৩৫ খনির মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৪৩টা সম্পূর্ণ-রূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাট, চা, কয়লা বাংলার প্রধান বাণিজ্যসম্পদ্। গত কয়েক বৎসর যাবৎ চা'য়ের উপর দিয়া প্রবল দুর্য্যোগ বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু বৈদেশিক চা-বাগানের মালিকদিগের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকায় গভর্ণমেণ্ট নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিয়া চা-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করাতে গত দুই বৎসর যাবৎ চা-শিল্পের সুদিন আবার ফিরিতে সুরু করিয়াছে; এমন কি চা'য়ের দর পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ

বাড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর কয়লার খনি ক্ষুদ্র ও স্বল্প মূলধন দ্বারা পরিচালিত বলিয়া, প্রথম শ্রেণীর বড় বড় সুপ্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় খনির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাংলার এই শিল্পকে বিপন্মুক্ত করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও গভর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত কোন-রূপ প্রতিকারের পন্থাবলম্বন করেন নাই। বোম্বাইয়ের কাপড়-কলওয়ালাদের উন্নতির জন্য বিদেশী বস্ত্রের উপর শুল্ক ধার্য্য হইল, বাংলা সেই শুল্কের অংশভাগী হইল অথচ বোম্বাই বাংলা-ও-বিহারের কয়লা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর প্রত্যুপকার করিল। ব্যবস্থাপরিষদে বাংলার প্রতিনিধিগণ আমদানী কয়লার উপর কর ধার্য্য করিতে চাহিলে বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিগণ ক্ষাপ্পা হইয়া উঠিলেন। গভর্ণমেণ্টও আফ্রিকার স্বার্থ বজায় রাখিতে ঐদিকেই সায় দিলেন। এমন কি, মহাত্মা গান্ধীও বিদেশী কয়লার বর্জ্জনের জন্য আহ্মেদাবাদের কলওয়ালাদের কোন দিন একটি কথাও বলিলেন না; কারণ বোধহয় কয়লার কারবারে বোম্বাইয়ের কোন স্বার্থ নাই।

চামড়ার ব্যবসাও বাংলার একটা মস্ত বড় ধনাগমের ক্ষেত্র; কিন্তু এখানেও বহির্ব্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে অ-বাঙ্গালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অন্তর্ব্বাণিজ্য কি বহির্ব্বাণিজ্য কোন ক্ষেত্রেই হিন্দু বাঙ্গালীর একেবারেই স্থান নাই।

বোম্বাই ও এডেনের লবণ-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য হইল। পাঞ্জাবের গমের বাজার গরম রাখিবার জন্য আমদানী গমের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসিল। ইহাতে বাংলার লাভ হইল এই, যে তাহাকে জীবনধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর জন্য অতিরিক্ত শুল্ক বহন করিতে হইল বা হইবে।

বাংলার ধান-চাউল ও সাধারণ শস্যের ব্যবসাও ক্রমশঃ বাঙ্গালীর হাত হইতে সরিয়া মাড়োয়ারী প্রভৃতি অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর করতলগত হইতেছে। নারায়ণগঞ্জে দাঁও বুঝিয়া জনৈক সাহেব কোম্পানীও মুদীর দোকান খুলিতেছে।

— ৪ —

পাতিয়ালা ও মাদ্রাজ হইতে চীনাবাদাম, পাঞ্জাব, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে গম, বর্ম্মা ও বিহার হইতে তামাক, মধ্য প্রদেশ হইতে বিশেষ করিয়া পাটনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকারের রবিশস্য, মরিচ ইত্যাদি, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে গুড়, চিনি, পেঁয়াজ, আলু, সরিষা, তৈল প্রভৃতি বাংলাতে আমদানী হয়। বাংলার পল্লী ও গোধন বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধ, ঘি, মাখম, পণীর প্রভৃতির জন্যও আজ বাঙ্গালী পরমুখাপেক্ষী। বাংলার পান-ব্যবসায়ী বারুইজাতি পৈতৃক ব্যবসা ছাড়ায় পূর্ব্বে খাসিয়া, জয়ন্তী ও পশ্চিমের ছোটনাগপুর, যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ হইতে বাংলায় পানের আমদানীও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই সমস্ত পণ্যসম্ভারের আদান-প্রদান বা দালালী কার্য্য যাহারা করে, তন্মধ্যে শত-করা নব্বই ভাগই প্রায় অ-বাঙ্গালী।

বড় বড় ব্যাঙ্ক-ব্যবসাগুলিও প্রায় বিদেশীর পরিচালিত। এক্সচেঞ্জ-স্পেকিউলেটিভ্ ও শেয়ার-মার্কেটেও অ-বাঙ্গালীর ভীড়। অর্থনীতিক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙ্গালী আজ কোথায়? কোথাও তো তাকে আজ সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ দেখা যায় না। অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সংখ্যা যে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক কম, তাহা নিম্নের তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	উপার্জ্জনকারীর সংখ্যা	কার্য্যকারী পোষ্যের সংখ্যা	প্রতিপাল্য পোষ্যের সংখ্যা
মাদ্রাজ	৪৬৭ লক্ষ	১৭৯ লক্ষ	৮০ লক্ষ	২০৮ লক্ষ
যুক্ত প্রঃ	৪৮৪ ,,	২০২ ,,	৩৩ ,,	২৪৮ ,,
বিহার উঃ	৩৭৬ ,,	১৫০	৫ ,,	২২১ ,,
বাংলা	৫,০১,১২,০০০ জন,	১৩৭৫০৫৮৫ জন,	৬৬৩,৩৭৩৭জন,	৩,৫৬,৯৯,৫৮০ জন

অথচ ভাগ্যবিপর্য্যয় এমনি, যে বাংলার মত এমন বিপুল বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র অন্য কোনও প্রদেশে নাই। উদ্যম, উপযুক্ত অধ্যবসায় ও আন্তরিক সংহতিবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকিলে, এমন সুজলা, সুফলা, সোণার বাংলায় অন্নবস্ত্রের অভাব কোন দিন হইতে পারে না। দুনিয়ার মধ্যে বোধ হয় বাংলাই এমনি বিচিত্র প্রাকৃতিক সম্পদে বিভূষিত যে, সে সর্ব্বতোভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে এবং উদ্বৃত্ত সামগ্রী রপ্তানী করিয়া প্রচুর ধনাগমও করিতে পারে। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয়, এই সব অমূল্য সুযোগ সুবিধা সত্বেও সামান্য উদরান্নের সংস্থানে বাঙ্গালী

অপরাপর প্রদেশাপেক্ষা আজও বহু পশ্চাতে। নিম্নের তালিকা হইতে বৃত্তির হার স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে :—

প্রদেশ	শিল্পদ্রব্যনির্ম্মাণ ও কারখানার কাজে	যানবাহনের কাজে	ব্যবসাবাণিজ্যে
মাদ্রাজ	২৫ লক্ষ	৪ লক্ষ	১২ লক্ষ
যুক্তপ্রদেশ	৩১ ,,	২৩৭ হাজার	১৩৬১ হাজার
বিহার উড়িষ্যা	১৩৬২ হাজার	১৫৭ ,,	৭৫৩ ,,
বাংলা	১২ লক্ষ	২ লক্ষ	৯ লক্ষ

অ-বাঙ্গালীকে বাদ দিলে বাঙ্গালীর আনুপাতিক সংখ্যা অনেক কম হইবে, ইহার কারণ এই যে, এক বাংলা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রদেশের শিল্প-বাণিজ্যাদি দেহশ্রমের কার্য্যগুলি ঐ প্রদেশবাসীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাংলার উর্ব্বরা ভূমিতে যেরূপ অবাধ লুণ্ঠন চলে, তাহা অন্য কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালীর অন্নকষ্ট হইবে না কেন?

বাংলার আনাচে-কানাচে পর্য্যন্ত মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী প্রভৃতির হুড়াহুড়ি; কিন্তু মাড়োয়ার বা পাঞ্জাবের দোরের গোড়ার দেশেও বাংলার অনুপাতে এই সব বিদেশীর সংখ্যা অনেক কম।

প্রদেশ	মাড়োয়ারীর সংখ্যা	পাঞ্জাবীর সংখ্যা	গুজরাটীর সংখ্যা	মারাঠির সংখ্যা
যুক্তপ্রদেশ	১১,৯৩৭ জন,	২৬,৬১৪,	৪,১১২,	৪,২৮৪,
বিহার উঃ	১৭,৮৮৩,	৮,৪৩০,	৫,৩০৪,	৩,২১৯ জন (তামিল)
বাংলা	৩২,৯০৭	৯,২৫৮		৪২,৫২০ (মাদ্রাজী)

অর্থশোষণ ছাড়া এই সব অ-বাঙ্গালীর বাংলায় শুভাগমনের অন্য কোন কারণ আপাততঃ দৃষ্ট হয় না।

স্বদেশীযুগের প্রারম্ভে অর্থনৈতিক সংগঠনের যেরূপ ধুম পড়িয়া গিয়াছিল তাহা শেষ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট দুই চারিটী ক্ষেত্রে (কাপড়ের কল, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি) ছাড়া টিকিয়া থাকে নাই। জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হটিয়া গিয়াছে, তাহা ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টানুযায়ী হিসাবের তুলনায় বেশ বুঝা যায় :—

শতকরা হিসাব :

	১৯২১		১৯৩১
কৃষি ও পশু পালন…	৭১˙৯২	…	৬৮˙৩৪
খনিজ ধাতুসংগ্রহ …	০˙৪১	..	০˙২৯
শিল্পপ্রতিষ্ঠান …	১০˙০০	…	৮˙৮০
যান বাহন …	২˙২২	…	১ ৯৩
ব্যবসা বাণিজ্য …	৫˙৯১	…	৬˙৪২
দাস্যবৃত্তি	২˙৭৪	…	৫˙৫৮
বিশেষ কোন জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থাভাব …	২˙৮০	…	৪˙৩২

আভ্যন্তরিক অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ক্রমহ্রাস ঘোরতর আশঙ্কার কারণ।
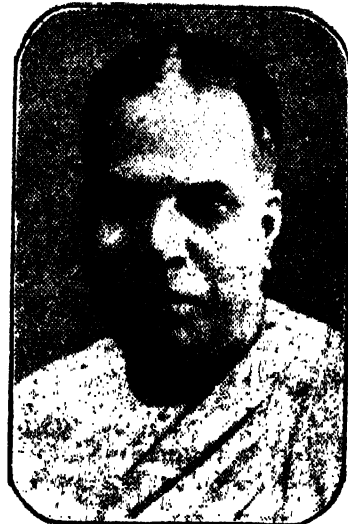
বাংলার অর্থনীতি-ক্ষেত্রে অন্যতম নেতা ও পথ-প্রদর্শক
শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

কুটীর-শিল্প সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। বাংলার রেশম-শিল্পের জন্য মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু ইহা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। গত ফরিদপুর বণিক্-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার দেশবাসীর দৃষ্টি ঢাকার বস্ত্র-শিল্পের বর্ত্তমান দুর্গতির প্রতি আকর্ষণপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন এবং কুশিদা বস্ত্র জেদ্দা, আলজিরিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি

স্থানে রপ্তানী হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে উহা নামিয়া মাত্র ৩০৷৪০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। একদা বিখ্যাত চারুশিল্পের চরম নিদর্শন ঢাকার এই মসলিন ও কুশিদা বস্ত্র-শিল্পকে বর্ত্তমানের আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে না রক্ষা করিলে, অনতি-বিলম্বেই ঐগুলি স্মৃতির বিলাস হইয়া দাঁড়াইবে। এই সম্পর্কে পূর্ব্ব-বাংলার ফরিদপুরের আর একটি লাভবান্ কুটীর-শিল্পেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'শীতলপাটী শিল্প' একদা এই অঞ্চলে প্রভূত সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া বহু লোকের, বিশেষ করিয়া মধ্যবৃত্তি ভদ্রগৃহস্থের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা হইত। এই শীতলপাটী সাধারণতঃ মুর্ত্তা হইতে প্রস্তুত হয়। এতদ্দেশীয় 'পাটীকর' এক সম্প্রদায়ই এই শিল্পের উপর ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের পুরুষেরা শ্রীহট্ট, কাছাড়, আসাম প্রভৃতি বহু দূরদেশ হইতে মুর্ত্তার বেত উঠাইয়া চালান দিত এবং ঐ বেত পাটী প্রতি ঠিকা মজুরী হিসাবে গৃহস্থের বাড়ী বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। অবসর-সময়ে ঘরে বসিয়া এই শিল্পের দ্বারা বহু গৃহস্থের মেয়েরাই দৈনিক তিন আনা হইতে ছয় আনা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইত। এখনও মাদারীপুর মহকুমার কার্ত্তিকপুর প্রভৃতি মৌজার অনেক মধ্যবৃত্ত গৃহস্থের মেয়েরা এই পাটী বয়ন কার্য্য করিয়া স্বাবলম্বী। এই পাটীকর সম্প্রদায়ের নবীনেরা এই শিল্পকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে না পারায় ক্রমশঃ ইহা লোপ পাইতে বসিয়াছে।

মোটামুটি খতাইয়া দেখিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হয় যে, আর্থিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী দিনের পর দিন স্থানচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। ইহার জন্যও বাংলায় বছরের পর বছর বেকারের হাহাকার বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা নিতান্ত আশঙ্কার বিষয়, সন্দেহ নাই। ১৯৩১ সালের আদম স্থমারীতে প্রকাশ যে, যে-যে ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অপ্রধান। যে সকল লাভজনক ব্যবসায়ে বাঙ্গালী নিয়োজিত ছিল তাহা হইতেও নানা কারণ বশতঃ ক্রমে অপসারিত হইতেছে। ১৯২১ সালে বাঙ্গালী পাট-ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল ১৮,৮৬০ এবং ১৯৩১ সনে উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৩৮৯৮। এই অপ্রত্যাশিত হ্রাসের কারণ ব্যবসার মন্দা হইলেও এই শূন্যস্থান বাঙ্গালী আর পূরণ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।

স্বদেশী যুগের পর হইতে, বিশেষ করিয়া গত দুই বৎসরের বস্ত্র-শিল্পে বাঙ্গালী অনেকখানি স্বাবলম্বী হইলেও, এখনও বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের বহু পশ্চাতে আছে। ১৯৩০ সালের হিসাবে দৃষ্ট হয়, যে সারা ভারতে সর্ব্বমোট ৩৪৪টি কাপড়ের কলের মধ্যে সন্দ্বীপ বোম্বাইয়ে ছিল ২:৯, মধ্য-ভারতে, ১৫, যুক্ত-প্রদেশে ২৫, মান্দ্রাজে ২৮ আর বাংলায় ১৭টী মাত্র। ইহার পরে ১৯৩: সালে বাংলায়
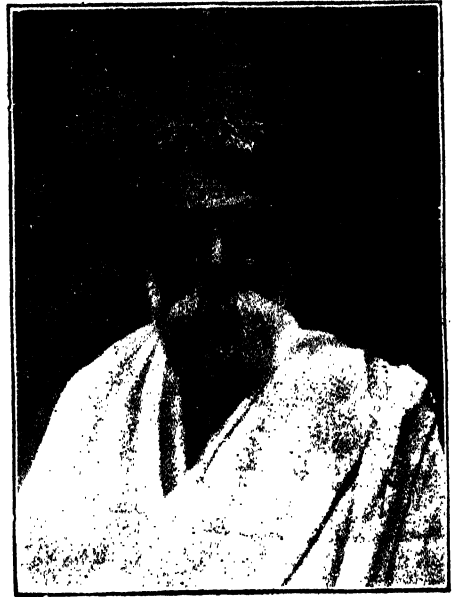
বাংলার অর্থসমস্যার সমাধান যিনি জীবন-ব্রত করিয়াছেন—
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

৪টি ও ১৯৩২ সালে ২০টি নূতন কল হয় এবং চলিত বৎসরেও অনেকগুলি কল-প্রতিষ্ঠার কল্পনা চলিতেছে। কাপড়ের প্রয়োজনানুপাত ধরিলে বস্ত্রশিল্পে বাংলার স্থান অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বহু নিম্নে। এক বাংলাদেশেই প্রায় ১৬ কোটি টাকার (সারা ভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশ) বাৎসরিক কাপড়ের প্রয়োজন, অথচ বর্ত্তমানে ৫০ লক্ষ টাকার বেশী বস্ত্র বাংলায় উৎপন্ন হয় না। সম্প্রতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় "বঙ্গশ্রী" কটন মিলস্ নামক

একটি নূতন কাপড়ের কল উদ্বোধন উপলক্ষে বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গালীর অর্থাগমের বিপুল সম্ভাবনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাঙ্গালীকে শিল্প-বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আচার্য্য রায় আজীবন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সমস্ত রাষ্ট্রান্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া বাংলার কৃষিশিল্প প্রভৃতি অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রগুলিকে পুনর্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করার সম্বন্ধে আচার্য্য রায় তাঁর মহামূল্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রদূত, তাঁর জীবনই বাঙ্গালীর সম্মুখে একটি বাস্তব সাফল্যমণ্ডিত আদর্শ।

বাংলার কৃষি ও কৃষকের অবস্থাও ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। যে দেশের শতকরা আশী জনই কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে, সে দেশের শিল্প-বাণিজ্য-বৃত্তি-সম্পদ্ সব কিছুরই সাফল্য নির্ভর করে চাষীর ক্রয়-ক্ষমতা ও চাষোৎপন্ন সামগ্রীর উপর। কিন্তু ইহারা শিক্ষা-দীক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত বলিয়া আধুনিক অভিনব ও উন্নততর কৃষি-কৌশল কিছু বরণ করিয়া লওয়ার সামর্থ্য নাই বা আশা করাও যায় না। বাংলার প্রাণ কৃষককুল আজ ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, রোগে-শোকে জর্জ্জরীভূত, বস্ত্রহীন, অন্নহীন। অভিজ্ঞেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, যে প্রত্যেক চাষীর বাৎসরিক গড়-আয় ৪২৲ টাকা; তন্মধ্যে ঋণ-সুদ ইত্যাদি বাদ দিলে থাকে মাত্র ৩৩৲ টাকা অথবা মাসে ২৸০ টাকা। ইহার মধ্যই তাকে গ্রাসাচ্ছাদনের ও কর ইত্যাদির ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের হিসাবমতে দেখা যায়, ১৯০৬ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বাংলায় গড়ে মাথা পিছু কৃষিঋণ ছিল প্রায় ২৫৲ এবং পরবর্ত্তী বৎসরে উহা ১০৲ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৩৫৲ টাকায়।

সম্প্রতি বঙ্গীয় বেকার-যুবক-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান বাংলায় আর্থিক দুর্গতির কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ১৯২৯-৩০ সালের পূর্ব্ব দশ বৎসরের গড়পড়তায় বার্ষিক বাংলার কৃষক সম্প্রদায় তাহাদের বিক্রয়যোগ্য বিভিন্ন ফসলের দরুণ পাইয়াছে প্রায় ৭২ কোটি টাকা এবং চাষীদের বার্ষিক খাজনা, ঋণ, সুদ প্রভৃতির পরিমাণ ২৮ কোটি টাকা বাদ দিয়া ৪৪ কোটি টাকার ক্রয়শক্তি চাষীদের ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই কৃষিপণ্যের বিক্রয়মূল্য যথাক্রমে হ্রাস পাইয়া হয় ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ৫৩ কোটি টাকা; ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে ৪০ কোটি এবং ১৯৩২-৩৩ সনে কিঞ্চিদধিক সাড়ে ৩২ কোটি টাকা, অথচ চাষীদের ঋণ ও খাজনার যে পরিমাণ তাহা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায়, যে যদি বাংলার কৃষিজীবী সম্প্রদায় তাহাদের দেয় টাকা মিটাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ক্রয়শক্তি শূন্যেরও কম হইয়া যায় এবং না দিলেও ক্রয়শক্তি যে অর্দ্ধেকেরও কম তাহা সুস্পষ্ট। কৃষকের এই দুরবস্থার জন্যই বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই হাহাকার দেখা দিয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপায়-স্বরূপ শ্রীযুক্ত খৈতান নির্দ্দেশ দেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে শস্যাদির মূল্য দ্বিগুণিত হইলে বাংলা আবার ১৯২০ হইতে ১৯২৯ সালের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু করে কে? গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই দেশের মুদ্রা-প্রচলনের পরিমাণ বাড়াইয়া অনায়াসেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট দেশের আভ্যন্তরিক কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণ না করিয়া মুদ্রা-বিনিময়ের সমতা রক্ষা করার জন্যই বরাবর আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। জাপান, মার্কিণ, এমন কি ইংলণ্ড (নিজের দেশে) প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের সমতা-রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া অন্তর্ব্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনানুযায়ী মুদ্রা-প্রচলন (currency) নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে কুণ্ঠা করিতেছেন না। রাষ্ট্র-পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক প্রগতি অনেক সময়েই পরস্পর পরিপন্থী। জাতির বাণিজ্য-প্রতিভা এই নিরুপায় অবস্থার মাঝে প্রতিপদে ব্যাহত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। অসহায় উপায়হীন জনসমাজের এমন অবস্থায় অরণ্যে নিস্ফল রোদন করা ছাড়া আর কি সম্বল আছে? কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিউটে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার দেশের এই সঙ্কটাবস্থা হইতে

মুক্ত করিতে হইতে হইলে বাংলায় বহুল পরিমাণে জমি-বন্ধকী-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন এবং উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেশবাসীর আশুদৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই ধরণের ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানের কৃষি-বিপর্য্যয়কে তো নিরাময় করিবেই, উপরন্তু বন্ধকী ঋণের দায়িত্বগ্রহণে মূলধনের সহায়তা করিয়া ব্যবসা-শিল্পেরও প্রভূত কল্যাণসাধন করিবে। বাংলার মফঃস্বল সহরে খাঁটি কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক নাই বলিলেও চলে; অথচ বাণিজ্যপ্রসারের গোড়ার কথাই এই ব্যবসা-বাণিজ্য-পরিচালনের সহায়তাকল্পে ঋণদান করিতে পারে এমন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। বাংলার বিভিন্নস্থানে বর্ত্তমানে যে ৮০০ শতেরও অধিক লোন-অফিস সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার কোনটিও এই প্রকার ব্যাঙ্কের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারে নাই বা পারিবারও কোনই সম্ভাবনা নাই।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা গভর্ণমেণ্টের বাংলার প্রতি অবিচার দিনের মত স্পষ্ট। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বিহার-উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে জমির উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধির জন্য গভর্ণমেণ্টে যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বাংলায় একান্তই অভাব। অথচ রেল-রাস্তার বেড়াজালে বৃষ্টির ও বর্ষায় নদী-নালার জলের আগম-নিগমের পথ রুদ্ধ হইয়া বঙ্গদেশ, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশঃ অনুর্ব্বর, ম্যালেরিয়া ও প্লাবনে প্রপীড়িত হইয়া পড়িতেছে। এই সকল রাস্তা প্রস্তুত করার সময়ে উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হয় নাই। অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আয়াপেক্ষা যদিও বাংলা গভর্ণমেণ্টের আয় অধিক, কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-কৃষি প্রভৃতির উন্নতিকল্পে টাকা চাহিলেই সরকারী তহবিলের অর্থাভাবের দুশ্চিন্তা প্রবল হইয়া উঠে। ১৯৩১-৩২ সালের সরকারী সেচ-বিভাগের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতেও এই মামুলী যুক্তির অভাব নাই। বর্ত্তমান বৎসরে চুয়াডাঙ্গা মহকুমাস্থিত চূর্ণী নদীর বদ্ধ মুখের খনন-কার্য্য ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দামোদর খালের কার্য্য শেষ হইয়াছে। বাংলার গভর্ণর কর্ত্তৃক ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে দামোদর খালের উদ্বোধন-কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই খালের জন্য হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার প্রায় ১৮০,০০০ একর ধান্যের জমির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে এবং যে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায়, জল-কর (একর প্রতি ৪৲ ধার্য্য হইবার প্রস্তাব হইয়াছে) দরুণ উশুল হইতে কোন বিঘ্ন হইবে না। এই কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের লোকসান হইবার কোন সম্ভাবনা নাই অথচ সরকারের একটু শুভেচ্ছা হইলেই ঋণ করিয়াও পশ্চিম বাংলার অনেক পতিত জমি উদ্ধার তাঁহারা করিতে পারেন। আলোচ্য বর্ষে বক্রেশ্বরের খাল ও কুমার নদের নিম্ন ভাগে কপাট-কল নির্ম্মাণ-কার্য্যও হাত দেওয়া হইয়াছে। কুমার নদ বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইয়া যাওয়ায় উহার তীরবর্ত্তী বহু বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ, গঞ্জ প্রভৃতি অতীতশ্রীহীন হইয়া বর্ত্তমানে নানা ব্যাধি, বিশেষ ম্যালেরিয়ার আকরে পরিণত হইয়াছে ও উভয়তীরস্থ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ক্রমশঃই অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে। এই নদের উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার অনেকাংশ ও কলিকাতার মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ পুনঃ-স্থাপিত হইতে পারে এবং রেল হইতে বহুদূরাবস্থিত মরা পল্লীগুলি আবার পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু আশার আলোক তো দৃষ্ট হয় না। সরকারী রিপোর্টেই বলা হইয়াছে যে, অনেক কার্য্যকরী পরিকল্পনাই মঞ্জুর হইয়া আছে বা অনেকগুলির তদন্তও চলিতেছে। কিন্তু ম্যাও ধরা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে কি না, সন্দেহ —কারণ, অর্থাভাব।

গভর্ণমেণ্টের এই চিরন্তন অর্থাভাবের ওজুহাতের গোড়ার কথা নিরন্ন বাংলার প্রতি দরদাভাব। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ইহার সত্যতা অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়াছেন, যাহা নিম্নের প্রাদেশিক তুলনায় দৃষ্ট হইবে :—

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	কোন প্রদেশ কত পায়	মাথা পিছু ব্যয়
বঙ্গদেশ	৫ কোটি	১১ কোটি	২॥০ টাকা
বোম্বাই	১২ কোটি ৯০লক্ষ	১৫ ,,	৮ ,,
মাদ্রাজ	৪ ,, ২ ,,	১৪ ,,	৪ ,,
পাঞ্জাব	২ ,, ১১ ,,	১১৺ ,,	৫॥০ ,,

অথচ অন্য দিকে বাংলা আদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ অন্যান্য সকল প্রদেশাপেক্ষা অধিক।

প্রদেশ	জন প্রতি ট্যাক্স	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যয়
বাংলা	৭॥০ টাকা	৮৵০ আনা
যুক্ত প্রদেশ	৩॥০ ,,	
বিহার	১৮০ ,,	
বোম্বাই		৩৲ টাকা
পাঞ্জাব		২৮০ আনা

সমগ্র ভারতে যত টাকা আয়কর রূপে আদায় হয়, তাহার শতকরা ৩৬৲ এক বাংলা দেশ হইতেই আদায় হয়। বাংলাদেশে মোট যত টাকা ব্যয় হয়, তাহার তিন গুণেরও অধিক আয় হয়। যে দেশ এমন নির্ম্মম ভাবে চারিদিক্ হইতে শোষিত হয়, সে দেশের দুর্গতি হওয়াটা আদৌ অপ্রত্যাশিত নহে। এই শোষণের পথ রুদ্ধ করিতে হইলে, দেশকে সংহতিবদ্ধ ও উদ্যত হইতে হইবে।

বাঙ্গালীর এই ঘোর জীবন-সংগ্রাম সমস্যায় নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যর্থতা, কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে অসহায় শিশুসুলভ বিমুখতার কারণ ও পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন,—"আমার মনে হয়, ইহার অন্যতম মুখ্য কারণ হইল বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যাপক দৃষ্টি ও সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যমের অভাব। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এতদিন তাহার সঙ্কীর্ণ কর্ম্মকেন্দ্রে বসিয়া যে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে; নতুবা পুনরায় শক্তি-সঞ্চয়ের সম্ভাবনা তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত। বর্ত্তমানে সর্ব্বদেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ব্বিশেষে সকল ব্যবসা-শিল্পই পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে। এই প্রভাবের প্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে কোন ব্যবসা-শিল্পই এখন আত্মরক্ষায় সক্ষম হইবে না। এই বিশ্বশক্তি এখন নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। একদিকে যেমন উন্নততর শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ইহার প্রকাশ দেখা যাইবে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন শুল্ক ব্যবস্থা, অর্থবিনিময় নিয়ন্ত্রণ, যান-বাহনের ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়া ইহার প্রভাব অভিব্যক্ত হইতেছে। যাহারা এই বিশ্বশক্তির দৈনন্দিন প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় অবহিত হইবে, তাহারাই ইহার সংঘাত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে; যাহারা এবিষয়ে উদাসীন, নিশ্চেষ্ট থাকিবে, তাহাদের পক্ষে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই চরম সত্য উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে কর্ম্মতৎপর হইতে হইবে।"

"কলিকাতা অন্তঃ ও বহির্ব্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। বাংলার ব্যবসা শিল্পের প্রসারের উপায় কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই করিতে হইবে। সঙ্ঘসৃষ্টির প্রয়োজন বর্ত্তমান যুগে কেবল ব্যবসা-ক্ষেত্রেই নয়, সকল প্রকার প্রচেষ্টাতেই উহার সার্থকতা দৃষ্ট হইয়াছে। বাংলার প্রত্যেক জেলাকে কেন্দ্র করিয়া যদি ব্যবসায়িগণের সঙ্ঘ সৃষ্ট হয় এবং সেই সঙ্ঘগুলি

অর্থক্ষেত্রে কৃতী শিক্ষিত বাঙ্গালী
স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যদি কলিকাতায় প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের সহিত সংযোজিত থাকে, তাহা হইলে অনায়াসেই সমগ্র বিশ্বশক্তির সহিত যোগস্থাপন সম্ভব হইতে পারে।"

দেশের এই উৎকট অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করাই জাতির সম্মুখে বিষম সমস্যা। একক চেষ্টার দ্বারা ইহা সম্ভব নয়, ঐক্যবদ্ধ ভাবেই জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। ব্যক্তিগত উদ্যম ও অধ্যবসায় দ্বারা ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, বাংলায় ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু ইহাতে জাতীয় সমস্যার সমাধান হয় নাই। ধ্বংসোন্মুখ দেশ-জাতিকে বাঁচিতে হইলে জাতীয় ভাবেই এই সমস্যাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, বাংলার বিস্কুট শিল্পের অগ্রদূত স্বর্গীয় কে, সি, বসু প্রভৃতি অনেক নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা অতি নগণ্য অবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে শিল্প-বাণিজ্যে প্রভূত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে জাতীয় সমস্যার সমাধান হয় নাই। ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইতে হইলে জাতীয় ভাবেই এই সমস্যাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

আশার কথা, যে বাঙ্গালীর সম্মুখে বাংলার এই আর্থিক ও অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার বিভীষিকাময় ভবিষ্যচ্চিত্রটী ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রতি রাষ্ট্রীয় নেতাদেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে। জেল হইতে মুক্তি পাইয়া প্রফেসর নৃপেন ব্যানার্জ্জি বাংলার তরুণের সামনে তাঁর ভাবী কর্ম্মধারার সম্বন্ধে যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা চিন্তনীয় বিষয়। পণ্ডিত জহরলালজীও ভারতের তথা বিশ্বের বর্ত্তমান সমস্যা, অর্থনৈতিক বলিয়াই দৃঢ় অভিমত দিয়াছেন। বিশ্ব আজ এই অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য ও কূট পাক-চক্রে পড়িয়া বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত। সকল দেশের মনীষীরা ইহার সুষ্ঠ মীমাংসার জন্য আজ চিন্তিত। সকল ঘনঘোর তমিস্রা ভেদ করিয়া সুদিনের প্রভাতী আলো অদূর ভবিষ্যতে ফুটিয়া উঠিবেই। বাঙ্গালী কি এখনও ঘুমাইবে! যুগ-যুগান্তব্যাপী সৃষ্টির এ গর্ভবেদনা যে বাঙ্গালীকে আশ্রয় করিয়াই জাগিতে চাহে! বাঙ্গালীর দিব্য অভিনব অর্থনৈতিক সৃষ্টি কি বিশ্বমানবতাকে সার্থক করিবে না? বাঙ্গালীর জাগরণ-যুগের বোধন-ক্ষণের স্বামীজীর সে অমর বাণী বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া এখনও যে গর্জ্জিয়া উঠে,—"So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every one a traitor."

— ৫ —

যুগের প্রবাহে নারীও সর্ব্বতোভাবে আত্মদান করিবে। এই প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া নারী আপনার সত্যই চিনিয়া লইবে, মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে কল্যাণকেই। যুগের ডাক কি নারীকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে? তাহার মুক্তির প্রেরণা কি এমন তির্য্যক্ আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী গ্রহণ করিতে পারে যাহা সমাজের বুকে জ্বালাইয়া তুলিবে অশান্তির দাবানল, ঘরে ঘরে ঘোর অন্তর্ভেদ সৃষ্টি করিবে? উহা কি বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র পারিবারিক স্বরাজ্য, তাহার সুখ-শান্তির চির-নীড় ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে? এ আশঙ্কা একেবারে অমূলক তাহা বলিতেছি না; কিন্তু যুগস্রোতঃ ঠেকাইয়া রাখা কাহারও সাধ্য নহে, প্রত্যুত তাহা কল্যাণকরও হইবে না। বিধাতা যদি সত্যই জাতির অভ্যুত্থান চাহিয়া থাকেন, তবে এই খরতর জাগরণ-যুগে নারীকে অন্তরে বাহিরে সজাগ ও প্রস্তুত হইয়াই জাতির জয়-যাত্রায় যোগদান করিতে হইবে।

নারী আজ আর ঘরের ক্ষুদ্র পরিসীমায় তার ব্যক্তিত্বের সবখানি স্ফূর্ত্তি খুঁজিয়া পাইতেছে না। দীর্ঘ দিনের অবরুদ্ধ চেতনা আজ বাহিরের মুক্ত আলো বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়া একটু হাঁফ ছাড়িতে চায়। নারীরও একটা বিশিষ্ট অস্তিত্ব আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে; নারীহৃদয়ের বিশিষ্ট প্রেরণা তাহার নিজের স্বাধীন মৌলিক ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। এই অন্তঃপ্রেরণাকে যথার্থভাবে অবধারণ করিতে এবং জীবন দিয়া উহারই বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ কল্যাণ-মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে যদি এক মুঠা অগ্নিময়ী নারীও এ দেশ ও জাতির মধ্যে দেখা না দিত, আমরা যুগের-বাংলা-গঠনে একবারে নিরাশ হইতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাগ্যক্রমে, বাংলায় পুরুষের ন্যায় বাঙ্গালী নারীও আজ যুগশক্তির নির্দ্দেশ বুঝিতে একেবারে অসমর্থা নহেন। যুগ-ধর্ম্ম-সাধনে বাংলার নারীশক্তি আজ উন্মাদিনী বেশে জাগিতেছে। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী মহাশক্তির জাগ্রত পদ-ভরে অচল সমাজবক্ষে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ বহিয়া যাইবে, ইহা বিচিত্র নয়।

বাংলার নারী প্রথমেই জাগিয়াছে প্রলয়মূর্ত্তি লইয়া! ইহাতে ভীত হইবার, অনির্দ্দেশ্য আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবার কিছুই নাই। পুরুষ যেমন যুগশক্তিকে আশ্রয় দিতে গিয়া একদিন যুগ-স্রোতে টলিয়া, ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, আজ নারীর জীবনেও সেই একই প্রকার অভিজ্ঞান যথাক্রমে দেখা দিবে, ইহা আশাতীত নহে। পরন্তু এইরূপ না দেখিলেই আমরা চিন্তিত হইতাম—মনে করিতাম, যুগের জাগরণী আলো নারীর অন্তরে যথার্থ

বিদ্যুৎ-স্পর্শে দেয় নাই। যুগশক্তি যে জীবনেরই জাগ্রত অনুপ্রেরণা, এই বিদ্যুন্ময় জাগৃতি যেখানে নামিয়া আসিবে সেইখানেই দেখা দিবে গতির চাঞ্চল্য, প্রাণের উদ্দাম, অস্থির, সজীব বিক্ষোভ ও ঝঞ্ঝনা। প্রাণ যখন জাগে, তাহা হিসাব করিয়া জাগে না—নারীর প্রাণও আজ কুল-হারা তটিনীর মত উচ্ছ্বসিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহার তাহার বেদনার জালা আজ নয়নে অগ্নি উদ্গীরণ করে। বুকে তাহার দাব-দাহ, মরু-ময়ী পিপাসা তর্পণ চাহে। এখানে শুধু প্রাচীন সভ্যতার আদর্শ-বাণী আজ আর সত্য সত্যই সান্ত্বনা দিতে পারে না। নারী আজ চাহে আলো—মুক্তির, স্ব-প্রতিষ্ঠার আলো; এই আলো মানুষ হইয়াই সে খুঁজিতে পা বাড়াইয়াছে।
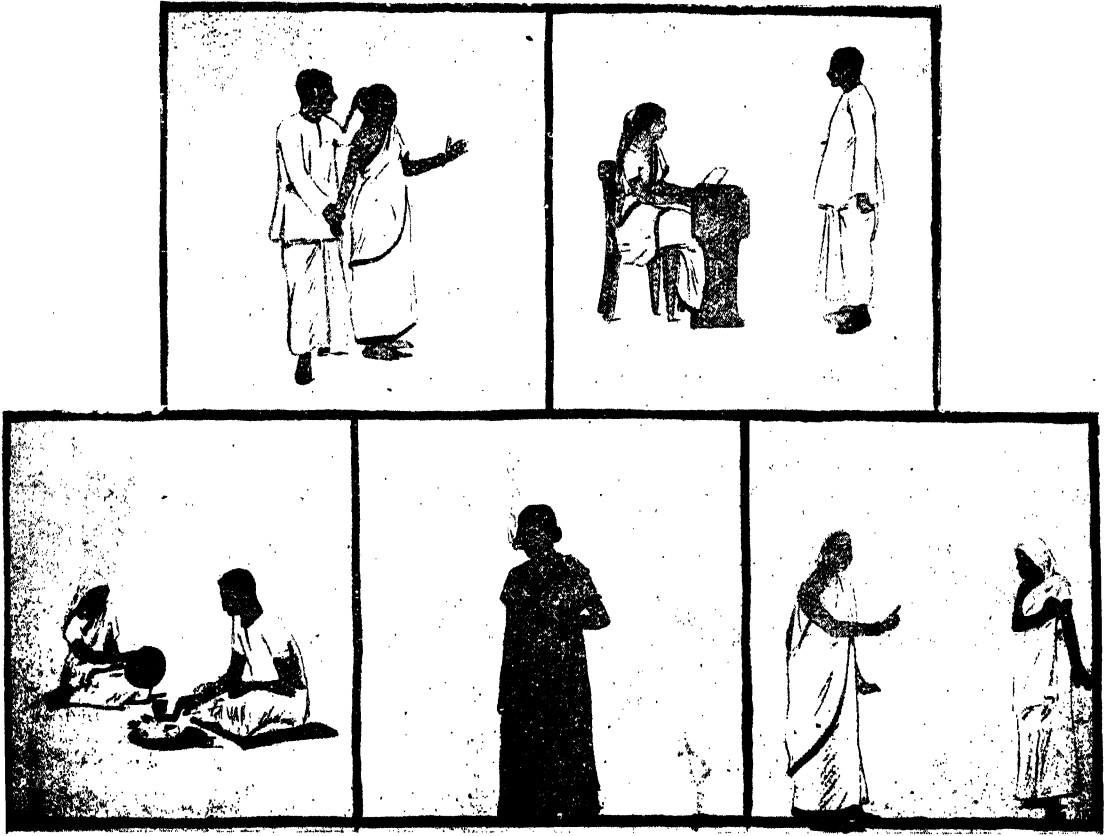
বাঙ্গালীর সংসারে নারী—নানা অবস্থায়

সম্মুখে কোনও নিন্দা, ভৎর্সনা, প্রতিকূল সমালোচনা, বাহিরের বাধা বিঘ্ন পরিণামে টিকিবে না।

নারীর এই চঞ্চল জীবন-বন্যার চরম গতি-নির্দ্দেশের সময় এখনও নয়। সে আজ পাইয়াছে একটা গতি—শুধু আদর্শের দিক্ হইতে নয়, জীবনের দিক্ হইতেই। জীবনের দায়ই আজ গুরুভার জগদ্দল পাষাণের মত চাপিয়া নারীর কমনীয় প্রাণ নিষ্পিষ্ট, উন্মথিত করিয়া তুলিতেছে।

আজ যুগের বাংলায় নারী তাই অন্ধকারের অবগুণ্ঠন মাথা হইতে খসাইয়া, সরল চক্ষে পৃথিবীর ও আকাশের পানে তাকাইতে দ্বিধা করে না, কোনও মানা শুনে না; নারীর লজ্জা তার স্বাভাবিক পবিত্রতার জ্যোতির্ম্মণ্ডিত হইয়াই নয়নকে সত্যের প্রদীপ্ত আবরণে রক্ষা করিবে। পাপ লুকাইয়া থাকে অন্ধকারে, সকল সতর্ক প্রহরা-দৃষ্টি ও নীরন্ধ্র প্রাচীর-বেষ্টনী এড়াইয়া—ইহা আজ বুঝিয়াছে

বলিয়াই নারী আজ ঘরের বাহিরে আসিয়াও নিঃসঙ্কোচে সহজ স্বচ্ছন্দ পদবিক্ষেপে জীবনের নানা ক্ষেত্রে চলাফেরা করে।

"সচল হয়ে অচল সে
বস্তার চেয়ে ভারী—
মানুষ হয়েও সঙের পুতুল
বঙ্গদেশের নারী!"

বাংলাদেশের শিক্ষিতা নারী সম্বন্ধে একথা আর বলা চলে না। ট্রেণে, ট্রামে, বাসে, সাইকেলে, মটরে, এমন কি অশ্বারোহণেও বাঙ্গালী নারী নির্ভয়ে, নিঃসঙ্গ হইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সিষ্টার নিবেদিতার কথা—"Schools large and small, schools in the home and out of it, schools elementary and advanced, all these are an essential part of any working out of the great problem." যুগের ধর্ম্ম প্রবল শিক্ষা-প্রসারের মধ্য দিয়াই সুসাধ্য হইবে। শুধু নারীকে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে—"these schools must be within Indian life, not antagonistic to it." দলে দলে সারি দিয়া উৎসর্গ-

শিক্ষয়িত্রী

নারী ইন্সিওরেন্সের ক্যান্‌ভাস করিতেছে

ব্রতে দীক্ষিতা নারী শিক্ষা-যজ্ঞে আত্মদান করুক। যে উন্মাদনা আজ জীবনের দায়ে আসিয়াছে তাহাই উৎসর্গের প্রেরণায় নিঃস্বার্থ ও উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিলে, বাংলায় অভিনব জাতি গঠনের আয়োজন সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রেই সুচিত হইবে। নারীর বুকে দাবানলের ন্যায় শিক্ষার অসীম ক্ষুধা যুগের প্রয়োজনেই ফুটিয়াছে; ইহা শুভ পথে পরিচালিত হইলে জাতির অর্দ্ধশতাব্দীর অগ্রগতি নারী দশ বৎসরে সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিবে।

নারীর প্রকৃত শিক্ষা বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব নয়, তাহার স্বরূপাবধারণেরই হেতু। এই গতির পথে চলিতে

কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হয়। মারাঠী ও রাজপুত বীর-বালা যাহা পারে, বাংলার নারী-শক্তির পক্ষে তাহা অসাধ্য নয়, অশোভন নয়—রাণী ময়নামতী, রাণী ভবানীর গৌরবাধিকারিণী বঙ্গ-বালা কেন তাহাদের জাগ্রত জীবনোল্লাস এমনই শত সহস্র মুক্ত জীবন-ভঙ্গীর মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া তুলিবে না?

বাংলার নারী আজ জীবনের দায়েই নানা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে জীবিকার্জ্জনে ছুটিয়াছে। শিক্ষা চাই—নারীর শিক্ষা-সাধনার ভার নারীকেই তো গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই তো স্বাভাবিক। শিক্ষয়িত্রী-বেশে নারীকে আজ

চলিতেই নারী বুঝিবে—তাহার জীবনের দায় তাহার নয়, ভগবানের। সেদিন তাহার নয়নে জ্বলিয়া উঠিবে যে অভিজ্ঞতার আলো, তাহা কোনও মানুষের, সমাজের মুখ চাহিয়া যেমন তাহাকে বসিয়া থাকিতে দিবে না, তেমনি পুরুষের, সমাজের বিরুদ্ধে অভিমানিনী বিদ্রোহচারিণী হইয়া আত্মশক্তির তিলমাত্র ক্ষয় করিতেও তাহাকে দিবে না। নারী হৃদয়ে পাইবে সেই অমোঘ, অব্যর্থ বাণী, যাহা তাহার হৃদয়দেবতার, ভগবানেরই। আপনাকে চিনিবে সে পুরুষোত্তমেরই চিন্ময়ী শক্তিমূর্ত্তি রূপে। এই স্বরূপের অবধারণ জাগ্রতা নারীর পক্ষে সুদুরূহ নহে। উৎসর্গ-

অবাধ মেলা-মেশা!

মন্ত্রের সাধনেই ইহা লব্ধ হয়, সিদ্ধ হয়। বাংলার নব-জাগ্রত নারীসমাজ যুগশক্তির বরণীয় যন্ত্র রূপে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই যুগের দীক্ষা বরণ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবে না।

পারিবারিক দায়ের সহিত আজ দেশ ও জাতীয়তার দাবী সংযুক্ত হইয়া নারীকে সমধিক মহনীয় করিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিবার প্রেরণাই দিতেছে। জীবিকার পথে, নারী আজ কোনও ক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ্ নহে। শিক্ষা-বিভাগ ছাড়া ডাক্তারী, নার্সিং, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী কেরাণী, ইন্সিওরেন্স-এজেন্টের কাজ—সর্ব্বত্র শিক্ষিতা বাঙ্গালী নারী অভিযান করিয়াছে। নারী গ্রন্থকর্ত্রী আজ পুস্তকপ্রকাশকমণ্ডলীর সসম্মানে গণনীয়া; নারী লেখিকা আজ সাহিত্যক্ষেত্রের সর্ব্বত্র সুপরিচিতা, সমাদৃতা; নারী রাষ্ট্র-নায়িকার কল-কণ্ঠে অগ্নি-বৃষ্টি সভাক্ষেত্রে, কংগ্রেসে, কর্পোরেশনে, শ্রমিক আন্দোলনে জন-গণ-মন উত্তেজিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। জীবনের দায় প্রসারিত হইয়াই নারীর এই বৃহত্তর জীবনসাধনার ক্ষেত্র ও বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী জাতি ও সমাজের পরিবর্দ্ধিত সমৃদ্ধি ও সজীবতার লক্ষণ রূপে ক্ষিপ্র বেগে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে।

বাংলার পুরুষ যেখানে পৌরুষ-রক্ষায় অক্ষম, সেই-খানেই শক্তির ব্যাভিচারিণী মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। মূর্ত্ত মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক লক্ষণ না দেখিতে পাইলেই শক্তি

অফিষে বসিয়া নারী কাজ করিতেছে

ডাকিনী-যোগিনীর বেশে তাহাদের রক্ত মাংস খায়। যেখানে সত্যই ঐশ্বরিক ভাব, সেখানে নারী হৃদয়মন্দিরের দেবী রূপে গৃহ, সংসার, সমাজ, সবই দিব্য মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলে। পুরুষ যদি হয় চরিত্রহীন, স্বার্থপর, রুগ্ন, দুর্ব্বল, কাম-পিশাচ, নারী সেখানে তার সত্য গৌরব ও অধিকার খুঁজিয়া না পাইয়া বিদ্রোহ ও অনাচারে মাতিবে, ইহা অস্বাভাবিক নয়। ইহাই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি তাহা বলিতেছি না; কিন্তু স্বভাব-ধর্ম্ম অতিক্রম করার সুশিক্ষা না পাইলে, নারী ও পুরুষের মধ্যে যে নিত্য সত্য সম্বন্ধ ও মিলন তাহা কখনও প্রস্ফুটিত ও লীলায়িত হইতে পারে না। চরিত্র যদি ঠিক থাকে, যেমন বাল্যবিবাহ করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে, তেমনি

অস্পৃশ্য স্পর্শ-শঙ্কিতা

গোপন বা ব্যক্ত আকারে নিহিত থাকিয়া কোথাও নারী-সাধনা জয়যুক্ত হইতে দেয় নাই, এখনও সম্পূর্ণ রূপে দিতেছে না। তাই নারীকে দেখিতে পাই, হয় স্বাধিকার-বঞ্চিতা কিম্বা স্বাধিকার-প্রমত্তা রূপেই—এই উভয় রূপই সর্ব্বনাশকারী, জাতিত্বের মূল ক্ষয় করে। যে নারী অন্ধ অজ্ঞানের বশবর্ত্তিনী হইয়া ধর্ম্মের দুয়ারে ধন্না দেয়, স্বার্থ ও কামনার পূরণ-বাসনায় অশ্বত্থতরু-শাখায় 'মানসিক' বন্ধন করিয়া আসে, ছদ্মবেশী নর-পিশাচ মোহান্ত বা ধর্ম্মগুরুর চরণে লুটাইয়া তাহার কামনার ইন্ধন যোগায়, প্রলোভনে সম্মোহনে নিজ অমূল্য সতীধর্ম্ম খোয়াইয়া বসে—যে নারী ভরণাক্ষম ভর্ত্তা বা অর্থগৃধ্ন ভ্রাতার

বালিকার স্বয়ম্বরা হওয়ায়ও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই; আবার যুবতী কিশোরী অবাধ স্বাধীনতা পাইয়াও শুদ্ধ স্বভাবের নৈসর্গিক কবচে সুরক্ষিত হইয়া দেশ ও সমাজের নৈতিক আব্‌হাওয়া কলুষিত করিয়া তুলিবে না। এই চরিত্রের ভিত্তি শিক্ষা ও সাধনায় সুগঠিত করিয়া তোলাই নারী-জাগৃতির মূলীভূত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ-প্রেরণা।

ইহার অভাবেই, প্রাচীন ও নবীন উভয় যুগেই সামাজিক পাপ, দুর্নীতি, অন্ধতা ও উন্মার্গগামী ভোগ-লিপ্সার বীজ
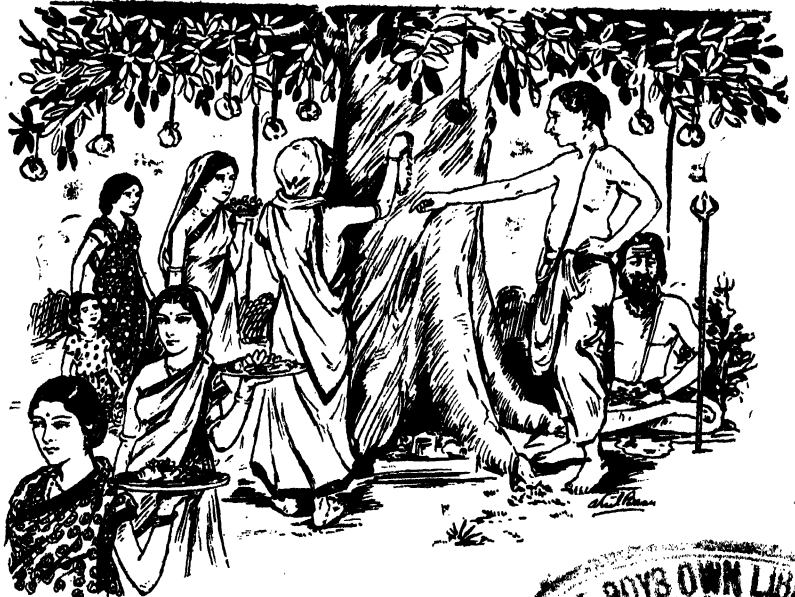
দলে দলে নারী অশ্বত্থ-শাখায় "মানসিক" বন্ধন করিতেছে
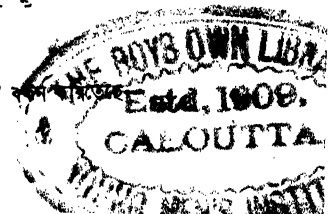
প্ররোচনায় নারী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, স্বীয় যৌবন-বিক্রীত উপার্জ্জনে ঐ নরাধমদেরই অর্থ-পিপাসা চরিতার্থ করিতে বাধ্য হয়, যে নারী স্বগৃহেই কামুক দেবর ও তাহার রাক্ষসী জননী শ্বশ্রূবেশধারিণীর জঘন্য ষড়যন্ত্রে ও অমানুষ অত্যাচারে ধর্ষিত, মূর্চ্ছিত ও রক্তাক্ত হয়—যে নারী আততায়ীর হাতে ঘরে বাহিরে সরমহীন হইয়া আবার নিশ্চিন্তে নিশীথ রাত্রে স্বামীর পার্শ্বে ঘুমাইয়াও শান্তি পায় না, বলাৎকার হইতে নিষ্কৃতি পায় না—সে নারীর স্বস্তি কোথায়, ভবিষ্যৎ কোথায়? আর যে সমাজ নারীকে দুর্ব্বৃত্ত হইতে রক্ষা করার শক্তি ধরে না, কিন্তু অরক্ষিতা, বলপূর্ব্বক অপহৃতা ও ধর্ষিতা অবলা ভাগ্যক্রমে ঘরে ফিরিলেও, তাহার দিকে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া মৃত্যু অথবা ততোধিক ভয়াবহ অত্যাচারীর আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে—ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পাপের এক নিক্তিতে ওজন করিয়া নির্লজ্জের ন্যায় কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত মূল্য আদায় করিতে ত্রুটি করে না—সে সমাজেরই বা স্বস্তি কোথায়? কল্যাণ কোথায়?

অন্য দিকে, নারী যেখানে স্বীয় জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যে, স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া, স্বাধীনতার ক্ষুধায় স্বেচ্ছাচারিতাকেই প্রকৃষ্ট জীবননীতি বলিয়া বরণ করে, নারী যেখানে বিলাসিনী, প্রভাতের প্রজাপতি সাজিতেই সাতিশয় আগ্রহ করে, স্বৈরচারিণী বেশে আকর্ষণের কেন্দ্র হইতেই পুরুষ-সমাজে মিশে, অবাধ মিশ্রণে সম্বন্ধের ব্যাভিচারে ভয় পায় না—শিক্ষা যেখানে কামনার পালিশ্ হইয়া শুধু অসারতাই ঢাকিয়া রাখে, ত্যাগ তপস্যা ভুলাইয়া দেয়, সংযমের বিধান স্বভাবের বিরুদ্ধে অত্যাচার বলিয়া মনে করায়—নারী যেখানে একনিষ্ঠা-ত্যাগে বহু-নিষ্ঠায় অনুরাগিণী হইয়া সতী-ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যায় লজ্জা পায় না, বহু পতির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রেমের চরিতার্থতা খুঁজিয়া বেড়ায়—নারী যেখানে বিজয়ী সভ্যতার অনুকরণে ডাইভোর্স চায়, পরীক্ষামূলক বিবাহের অভিনয় চায়, ফিল্মে খ্যাতি অর্জ্জন করে, বিলাস-নৃত্যে দর্শকের মন ভুলায়—কুমারী, যুবতী, বিধবা নির্ব্বিশেষে গর্ভনিরোধ বটিকায় অনিয়ন্ত্রিত যৌবনের মুস্কিল আসান খুঁজে—সে নারী-জাগরণ ও তপস্যার অভাবে, মূলে ঘুণ ধরিয়া, অচিরাৎ নিজেকে ও সমাজকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে—জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষা করিতে পারিবে না।

নারীর জাগ্রত শক্তি এই উভয় সঙ্কট পাশে ঠেলিয়া, জ্ঞানের তপস্যায়, প্রেমের মাধুর্য্যে, অসাধারণ সংযম-নিষ্ঠ চরিত্র-বলে, পবিত্রতার বিপুল তরঙ্গে সমাজ-জীবন অভিষিক্ত করুক—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী জগদ্ধাত্রীই নবজাতির মাতা, ভগ্নী, কন্যা রূপে ঘরে ঘরে বিদ্যুন্ময়ী যুগসাধিকা রূপে অভ্যুত্থিতা হউন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আবাহন

পূজা আসিল। দুর্গোৎসব বাংলার জাতীয় উৎসব। সঙ্ঘের পুরুষ-নারী এই উৎসবের নূতন করিয়া অনুষ্ঠান করে, নূতন ভাবে প্রেম ও ঐক্যের শক্তি অনুভব করে। সঙ্ঘের পূজা প্রতি বৎসর নব নব আকারে, নূতন ভাবে, সে সকলের প্রাণ অভিষিক্ত করে।

সঙ্ঘ যোগ-জীবনের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। যোগের আশ্রয় এখানে প্রেম; সম্বন্ধ তাহার অভিব্যক্তি। সঙ্ঘের দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসে দেখা যায়, যোগ-সিদ্ধ হওয়ার পথ দুর্গম ও কঠোর তপঃসাধ্য দেখিয়া কেহ বিমুখ হয়, কেহ বা কাম আশ্রয় করে। যোগই শক্তির দ্যোতক। কাম ও প্রেম দুই-ই যোগের আশ্রয়। কামাশ্রয়ীর জীবন-প্রকাশ যেমন অকস্মাৎ ঝিলিক দিয়া উঠে, তেমনই প্রতিক্রিয়ার আঘাতে ইহা এক মুহূর্তে ঢুইয়া পড়ে।

প্রেমাশ্রয়ীর জীবন দিব্য, ভাগবত। ইহা কঠোর তপঃসাধ্য ও দীর্ঘ-কাল-সাপেক্ষ; কিন্তু ইহার পূর্ণতা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও ঋতময় হয়। কামাশ্রয়ীর কর্ম্ম-প্রেরণা ও জীবনের উত্তেজনা অধিক দেখা যায়, তাহার কারণ যোগ-সিদ্ধ জীবন এখনও প্রকাশ হয় নাই। যোগ-সিদ্ধ হইতে হইলে প্রেমাশ্রয়ী হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইয়া অধিকাংশের জীবন এই উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মত হওয়ায় অথচ কামাশ্রয়ে বিরত অবস্থাই যোগাশ্রয় মনে করায় যে গর্ব্ব তাহাই জীবনের পঙ্গুত্ব প্রকাশ করে।

সঙ্ঘের এই উভয় অবস্থা ভেদ করিয়া যোগবীর্য্যের বিশুদ্ধ সত্তা সঙ্ঘ-মন্ত্রে দীক্ষিত মাত্রেরই জীবনের আংশিক অবদান সমাহৃত করিয়া, সঙ্ঘকে শনৈঃ শনৈঃ মূর্ত্ত করিতে চাহিতেছে। যাহারা কামাশ্রয়ী হইয়া সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, যাহারা কাম ও প্রেমের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় দোদুল্যমান, তাহারা সকলেই যেদিন দৃঢ় সঙ্কল্পে একান্ত ভাবে প্রেমাশ্রয়ে কৃতার্থ হইবে, সেইদিন সঙ্ঘজীবনের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য হিন্দু-ধর্ম্মের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিবে। কামাশ্রয়ী নিষ্কামচিত্ত নহে, ইষ্টে অনন্যচিত্ত নহে; ইহা সে নিজে এবং অন্যে সহজেই বুঝে—এই জন্য এই অবস্থায় তাহার কর্ম্ম ও প্রকাশ অবাধ। কামাশ্রয় ত্যাগ করিয়া প্রেমাশ্রয়ে অভিষিক্ত নয়, এমন যে জীবন তাহাই জটিল। সমস্যাময় অথচ সঙ্ঘধর্ম্মে বিশ্বাসী, এই উভয় দলকে আজ সঙ্ঘকে সিদ্ধ করার জন্য অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। সঙ্ঘই জাতির শক্তি; সঙ্ঘই ভবিষ্যভারতের অধিকতর সঙ্কটযুগে পরিত্রাণের হেতু হইবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যোগের আশ্রয় যে প্রেম তাহাতে সর্ব্বতোভাবে অবহিত না হইলে, নিষ্কাম কর্ম্মের যে প্রভাব ও গৌরব তাহা কোনমতে প্রকাশ হইতে পারে না। এই কর্ম্মই জ্ঞান-প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল ও ভাস্বর এবং এই আলোকেই বিশ্বের অন্ধকার দূর হইতে পারে—এইজন্য সঙ্ঘের পুরুষ ও নারী, সঙ্ঘের অনুরাগী, ভক্ত ও বন্ধু এই শক্তি-সাধনার দিনত্রয়ে সঙ্ঘের পূজামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যাহাতে নিবিড় ও সমাহিত চিত্তে যোগের পথে প্রত্যেকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার সাধনায় সকলকে সমবেত হইতে বলি।

সঙ্ঘে শক্তি-সাধনার এই নব পর্য্যায়ে বিভিন্ন অবস্থার নরনারীকে নিজ সাধনার ক্রম অনুসরণ করিয়া সঙ্ঘের মৌলিক যে প্রাণ তাহাকে পুষ্ট করিবার জন্য বিশুদ্ধ হৃদয়ের অবদান অর্ঘ্যস্বরূপ পূজাবেদীতলে স্থাপন করিয়া আজ সকলকে সমস্বরে প্রার্থনা করিতে হইবে—দিব্য জন্মের ও দিব্য কর্ম্মের। সঙ্ঘের ইষ্টস্বরূপ লক্ষ্য কল্পনার মূর্ত্তি নহে, ভাবময় স্বরূপ নহে, নরদেহে নারায়ণের বিগ্রহ কেন্দ্র করিয়া এই জাতির অভ্যুত্থান; আর শক্তির উপাসনাও ঘটে, পটে, যন্ত্রের অঙ্কন নহে, মূর্ত্ত মাতৃবিগ্রহের আরাধনা। নিষ্কাম কর্ম্ম জীবনের ধর্ম্ম না হইলে, এই অনুভূতি নিঃসংশয় ও বিপর্য্যয়-মুক্ত হয় না। তাই শ্রদ্ধা, উৎসর্গ সম্বল করিয়া আমরা প্রত্যেককে এই মহাপূজার বেদীতলে, এই মহাদেবীর পূজা ও আবাধনায় সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে অনুরোধ করি।
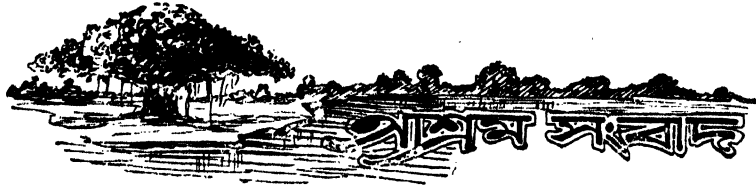
'প্রবর্ত্তক' শ্রমিক-সম্মিলন

"প্রবর্ত্তক-ভবনে"র বিভিন্ন বিভাগের অর্থক্ষেত্রে যে সকল শ্রমিক নিযুক্ত আছেন, সঙ্ঘের সাধক ও কর্ম্মিবৃন্দের সহিত সহযোগে আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে জীবিকার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে একটা উন্নত জীবন ও পরস্পর প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, তদুদ্দেশ্যে এক বৎসর পূর্ব্বে একটী শ্রমিক সম্মিলন হইয়াছিল। এ বৎসর শ্রীশ্রী৺বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষে তাহারই দ্বিতীয় সাম্বাৎসরিক সম্মিলনী সম্পন্ন হয়। "প্রবর্ত্তক-ভবনে"র সন্নিকটস্থ সঙ্ঘের কর্ম্মিমণ্ডলীর ২৫৭ বি নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থিত বাস ভবনে এই সম্মিলনী হইয়াছিল। সম্মিলনে 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে'র নেতা ও সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় চক্ষুর অস্ত্রোপচার বশতঃ অতি মাত্র দুর্ব্বল-শরীর হইলেও, উপস্থিত ছিলেন ও শ্রমিকমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাণীর মর্ম্ম সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত অগ্নিময়ী ভাষায় কর্ম্মিদিগকে বুঝাইয়া দেন ও খাদি-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা ও ব্রতী-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়ও এই উপলক্ষে একটী প্রাঞ্জল বক্তৃতায় সঙ্ঘের সাধক ও কর্ম্মীমণ্ডলীর সহিত কর্ম্মক্ষেত্রের এই সকল কর্ম্মী ও শ্রমিকমণ্ডলীর দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা ও নিত্যবৃদ্ধিশীল প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধের কথা নানা দিক্ দিয়া আলোচনা করেন। শ্রমিকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কেহ কেহ ইহার উত্তরচ্ছলে তাঁহাদের আশা ও বিশ্বাসের কথা জ্ঞাপন করেন।

পূজনীয় মতিবাবুর গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ উপদেশ-বাণী এইখানে সমুদ্ধৃত করিতেছি—

"যতদিন যাইতেছে ততই নিঃসংশয় হইতেছি, যে আমরা যতই শ্রম দিই, যতই উপার্জ্জন করি, ভাল আমাদের কোনও মতেই হইবে না, যতদিন না এক দল নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম কর্ম্মী গড়িয়া উঠে। এই দল ব্রাহ্মণের নহে, ভদ্রলোকের নহে, শিক্ষিত শ্রেণীর নহে—যারা নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, তারাই দেশের সর্ব্বপ্রকার দুরবস্থা দূর করার জন্য সংহতিবদ্ধ হইবে।

এই আহ্বান—ভারতের আহ্বান। এই মন্ত্রই ভারতের সনাতন ধর্ম্মকে মূর্ত্ত করিবে।"

পরিশেষে, কর্ম্মি-মণ্ডলীর একটী প্রীতিভোজ হইয়া অনুষ্ঠানটীর "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করা হয়।

—

প্রবর্ত্তক পল্লী-সংস্কার সমিতি

গত ১লা আশ্বিন রবিবার রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকার সময়ে চন্দননগর 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরে', প্রবর্ত্তক পল্লীসংস্কার সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। চন্দননগরের মেয়র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বোস মহাশয় সভাপতি ছিলেন। এই সভায় যথারীতি পূর্ব্ব বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিলোপ ও নূতন কার্য্যকরী সমিতির নির্ব্বাচন করা হয়। সমিতির সম্পাদকের পঠিত বিবরণী হইতে জানা যায়, এ বৎসর পল্লীর শিক্ষা ও জীবনোন্নতির জন্য একটী পাঠশালা স্থাপন ও অন্যান্য প্রচেষ্টা করেন। সমিতির কার্য্যোন্নতি পরিদর্শনে হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়।

—'আশ্রমী'

পূজার ছুটী

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে 'প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস' আগামী ৮ই আশ্বিন হইতে ১৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। ইতি—

কর্ম্মকর্ত্তা—"প্রবর্ত্তক"।

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, :61, Bowbazar St., Calcutta.
Printed by Krishna Prasad Ghosh, at Prakash Press—61, Bowbazar St. Calcutta.
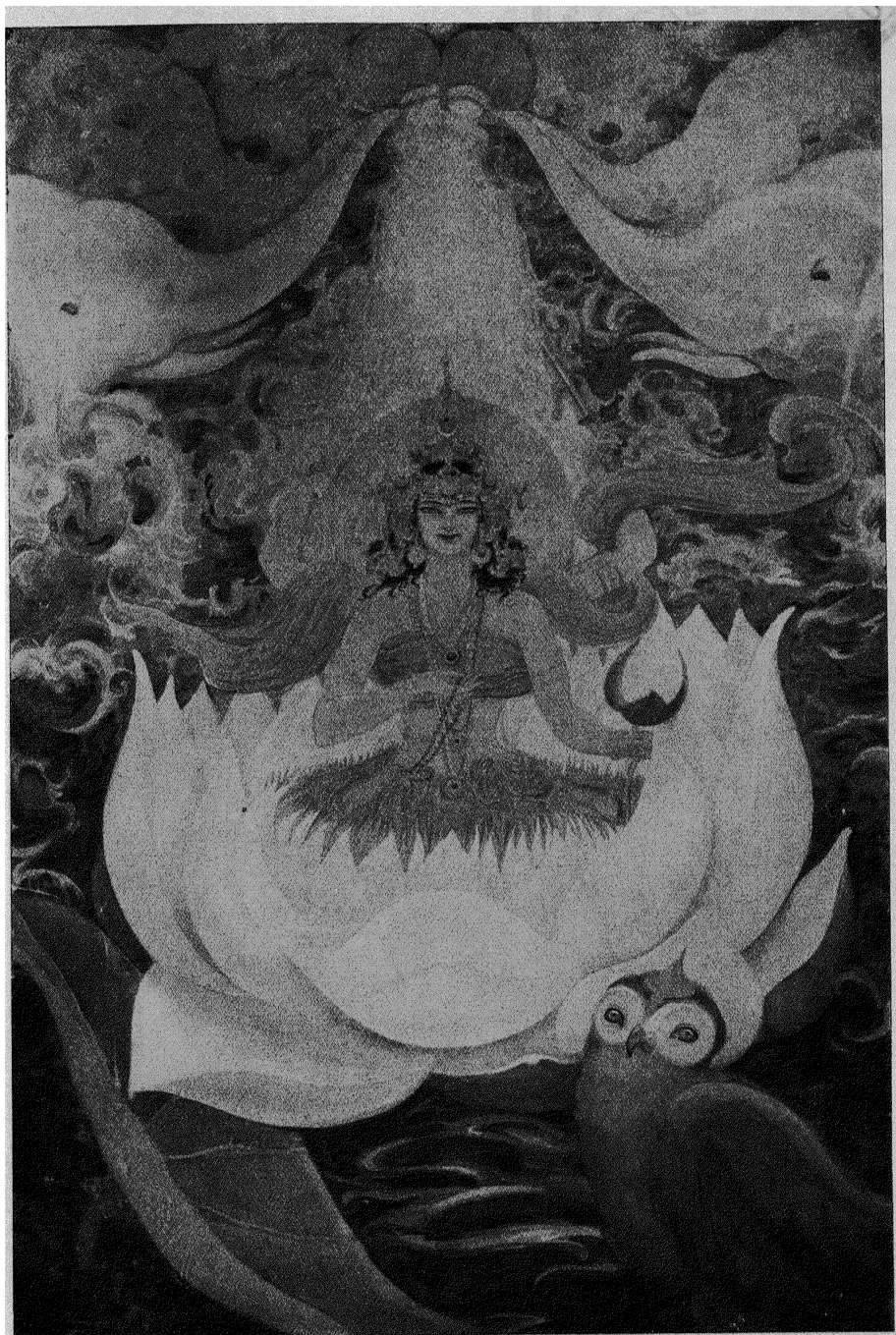
শ্রীলক্ষ্মী

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

ngraved by Prabartak Halftone Works, Calcutta.
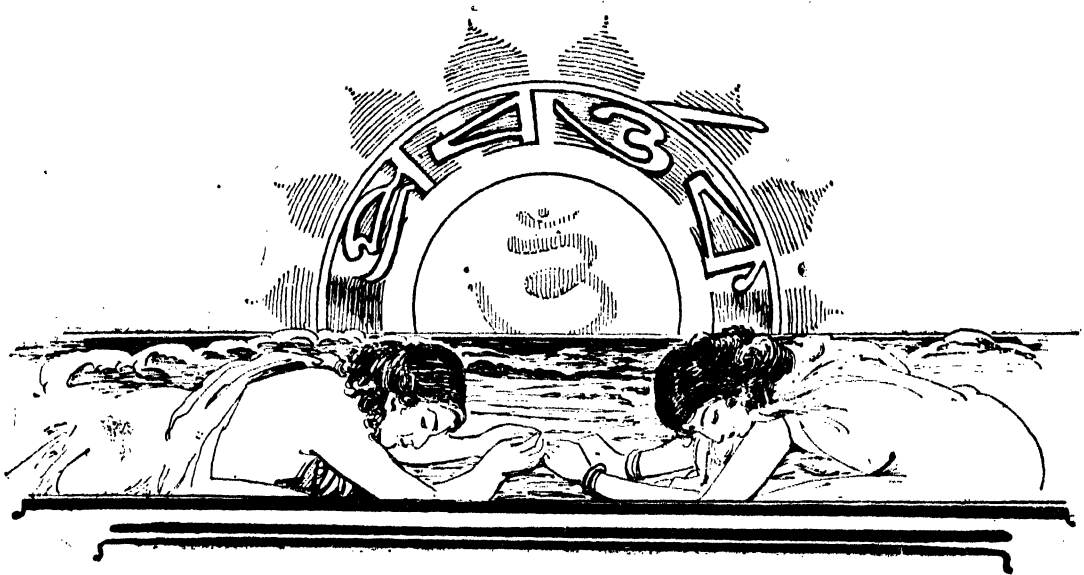
১৮-শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ | ৮-ম সংখ্যা

"টেরোরিজমের" প্রতিকার

মেদিনীপুরের পর হিলি।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, মেদিনীপুরে পর পর তিনটী শ্বেতাঙ্গ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হইয়াছেন আততায়ীর গুলিতে।

মিঃ পেডি কোন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় নাগরিকগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলে, প্রকাশ্য দিবালোকে এবং বহুজন সমক্ষে তাঁহাকে বিপ্লবিগণ আক্রমণ করে। তারপর মিঃ ডগলাসের কথা—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভায় বসিয়া তিনি যখন অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত শাসনব্যবস্থার কথা অথবা দেশের উন্নতি প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, একজনের অধিক, দুইজন বা ততোধিক হত্যাকারী দিবসের স্পষ্ট আলোকে তাঁহাকে হত্যা করে, এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর আততায়ী বলিয়া যে ধৃত হয়, সেও চরমদণ্ড লাভ করিয়াছে।

ইহার পর মেদিনীপুরে রাজকর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া কঠোর শাসননীতি প্রবর্ত্তন করেন। পুলিশ ও সামরিক কর্ম্মচারিগণের শাসন ও সতর্ক-দৃষ্টি সতত উদ্যত রাখা হইয়াছিল। বিপ্লবীর আত্মপ্রকাশের পথ রুদ্ধ করার দায়ে অনেক নিরীহ নাগরিকও বিব্রত হইয়াছিলেন; কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্য দিয়াই মিঃ বার্জ্জকে বহুজনসমাগমের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রের উপর নিহত করা হইল। অতঃপর শাসনের নাগপাশ কঠোর হইতে কঠোরতর যে হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে।

মেদিনীপুরের এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে কেবল ভারতের রাজপুরুষগণই বিক্ষুব্ধ বিচলিত হন নাই, ইংলণ্ডের মন্ত্রিবর্গ এবং অধিবাসিবৃন্দের কণ্ঠেও ক্ষুব্ধতার সঙ্গে অধিকতর সতর্কতার বাণী উঠিয়াছে, ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষ বাঙ্গালার নাগরিকগণের মধ্যেও ইহার প্রতিকারপ্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

বিপ্লব-দমনে আজ রাজা প্রজা উভয়েই বদ্ধপরিকর হইতে চাহে।

নাগরিক জীবনের যথার্থ দাবী ও অধিকার লাভের জন্য যাঁহারা বৈধী আন্দোলন শ্রেয়ঃ মনে করেন, তাঁহারা শাসনশৃঙ্খলারক্ষায় উদ্যোগী হইবেন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই ; কিন্তু আজ অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলন-কারিগণ এবং ভারতের রাজক্ষেত্রে চরমপন্থী বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি, তাঁহারা সকলেই একযোগে ইহার নিরসনে অনন্যমত হইয়াছেন। আজ দেশীয় সকল সংবাদপত্রেই জাতীয় জীবনগঠনের পথে বিপ্লবকর্ম্ম যে কিরূপ অন্তরায় হইয়াছে এবং আরও কতখানি বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হইতে পারে, এই সকল দেখাইয়া বিপ্লবীদের কর্ম্মধারা-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। দেশের নেতৃবর্গ, উচ্চরাজকর্ম্মচারিবর্গ, এংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকার পরিচালকবর্গ সকলেই আজ চাহিতেছেন বাংলার বিপ্লব আন্দোলন বন্ধ করিতে।

বিপ্লব-দমন-কল্পে দমননীতিই প্রয়োজন হয়, ইহাই সর্ব্বদেশের নীতি; কিন্তু ইহা দ্বারা প্রকৃত ব্যাধির প্রতিকার হইতেছে না দেখিয়া দেশীয় পক্ষ চাহিতেছেন—বিপ্লবীদের অন্তরে কোনরূপ সান্ত্বনাদানের ব্যবস্থা। অন্যপক্ষ বলিতেছেন, দমন-নীতির শেষ রাখিয়া কোন অভিমত-শ্রবণ বাঞ্ছনীয় নহে। দমনের অস্ত্রাগার শূন্য করিয়া একের পর এক সবগুলি অস্ত্র নিঃশেষে প্রয়োগ করা হউক ; বিপ্লব দূর হইবে। আবার এমন পক্ষও আছেন, যাঁহারা এই দুই নীতি প্রতিকারের উপায় নহে বলিয়া ভাবিতে বসিয়াছেন—কেমন করিলে অন্য কোন উপায়ে এই ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক আন্দোলন বাংলা হইতে দূর করা যায়।

বাংলায় বিপ্লব-বিষ ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া। কিন্তু সে বিপ্লব নিরসন করার উপায় ছিল। সে যুগের বিপ্লবীদের বিবেক ও যুক্তিতে দেশনেতৃগণের কথাই অবধৃত হইত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপার দেখিয়া এবং তাহার পর যে সকল বৈপ্লবিক বীভৎস কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহাতে আমাদের ধারণা—এই বিপ্লবিকের মনোবৃত্তির সহিত বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের সংস্রব খুব কমই আছে। প্রকাশ্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে, তাহা ইহারা সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষা করিয়া চলে, এমন কি মহাত্মার প্রতি ইহাদের সম্মানবোধও আছে বলিয়া মনে হয় না। একদিকে শাসন ও অন্যদিকে দেশবাসীর উপদেশবাণী ও যুক্তি—ইহাতে কাজ না হইলে বাংলায় এই চণ্ডনীতির অবসান কেমন করিয়া হইবে, ইহা দেশবাসীরই অধিক ভাবিবার বিষয় হইয়াছে।

সে একদিন ছিল, সত্যই যেদিন একদল জাতীয়পন্থী এইরূপ রাষ্ট্রনীতিক হত্যাকাণ্ডে কোনপ্রকার সংস্রব না রাখিয়াও এইরূপ কার্য্যে প্রকাশ্যে উল্লাস প্রকাশ করিতেন, সে একদিন ছিল যেদিন চরমপন্থিগণ সভাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ইহাদের নির্ভীকতার পরিচয় দিবার ছলে তাহাদের কার্য্যে একপ্রকার সমর্থন করিতেন। সে একদিন ছিল যেদিন জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে হত্যাকারীদের সহিদ বলিয়া প্রশংসাধ্বনি উঠিত। অন্য পক্ষ যাহাই মনে করুন, আজ কিন্তু দেশীয় কোন পক্ষই এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে প্রশ্রয় দেন না। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, বিপ্লবীরা কালের ঘনীভূত প্রলেপে এমনই গভীর আঁধারে মুষিকের ন্যায় পথ কাটিয়া চলিয়াছে, যেখানে প্রতিবাদের তিরস্কার বা প্রশংসার সাধুবাদ পৌঁছায় না, নির্য্যাতনের প্রচণ্ড আঘাতেই তাহাদের গতি স্তম্ভিত করে—কিন্তু মূল নিরসন করে না বলিয়াই সুযোগ বাড়িয়াছে।

দার্জ্জিলিংএ, সিমলা শৈলে, সম্পাদকের বৈঠকে, সর্ব্বত্র বিপ্লব-নিবারণের উপায় লইয়া আন্দোলনের গুঞ্জন উঠিয়াছে। কিন্তু প্রতিবিধানকল্পে শাসনাস্ত্র অধিকতর শানাইয়া তোলা ছাড়া অন্য কোনরূপ সুনীতি আবিষ্কৃত হইতেছে না।

এই জন্যই দেখি—মিঃ বার্জ্জের করুণ মৃত্যুর পর মেদিনীপুরেও চট্টলের অনুরূপ ভীম শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হইল। দেখিতে দেখিতে বাংলার দুইটী জিলা সামরিক আইনের নাগপাশে আবদ্ধ হইল। ইহাতেও ক্ষতি ছিল না—যদি ইহা দ্বারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা হইত। এইরূপ সান্ত্বনা কেহই আজ দিতে পারেন না। দেওয়াও সম্ভব নয়। অতীতে সরকারী বিবরণীতেই প্রকাশ, অকস্মাৎ বিপ্লবীর আবির্ভাব—শাসনপাশ

থাকিতেও অসম্ভব নহে। শারীরীক সংক্রামক ব্যাধি Quarrantine আইনে যদিও রোধ করা যায়—মনের দুরারোগ্য এই সংক্রামক ব্যাধি শাসনযন্ত্রে দূর হইয়াছে, ইহা ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশাসক ইংরাজ জাতিকেও বিপ্লবদমনে কোন অভিনব সিদ্ধ পন্থা আবিষ্কার করিতে না দেখিয়া আমাদের নৈরাশ্য আরও বাড়িয়া যাইতেছে।

চট্টল ও মেদিনীপুরের শাসকসম্প্রদায় যখন সামরিক শাসনের সাহায্যেই এই অঞ্চলে বিপ্লবদমনে বদ্ধপরিকর, তখন সুদূর উত্তর-বঙ্গে কয়েকজন বিপ্লবী আত্মপ্রকাশ করিল। হিলি ষ্টেশন আক্রমণ অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন অথবা দিনের আলোয় কোন উচ্চ শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীর নিধন রূপ নৃশংস ব্যাপার না হইলেও, বিপ্লবীর আত্ম-পরিচয় দেওয়ার স্পর্দ্ধা ইহাতে প্রকটিত হয়। এই জন্যই বলিতেছি, দেশে নির্য্যাতনের মাত্রা বাড়ায় একদিকে ইহারা যেমন উদাসীন, অন্যদিকে, যেমন প্রবাদ আছে, "রাজায় রাজায় লড়াই হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়" তদ্রূপ এইরূপ বিপ্লবীদের দুঃসাহসপ্রদর্শনে তাহাদেরই নিরীহ দেশবাসী, তাহাদেরই আত্মীয় পরিজন, পিতামাতা, সহোদর সহোদরা যে বিপন্ন হইবে, সেদিকেও তাহারা উদাসীন হইয়াছে। এই অবস্থায় রাজপুরুষদের শাসন-নীতির দোষ দিবার মুখ নাই, শান্তি ও শৃঙ্খলার মাঝে নাগরিক জীবনযাপনের অভিলাষী যাহারা তাহাদের অদৃষ্টেও দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য।

এই ক্ষেত্রে সভয়ে একটা কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য মনে হইতেছে। শাসকজাতি মনে করেন, বিপ্লবপন্থী যে সকল ক্ষেত্র হইতে অভ্যুত্থিত হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে পীড়ননীতি অধিক হইলে ভবিষ্যতে বিপ্লবীর সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে বিপ্লবসংহতি দেশের সহিত সংযোগ রাখিয়া চলিত, ইহারা তাহারা নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় পিতা তনয়ের সন্ধান পায় না, দুহিতার পরিচয় জানে না, —এ যেন ঠিক সেই কঠিন ঠাঁই হইয়াছে, যেখানে গুরু-শিষ্যের দেখা হয় না। এ কথা বুঝান খুবই শক্ত, কিন্তু রাজকর্তৃপক্ষগণকে ইহা প্রণিধান করায় অনুরোধ করি।

এত কথায় কোন পক্ষের সান্ত্বনা নাই। চাই বস্তুতন্ত্র প্রতিকার। নতুবা এইরূপ ব্যর্থ আলোচনা শুধু মসীক্ষয় নয়, শক্তি ও সময়ের অপব্যয়। সম্প্রতি একজন ইংরাজ বিপ্লবদমনের একমাত্র প্রতিকার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অতঃপর বিপ্লবীর কোনরূপ নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি উপস্থিত হইলে, বন্দীশালা হইতে দুইজন রাজবন্দীকে প্রকাশ্য স্থানে দাঁড় করাইয়া তাহাদের প্রাণবধ করা হউক। ইহা নূতন কথা নহে। আমেরিকার Lynching করার নীতি এখনও আছে। কিন্তু ইহাতে উদয়াস্তহীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব বাড়িবে না; আর একথা বৃটনবাসী ভাবিতেও পারেন না—আমাদের মত পরাধীন প্রজাও ইহা ভাবিলে মাথা নীচু করিবে।

কিন্তু প্রতিকার চাই। হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যার শাসন আজ না হউক, একদিন সভ্যতার আলোকে অপসারিত হইবে। মনুষ্যত্বের গৌরব বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। এই কথা রাজকর্তৃপক্ষের প্রতিই যে প্রযুজ্য তাহা নহে, ভারতীয় বিপ্লবীদেরও অনুধাবন করিতে বলি।

আর একটী প্রতিকারের কথা কাণে আসিয়া পৌছিয়াছিল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে—সিমলা শৈলে বৈপ্লবিক-দমন কল্পে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় সদস্য সম্মিলিত হইয়া এক উপায় নির্দ্ধারণ করেন। সম্প্রতি কুমুরের মিঃ জেমস তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রস্তাবিত উপায় কার্য্যে পরিণত না হইলে—মুক্ত কণ্ঠেই বলিয়াছেন, এমন দিন আসিবে যে দিন বিপ্লবীর অঙ্গুলীহেলনে ভারতের ব্যবস্থাপক সভা ও কর্পোরেশন প্রভৃতির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। আমরা ঐ প্রস্তাবিত কর্ম্মের বিবরণ যাহা পাই, তাহাও কার্য্যকরী বলিয়া মনে করি না; এবং কার্য্যকরী নহে বলিয়াই উহা এযাবৎ কার্য্যেও পরিণত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান বিপ্লবী দলের অন্তরে রাষ্ট্র, সমাজ, আর্থিক সংগঠনের প্রেরণা আদৌ নাই—এই হেতু ভারতীয় সমাজের সহিত ইউরোপীয়ান সমাজ একত্র হইয়া দেশীয় সংবাদপত্রের

সাহায্যেই বক্তৃতামঞ্চে, নগরে, গ্রামে, পল্লীতে প্রচার-কার্য্য যতই পরিচালনা করুন, আর দেশের বরণীয় কবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির স্বাক্ষরিত ইস্তাহার বিপ্লবের বিরুদ্ধে লিখিত ও প্রচারিত যতই হউক, "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনীর" ন্যায় ইহা কার্য্যে আসিবে না বলিয়া মনে হয়।

প্রতিকারের আর এক পন্থা রাঁচীর ইউরোপীয়ন পাগ্‌লাগারদের অধ্যক্ষ লেঃ-কর্ণেল বার্ডলেহিল দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, বাংলায় পাঁচ জন মনীষী লইয়া একটী কমিটী গঠন করা হউক ; উহার মধ্যে দুইজন উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্ববিদ্ থাকিবেন, যাঁহারা বিপ্লবি-গণের সামাজিক, নৈতিক, বংশানুক্রমিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া মনোবৃত্তির পরিচয় লইবেন এবং এই তত্ত্বানুশীলনের ফলে যাহাদের বিপ্লব-কর্ম্মে যোগদানের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদের মানস-পরিবর্ত্তনের সুব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যবস্থা একান্ত কঠোর কারাবন্ধনে সম্ভব নহে, বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্যাধির প্রতিকার করার ন্যায় তাহাদের সহিত সঙ্গত আচরণ করিতে হইবে—এইরূপ অবস্থায় বিপ্লব-বীজের মূল শোধিত হইলে বাংলায় এই বিষ আর ছড়াইতে পারিবে না।

শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ রুদ্র বিপ্লবতন্ত্রিগণের এই ভাবে সুচিকিৎসায় কতখানি উদ্যোগী হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহাপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম নীতি—আজ যে সকল বন্দী কারাবন্ধনে প্রতিদিন বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বাংলার আব্‌হাওয়া বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, তাহাদের কোষ্ঠীপত্রগুলি যদি সুদক্ষ জ্যোতিষীর হস্তে অনুশীলনের জন্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, প্রচণ্ড গ্রহকালটুকু কাহার কবে শেষ হইবে তাহা নির্দ্ধারিত হইলে নির্ভাবনায় একদল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। গ্রহচক্রে হত্যাকাণ্ডের সম্ভাবনা যাহাদের ভাগ্যে আছে, এমন তরুণদের বন্দী করিয়া রাখিলে এই দুর্দ্দৈব হইতে দেশ রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু সকলেই জানেন, বস্তুতন্ত্র রাজ্যশাসননীতি যাঁহাদের হস্তে সুরক্ষিত, তাঁহাদের নিকট এই সকল অপূর্ব্ব ও অসাধারণ পন্থা কার্য্যকরী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

তবে প্রতিকার কি ? হিলির ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ষ্টেট্সম্যান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার পূর্ব্বকথিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য তাগিদ দিয়াছেন—হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ প্রতিনিধি-পক্ষের সভার সাহায্যে মিলনের আব্‌হাওয়ায় বিপ্লব-বিষ নিরস্ত হওয়ার আশা করিয়াছেন—পরস্পরের শুভ কল্যাণেচ্ছা কর্পোরেশন, চেম্বার-অব্-কমার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত সংস্থার ভিতর দিয়া সুপ্রচারিত হইলে, শান্তির আব্‌হাওয়া বহিতে পারে, এইরূপ মনে করিয়াছেন। ইহা খুবই যুক্তিপূর্ণ অভিমত ; কিন্তু এই আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে বাংলার এমন নিগূঢ় ক্ষেত্রে, যেখানে পরিষদের সভ্যবৃন্দ কোন দিন পা বাড়ান নাই। দেশের মেরুদণ্ডে স্পন্দন তুলিতে হইবে এবং শান্তির আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার যে সুযুক্তি, তাহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

আমরা একটা শক্তিশালী বিপ্লবী দলের মনোবৃত্তির শোধন ও পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বাংলায় গঠন-যজ্ঞ সুরু করিয়াছি। বিপ্লবীর মনোবৃত্তি কি প্রচুর প্রয়াস ও কঠোর তপস্যায় শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতিক ও আত্মিক উন্নতি কল্পে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহার সন্ধান আমরা একেবারে জানি না বলিলে মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করা হয় ; এইজন্যই বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন যদি দেশ ও জাতির কল্যাণ হেতু প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই বিষয়ে আমাদের নীরব থাকা কর্ত্তব্যের ক্রটি বলিয়া মনে করি। এবং এই জন্যই আজ একটা দায়ভার মাথায় চাপিয়া বসিলেও—অতি সন্তর্পণে সত্যপ্রকাশে প্রস্তুত হইয়াছি।

আমরা মনে করি, রাজকর্ত্তৃপক্ষ যখন বিপ্লবনীতির মূলোচ্ছেদে যত্নবান্ হইয়া দেশের সহায়তা চাহিতেছেন আর দেশীয় পক্ষও ইহাতে ভিন্নমত নহেন, তখন কার্য্যতঃ ইহা সিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় পক্ষের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রমুখ অনেকেই ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের সহিত একত্র হইয়া ইহার প্রতিকারার্থে যে সকল উপায়ের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কোনটিই আজ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। এইরূপ না হওয়ার যে কারণ তাহা ব্যক্ত করা শ্রেয়ঃ নহে কি!

আমরা সেই আইন বুঝি না, যাহা সত্তার শুভ প্রেরণা ব্যর্থ করে, হয় তো অজ্ঞতাবশতঃ অনেক ক্ষেত্রে যাহা শিব-সুন্দর, তাহা অকারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার পরিণাম কখন মন্দ হইবে না। ক্ষতির দিক্ না দেখিয়া সত্য কথাটাই তাই উল্লেখ করিতেছি।

সহযোগ কথায় নয়, কাজে চাই। কার্য্যতঃ হওয়ার অন্তরায় হইয়াছে, নেতাদের 'মর‍্যাল' অর্থাৎ যে নৈতিক আস্থা থাকিলে উন্মার্গগামী তরুণদের সম্মুখে বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারা যায় "Halt", "দাঁড়াও", "দেশের সর্ব্বনাশ করিও না," সেই বস্তুটিই পাইতে হইবে। যে বিপ্লব-বিষ প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার মূলে আঘাত দিতে হইলে, চাই স্বাস্থ্যপূর্ণ আব্‌হাওয়া; দুই এক ক্ষেত্রে গন্ধক ছড়াইয়া বায়ু-শোধনে কাজ হইবে না।

এই 'মর‍্যাল' বস্তুটী সহযোগনীতির মধ্য দিয়া রাজ-শক্তিকেই ফিরাইয়া দিতে হইবে। দেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নূতন নহে। ইহার জন্য বৈধী আন্দোলন দেশ-নেতৃগণ সেদিন পর্য্যন্ত আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, নেতৃগণের অক্ষমতা ত্যাগ অথবা নির্য্যাতন সহিবার অশক্তিতে আসে নাই, নিরাশ হইয়াই হাল তাঁহারা ছাড়িয়াছেন। দেশের প্রাণে পুনরায় আশার সঞ্চার করিতে হইবে।

অনেকে বলেন—দারিদ্র্য, দুঃখ, বেকারসমস্যা বিপ্লবের হেতু। ইহা ভুয়া কথা। এইরূপ পঙ্গু জীবনের পরিণাম অপমৃত্যু। বাংলার বিপ্লবীরা নৈরাশ্যক্ষুব্ধ প্রেতের ন্যায় আজ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য; তাহাদের মনেও একটা সান্ত্বনার বাণী প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা জাতীয় পক্ষের reconcile কথার প্রতিধ্বনি মাত্র নয়, ইহার মধ্যে খুব বড় সত্যই নিহিত আছে, চাই আজ একটা সান্ত্বনা, যাহা নেতৃবৃন্দের সহিত জাতির প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করিবে, বিপ্লবীদেরও সম্মুখে সকলে একবাক্যে ভরসা করিয়া বলিতে পারিবে—দাঁড়াও, কেবল বিপ্লবের প্রতিকার নয়, বাঁচার মত অধিকারও মিলিবে। ইহা একটা আজ্‌গুবি দাবী হইবে না, বাংলার হিন্দু এখনও ইংরাজের ছত্রতলে আত্মগঠনের প্রয়াসী—শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম তাঁহাদের বিশৃঙ্খলাময়, আত্মগঠন ও অধ্যাত্মজাগরণের জন্য প্রবল বৃটিশের আশ্রয়ত্যাগ তাহারা সমীচীন মনে করে না। কিন্তু এই মনোভাব ও জাতির ভবিষ্য স্বপ্নের কথা বিশদ করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে বলিবার মত একটা আব্‌হাওয়া রাজ-কর্তৃপক্ষগণই দিতে পারেন। বিপ্লবীর জিদের প্রত্যুত্তরে প্রবল বৃটিশশক্তিরও জিদ্ প্রকাশ পাইলে দেশ ও জাতিই পিসিয়া মরিবে। দুই চারিজন বিপ্লবী একত্র হইলে একটা অনর্থ বাধাইতে পারে, সমগ্র জাতি ইহার জন্য মরিতে প্রস্তুত নহে—এই কথাটা ব্যক্ত করার মত ক্ষেত্র চাই। সংযোগ সার্থক করার গোড়ায় যে অন্ধকার আছে, তাহা ঘুচাইতে হইবে। বিপ্লবীর কার্য্যে দেশের পরিণাম ভাল হইবে না, ইহা সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বুঝিতেছেন; কিন্তু নানাকারণে হিন্দু বাঙ্গালীর বুক ভাঙ্গিয়াছে। অধিক শোকে মানুষের বুক যেমন পাথর হইয়া যায়, হিন্দু জাতির এইরূপ দুরবস্থা আসন্ন। আজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথেই নিদ্রিতের ন্যায় অবাধ যাত্রায় তাহার বাধিতেছে না। এমনই নৈরাশ্যক্ষুব্ধ হৃদয় ঔদাসীন্যে ভরিয়া উঠিয়াছে, এত বড় একটা জাতির মৃতদেহও কত বড় অশান্তির কারণ, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তির বুঝা কঠিন নহে। প্রতিকার এইখানে। প্রাণে স্পন্দন তুলিবার পথে অন্তরায় দূর করার ব্যবস্থা ও তাহার আলোচনা আশু প্রয়োজন হইয়াছে।

হিন্দু বাঙ্গালীর একটা ন্যায্য দাবী আছে; একথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াও বলি, এই দাবীর পশ্চাতে বিপ্লবীর শক্তি কেহ গণনায় আনে না। হিন্দু-জাতিও চাহিতেছে সান্ত্বনার বাণী, একটা বস্তুতন্ত্র সুব্যবহার (Gesture). যদি দাবী সত্যই অন্যায় হয়, তাহা উপেক্ষিত হউক, প্রতিবাদ নাই; আর সে প্রতিবাদ অজ্ঞতাবশতঃ যদি কোথাও উত্থাপিত হয়, হিন্দু সংহতিই তাহা নিবারণ করিবে।

বিপ্লব-বিষে হিন্দু সমাজের সর্ব্বাধিক সর্ব্বনাশ হয়, ইহা নিবারণ করিতে তাহারাই সর্ব্বক্ষেত্রে অধিক উদ্বুদ্ধ; কিন্তু হিন্দু নেতাদের ভরসা দিবার, 'মর‍্যাল' দিবার, সান্ত্বনা দিবার বস্তুটী আজ অতি অকিঞ্চিৎকর। তাহা কি, এই প্রশ্নের উত্তর নেতারাই দিবেন। তাহা অযৌক্তিক হইলে, অনর্থের কারণ হইলে কোন কথাই নাই—শাসন-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া মরাই তখন শ্রেয়ঃ। বাংলার হিন্দুর চক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, সম্মোহিতের ন্যায় তার মুখে প্রলাপ শুনা যায়। এই অবস্থায় তাহার সহযোগ কথায় ছাড়া কার্য্যতঃ কিছু হয় না। বাংলার বিষাক্ত আব্‌হাওয়ার একমাত্র প্রতিকার—বাঙ্গালীর মনে আশা ও উৎসাহের দীপ জ্বালিয়া দেওয়া। উভয় দিক্ হইতে তাই এই বিষয়ের একটা সমাধান প্রয়োজন হইয়াছে।
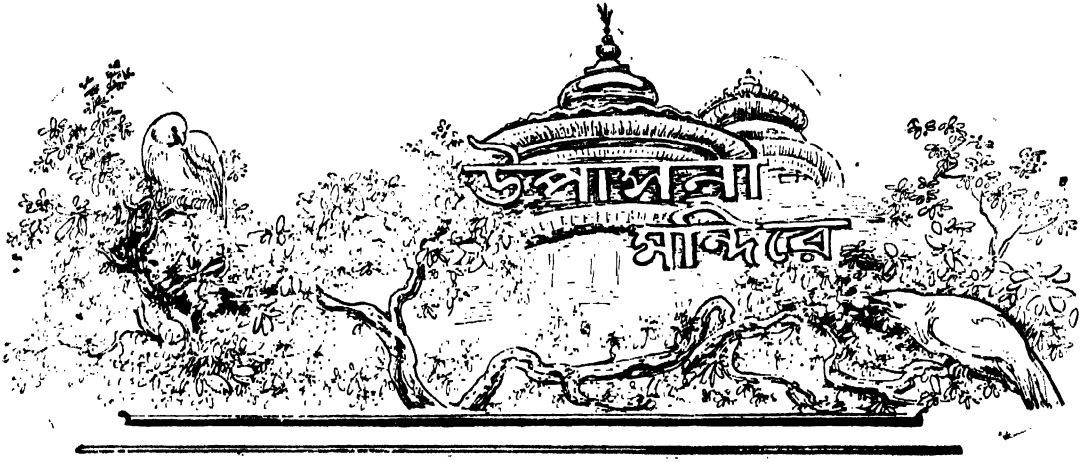
মহাপূজা

[আশ্রমী সঙ্কলিত]

(আশ্রমে এবার নিয়োক্ত বিধানে মহাভাবময়ী মাতৃপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছিল)

(আচমনান্তে সর্ব্বৈরেব পূজার্থিভিরুচ্চারণীয়ম্)

আসনশুদ্ধিঃ—হে পৃথিবি! যুগাৎ যুগান্তরং মূর্ত্তভগবচ্চরণাঙ্কলাঞ্ছিতস্তে পৃষ্ঠম্; অয়ি পুণ্যময়ি! ভবদীয়াপরিসীমপবিত্রতয়া মাং পরিপূরয়, ধর্ম্মক্ষেত্রে ভবদীয় পুণ্যপীঠে মদাসনং স্থিরং প্রতিষ্ঠাপয়; হে ধরিত্রি! ভারতীদেব্যাঃ মূর্ত্তিরূপেণ লীলায়িতাং ভবতীং ভূয়োভূয়ঃ প্রণমামি।

হে পৃথিবী, যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার বুক মূর্ত্ত ভগবানের চরণচিহ্নে লাঞ্ছিত—পুণ্যময়ি! তোমার অপরিসীম পবিত্রতায় আমায় পরিপূর্ণ কর--ধর্ম্মক্ষেত্র তোমার পুণ্য পীঠে আমার আসন স্থিরপ্রতিষ্ঠ কর—হে ধরিত্রি, দেবী ভারতীর মূর্ত্তিতে তুমি লীলায়ত—তোমাকে আমি বার বার প্রণাম করি।

জলশুদ্ধিঃ—ব্রহ্মবারি! কলুষনাশিন্! পরিপূতগঙ্গোত্রীধারারূপিন্! ত্বৎস্পর্শনান্মে.বাহ্যাভ্যন্তরম্ নিষ্কলুষীভবতু। মাং সর্ব্বথাভিষেচয়। নিরতিশয়পুণ্যেন, শ্রদ্ধয়া চ মৎসর্ব্বাঙ্গং পরিপূরয়, যথাহমদ্য শক্তিপূজায়াম্ যথার্থমধিকারিত্বম্ লভে।

ব্রহ্মবারি, কলুষনাশিনী, পবিত্র গঙ্গোত্রীধারা, তোমার স্পর্শে আমার অন্তর বাহির নিষ্কলুষ হউক। আমায় অভিষিক্ত কর। অশেষ পুণ্যে, শ্রদ্ধায় আমার সবখানি ভরাইয়া দাও। আজ আমি শক্তি-পূজার যথার্থ অধিকারী হই।

ভূতশুদ্ধিঃ—দেবি! ভগবতি! ভগবদানন্দবিধানেন চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বৈর্মাং নির্ম্মিতবত্যসি। মৎ-পদাঙ্গুষ্ঠাদাকেশাগ্রমদ্য নিঃস্বার্থং, নিষ্কলুষং, ভাগবন্ময়ঞ্চ সম্পাদ্যতাম্। গৃহ্লাতু মদীয়ং ঘ্রাণং, পুণ্যগন্ধেন শ্বাসং প্রশ্বাসঞ্চ। ধমতু মচ্ছ্রুতিঃ ভাগবৎপাঞ্চজন্যেন। মদীক্ষণে :প্রকাশিতমস্তু ব্রহ্মণোর্জ্যোতির্ম্ময়ম্ রূপম্। উপচিতমস্তু মদীয়ে স্পর্শে আনন্দময়ভগবতোঽমৃতপ্রস্রবণম্। রসনায়াম্মে ভগবতঃ কীর্ত্তনং জয়ং ধ্বনয়তু। ভগবচ্চরণার্ঘ্যদানায় সমুদ্যচ্ছতু মে করপুটম্।

মচ্চরণে অবিচলিতসঙ্কল্পেন ভগবদুদ্দেশ্যসাধনায় অচলপ্রতিষ্ঠে ভবেতাম্। মৎপায়ুপস্থং দূষিতশারীরিকমলমূত্রনির্গমণায় নিরন্তরম্ জাগর্ত্তু। ভবতু মে বাক্যং পবিত্রং, ঋঙ্মন্ত্রময়ঞ্চ। সর্ব্বথা ভাগবৎপ্রেমাবগাহিতসর্ব্বাঙ্গোঽহমদ্য শক্তিপূজায়া অধিকারিতামর্থয়ে।

দেবি ভগবতি, ভগবানের আনন্দবিধানে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে আমায় মূর্ত্তি দিয়াছ। আমার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত আজ নিঃস্বার্থ, নিষ্কলুষ, ভাগবতময় হউক। আমার ঘ্রাণে পুণ্য গন্ধে শ্বাস প্রশ্বাস গৃহীত হউক। আমার শ্রুতি ভগবানের পাঞ্চজন্যে ধ্বনিত হউক। আমার দৃষ্টিতে ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রকাশিত হউক। আমার স্পর্শে আনন্দময় ভগবানের অমৃত রাশি উথলিয়া উঠুক। আমার রসনায় ভগবানের কীর্ত্তন জয়ধ্বনি করুক। আমার করপল্লব ভগবানের চরণে অর্ঘ্যদানে উদ্যত হউক। আমার চরণ দৃঢ় সঙ্কল্পে ভগবানের উদ্দেশ্য-সাধনে অটল স্থির হউক। আমার বাক্ পবিত্র ঋক্ মন্ত্রময় হউক। আমি আজ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গ ভাগবত প্রেমে অবগাহিত করিয়া, শক্তিপূজার অধিকারী হইতে চাহি।

অর্ঘ্যশুদ্ধিঃ—রূপরসানন্দঘনমূর্ত্তের্বিষ্ণোশ্চরণচুম্বিত-জাহ্নবীধারাসিক্ত-পল্লবকুসুমাদিকম্ মদীয়সশ্রদ্ধ-চিত্তমনসোর্নির্ম্মলযুপকরণীভূতম্, যুষ্মদাশ্রয়েণ দেব্যাঃ শ্রীচরণসরসিজে মামকীনাত্মনিবেদনমহা-মন্ত্রম্ সমুচ্চারিতমস্তু।

রূপ-রসানন্দ-ঘন-মূর্ত্তি বিষ্ণুর চরণ-চুম্বিত, জাহ্নবী-ধারা-সিক্ত পল্লবফুলরাশি আমার সশ্রদ্ধ চিত্ত ও মনের নির্ম্মল উপাদান, তোমাদের আশ্রয়ে দেবীর চরণকমলে আত্মনিবেদনের মহামন্ত্র উচ্চারিত হউক।

ধ্যানম্—মেঘ-মেদুরাবিন্যস্তকুন্তলা, ভগবতী দশভুজা, নানাশস্ত্রধারিণী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠসমাহিতা, মৃগেন্দ্র-বাহনী, মহাসুরনিধনোদ্যতা, মধুরামৃতহাস্যময়ী, স্থিরযৌবনা, গৌরকান্তি জননী, সন্তানপালিনী, দুঃখভয়ার্ত্তিনিবারিণী, মহাদুর্গা, যশোবীর্য্যৈশ্বর্য্যদায়িনী, নিত্যানন্দময়ী, সুভাষিনী, ত্রিজগৎপালন-শক্তিধারিণী, মহামায়া, ভবতী জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তিতোঽদ্যাস্মদীয়হৃদয়মন্দিরে আবির্ভবতু। সংহারি-ভুজঙ্গদশনাঘাতেন, ত্রিশূলপ্রহারেণ, দশভিঃ প্রহরণৈশ্চ পাপাসুরম্ বিনশ্য মজ্জীবনমমৃতময়ং বিদধাতু। ভবৎসন্ততিরমৃতস্যপুত্রোঽহম্ পাপরহিতনির্দ্বন্দ্বচিত্তো দেবতাসৃষ্টিরচনাযোগ্যতাম্ প্রার্থয়ে। হে দেবি! মঙ্গলমধুরনৃত্যজনিতা ত্বদীয়লাস্যমাধুরী মচ্চিত্তং সততং তবৈব চরণারবিন্দে সুস্থিরং সুদৃঢ়ম্ সংলগ্নঞ্চ কারয়তু। জগদ্ধাত্র্যা বীরমাতৃকায়া জগজ্জয়ী বীরপুত্রোঽহম্। ভগবতঃ পাঞ্চজন্যধ্বনিতমন্ত্রম্ মজ্জীবনেন সিধ্যতু। অয়ি ত্রিনয়নে! দক্ষিণতঃ, বামতঃ, ঊর্দ্ধতশ্চ ত্বদীয়-করুণারাশির্মাং পুলকিতং প্রফুল্লময়ঞ্চ সম্পাদয়তু। তবৈব সুশীতলে কক্ষে, বক্ষসি চ মদেকান্তাশ্রয়ঃ সম্পদ্যতাম্। দেহি মেঽনন্যসন্তানব্রতসিদ্ধিসামর্থ্যম্, বরম্ দেহি হে জগদ্ধাত্রি! ত্বদ্রূপা-লোকেন দ্রবীভবনম্ মে জায়তাম্।

মেঘ-মেদুর আলুলায়িতকুন্তলা ভগবতী দশভুজা, অস্ত্রধারিণী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠে সমাহিতা, অসুর-নিধনে উদ্যতা, মধুরামৃত-হাস্যময়ী, স্থির-যৌবনা, গৌরকান্তি জননী, সন্তানপালিনী, দুঃখ ভয়ার্ত্তিনিবারিণী মহাদুর্গা, যশো-বীর্য্যৈশ্বর্য্যদায়িনী, আনন্দময়ী, সুভাষিনী, ত্রি-জগৎপালনশক্তিধারিণী মহামায়া, আজ আমাদের হৃদয়মন্দিরে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হও। কাল-ভুজঙ্গ-দংশনে, ত্রিশূলাঘাতে, দশপ্রহরণে পাপাসুর বিনাশ করিয়া আমায় অমৃতময় জীবন দাও। আমি তোমার সন্তান, অমৃতের পুত্র, নিষ্পাপ নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে দেবতার সৃষ্টি-রচনায়

যোগ্য হই। হে দেবি, তোমার মঙ্গল মধুর নৃত্যে, তোমার লাস্যমাধুরী আমার চিত্ত সতত তোমারই চরণারবিন্দে সুস্থির ও দৃঢ়রূপে সংলগ্ন রাখুক। আমি জগদ্ধাত্রী বীরমাতার জগজ্জয়ী বীরপুত্র। ভগবানের পাঞ্চজন্য ঋকমন্ত্র আমার জীবন দিয়া সিদ্ধ হোক। হে ত্রিনয়নে, দক্ষিণে, বামে ও উর্দ্ধে তোমার সুশীতল কক্ষে বক্ষে আমার একান্ত আশ্রয় হউক। অনন্ত সন্তানব্রত সিদ্ধ করার শক্তি দাও। বর দাও। হে জগদ্ধাত্রি, তোমার রূপের আলোতে আমি দ্রবীভূত হয়ে থাকি।

পুষ্পাঞ্জলিঃ—রক্তকোকনদালক্তরঞ্জিত-করতলচন্দ্রোজ্জ্বলাসীমসৌন্দর্য্যময়যুগলচরণনখরে-নখর-হিরণ্ময়-বিদ্যুদগ্নিঃ স্ফুরতি। নবনীতকোমলাভয়শীতলপদযুগলে! হে দশভুজে! অর্পয়ামি মে হৃদয়ার্ঘ্যং ত্বদীয়ে পাদপদ্মে। হে দেবজননি! আশীর্ব্বদতু মাং ভবতী।

রক্ত কোকনদ, অলক্তরঞ্জিত করতল চন্দ্রোজ্জ্বল, অসীমসৌন্দর্য্যময় যুগলচরণনখরে নখর হিরণ্ময় বিদ্যুদগ্নি ঝলসিয়া উঠে। নবনীত-কোমল অভয়-শীতল পদযুগলসম্পন্না হে দশভুজে, আমার হৃদয়ার্ঘ্য তোমার চরণে অর্পণ করি। হে দেব-জননি। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।

প্রণামঃ—বিদ্যাবিদ্যাপাপপুণ্যমঙ্গলামঙ্গলাদিজাগতিকদ্বন্দ্বসৃষ্টিপ্রসূতে। মহাঘোরে। মহাকালবক্ষসি তাণ্ডবনৃত্যপরায়ণে, মহাকালি! কলুষনাশিনি! মুক্তিদাত্রি! স্বভাবস্বরূপপ্রদায়িনি! মহাদেবি! অব্যক্তানির্ব্বচনীয়ক্ষরাক্ষরপুরুষোত্তমমহাশক্তিস্বরূপিণি! তুভ্যম্ নমঃ! অয়ি! অপূর্ব্বজ্ঞানবিজ্ঞানদায়িনি! ব্রহ্মস্বরূপিণি! চিদ্‌ঘনে! আদ্যাশক্তিস্বরূপিনি! ভাবরূপিনি! প্রত্যক্ষানুভূতিপরোক্ষাপরোক্ষজাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তুতুরীয়াদ্যাবস্থানাং জনয়িত্রি! হে জগদ্ধাত্রি! তুভ্যং নমঃ।

বিদ্যা অবিদ্যা, পাপ পুণ্য, মঙ্গল অমঙ্গল, জগতের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রসূতি, মহাঘোরা, মহাকালের বক্ষে তাথিয়া তাথিয়া নৃত্যপরায়ণা মহাকালী, কলুস-নাশিনী, মুক্তিদাত্রী, স্বভাব-স্বরূপ-প্রদায়িনী মহাদেবি, অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়, ক্ষরাক্ষর পুরুষোত্তমের মহাশক্তিস্বরূপিনী তোমায় আমি নমস্কার করি। অয়ি অপরূপ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দায়িনি ব্রহ্ম-স্বরূপিনী চিদ্‌ঘন আদ্যাশক্তিস্বরূপিনী, ভাবরূপিনী, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পরোক্ষ অপরোক্ষ, জাগৃত-স্বপ্ন-সুষুপ্ত-তুরীয় সকল অবস্থার জনয়িত্রী হে জগদ্ধাত্রি, আমি তোমায় নমস্কার করি।

জপঃ--"ওঁ সচ্চিদানন্দময়ী মা" (অষ্টোত্তরশতশঃ)

"ওঁ সচ্চিদানন্দময়ী মা" ১০৮

জপবিসর্জ্জনম্—গোপনতান্ত্রিকমর্ম্মবীণামন্ত্রঝঙ্কারেণাস্মাকমেতত্ত্বদীয়ারাধনায়াঃ সিদ্ধির্বিধীয়তাম্, গৃহ্যতাঞ্চৈষারাধনা, অস্মিন্নেব জীবনে নবজন্ম প্রদীয়তাম্। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, হরি ওঁ।

গোপন তন্ত্রের মর্ম্মবীণার মন্ত্রঝঙ্কারে তোমার আরাধনায় আমাদের সিদ্ধ কর—গ্রহণ কর—ইহজীবনেই নবজন্ম দাও। (শান্তিপাঠ)।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের আগমন

স্বামী সুন্দরানন্দ (কলম্বো)

জগতের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রায় সকল ধর্ম্মই অল্পাধিক পরিমাণে রাজ-সহায়ে প্রচারিত হইয়াছে। কোন ধর্ম্ম রক্তমণ্ডিত তীক্ষ্ণ তরবারীর মাহাত্ম্যে, কোনটী সাম্রাজ্যবাদ (imperialism) ও বাণিজ্য-বিস্তার (economic exploitation) নীতিমূলে এবং কোনটী মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানকে জাগ্রত করিয়া সাধারণে প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু রাজ-সহায় যে প্রত্যেক ধর্ম্ম-প্রচারের মুখ্য কারণ, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। প্রধানতঃ রাজা অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম অর্দ্ধ পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। রাজা সুধন্বের সাহায্য ভিন্ন আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মকে তাঁহার জন্মভূমি ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইতেন না। সিংহলের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে অপসারিত করিয়া রাজা অশোকের পুত্র ভিক্ষু মহিন্দ লঙ্কা-রাজ তিষ্যের সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এবং পরবর্ত্তী প্রায় সকল সিংহলী রাজাই এই দ্বীপময় বিহার, ডাগোবা ও পার্ব্বত্য মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য অসংখ্য উপায়ে এই ধর্ম্মপ্রচারে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সিংহলের বিখ্যাত রাজা পরাক্রম-বাহু খৃঃ পূঃ ৬৪—৯৭ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি লঙ্কার বিভিন্ন স্থানে ১৪১টী পুষ্করিণী, ৬৫০০ বৌদ্ধ-বিহার, ৫০টী ধর্ম্মপ্রচার-গৃহ, ১২৪টী বৌদ্ধ-গ্রন্থাগার, ২০৩টী বৌদ্ধ-মঠ, ৯৭টী ডাগোবা (বৌদ্ধস্তূপ), ৩১টী অপরূপ কারুকার্য্যমণ্ডিত বৌদ্ধ পার্ব্বত্য মন্দির (rock-temple) এবং অসংখ্য হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা এই প্রবন্ধে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের আগমনেতিবৃত্ত বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব।

সিংহলের রাজা তিষ্য দেবগণেরও প্রিয় ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। সিংহলবাসিগণ ইঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। এই শ্রদ্ধার মাত্রা এত বেশী ছিল, যে তিনি "দেবনাম্‌পিয় (প্রিয়) তিষ্য" বা দেবপ্রিয় (Tissa, the Delight of the Devas) বলিয়া লঙ্কা-দ্বীপে প্রসিদ্ধ। দেবগণ যে এই রাজার প্রতি বিশেষ অনুকম্পা-পরায়ণ ছিলেন, ইহার প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক উপকথা এদেশে প্রচলিত। শোনা যায় যে, যে সকল ধনরত্ন এত কাল এই দ্বীপের জলে স্থলে লুক্কায়িত ছিল, দেবানুগ্রহে উহা সব এই রাজার ভোগের জন্য আপনা আপনি বাহির হইয়া অদ্ভুত উপায়ে তাঁহার হস্তগত হয়। আট প্রকার বহুমূল্য মুক্তা গভীর সমুদ্রে জন্মে এবং উহা বিশেষ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু এই ভাগ্যবান্ রাজার জন্য সমুদ্রসৈকতে উহা স্বতঃই উত্থিত হয়। তাঁহার রাজধানী অনুরাধাপুরের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতে তিনটী অদ্ভুত বংশ হঠাৎ গজাইয়া উঠে। প্রথমটী অবিকল রৌপ্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং উহার চারিদিকে একটী স্বর্ণ-লতিকা সুন্দরভাবে জড়ান। দ্বিতীয় বংশটীতে বিবিধ বর্ণের অনেকগুলি থোপা থোপা অদৃষ্টপূর্ব্ব অতি সুন্দর ফুল জন্মায় এবং তৃতীয় বংশকাণ্ড হইতে কয়েক প্রকার জীবন্ত পশু এবং পক্ষী বাহির হইতে থাকে। রাজা তিষ্য ভগবানের এই অদ্ভুত সৃষ্টি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং ইহা অপ্রত্যাশিতভাবে দেবানুগ্রহে প্রাপ্ত অনেক দুষ্প্রাপ্য মণি-মুক্তা ও রত্নাদিসহ তাঁহার প্রিয় বন্ধু ভারত-সম্রাট্ ধর্ম্মাশোকের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন; রাজা অশোকও বিনিময়ে প্রভূত ধন-রত্নাদি তাঁহার নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া নিম্নোক্ত পত্র লেখেন—

"আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছি, আপনি কি মুক্তিলাভের জন্য এই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন?"

এই ঘটনার কিছুকাল পর রাজা তিষ্য অগণিত অনুচর সমভিব্যহারে মিহিন্টেল (Mihintale) পর্ব্বতের গভীর অরণ্যে শীকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একটী

সুদৃশ্য মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে তিনি একাকী একটী নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। হঠাৎ মৃগটী অদৃশ্য হইয়া তৎস্থলে একটী সৌম্য মূর্ত্তি মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। এতদ্দৃষ্টে তিনি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হন। সন্ন্যাসীর কয়েকজন সঙ্গী ছিল, কিন্তু রাজার দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পতিত হয় নাই। আগন্তুক সন্ন্যাসী বিনয়নম্র বচনে রাজাকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে আহ্বান পূর্ব্বক বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলে তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে তাঁহার একজন সামন্ত যক্ষরাজ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাঁহার ভ্রম নষ্ট হয়। সন্ন্যাসিপ্রবর বলিলেন,—"রাজন্, আমরা শ্রীভগবান বুদ্ধের শিষ্য, তাঁহার সত্যধর্ম্ম প্রচারার্থ জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) হইতে এই দ্বীপে আপনার আশ্রয়প্রার্থী।" পরে কথাপ্রসঙ্গে রাজা জানিতে পারিলেন, যে নবাগত সন্ন্যাসী ভারতসম্রাট্ অশোকের পুত্র মহিন্দ। ভিক্ষু মহিন্দ খৃঃ পূঃ ৩ শতাব্দীতে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থে আগমন করেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্রাট্ অশোকের পুত্রের বিষয় রাজার স্মরণপথে আসিল। তিনি তীর ধনুক পরিত্যাগ করিয়া এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে ভাবের আতিশয্যে বসিয়া পড়িলেন। এখানে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া রাজার সঙ্গে নূতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর আলোচনা চলিল; ফলে রাজা অনুচর ও পাত্র মিত্র সহ অরণ্য হইতে মিহিন্টেল পর্ব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষু মহিন্দ অন্যান্য প্রচারকসহ রাজধানী অনুরাধাপুরে আসিয়া সহর হইতে কিছু দূরে একটী রাজোদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজসম্মানে তাঁহাদিগকে রাখিয়া রাজা তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিতে কর্ম্মচারীদিগকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহলীদের মধ্যে প্রসারিত হইল, ক্রমে যক্ষ (রাক্ষস) ও নাগ প্রভৃতি আদিম অধিবাসীর মধ্যে ইহা বিস্তার লাভ করিল।

রাজা তিষ্য ভিক্ষু মহিন্দের পরামর্শক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শিক্ষা ও সাধন ভজনের সুবিধার জন্য নির্জ্জনস্থানে একটী বিহার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন। এই বিহারের জমি চিহ্নিত করার দিনে রাজকীয় সমারোহে একটী বিরাট্ উৎসবের আয়োজন করা হইল। ঢেঁরা পিটাইয়া সাধারণে ইহার সংবাদ প্রচার করা হইল। নির্দ্ধারিত শুভদিনে রাজা তিষ্য সৈন্যসামন্ত সহ বহু মূল্যবান্ রাজবেশে সুসজ্জিত শকটা-রোহণে বিহারের ভিত্তি স্থাপন করিতে যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি ভিক্ষু মহিন্দের ভবনে যাইয়া তত্রত্য সকল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সমভিব্যহারে বিহারের জমিতে রওনা হইলেন। রাজাদেশে রাজধানীর সকল রাস্তা ও ঘরবাড়ী পত্র-পুষ্প-নিশান ও আলোকমালায় বিশেষভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। রাজপথের মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুদৃশ্য তোরণ অতিক্রম করিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ এক বিরাট্ মিছিল অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত বিহার-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুইটী রাজহস্তী একটী স্বর্ণনির্ম্মিত প্রকাণ্ড লাঙ্গল বহন করিয়া চলিল। রাজা তিষ্য স্বয়ং হলচালনা করিয়া বিহারভূমি কর্ষণ করিয়া উহার সীমা নির্দ্দেশ করিলেন। পরে অল্পকালের মধ্যেই একটী প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মিত হইল। উহাতে শত শত ভিক্ষুর থাকিবার স্থান, পাঠ ও প্রচার গৃহ, গ্রন্থগার এবং জপধ্যানের জন্য উপযুক্ত কুটীরাদি নির্ম্মিত হইল। এই বিখ্যাত বৌদ্ধমঠ "মহাবিহার" নামে সাধারণে পরিচিত। ইহা বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং মহৎ লোকের আবাস বলিয়া সিংহলে এককালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

ভগবান বুদ্ধের ভস্মাস্থি (relics) এ পর্য্যন্ত লঙ্কায় আনয়ন করা হয় নাই। ভিক্ষু মহিন্দের ইচ্ছায় রাজা তিষ্য ভারতে লোক পাঠাইয়া সম্রাট্ অশোকের নিকট হইতে উহা আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজা অশোক বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে শ্রীভগবান বুদ্ধের দক্ষিণ গণ্ডের অস্থি ও একটী ভিক্ষাপাত্রপূর্ণ অন্যান্য ভস্মাস্থি প্রদান করিলেন। এই ভস্মাস্থির উপর বিখ্যাত "থূপরাম ডাগোবা" (Thuparama Dagoba) নির্ম্মিত হইয়া রাজকীয় আড়ম্বরে ইহার অভিষেক উৎসব সম্পাদিত হইল। সমগ্র লঙ্কাদ্বীপে ইহাই প্রথম ডাগোবা (বৌদ্ধস্তূপ)।

রাজা তিষ্যের ছোট ভ্রাতৃবধূ রাণী অনুলা (Anula) পাঁচশত স্ত্রীলোকসহ প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক "মহা-

বিহারে” অবস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, যে ভিক্ষুদের সঙ্গে ভিক্ষুণীদের বাস করা বৌদ্ধ-সঙ্ঘমতে বিধেয় নহে। পরে তাঁহার পরামর্শে পাটলীপুত্র নগরের বৌদ্ধ স্ত্রীমঠের অধ্যক্ষা তাঁহার ছোট ভগ্নী বিদূষী “সঙ্ঘমিত্ত” (Sanghamitta)কে লঙ্কার স্ত্রী-মঠের ভারার্পণার্থ আনয়ন করিবার জন্য রাজা তিষ্য সম্রাট্ অশোকের নিকট লোক প্রেরণ করেন। ধর্ম্মাশোক প্রথমতঃ তাঁহার প্রিয় কন্যাকে দূরদেশে পাঠাইতে সঙ্কোচ প্রকাশ করেন; কিন্তু তিনি নিজেই বুদ্ধধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জন্য সিংহলে যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে রাজা সম্মত হন। রাজকন্যা বিদূষী সঙ্ঘমিত্ত সিংহলে আগমন করিলে বিশেষ সমারোহের সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়া হইতে বোধিবটবৃক্ষের যে শাখা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা অনুরাধাপুরের মহাবিহার সংলগ্ন একটী বাগানে রোপিত হয়। এই বৃক্ষ অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতেছে।

রাজা তিষ্য ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্তের জন্য দুইটী সুন্দর বিহার স্থাপন করেন। রাজকন্যা অনুলা তাঁহার সহচরীগণ সহ বিদূষী সঙ্ঘমিত্তের সঙ্গে যোগদান করেন। রাজা তিষ্যের দেহত্যাগের পরও ভিক্ষু মহিন্দ ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্ত সিংহলে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। পরে তাঁহাদের দেহত্যাগ হইলে রাজকীয় জাঁকজমকের সহিত অত্যন্ত উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়া সিংহলবাসিগণ তাঁহাদের দেহ সমাহিত করেন।

ভারতীয় চিত্র-কলা পরিচয়

চিত্রের মধ্যে কেন্দ্র

[শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত]

বিশেষভাবে চিত্র পর্য্যালোচনা করিতে হইলে চিত্রের মধ্যে কোন স্থানে কেন্দ্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা আবশ্যক। কেন্দ্র হইতেছে চিত্রের মাধুর্য্য উদ্ঘাটন করিবার দ্বার। এই কেন্দ্র (centre)টী বুঝিতে না পারিলে চিত্রের বিশেষত্ব কিছু বোঝা যায় না। দর্শকগণ অনেক সময়ে বর্ণ এবং সৌষ্ঠব দেখিয়াই বিমোহিত হন এবং অনেক প্রকার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু চিত্রের ভিতর কোনখানে কেন্দ্রটী লুকাইয়া আছে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন না। এইজন্য চিত্রকরের তদ্বিষয়ে যে বিশেষ প্রয়াস, মন কিরূপে নানাভাবে বিকাশ পাইতেছে তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন না। চিত্র পর্য্যালোচনা করা অর্থে এস্থলে এই বলা যাইতে পারে, যে শিল্পীর মনোভাব কিরূপে উন্নতির পথে যাইতেছে ও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে মুখ্য ও গৌণ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহা দেখা ও বুঝা। ইহা না পারিলে চিত্রের বিশেষত্ব কিছুই বুঝা যায় না। শিল্পী নিজের মনে ধ্যানাবস্থায় সংযতচিত্ত হইয়া ভাবরাশি প্রত্যক্ষ করেন। যখন গভীরভাবে শিল্পীর মন আক্রান্ত বা সন্নিবিষ্ট হয়, তখন শিল্পী নিজ চক্ষের উপরে ভাবরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ভাবের রূপ, অবয়ব, বর্ণ ইত্যাদি আছে।

স্থূল বস্তুতেও যেরূপ নানাবিধ গুণ পরিলক্ষিত হয়, সূক্ষ্ম ভাবরাশিতেও সেইরূপ সকল গুণ বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়; প্রভেদ মাত্র এই, যে পার্থিব বস্তুতে ইহা ভঙ্গুর ও পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ভাবরাশিতে ইহা স্থায়ী ভাবে থাকে। সূক্ষ্মবস্তুতে বিশেষ গুণ আছে

বলিয়াই স্থূল বস্তুতেও সেই সকল গুণ পরিলক্ষিত হয়। মনোবিজ্ঞান-মতে প্রথম ভাবরাশি, পরে স্থূলবস্তু; এইজন্য ভাবরাশিতে বহুবিধ গুণ দর্শন করা যায়। কিন্তু সকল গুণ, বর্ণ, অবয়ব স্থূল বস্তুতে সেভাবে আনা যায় না। সূক্ষ্মেতে অতি বিশিষ্টভাবে নানারূপ বস্তু দেখা যায়, কিন্তু স্থূলে সেই সকল গুণ রাশি দেখা যায় না। এইজন্য ইহা বিশেষভাবে বলা যাইতেছে, শিল্পীর চিন্তা-ধারা মনোবৃত্তি পার্থিব পদার্থ দ্বারা প্রতিফলিত করা যায়, ইহাই হইতেছে চিত্র। একটি গাভী দৌড়াইয়া যাইতেছে, পথভ্রান্ত হইয়া সশঙ্ক নেত্রে চাহিতেছে এবং নিজের আবাসস্থান গ্রীবা উন্নত করিয়া সর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে। ঐটি হইল প্রাকৃতিক বস্তু। সকলেই ইহা দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে কেহই মনোযোগ করেন না; কারণ, ইহা নিত্য ঘটনা, বিশেষত্ব কিছুই নাই। কিন্তু চিত্রকর যখন উদ্‌ভ্রান্ত গাভী পটে অঙ্কিত করেন, তখন অপূর্ব্ব দৃশ্য হয়।

অঙ্কিত বস্তু প্রাকৃতিক গাভী নয়, কিন্তু চিত্রকরের মন সেই উদ্‌ভ্রান্ত গাভী দেখিয়া কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল তাহাই তিনি দর্শন করাইতেছেন। অপর ভাষায়, শিল্পীর মন হৃদয়ের ভিতর কিয়দংশ থাকিতেছে এবং অপর অংশ গাভীর দেহে প্রবেশ করিয়া ও গাভীরূপ ধারণ করিয়া কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত সচকিত ভাবে চাহিতে হয় তাহাই দর্শন করাইতেছে। শিল্পীর নিজেরই মনের উদ্‌ভ্রান্ত গাভী অঙ্কিত রূপান্তর। ইহা হইতে আমরা শিল্পীর তৎ-সাময়িক মনোভাব অনুমান করিতে পারি। এইরূপে ঝঞ্ঝাবাতে দোদুল্যমান বনস্পতি কিরূপ হয়, আলেখ্য হইতে আমরা অন্যভাবে বুঝিতে পারি। ইহা বাত্যা-বিহত তরুরাজি নহে, কিন্তু শিল্পীর মনোনিঃসৃত দোদুল্য-মান বনস্পতি। এইরূপে ধ্যানমগ্ন গিরিশৃঙ্গ, রোরুদ্যমান বিটপী, শোকার্ত্ত পক্ষি-মিথুন, বিলপমানা স্রোতস্বতী, এইরূপ অনেক প্রকার বস্তু চিত্রকরের তুলিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই। এ সকল অঙ্কিত বস্তু প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত এক নহে। কিন্তু চিত্রকর ইহার ভিতর নিজের ভাব বা স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কিয়দংশে দ্রষ্টব্য বস্তু হইয়াছেন ও কিয়দংশে প্রকাশ হইয়াছেন, ইহাই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই হইল চিত্রের উৎকর্ষ।

এই সকল বুঝিতে হইলে চিত্রের মধ্যে কেন্দ্র রেখা আছে, তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। কেন্দ্র বুঝিতে না পারিলে চিত্রের বিশেষত্ব বোধ্য হয় না। অর্থাৎ চিত্রকর কোন স্থানে বসিয়া বাহ্য বস্তু দেখিয়া-ছিলেন, সেই স্থানটি অতি নিভৃত ভাবে চিত্রকর সন্নিবিষ্ট করেন। এই স্থানটি শিল্পী সাধারণ চক্ষু হইতে সর্ব্বদাই গোপন করিতে চেষ্টা করেন, যেন আত্মপরিচয় দিতে অস্বীকৃত হইয়া তিনি অপ্রকাশ্যভাবে কোন বিজন স্থানে বসিয়া জগৎ দেখিয়াছেন, তাহার অনুভব করিয়াছেন।

পরে সেই সকল ভাব-সমষ্টি তিনি বর্ণ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই কেন্দ্র হইল চিত্রের দ্বারোদ্‌ঘাটনের উপায়। শিল্পীর স্থান কোথায়, এটি নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক। কেন্দ্রটি বুঝিতে পারিলে শিল্পীর দৃষ্টি-শক্তি ও দর্শন-স্থান বোঝা যায়। তাহা হইলে প্রকৃতির সমস্ত ভাব অনুধাবন করা হয়।

এইরূপ এক প্রবাদ আছে, যে হর্ষবর্দ্ধন লীলা-অভিনয় প্রকরণ করিয়াছিলেন। এখন যদিও যাত্রা অর্থে সঙ্গীত-সভা বুঝায়, কিন্তু পূর্ব্বকালে এবং বাঙ্গালার বাহিরে যাত্রা অর্থে বিগ্রহ লইয়া গমন বুঝায়—যথা রথযাত্রা। বৃন্দাবনে অদ্যাপি দোল ও ঝুলন যাত্রায় বিগ্রহ নিজ মন্দির হইতে উদ্যানে গিয়া থাকে, ইহাকে চলিত কথায় যাত্রা বলে এবং উদ্যানভবনে সঙ্গীতাদি উৎসব হইয়া থাকে। উড়িষ্যা দেশে আমরা যাহাকে যাত্রা বা সঙ্গীত সভা বলি তাহাকে পালা "গান" বলিয়া থাকি। তাহাকে আমরা বাঙ্গালায় "লীলা গানও" বলি যথা—কৃষ্ণ-লীলা, রাম-লীলা ইত্যাদি।

অনেকে এইরূপ মনে করেন, যে বাঙ্গালা দেশে পাঁচালী গান বা লীলা-গান প্রথম পাঞ্চাল বা কান্যকুব্জে বিরচিত এবং পরে বাঙ্গালা দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। এইজন্য পাঞ্চালী লীলা গান অপভ্রংশ হইয়া পাঁচালী হইয়াছে। যাহা হউক, পাঞ্চাল বা কান্যকুব্জে যেখানেই সূচিত হউক, হর্ষের সময়ে বহুবিধ ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা যথেষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এইরূপ একটি প্রবাদ আছে, যে হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব কালে বুদ্ধের লীলা-গান প্রচলিত হয়। জনসাধারণকে বুদ্ধের জীবনী বিশেষ করিয়া পরিদর্শন করাইবার জন্য এই সহজ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। Europe'এ Roman Catholicদিগের মধ্যে ইহাকে Passion Play বলে। Passion অর্থ Suffering বা কষ্ট-ভোগ। যীশুর জীবনের লীলা সন্ন্যাসিগণ নাটকাভিনয়ে দেখাইয়া থাকেন। এবং পারস্য দেশে অদ্যাপি হোসেনের মৃত্যু তৎসংক্রান্ত সমস্ত লীলা অভিনয়ের ন্যায় দেখান হয়। আমি স্বয়ং বহুবার ইস্পাহানে এইরূপ অভিনয় দর্শন করিয়াছি, অতি মনোরম প্রদর্শন হইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধের জীবনী অভিনয় রূপে প্রদর্শন করিতে হইলে নৃত্য গীতাদি আবশ্যক হয়। নৃত্য বা অঙ্গ সঞ্চালন দেখাইতে কটিদেশ বক্র বা দোদুল্যমান হওয়া আবশ্যক এবং হস্ত পদাদির বিভিন্ন স্থানের পরিবর্ত্তন ও সঞ্চালন দেখাইতে হইবে। এই নিমিত্ত সম্ভবতঃ এই সময়ে আলেখ্য ও চিত্র হইতে এইরূপ বক্র কটি গ্রীবা প্রণয়ন করা হয়। অদ্যাপিও বৃন্দাবনে যখন অপ্সরী বা কিন্নরী দেখাইতে হয় তখন এইরূপ বক্র কটির অধিষ্ঠান বা ঠাম দেখাইতে হয়। এই অধিষ্ঠানে চাপল্যের ভাব কিঞ্চিৎ মিশ্রিত আছে। ধ্যান কালে প্রথম প্রথা হইতে মেরুদণ্ড ও গ্রীবা সম-সূত্রে সমাসীন থাকিবে। কিন্তু বক্র কটি হইলে ধ্যানের অন্তরায় হয়। কারণ ইহাতে চাপল্যের ভাব রহিয়াছে; এজন্য উত্তর ভারতবর্ষে বঙ্গদেশ ব্যতীত বক্র কটি ভাব দেব-মূর্ত্তিতে কেহই গ্রহণ করিল না। বৃন্দাবনের সন্নিকটস্থ নন্দ গ্রামে অর্থাৎ যেখানে প্রবাদ অনুযায়ী নন্দ ও যশোদার রাজ্য ছিল, সেই স্থানের মন্দিরে নন্দ যশোদা, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ বলরাম, তৃতীয়তঃ দুটী কৃষ্ণের সখা মন্দির-গৃহে এই ছয়টী বিগ্রহ রহিয়াছে; কিন্তু এই নন্দ-গ্রামের কৃষ্ণের কটি বক্র নহে, বলরাম বা অন্য কোন বিগ্রহের কটিও বক্র নহে। বিষ্ণু-মূর্ত্তিতে বক্র কটি হয় না। কারণ, বিষ্ণু-মূর্ত্তি ধ্যানমূর্ত্তি। পুরীর টোটার গোপীনাথ নামে এক কক্ষে বলরাম রেবতী ও বারুণী তিন বিগ্রহ আছে এবং অপর কক্ষে গোপীনাথ ও রাধিকা আছে। কিন্তু এই গোপীনাথের কটি বক্র নহে। কোনারক, ভুবনেশ্বর বা অন্য স্থানে বিগ্রহ সকল সমসূত্রে দণ্ডায়মান, কেবল মাত্র যে সকল স্থানে নৃত্য গীত বা চাপল্যের ভাব দেখান হইয়াছে তথায় বক্র কটি প্রদর্শিত হইয়াছে। তথায় বিখ্যাত সূর্য্যমূর্ত্তি সমসূত্রে মেরুদণ্ড রাখিয়া দণ্ডায়মান পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালায় বক্র কটি ও ত্রি-ভঙ্গ ভাবের সহিত আধুনিক উভয় ভারতে অন্য বিগ্রহের সামঞ্জস্য নাই।

চিত্রে দেখিতে পাইলাম, যে দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন মন্দির বক্র কটির ভাব পরিদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু এই ভাব কি অর্থে নিয়োজিত হইয়াছে, বিশেষ বুঝিতে পারা যায় না। কোন নৃত্য বা চাপল্যের ভাব হইতে হইয়াছে বা ধ্যানদর্শনের ফলে হইয়াছে তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক, দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন মূর্ত্তিতে বক্র কটি পরিলক্ষিত হয়।

বিচারক

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচার-বিভ্রাটে পড়ি' সত্যাশ্রয়ী দীন
ডুবি কারা-অন্ধকারে গণে শেষ দিন।
বিচারক হাঁকে গর্ব্বে মৃত্যু-দণ্ড হানি',—
"শান্তিহীন বিশ্ব-বুকে মোর দীপ্ত-বাণী
অধর্ম্মের অন্যায়ের টুঁটি চাপি সদা
রাখিয়াছে সত্য-ধর্ম্ম—ন্যায়ের মর্য্যাদা!"
নম্র-শিরে কহে বন্দী,—"সত্য বটে তাই,
বিধির বিচারে কিন্তু তব ঠাঁই নাই!"
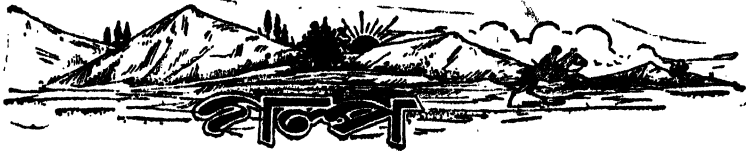
রাজদণ্ড

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর নির্ভর করিয়াই মালতী তাহার একমাত্র পুত্রের কেবলরাম নাম পরিবর্তন করিয়া রাখিয়াছিল রাজবল্লভ। লোকে কিন্তু সাদা কথায় বলিত রেজো!

কেবলরামের বয়স তখন আন্দাজ পাঁচ কি ছয়, সেই সময়ে একজন গনৎকার তাহার করকোষ্ঠী দেখিয়া বলিয়াছিল—

—এ ছেলের কপালে রাজদণ্ড আছে। এর ওপর নজর রেখো।

রাজদণ্ড বলিতেই মালতী বুঝিল, তাহার ছেলে রাজা হইবে। সে তো বরাবরই শুনিয়া আসিয়াছে—কপালে রাজদণ্ড থাকিলে রাজা হয়। সুতরাং নজর না রাখিলে অনেকেই হিংসার জ্বালায় তাহার পুত্রের অনিষ্ট করিতে পারে।

রাজবল্লভ রাজা না হোক, অন্ততঃ পক্ষে জমীদার সে না হইবে তাই বা কে বলিতে পারে? তাহাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব তো কোনদিন নাই—দু'চার বিঘা যাহা আছে—ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে ফাঁপিয়া যাইতেও তো পারে। সাধু সন্ন্যাসী দেবতা ধর্ম্মের উপর মালতীর অগাধ বিশ্বাস বলিয়াই সে গনৎকারের রাজদণ্ড কথাটার বিপরীত অর্থ করিয়া বসিল।

বাগ্দীপাড়ার মধ্যে মালতীর স্বামী বিপিনের অবস্থা ছিল ভাল—তাহার দুইটা হেলে গরু ছিল; গ্রামের লোকদের জমীজমা ভাগে লইয়া চাষ আরম্ভ করিয়া বেশ কিছু জমাইয়াছিল—মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রায় কুড়ি বিঘা জমী সে কিনিয়া ফেলিয়াছিল।

বিপিনের মৃত্যুর পর দুই এক বিঘা নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তবু এখনও যাহা আছে তাহাই ভাগে বিলি করিলেও মালতীর স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যাইতে পারে। হঠাৎ দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয় নাই, আর হইবেও না।

সে অনেক দিনের কথা।—

তখনও মালতীর সন্তানাদি হয় নাই।

বিপিন বলিত—জানিস্ মালু!—আমাদের যদি একটা ছেলে ভগবান দেয় তো তাকে পড়াবো।

মালতী বলিত—হ্যাঁ তোমারও যেমন কথা!—বাগ্দীর ছেলে বুঝি আবার পড়তে যায়!

বিপিন বলিত—যাবে না কেনে রে?—তাকে তো আর খেটে খেতে হবে না। আমি খেটে খেটে বুঝেছি রে খাটার কি জ্বালা। আর বুঝলি, মালু! যা রেখে যাবো তাতে আর বাছাকে আমার খাটতে হবে না—বেটা আমার গায়ে ফুঁ দিয়ে নবাবের মত থাক্‌বে আর পড়বে।

মালতী বলিত—না বাপু! তার চেয়ে খেটে খাবে আমার উপর নবাবি দেখাবে তা হবে না। আর ও-সব বালাইয়ে কাজ কি? আমরা ছোট জাত, ছোটর মতই থাক্‌বো।

বিপিন বলিত—হ্যাঁ ছোট জাত—ছোট জাত কি গায়ে লেখা থাকে নাকি? দেখবি, লেখা পড়া শিখলে কত লোক তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবে।

ঠাট্টা করিয়া মালতী বলিত—একসঙ্গে নেমন্তন্ন করে' খাওয়াবে—

বিপিন বলিত—আচ্ছা দেখিস্—

সেই মালতীর পুত্র হইয়াছে; কিন্তু বিপিন তাহার মুখ দর্শন করিতে পায় নাই—পুত্রের জন্মের এক মাস পূর্ব্বেই সে সংসার হইতে বিদায় লইয়াছিল।

তাই মালতী তাহার মৃত স্বামীর আশা অপূর্ণ রাখিতে পারিল না—আর তাহা পারিল না বলিয়াই সে রাজবল্লভকে আট বৎসর বয়সে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল গ্রামেরই পাঠশালায়।

প্রথমে ব্যাপারটাকে কেহই আমলে আনে নাই; তখন সকলেই হাসিয়া বলিয়াছিল—

বাগ্দী মাগীর যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! যে দুদিন বাদে যাবে লোকের গরু চড়াতে তাকে দিয়েছে পাঠশালে!

কথাটা মালতীর কাণেও আসিত—মনে মনে দুঃখ অনুভব করিলেও মুখে সে ভাব সে প্রকাশ করিত না। পুত্রকে কাছে ডাকিয়া বলিত—বাবা রাজু! মন দিয়ে লেখো প'ড়ো—যেন।

রাজবল্লভ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিত।

রাজবল্লভের পড়িবার আগ্রহ ছিল খুব বেশী আর তাহা ছিল বলিয়াই সে কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রাথমিক পরীক্ষায় মাসিক চার টাকা বৃত্তি পাইয়া গেল। সেই হইতে তাহার পড়িবার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল।

গ্রামের লোক কিন্তু এতটা আশা করে নাই। তাহাদের ধারণা ছিল, বৃত্তি যদি পায়ই তবে তাহা তাহাদের পুত্রেরাই পাইবে। তাহা যখন হইল না, তখন সকলেরই গাত্রদাহ উপস্থিত হইল; বিশেষ করিয়া—হরিশ ভট্টাচার্য্যের।

হরিশ বলিল—ঘোর কলি; নইলে এমন ধারা হয়? না কেউ কখনও শুনেছ? ব্রাহ্মণ রইলো, কায়স্থ রইলো পড়ে'—যারা বিদ্যে নিয়ে নেড়ে চেড়ে খাবে—তারা জলপানী না পেয়ে পেলে কিনা ওই ব্যাটা পুঁটে বাগ্দী—এর চেয়ে চাষার ছেলে পেলেও যে ছিল ভালো!

সতীশ রায় কথাটা সমর্থন করিয়া বলিল,—আর দাদা! আর সেদিন নাই—ছিল বটে একদিন ব্রাহ্মণ জাতির সেরা—কায়স্থ বিদ্যার বরপুত্র—

গ্রামের উচ্চ ভদ্র সকলেরই আলোচনার পাত্র হইয়া দাঁড়াইল এই রাজবল্লভ।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও তাহাকে লইয়া আলোচনা চলিতেছিল বেশ। তাহাদের কথার সার মর্ম্ম ছিল,—যাক্, এবার তবু তাদের মধ্যে একটা মানুষ হ'য়ে দাঁড়ালো—ওঃ বাপ্ একখানা পত্তর লেখাতে কি পড়াতে হ'লে বাবুদের কত খোসামুদিই না করতে হ'ত। এবার আর ভদ্দর লোকদের চালাকী চলবেনা যাদু!

দুই শ্রেণীর সমাজেই আজ রাজবল্লভের কথা!—একদল তাহার বৃত্তিপ্রাপ্তিতে যেমন আনন্দিত ও উৎফুল্ল—অপর দিকে ঠিক তার বিপরীত।

—ব্যাটা বাগ্দীর ছেলে যে শিক্ষিত হ'য়ে তাদের মানসম্ভ্রম, বিদ্যাবুদ্ধির কেরামতির উপর হাত চালাবে, আর তাই তারা নির্ব্বিবাদে সহ্য ক'রবে—অসম্ভব!

সুতরাং কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র।

হরিশ ভট্টাচার্য্য বলিল,—তা যাই বল না তোমরা—"নাই" পেয়ে ব্যাটা শেষে মাথায় উঠবে—একটা বিলি ব্যবস্থা এই বেলা করে' ফেল। আর বাড়াবাড়ি ভাল নয়।—

কিন্তু কি উপায় করা যায়?—অবশেষে স্থির হইল পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে যাওয়া।

পণ্ডিত মশাই এ গ্রামের লোক নহেন। এককালে অবস্থা নাকি তাঁহাদের ভালই ছিল, তবে জ্ঞাতি শত্রুর সহিত একটা জাম গাছের স্বত্ব লইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় বেচারী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া উদরান্নের আর কোনও প্রকার সংস্থান করিতে না পারিয়া পরিশেষে এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু লোকটী বেশ শিক্ষিত, সচ্চরিত্র এবং উদার।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পাঠশালা, দক্ষিণদ্বারী একটানা প্রকাণ্ড একখানা গৃহ, তাহাতে তিনটী কামরা। পশ্চিম দিকেরটী পণ্ডিত মহাশয়ের পাক ও ভাণ্ডার-গৃহ।—পূর্ব্ব দিকেরটী শয়ন-ঘর এবং মাঝের লম্বা বড় একটানা ঘরটীতেই সকাল বৈকাল পাঠশালা বসে।

পাঠশালা-গৃহের দক্ষিণ ও পশ্চিম খোলা। পশ্চিম দিকে একটী ছোট মাঠ—এখানে ছেলেরা খেলা করে—

মাঠের ওধারে কয়েক বিঘা আবাদি জমী—তাহার পশ্চিমে গ্রামের বাগ্দীপাড়া।

পাঠশালা-গৃহের সম্মুখে দক্ষিণে, পল্লীর প্রশস্ত পথ, পথের পশ্চিমে গ্রামের দীঘি। সন্ধ্যার ক্ষণ পূর্ব্বে ঐ পথ দিয়াই গ্রামের বধু, বালিকা ও গৃহিণীর দল দীঘি হইতে জল লইতে আসে। পথ দিয়া গরুর গাড়ী যাওয়া আসা করে, ছেলেরা তখন উচ্চরবে ঘোষণা করে দুই একে দুই, দুই দ্বিগুণে চার—

পাঠশালা বাড়ীটার চারিদিকে ঘন কল্‌কে ও রাং-চিতার বেড়া—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা শিশু গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—ওদিক্‌ দিয়া একটা বটগাছ নতুন বসানো হইয়াছে।

দুপুরবেলা পণ্ডিত মশাই যাই হোক দুইটা ভাতে ভাত রাঁধিয়া লন—সেদিনও লইতেছিলেন, এমন সময়ে সদলবলে হরিশ ভট্টাচার্য্য, সতীশ রায় প্রমুখ গ্রামের ভদ্র-পল্লীর প্রায় সকলেই আসিয়া দাঁড়াইতেই—পণ্ডিত মশাই হঠাৎ অসময়ে এতগুলি সম্ভ্রান্তের আগমনে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

হরিশ ভট্টাচার্য্য বলিল,—থাক্‌ থাক্‌, অত ব্যস্ত হবার দরকার নাই।

কতকগুলি তালের চ্যাটাই টানিয়া একখানার উপর বসিয়া বলিল,—বসহে সতীশ, তোমরাও বসহে—তারপর বলিল—বুঝলে পণ্ডিত—

বলিয়া নানা কথার পর—হরিশই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যে কথাটা বলিল, তাহাতে পণ্ডিত মশাই অবাক্‌ হইয়া কহিলেন,—সেটা কি ভাল হবে? তাছাড়া ছেলেটার পড়বার দিকে মন রয়েছে বেশ।

হরিশ এবার বিরক্ত হইয়া গেল; বলিল—রয়েছে তো রয়েছে—তাতে কার মাথা কিনেচে বাপু!—তুমি কি বলতে চাও যে ওই বাগ্দীর ছেলের সঙ্গে বসে আমাদের বামুন কায়েতের ছেলেরা পড়বে—আর ছিষ্টি জ্বালাবে—বলি আমাদের কি আর জাত জন্ম রইবে না?—

পণ্ডিত মশাই বলিলেন—লেখা পড়া শিখতে গেলে অতটা বাছবিচার করা চলে না। তা ছাড়া ওই এখন আমার স্কুলের গৌরব।

মুখ খিঁচাইয়া হরিশ বলিল—তবেই আর কি? আমাদের গৌরব নরক হ'তে ত্রাণ করবে!—শোন পণ্ডিত, আমি বক্তিমে শুনতে আসি নাই—বলি, তুমি ওকে স্কুল থেকে তাড়াবে কি না?

পণ্ডিত মশাই আমতা আমতা করিয়া বলিল, আমি তাড়াবার কে—বলুন;—তবে আমি ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে লিখি, তিনি যদি—

হরিশ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—তিনি যদি অনুমতি দেন—এস হে সব চলে এস, ও ওকে তাড়াবে না, দেখি ওর ইন্‌স্পেক্টর কেমন করে' স্কুল চালিয়ে নেয়।

সকলে চলিয়া গেল।

পাঁচ দিন নয়, দশ দিন নয়—তিন দিনের মধ্যেই আর একটা পাঠশালা বসিয়া গেল হরিশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে; পড়াইবার ভার লইল—হরিশ নিজে।

বেগতিক বুঝিয়া পণ্ডিত মশাই আসিয়া বলিলেন—বেশ, আমি আপনার কথাতেই রাজী।

সকলেই কথাটা শুনিয়া বলিল—যাক্‌, এতদিনে দেখছি, পণ্ডিতের সুমতি হয়েছে।

সুমতি না হইলেই বা উপায় কোথায়? আজ পাঁচ দিন বেচারীকে কেহ একটা সিধা পর্য্যন্ত দিয়া সাহায্য করে নাই—ঘরে যে চাউল মজুত-ছিল তাহা দিয়াই আজ এ কয় দিন চলিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া তো বরাবর চলিবে না—ইদানীং দুই একজন ব্যতীত আর কোন ছাত্রই পড়িতে আসে না। সুতরাং তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে রাজী হইতে হইল।

পণ্ডিত মশাইয়ের মনের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। হরিশ ভট্টাচার্য্যের পাঠশালা হইতে ফিরিয়া পণ্ডিত মশাই একটা ভাঙা চেয়ারের উপর বসিয়া সেই কথাটাই ভাবিতেছিলেন—কেমন করিয়া রাজবল্লভের নিকট কথাটা তুলিবেন। দুই একজন ছাত্র যাহারা তখন আসিয়াছিল, পণ্ডিত মশাইকে অন্যমনস্ক দেখিয়া শ্লেটের পিঠে চিক কাটাকাটি খেলিতেছিল।

যাহাকে লইয়া ভাবনা সেই আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল—পণ্ডিত মশাই ধরা গলায় বলিলেন—

—রাজু! শোন!

রাজবল্লভ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল;—পণ্ডিত মশাই কি বলিবেন তাহা সে কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল—কারণ এ কয়দিন স্কুলে আসিয়া সে যাহা শুনিয়াছিল তাহাতে তাহার অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না। কিন্তু পণ্ডিত মশাই তাহাকে তাড়াইয়া দিবেন না, এ ধারণা বরাবরই ছিল।

পণ্ডিত মশাই বলিলেন,—তুমি বৃত্তি পেয়েছ বলে' গাঁয়ের লোকগুলো হিংসায় জলে মরছে—তারা তোমাকে না তাড়ালে আমার স্কুলে কোন ছেলেকে পড়তে দেবে না। তাই—

বাকী কথাটা তিনি সহসা শেষ করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তাই বলছিলাম যে—তোমাকে পড়ালে যদি আমার অন্ন মারা যায়, তা হ'লে—তুমি কি বল?

রাজবল্লভ কিছুই বলিল না। শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পণ্ডিত মশাই বলিলেন;—কিছু মনে করো না বাবা! তুমি এলে যদি আমার ক্ষতিই হয়, তা'হ'লে তোমার উচিত না আসা।

রাজবল্লভ একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—বেশ তাই হবে, পণ্ডিত মশাই—

রাজবল্লভ পণ্ডিত মশাইয়ের পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইয়া ফিরিতেছিল; পণ্ডিত মশাই বলিলেন, যদি তোমার পড়বার একান্ত ইচ্ছা থাকে তা হ'লে রাত্রে আমার কাছে এসে পড়তে পার।

রাজবল্লভ কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না, যে সে বৃত্তি পাইয়াছে তাহাতে লোকের হিংসা করিবার এমন কি আছে? সে বৃত্তি পাইয়াছে বলিয়া তাহার অপেক্ষা তাহার গাঁয়ের কত আনন্দ হইয়াছে—এইতো কালই তাহার মাতা দক্ষিণপাড়ার জাগ্রত গ্রাম্যদেবী কালীতলায় জোড়া পাঁঠা মানসিক করিয়া আসিয়াছে। তাহার নিজেরও আনন্দ বড় কম হয় নাই—সে ত মাকে বলিয়াছে—এবার আমরা সরস্বতী পূজা করবো মা! হায়রে, তাহার এ উচ্চাশাকে কে বা কাহারা এমন করিয়া সমূলে বিনাশ করিয়া দিতে চায় গো—

পণ্ডিত মশাইয়ের কথার উত্তরে রাজবল্লভ বলিল;—তাতেও যদি ওরা বাগড়া দেয়?

পণ্ডিত মশাই বুঝিলেন, অসম্ভব নয়। তিনি বলিলেন—এক কাজ করতে পার—ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে ধরে' যদি পড়তে পারো হয়তো একটা কিছু গতি হ'তে পারে। কাল আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো—তুমিও না হয় আমার সঙ্গে যেও।

রাজবল্লভ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

রাজবল্লভ বাড়ী ফিরিতেই মালতী বলিল—কিরে এরই মধ্যে চলে' এলি যে—ছুটী হ'য়ে গেল বুঝি?

রাজবল্লভ বই শ্লেট তুলিয়া রাখিতে রাখিতে বলিল—হ্যাঁ, জন্মের মতন।

মালতী এ কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। রাজবল্লভ তাহাকে সবিস্তারে সকল কথা বলিতেই মালতী এই সব একচোখা অনামুখো গ্রামবাসীদের উদ্দেশে অনেক কিছু শ্রাব্য ও অশ্রাব্য কথা উচ্চ কণ্ঠে শুনাইয়া দিল—তাহারা শুনিতে পাইল কি না তাহা সেই একজনই জানেন।

পরদিন রবিবার। প্রাতে রাজবল্লভ তাহার ছিটের জামাটী গায়ে দিয়া একখণ্ড ছেঁড়া নেকড়াতে মুড়ি ও গুড় বাঁধিয়া পণ্ডিত মশাই'এর সহিত কীর্ণাহারে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

পণ্ডিত মশাই নিজ প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করিয়া রাজবল্লভের সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় বলিলেন;—আমি বুঝতে পারছি না, যে কেন তাঁরা গ্রামের মধ্যে একটী ভাল ছেলেকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে চান্। আচ্ছা, আমি যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করে' দেব এখন।

স্কুলের এই গোলমালের জন্য তদন্ত আরম্ভ হইয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় পণ্ডিত মহাশয় ও অপরাপর গ্রামবাসিদের তলপ করাইয়া তাহাদের মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ

করিয়া উহা শিক্ষাবিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিয়া দিলেন।

প্রায় পনের দিন পরের কথা!

শিক্ষাবিভাগ হইতে উত্তর আসিল—রাজবল্লভকে পড়িতে দেওয়া হউক—যদি না দেওয়া হয়, স্কুলের মাসিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে—যেহেতু শিক্ষার অধিকার জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকারই আছে।

মন্তব্য শুনিয়া হরিশ প্রভৃতি কয়েকজন চটিয়া গেল। যাইবারই কথাই তো—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ব্যতীত শিক্ষার অধিকার আবার কার আছে? ম্লেচ্ছ রাজার আমলে সব স্বেচ্ছাচারী কাণ্ড—এ সব অন্যায় আমরা মান্‌তে রাজী নই—আর একটা পাঠশালা চালাবো।

সতীশ রায় কিন্তু ইহাতে রাজী হইতে পারিল না। সে এই বিবাদের সূত্রপাত হইতে যদিও হরিশের দলে, তথাপি সে ভাবিয়া দেখিল—যদি সরকারের সহিত বিপক্ষতাচরণ করিয়া নূতন পাঠশালা স্থাপন করা যায়, তাহা স্থায়ী হইবে কি না? কিছুতেই হইবে না। সুতরাং তাহার পুত্রগুলি মূর্খ হইয়া থাকিবে। হরিশ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ। তাহার সেবক শিষ্য দু চার ঘর যাহা আছে, তাহার পুত্র এই দেবভাষাবিরহিত বাংলা দেশে অং-বং-শং করিয়াও মূর্খ চাষাদের মাথায় হাত বুলাইয়া চাল-কলা এবং দুই বেলা দুই মুঠা জুটাইবে—কিন্তু তাহার পুত্র? তাহাদের কি উপায় হইবে? চোর না ডাকাত? না পরের বাড়ী তামাক সাজিতে যাইবে? না না তাহা হইতেই পারে না—সুতরাং সে রাজী হইতে পারিল না। বলিল, অত চট্‌লে চলবে না ভায়া, ভেবে চিন্তে দেখ—

হরিশ বলিল—ভাব্‌বো আবার কি? পণ্ডিত মশাইয়ের মাইনে—সে তো আমরাই দোব—দু-চার আনা যে যেমন পাড়বে। আর খাবার ভাবনা? এতগুলো বামুন কায়েৎ গাঁয়ে থাকতে আবার খাবার ভাবনা?

সতীশ বলিল—কথা ঠিক; কিন্তু এটা সরকারের রাজত্ব, সরকার যদি তোমাকে স্কুল চালাতে না দেয়?

হরিশ অত শত বুঝে না, বলিল—দেবে না অমনি আমরা—মজা কিনা? একশো বার দেবে।

সতীশ বলিল—যদি না দেয়, বে-আইনি পাঠশালা বলে' পুলিশ লাগিয়ে তুলে দেয়, তখন? এ সরকারের রাজত্ব সরকারী মতে চলতে হবে।

সতীশ রায় এমন কতকগুলি যুক্তি দিল, যাহার ফলে রাজবল্লভ পড়িতে পাইল এবং পাঠশালাও পূর্ব্বে যেমন চলিতেছিল তেমনিই চলিতে লাগিল।

কিন্তু হরিশের মনটা তখনও খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল দেখিয়া সতীশ বলিল—বুঝ্‌লে ভট্টাজ! ছোঁড়া আজ বৃত্তি পেয়েছে মেনে নিলাম—কিন্তু চিরদিনতো আর পাবে না। বামুন কায়েতের মাথা আর বাগ্দীর মাথায় যদি সমান বুদ্ধিই থাকবে, তা'হলে দুটো কথার সৃষ্টিই বা হবে কেন?—ছোট আর বড়, এ জাতিগত সংস্কার তো একটা আছে—ও বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া হ'য়েছে বই কিছু নয়!

রাজবল্লভ শিক্ষিত হইতে লাগিল যতই, ততই স্বার্থবাদী দলের হিংসা বাড়িতে লাগিল—কারণ, রাজবল্লভ শুধু শিক্ষিত হইতেছে বলিয়া নহে, সে প্রত্যেক পরীক্ষায় জলপানি পাইতেছে এবং তাহারই টাকা হইতে আবার উঁচু শ্রেণীতে পড়িতে পাইতেছে—ভবিষ্যতে সে একটা কিছু না করিলেই বাঁচা যায়! আশঙ্কাটা সব চেয়ে হরিশ ভট্টাচার্য্যেরই বেশী; তাহার চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠে, রাজবল্লভ যেন তাহাকে পদে পদে অপদস্থ করিতে চায়—তাহার প্রতি কথায় কথায় প্রতিবাদ করে, তর্ক করে।

করিয়াছিল একদিন—

কয়েক বৎসর মধ্যেই রাজবল্লভ কীর্ণাহার হাই-স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া গ্রামে ফিরিল। সে যখন প্রথম কীর্ণাহারে পড়িতে যায় তখন মালতী বলিয়াছিল—বাবা রাজু, মনে রাখিস, তুই বাগ্দীর ঘরের ছেলে, মন দিয়ে পড়াশুনো করিস্ যেন।

রাজবল্লভ মাতার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল।

মাতার উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল—আর তাহা করিবার একটা কারণও ছিল। যাহারা

বলিয়াছিল—"দুদিনবাদে কার' গরু চড়াবে তার ঠিক নেই, তার আবার লেখাপড়া শিখ্‌বার সখ কেন?" তাহাদের সেই কথাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য, সে যে কাহারও গরু চড়াইবে না তাহা দেখাইবার জন্যই সে আরও মন দিয়া লেখাপড়ায় মন দিয়াছিল।

সহরে পড়িতে আসিয়া অনেক ছেলেই লেখাপড়া শিক্ষার চেয়ে বিলাসিতা শিক্ষাটুকুই ষোল আনায় লাভ করিত—তখন রাজবল্লভ নিজের কামরাটীতে বসিয়া হয় ইতিহাস, নয়তো ইংরাজী বই লইয়া পড়িয়া থাকে। সেই জন্যই শিক্ষকেরাও রাজবল্লভকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

যে মীমাংসা রাজবল্লভ সমস্ত পাঠ্য জীবন ধরিয়া করিতে পারে নাই, আজ বাড়ী আসিতেই হঠাৎ তাহার মীমাংসা হইয়া গেল।

যতীন বাগ্দী সেদিন সন্ধ্যা বেলা একখানা তেল-চিট্‌চিটে ময়লা ছেঁড়া খাতা আনিয়া রাজবল্লভকে বলিল—দেখ্‌তো ভাই রাজু, আমার এই হিসেবটা—আমার হিসেবে তের টাকা হয়—আর বলে কি না বারো টাকা চার আনা।

রাজবল্লভ হিসাব মিলাইতে বসিল, বলিল—বল কোন দিন কত বস্তা বোঝাই দিয়েছ?

যতীন হাতের আঙ্গুল গণিয়া বলিয়া যায়—এই তোমার সে বুধবারে দুকুড়ি, লখিবারে এককুড়ি দশ; কত হ'ল?

রাজবল্লভ বলে—তাহার পর খাতাখানা টানিয়া লইয়া মিলাইয়া দেখে, ঠিক হইয়াছে—কিন্তু টাকা আনার যোগে ভুল—আবার যতীন হিসাব দেয়, রবিবার দিন সাতান্ন বস্তা; কিন্তু খাতায় লেখা পঞ্চাশ বস্তা।

এমনি ধারা গোলমাল প্রায়ই হয়, শুধু যতীনের হিসাবে নয়—নেংটের, মেধোর, স্বরোর সবারই হিসাবে।

রাজবল্লভ স্থির করিল—এই সব অশিক্ষিতদের যাহাতে কেহ ঠকাইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা সে যদি না করে তাহা হইলে তাহার শিক্ষার মূল্য কি? সহরে সে দেখিয়া আসিয়াছে, কত ভদ্র সন্তান গরীবদের জন্য বিনা বেতনে রাত্রিতে স্কুল খুলিয়াছে। দিনে সমস্ত দিন খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলা পর-নিন্দার আড্ডা ভাঙ্গিয়া স্কুল করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের নানাদিকে উন্নতি হইতেছে।

কথাটাকে তাহাদের সমাজে তুলিতেই দুই চারি জন বলিল—আবার ওসব হাঙ্গামা কেনে বাপু! ওসব ভদ্দর লোকদেরই ভাল; আমরা গরীব দুঃখী মানুষ, দুঃখু ধান্ধা করে' খাই—সময় কোথা!

কিন্তু রাজবল্লভের অকাট্য যুক্তি দুই চারি দিনের মধ্যেই সকলকে রাজী করাইল। তখন সে গ্রামস্থ ভদ্র-লোকদের নিকট ইহার জন্য কিছু কিছু সাহায্য প্রার্থনাও করিল—কিন্তু সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাহারা তো হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল; শুধু তাহাই নহে—ব্যঙ্গ-ভরে বলিয়াছিল—ওহে বাপু! দেশের সবাই যদি লেখাপড়া শেখে, তাহ'লে যে দেশে মুটে মজুরের অভাব হবে।

কথাটাতে রাজবল্লভের প্রাণে আঘাত লাগিল। আর কাহারও নিকট সাহায্যপ্রত্যাশী না হইয়া, একটী শুভদিন দেখিয়া নৈশ বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া, কীর্ণাহারে স্কুল ইন্‌স্পেক্টরকে সকল কথা জানাইয়া সে একখানি দরখাস্ত করিয়া দিল।

একমাস পরে রাজবল্লভের দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া মাসিক পাঁচটী করিয়া টাকা সাহায্য পাইবে, এই হুকুম আসিল।

রাজবল্লভ শুধু স্কুল খুলিয়াই স্থির হইয়া রহিল না, তাহাদের অভাব অভিযোগ, তাহাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে।

হরিশ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সকলেই বেগতিক বুঝিয়া একটা পরামর্শ-সভা আহ্বান করিল।

হরিশ বলিল—কেমন হে ভায়ারা, বলেছিলাম তো আগেই, তখন আমার কথা কেউই শুনলে না তো! আমি আগেই জান্‌তাম, ও বাবা কাল-কেউটের বাচ্ছা। ছুটো কালীর আঁচড় পেটে পড়েচে কি না পড়েচে—কথায়

কথায় ফোঁস, একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান-- ব্যাটা বামুন কায়েৎ মানতে চায় না।

সতীশ বলিল—যা হবার তা তো হ'য়ে গেছে, ওসব ভেবে কোন লাভ নেই—এখন ওকে দমানো যায় কেমন করে' ?

রমেশ রায় বলিল—ব্যাটা যে রকম করে' অন্ধের চোখ ফুটিয়ে দিতে আরম্ভ করেচে—আর দু'এক বৎসর পরে আমাদের "হাড়ির হাল" করে' তবে ছাড়্বে।

নানা জল্পনা কল্পনার পর স্থির হইল- যে, রাজবল্লভের দলে যে বা যাহারা থাকিবে তাহাদিগকে গ্রামস্থ পঞ্চায়েৎ কোনও প্রকারে সাহায্য করিবে না, তাহারা তাহাদিগকে কাজ দিবে না; এমন কি ভিন্ন গ্রাম হইতে 'জন-মজুর' আনাইয়া কার্য্য চালাইবে।

পরামর্শ-মত কাজও হইল। কিন্তু ফল হইল হিতে বিপরীত। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, ভিন্ন গ্রাম হইতে 'জন-মজুর' কেহ কাহারও বাড়ীতে কাজে আসে নাই। সংবাদ লইয়া বুঝিল, এ রাজবল্লভের চক্রান্ত। কারণ, মজুরেরা স্পষ্টতঃ বলিল—আপনারা যদি গাঁয়ের লোক নিয়ে কাজ চালাতে না পারেন, তবে আমরা ভিন্ গাঁয়ের লোক, আমাদের রোজ রোজ গাঁ অস্তে কাজ করে' পোষাবে না বাবু! তার চেয়ে গাঁয়ের লোক নিয়ে চালিয়ে নিলেই ভাল হয় না কি ?

হরিশের দল বিপদ্ গণিল। আষাঢ় মাস। বৃষ্টি হইয়াছে—জমিতে জলও জমিয়াছে, এমন সময়ে চাষের ক্ষতি করা কোনও মতেই উচিত হয় না। কারণ, ক্ষতি হইলে সমস্ত বৎসরের আশা ভরসা লোপ পায়। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য, হরিশের দল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়, তবু মজুর পায় না, দ্বিগুণ বেতনেও কেহ কাজ করিতে চায় না। উপায় ?

উপায় হয়তো হইতে পারিত। যদি তাহারা রাজ-বল্লভের সহিত মীমাংসা করিত, যদি তাহাকে বশে রাখিয়া কাজ করিত—তাহা তাহারা করিলেন না বলিয়াই এমনি ধারা পদে পদে অপদস্থ হইয়া কেবলই ক্রোধের মাত্রা বাড়াইল বইতো নয়।

হরিশ বলিল—দল স্থির করি—দেওয়া যাক্ ছোঁড়াকে ঘা কতক বসিয়ে। কিন্তু সাহস হয় না। যত হাড়ি, বাগ্দী, ডোম, ডোকল, সব ব্যাটাই ওই হতভাগার দলে। তার উপর ব্যাটারা যা খাপ্পা হ'য়ে আছে!

একজন বলিল- উপায় হচ্ছে—জমিদারের শরণ নেওয়া—যদি তিনি কিছু বিহিত করে দেন। সকলেই কথাটা সমর্থন করিল।

সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্রের অপরাধে রাজবল্লভ ধৃত হইয়া হাজতে আসিল যেদিন, সেদিন গ্রামের মজুর-মহলে একটা চঞ্চলতার সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু পুলিশের সহিত কে লড়াই করিতে যাইবে ? তবুও সেই রকম ধরণের একটা কি যেন পরামর্শ চলিতেছিল জানিতে পারিয়া, রাজবল্লভ সকলকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিল, যদি তাহারা এই রকম করে তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আসিয়াছে তাহা বলবৎ হইয়া মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা বরং সে বেশী পরিমাণে সাজা পাইবে।

আদালতে প্রমাণের অভাবে রাজবল্লভ মুক্তি পাইল। আদালতে প্রমাণ হইল, রাজবল্লভ দল গঠন করিয়াছে সত্য, তবে তাহা সরকারের বিরুদ্ধে নয়—গরীব, চাষী, মজুরদের মধ্যে শিক্ষা ও সহবতের প্রচলন করার জন্য, সুতরাং রাজবল্লভ মুক্তি পাইল।

কিন্তু পাইলে কি হইবে? গ্রামের ভদ্রসমাজ মুক্তি দেয় কই? তাহারা যে নাছোড়বান্দা! তাহার মুক্তির একমাস না যাইতেই সে পুনরায় গ্রেপ্তার হইল, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নয়—ডাকাতির অভিযোগে। কারণ, যাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল—সে পুলিশের নিকট জবানবন্দী দিবার সময়ে বলিল,—ডাকাতদের মধ্যে কয়েকজনকে সে চিনিয়াছে, তাহার মধ্যে রাজবল্লভ ছিল এবং সেই ছিল দলের সর্দ্দার।

প্রমাণ সাক্ষীসাবুদেরও অভাব হইল না। বামালও পাওয়া গেল—কয়েকখানা সোণার অলঙ্কার, কয়েকখানা নম্বরী নোট পর্য্যন্ত!

রাজবল্লভের গৃহ যখন খানাতল্লাস হইতেছিল, তখন সে বাড়ী ছিল না—তাহাদের সমিতির কাজে হরিপুর গিয়াছিল।

কেশব বাগ্দী তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য হরিপুরে সংবাদ দিতে গিয়াছিল; কিন্তু রাজবল্লভ কেশবের সঙ্গে যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বাড়ীটী চৌকীদার, দফাদার, কনেষ্টবলে ভর্ত্তি। পাড়ার কয়েকজন বাগ্দী ও ডোমেদের যুবককে হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে এবং একটা বেতের মোড়ার উপর হাফপ্যাণ্ট-পরা দারোগাবাবু মালতীকে তম্বী করিয়া বলিতেছে—বল্ মাগী কি জানিস্—নইলে তোকেও ধরে নিয়ে যাবো।

মালতী হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি কিছুই জানি না বাবা!

রাজবল্লভ আগাইয়া আসিয়া বলিল—যা জিজ্ঞাসা করবার আমাকে করুন।

হরিশ ব্যস্তভাবে বলিল—এই যে হুজুর! রাজবল্লভ এসেছে। আহা ও অবলা, ওকে ছেড়ে দিন।

দারোগার আদেশে রাজবল্লভের হাতে হাতকড়া পড়িয়া গেল। রাজবল্লভ জিজ্ঞাসা করিল—আমার অপরাধ?

দারোগা মুখ ফিরাইয়া বলিল—অপরাধ? থানায় গেলেই জান্‌তে পারবে। একবার ছাড়ান পেয়ে যে একেবারে বেড়ে গেছ। মনে করেছ—গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে ঘুণ ধরেছে, না?

আরও ঘণ্টাখানেক খানাতল্লাসী করিয়া সমিতির খাতাপত্র চোরাই মালসহ রাজবল্লভ ও অপরাপর আসামীদের লইয়া গেল।

মালতী আসিয়া একেবারে দারোগার পায়ে আছড়াইয়া পড়িল—বলিল, ওকে ছেড়ে দাও বাবা!

রাজবল্লভ দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—মা!

মালতী দারোগার পা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আমি কেমন করে' মুখ দেখাবো বাবা!

রাজবল্লভ বলিল—তোমার তো এতে লজ্জার কিছুই নাই মা! তুমি তো জানো, আমি নির্দ্দোষ।

রাজবল্লভকে লইয়া গেল।

মালতীর ক্রন্দনে আকাশ বাতাস কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

আদালতের বিচারে রাজবল্লভ দোষী প্রমাণ হইল—আরও প্রমাণ হইল, তাহাদের সমিতির খাতাপত্রের দিক্ দিয়া—কারণ তাহাদের নিয়মাবলীর এক অধ্যায়ে লেখা ছিল "এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা।"

অপর সকলেই প্রথম বারের আসামী ছিল বলিয়া এক বৎসর ও রাজবল্লভের দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল।

মালতী পুত্রকে খালাস করিবার জন্য যাহা কিছু শেষ সম্বল ছিল সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

পাঁচখানা গ্রামের জল-অচল জাতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—জেলখানার ফটকের কাছে, তাহাদের গুরু, তাহাদের সর্দ্দারকে অভিনন্দন করিবার জন্য। সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া।

রক্ষি-পরিবেষ্টিত রাজবল্লভ আসিয়া দাঁড়াইল—সেই বিরাট্ জনতার দিকে একবার তাকাইল—দেখিল, দুহাতে ভীড় ঠেলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আসিতেছে মালতী—

ভিতর হইতে একজন রক্ষী জেলখানার বিরাট্ লৌহ-ফটকের নীচের দিকের একটা অংশ খুলিয়া দিল।

মালতী আসিয়া রাজবল্লভকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—রাজুরে—আমি কেমন করে' ঘরে ফিরে' যাবো? আমি কেমন করে' দিন কাটাবোরে বাবা! ওরে তুই যে আমার সবে ধন নীলমণি—

রাজবল্লভ সান্ত্বনার সুরে বলিল—চুপ কর মা, কেঁদ না। তুমিও যদি এমনি করে কাঁদবে তা হ'লে, আমি

কেমন ক'রে দিন কাটাবো? মনে কর, আমি কলকাতা গেছি পড়তে।

মালতী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া বলিল—ওরে তোর বরাতে যে এমন ঘটবে তাতো স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুই যে রাজা হবি, তোর কপালে যে পঁচিশ বছর বয়সে রাজদণ্ড লেখা আছে। গণক ঠাকুরের কথা কি মিথ্যে হবে? এই যে তোর পঁচিশ বছর চলছে রে—

এত দুঃখেও রাজবল্লভের হাসি পাইল। বলিল—তুমি ভুল বুঝেছ মা! গণক ঠাকুর ঠিকই বলেছেন, গণক ঠাকুর তো বলেন নাই, যে তোমার ছেলে রাজা হবে। আজ রাজদণ্ড ছিল বলে'ই পাকে-প্রকারে সেটা ঘটে গেল। রাজদণ্ড মানে রাজার কাছ থেকে দণ্ড পাওয়া—তাই তো পেলাম। এ সেই—কাশীতে মৃত্যুর জায়গায় ফাঁসীতে মৃত্যুর গল্পের মত হ'য়ে গেছে মা!

তারপর জনতার দিকে ফিরিয়া বলিল—আমাকে যারা ভালবাসো, স্নেহ কর, তারা শুধু মনে রেখ—আমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নেমেছি—আমি না ফেরা পর্য্যন্ত আমার হাতে গড়া সমিতি ভেঙ না—স্কুল চালিও—আর একটী কথা শুধু মনে রেখ—তোমরা মানুষ—

জনতার ভিতর হইতে কে একজন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—আমরা এর প্রতিশোধ নেব।

গম্ভীর ভাবে রাজবল্লভ বলিল, না। আমি না ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে।

সিপাহী বলিল,—দের্ হো যাতা, চল্।

রাজবল্লভ বলিল—যাত্যা হ্যায় ভাই, গোসা কর মাৎ।

বন্দী রাজবল্লভ লোহার বালা পরা হাত দুইটী উর্দ্ধে তুলিয়া সকলকে নমস্কার করিল—হাতকড়া-সংলগ্ন লোহার শিকলটা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—তার পর হেঁট হইয়া মালতীর পায়ের ধূলা তুলিয়া দুহাত মুখের নিকট আনিয়া মাথায় ঠেকাইল, বলিল—মা, বাড়ী ফিরে যাও, মনে ক'রো আমি কোথাও বিদেশে গেছি। আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন মানুষ হই—আমার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়।

মালতী তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, তাহার দুচক্ষু দিয়া অবিরাম অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল—রাজবল্লভের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। সকলের মনই বিষাদে আচ্ছন্ন।

একটা সিপাই রাজবল্লভকে টানিয়া সেই দরজা দিয়া ফটকের মধ্যে প্রবেশ করাইল, সঙ্গে সঙ্গে ভারী লোহার আংশিক দরজাটাও বন্ধ হইয়া গেল। ফটকের বাঁ দিকে জেলের অফিস-ঘর। বাহির হইতে রেলিং-ঘেরা ফটক ও আফিস ঘরের কতক অংশ দেখা যায়। রাজবল্লভকে অফিস-ঘরে লইয়া গেল এবং প্রায় আধঘণ্টা পরে অফিস-ঘর হইতে বাহির করিয়া ফটকের ভিতর দিকের বিরাট্ লোহার বন্ধ দরজার এক অংশ খুলিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল যাইবার সময়ে রাজবল্লভ একবার এই বহির্জগৎটা দেখিয়া লইল এবং দেখিয়া লইল তাহার মাকে, দেখিল তাহার দলকে। রাজবল্লভের ভিতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

সকলে যখন বিমর্ষ মনে ফিরিতেছিল, তখন তাহাদের কিছু আগে যে আর একটী দল চলিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, জিতা রহো দা ঠাকুর, কি সাক্ষিটাই না দিলে মাইরী! একসেলেণ্টো—একটু বেফাঁস হ'লেই সব ফেঁসে যেত।

হরিশ বলিল—ওকি আর আমি বলেছি, শাস্ত্রেই বলেছে, দশচক্রে ভগবান ভূত!

বাদ্যে বাজীকর

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, বি-এ

বোসের সার্কাস না দেখিয়াছেন আমাদের দেশে আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে এমন খুব কমই আছেন। বিশেষ করিয়া গণপতি বোসের "ভৌতিক খেলা" আবালবৃদ্ধবনিতার বিস্ময়ের বস্তু ছিল। হস্ত-পদ-বন্দী অবস্থায় একই সময়ে 'হারমোনিয়ম' 'ডুগী-তবলা' বাজান যে তপঃসাধ্য ব্যাপার তাহা সাধারণের নিকটে ভুতুড়ে কাণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াটাই স্বাভাবিক। অভ্যাসে অসাধ্য সাধিত হয়। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা প্রতীচ্য দেশে পিয়ানো বাদ্যে যে অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহারই একটা ছবি বক্ষ্যমান প্রবন্ধে চিত্রিত হইয়াছে।

বসিবার টুল পড়িয়া যাওয়ায়, রস বে-কায়দায় পড়িয়াও পিয়ানো বাজাইতে আরম্ভ করেন

প্রথমেই পেডেরিউস্কির নাম করা যাইতে পারে, তিনি তাঁর যন্ত্রকে দেবদূতের মতই যথেচ্ছা ইঙ্গিত মাত্রই যেন হাসাইতে, কাঁদাইতে, কথা বলাইতে বা গান গাওয়াইতে পারিতেন। আর একজন বিখ্যাত পিয়ানো-বাদক, পিয়ানো-যন্ত্র যাঁর খেলার সামগ্রীর মতই—ইহার নাম মিঃ রস্। রস্ ও পেডেরিউস্কির পিয়ানো বাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও বর্ত্তমান আছে। পেডেরিউস্কি ধীর, শান্ত, ভাবুক। তাঁর সমাহিত অন্তরের প্রাণময় সুরটি যেন পিয়ানোর রাগিণীর মাঝে রূপান্বিত হইয়া সহজভাবেই শ্রোতার চিত্ত স্পর্শ করে। তিনি সত্যই সুরের সাধক, যেন এ মর্ত্ত্যের মানুষ নন। আর মানুষের চঞ্চলতা, চমৎকারিত্ব 'রসে'র মধ্যে বর্ত্তমান। তাঁর অসাধারণ কলা-কৌশল মনুষ্য নির্ব্বিশেষকে বিমুগ্ধ বিস্ময়ান্বিত করে। পিয়ানো বাজাইতে তাঁর কোন স্থান-কাল-অবস্থাবিশেষের প্রয়োজন হয় না। পথে-ঘাটে-মাঠে, শুইয়া-বসিয়া, কাৎ-চিৎ-উবু হইয়া, যে কোন প্রকারেই হউক্, রসের অঙ্গুটি

পিঠের দিকে হাত ও শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে সম্মুখীন হইয়া রস বাজাইতেছেন

পিয়ানোর স্পর্শ মাত্রেই যেন তাঁর ইচ্ছামতই উহা বাজিয়া উঠে। পিয়ানোর সহিত কোন কুঠরীতে রসের হাত-পা

নাচিতে নাচিতে পিছন ফিরিয়া বাজাইতেছেন

বাঁধিয়া চোখে সাত পুরু কাপড় জড়াইয়া ছাড়িয়া দিলেও, রস্ পিয়ানো বাজাইতে সমর্থ হইবেন। রসের শরীরের যে কোন অঙ্গ পিয়ানোর চাবী স্পর্শ করিলেই নিখুঁৎ বাদ্যধ্বনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে। দক্ষ বাদকেরা অঙ্গুলীর দ্বারা যেমন ভাবে পিয়ানো বাজাইতে পারে, রস্ নাসিকার অগ্রভাগ, ইষ্টকখণ্ড, মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা অথবা দন্ত-পিষ্ট পেন্সিল বা কলমের দ্বারা ঠিক তেমনি ভাবেই বাজাইতে সমর্থ।

রসের পুরা নাম জর্জ্জ রস গিলফ্যালান। ইংলণ্ডে ইহার বাড়ী। ডাঃ ওয়ালফোর্ড ডেভিসের ছাত্র হিসাবে উইণ্ডসরে সর্ব্বপ্রথম ইনি সঙ্গীত-শিল্প চর্চ্চা করিতে থাকেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই একজন সুদক্ষ পিয়ানো ও বেহালা-বাদক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তারপর রয়েল বুরোতে ও পরে আমেরিকায় সঙ্গীত-বাদ্য-শিক্ষকতার কার্য্য কিছুদিন করেন। তাঁর বিচিত্র প্রতিভা ব্যবসায়ী-দলেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমেরিকানিবাসী সঙ্গীত ও বাদ্যশিল্পে সুদক্ষা মিসেস গ্রেসনের পাণিগ্রহণের পর 'রস এণ্ড গ্রেসন' নাম দিয়া তিনি নিজেই একটি ব্যবসায়ী দল সৃষ্টি করেন। রসের প্রদর্শনীয় বিষয়গুলি খুব আমোদ-প্রমোদ ও কৌতুকপূর্ণ হইলেও কখনই ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে না বলিয়াই বোধহয় শীঘ্রই তিনি লোকপ্রিয়, বিশেষ করিয়া ভদ্রসমাজের নিকট আদরণীয় হইয়া উঠেন। রসের অন্যান্য কৌতুকের মধ্যে 'শিক্ষক ও ছাত্র' নামক ক্রীড়াটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁর অসাধারণত্ব হইতেছে হরেক রকম পিয়ানো বাজনায়—যাহা দেখিবার জন্য দূরদূরান্তের অসংখ্য দর্শক প্রতি রাত্রে ভীড় পাকায়।

রসের পিয়ানো-কৃতিত্বের মূলে একটা কৌতুকময় হাস্যকর ইতিহাস আছে। কখন্ কোন ঘটনাসূত্র যে মানুষের ভাগ্যে অঘটন ঘটায় তাহা অনেক সময়েই মানব-মনের কল্পনার অতীত।

হাতের সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়াও সুর দিয়া চলিয়াছেন

এই ঘটনা সংঘটিত হয় রসের ব্যবসায়ী জীবনারম্ভের প্রথম এক শুভমুহূর্ত্তে। 'শিক্ষক ও ছাত্রে'র ক্রীড়া-

কৌতুক চলিতেছে। খেলাও জমিয়াছে বেশ। মণ্ডপ-ভরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দ। রস্ পিয়ানো বাজাইতেছেন। অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ তাঁহার বসিবার আসনটী
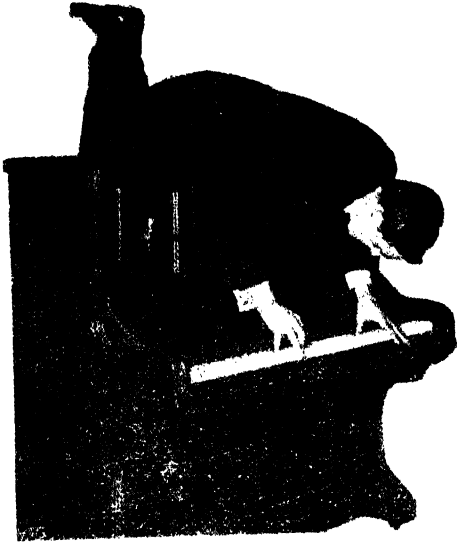
একেবারে উল্টা দিক হইতে পিয়ানো বাজান (ইহা সব চেয়ে কঠিনতম খেলা)

স্থানচ্যুত হইল। রসের আকস্মিক পতন এক কদাকার দৃশ্যের সৃজন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর অবজ্ঞার বিকট হাস্যধ্বনি মণ্ডপ মুখরিত করিয়া তুলিল। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার অঙ্গুলী পিয়ানোর চাবী হইতে বিচ্ছিন্ন না হওয়ায়, পিয়ানোর বাদ্যধ্বনির মাঝে কোন ছেদ পড়িল না। রস্ উপস্থিতবুদ্ধি-বলে পতিত অবস্থাতেই পিয়ানো বাজাইয়া চলিলেন। উপস্থিত সকলেই মনে করিল, ইহাও বোধহয় সেদিনকার রাত্রের খেলারই একটি অঙ্গ। দৃশ্যের অবসানে সকৌতুক দর্শকগণের জয়ধ্বনি রসের মুখে সকলের অলক্ষিতে সাফল্যের আশালোক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। রসের জীবনে এই আকস্মিক অভিনব প্রেরণা তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে কত দূর সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল।

পিয়ানোর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ও না দেখিয়া নির্ভুলভাবে পিয়ানো বাজানো অবশ্য রসের মত নিপুণ বাদ্যকরের নিকট খুব কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু দূর হইতে দেখিতে সহজ বোধ হইলেও, অনেক অভিজ্ঞেরাও রসের মত সহজ ও সম্পূর্ণভাবে বাজাইতে গলদঘর্ম্ম হইবেন। পরন্তু রস্ শুধু এমনিভাবে বাজাইয়াই ক্ষান্ত হন না, বাদ্যের তালে তালে তিনি নৃত্য করেন এবং বাজনা সাঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হাত ঘুরাইয়া পিয়ানোর ঢাকনি ফেলিবার সমান তালেই ডিগ্‌বাজী খাইয়া নিজের পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়ান।

নাসিকাগ্র দিয়া পিয়ানো বাজাইবার সময়ে তিনি এমন নাকি সুর উচ্চারিত করেন, যাহাতে মনে হয় যেন তিনটি সুর একই সঙ্গে ধ্বনিত হইতেছে।

মিঃ রসের আর একটি আশ্চর্য্যজনক পিয়ানো বাজাইবার কৌশল এই, যে যন্ত্রের উপরিভাগে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ও নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাধারণতঃ যেভাবে পিয়ানো বাজান হয়, ঠিক তার উল্টাদিক্ হইতে বাজান—ইহা কম কৃতিত্ব নয়। বাদকের অবস্থিতির দরুণ হস্তের এবং অঙ্গুলীর গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক্

ভূমিতে মাথা রাখিয়া বাজান

হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। ইহাই বোধহয় মিঃ রসের সকল খেলার মধ্যে কঠিনতম।

পিয়ানো বাজাইতে মিঃ রসের ক্ষিপ্রকারিতা অসাধারণ। পর্দ্দায় আঘাত দিয়া প্রতি মিনিটে তিনি গড়ে ছয় শত সুরের ধ্বনি সাধারণতঃ তুলেন। তিনি যে কেবল নিজের খুসীমত সঙ্গীতের সুর দেন তাহা নয়, দর্শকের পছন্দানুযায়ী যে কোন চলিত জনপ্রিয় গানের সুর দিতে সমর্থ।

মিঃ রসের আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক কৃতিত্ব এই, যে তিনি একই সময়ে বাম হস্তের দ্বারা এক সুর বাজাইতেছেন, যেমন—"Dolly Gray" এবং দক্ষিণ-

মেঝেতে বসিয়া বাজান

উপর হইতে মাথা ও হাত ঝুলাইয়া বাজাইতেছেন

হস্তের দ্বারা অন্য আর একটি সুর যেমন "Yanku Doodle" বাজাইতেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে মুখে হয়তো আর একটি গীতও গাহিতেছেন যেমন "Way down the Swanee River." সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের তিনটি সুরের সংমিশ্রণে আগাগোড়া কোনও প্রকারের শ্রুতিকটু বেসুরা কিছুর সৃষ্টি হয় না।

রস্ যন্ত্রের উপরিভাগে দর্শকবৃন্দের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া মস্তক ও শরীরের ঊর্দ্ধভাগ এমনিভাবে পিছনের দিকে চিৎভাবে নোয়াইয়া আনেন যাহাতে সকলের দৃষ্টিগোচর হন এবং তৎপরে এই অনারামদায়ক অবস্থার মধ্যেও তিনি যে কোন সুর নির্ভুলে বাজাইয়া যান। মেঝের উপরে মস্তক স্থাপন করিয়া ও পদদ্বয় পিয়ানোর উপরিদেশে রাখিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলীর সাহায্যে পিয়ানো বাজাইতে অবশ্য কিছু বিলম্ব হইলেও, কিন্তু কোন ভুল হয় না।

রস জুতার কাঁটা দিয়া পিয়ানো বাজাইতেছেন ও দুই হাতে বেহালা বাজাইতেছেন

মিঃ রসের এই সকল কৌতুক-দৃশ্যের মধ্যে তাঁর সব চেয়ে বিশিষ্টতম প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন তিনি ভূমিতে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া একই সময়ে তাঁর জুতার গোড়ালি দ্বারা পিয়ানো বাজান ও দুই হাতে বেহালারও সুর দেন। রসের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় চিত্রাঙ্কনেও দৃষ্ট হয়। সময়ের মূল্য তাঁর নিকট খুব অধিক। তাই তিনি একই সময়ে পিয়ানোও বাজান এবং তুলি ও পেন্সিলের দ্বারা সুদৃশ্য চিত্রাঙ্কনও করেন।

আজ পর্য্যন্ত দুনিয়াতে মিঃ রসের মত পিয়ানো বাদ্যে বিচিত্র কৃতিত্ব কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। তাঁর অসীম উদ্যম ও অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়। রসের ইচ্ছাশক্তির স্পর্শে যেন জড়ও প্রাণবন্ত হইয়া সাড়া দেয়। পিয়ানো বাদ্যে রসকে বাজীকর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ঢেউয়ের পর ঢেউ

(উপন্যাস)

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

— এগারো —

নেপথ্যে ললিতা যতই আপত্তি করুক, বেয়াইর টাকা ধরণীবাবু বেশ মুক্ত হাতেই গ্রহণ করতেন। প্রথমতঃ, পরিণীতা মেয়ের ভরণপোষণের ভার তার স্বামিগৃহের উপরই ন্যস্ত থাকা বিধেয়; দ্বিতীয়তঃ, হাতের কাছে টাকা এসে পড়লে কে না হাতের মুঠিটা একটু শিথিল করে!

বরং এ-ব্যাপারটায় ধরণীবাবু মনে মনে আরাম পাচ্ছিলেন প্রচুর। যাই হোক্, ললিতার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের সুতোটা একেবারে আল্‌গা হ'য়ে যায় নি, এই সুতো ধরে' সে আবার তার নিরাপদ্ নিবিড় আশ্রয়ে গিয়ে একদিন অবতীর্ণ হ'তে পারবে। আসলে সেইখানেই তার স্থান, বাপের বাড়ীতে দিন কতক সে হাওয়া বদলাতে এসেছে মাত্র।

তাই মাস আষ্টেক বাদে একদিন সকালে স্বয়ং জগদীশবাবু সশরীরে তাঁর দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হ'লেন দেখে তাঁর সুখের আর অবধি রইলো না।

ঘটনাটা ঠিক খুলে বিশ্বাস করবার মতো নয়। উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবার মতো কোনো সোপকরণ সমারোহ তো তাঁর নেই-ই, সামান্য একটা নমস্কার করতে পর্য্যন্ত তিনি ভুলে গেলেন। উৎসাহের আতিশয্যে জগদীশবাবুর হাত দুটো চেপে ধরে' তিনি বিগলিত গলায় বললেন,—আপনি হঠাৎ এই গরীবের ঘরে?

জগদীশবাবুর প্রশান্ত মুখে শীতল একটি হাসি ফুটে উঠলো। নির্লিপ্ত গলায় বল্‌লেন,—শুধু অর্থের অল্পতায়ই লোকে গরিব হয়?

—কিন্তু, আপনি আসবেন, বাড়ীর ভিতরে সসম্ভ্রমে তাঁকে নিয়ে আসতে-আসতে ধরণীবাবু বললেন,—আগে থেকে একটা খবর পেলে আমরা সবাই ষ্টেশনে যেতে পারতাম যে। আপনার ভারি কষ্ট হ'লো!

—খবর দেবার সময় পেলুম কই? শূন্য চোখে চারিদিকে চাইতে চাইতে জগদীশবাবু আর্দ্রকণ্ঠে বললেন,—বৌমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। কোথায়, বৌমা, আমার ললিতা-মা কোথায়?

এমনি একটা নিদারুণ শুভসংবাদ যে তিনি বহন করে' এনেছেন, ধরণীবাবুর তাতে সন্দেহ ছিলো না। আবেশে গলা তাঁর আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো: মহী—মহীপতির কোনো খোঁজ পেয়েছেন নাকি?

—উড়ো খবর কতই তো কাণে আসে। জগদীশবাবুর মুখ বিতৃষ্ণায় ভারি হ'য়ে উঠলো: শুনি, কখনো হরিদ্বার কখনো রামেশ্বর—গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছেন নাকি! গরু খোঁজার চেয়েও বেশি।

—ও কি ফিরে আসবে না? ধরণীবাবুর গলা হঠাৎ ম্লান হ'য়ে এলো।

—ফিরে না-এসে যাবে কোথায়? গুরু যে ওর ঘরের দুয়ারে ওর ফেরার অপেক্ষায় বসে' আছেন। জগদীশবাবু না বসে' ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন: বৌমা কোথায়? মা-কে যে আমি বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি।

কারণটা ধরণীবাবুর কাছে এখনও স্পষ্ট হয় নি। পাশাপাশি চলতে-চলতে তিনি শুধোলেন: তবে কি—

—আমার মেয়ের যে এই সতোরোই বিয়ে। জগদীশবাবু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—বলা কওয়া নেই, হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেলো। চিঠি-পত্তর লেখবার সময় নেই, সোজাসুজি নিজেই চলে' এলুম। আজই আবার বৌমাকে নিয়ে ফিরে যাবো। বিকেলে যাবার একটা ট্রেণ আছে না?

ধরণীবাবু আপত্তি করিলেন: তা, আজই কি আর হয়?

—আজই হ'তে হ'বে। হাতে আর সময় কোথায়? বৌমাকে নিজে নিয়ে যাবার জন্যে সব আমি ছড়িয়ে রেখে এসেছি—আমি গেলে তবে অন্য কথা। আরো খানিকটা এগিয়ে আসতে জগদীশবাবু সামনে সিঁড়ি পেলেন। বার্দ্ধক্যে শরীর যে তাঁর অপটু, এ কথা তাঁর আর মনেই রইলো না। একেক পায়ে দু' তিনটে করে' সিঁড়ি ডিঙোতে-ডিঙোতে তিনি উপরে উঠতে লাগলেন; সেই বলদৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সতেজ কণ্ঠস্বর উৎসারিত হ'তে লাগলো: বৌমা, আমার ললিতা-মা কোথায় গেলো?

সকালবেলা স্নান করে' এসে পাখার হাওয়ায় পিঠের উপর ভিজে চুল ছড়িয়ে দেয়ালের আয়নার সামনে চুপ করে' দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ললিতা এক মনে নিজেকে তখন বিভোর হ'য়ে দেখছিলো। রবিবার—সকালে আজ সৌরাংশু পড়াতে আসে নি। সময়টা ভারি একা। হাতে কোনো কাজ নেই, তাই নিজ হাতে একটি পান সেজে খেয়ে ললিতা তখন প্রায় ঠোঁট দুটি লালিমায় পিছল করে' এনেছে। নীচেকার ঠোঁটটি উল্‌টে-উল্‌টে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখাআর তার ফুরোতে চায় না! স্নানের স্নিগ্ধতার মতো নির্ম্মল একটি মুক্তির অজস্রতা তার সমস্ত গা থেকে যেন উছলে পড়ছে।

—বৌমা!

ডাক শুনে ললিতা থম্‌কে দাঁড়ালো। শূন্য চোখে পাশের দেয়ালের দিকে তাকাতে লাগলো—এ ডাকের কে উত্তর দেবে!

সে ছাড়া উত্তর দেবার কেউ নেই আশে-পাশে। জগদীশবাবু ঘরের মধ্যে সটান ঢুকে পড়েছেন। তাঁকে দেখে ললিতার মুখ মুহূর্ত্তে একেবারে নিবে গেলো। তার শরীরের নবনী-নমনীয় লাবণ্য যেন পুঞ্জ পুঞ্জ পাষাণস্তূপের মতো এক বিরাট্ ভার হ'য়ে উঠলো। দাঁড়াবার জন্যে পায়ের নীচে সে যেন মাটি খুঁজে পেলো না। আঁচলটা সংক্ষিপ্ত করে' এনে মাথার উপর যে একটা ঘোমটা দেওয়া দরকার তা পর্য্যন্ত তার খেয়াল নেই।

জগদীশবাবু তার দিকে এক পা এগিয়ে এসে স্নেহপূর্ণ বিষণ্ণ গলায় বল্‌লেন,—বুড়ো ছেলেকে চিনতে পাচ্ছ না, মা?

ললিতা তবুও প্রতিমার মতো স্থির। অসম্বৃত চুলে-আঁচলে দাঁড়াবার অসম্ভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত ভঙ্গীতে তার পর্ব্বতাকার বিস্ময়! দুই চোখে অহৈতুক আশঙ্কার বিবর্ণতা।

ধরণীবাবু ধম্‌কে উঠলেন: তোর শ্বশুরমশাই যে!

আঁচলের প্রান্তটা মাথায় কোনোরকমে টেনে দিয়ে প্রাণহীন যান্ত্রিক একটা ভঙ্গীতে ললিতা জগদীশবাবুর পায়ের কাছে প্রণত হ'লো। সে প্রণাম সাঙ্গ হবার আগেই জগদীশবাবু তাঁর প্রসারিত পেশল দুই হাতে

ললিতাকে বুকের উপর টেনে নিলেন। পায়ের উপর নরম শিথিল ক'টি আঙুলের ঈষৎ কম্পিত একটি ছোঁয়ায় তাঁর ছু' চোখে অনর্গল জল নেমে এলো। ললিতার সদ্যাসিক্ত চুলের উপর হাত বুলোতে-বুলোতে বল্লেন,—তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি, মা। তোমাকে ছাড়া ঘর-দোর আমার সব আঁধার হ'য়ে আছে। আমি কেবল পাতাবাহারেরই বাগান করেছি, মা, কোথাও আমার ফুল ফুটে নেই।

আস্তে-আস্তে সেই আলিঙ্গন থেকে নিজেকে শিথিল করে' এনে ললিতা শ্বশুরের দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলো।

চেয়ারে পিঠ ছড়িয়ে বসে' জগদীশবাবু দরাজ প্রফুল্ল গলায় বল্লেন,—আজ বিকেলের ট্রেণেই আমরা যাবো, মা। দিন পাঁচেক পরে লক্ষ্মীর বিয়ে। কিন্তু আমার ঘরের লক্ষ্মীই যদি পরবাসী থাকে, আমার উৎসব তবে জম্‌বে কী করে' বলো?

ললিতা ততক্ষণে জানলার কাছে সরে' গেছে। মুঠো করে' লোহার একটা শিক চেপে ধরে' বল্লে,—ও! লক্ষ্মীর বিয়ে নাকি?

—হ্যাঁ, এই সতেরোই। নিশ্বাস ফেলবারো আমার সময় নেই। জগদীশবাবু স্বচ্ছন্দে জামার বোতাম খুলতে-খুলতে বল্লেন,—তবু সবাইকে ঠেলে ফেলে আমিই ছুটে এলাম, মা। সবার আগে আমিই মা-কে দেখবো—আমিই নিয়ে যাবো মা-কে উদ্ধার করে'। জগদীশবাবু অপর্য্যাপ্ত খুসিতে অনর্গল হেসে উঠলেন: অত দূরে গিয়ে দাঁড়ালে কেন, আমার কাছে এসো, বুড়ো ছেলেকে একটু আদর করো এসে।

জগদীশবাবুর উচ্ছ্বসিত হাসির উপর ললিতার মুখ প্রলয়ের অন্ধকারে হঠাৎ কালো হ'য়ে উঠলো। স্পষ্টতায় তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছন্ন গলায় সে বললে,—আমি যেতে পারব না।

কথাটা রূঢ়তায় এত অনাবৃত যে তার জ্বালায় ধরণীবাবুর সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝল্‌সে গেলো। বরং তাঁর আশা ছিলো—জগদীশবাবুকে পেয়ে ললিতার উড্ডীন দুই বিস্ফারিত পাখা এবার ছায়াচ্ছন্ন আশ্রয় দেখতে পাবে। প্রণামের ভঙ্গীতে তার বিদ্রোহের শাণিত রেখাগুলি শীতল ম্রিয়মাণ হ'য়ে আসবে বা। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঔদ্ধত্যে তাঁর সমস্ত সাধ-স্বপ্ন যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেলো। ললিতার মুখের উপর তিনি ফেটে পড়লেন: যেতে পারবি নে মানে? তোর ননদের বিয়ে—বাড়ীর বড়ো বৌ হ'য়ে—

ললিতার পান-খাওয়া টুকটুকে ছু'টি ঠোঁটে বিশীর্ণ একটি হাসি ফুটে উঠলো। বল্লে,—তার আমি কী করবো? এখান থেকে তার জন্যে শুভকামনা করলেই আমার যথেষ্ট।

ধরণীবাবু গোড়ায় যদি বা একটু সবিনয় আপত্তি করছিলেন, এখন একেবারে সুর ধরলেন উল্টো। ছুটো দিন ধরে' রাখা দূরের কথা, এখন ললিতাকে ঠেলে বাড়ীর বা'র করে' দিতে পারলেই যেন তিনি বাঁচেন। ঝাঁজালো গলায় তিনি বল্লেন,—তোর যেতে না পারার কী কারণ থাকতে পারে? এখানে তোর কী কাজ?

—কাজ অনেক। কথাগুলি ললিতার নিজের কাছেই কেমন নির্লজ্জ, অশোভন শোনাচ্ছিলো, কিন্তু অন্ততঃ সত্যের কাছে সে মুখে ঘোমটা টেনে দাঁড়াতে পারবে না: সামনেই আমার পরীক্ষা, আর ছু'টি মাসও তারও বাকি নেই। এখন একটি দিনও বাজে কাজে ব্যয় করার মতো আমার সময় নেই, বাবা।

—এটা একটা বাজে কাজ হ'লো? জগদীশবাবুর নীরব বিমূঢ় উপস্থিতিটা তাঁর রাগে যেন ধীরে ধীরে হাওয়া দিতে সুরু করেছে। ধরণীবাবু অস্থির হ'য়ে বল্লেন,—তোদের সংসারে বিয়ে, তোর আপন ননদ, আর তুই সেখানে যাবি নে? এ কখনো হ'তে পারে? এর কাছে কী ছাই তোর পরীক্ষা!

ললিতা চোখ নামিয়ে অস্ফুট গলায় বল্লে,—কোথায় কার সংসার বাবা!

দুঃখের মধ্যে ছুটো অংশ আছে—এক আঘাত, অপর বেদনা। সেই বেদনাহীন নির্দ্দয় আঘাতটা অতিকায় একটা বিস্ময়ের মতো জগদীশবাবুকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে' ফেললো। সমস্ত ব্যাপারটা যেন তিনি আনুপূর্ব্বিক অনুধাবন করতে পারছেন না: এ যেন সেই ললিতা নয়। সেই নির্ব্বাক্‌কুণ্ঠিতা প্রচ্ছন্নচারিণী ললিতা! সে যেন

আর নয় সেই সান্ধ্য, স্তিমিত দীপশিখা—নির্বারিত, নিষ্কাশিত একটা অসি। আগে তার শরীরে ক্লেশশীর্ণ অনির্ব্বচনীয় একটি কৃশতা ছিলো, এখন তার দেহ রূপে রেখায় বন্য প্রগল্‌ভ হ'য়ে উঠেছে। দু' চোখের দীর্ঘ, আনমিত দুই পল্লব আগে তার কপোলের উপর স্নিগ্ধ একটি ছায়া বিস্তার করতো, এখন তার বিস্তৃত উদার দৃষ্টিতে যেন প্রখর উলঙ্গতা! তার দিকে তেমন কোমল স্নেহে যেন আর চাওয়া যায় না। ললাটে উদ্ধত দীপ্তি, সমস্ত মুখাভাসে একটা স্থূল সচেতন গাম্ভীর্য্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লাস্যলীলায় যেন কোন লালসা রয়েছে প্রচ্ছন্ন। রৌদ্রদগ্ধ শুভ্র আকাশে কোথাও যেন একটি সৌম্যকান্ত নীলিমার চিহ্ন নেই। আগে তার চারপাশে বেদনার করুণ, ঘন একটি কুজ্ঝটিকা ছিল—হয়তো সেই ছিল তার প্রকাশের সুষমা। ছবিকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যে তার-আলোর পাশে আজ যেন আর এক কণা নিরাবরণ ছায়া নেই। বিলাস-সমৃদ্ধির মাঝে নিজেকে এই তার গৌরবদানের চেষ্টাটা জগদীশবাবুর কাছে মর্ম্মান্তিক কুৎসিৎ লাগ্‌ছিলো। আজো তাকে সেই প্রতীক্ষমানা বিষণ্ণ বিরহিণীর বেশে দেখতে পেলেই বোধহয় তিনি খুসি হ'তেন। কিন্তু তার সেই শ্যামল গ্রাম্যতার উপর আজ রুক্ষ নগরীর প্রখর চাকচিক্য এসে পড়েছে।

জগদীশবাবু গলায় খানিকক্ষণ কোনো কথা পেলেন না। শুক্‌নো একটা ঢোঁক গিলে তিনি শূন্য, নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলেন: সংসারে সেই একজনই কি সব? আমরা কি তোমার কেউ নই?

—এ-সব কথার আমি কী উত্তর দেবো বলুন! তার মুখে এক নিমেষে এত কথা যে আজ কোত্থেকে অনর্গল এসে যাচ্ছে, ললিতা নিজেই কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। জান্‌লার শিক্‌টা আরো শক্ত করে' চেপে ধরে' কী বলছে কিছু আয়ত্ত না করে'ই সে স্পষ্ট বলে' ফেল্‌লো: কিন্তু আমার ওপর ঐ সংসারের আর কোনো দাবী নেই।

—দাবী নেই? অপরাধীর মতো নিরুত্তেজ, ম্লান গলায় জগদীশবাবু বল্‌লেন,—বৃথা তুমি অভিমান করছ, মা। একজনের ভেতর দিয়ে তোমার পরিবার কত বৃহৎ হ'য়ে উঠেছে একদিনে, তোমার দুয়ারে স্নেহানুরক্ত কত প্রত্যাশী জুটেছে একে একে, তাদের তুমি ত্যাগ করবে কী করে'? তোমার সেই লক্ষ্মী, তোমার এই বুড়ো অনাথ ছেলে! দাবী নেই—এমন নিষ্ঠুর কথা তুমি বল্‌লে কী করে', বৌমা?

ললিতা আঙুলে আঁচল জড়াতে-জড়াতে নম্রকণ্ঠে বল্‌লে,—কিন্তু সেই সব সম্পর্ক তো চুকে' গেছে। মাটি থেকে যে গাছ মূলচ্যুত হ'য়ে গেছে, তার কাছ থেকে ছায়া আশা করা ভুল।

—অনেক কথা যে শিখেছিস্ দেখছি। ধরণীবাবু মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন।

—মূলচ্যুত তো তুমি হও নি, বৌমা। উত্তেজনায় জগদীশবাবু চেয়ারের মধ্যে নড়ে'-চড়ে' উঠলেন: আমরা যে তোমাকে সহস্র শিকড় মেলে আঁকড়ে ধরে' আছি।

—প্রাণহীন শুকনো একটা কাঠকে জোর করে' ধরে' রেখে লাভ কী? আমাকে ছেড়ে দিন্।

ক্ষণকাল জগদীশবাবু স্তম্ভিতের মতো বসে' রইলেন। একটার পর একটা তাঁর জামার ঘরগুলি বোতামে ভরে' উঠতে লাগলো। চেয়ারের হাতলটা দৃঢ় হাতে চেপে ধরে' তিনি আর্ত্ত, রুক্ষ গলায় বল্‌লেন,—ছেলের কখনো মৃত্যুকামনা করি না, কিন্তু সেই সর্ব্বনাশটাও যদি কোনোদিন ঘটে, তবু, তবু বৌমা, তোমার স্থান চিরকাল আমাদেরই সেই সংসারে। তোমার ওপর তারই দাবী সকলের আগে।

কথাটা তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই ললিতা বলে' উঠলো: কিন্তু এ-ঘটনাটা সেই মৃত্যুর চেয়েও মর্ম্মান্তিক।

ধরণীবাবু ফের একটা গর্জ্জন করে' উঠলেন: এ-সব তুই কী বল্‌ছিস, ললিতা?

ললিতা চোখ নামিয়ে ভীত পাংশু মুখে বল্‌লে,—জানি না কী বলছি। তবে এই কথাটাই হয়তো বোঝাতে চাচ্ছি, বাবা, আমার ওপর সংসারে আর কারুর কোনো দাবী-দাওয়া নেই, আমিও কারুর আর অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি না।

কথাটা বলে' ফেলেই ললিতা চলে যাচ্ছিলো, ধরণীবাবু তার পথরোধ করে' দাঁড়ালেন। রাগে তাঁর ঠোঁট দুটো

থরথর করে' কাঁপছে, হাতে-পায়ে যেন আর কোনো বশ নেই।

—ওঁদের ঘরে তোর বিয়ে হয় নি?

—হয়েছিলো, দুঃস্বপ্নের মতো আমার তা স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু সেইটেই আমার পরিচয়ের শেষ কথা নয়, বাবা।

—বৃথা ওর সঙ্গে তর্ক করেছেন আপনি। জগদীশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গায়ের চাদরটা কাঁধের উপর ভাঁজ করতে-করতে বললেন—আমি চল্লাম।

ললিতাই এগিয়ে এলো: সে কী কথা? এখুনি যাবেন কোথায়?

—নিশ্চয়। এখানে থাকবোই বা কী করতে? আমি তো তোমার কেউ নই।

ললিতা মুখে হাসি আন্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌লে—কেউ না-ই বা হ'লেন। তবু বাড়ীতে অতিথি এসেছেন তো। তাঁর তো প্রাপ্য একটা সেবা আছে।

—থাক। সেবার কথা বলে' এই বুড়োকে আর অপমান কোরো না।

—অপমান! ললিতা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—তোমাদের হালি ভাষায় একেই বোধহয় সেবা বলে। প্রচ্ছন্ন রোষে ও ক্ষোভে জগদীশবাবুর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠেছে: কিন্তু এই বুড়ো বয়সে এতটা পথ ট্রেণ-ষ্টিমারের ধকল সয়ে' এসে ফের শুধু-হাতে এমনি ফিরে যাওয়াটাকে আমরা ঠিক আপ্যায়ন বলি না। কিন্তু, সম্পর্ক যখন চুকে গেছেই বল্‌ছ, যাক্।

ললিতা স্নিগ্ধ গলায় বল্‌লে—আমাকে নিয়ে গেলেও আপনাকে সেই ফিরে যাওয়াই হ'তো, বাবা। কিন্তু আমাকে তো আমি বেঁচে থাকতে অপমানিত হ'তে দিতে পারি না।

—বেশ, বেঁচেই থাকো তবে। জগদীশ কুটিল একটা ভ্রূভঙ্গী করে' দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সসব্যস্তে ধরণীবাবু তাঁর পথ আগ্‌লালেন: বা, এখুনি আপনি যাচ্ছেন কোথায়? আপনাদের ট্রেন তো সেই বিকেলে।

জগদীশবাবু বল্‌লেন—যাওয়া কেবল মানুষের ট্রেনেই হয় না বেয়াই মশাই, কখনো কখনো মানুষ পায়ে হেঁটেও চলে' যেতে পারে।

ব্যাপারটা অকস্মাৎ ললিতার কাছে অত্যন্ত সামঞ্জস্য-হীন, বীভৎস বলে' মনে হ'তে লাগলো। এতদিনকার মনের রুদ্ধ আক্রোশটা হঠাৎ একটা নির্গমনের পথ পেয়ে নিদারুণ কলুষিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তাতে কোনো শ্রী নেই, কোনো সংযম সে রক্ষা করতে পারে নি। বিনয়ে ভেঙে পড়ে' ললিতা জগদীশবাবুর কাছে ঘেঁসে এলো, করুণ, মিনতিময় কণ্ঠে বল্‌লে—আপনি যাবেন না। আমি আপনার কাছে অনেক অপরাধ করেছি, কিন্তু বাবার কোনো দোষ নেই।

জগদীশবাবু বললেন—তেমনি মহীই তোমার কাছে অপরাধ করেছিলো, আমার কোনো দোষ ছিলো না, ললিতা।

এ-কথার যে কী সদুত্তর দেওয়া যেতে পারে ললিতার মনে এলো না।

জগদীশবাবুই কথাটার জের টান্‌লেন: সম্পর্কটা একটা পারস্পরিক ঘটনা। তোমার যখন আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কাজে-কাজে আমাদেরো নেই। একটা ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জগদীশবাবু ফের বললেন—শুনে সুখী হলাম, সংসারে স্বামীকেই তুমি একমাত্র চিনেছিলে। কিন্তু তোমার সীমন্তে স্মৃতির সেই চিহ্ন-টুকুও তুমি বাঁচিয়ে রাখো নি। বোধহয় তাকেও তুমি আর স্বীকার করতে চাও না!

ললিতা কোনো আর কথা বলবে না বলে' প্রতিজ্ঞা করেছিলো। কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে কে যেন তাকে ঠেলা মারতে লাগলো। অসহায়ের মতো সে বলে' বসলো: যে আমাকে স্বীকার করে নি তার প্রতি এমনি কোনো কৃতজ্ঞতা দেখানেই তো অন্যায়।

—একশোবার। তোমার সঙ্গে তর্কে কে এঁটে উঠবে বলো? তুমি যে নতুন পরীক্ষা দিচ্ছ। জগদীশবাবু তার মুখের উপর বিদ্রূপের একটা তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে দ্বিধা করলেন না। ললিতার মাঝে তিনি যেন দেখতে পেলেন তাঁর ছেলের অপমৃত্যু। মনে-মনে প্রবল একটা প্রলোভন

ছিল, যে হয়তো দেখতে পাবেন ললিতার চারপাশে বিরহের নিভৃত পরিমণ্ডলের মাঝে মহীপতি এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু নির্লজ্জ নিরাবরণ মরুভূমিতে আশ্রয়-শীতল এক কণা ছায়া তিনি খুঁজে পেলেন না। চৌকাটটা পেরোবার আগে মুখ ফিরিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কিন্তু কিসে তোমার এতো বড়ো আস্পর্দ্ধা হ'লো সেই কথা ভেবেই আমি অবাক্ হচ্ছি, ললিতা। তুমি কি এর পরেও মহীর পথ চেয়ে বসে' থাকতে চাও নাকি ?

ললিতা এবারো না বলে' থাকতে পারলো না : পৃথিবীতে নিজের পথ পেলেই আমি বাঁচবো।

—ও! হ্যাঁ, জিগ্‌গেস করাটাই আমার ভুল হয়েছিলো। তুমি তো পৃথিবীতে শুধু বাঁচবার জন্যেই এসেছো। বেশ। জগদীশবাবু সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হাঁক পাড়লেন : হরেন! হরেন! ট্যাক্সিটাকে এরি মধ্যে বিদেয় করে' দিয়েছ নাকি? ডাকো, ডাকো, ফের একটা ধরে' নিয়ে এসো, এখুনি আমাদের ফিরে যেতে হ'বে।

ধরণীবাবু অনুনয়ে আলুণ্ঠিত হ'তে লাগলেন, জগদীশ-বাবুকে কিছুতেই ফেরানো গেলো না। রাস্তায় নেমে এসে তিনি কঠিন মুখ করে' বললেন—যতক্ষণ আপনার বাড়ীর মধ্যে ছিলাম ততক্ষণ যা-হোক আপনার সঙ্গে একটা বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু আর কেন, সে-বাড়ী থেকে তো আমি বেরিয়ে এসেছি। রাস্তায় চলে' এসে এখন আমার মনে পড়ছে যে আমি পীরগাঁয়ের জমিদার। সে-কথা আমি আর ভুলতে চাই না, ধরণীবাবু।

উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে ললিতা সমস্ত দৃশ্যটা আগা-গোড়া দেখেছে, পিছনের চাকায় ধুলো উড়িয়ে তার চোখের উপর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ট্যাক্সিটাও রাস্তার মোড় ঘুরলো। কোথা থেকে কী যে একটা কাণ্ড ঘটে' গেলো তার কিছুই যেন সে ধরতে-ছুঁতে পেলো না, মনে হ'লো তার জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন এক নিমেষে ভারমুক্ত এই প্রভাতবেলাটির মতো শাদা, পরিচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে।

ধরণীবাবু ক্ষিপ্তের মতো উপরে ছুটে এসে প্রায় একটা চীৎকার করে' উঠলেন : এ তুই কী করলি, লিলি ? এমন একজন গণ্যমান্য অতিথি, তোর এতো বড় একটা গুরুজন—তাকে তুই এক কথায় এমনি তাড়িয়ে দিলি ?

ললিতা এমনি একটা রূঢ় ভর্ৎসনার জন্যে মনে-মনে প্রস্তুত হ'য়েই ছিল, বল্‌লে—এতে আমার কী করবার আছে বলো ? আমি তাঁর সঙ্গে তাঁদের সংসারে আর ফিরে যেতে পারি না, সেটা আর আমার অপরাধ নয়, বাবা।

—যেতে পারিস্ না, কেন তুই যেতে পারবি না শুনি ?

মাথার ঘোমটাটা পিঠের উপর খসিয়ে দিয়ে ললিতা বল্‌লে—এই প্রশ্নটা আমাকে না জিগগেস করলেও পারতে

—কিন্তু এরা কি তোর কেউ নয় ? ধরণীবাবু আরেকটা হুঙ্কার দিলেন।

—কেউই আমার কিছু নয়, বাবা। আমার শুধু আমি আছি, একলা আমি। ললিতা জানলা থেকে সরে' তার টেবলে এসে বস্‌লো।

ধরণীবাবু তার কাছে এগিয়ে এলেন : তুই ভেবেছিস কী ? হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে বিবাহের এই দৈব সম্বন্ধটা তুই ছিন্ন করবি কি করে' ?

ললিতা একটা বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বল্‌লে—সেই তো হিন্দুমেয়ের চরম দুর্ভাগ্য, বাবা। একবার এই বিয়ের জালে জড়িয়ে গেলে আর তার মুক্তি নেই, বন্ধনটা যত বেদনার, যত অত্যাচারেরই হোক না কেন, তিল-তিল করে' তাকে আমরণ মরতেই হ'বে। কিন্তু আমার আর ভাবনা কী বলো, আমি তো মুক্তি পেয়েই গেছি দেখছো।

—কিন্তু মহীপতি যদি একদিন আসে ?

ললিতার দুই চোখ যেন অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠলো : তিনি আবার কেন আসতে যাবেন ? তিনি তো সন্ন্যাসী।

—ধর্, যদি সে একদিন আসে। ধরণীবাবুর দৃষ্টি প্রতিহিংসায় তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে : আর এসে যদি তোকে নিয়ে যেতে চায় ?

—তার আস্পর্দ্ধাকে বলিহারি। ললিতা টেব্‌ল্ থেকে উঠে দাঁড়ালো : তাকেও তখন এমনি অধোমুখে ফিরে যেতে হ'বে।

(ক্রমশঃ)

প্রবর্ত্তক নারী-মন্দির
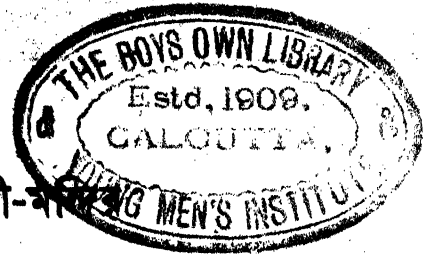
কয়েক বৎসর পুর্ব্বে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় যখন তাঁর পূজনীয়া মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত করিয়া চন্দননগরে কৃষ্ণভামিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই পুণ্য অনুষ্ঠানের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারি নাই। মানুষ গড়ার স্বপ্ন শুধু একদল পুরুষ লইয়াই আমার জীবন প্রমত্ত করে নাই, নারীর জীবন-সাধনার ক্ষুদ্র আয়োজনেও তখন আমায় পাগল করিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করার ভার ছিল দেশপূজ্যা শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণীর উপর।

সভায় দেশের অনেক বরণীয় বিদ্বজ্জনের সমাবেশ হইয়াছিল। সাধারণ সভায় যোগদান ও বক্তৃতা করা আমার অভ্যাস নাই, তবু এই দিন দুই এক কথা বলিতে উঠিয়াছিলাম। কিন্তু কথাগুলি সভানেত্রী ভাল বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন; সেদিন তাহার প্রতিবাদ করি নাই। বিস্মিত হইয়াছিলাম এই বর্ষীয়সী বিদুষীকে নারীর মৌলিক তত্ত্বটা অস্বীকার করিতে দেখিয়া; পরে বুঝিয়াছি, বিদেশী শিক্ষায় ভারতের পুরুষজাতিরই মস্তিষ্ক শুধু বিকৃত হয় নাই, ভারতের অন্তঃপুরও উহা জয় করিয়াছে।

বলিয়াছিলাম, নারীকে শিক্ষা দিতে হইবে, ভারতীয় ভাব ও আদর্শ লক্ষ্যে রাখিয়া। ভারতের অন্তঃপুরকে শিক্ষার দোষে যেন কলুষিত না করি। এই সতর্কতার বাণীই সেদিন কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, নারী যেন পুরুষের তুল্য অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় নারীত্বের অপমান না করে। নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, পুরুষের সে অবিভাজ্য অঙ্গ—পুরুষ যদি হয় কায়া, নারী তাহার ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিবে। পুরুষের ইচ্ছারূপিণী এই নারীশক্তি যদি গড়িয়া উঠে, জাতি ধন্য হইবে। কথাগুলি এইভাবের ছিল।

আমার ভাব ও ভাষার সমর্থন করিবার মনীষিবর্গ সভায় একান্ত কম ছিলেন না, কিন্তু নারী-স্বাতন্ত্র্যের যে ঝড় উঠিয়াছে, সেদিন সভায় এই কথায় তাহারই প্রকাণ্ড আবর্ত্ত সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয়া সভানেত্রী মহাশয়া যুগনারীর নেত্রীস্বরূপা, নারীকে পুরুষের ছায়া বলার অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন নাই; তাঁহার তিরস্কারবাণী সর্ব্বতোভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না।

ভারত দেবস্থান। ভারতের মূল ঊর্দ্ধে; ভারতের শিক্ষাসভ্যতার ধারা এইজন্য অস্বীকার করিতে পারি নাই। সৃষ্টির গোড়ায় পুরুষ, তাহারই সঙ্কল্প-শক্তিরূপে মায়া বা প্রকৃতির সৃষ্টি। ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ব কেবল দার্শনিকতা নহে; তাহাই বস্তুতন্ত্র হইয়া রূপ লইয়াছে। পুরুষ ও নারী এই সৃজন-রহস্যের প্রতীক মাত্র। কি পুরুষ, কি নারী যদি শিক্ষার গুণে স্ব স্ব-রূপ উপলব্ধি না করে, তবে সেই বিপর্য্যয়কর শিক্ষা বিপ্লবমূলক হইবে, অনর্থ সৃষ্টি করিবে। ভারতের ভাগ্যাকাশ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, পরাধীনতার কঠিন নিগড় তাহার একমাত্র কারণ নহে; জীবনের মূলে যে উত্তম রহস্য ভারতের নারী পুরুষ তাহা বিস্মৃত হইতে চলিয়াছে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের শিক্ষা স্বরূপ উপলব্ধি করার সাধনা। কেবল পুরুষের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান নহে; নারীকেও ইহার জন্য এখানে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। স্বরূপের পথে নিরহঙ্কার ও কামনাশূন্য হওয়ার কড়া তাগিদ আছে, সুতরাং এই পথ দুর্গম ক্ষুরধার। কিন্তু পুরুষের ন্যায় নারী আত্ম-সাধনায় অক্ষম নহে; ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পুরুষ পাইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, নারীর ভাগ্যে তাহা ব্যাপকভাবে ঘটে নাই। আজ সেইদিকে নারীর দৃষ্টি পড়িয়াছে—নারী যে পুরুষের অপেক্ষা অল্প মেধা ধরে না, তাহা সে প্রতিপদেই প্রমাণ করিতেছে এইজন্য নারী পুরুষের তুল্য, এ ধারণা শিক্ষার দোষ ইহা নারী-পুরুষের মধ্যে যে ঐক্য ও প্রেম তাহা ক্ষু

করিবে। তুল্য অধিকারী হইয়া নারী-পুরুষের মিলন, নিছক কল্পনা। নারীর হৃদয় লতার মত পুরুষকে আশ্রয় করিয়া শোভা পায়, সার্থক হয়। অহংকার বশতঃ সাম্য-বাদের আদর্শে নারীর আজিকার আকাঙ্ক্ষা সাময়িকভাবে উত্তেজনা জাগায়; কিন্তু হৃদয়ের পরম তৃপ্তি এই পথে নহে, নারী তাহা ক্রমে বুঝিবে। পাশ্চাত্য বুঝিতেছে; প্রাচ্য বহুদিন পূর্ব্বে বুঝিয়াছে বলিয়াই নারী পুরুষের চরণে নতি জানাইয়া ভগবতী অন্নপূর্ণার আসন অধিকার করিয়াছে, আজিকার সম্মোহন দীর্ঘদিনের জন্ম তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে না—ইহা আমার অভিমত নহে, সনাতন ভারতের অমোঘ বিধান।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে যে একদল নারী স্বরূপের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের প্রথম শিক্ষা ছিল, উদয়াস্ত কর্ম্ম। ইহা বড় নিষ্ঠুরতা বলিয়া অর্ব্বাচীন যুগের নারী-পুরুষ অভিযোগ তুলিয়াছিলেন—কিন্তু প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নারী তাহাদের সমস্ত যৌবন দিয়া সেবার সাধনাই করিয়াছে। পুস্তক, আঁকা-জোকার রঙ তুলি, লিখন-যন্ত্র সে হাতে তুলে নাই, শিল্-নোড়া লইয়া সে বাট্‌না পিষিয়াছে, রন্ধনশালার উত্তাপে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়াছে; সঙ্ঘের প্রাঙ্গনে আবর্জ্জনা রাখে নাই, পয়ঃপ্রণালী মার্জ্জন করিয়াছে—অন্নথালি হস্তে শত শত আহারার্থীর অন্ন পরিবেশন করিয়াছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে—আর সে নৃত্য করে উপাসনার মন্ত্রে, গৃহস্থালীর সকল প্রকার নিপুন কর্ম্মে। ইহার মধ্যে অতি অল্প সময়েই সে বর্ণমালার সহিত পরিচয় করিয়াছে। এই তপস্যার যুগে, যে কয়জন নারী অবহিত ছিল, তাহারাই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নারী-মন্দিরের আজ ভবিষ্যৎ।

আপনাকে দেওয়ার খেলায় কুণ্ঠাহীন হওয়ার পর শিক্ষার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম শিক্ষা—ভারতের শিক্ষা, ভারতের ভাব ভাষা, বেদ পুরাণের সহিত পরিচয়। বাংলা ও সংস্কৃত চর্চ্চা জীবন-সাধনার বেদী। সঙ্ঘের নারী-মন্দির এই পথে আজ অনেক দূর আগাইয়াছে; দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে আজিকার অবস্থা কল্পনায় ছিল না, এবং আজিকার ব্যবস্থা দুই চারি বৎসরে আরও অধিকতর সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন রূপে নারীকে তার যোগ্য অধিকার দিবে—এ বিশ্বাস আমার আছে।

ভারতের শিক্ষা বলিতে—পুরাণ, গীতা, উপনিষদ, কলাপ, পাণিনিই শুধু নহে। তবে এইগুলি এ-জাতির শিক্ষার ভিত্তি। যেখানে এই ভিত্তি নাই, সেখানে ভারতের মস্তিষ্ক রক্ষা পায় নাই। ভারতের সাধনায় ভারতকে গড়ার তপস্যা নাই। জগতের সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিয়া আয়ত্তে আনিতে হইবে। কিন্তু অগ্রে চাই, স্ব-ভাব প্রাপ্তি। সংস্কৃত শিক্ষা ইহার মূল—নারী ও পুরুষ উভয়েরই; তারপর সাধারণ শিক্ষার কথা।

এইরূপ ভারত-চরিত্র গড়ার একটা তপস্যা এখানে চলিয়াছে এবং ইহা যুগের মত নহে, এইজন্য প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অনেকের নিকট একটা দুর্ব্বোধ্য বস্তু। অসংখ্য প্রকার সংঘর্ষের মধ্য দিয়াও জাতি-গঠনের পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইয়াছে; ঘটনা-বৈচিত্র্যে বিচিত্র অবস্থা-ব্যবস্থায় সঠিকরূপে সঙ্ঘের পরিচয় দেশের নিকট এখনও পরিস্কার না হওয়ার ইহাও একটা কারণ।

সংগঠন-যজ্ঞ বলিতে চরিত্র গড়াই আমরা বুঝি, সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ইহাই সুরু করিয়াছে। মাথা তুলিতে গিয়া প্রথম পদক্ষেপ বিপ্লবের আবর্ত্তে; তাহা হইতে মুক্তি না পাইতে পাইতে সৃজনের স্বপ্নে প্রচণ্ড ঋণভার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তাহার পর সমাজ, ধর্ম্ম, আদর্শ প্রভৃতি ঘরোয়া বিপ্লবজাল বিদীর্ণ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছে। কাজেই নিজেদের গুছাইয়া উঠিতে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। দেশের লোকও যে তাহা সহজে বুঝে নাই, ইহাও কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই।

জাতি দেশের মানুষ লইয়াই গড়ে। কাজেই মানুষ যদি স্বরূপ-বস্তুর উপর সুপ্রতিষ্ঠ না হয়, নানারূপ কল্পনার কুহকে নানারূপ বিকৃত-চরিত্র লাভ করে, সে একটা অস্বাভাবিক সৃষ্টি অকস্মাৎ ঝড়ের ন্যায় দেশ তোলপাড় করে, পরে কর্পূরের ন্যায় উপিয়া যায়—সঙ্ঘ তাই ধীরপদে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে।

যে একদল নারী-পুরুষ আত্মস্থ হইয়া দেশের সর্ব্বত্র স্বরূপপ্রাপ্ত পুরুষ নারীকে ছড়াইয়া দিবে, তাহাদের

আত্মগঠনের কাল কিছু দীর্ঘ হইবেই। যাহারা গড়িয়া উঠিল, তাহারা যদি বিসৃত হইয়া পড়ে, লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই তাহাতে অধিক হইবে। কেন না, যে আব্‌হাওয়া ও পারিপার্শ্বিক ভাব ঘন হইয়া উঠিলে নবাগতদের শিক্ষা-সাধনা ক্ষিপ্র করিয়া তুলিবে, তাহা সিদ্ধ সমষ্টির কেন্দ্রবদ্ধ জীবনক্ষেত্রেই অধিকতর সম্ভব। এইজন্য প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বিদ্যার্থিভবনে আজ যাহারা ভীড় করিতে আসে, তাহাদের শিক্ষার ভার প্রবর্ত্তকের শিক্ষা-সাধনায় একরূপ গড়া মানুষের হাতে ন্যস্ত করিতে পারিয়াছি বলিয়াই নির্ভয়ে বলিতে পারি, তাহারাই হইবে জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু যতদিন ইহা জাতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে দাঁড়াইয়াছিল, ততদিন ছাত্র-সংখ্যা দেখি নাই; যেদিন হইতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়াইবার সুব্যবস্থা হইল সেইদিন হইতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা যুগের হাওয়া। নারীর পক্ষেও এই একই কথা। যুগের হাওয়া একেবারে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। এই অবস্থায় ভারতের ভাবধারা রক্ষা করার একমাত্র উপায়, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-সাধনা আত্মস্থ করিয়া শিক্ষাদানের পক্ষে যোগ্য নারী পুরুষ গড়িয়া তোলা। সঙ্ঘের দৃষ্টি এইদিকে গোড়া হইতে আছে; এইজন্য এইক্ষেত্রে ইহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে।

পুরুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল; যুগ-শিক্ষার সঙ্গেই ভারতের শিক্ষা-সাধনার সঙ্কেত-লাভ, অতঃপর বিদ্যার্থিভবনে অসম্ভব নহে। অতঃপর যে একদল নারী প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে এই দীর্ঘদিনের তপস্যায় মানুষ হইয়া উঠিল, তাহাদের চাই কর্ম্মক্ষেত্র; তাহারাও আজ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারিলে, যে সকল নারী আত্মগঠনের সহিত বর্ত্তমান শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নারীত্বের মর্য্যাদা চাহে, তাহাদের দলে দলে গ্রহণ করা যায়।

কার্য্যবশতঃ একটু বাহিরে ঘুরিয়া যে অভিজ্ঞতা পাইয়াছি, তাহাতে নারীর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা অধিক করিয়াই মনে জাগিয়াছে। নারী আজ শিক্ষা চায়, জীবন চায়; নারীর প্রাণ আজ জাগিয়াছে। প্রতিদিন অসংখ্য পত্রাদি হইতে যাহা না বুঝিয়াছি, অনুভব করিয়াছি, বাংলার নানাস্থানের অবস্থা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। পুরুষের শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেশ সমর্থ নহে, সমর্থ থাকিলেও তাহার উপযোগী শিক্ষক নাই—নারীকে শিক্ষা দিবে কে! নারীর প্রাণ যে আজ ধৈর্য্যহীন হইয়াছে!

নারী কতখানি জাগরণের উত্তেজনায় উন্মাদিনী বিপ্লব-তরঙ্গে তাহাদের আত্মদান তাহার কতকটা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিরূপ অবস্থায়, কি মনোভাব পোষণ করিয়া, ছিন্নমস্তার মত, নারী আজ নিজের কণ্ঠনালী ছিন্ন করিতে উদ্বুদ্ধ, রাজকর্তৃপক্ষও তাহা বুঝে না, স্বজাতিও দিশেহারা! উৎপীড়ন ঔদাসীন্যে নারী আজ প্রবঞ্চিত, তাহার জাগরণ স্রোতঃ পথ না পাইয়া বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

এইরূপ একটী বস্তুতন্ত্র করুণ ঘটনায় বিপন্ন পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়া বুঝিলাম, নারী চায় সত্যই স্বরূপের সন্ধান। উচ্চশিক্ষায় সে তাহা না পাইয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের নিষ্ঠুর আকুলতায় মৃত্যুপণ করিয়াছে; ইহা তাহার আত্মঘাতী হওয়ার সহায় স্বরূপই হইয়াছে। নারীর আকুল নিবেদন, সে চায় পথের সন্ধান পাইবার আলো। তাই আকুল হইয়াই নারীকে স্বরূপদানের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাধ্যমত দেশকে উদ্যোগী হইতে বলি—নতুবা হিন্দুসমাজ উৎসন্ন যাইবে। রক্ষণশীল সমাজের বন্ধন তাহারা পদাঘাতে চূর্ণ করিবে।

সময়-ক্রমে বিপদের মাত্রাই বাড়িবে। রাজার জাতি ইহা বুঝিবে না। স্বজাতিই যখন বুঝে না, তখন অন্যের উপর দাবী বা দোষারোপ করা সঙ্গত নহে। দেশের নারীশক্তিকে রক্ষা করিতে হইলে নারীশিক্ষার বিস্তারই বড় কথা নহে; নারীকে নারীত্বের মর্য্যাদা দিয়া সান্ত্বনা দিতে হইবে। এই ব্যবস্থাই জাতিকে করিতে হইবে।

এইজন্য প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে নারী-শিক্ষা-মন্দিরের একটু বিস্তৃত ব্যবস্থার জন্য তাড়া অনুভব করিতেছি। পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থার মত, সঙ্ঘের নারী কর্তৃক নারী-শিক্ষা-মন্দিরে অন্ততঃ শত জন নারী যাহাতে শিক্ষা-সাধনার সন্ধান পায়, তাহার আয়োজন করার দরকার হইয়াছে।

সঙ্ঘের অর্থ-প্রতিষ্ঠান হইতে ধীরে ধীরে যে আয়ের সম্ভাবনা তাহা হইতে এই কর্ম সিদ্ধ হইবে, এই আশাও

সুদূরপরাহত হইতেছে, আর এইরূপ প্রতীক্ষাও সান্ত্বনা দেয় না। বেকার-সমস্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে সঙ্ঘের সর্ব্বত্যাগী সন্তানগণের প্রচেষ্টায় যদি ইহার কথঞ্চিৎ প্রতিবিধান হয় তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিব। একটী ২৫৲ টাকার চাকুরীর জন্য ১২৫টী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীর নিবেদনপত্র পাইয়াছি—এই অবস্থায় শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য উপায়ের আশা আর করি না। আমি সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্ত প্রতি নারী পুরুষকে আমার এই উদ্দেশ্য-সাধনে মুক্তহস্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। আমি দেখিয়াছি, একশত জন নারীকে সঙ্ঘে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে আয়োজন করিতে হইবে, তাহার জন্য প্রায় দশ বার হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। সংগঠনের কাজে যাঁহাদের আস্থা ও বিশ্বাস আছে জাতির অর্দ্ধেক অংশ নারীর শিক্ষায়, তাঁহাদের সহানুভূতি আমি প্রার্থনা করি। সঙ্ঘের প্রাণশক্তিও ইহার জন্য যথাসাধ্য করিবে।

নারীশিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজও করিতে পারিলে, আগামী দশ বৎসরে একশত জন নারী দেশের সর্ব্বত্র ভারতের ভাবধারার শিক্ষা ও আদর্শ দিয়া বাংলার শত শত নারীকে গড়িয়া তুলিবে। গঠনের কাজে এই সময় অধিক দীর্ঘ নহে। অর্দ্ধশতাব্দী আমরা রাষ্ট্রনীতিক সাধনায় দিয়াছি, চরিত্রগঠনের কাজে দেশের সহানুভূতি ও উৎসাহ আমাদের সহায় হউক—এই প্রার্থনাটুকুই দেশের কাণে শুনাইয়া রাখিলাম।

সমাজ ও শিক্ষা সমন্বয়

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম-এ, এচ ডি ল এড, ডবলিন

এক হিসাবে এই বিশাল পৃথিবীকে মানুষের সর্ব্ব-প্রকার শিক্ষার আগার বলা যাইতে পারে। এই পৃথিবীতে এমন একটিও অপ্রয়োজনীয় বস্তু নাই, যাহা হইতে আমরা চেষ্টা করিলে শিক্ষার উপাদান সংগ্রহ না করিতে পারি। এই প্রবন্ধে আমরা অন্য সমস্ত উপাদান উপেক্ষা করিয়া শিক্ষায়তন ও সমাজ এই দুইটী সর্ব্বপ্রধান উপাদান মানুষকে মানুষ করিবার জন্য কতখানি সাহায্য করিতেছে তাহারই বিস্তৃত আলোচনা করিব। শিক্ষায়তন ও সমাজ, এই দুয়ের মধ্যে আবার যদি শুধু শিক্ষায়তনের কথা আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যে শিক্ষায়তন একমাত্র স্থান যাহার সহিত মানুষের শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাই ভাবিয়া সে যুগের শিক্ষাকর্ত্তারা মনে করিয়াছিলেন, বিদ্যালয় বলিতে এমন একটি স্থান বুঝায় যেখানে শুধু "কেতাবী বিদ্যা" শিক্ষা দেওয়া হয়, আর যাহার উদ্দেশ্য হইল ছেলেদের বছর বছর ক্লাসের পর ক্লাস উঠাইয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সে যুগের মহতী বাণী ছিল "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"। ছাত্র আপনাকে সমস্ত সংসার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া নিজের পুঁথির মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে। কিন্তু কাল-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অন্য জিনিষের মতন মতেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, যে যদিও বিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য "লেখাপড়া শিখান", তাহা হইলেও ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—ইহার আরও মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সে ছিল একদিন যখন মানুষ culture বলিতে বুঝিত, কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহ বা অতীত যুগের ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান। সে যুগে একথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই, যে শিশুর সমস্ত বৃত্তিগুলি পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কি করিয়া উন্মেষ করা যাইতে পারে এবং এই Harmonious development-এর উপর কি করিয়া culture'এর ভিত্তি গড়িয়া তোলা যাইতে

পারে। চতুষ্পার্শ্বে যে সমস্ত উপাদান আছে তাহা হইতে জ্ঞান আহরণ করা, কি ক্ষুদ্র দৃষ্টির অগোচরে বিশাল পৃথিবীর অপরাপর অংশে কি হইতেছে তাহার সন্ধান রাখাও যে একটা শিক্ষা, এ ধারণা সে যুগের লোকের ছিল না। শিক্ষা অর্থে লোকে বুঝিত, অতীত যুগের ও অতীত ঘটনার উপর টীকাটিপ্পনী, পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র, ইহারই ধরণের গবেষণা এবং "লিখিতে" ও "পড়িতে" শেখা। বালকের মন যাহাতে অতীত ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকগুলিও সেই ভাবে লিখিত হইত। সাধারণের ধারণা ছিল, যে এই পুরাতন অতীত ঘটনার মধ্যেই বালক জগতের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই জানিতে পারিবে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি দুই চারিখানা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে পারা, দরকার হইলে দুই চারি কলম লিখিতে পারা, প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় সামান্য হিসাব পত্র রাখা এবং সাধারণ বুদ্ধি, ইহাই সাধারণের শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। তখনকার দিনের অপেক্ষাকৃত সহজ জীবন-যাত্রার পক্ষে হয়ত ইহা নিতান্ত মন্দ ছিল না। কিন্তু আজ দেশে মহা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে—সে সহজ ও স্বাভাবিক সমাজ আর নাই। জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত ও ঘন ঘোর কোলাহল! কাজেই পূর্ব্বেকার বিদ্যায়তন-গুলি যে ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল, এখনকার দিনে আর সে ভাবে চলিতে পারে না। এ নবযুগের বিদ্যায়তনকে নূতন ধরণে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সমাজে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেখানে সে কি করিয়া টিকিয়া থাকিবে, তার সেই ক্ষুদ্র পৃথিবীটির মধ্যে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানটি কোথায়, তাহাই তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া এবং কি করিয়া সে আপনাকে সমাজের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবে—ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইবে এ যুগের বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

নব্য শিক্ষা-বিশারদদের মতে, বিশেষতঃ অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিকের মতে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে "চরিত্র শিক্ষা দেওয়া" character training—এই চরিত্র-শিক্ষা বলিতে আমরা যে সঙ্কীর্ণ অর্থে (নৈতিক দিক্) গ্রহণ করিয়া থাকি সে অর্থে নয়—ইহা ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর বলেন, পূর্ব্বেকার সহজ সরল ও স্বাভাবিক যুগে যেটুকু চরিত্র-শিক্ষা সমাজের মধ্যে বাস করিয়া ও বিশাল সমাজাঙ্গের নিজেকে একটি বিশেষ অংশ ভাবিয়া ও তাহার ভাল মন্দের সহিত নিজের ভাল মন্দ সমসূত্রে গ্রথিত বিবেচনা করিয়া হইত, সেটুকুর ভার আজ এই জটিল সভ্যতার যুগে বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে।

হয়ত অনেকে মনে করিবেন, আমরা যাহাকে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক যুগ বলিতেছি সে যুগ কবির কল্পনা-রাজ্যে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ লইয়াই মানুষের এই বিচিত্র সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক যে সরল ও স্বাভাবিক সমাজের কথা বলিয়াছেন তাহার অস্তিত্ব খেয়ালীয় স্বপ্নের মধ্যে খুঁজিবার কোন প্রয়োজন নাই—সে সমাজের খোঁজ তিনি নিজেই দিয়াছেন। এই সরল যুগ বলিতে তিনি সেই ১৬২০ সালের কথা উল্লেখ করেন, যখন ঔপনিবেশিকরা Mayflower জাহাজে করিয়া আমেরিকায় গিয়া নব্য ইংলণ্ড স্থাপন করেন বা এইরূপ যে কোন ঘটনা যখন কেহ Swiss Family Robinson কিম্বা Robinson Crusoeর মতন একটা অজানা অচেনা জায়গায় সহায়সম্পত্তিহীন হইয়া বসতি স্থাপন করে। এই রকম একটা ছোট্ট সমাজে আমরা কি দেখিতে পাই? জীবনযাত্রায় বহু কার্য্য বাধ্য হইয়া আপন হাতে করিতে হয়; কাজেই শিশু জন্মাবধি তার আত্মীয়স্বজনকে সমস্ত কাজ গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত করিতে দেখিয়া জিনিষগুলি সহজেই বুঝিতে পারে। কাজের মধ্যে mystery বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না। পরিবারে পুরুষেরা বন থেকে পশুপক্ষী মারিয়া আনে, তাহাই রাঁধিয়া খাওয়ায় স্ত্রীলোকেরা, আর সংসারে যদি ছোট ছেলে-মেয়ে থাকে তারাও সাহায্য করিতে কসুর করে না। তারা হয়ত জঙ্গল হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া শুকনা কাট যোগাড় করিয়া আনিয়া মাকে নিজেদের শক্তির অনুরূপ সাহায্য করিয়া থাকে। এইরূপে রন্ধনরূপ একটা কাজ (art of cooking) শিশু আগাগোড়া চোখের

উপর দেখিতে পায়—শুধু দেখিতে পায় না, সে তার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সাহায্য করিতে পারে এবং শিক্ষা লাভও করে। মাঠে লাঙ্গল দেওয়া হইল, মই দিয়া জমি চৌরশ করা হইল, বীজ ছড়ান হইল; তারপর শস্য পাকিলে কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া ঘরে আসিল। ঘরের মেয়েরা সেই শস্য জাঁতায় পিষিয়া ময়দা তৈরী করিল, কিম্বা কাছাকাছি কোন জাঁতাওয়ালার কাছে পিষাইয়া আনা হইল—পরে যখন সেই ময়দার রুটি তৈরী হইল, সকলে মিলিয়া মহানন্দে সেই রুটি খাইল। খাইবার সময়ে বালক সহজে বুঝিতে পারিল, এই এক একখানি রুটি করিতে কত পরিশ্রম এবং কত লোকের সহযোগিতার প্রয়োজন। পরিধেয় বস্ত্রের বিষয়েও ঠিক এই একই কথা বলা যাইতে পারে। মাঠ চষিয়া, বীজ পুঁতিয়া তুলার চাষ হইতে, চরকার সূতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় বোনা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া শিশুর চক্ষের সম্মুখে হইতেছে, তার অগোচর কিছুই নাই। এইরূপ সমাজ-জীবনে শিশু প্রথম হইতেই স্বাবলম্বন, সহযোগিতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা শিখিতে পায়। সে যুগে গৃহ ছিল শিল্প-শিক্ষার স্থান। ছেলেরা বাপের কাছে এবং মেয়েরা মায়ের কাছে শিক্ষানবিশী করিত। এই শিক্ষানবিশী ক্রীড়াচ্ছলেই হইত—পিতামাতাকে কাজে সাহায্য করিতে গিয়াই তারা অনেক কাজ শিখিয়া ফেলিত। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের ছোট ছোট কাজ এত চিত্তাকর্ষক, যে তারা শিশুর চরিত্রশিক্ষা বিষয়ে কম সাহায্য করিত না। শিশু বড় হইয়া বিদ্যালয় গিয়া যে শিক্ষা পাইবে, তার গোড়া-পত্তন এই ভাবে ঘরে বসিয়াই হইত।

এইরূপ একটি সরল ও স্বাভাবিক সমাজে যে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও লালিত পালিত হইয়াছে তাহার এই সহজ জীবনের সহিত যদি অপর একটি শিশু যে নিউইয়র্ক, সিকাগো, লণ্ডন বা বোম্বাই, করাচি, কলিকাতা প্রভৃতি বর্ত্তমান জটিল সভ্যতার কেন্দ্র স্থলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার জীবনের তুলনা করি, তাহা হইলে কত না গভীর পার্থক্য দেখিতে পাই! ইউরোপের, শুধু ইউরোপ কেন আমাদের দেশেও এই সমস্ত বড় বড় সহরে সভ্যতা শুধু জটিল ও কৃত্রিম নয়, সে সভ্যতা বহুল পরিমাণে শিশুর চক্ষুর অন্তরালে পরিবর্দ্ধিত, শিশুর বুদ্ধির অগম্য; কাজেই সে শিশুর প্রাণে প্রেরণা আসিতে পারে না—সমাজে সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বভাবের প্রয়োজন কত শিশু তাহা বুঝিতে অক্ষম। এই বিরাট্ সভ্যতা-গঠনে শিশু তাহার সমস্ত উৎসাহ, প্রতিভা ও কর্ম্মানুরাগ সত্ত্বেও সাহায্য করিতে পারে না। খাদ্যসংগ্রহ, পরিচ্ছদ ও গৃহ প্রস্তুত করা প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতার বড় বড় প্রতীকগুলি শিশু আর স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে পায় না। চাল, ডাল, ঘি, ময়দা দোকানে ভারে ভারে সাজান আছে, কিনিয়া লইলেই হইল! জামা কাপড় যেন কোন এক অদৃশ্য যাদুবলে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়! এই কলিকাতা সহরে কোথা হইতে এত রাশি রাশি টাটকা মাছ, শাকশব্জী, ফলফুল আসিয়া উপস্থিত হয়, শিশু বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কলিকাতা সহরে একটুকরা জমিতে ত চাষ হয় না —পুকুর দীঘি ত কিছুই নাই; তবে এ সব আসে কোথা হইতে? এ গুহ্যতত্ত্ব শিশুকে কে বুঝাইয়া দিবে? কেমন করিয়া বুঝান যাইবে? অবশ্য কৃত্রিম সভ্যতার অন্যদিকও ভাবিবার আছে। ইহাতে মানুষ বেশী পর-নির্ভর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব যুগের সহজ সমাজে মানুষে মানুষে সহযোগিতার যত না বেশী দরকার ছিল, এই কৃত্রিম কলকারখানার যুগে তার অপেক্ষা বহুগুণে সহযোগিতার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—এই সহযোগিতা শিখিবার ও বুঝিবার আছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এত ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে শিশু তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এত বিরাট্ ব্যাপারের ধারণা করিতে পারে না। পল্লীগ্রামে আমাদের দেশে এখনও জীবনযাত্রাপ্রণালী অনেকটা সহজ ও সরল—কৃত্রিমতা খুব বেশী ঢোকে নাই; কিন্তু আজ কালকার সহরে ছেলে ঘরে Practical training খুব কম পায়, কি হয়ত পায় না। মানুষের জীবনের সঙ্গে যে সমস্ত সমস্যা প্রতিদিন জড়িত হইয়া রহিয়াছে, সে সমস্ত সমস্যার সমাধান সহরের ছেলে খুব কম দেখিতে পায়। *

* ইংলণ্ডে অনেক Elementary School-এর ছাত্রদের "দুধ কোথা থেকে আসে?" জিজ্ঞাসা করিয়া, শুনিতে পাইয়াছি "Dairy-

বনে গিয়া শীকার করিয়া, নদী হইতে মাছ ধরিয়া বা চাষ আবাদ করিয়া আর খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় না—বাজারে যাইলেই সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায়। গৃহ শিল্প ত এক রকম উঠিয়া গিয়াছে—যাহা বাজারে কিনিতে মিলে কেহই আর কষ্ট করিয়া তাহা ঘরে তৈরী করিতে রাজী নয়। এমন একদিন ছিল যখন সামাজিক জীবনের এই একান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলি শিশুর চোখের সম্মুখেই ঘটিত—আজ সেগুলি শিশু চক্ষুর অন্তরালে গোপনে কলে, কারখানায় ও অফিসে হইতেছে। বাপের পেশা কি সে সম্বন্ধে ছেলের পরিষ্কার ধারণা নেই, দেখিতেও পায় না; কেন না, বাপ ত দূরে আফিসে বা কারখানায় কাজ করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন। আর যদিই বা ছেলে বাপের কাজকর্ম্ম দেখিতে পাইত তাহা হইলেও হয়ত ভাল ধারণা করিতে পারিত না; তার কারণ বাপ যে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন সেই কাজটি ঐ সমগ্র কাজের তুলনায় এত সামান্য, যে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সে দেখিতে পায় না; কাজে কাজেই তার পিতার ক্ষুদ্র সাহায্যটুকু ঐ বিরাট্ ব্রত উদ্‌যাপন করার জন্য কতখানি প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিতে পারে না। তাই বলিতেছি, আগেকার যুগে নিজের কুটীরে বসিয়া, দেখিয়া শুনিয়া শিশুর যে chracter-training হইত, এখন আর তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।

farm," বা "Milk-van" বা "Door-side প্রভৃতি" হাস্যজনক উত্তর। ছেলেদের দোষ কী? কলিকাতার বড়বাজারের মতন লণ্ডনের রাস্তায় আর গরু শুইয়া থাকে না বা গৃহস্থও গো-পালন করে না, যে শিশু গো-দোহন দেখিতে পাইবে। কোন দূর পল্লীগ্রাম হইতে দুধ দোহাইয়া ট্রেণে বোঝাই হইয়া ভোর বেলা লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হয়। শিশু দেখে দোকানে বোতলে করিয়া দুধ সাজান আছে, কিংবা van-ওয়ালা গাড়ী করিয়া দুধ আনিয়া দুয়ারের বাহিরে রাখিয়া গেল।

Germany-র একটি Grund School-এ (প্রাথমিক বিদ্যালয়) একটি ছেলেকে গরুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বালকটি হুবহু সমস্ত বলিয়া গেল; পরে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম "গরু কত বড় হয়?" "So grosz" এত বড় বলিয়া আঙ্গুল দিয়া তিন চারি আঙ্গুল লম্বা দেখাইয়া দিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, বালকটি কি একটা ছেলেদের বইতে গরুর বিষয় পড়িয়াছিল—ঐ বইতে তিন চার আঙ্গুল বড় একটি গরুর ছবিও ছিল, তার থেকে বালকের ধারণা গরু তিন চার আঙ্গুল বড় হয়। বালকের দোষ দেওয়া যায় না। জীবন্ত গরু সে ত দেখে নাই। তার বিদ্যা পুঁথিগত, বইতে যাহা পড়িয়াছে তাই সে বলিয়াছে—অধিক ভাবিবার অবকাশ তার কোথায়?

গল্প শোনা যায়, কলিকাতার অনেক ছেলে (ছোট অবশ্য) ধান গাছে তক্তা হওয়া সম্ভব, নাকি বিশ্বাস করিয়া থাকে।

সমাজে এই যে বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, শিশুর জীবনে ইহার অর্থ অতি গভীর। ইহার অর্থ এই যে, আগে যে সব ছোট ছোট নিতান্ত আবশ্যকীয় কাজ শিশুর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত ছিল আজ সেগুলি শিথিল হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, শিশুর নিজের হাতে কাজ করিবার জন্য যে একটা সহজাত উদ্দীপনা ছিল সেটি আজ নষ্ট হইয়াছে। তাই বলিতেছি, এই সমস্ত শিক্ষা সভ্যতার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া আজকাল আর ঘরে পাইবার উপায় নাই—তার ভার আজ সযত্নে বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে।

তাহা হইলে সমস্যা হইতেছে, শিশুর শিক্ষার পত্তন কি ভাবে করিতে হইবে? সেই অতীত কালের সহজ সরল যুগে—যখন "জীবনতরী বহে যেত মন্দাক্রান্তা তালে"—সেই যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে কি? যদিও অনেকে ইউরোপে, আমেরিকায় এবং আমাদের দেশেও "Back to nature", "back to the past" রব তুলিয়া, এই কলকব্জা ও হাতেগড়া সভ্যতাকে ছাড়িয়া—"When Adam delved and Eve span"র যুগে ফিরিতে চান; আমাদের কাছে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমরা চাই, এই কৃত্রিম ও মানুষী সভ্যতার যুগে শিক্ষাকে তাহার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে।

এই জটিল ও কৃত্রিম সভ্যতার ফলে সমাজ-সংসারে যে বিরাট্ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কি ভাবে নব যুগের শিক্ষাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সফল করিতে হইবে, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়ের কাজ শুধু "লেখা" ও "পড়া" শিখাইবার মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। নবযুগের বিদ্যায়তনকে গুরু কর্ত্তব্যের ভার লইতে হইবে—সে কর্ত্তব্যটি হইল পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি (Supplying an environment to the child). এই পরিবেষ্টনী

সেই পূর্ব্ব যুগের সহজ ও সরল সমাজের মতন ঠিক না হউক, অন্ততঃ চরিত্র-শিক্ষা দিবার সুযোগ ও সুবিধা বিষয়ে অনেকটা কাছাকাছি হইবে। "বিদ্যালয় ও সমাজ" নামক পুস্তিকায় আচার্য্য Dewey এই যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়কে একটি ক্ষুদ্র সমাজ "miniature society" করিয়া তুলিতে হইবে। এই সব "ক্ষুদ্র সমাজে" ছেলেরা সহজ, স্বাভাবিক ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবন (আজকালকার ভাষায় communal life) যাপন করিতে শিখিবে। এখানে তারা সহজ ও স্বাভাবিক কাজগুলি (natural jobs) করিবার অবকাশ পাইবে এবং এই সকল কাজ করিতে করিতে যে সব সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেগুলির সমাধান তারা নিজে হাতে কলমে করিবে; শুধু লিখিয়া পড়িয়া বা অঙ্ক কষিয়া সে সমস্যার সমাধান করিলে চলিবে না—যদিও লেখাপড়া বা অঙ্ক কষাকে আমরা স্কুলের পাঠ্য তালিকা হইতে বাদ দিতে পারি না; কেন না, সংসারে এগুলির প্রয়োজন আছে।

আধুনিক যুগের বিদ্যায়তনকে গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রাচীন-পন্থীদের তিনটি বিষয়ে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে (১) শিক্ষনীয় বিষয় (২) শিক্ষকেরা যে ভাবে এই সব বিষয় পরিচালনা করেন এবং (৩) ছাত্রেরা যে ভাবে এই সব বিষয় আয়ত্ত করে।

(১) লেখা, পড়া, অঙ্ক কষা, ভূগোল, শিশুর জীবনে এগুলির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে, কাজেই পাঠ্য তালিকায় এগুলি রাখিতে হইবে; কিন্তু ইহাদের বিষয়-বস্তুর অদল বদল করিতে হইবে এবং শিক্ষার প্রণালীও আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। (আধুনিক যুগের Project Method ও আমেরিকার প্রচলিত Prof. H. E. Armstrong প্রবর্ত্তিত Heuristic method এ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে) * আজকালকার দিনে একথা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, যে মনের উৎকর্ষের ন্যায় শরীরের উৎকর্ষেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; শুধু যথেষ্ট নয়, হয়ত অধিক প্রয়োজন—কেন না, দেহের উৎকর্ষের উপর মনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। কাজে-কাজেই বিদ্যালয়কে এমন একটি স্থান করিয়া তুলিতে হইবে যেখানে ছাত্রেরা শুধু মানসিক ভাবে নয়, শারীরিক ভাবেও যেন সতেজ থাকিতে পারে। উচ্চাঙ্গের ধ্যান ধারণা ছাড়িয়া দিলেও, (কেন না, ইহা সাধারণের জন্য নহে) "লেখা" ও "পড়ার" প্রয়োজনীয়তা আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে যথেষ্ট রহিয়াছে। সামান্য সামান্য লেখাপড়া না জানিলে, অতি ছোট ছোট কাজও করিতে অনেক অসুবিধা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, বলা যাইতে পারে, যে সমস্ত বিজ্ঞাপন রাস্তায় বাহির হইলেই চোখে পড়ে, যেমন "বাঁ দিকে চলিও", "লাইন পার হইও না, পুলের ওপর দিয়া যাইবে"; ষ্টেশনে "টিকিট ঘর", "বিশ্রাম ঘর" প্রভৃতি। ঐগুলি সামান্য লেখাপড়া জানার অভাবে পড়িতে না পারিলে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। এ বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া এমন ভাবে শেখান হইতেছে, যে যেন ইহাই জীবনের একমাত্র কাম্য—যেন ইহারই উপর ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। অধুনা যে জগতে আমরা বাস করিতেছি তাহা পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন হেতু পূর্ব্বযুগ অপেক্ষা বহুপরিমাণে পরিবর্দ্ধিত ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এ যুগের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে, যে সমস্ত বিদ্যালয় নবযুগের পরিবর্ত্তন অনুসারে আপনাপন পাঠ্যতালিকা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত না করিবে তাহাদের উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হইবে না।

(২) এ যুগের শিক্ষককে শুধু পাঠ্য-পুস্তক হইতে ক্লাসের মধ্যে বসিয়া খানিক পড়িয়া শুনাইয়া গেলে বা ছাত্রদের নিকট হইতে সেইগুলি পরদিন হুবহু আবৃত্তি করাইয়া লইলেই চলিবে না—শিক্ষার ধরণ বদলাইতে হইবে। কতকগুলি ঘটনা বা বিষয় বর্ণনা করিয়া যাইলে লাভ কি? ঘটনা বা বিষয় সে ত নানাদিক্ দিয়া নানাভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। তাই বলিতেছি, শুধু কতগুলি ঘটনার (facts) উল্লেখ করিলে কোন উপকারই হইবে না। সেগুলিকে

* এই দুইটি method সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে বিশেষ কিছু লেখা হইল না।

এমনভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের গভীর অর্থ ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম হয়, যাহাতে তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ তাহারা দেখিতে পায় এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সেগুলি প্রয়োগ করিতে পারে। সুতরাং আগের যুগে শিক্ষকেরা যে আপনাদের পথপ্রদর্শক ও নিয়ন্তা (cicerone and dictator) বলিয়া ভাবিতেন, সেই মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া এখন তাঁহাদের হইতে হইবে দর্শক ও সহায়ক (watcher and helper)*

(৩) শুধু কতকগুলি ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তাহা হইতে সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া লওয়া বা তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভাশালী বালকের পক্ষেই সম্ভব—সাধারণের পক্ষে নয়। শিক্ষকের কর্ত্তব্য, কতকগুলি ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পরিবর্ত্তে সত্যকারের মালমশলা ছাত্রদের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিয়া দেওয়া; যাহাতে তাহারা এই সব মালমশলা সত্যকারের কাজে লাগাইতে পারে; অর্থাৎ শিক্ষক চেষ্টা করিবেন, বিদ্যালয়ের ভিতরের জগৎ যেন বিদ্যালয়ের বাহিরের জগৎ হইতে কোন বিষয়ে পৃথক্ না হয়।

এইজন্যই নবযুগের শিক্ষাগুরু আচার্য্য Dewey পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "বিদ্যালয়কে একটি ক্ষুদ্র জনসমাজে (community) পরিণত কর"। এখানে ছাত্রেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে (communal life) বাস করিবে; কিন্তু এই সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যেন গতানুগতিকের ধারা অনুসরণ না করে; বিধিনিষেধের দ্বারা তাদের স্বাধীনতা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। ইহার গতি হইবে অতি স্বাভাবিক; যখন ছাত্রেরা এই ক্ষুদ্র সমাজের জীবন শেষ করিয়া বহির্জগতের বৃহৎ সমাজে আপন আসন করিয়া লইবে, তখন যেন এখানকার ক্ষুদ্র জীবনের গতির সহিত আজিকার দিনের এই বর্দ্ধিষ্ণু ও বৃহত্তর বহির্জগতের গতির বিরোধ না ঘটে—দুই জীবনের মাঝে যেন মিলনের সেতু গড়িয়া উঠে। Embryo-societyর মধ্যে শিশু যেন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ও কর্ম্মতৎপর হইতে শিক্ষা পায়। সেইজন্য পুনরায় বলিতেছি, বিদ্যালয়কে ছাত্রদের চরিত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে—যে শিক্ষা শিশু সামাজিক জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মে সহায়তা করিয়া পাইত। শুধু তাই নয়, বিদ্যায়তনের আরও লক্ষ্য রহিবে, শিশুর সহিত প্রকৃতির এবং সত্যকারের বস্তু ও অবস্থার (Real things and situation) নিবিড় পরিচয় করিয়া দেওয়া। একজন শিক্ষাকর্ত্তা বলিয়াছেন—"Lessons are remote and shadowy, compared with training of attention and judgement, acquired in having to do things with a real motive behind, and a real outcome ahead." শুধু কেতাবী শিক্ষা দিলে চলিবে না, হাতে-কলমে কাজ করিতে কার্য্যকরী শিক্ষা দিতে হইবে। এই কার্য্যকরী শিক্ষায় একটি সুফল এই যে, ইহাতে শিশু নিষ্ক্রিয় ও গ্রহণশীল না হইয়া সতর্ক ও কর্ম্মকুশল হইতে শিখে। তাহা ছাড়া কাজ করিতে যাইলে সহযোগিতার প্রয়োজন আপনি হইয়া থাকে তাহা আর নূতন করিয়া শিখাইবার দরকার হয় না।

ব্যবসায় বাণিজ্য, পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থা, শাসন-প্রণালী অতিমাত্রায় বদলাইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বদলাইবে। ইহাতেই বুঝা উচিত, যে বর্ত্তমান উন্নতি ও জটিল সভ্যতার জন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু আরও একটু তলাইয়া বুঝিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, যে একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য বাড়িয়া গিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ইহার দায়িত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কেন না, শিক্ষার ভার জনসাধারণ গ্রহণ করিয়াছে—কাজেকাজেই তাহাদের স্থায়িত্ব জনসাধারণের মতের উপর নির্ভর করে। (বিদ্যালয় ধর্ম্মশিক্ষার ভার গ্রহণ করিবে কিনা এবং করিলে কোন ধর্ম্ম অনুসারে ও কিভাবে শিক্ষা দিবে প্রভৃতি নানা কথা আসিয়া পড়ে।) অবশ্য বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—যাহা আমরা বহুবার

* এইরূপ শিক্ষাপদ্ধতি ইউরোপে যে সব স্কুল Montessori system'এর সারাংশ লইয়া Self-government নীতিতে পরিচালিত হইতেছে কিম্বা জার্ম্মানী ও আমেরিকায় যে সব স্কুলে অতি অধুনা প্রচলিত Hamburg system অনুসরণ করা হয়, সেইখানেই সম্ভব। এই সব কথা লেখা হইল আজকালকার এই সব নূতন পদ্ধতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া।

বলিয়াছি—চরিত্র-শিক্ষা দেওয়া। এই চরিত্র-শিক্ষা পুঁথি পড়াইয়া হইবে না, ধর্ম্ম-শিক্ষার মধ্য দিয়াও নয়, আর Party-politics দিয়া ত নয়ই। এই চরিত্র-শিক্ষা দিতে হইবে কর্ম্মের মধ্য দিয়া, সহযোগিতার মধ্য দিয়া।

অধ্যাপক Dewey—যাঁর মতামত আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি এবং যিনি বর্ত্তমান যুগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিশারদ—বলেন, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা ও চরিত্র-সংগঠন হইবে জাতীয় ব্যবসায়-শিক্ষার দ্বারা। তিনি Generie occupation of mankind কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন—মৎস্য ধরা, বস্ত্রবয়ন, রন্ধন, মৃগয়া, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি। ছাত্রেরা অল্পবয়স হইতে এই সব কার্য্যে যোগদান করিলে, এই সব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য পূর্ব্বপুরুষদের যে সব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল সেগুলি তারা চোখের সম্মুখে দেখিতে পায়; নূতন করিয়া চিন্তা করিতে শিখে, আবিষ্কারগুলি আবার নূতন করিয়া ঝালাইয়া লয়। বর্ত্তমান সমাজকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারে, কেমন করিয়া এই রকম একটি সমাজ গড়িয়া উঠিল।

আজ একথা সকলেরই বুঝা উচিত, যে গোটাকতক অতি প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্পের সহিত যদি ছাত্রদের ছেলে-বেলা হইতে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে সমাজে তাহাদের স্থানটি কোথায়, এ বিষয় তাহাদের ধারণা চিরদিন আব্‌ছায়া থাকিয়া যাইবে; তাহা ছাড়া যে অগণিত নরনারী শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে ও এই বিশাল সভ্যতা-গঠনের পক্ষে যাহাদের দান নগণ্য বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না, তাহাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করা ও তাহাদের ব্যথায় ব্যথী হওয়া উত্তরকালে তাহাদের পক্ষে সহজে সম্ভব হইবে না। আমাদের দেশে অনেকের ধারণা, যে যারা মাথা খাটাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তারা, শরীর খাটাইয়া যারা খায় তাদের চেয়ে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তাই উকীল, মোক্তার, ডাক্তার সম্মান বেশী পাইয়া থাকে মৃৎশিল্পী, দারুশিল্পী, চিত্রকর ও রঞ্জক প্রভৃতির চেয়ে। অথচ এই দেশের কবি গাহিয়াছেন :—

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে,
করচে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটচে যেথায় পথ,
খাটচে বারোমাস,
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার পর

* * * *

রাখো রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক্ ধূলাবালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে॥"

বিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ শ্রমশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহার প্রধান উপকার এই হইবে, যে ছাত্রেরা পরস্পরের সহিত খুব খোলাখুলি ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইবে; কেন না, এই সব কাজ একা একা করা সম্ভব নয়, অপরের সাহায্য লইতেই হইবে। এই ভাবে তারা পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান ও সহযোগিতায় যে প্রয়োজন সে কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিবে।

সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে সমস্ত শিক্ষা-সংস্কারকেরা সমাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষাই একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সমাজের উন্নতি করিতে হইলে, শিক্ষাকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে (Education should be socialised)। বিদ্যালয়-গুলিকে আমাদের কর্ম্মবহুল জীবনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি করিয়া তুলিতে হইবে—পূর্ব্বযুগের ন্যায় সেগুলিকে সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে চলিবে না। Froebel, Pestalozzi এবং অন্যান্য সকলে শিক্ষাকে সমাজের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া, সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁরা আশা করিয়াছিলেন, এই ভাবে ছাত্রদের মধ্যে একটী social spirit জাগিয়া উঠিবে; কিন্তু তাঁরা বিদ্যালয়কে Embryo commuinty করিয়া তুলিবার কল্পনা করিতে পারেন নাই। শিক্ষাকে সজীব করিয়া তুলিতে হইলে, বিদ্যালয়গুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে পরিণত করিতে হইবে।

দেশের বিদ্যায়তনগুলি যদি সমাজের অভাব অভিযোগের দিকে লক্ষ্য না রাখে, তাহা হইলে তারা জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে। চাষা, কামার, কুমার বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাইতে চাহিবে না—তারা ভাবিবে, স্কুলে ছেলে পাঠাইলে তারা বাবু হইয়া যাইবে, কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে। বিদ্যালয় যদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া করা হয়, শিক্ষার বিধান যতই আধুনিক ও উন্নত ধরণের হউক না কেন, লোকে তাহাকে Isolated Institution বলিয়াই ভাবিবে। দেশ জানিতে চায়, বিদ্যালয়গুলি তাদের সত্যকারের উপকারের জন্য কি করিতেছে, তাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে কি না—বালক কালিদাস, ভবভূতি পড়িয়া রসাস্বাদন করিতে পারিতেছে কিনা, এ তাদের লক্ষ্য নয়। কাজেই শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিতে হইলে দেশের এই তাগিদ উপেক্ষা করিলে চলিবে না—স্কুলের মধ্যে Community-spirit কে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

বিদ্যালয়গুলি যদি আশ-পাশ চারিদিকের ঘটনার ও অবস্থার সহিত সংস্পর্শ রাখে, তাহা হইলে যে শুধুই পড়াশুনা ভাল হইবে ও ছাত্রদের কর্ম্মে প্রবৃত্তি বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে তাহা নহে; প্রতিবেশীদের যথেষ্ট উপকারও করা হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ছাত্রেরা স্কুলের সন্নিহিত গ্রামের জরিপ করিলে ও তার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিলে পৌরজন শাস্ত্র (civics) শিখিতে পারিবে; শুধু শিখিতে পারিবে না, তারা পল্লীবাসীদের জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে; কিন্তু যদি civics সম্বন্ধে ক্লাসে বসিয়া পাঠ্য পুস্তক হইতে খানিকটা আবৃত্তি করিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে সে বিদ্যা পুঁথিগত হইয়াই থাকিবে, তার সদ্ব্যবহারের আশা কম।

আমেরিকায় Gary Schools এবং Mr. Valentine'এর স্কুলগুলি নবযুগের আদর্শ স্কুল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই বিদ্যালয়গুলি যে সব স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানের প্রতিবেশীদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক তাগিদের ক্ষুধা মিটাইবার জন্যই আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে। এই বিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য অতি মহৎ—ইহাদের উদ্দেশ্য হইল একটী নূতন জনসমাজ সৃষ্টি করা। সেখানকার প্রত্যেক অধিবাসী হইবে উন্নতিশীল, স্বাধীন ও সতেজ—মনে ও প্রাণে। ইহাদের এ উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইয়াছে, আজ এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা ভারতবর্ষে গ্রামে গ্রামে এই আদর্শে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।

যাত্রী

শ্রীশশাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী

বিজন বন্ধুর পথে চলেছি একাকী,
শূন্যপানে চেয়ে আছি, অশ্রুভরা আঁখি।
সম্মুখে পিছনে নামে গভীর আঁধার,
ভয়-ভীত পান্থ আমি, স্তব্ধ চারিধার।

রাশি রাশি দুঃখ আর ব্যথা অশ্রুজল,
লয়েছি বরণ করি জীবন সম্বল।
অসহায়, রিক্ত আমি নাহি মোর কেহ,
চলে না চরণ আর ক্লান্ত সারা দেহ।

তবু শূন্যমনে চলি দীর্ঘ-পথ বাহি',
আগ্রহ ব্যাকুল হ'য়ে কার পানে চাহি।
মনে হয় দূরে যেন দেখি কার আলো,
কে যেন ডাকিয়া যায় বাসি মোরে ভালো।
চলেছি সন্ধানে তার, সুখ মোর তাই,
তাহারে স্মরণ করি দুঃখ ভুলে যাই।

"ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস"

শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

মান্যবর 'প্রবর্ত্তক' সম্পাদক মহাশয়,

১৩৪০ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের "প্রবর্ত্তকে" শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি-এ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ "ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস" পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষই যে পৃথিবীতে জ্ঞান, সভ্যতা ও শিল্প বিস্তারের আদি কেন্দ্র-ভূমি বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাতে জগতের সম্মুখে প্রত্যেক হিন্দু-ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং গৌরব-বোধে শির উন্নত হয়।

উক্ত নিয়োগী মহাশয়কে আমার কিছু নিবেদন আছে; অবশ্য তাঁহার প্রবন্ধের কোনরূপ প্রতিবাদ হিসাবে আমি এই পত্র লিখিতেছি না। তিনি একজন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ব-বিদ্; তবে আমার লিখিত এই সংবাদে যদি তাঁহার প্রবন্ধের অনুমাত্র পোষকতা করে, এই আশার বশেই এই পত্রখানি পাঠাইলাম।

১। গত বৈশাখ মাসের 'প্রবর্ত্তকে' নিয়োগী মহাশয়, গৌড়-নগরকে "পুণ্ড্রবর্দ্ধন" আখ্যা দিয়াছেন, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবর্ত্তকে' বঙ্গদেশকে 'গৌড়দেশ' বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে—"The land between the Mahanadi and the Godavari to Manbhum, thence to the land between the Mahananda and the Teesta, which is called Gouradesa।"

কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় যে—চন্দ্রবংশীয় বলি রাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র ছিল, ঐ পুত্রগণকে তিনি এক একটি রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহাদের নামানুসারেই অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশের নামকরণ হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞকালে বীরবর ফাল্গুনী যজ্ঞাশ্বের রক্ষাকারণ বঙ্গ, পুণ্ড্র, কোশল প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছিলেন।

কল্কিপুরাণে দেখিতে পাই যে, কল্কিদেব হরি, কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র প্রভৃতি নরপতিগণকে যথাক্রমে পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্র পুলিন্দ, সুরাষ্ট্র দেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং আপন জ্ঞাতিদিগকে মধ্য-কর্ণাট, অন্ধ্র, ওড্র, অঙ্গ, বঙ্গদেশ দান করিয়াছিলেন। আবার 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত মহাকোষে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম কোথাও নাই, 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' নাম আছে—তাহার অর্থ যথা:—"পৌণ্ড্রবর্দ্ধনঃ—দেশভেদঃ। বেহার ইতি খ্যাত। ইতি শব্দরত্নাবলী।" উক্ত শব্দকল্পদ্রুমে, গৌড়ের সীমানাও নির্দ্দেশ করা আছে, যথা:—"বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগংশিবে। গৌড়-দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥ ইতি শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্রে সপ্তমপটলঃ।"

ভারতের আর্য্যাবর্ত্তভূমে পাঁচটি গৌড় ছিল, তাহাও শব্দকল্পদ্রুম পাঠে জানা যায়, যথা—"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা

গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়া ইতিখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥ ইতি স্কন্দপুরাণং।"

এরূপ প্রবাদ আছে যে, পুরাকালে যে সকল পণ্ডিত শাস্ত্রালোচনায় এই পাঁচটি গৌড় জয় করিতে পারিতেন, তাঁহারা দিগ্বিজয়ী উপাধি পাইতেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান জন্য শঙ্করাচার্য্যকে, শাস্ত্রীয় তর্কে এই পাঁচটি গৌড় জয় করিতে হইয়াছিল—ইহা "শঙ্করবিজয়" নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়।

এক্ষণে নিয়োগী মহাশয়কে জিজ্ঞাস্য এই যে—বঙ্গদেশ, গৌড়, ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন, এই তিনটি নাম কি একই প্রদেশের অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নাম? যদি পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশই হয়, তবে নিয়োগী মহাশয় কোন প্রদেশকে উপলক্ষ করিয়া "ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস" লিখিয়াছেন এবং "শব্দকল্পদ্রুমে" এরূপ বিভিন্ন মত কেন দেখা যায়—সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ভবিষ্য সংখ্যার 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশ করিয়া সাধারণ পাঠকের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন, আশাকরি।

নিয়োগী মহাশয় বেদ, পুরাণ, বাইবেল ও নানা দেশের পুরাবৃত্ত হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে—পুরাকালে ভারতীয় রাজগণই ইজিপ্ট, গ্রীস, রোম এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশ জয় করিয়া নিজ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন; এবং ঐসকল দেশে জ্ঞান, বিদ্যা ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত নিয়োগী মহাশয়ের ন্যায় ভারতের অন্যান্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌ও ভারতীয় জ্ঞান বিদ্যা প্রভৃতি ইউরোপ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে যে প্রচার হইয়াছিল তাহা যথেষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ নিয়োগী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রমাণ স্বীকার না করিয়া, বরং চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া নিয়োগী মহাশয় যেন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছেন। এক্ষণে নিয়োগী মহাশয়ের নিকট আমার নিবেদন এই যে—দাসত্বের মসীবর্ণ টীকা যতকাল ভারতবাসীর কপালে অঙ্কিত থাকিবে, ততকাল স্বাধীন জাতির নিকট তাহাদের মানসম্ভ্রম কিছুই থাকিতে পারে না, এবং দাসজাতির মতামতের কোন মূল্যও হয় না।

নিম্নলিখিত সংবাদটিতে নিয়োগী মহাশয়ের প্রমাণগুলি যদি Sir John Marshall-দিগরের নিকট "squared with facts" হয়, এই আশায় লিখিলাম।

২। "History of the Horse" (১) নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকের প্রণেতা—জনৈক ইংরেজ। উক্ত পুস্তকে ঘোড়ার সম্বন্ধে ঘোড়ার দেহের গঠন, ঘোড়ার আদিম বাসস্থান, ঘোড়ার নানা প্রকার রোগ ইত্যাদি অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে। কিন্তু উক্ত ইংরেজ-লেখক উক্ত পুস্তকের একটি অধ্যায়ে, মানুষের নিকট অশ্ব-জাতির দাসত্বের Antiquity (প্রাচীনত্ব) সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন অর্থাৎ এই পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দেশের কোন্ জাতীয় লোক সর্ব্ব-প্রথমে বন্য ঘোড়া ধরিয়া এবং বাধ্য করিয়া মানুষের ব্যবহার-যোগ্য করিয়াছিলেন। উক্ত লেখক গ্রীস, রোম, ইজিপ্ট প্রভৃতি নানাদেশের পুরাবৃত্ত এবং বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে—"হিন্দুস্থানের অধিবাসী-গণই সর্ব্ব-প্রথমে বন্য ঘোড়া ধরিয়া মানুষের ব্যবহার-যোগ্য করিয়াছিলেন" [অবশ্য হিন্দু-ভারতবাসীর নিকট এ তথ্য নূতন নহে, কারণ, বৈদিক-কালে সত্যযুগের হিন্দুগণও অশ্বমেধ যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যদেবতার রথ সপ্তাশ্বযোজিত, একথা শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন]

৩। তৎপরে উক্ত 'History of the Horse' পুস্তকের প্রণেতা ভারতীয়গণের দিগ্বিজয় ও তৎসঙ্গে জ্ঞান

(১) আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয় বাল্যকালে পাঠ্যাবস্থায় "History of the Horse" নামক একখানি পুস্তক স্কুল হইতে প্রাইজ পাইয়াছিলেন। ঐ বইখানি যে ৮০ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়; কারণ প্রায় ৮০ আশী বৎসর কাল ঐ পুস্তক আমার বাটীতেই আছে। সম্প্রতি উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশের ও শেষাংশের কতকগুলি পাতা উইপোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়াছে; কেবল মাঝখানের কতকগুলি পাতা এখনও বর্ত্তমান আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ পুস্তক একবার পাঠ করিয়াছিলাম বলিয়া আমার স্মরণ আছে যে, উক্ত পুস্তকের প্রণেতা একজন ইংরেজ। আমার নিকট ঐ পুস্তকের যে অংশটুকু আছে, তাহাতে Antiquity of Horse অধ্যায়টি সম্পূর্ণ লিখিত আছে। ইজিপ্টদেশীয় মানুষেরও ঘোড়ার ২।৩ খানি ছবিও ঐ পুস্তকাংশে অঙ্কিত আছে।—(লেখক)

ও সভ্যতা বিস্তারের কতক আলোচনা করিয়াছেন,—যথা "ভারতীয়গণ অশ্বকে সাংসারিক কার্য্য ব্যতীত, যুদ্ধকার্য্যেও যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন; তাঁহাদের অশ্বারোহী সৈন্য অত্যন্ত প্রবল ছিল; তাঁহারা যুদ্ধকালে দ্রুতগামী Tangum (২) অশ্বসকল ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের অশ্বের উচ্চতা ১০।১২ হাত ছিল; কোন অশ্বের উচ্চতা ১৫ হাত অবধি ছিল।"

উক্ত পুস্তক হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"Most authorities, we believe, agree, that the Hyksos, Cushites (৩) or Scythians, made an irruption into Lower Egypt, where they continued for upwards of a hundred years, under the Government of their own kings. The reign of Hyksos or shepherd kings, (৪) lies, according to some authorities, between the years 1800 and 1600 B. C. Manetho's 17th dynasty consists of shepherd kings who reigned at Memphis * * *. Dr. Hales, makes the invasion of these people to occur about the year 2159 B. C. (see 'New Analysis of Chronology',) and considers that their reign lasted for a period of 260 years ; * * * Mr Faber regards the pyramids to have been built under these warlike strangers, and this view of the subject is adopted by the writer of the notes to the "Pictorial Bible". * * * If therefore we conclude, that the Hebrews were employed on the pyramids, we must conclude that they were not of native Egyptian structure, but were formed on the soil of Egypt by a foreign people. Of this it is a remarkable corroboration, that the pyramids are confined to that part of Egypt which the shepherd conquerors occupied, whereas we should rather expect to have found them, if native structures, in upper Egypt, and the vicinity of the hundred-gated Thebes, the ancient and chief seat of the Egyptian religion, and of the temples and monuments connected with it. * * *

"Various Arabian writers concur in the statement that the pyramids were built by a people from Arabia, who, after a period of dominion in Egypt, were ultimately expelled. There is every probability that though these shepherd-kings came immediately from Arabia, their original migration was from lands further east, and it might not be impossible to track their progress by the pyramidal structures they have left in the lands they subjected to their rule.

"The Indian annals record a migration from the east of a race of Pali or shepherds (see the Philites above quoted from Herodotus). They were a powerful tribe, who in ancient times governed all the country from the Indus

(২) দ্রুতগামী Tangum অশ্ব,—তুরঙ্গম শব্দের অপভ্রংশ কি না,—পাঠক বিবেচনা করিবেন—(লেখক)।

(৩) Cushite=কুশদেশবাসী, প্রাচীন পুরাতত্ত্ববিৎ Diodorus,—কুশাইট অর্থে কৃষ্ণবর্ণ জাতি বলিয়াছেন, কিন্তু Cush,—in the older historical parts of the Old Testament, is applied evidently to—"Nations living to the east-ward of the Red sea"। কর্ণেল উইলফোর্ডের মতে 'কুশদ্বীপ,—অর্থে, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তস্থিত এবং কাস্পীয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগরের সন্নিকটস্থ দেশসমূহকে বুঝায়। হিন্দুদিগের পুরাণে, কুশদ্বীপের যথেষ্ট পরিচয় ও বর্ণনা আছে; পুরাকালে হিন্দুরাজগণই যে কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ—শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও গরুড়পুরাণ হইতে পাওয়া যায়। এই কুশাইটগণের দিগ্বিজয় অর্থে—ভারতীয় রাজগণের দিগ্বিজয় বুঝায়; কিন্তু উপরিলিখিত Hyksos,—রামায়ণের ইক্ষাকুবংশ কি শ্রীমদ্ভাগবতের ঋক্ষবংশ—পাঠক বিচার করিবেন।—(লেখক)

(৪) পুরাকালে হিন্দুরাজগণ বহুসংখ্যক গো-পালন করিতেন; বিরাট রাজার গো-ধন বৃত্তান্ত মহাভারত-পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। এই জন্যই বোধ হয় ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগকে Pali (পালক) or shepherd kings বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। প্রাচীন পুরাতত্ত্ববিৎ Herodotus এই Pali or shepherd রাজগণকে Philites বলিয়াছেন।—(লেখক)

to the Ganges. Being an active, enterprising people, they by conquest and colonization, spread themselves west-ward even into **Africa and Europe**. *They took possession of Arabia and the western shores of the Red Sea.*

"*We may connect this with another record of an ancient king, whose empire Vishnu enlarged, by enabling him to conquer Misra-stan* (৫) *or the land of Egypt, where his immense wealth enabled him to raise three mountains, called Ruem-adri or the mountain of gold ; Rujat-adri,— the mountain of silver, and Retn-adri— the mountain of Gems. These monarchs were the builders of pyramids,* (৬) *and probably derived their names, as Diodorus conjectures, from the colour of the stone with which they were coated.*"

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মিশর ও ইউরোপের অধিবাসিগণ দুইশত বৎসরের অধিককাল ভারতীয় রাজগণের অধীনে থাকিয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যা এবং নানাপ্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত ভারতীয় রাজবংশের অবসান হইলে পর, মিশরবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করেন এবং ভারতবাসীর পরিত্যক্ত ঐসকল পিরামিড মিশরীয় রাজগণ যদৃচ্ছামত ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

৪। ১৩৪০ সাল আষাঢ় মাসের 'প্রবর্ত্তকে'— নিয়োগী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"The Pyramid-builders were Indo-Europeans" কিন্তু Indo-Europeans নাম দিয়া নিয়োগী মহাশয় কিরূপ যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। "The Pyramid-builders were Indians or Indo-Egyptians"—এই কথাই বোধ হয় নিয়োগী মহাশয়ের লেখা উচিত ছিল।

উক্ত 'History of the Horse' পুস্তকের প্রণেতা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, যে "ভারতবাসিগণ পুরাকালে মিশর দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন—এই সত্য ঘটনামূলক পুরাবৃত্ত মিশরদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ও পুরোহিতগণ আবহমানকাল চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, ইহা প্রাচীন গ্রীসীয় ঐতিহাসিক Herodotus স্বীকার করেন।"

৫। আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের প্রাচীন-গৌরব চাপা দিবার কিম্বা লোপ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট বটে; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-বিখ্যাত কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রকৃত সত্যের অপলাপ করেন নাই। নিয়োগী মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য নিম্নে কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

ফ্রেডারিক ম্যাক্সমুলার M. A. (Oxford) এবং ইংলণ্ডের বোডলীয়ন্ পুস্তকালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন :—"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty, that nature can bestow,—in some parts a very Paradise on Earth,—I shall point to India. * * *"

Maxmuller's—*'India—what it can teach us.*"

"India is the source from which not only the rest of Asia, but the whole western world, received their knowledge and their religion."

Prof. Heeren's—*Historical Researches.*
Vol. II.

---

(৫) 'মিস্র-স্থান,—উপস্থিত মিশর নাম ঐ মিস্র কথার অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নিয়োগী মহাশয় মিশর=মা ঈশর,—কেন লিখিয়াছেন?—(লেখক

(৬) হিন্দু-জাতির তন্ত্র-শাস্ত্রের অন্তর্গত—'ইন্দ্রজাল খণ্ডে',— পৌরমঠ কথার উল্লেখ দেখিতে পাই; উক্ত পৌরমঠের আকৃতির যে রূপ বর্ণনা আছে, তাহা মিশর দেশের পিরামিডেরই মত। ঐ পৌরমঠ কথাটি ইউরোপীয় উচ্চারণের ঢং-এ,—পিরামিড হইয়াছে কি? পাঠক তাহা বিচার করিবেন; যেমন কলিকাতা=ক্যালকাটা, বর্দ্ধমান= বার্ডওয়ান।—(লেখক)

"No nation on Earth can vie with the Hindus in respect of the antiquity of their civilization and the antiquity of their religion."

Chamber's—"*Theogony of the Hindus*"

"English decorative art, in our day, has borrowed largely from Indian forms and patterns."

Sir W. W. Hunter—"*Imperial Indian gazetteer*"

ভারতের অতীত গৌরব-কাহিনী জগৎসমীপে প্রচারের প্রচেষ্টার জন্য নিয়োগী মহাশয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পিতৃ-গৌরবই প্রতিষ্ঠার মূলীভূত। পিতৃ-গৌরব বিস্মৃত হইলে, জাতি অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়, আপনার জাতীয় জীবন বিনষ্ট করে। পিতৃ-লোকের গৌরব-কাহিনী গানই আপনার দেশকে ও আপনার জাতিকে উন্নত করে।

মহামতি Maxmuller বলিয়াছেন :—"A people that can feel no pride in the past, in its history and literature, lose the main-stay of its national character."

শ্রমিক

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

আমরা চাষা আমরা মজুর শূদ্র মোরা দেশের দাস.
আমরা করি দিন মজুরী লাঙ্গল দিয়ে লাগাই চাষ।
রৌদ্রে ঝড়ে গতর খাটাই অটুট মোদের দেহের বল
লোহার মত মোদের বাহু কারখানাতে চালায় কল ;
দেশ্ বিদেশে জাহাজ চলে মোদের গড়া মাল নিয়ে
দেবতা চালে মোদের আশীষ ঘরের ফুটা চাল দিয়ে।
শাল আলোয়ান বুন্‌তে মোরা দিবস-রাতি শ্রম করি
শীতের রাতে লেপ জোটেনা ছিন্ন কাঁথা গায় পরি ;
আমরা মুটে আমরা মজুর শ্রমিক মোরা নীচ জাতি,
জীবন ব্যাপি' গতর খেটে ধনীর দোরে হাত পাতি!

পায়ের তলায় দলন করে মোদের যত ধনীর দল,
একবেলা ভাত তাও জোটেনা সঙ্গী মোদের চোখের জল ;
আমরা গড়ি প্রাসাদ-পুরী বুকের শোণিত জল কোরে
পরিশ্রমের দাম জোটে না খাটিয়ে ধনী নেয় জোরে।
ক্রোশের পরে ক্রোশ চলে যাই মাথায় নিয়ে ভীম বোঝা
বাবুরা কয়, শক্ত কি আর? অভ্যাসেতে সব সোজা!
তবু সবার মন ভার কথায় কথায় মুখ ভারী
আমরা যদি চক্ষু রাঙ্গাই কারুর কি আর ধার ধারি?
আমরা মুটে আমরা মজুর শ্রমিক মোরা নীচ জাতি!
জীবন ব্যাপি' গতর খেটে ধনীর দ্বারে হাত পাতি।

মুখবুজে সব সহ্য করি জীবন-ভরা লাঞ্ছনা
হায়রে মোদের ব্যর্থ-জীবন সইছি কেবল বঞ্চনা
জগত ব্যাপি' স্বেচ্ছাচারের শাসন কে আজ করবে গো
কবে মোদের হাহাকারে তীব্রব্যথা ঘুচ্‌বে গো?
আমরা বাড়াই দেশের শোভা, নগর, সহর, রাজধানী
সোণা, রূপা, হীরক, লোহা সর্ব্ব ধাতুর সন্ধানী।
আমরা যেরে কর্ম্মীরাজা ময়দানবের সন্ততি
কর্ম্ম মোদের ধর্ম্মরে ভাই সেবায় মোরা তাই ব্রতী।
আমরা চাষা আমরা মজুর শূদ্র মোরা দেশের দাস
আমরা করি দিন মজুরী লাঙ্গল দিয়ে লাগাই চাষ।

রোগে মোদের হয়না সেবা রাত্রি কাটাই ফুটপাতে
ওষুধ তো হায় দূরের কথা বৃষ্টিভিজি বর্ষাতে।
দুঃখে শোকে নীরব রহি চায়না কেহ মুখপানে,
কেউ বা বলে কুলীর কি আর দুঃখ্ ব্যথা হয় প্রাণে?
আমরা তুলি মুক্তামাণিক সাগর-তলে ডুব দিয়ে
আমরা সাজাই কবির হিয়া তাজমহলের রূপ দিয়ে।
বিশ্বনাথের দেউল গড়ি, জগন্নাথের কাঠের রথ
সবাই মোদের ঘেন্না করে মন্দিরে হায় পাইনা পথ
আমরা মুটে আমরা মজুর শ্রমিক মোরা নীচ জাতি
জীবনব্যাপি' গতর খেটে ধনীর দোরে হাত পাতি।

ওগো মোদের উন্নত জাত দাওগো মোদের অন্ন দাও
পারিশ্রমিক দাওগো মোদের, দিবস-রাতি খাটিয়ে নাও,
দ্বিগুণ ফসল কোর্‌ব মোরা, কোর্‌ব মাঠে দ্বিগুণ চাষ
আমরা নহি ঘৃণ্য হেয়, শূদ্র মোরা দেশের দাস
বন্ধুভাবে চালাও মোদের দেখাও তোমার জ্ঞানের বল
মোদের জোরে দেশের বুকে লক্ষ রকম চল্‌বে কল
বিশ্বজীবের সেবায় মোদের নিঃশেষে আজ করবো দান
মানুষ মোরা নইকো হেয় বিধির গড়া মোদের প্রাণ।
আমরা মুটে আমরা মজুর আমরা নহি নীচ জাতি
পরিশ্রমের দাম নিতে তাই সগৌরবে হাত পাতি॥

—বৈচিত্র্য—

অগ্নিনিবারণী বৈদ্যুতিক যন্ত্র

বিষাক্ত গ্যাস প্রতিষেধক কৌশল—

বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনী শক্তি মানবতার কল্যাণ অকল্যাণ উভয়দিকেই সমানে নিয়োজিত হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা যেমন সম্ভব হইয়াছিল, তেমনি তাহা প্রতিরোধের চেষ্টা বিজ্ঞানের দ্বারাই সুসিদ্ধ হইয়াছে। প্রতীচ্যের অনেক স্বাধীন দেশেই

অগ্নিনিবারণী বৈদ্যুতিক যন্ত্র—

জলের দ্বারা আগুন নিবাইবার প্রথা এতদিন সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। ইহাতে অসুবিধা অনেক। তাই সম্প্রতি সুবিখ্যাত ওয়েষ্টিং হাউস্ এঞ্জিনীয়ারগণ কর্ত্তৃক একপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে ও হাঙ্গামায় অগ্নি-নিবারণ সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ক্যামেরা-হুডের মত ঘেরার অভ্যন্তরে যে বৈদ্যুতিক চক্ষু (eye) দৃষ্ট হইতেছে, উহা আলোর উপর প্রতিক্রিয়া করে। যখনই এই চক্ষু কোন অগ্নি সন্দর্শন করে, অমনি ইহার আবর্ত্তন নিরুদ্ধ হয় এবং উহা হইতে অগ্নি-নিবারক একপ্রকার প্রবাহ নির্গত হয়, যাহার অন্তহীন চেষ্টাই হয় কেবল অগ্নিশিখার সমতা-সাধন। এই প্রচেষ্টা ব্যাপক-ভাবে ফলবতী হইলে, দুনিয়ায় প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

বিষাক্ত গ্যাস প্রতিষেধক কৌশল

ইহার রীতিমত কসরত চলিতেছে। এখানে ছবিতে দেখান হইয়াছে, কেমন করিয়া রক্ষীরা আহত সৈন্যদিগকে এই বিষাক্ত গ্যাসের কবল হইতে রক্ষা করিতেছে।

প্রকৃতির শিল্পচাতুর্য্য

প্রকৃতির শিল্পচাতুর্য্য—

মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডই সুবিখ্যাত। সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বার্ণিনা মসিক প্রদেশে নিশার শিশির ও বরফের প্রীতি আলিঙ্গনে যে নয়নাভিরাম দৃশ্যের সৃজন হয়, তাহার একটি নমুনা ছবিতে দেখান হইয়াছে। শিশির-বিধৌত বরফের অপূর্ব্ব সমাবেশে ধাপের পর ধাপ সজ্জিত হইয়া যেন প্রকৃতির চরম শিল্প-নৈপুণ্যের নিখুঁত নির্দ্দেশ দিতেছে।

ঐতিহাসিক মাথার খুলি—

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ মিউজিয়মে রোমাঞ্চকর কাহিনী সম্বলিত একটি মস্তিষ্কের খুলি সংগৃহীত হইয়াছে। সেই খুলির প্লাসটারের প্রতিচ্ছবি এখানে দেওয়া হইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালীতে একৃজিলি নামক একজন ভীষণপ্রকৃতির মানুষ বাস করিত। এই লোকটির জীবন কেন্দ্র করিয়া সে সময়ে বহু রহস্য-সৃষ্টি হইয়াছিল। একৃজিলির কুবুদ্ধি ছিল অসাধারণ। সে সমসাময়িক কর্ত্তৃপক্ষের ও বহুলোকের চক্ষে ধূলি দিয়া অসৎ উপায়ে ও অবৈধ বাণিজ্যের দ্বারা বিপুল ধনোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। একবার ফ্রান্সে তার এই জুয়াচুরী ধরা পড়ে ও সে যাবজ্জীবনের জন্য কারাবাসে দণ্ডিত হয়। কিন্তু একৃজিলি

ঐতিহাসিক মাথার খুলি

অসাধারণ প্রতিভাবলে মুক্তি লাভ করে। বন্দীবাসের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে দ্রব্যগুণের প্রভাবে সে এমনি অসাড় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল যে, জেলকর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে মৃত বিবেচনায় কবরস্থ করে। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে সে দ্রব্যগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া কবরের বাহিরে আসে ও আর একটী প্রতিষেধকমূলক ঔষধ সেবন দ্বারা নিজেকে সতেজ করত: ইতালীতে পুনরাগমন করে। ইতালীতে একটি জঘন্য অপরাধের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠে একৃজিলির রোমাঞ্চকর জীবনের অবসান হয়। কয়েক বৎসর পরে তার কবর খনন করিয়া দৃষ্ট হয় যে একৃজিলির চর্ম্ম-মাংসহীন মাথার খুলি বেষ্টন করিয়া একটি বিষধর সর্পের কঙ্কালে বিসর্পিত আছে ও আঁখি গহ্বরের মধ্য দিয়া উক্ত সর্পের ফণা বিস্তৃত রহিয়াছে। মনুষ্যজীবনের এই পরকালের বিচিত্র রহস্য সত্যই দুর্ভেদ্য।

যবনিকা

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রদ্যোৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। অমলবাবুর বদলে টিউশনি করিতে করিতে নিজের জন্য কাজও খুঁজিতেছে। অমলবাবু শীঘ্রই সারিয়া ফিরিবেন, তাহার পর নিজের জীবিকানির্ব্বাহের একটা উপায় ত তাহাকে করিতে হইবে। আপাততঃ নব-জীবনের বড় বড় সমস্যা এই প্রাণধারণের স্থূল প্রয়োজনে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

এক এক সময়ে সে অবাক্ হইয়া ভাবে যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাহার আর যেন কোন প্রভেদ নাই। তাহাদের মতই দিন-যাপনের স্থূল চিন্তাতেই সে তন্ময় হইয়া আছে। তাহার বাহিরে কিছু ভাবিবার সময়ই তাহার কই? বিস্মৃতির যে প্রাচীর তাহার অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ভাবে দাঁড়াইয়া আছে তাহার কথা সব সময়ে তাহার স্মরণও থাকে না। তাহার পাশে তাহারই মত অভাবের দারিদ্র্যের ভ্রূকুটির তলে নিত্য যাহারা বাস করে তাহারাও অতীত একটা কিছু থাকিলেও স্মরণ করিবার সময় পায় কোথায়? সে হিসাবে তাহাদের সহিত প্রভেদ প্রদ্যোতের বুঝি নাই!

কিন্তু প্রভেদ একটু আছে বই কি! অমলবাবুর ছোট ভাই দুটির কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়! এক-দিনে তাহারা অমন করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে কে জানিত! অসহায় লতার মত তাহার ক্ষুধিত মন একটা অবলম্বনের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে, তাহার চারিপাশের শূন্য আকাশে সে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে একটা আশ্রয়ের জন্য! নিষ্ফল জানিয়াও এতটুকু কুটিও সে উপেক্ষা করিতে পারে না। অত সহজে তাই বুঝি ওই দুটি শিশু তাহার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সে মনে মনে জানে, তাহার এ আকুলতা নিষ্ফল। ভাগ্য তাহাকে দুর্ণিবার স্রোতে ভাসাইয়াছে, তীরের সহিত মিতালী করিয়া শিকড় গাঁথিবার চেষ্টা তাহার বৃথা। মাটির স্থির ধ্রুব আশ্রয় তাহার জন্য নহে, চারিটি শিশুহাতে কূলের মৃত্তিকা তাহাকে যত মধুর হাতছানি দিয়াই ডাকুক না কেন, নদীস্রোত তাহাকে দাঁড়াইবার অবসর দিবে না! তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ভাসিয়া যাইতে হইবে। প্রভেদ এইখানে, এই নিরাশ্রয়তায়!

অমলবাবুর দিন দশেকের ভিতর ফিরিবার কথা ছিল; তাহার ফিরিবার দিন তিনেক আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রদ্যোৎ একটা কাজ পাইয়া গেল। কাজ অবশ্য ছেলে পড়াইবারই, কিন্তু মাহিনা ভাল; আপাততঃ অন্নচিন্তাটা তাহার ঘুচিবে। মফঃস্বলের এক ধনী জমিদার তাঁহার ছেলেদের পড়াইবার জন্য একজন গৃহ শিক্ষক চান। অমলবাবুর বদলে যে ছাত্রদের সে পড়াইতেছে তাহাদেরই একজনের সুপারিশে কাজটা তাহার জুটিয়া গেল। দিন সাতেকের ভিতরই রওনা হইতে হইবে।

প্রদ্যোৎ ঠিক করিল, অমলবাবু ফিরিলেই তাঁহাকে তাঁহার কাজ বুঝাইয়া দিয়া সে চলিয়া যাইবে। যাওয়া সম্বন্ধে তাহার মনে কুণ্ঠার কিছু নাই। তাহার কাছে সমস্ত দেশই সমান।

কিন্তু অমলবাবুর হইল কি! দশ দিনের জায়গায় পনেরো দিনেও তিনি ফিরিলেন না। প্রদ্যোৎ এই পাঁচটা দিন কোনো রকমে আশায় আশায় অপেক্ষা করিয়াছে। অমলবাবু যে রকম অসুস্থ হইয়াছিলেন তাহাতে দশ দিনের জায়গায় কিছু বেশী সারিতে সময় লাগা বিচিত্র নয়। কিন্তু পনেরো দিনের পরও অমলবাবুকে আসিতে না দেখিয়া সে চিন্তিত হইল। তাহার নিজেরও আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। কাজ পাওয়া যে কত কঠিন এই কয়দিনে সে তাহা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তাহার অবহেলার একাজ ফস্কাইলে কি যে তাহার অবস্থা হইবে কিছুই বলা যায় না।

সে অমলবাবুকে জরুরী একটা চিঠি দিয়া সমস্ত বিষয় পরিস্কার করিয়া লিখিল এবং সেই সঙ্গে জানাইল যে অমলবাবু দু একদিনের ভিতর না ফিরিলে বাধ্য হইয়া তাঁহার টিউশনিগুলি ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। যদি অমলবাবু কোন কারণে এখনও আসিতে না পারেন, তাহা হইলে আর কাহাকেও বদলী দিবার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন।

প্রদ্যোতের কর্ম্মস্থলে যাইবার শেষ দিন আসিয়া পড়িল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তবু অমলবাবুর দেখা নাই। প্রদ্যোতের চিঠির উত্তরে একটা চিঠিও তিনি দেন নাই। প্রদ্যোৎ এবার একটু অপ্রসন্নই হইয়াছিল অমলবাবুর উপর। বিপদের সময়ে তাঁহার দরুণই যে সাহায্য প্রদ্যোৎ পাইয়াছিল তাহার জন্য সে কৃতজ্ঞ; সে কৃতজ্ঞতার ঋণ সে সামান্যভাবে শোধ করিবার চেষ্টাও করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে আর নিজের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া থাকিতে পারে না। অমলবাবু সেরূপ আশা করিয়া থাকিলে অন্যায়ই করিয়াছেন। তাহার চিঠির উত্তরে অন্ততঃ একটা চিঠি তাঁহার লেখা উচিত ছিল। এই দায়িত্বহীনতাকে প্রদ্যোৎ কোন রকমেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

মনে মনে অমলবাবুর উপর এইভাবে অপ্রসন্ন হইলেও, তাঁহার কাজ ফেলিয়া চলিয়া যাইতে কোথায় প্রদ্যোতের একটু বাধিতেছিল। তাঁহার অবহেলায় কাজগুলি গেলে অমলবাবুর সংসারের কি যে অবস্থা হইবে তাহা সে কল্পনা করিতে পর্য্যন্ত সাহস করে না। নিজেকে অবশ্য সে বুঝাইয়াছে, যে অমলবাবু যদি নিজের ক্ষতি ইচ্ছা করিয়া করেন, তাহা হইলে তাহার আর অকারণে মাথাব্যথা কেন! সে যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এখন নিজের কাজ রাখা না-রাখা অমলবাবুর হাতে। কিন্তু বুঝাইবার এত চেষ্টা সত্ত্বেও মনে একটা খোঁচ যেন থাকিয়া যায়। অকারণে কি রকম একটা অশান্তি বোধ হইতে থাকে।

তবু সারা সকালটা প্রদ্যোৎ যাইবার উদ্যোগ আয়োজনই করিল। ইহার মধ্যে আর একখানা চিঠি লিখিয়া সে অমলবাবুকে পাঠাইয়া দিয়াছে। অমলবাবুর পত্র না পাওয়ায় সে যে চিন্তিত এবং আর অপেক্ষা করিলে তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই যে তাহাকে যাইতে হইয়াছে, একথা জানাইয়া সে অমলবাবুর কাছে বিদায় চাহিয়াছে। কমল ও বিমলের কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন, তবু সে নীচে এক ছত্রে তাহাদের কথা না লিখিয়া পারে নাই।

চিঠি ফেলিয়া দিয়া আসিয়া, যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার সময়ে তাহার মনে নূতন এক খট্‌কা লাগিল, অমলবাবু নূতন করিয়া আবার অসুখে পড়েন নাই ত! সেইজন্য চিঠির উত্তর আসে নাই, এমনও ত হইতে পারে!

জোর করিয়া এ নূতন সন্দেহকে মন হইতে সে সরাইয়া দিবারই চেষ্টা করিল। এ সন্দেহ পোষণ করিয়া যাইবার আয়োজন করিতে তাহার হাত যেন উঠিতে চায় না। কিন্তু এ তাহার নিশ্চয়ই অমূলক ভয়, অমলবাবু নিশ্চয়ই ভালো আছেন। সে জন্য ভাবিবার তাহার প্রয়োজন নাই। আর ভাবিয়াই বা সে কি করিবে? অমলবাবু যদি আবার অসুস্থই হইয়া পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার জন্য সে নিজের ক্ষতি তো এখন করিতে পারে না। তাহাকে চলিতেই হইবে।

জিনিষপত্র গুছাইয়া বোর্ডিং-এর বিল সে চুকাইয়া দিতে গেল। ম্যানেজারবাবু ইতিমধ্যে তাহার যাত্রার উদ্দেশ্য, গন্তব্য স্থান ইত্যাদি খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার স্বভাবই তাই। তিনি প্রায়ই গর্ব্ব করিয়া বেড়ান, যে বোর্ডিং হইলে কি হয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে গৃহের অভাব কাহাকেও বোধ করিতে হয় না। বোর্ডারদের শুধু পয়সা নয়, তাহাদের সুখ দুঃখের ভাগও তিনি লইয়া থাকেন। শুধু ব্যবসার সম্পর্ক সকলের সহিত রাখিতে পারেন না বলিয়া কি ভাবে তিনি কতবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সে কথাও তিনি সবিস্তারে বলিতে ছাড়েন না। তাঁহার এই ব্যবসায় অতিরিক্ত সম্পর্ক পাতাইবার চেষ্টায় ইতিপূর্ব্বে প্রদ্যোৎকেও বিব্রত হইতে হইয়াছে অনেকবার।

আজ প্রদ্যোতের দেওয়া টাকাগুলি একবার টেবিলে, একবার পেপার-ওয়েটের উপর ও তাহার পর আর একবার মেঝেতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া বাজাইয়া লইয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন—"চল্‌লেন তা'হলে আজই!"

রসিদটা লইয়া প্রদ্যোৎ সরিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে। এ কথার সে উত্তর দিল না।

ম্যানেজারবাবুর কিন্তু অত শীঘ্র রসিদ দিবার কোন তাড়া নাই। ড্রয়ার খুলিয়া আর একবার টাকাগুলির দুপিঠ উল্টাইয়া যাচাই করিয়া লইয়া একটি ক্যাশ-বাক্সে রাখিতে রাখিতে তিনি বলিলেন—"কি বল্‌ব মশাই! এতকাল ধরে' বোর্ডিং চালাচ্ছি—জানেন ত আমাদের এটা হচ্ছে ওল্ডেষ্ট বোর্ডিং হাউস্! ওল্ডেষ্ট এ্যাণ্ড বেষ্ট—কলকাতায় যখন ঘোড়ার ট্রাম চল্‌ত তখন থেকে আমাদের বোর্ডিং হাউস্ চলছে—তখন অবশ্য আমি ছিলাম না—আমার মামা ছিল ম্যানেজার—আসলে মামাই এটা ষ্টার্ট করে কি না! তারপর, মামার ছেলে-পুলে নেই—ডায়াবিটিসের ব্যামো বলে ভালো করে' দেখতে শুনতেও পারে না—আমিও তখন পাশ করে' বসে বসে আছি কর্ম্মের অভাবে—আর কাজকর্ম্ম বল্‌তে ত চাকরী—সে মশাই আমি তখনই ঠিক করেছিলাম করব না বলে। চাকরী আমাদের তিনপুরুষে কেউ করে নি। আমাদের বংশে—"

ঘোড়ার ট্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া পারিবারিক ইতিহাসের কোন মহামূল্য পৃষ্ঠায় ম্যানেজারবাবু যে তাঁহার বক্তৃতাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ প্রদ্যোতের অস্থিরতাটা বোধহয় তাঁহার চোখে পড়িল, এবং তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়া ধনুকের ছিলার মত পূর্ব্বের স্থানে ফিরিয়া গিয়া তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম এতকাল ধরে' বোর্ডিং চালাচ্ছি মশাই, কিন্তু এখনও মনটা শক্ত করতে পার্‌লাম না। দু দিনের জন্যে কেউ এলেও মায়া পড়ে যায়—ছেড়ে যাওয়ার সময় মনে হয় যেন কতদিনের আত্মীয় চলে' যাচ্ছে। মনকে বলি, তোর অত কেন রে বাপু! তুই বোর্ডিং চালাস্, খেতে দিবি, থাকতে দিবি, পয়সা নিবি—ব্যাস্ ফুরিয়ে গেল! কে এল, কে গেল তাতে তোর কি! বোর্ডিং ত বোর্ডিং, মায়া করে' এ দুনিয়াতেই কি কিছু লাভ আছে—ধরে রাখতে পারিস্ কাউকে! তাই আমাদের দাদাঠাকুর বল্‌ত না? দাদাঠাকুরকে আপনারা দেখেন নি—ওই আপনাদের ঘরেই থাক্‌ত, সন্ন্যাসী মানুষ—কোন ঝঞ্ঝাট নেই—ভারী ভালো লোক ছিল! সেই বল্‌ত—বোর্ডিং নয় রে, বেটা বোর্ডিং নয়—ভালো করে' চেয়ে দেখ, ম্যানেজারী করেই উদ্ধার হয়ে যাবি! কোথা থেকে এসে খাতায় নাম লেখাচ্ছে—আর নাম কাটিয়ে কোথা চলে যাচ্ছে মেয়াদ ফুরুলে! ভাব দেখি ব্যাপারখানা! —কিন্তু বল্লে কি হবে;—মায়া কি যায়! কেউ যেতে চাইলেই মনটা কেমন করতে থাকে!"

এ অনুভূতির মর্ম্ম খানিকটা বুঝিতে পারিয়া প্রদ্যোৎ বলিল—"আমার রসিদটা না হয় পরে দেবেন!"

"না, না, এই যে দিচ্ছি, নিয়েই যান না" বলিয়া ম্যানেজার মহাশয় রসিদের খাতা বাহির করিলেন এবং কলমটা দোয়াতে ডুবাইয়া রাখিয়া হতাশভাবে বলিলেন—"আবার কখনো দেখা হবে কিনা ভগবান জানেন! কিন্তু এই কথা রইল, যদি কখন এইদিকে আসেন, পায়ের ধুলো দিতে ভুল্‌বেন না যেন।"

কলমটা দোয়াত হইতে উঠাইয়া রসিদের খাতার উপর লিখিতে গিয়া হঠাৎ আবার তিনি বলিলেন—"এবার যখন ফিরবেন তখন কি আর এ রকম হোটেল আপনার রুচ্‌বে মশায়—তখন আপনার ভোলই যাবে বদলে।"

বিরক্তি সঙ্গেও হঠাৎ তাহার সম্বন্ধে ম্যানেজার মশাই'এর এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী প্রদ্যোৎ একটু বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারিল না।

ম্যানেজারবাবু বলিলেন—"আমিত আগেই বলেছি মশাই, এবার আপনার একটা হিল্লে হয়ে গেল! ছেলে পড়ান হলে কি হয় বড় ভাল কাজ বাগিয়েছেন। ওখানে ছুঁচ হয়ে ঢুকে একেবারে ফাল হয়ে বেরুতে পারবেন। আর আমার নিজের চক্ষেই যে দেখা—আমাদেরই এক জ্ঞাত্‌-ভাই কোন পাঠশালা না কোথায় মাষ্টারী করে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেতো না পেট ভরে'। তারপর এমনি একটা পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে জমিদারের ছেলেকে পড়াবার মাষ্টারী পেয়ে গেল। সবাই মানা করেছিল যেতে, বলেছিল কি হবে গিয়ে সেই বন-দেশে। কিন্তু মানা শোনেনি বলেই না আজ কলকেতার দু'খানা বাড়ী তুলে দুখানা মোটর হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে। মাষ্টারী থেকে সেরেস্তায় ভালো চাকরী, তারপর একখানা তালুকের নায়েবী, তারপর সমস্ত ষ্টেটের ম্যানেজার, এত আমাদের চোখের ওপর হল বছর কয়েকের ভেতর! পাঁচ বছরে ফুলে লাল হয়ে গেল!"

ম্যানেজারবাবু হঠাৎ চোখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"অবশ্য ভেতরে ব্যাপার আছে মশাই! বড় বড় ঘরের নোংরা ব্যাপার আমাদের বল্‌তেও বাধে..."

প্রদ্যোতের মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া তিনি সেই উপাদেয় অবর্ণনীয় ব্যাপার বলার লোভ সম্বরণ করিলেন। বলিলেন—"এই যে দিই আপনার রসিদ লিখে! আপনার তেমন তাড়াতাড়ি ত নেই। সেই একটার ত গাড়ী?"

প্রদ্যোৎ এতক্ষণ ম্যানেজারবাবুর অর্দ্ধেক কথাই শোনে নাই। নিজের মনে সে অন্য একটা কথা গভীর ভাবে ভাবিতেছিল। ম্যানেজারবাবুর প্রশ্নে হঠাৎ সচেতন হইয়া সে বলিল—"না, আমি এখুনি বেরুব।"

"এখুনি বেরুবেন! এখন ত মোটে দশটা! এই না একটায় গাড়ী বল্লেন?"

প্রদ্যোৎ সংক্ষেপে বলিল—"আমি এখন অন্য জায়গায় যাচ্ছি। কাজের জায়গায় আজ যাব না।"

"আজ যাবেন না!" ম্যানেজারবাবু রসিদটা তখন লিখিয়া ফেলিয়াছেন। সেদিকে হতাশভাবে তাকাইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন—"আমায় আগে তা বল্‌তে হয়!"

"তাতে আর কি হয়েছে! আপনার প্রাপ্য ত চুকে গেল! কাল সকালে এসে জিনিষপত্রগুলো শুধু নিয়ে যাব।"

ম্যানেজারবাবুর মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—"জিনিষপত্র গুলো ত থাকবে! একটা দিন আমার ঘরও থাকবে জোড়া হয়ে!"

প্রদ্যোৎ বিরক্তি দমন করিয়া বলিল—"সে একটা দিনের ভাড়া না হয় কেটে নিন্‌।"

ম্যানেজারবাবু তথাপি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন "তা বল্‌ছেন যখন না হয় নিচ্ছি। কিন্তু রসিদের একটা পাতা ত নষ্ট হ'ল।"

কাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে আরও দুইদিন সময় চাহিয়া ভাবী মনিবের কাছে একটা চিঠি লিখিয়া প্রদ্যোৎ দারবাক রওনা হইল। ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া ইহাই সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া চলিয়া যাওয়া যে তাহার পক্ষে মোটেই অন্যায় নহে, মনকে নানাভাবে একথা বুঝাইয়াও সে ইতিপূর্ব্বে স্বস্তি পাইতেছিল না। তাহার নবজাগ্রত জীবনে এই প্রথম

দ্বন্দ্ব, প্রথম কর্ত্তব্যের সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রথম পরীক্ষাতেই সে কি হার মানিবে? অমলবাবু সত্যই তাহার কেহ নয়, কোন কর্ত্তব্যই তাহার এক্ষেত্রে নাই, একথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া তাহার চলে না। আত্মীয়তার গূঢ়তম অর্থেও অমলবাবুকে সে বাদ দিতে বুঝি পারে না। নূতন জীবনে তাঁহারাই ত তাহার প্রথম আত্মীয়। তাঁহাদের সহিতই তাহার মনের প্রথম স্নেহের গ্রন্থী পড়িয়াছে। নিজের কাজের ক্ষতি হয় হোক, অমলবাবুর খবর একবার নিজে তাহাকে গিয়া লইয়া আসিতেই হইবে। সে বুঝিয়াছে, যে নূতন জীবনের প্রারম্ভে এই খুঁতটুকু রাখিয়া গেলে কোনমতেই সে শান্তি পাইবে না। আর ক্ষতি তাহার সত্যই কিছু নাও হইতে পারে। দুদিনের বিলম্বে হয়ত এমন কিছু আসিয়া যাইবে না।

গ্রামের পথ এবার তাহার চেনা। অমলবাবুদের বাড়ী পৌঁছাইতে বিলম্ব হইল না। পথে যাইতে যাইতে বিমল কমলের সহিত তাহার আগের বারের বিদায়ের কথা মনে হইতেছিল। সত্যই আবার এ গ্রামে তাহাকে ফিরিতে হইবে, একথা সে ভাবে নাই।

মেঘলা আকাশ গ্রামের উপর নত হইয়া আছে। সেই বিষণ্ণ আলোয় ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভরা গ্রাম যেন আরো পরিত্যক্ত, আরো জনহীন বলিয়া মনে হয়। যে পুকুরের ধারে বিমলের সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সেখানে আসিয়া প্রদ্যোৎ উৎসুক ভাবে একবার জলের দিকে না চাহিয়া পারিল না। যেন বিমলকে আজও সেখানে দেখা যাইতে পারে। বিমল অবশ্য সেখানে নাই। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াও দুই ভায়ের কাহাকেও প্রদ্যোৎ দেখিতে পাইল না। সম্ভবতঃ তাহারা অন্য দিকে কোথাও গিয়াছে। সুশীল সুবোধ বালকের মত তাহারা যে এই মেঘলা দুপুরে ঘরে বন্ধ হইয়া আছে, একথা প্রদ্যোৎ বিশ্বাস করিতে পারে না।

অমলবাবুদের বাড়ীর দরজা বন্ধ। প্রদ্যোৎ বাহির হইতে শিকলি নাড়িয়া, অমলবাবুর নাম ধরিয়া কয়েকবার ডাকিল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

দরজার শিকলি আরো জোরে নাড়িয়া, গলাটা আর একটু চড়াইয়া দেওয়ার পর ভিতরে পদশব্দ পাওয়া গেল। কে যেন দরজা খুলিতে আসিতেছে।

প্রদ্যোৎ নিজের মনে একটু হাসিয়া বলিল—"কে বিমল নাকি?"

কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর নাই। দরজাটা তাহার পর খুলিয়া গেল বটে; কিন্তু যে খুলিয়াছে তাহাকে দেখা গেল না। দরজার পাশে সে নিজেকে গোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

একটু বিস্মিত হইয়া প্রদ্যোৎ জিজ্ঞাসা করিল—"অমল বাবু বাড়ী আছেন ত?"

এবারও খানিকক্ষণ কোন উত্তর নাই। অমলবাবুর ভগিনীদের মধ্যে কেহ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছে বুঝিয়া, প্রদ্যোৎ নিজের পরিচয় স্বরূপ বলিল—"আমি অমলবাবুর বন্ধু, কলকাতা থেকে আস্‌ছি। এর আগে আর একদিন এসেছিলাম।"

এবার দরজার ধার হইতে মৃদুকণ্ঠে শোনা গেল—"আপনি একটু দাঁড়ান।"

অমলবাবুর ছোট বোনই দরজা খুলিতে আসিয়াছিল। উঠান পার হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিতভাবে বড় চালার দিকে যাইতে দেখা গেল।

প্রদ্যোতের সমস্ত ব্যাপারটা কেমন একটু অদ্ভুত লাগিতেছিল। অমলবাবুর অসুখ কি তাহা হইলে আরও বাড়িয়াছে; না তিনি কোনও কাজে কোথাও গিয়াছেন! বিমল কমলকে এ সময়ে পাইলে অনেকটা যেন সুবিধা হইত। কিন্তু তাহাদেরও দেখা ত নাই।

মেয়েটি কেন যে তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া চলিয়া গেল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রদ্যোৎ একটু বিমূঢ় হইয়া রহিল। বাড়ীটা অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ। ঠিক দ্বিপ্রহরের গ্রামের স্তব্ধতা এ নয়, ইহার পিছনে কিসের যেন একটা দুর্জ্ঞেয় অস্বস্তিকর উপস্থিতি আছে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে প্রদ্যোৎ ক্রমশঃই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। ভিতরে কোন সাড়া শব্দ নাই। মেয়েটি বাড়ীর ভিতর যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। প্রদ্যোতের মনে হইল, অমলবাবু বাড়ী থাকিলে

তাহাকে ভিতরে লইয়া যাইবার এত বিলম্ব হইবার ত কারণ নাই। অমলবাবু যে ভিতরে নাই, এমন কথাও কিন্তু ভাবা যায় না। মেয়েটি তাহা হইলে সেই কথা আগেই জানাইতে পারিত।

সংশয়-দোলায় কিন্তু আর তাহাকে দুলিতে হইল না। নিস্তব্ধ বাড়ীটা হঠাৎ যেন ঘনছায়াচ্ছন্ন আকাশের তলায় কাৎরাইয়া উঠিল। অমলবাবুর মা স্খলিতপদে দাওয়া হইতে নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আর্ত্তনাদের শব্দ প্রদ্যোৎকে একমুহূর্ত্তে বিস্ময় বেদনায় স্তব্ধ বিমূঢ় করিয়া দিল। এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা তাহার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এখনও তাহার সমস্ত মন দিয়া এ কথায় বিশ্বাস করিতে সে যেন পারিতেছে না। কিন্তু বৃদ্ধা অমলবাবুর মার আর্ত্তনাদের ভিতর সন্দেহের অবসর আর যে নাই। প্রদ্যোৎ যেন আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, সেইখান হইতেই সে পলাইয়া যায়। এই শোকবিহ্বল অসহায় পরিবারটির সম্মুখীন হইতে সে পারিবে না। কিন্তু পালাইবার আর উপায় নাই। বৃদ্ধা দূর হইতে চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছিলেন—"আমার নেবুকে দেখতে কে এসেছে গো! ওগো দেখে যাও!"

মার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কমল ও বিমল ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাদেরও চোখে অশ্রু, কিন্তু সেই অশ্রু-কাতর মুখের উপরেই রাঙাদাকে দেখিতে পাওয়ায় যে আনন্দ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহা দেখিয়া হঠাৎ প্রদ্যোতের বুকের ভিতর পর্য্যন্ত যেন মোচড় দিয়া উঠিল। এত অহৈতুক ভালবাসা পাইবার সৌভাগ্য যে সহ্য করা যায় না। সমস্ত মন যে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতিতে আড়ষ্ট হইয়া থাকে। তাহার চোখে ত জল আসিবার কথা নয়। তবু কমল ও বিমলের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া সে অশ্রু গোপন করিল।

কমল অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—"দাদা মরে গেছে, রাঙা-দা!"

বিমল ধমক দিয়া বলিল—"ধাঃ, বল্‌তে নেই ও কথা। দাদা স্বর্গে গেছে, না রাঙা-দা!"

(ক্রমশঃ)

সন্ধ্যায়

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রবির আলো, ঐ মিলালো, আঁধার এলো সঞ্চারি'।
বিহগ ছোটে নীড়ের পানে,
মুখরি' শত বিদায়-গানে,
উতল-হাওয়া বনের বুকে বাজায় পাতার খঞ্জরী।

নীলের গায়ে বিভোর চাহে তারকা-বঁধু উল্লাসে।
চোখের পাতা কাঁপন ভরা,
নদীর বুকে দেয় সে ধরা
তৃণের মাঝে লুকিয়ে দেহ—ঝিল্লী ওঠে গুঞ্জরি'।

বাতাস লাগি', উঠিলো জাগি' সরম-রাঙা মল্লিকা।
হাস্নুহানার কাঁপায়ে হিয়া,
বাতাস গাহে 'জাগো পিয়া'
পাগল প্রাণে প্রলাপ গাহে দাঁড়ায়ে পাশে চঞ্চরী'।

নীলিমা-ভাতি', উদিলো বিধু সিঁদুর-সম-রক্তিম।
সরম ভরে জোছনা ধারা—
ঝরিয়া পড়ে, বাঁধন-হারা,
গোলাপ-সম গরবে ফোটে,—হৃদয়ে প্রেম-মঞ্জরী।

আততায়ীর কবলে মিঃ বার্জ—

বিগত ২রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে মেদিনীপুরের জেলা মেজিষ্ট্রেট মিঃ বি, ই, জে বার্জ অপ্রত্যাশিতভাবে আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। মেদিনীপুরের পুলিশ ক্লাব ফুটবল গ্রাউণ্ডে টাউন ক্লাব ও মেহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যেকার একটি ফুটবল খেলার

মিঃ বার্জ

প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য যেমন তিনি মটর হইতে অবতরণ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন অমনি তিনটি তরুণ তাঁর প্রতি গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে। মিঃ বার্জের শরীরে কয়েক জায়গায় গুলির আঘাত লাগে এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন।

এই মেদিনীপুরেই মিঃ বার্জের পূর্ব্বে গত বৎসর ও তৎপূর্ব্ব বৎসর মিঃ ডগলাস ও মিঃ পেডি বৈপ্লবিকের গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন। নিরপরাধ ব্যক্তিকে এই প্রকারের কাপুরুষোচিত নৃসংশভাবে হত্যা করায় সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই মনে দারুণ ব্যথার সৃষ্টি করিয়াছে। দেশের অগ্রগতির পথও ইহাতে প্রতিহত হয়। বিভ্রান্তচিত্ত তরুণের নিঃসঙ্কোচ এই নৃসংশতার মনস্তত্ত্ব যাহাই হউক, ইহা যে অহিংস ভারতের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তাহাতে সংশয় নাই। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে এ পরিপন্থী মনোবৃত্তি কেমন করিয়া সংক্রামিত হইল তাহার মূলান্বেষণ করা উচিত।

১৮৯৫ সালে মিঃ বার্জ জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯২১ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিসে যোগদান করেন ও ঐ বৎসরই ভারতে আসেন। ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত তিনি সেটলমেণ্ট অফিসার ছিলেন এবং ১৯৩২ সালের প্রথমই মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট ও কালেকটর হইয়া আসেন। তাঁর দীর্ঘ এক যুগের চাকুরীর মেয়াদ বাংলায়ই কাটে। তিনি ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলাতে বেশ দক্ষ ছিলেন। মিঃ বার্জের উৎসাহে মেদিনীপুরে খেলার উৎসব বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। মিঃ বার্জের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সময়ে তাঁর স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। মিঃ বার্জের শোকসন্তপ্ত পরিবার ও তাঁর আত্মার আমরা শান্তি কামনা করি।

পরলোকে আনি বেশান্ত—

বিগত ৬ঠা আশ্বিন বুধবার বেলা ৪ ঘটিকায় মাদ্রাজ আদিয়ার আশ্রমে ভারত মাতার একনিষ্ঠ সেবিকা শ্রীযুক্তা বেশান্ত সাধোনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল পঞ্চাশীতিবর্ষ। ডাক্তার বেশান্তের সুদীর্ঘ গৌরবময় কর্ম্মবহুল জীবনাবসানে সারা ভারতের নরনারীর মর্ম্ম নিঙাড়িয়া ব্যথার অশ্রু ধরিত্রীর বুক সিক্ত করিয়াছে। বিদেশিনী বিজাতীয়া, বিভিন্নকৃষ্টি-পুষ্টা এই শ্বেতাঙ্গীর জন্য কিসের ব্যথা, কেন এই শ্রদ্ধাঞ্জলী, ভারতের গৃহে গৃহে মর্ম্মন্তুদ বেদনাময় ঐ বিয়োগ-

কাতরতা? সনাতন ভারত বিশ্বাস করে আত্মার জন্মান্তরবাদে। তাই যেদিন সুদূর সাগরপার হইতে তরুণী এই আইরিশ মহিলা ভারতের মাটি স্পর্শ করিয়াই বিলুপ্ত স্মৃতির অন্তরালের কোন আকুল অজানা টানে দেশমাতৃকার পুঞ্জীভূত বেদনা-ভারে ব্যথিত হইয়া নিঃশেষ নিজেকে উৎসর্গ করিলেন, সেদিন জননী নিঃসঙ্কোচে নিঃসম্পর্কীয়া দুহিতাকে ফিরিয়া-পাওয়া হারাণ নিধির মতই আপনার স্নেহার্দ্র বক্ষপুটে ধারণ করিলেন। জাতি-বর্ণ-রক্তের কোন বিচার এখানে নাই, ভারতকে যে 'মা' বলিয়া ডাকে

ডাঃ আনি বেশান্ত

সেই ভারতের নব জাতীয়তার একজন। ভারতমায়ের এই মহীয়সী ধর্ম্ম-কন্যা তাঁর বৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ উৎসর্গীকৃত জীবনের বহু কল্যাণকর কর্ম্মের মাঝে সন্তান-ধর্ম্মের পরিপূর্ণ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া তো অনেক প্রতীচ্যবাসীই ভারতে দীর্ঘ জীবন-যাপন করিয়াছেন বা করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ ও ডাক্তার বেশান্তের মত আর কেহই ছোট বড় নির্ব্বিশেষে দেশবাসীর হৃদয়াধিকার করিতে পারেন নাই। ভারতের কল্যাণকল্পে তিনি তিলে তিলে বছরের পর বছর যে আত্মদান করিয়া আসিতেছিলেন, মরণে সে দেওয়ার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়িয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম-সভ্যতা-কৃষ্টি, আশা আকাঙ্ক্ষা, সম্পদ্-বিপদ্, শিক্ষা-সাধনায় তিনি সর্ব্বোতোভাবে নিজেকে একীভূত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র-সমাজ-শিক্ষায়তন প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই অসাধারণ মহিলার পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। কেমন করিয়া এই বিদুষী বিদেশিনীর জীবন ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত হইল, তাহার পশ্চাতে একটি তত্ত্বপূর্ণ কাহিনী আছে।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে শ্রীযুক্তা বেশান্ত লণ্ডন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল উইলিয়ম পেজউড্। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে শ্রীযুক্তা বেশান্ত শিক্ষালাভ করেন। অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভার বলে তিনি অল্প বয়সেই সবিশেষ জ্ঞানার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁর প্রগাঢ় ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্ম্মানুরাগ ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক বেশান্ত নামক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯ বৎসর। বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শৈশবেই কন্যাটি মারা যায়। মিসেস বেশান্তের স্নেহ-কাতর হৃদয়ের শত ব্যাকুল প্রার্থনা ব্যর্থ হইল। তিনি ভগবানের কারুণ্যে সন্দিহান হইলেন। তিনি যুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন না, কোন পাপে নিরপরাধ শিশুর এ অকাল মৃত্যু! খৃষ্টান জগতের নীতি-বুদ্ধি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। তিনি ক্রমশঃ ধর্ম্মে ও ঈশ্বরের অস্তিত্বেই অবিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন। জীবনের সত্য উপলব্ধি ব্যত্যয় ঘটাইতে তাঁহার মনুষ্যত্বে বাধিল। বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-সূত্র ছিন্ন করিলেন। সত্যানুসরণের পথেই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতের বিখ্যাত নাস্তিক ব্রাড্‌ল সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া সাধারণ-তন্ত্র ও নাস্তিকতার প্রচারে রত হন। এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডে বাগ্মিতার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ম্যাডাম ব্লাভাস্কি রচিত "সিক্রেট্ ডকট্রিন" (Secret docrine) গ্রন্থপাঠে শ্রীযুক্তা বেশান্তের নাস্তিক্য মনোভাব বিদূরিত হইতে আরম্ভ করে ও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান পূর্ব্বক উক্ত সমিতির

ভাব ও আদর্শ প্রচারে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বেশান্ত সর্ব্বপ্রথমে ভারতে পদার্পণ করেন। ভারতের মাটি-জল-হাওয়ার সঙ্গে তিনি মুহূর্ত্তে পরিচয় লাভ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে তিনি তাঁর জিজ্ঞাসু মনের অনুকূল খোরাক পাইলেন এবং হিন্দুত্বের পুনরুত্থান ও মানুষ-গড়ার প্রেরণায় তদবধি জীবনের সবখানি ঢালিয়া দেন। ভারতের রাজনৈতিক অধিকার ও শিক্ষার জন্য মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ডাঃ বেশান্ত অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতে হোমরুল আন্দোলনের জন্মদাত্রী ও থিওসোফিক্যাল সমিতির কর্ণধারিকা। কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ ডাঃ বেশান্তের হিন্দুধর্ম্ম ও জাতীয়তার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের সমুজ্জল নিদর্শন। কংগ্রেসের সহিত তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ভারতের ইতিহাসে চিরদিন শ্রদ্ধার্ঘ্য পাইবে। ডাঃ বেশান্তের ব্যক্তিত্বও ছিল যেমন অসাধারণ, তেমনি ছিল তাঁর বিচিত্র কর্ম্ম-তৎপরতা ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা। তিনি একাধারে ছিলেন সুবক্ত্রী, সংবাদপত্রসেবিকা ও পরিচালিকা, লেখিকা, রাজনীতিকুশলা, ধর্ম্মপ্রাণা এবং চিরগতিশীলা ভ্রমণকারিণী। ত্যাগ-তপস্যার মূর্ত্তি শ্রীযুক্তা বেশান্ত দানে মুক্তহস্ত ছিলেন, ভবিষ্যতের জন্য কখন সঞ্চয় করিতেন না। তিনি মৃত্যুর সময়ে উইল করিয়া ভৃত্যদিগকে যাবজ্জীবন অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এই ভারতেই আবার নবকলেবর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি তাঁর অসমাপ্ত জীবন-মিশন সিদ্ধ করিবেন বলিয়া হিন্দুভারত বিশ্বাস করেন।

বিঠলভাই প্যাটেলের মহাপ্রয়াণ—

সুদূর প্রবাসে জেনেভা নগরীতে বর্ষীয়ান রাষ্ট্রনেতা শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল ২২শে অক্টোবর অপরাহ্নে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন।

ভারতের ভাগ্য আজ ঘন তমিস্রাচ্ছন্ন। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্র দুর্ভাগা দেশবাসীর রুদ্ধশ্বাসে হাহাকারপ্রপীড়িত, শঙ্কিত। বহিঃশাসনের নিষ্ঠুর দণ্ড সহস্রফণা বিস্তার করিয়া যেন বিষোদ্গিরণ করিতেছে। কংগ্রেস বিলুপ্তপ্রায়। সকল আন্দোলন গতিহীন। স্বাধীনতাকামী প্রতিষ্ঠানগুলি নানা কারণে ছিন্নভিন্ন। মহাত্মার আজীবন সাধনার সাফল্য-বিগ্রহ সাধের সবরমতী আশ্রমে বিভীষিকাময়ী শ্মশানদৃশ্য জাতির মর্ম্মন্তুদ প্রাণের নিবিড় ব্যথার কাহিনীই নীরবে বহন করিতেছে। চরকা আর ঘুরে না। মনীষার কণ্ঠ নিরুদ্ধবাক্! রুদ্ধ কারার অন্তরালে দেশসেবকেরা দুঃস্বপ্নঘোরে নৈরাশ্যমগ্ন। দেশবাসী তন্দ্রালস্যে অচেতন। সংবাদপত্রসেবীরা আইনের বেড়াজালে বদ্ধহস্তপদ!
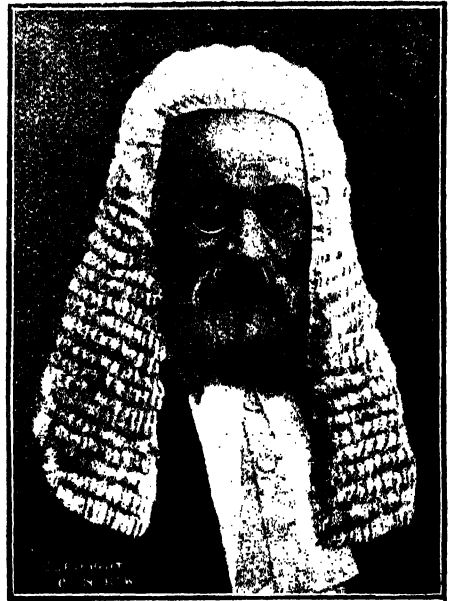
৺বিঠলভাই প্যাটেল

স্তব্ধ লেখনী! স্তিমিত সকল প্রাণচঞ্চলতা! বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশে ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশ যেন ঘনঘটাচ্ছন্ন। প্রতিকূল ঘটনাপুঞ্জ অন্ধকারের পর অন্ধকারেরই প্রলেপ দিয়া চলিয়াছে। দেশপ্রিয় জীবনের মধ্যাহ্নমুহূর্ত্তে সহসা অস্তমিত হইলেন। ভারতের অকপট কল্যাণকামী ডাঃ বেশান্তের তিরোধানে একটি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটিল। বৃদ্ধ হইলেও যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্য্য লইয়া বিঠলভাই প্যাটেল জাতির সম্মুখে নৈরাশ্যের গভীর আঁধারের মাঝেও যে আশার আলোক জ্বালিয়া পথের ইঙ্গিত দিতেছিলেন, তাহাও আজ নির্ম্মম মৃত্যুর ঝটিকাবর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইল। তাই দেশ জুড়িয়া আজ

এ শোক-বিহ্বলতা! দেশের কাণে আশার বাণী শুনাইবার লোক যে একে একে অপসারিত হইতেছে! কে জানে প্রাকৃতিক এই বিপর্য্যয় ও ভ্রূকুটীর মাঝে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার কি শুভ ইচ্ছা নিহিত আছে!

আশার গান গাহিবার ক্ষণ এখনও অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু নিছক বস্তুতান্ত্রিকতা কি ব্যক্তিগত, কি জাতীয়জীবনের সবখানি নয়। বাহ্য-বস্তুর পশ্চাতে যে ভাবদ্যোতনা বা ইচ্ছাশক্তি অলক্ষ্যে লীলায়িত, সনাতন ভারতের নিকট তাহাই একান্ত সত্য। খাঁটি স্বদেশপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশকর্ম্মীর যে বিপুল ত্যাগ-তপস্যা, দুঃখে বিপদে যে অতুল সহিষ্ণুতা তাহা বিফল হইবার নয়। আসন্ন মরণমুহূর্ত্তেও তাই বিঠলভাইয়ের কণ্ঠ চিরিয়া অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইতে দেখি তাঁর হৃদয়ের চির-ঈপ্সিত নিগূঢ় বাণী—"মৃত্যুর পূর্ব্বেও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।" এই আন্তরিক ইচ্ছাবীর্য্যের বস্তুতন্ত্র অভিব্যক্তি অনিবার্য্য, মরণেও ইহা নিঃশেষ হইবার নহে।

বিঠলভাই প্যাটেলের বিচিত্র কর্ম্মময় জীবন। আঘাতের পর আঘাত সহিয়াই জীবনের পথে তিনি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গুজরাটের এক নির্জ্জন পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার-কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জাভেরভাই প্যাটেল। কংগ্রেসসভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও বিঠলভাই প্যাটেল দুই ভাই ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুবিদিত। দুই ভাই-ই ছিলেন ব্যারিষ্টার এবং উভয়েরই আইন-বিচক্ষণতা ছিল অসাধারণ। মণ্টেগু-শাসন-সংস্কারের পূর্ব্ব হইতেই জ্যেষ্ঠ বিঠল বোম্বাই কর্পোরেশনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ১৯২৩।২৫ সালে তিনি বোম্বাই কর্পোরেশনের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৮ সালে মণ্টেগু-শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব আলোচনা করার জন্য বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তিনি উক্ত অধিবেশনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯১৯ সালে শাসন-সংস্কারের প্রতিবাদার্থ কংগ্রেসের যে প্রতিনিধিমণ্ডলী বিলাতে যায়, তিনি তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রথমে তিনি মহাত্মার প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন, পরে ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু দাশ কর্ত্তৃক স্বরাজ্যদল গঠিত হইলে তিনি বোম্বাই সহর হইতে স্বরাজীসদস্যরূপে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়া পরিষদের স্বরাজ্যদলের ডেপুটী লিডার হন। ১৯২৫ সালে তিনি স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতেই নির্ব্বাচিত সদস্যগণের অধিকাংশ ভোটে পরিষদের সভাপতির পদে বৃত হন। নিয়মানুবর্ত্তিতা তাঁর স্বভাবের সহজধর্ম্ম ছিল। তাই সেই সময় হইতেই তিনি সকল দলের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যান। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কারস্বরূপ ১৯২৭ সালে দ্বিতীয় বার তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি পার্ল্যামেণ্টের রীতি পদ্ধতি সবিশেষ জানিবার জন্য বিলাত গমন করেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠা এমনি ছিল যে তিনি সভাপতিরূপে যে বেতন পাইতেন, তাহার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দেশসেবার কার্য্যে ব্যয় করিতেন। পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি যে কার্য্যদক্ষতা ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভারতের রাষ্ট্রেতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে। তিনি যদি ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ম্যাক্‌ডোনাল্ড-রুজভেল্টের মত রাষ্ট্রপ্রতিভা দেখাইয়া জগদ্বিখ্যাত হইতে পারিতেন। পরাধীন দেশে আমলাতন্ত্রের চাপে পড়িয়াও স্বীয় মেধা ও প্রতিভার বলে তিনি কোনদিন দমেন নাই বা বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁর হিমাদ্রির মত উন্নতশির কোন দিন কোন ঘটনায় নতি স্বীকার করে নাই। বিঠলভাই প্যাটেলের নিরপেক্ষ গাম্ভীর্য্যের নিকট অতি বড় শত্রুরও মস্তক শ্রদ্ধাবনমিত হইয়া পড়িত।

বিঠলভাই প্যাটেলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই, যে পুষ্পের কমনীয়তা পাথরের দৃঢ়তায় ছিল ঢাকা। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে যখন হাজার হাজার দেশকর্ম্মী প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন, শ্রীযুক্ত প্যাটেলও এই মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতির পদে ইস্তাফা দেন। ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসের শেষভাগে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি দিল্লীতে গ্রেপ্তার হইয়া ছয় মাসের কারাদণ্ডে

দণ্ডিত হন। এই সময়ে তিনি রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, —"এইবার আমি আমার সম্মান ও পেন্সন লাভ করিলাম।" জেল হইতে মুক্তিলাভ করার পর তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৯৩১ সালে ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখ তিনি চিকিৎসার্থ ইউরোপ গমন করেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়াও তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা-স্বপ্ন সুসিদ্ধ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক সহানুভূতি উদ্বুদ্ধ করিতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন। আমেরিকায় তিনি যে সম্মান পাইয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন ভারত-বাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই। আয়ারল্যাণ্ডে ডি ভেলেরার সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ আলাপের প্রতি ছন্দে ভারতের প্রতি তাঁর অসীম দরদের কথাই পরিস্ফুট হয়।

অন্তরের অপূর্ব্ব অনুরাগ ও তেজস্বিতার সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া জীর্ণদেহ অধিকদিন চলিতে সমর্থ হইল না। পরাধীনতার বন্ধন-ব্যথা তাঁর বাহ্য-বিশ্রাম-মুহূর্ত্তের আড়ালে গুমরিয়া উঠিত। অবশেষে সুদূর ভিয়েনা প্রদেশে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া তিনি চির-বিশ্রাম লাভ করিলেন। শাশ্বত নিত্যদেহী কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়াও ভারতের এ স্বাধীনতা-সংগ্রামে শক্তির সঞ্চার করিবেন। ভারতের তরুণ তাঁর অসমাপ্ত কর্ম্মভার যদি সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে, তবেই এই জাতীয়যোদ্ধার অশরীরী আত্মা তৃপ্তি পাইবে।

নবীন আয়ারল্যাণ্ড—

আজিকার যে আয়ারল্যাণ্ড তাহা একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। তিন শত বছরের একটা রক্তরঞ্জিত সংগ্রামেতিহাস ইহার পশ্চাতে আছে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার চাপে জাতির প্রাণশক্তি মুমূর্ষ হইয়া পড়ে। স্বাধীনতার যে সহজ মনোবৃত্তি তাহাও হইয়া পড়ে অবসন্ন। স্তিমিত ইচ্ছাশক্তি ক্ষীণসাড়া দিলেও, গতানুগতিকতায় প্রভাবান্বিত নির্জ্জীব প্রাণ জাগিয়াও জাগিতে চাহে না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর যখন ধরণীর আলো শিশুর চোখে ছোঁয়া দেয়, তখন হইতেই মুক্ত প্রকৃতির অবাধ আস্বাদের জন্য সে হইয়া উঠে মাতাল। অন্তর্নিহিত এই স্বাধীন সত্তার ক্রমস্ফূরণের প্রেরণাই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বৃদ্ধির সাহায্য করে। মুক্তির দ্যোতনা মানুষের জন্মসিদ্ধ হইলেও, শতাব্দীর পরাধীনতার বাহ্য আবেষ্টন তাহার উপরে সুষুপ্তির প্রলেপ আনিয়া দেয়। বহুর উপর যখন এই আরোপ পড়ে, তখন জাতীয় জীবনেও বার্দ্ধক্যের ঘুণ ধরে। এ ক্ষেত্রে জাতির আভ্যন্তরিক বাধাই বড় হইয়া দেখা দেয়। দেশের, সমষ্টির বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিস্মৃত হইয়া ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির আশু প্রচেষ্টা দেশসেবীর অনেককেই উদ্বুদ্ধ করে। তার উপর শাসকজাতির স্বার্থপরতা ও স্বাধিকারমত্ততা শাসিত জাতির অগ্রগমনের পথে হিমালয়ের মত উল্লঙ্ঘ্য বাধা সৃজন করে।

মিঃ ডি ভেলেরা

দীর্ঘকালের অধীনতার পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের যে শতাব্দীব্যাপী সংঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সৌসাদৃশ্য ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে আছে বলিয়াই আয়ারল্যাণ্ডের বিজয়েতিহাস ভারতবাসীর লক্ষ্যে রাখিতে চায়।

শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংঘর্ষ চলিলেও, স্বাধীনতার বেদীপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে দৃষ্ট হয় একজন কি মুষ্টিমেয়কে। জাতির সত্তা সেখানেই মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠে। ইতালীর মুসোলিনী, জার্ম্মানীর হিটলার, রুশিয়ার লেনিন, তুরস্কের কামালপাশা আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তেমনি আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার্জ্জনে শতাব্দীর

পর শতাব্দী কত বীর যোদ্ধা রক্তপাত করিলেও, সহস্র সহস্র স্বদেশসেবক কত দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিলেও, আয়ারল্যাণ্ডের স্বদেশ-সাধনা আজ পরিপূর্ণ জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে—ডি ভ্যালেরাকে কেন্দ্র করিয়াই। ডি ভ্যালেরাই আজ নবীন আয়ারল্যাণ্ডের স্রষ্টা বলিয়া সম্পূজিত।

গত এক যুগের মধ্যে ধাপে ধাপে কেমন করিয়া আইরিশ ফ্রী ষ্টেট ফ্রী হইতে চলিয়াছে, তাহা রাষ্ট্রজগতে অবিদিত নয়। ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধির ফলে আয়ারল্যাণ্ডে যে ফ্রী ষ্টেট শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা গ্রিফিথ, কলিন্স, কসগ্রেভ প্রভৃতি নেতারা 'মন্দের ভাল' বলিয়া মানিয়া লইলেও, উহা ডি ভ্যালেরা ও জাতীয়তাবাদী দলকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তাই ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে জাতি শনৈঃ শনৈঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের পথেই চলিতেছিল। আয়ারল্যাণ্ড বুঝিয়াছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থপরিপূরিত ছায়াতলে পরিপূর্ণ জাতীয় বিকাশ সম্ভব নয়। আজ আয়ারল্যাণ্ডের চির ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা জয়যুক্ত হইতেছে, বলিতে পারা যায়। সম্প্রতি আইরিশ সেনেটের অনুমোদনে 'ডেইলে' যে কয়টি আইন গৃহীত হইয়াছে তাহা আয়ারল্যাণ্ডের দীর্ঘদিনের রাষ্ট্র-সাধনায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ঐ সংশোধিত আইনগুলির মধ্যে প্রধান তিনটীর মর্ম্ম এই, যে—

(১) সংশোধিত আইনে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি বর্ত্তমান আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে বাজেটের যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা রদ করিয়া একজিকিউটিভ কাউন্সিলের হাতে দেওয়া হইল।

(২) আইরিশ ডেইলে গৃহীত আইনে গবর্ণমেণ্ট বা রাজার সম্মতির যে প্রয়োজন ছিল তাহাও রদ হইল।

(৩) ইংলণ্ডের প্রিভী কাউন্সিলে আপীল করিবার এই সংশোধিত আইনে রহিত করা হইল।

এই সকল আইনের দ্বারা ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে একরূপ সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। ইহা আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে সাধারণতন্ত্র ঘোষণারই একরূপ পূর্ব্বসূচনা।

জাতির এই জাগ্রত চেতনা প্রতিরোধ করা ব্রিটিশ-রাজের পক্ষে এখন অসম্ভব। এমন একটি সময় ও সুযোগ ছিল, যখন ইংলণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আয়ারল্যাণ্ডকেও কানাডা অষ্ট্রেলিয়ার মত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া রাখিতে পারিত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর অতিমাত্র অন্ধ স্বার্থবুদ্ধি অপর পক্ষের শক্তি গণ্য করিতে পারে নাই। এমনি করিয়াই মার্কিণ ইংলণ্ডের হাতছাড়া হইয়াছে। ভবিষ্যতের আশা বড় আশা, পাকা রাষ্ট্রবিদের দূরদৃষ্টিকেও উহা তমসাচ্ছন্ন করে। ভারতের বেলাও ইংলণ্ড সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতেছে কি না কে জানে?

স্বাধীনতার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। মহামতি ডি ভ্যালেরারই এই বাণী। এই স্বদেশের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা বাহিরের অপেক্ষা ভিতরের বাধাই অধিক প্রতিহত করিয়াছে বা করিতেছে। আইরিশ সিভিক গার্ডের ভূতপূর্ব্ব চীফ কমিশনার জেনারেল আইওয়িন ও'ডাফি উক্ত পদ হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইবার পর ন্যাশনাল গার্ড বা নীলকোর্ত্তার দল গঠন করেন। তিনিই এখন ঐ দলের সর্ব্বেসর্ব্বা। 'নীল কোর্ত্তার দল' স্বদেশের স্বার্থসংরক্ষণের ছুঁতা ধরিয়া আয়ারল্যাণ্ডে জটিল রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব-প্রয়াসী কসগ্রেভের দলও ডি ভ্যালেরার আদর্শবিরোধী। স্বার্থান্ধ এই দলের যুক্তি স্বাভাবিক। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের অন্তর্গত আলষ্টারবাসী ইংরেজ ও প্রটেষ্টাণ্টদিগকে সমান রাষ্ট্রাধিকার দিয়া নিখিল আয়ারল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ডি ভ্যালেরা ও তাঁর জাতীয় দল উদ্বুদ্ধ। কিন্তু জেনারল ও'ডাফির দল ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার দোহাই দিয়া বিরোধিতা সুরু করিয়াছে। দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ মানবচিত্ত এমনি নৈতিক অধোগতিই প্রাপ্ত হয়। এই জাতীয়োন্নতি পরিপন্থী মনোবৃত্তি ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রেও বিরল নহে। বর্ত্তমান আইরিশ গবর্ণমেণ্ট 'নীল কোর্ত্তার' দলকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও শীঘ্রই তাদের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হইবে, বলিয়া দিয়াছেন। জেনেরাল ও'ডাফি অবশ্য এখন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করেন নাই; কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ নীতির উপর আয়ারল্যাণ্ডের শান্তি অনেকটা নির্ভর করিতেছে। বিজয়ী বীর ডি ভ্যালেরার অগ্রগমনের পথে কোন বাধাই টিকিবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও আয়ারল্যাণ্ডের এই বিরুদ্ধাচরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য আয়ারল্যাণ্ড হইতে আমদানী মালের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়াছেন। কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া ইহাতে দেশের মধ্যে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্ট হইয়াছে। স্রষ্টা যিনি তিনি সৃষ্টি করিতে জানেন, তাই ডি ভ্যালেরা এই অর্থকৃচ্ছ্রতায় না দমিয়া তাহার প্রতিকারার্থ ইতিমধ্যে প্রায় ১৫০টি কারখানা খুলিয়াছেন। নবীন আয়ারল্যাণ্ড আজ সব দিক্ দিয়াই জাগিতে চাহিতেছে। বিদ্রোহী জাতীয় সত্তা আজ ধ্বংস ও সৃষ্টির সঙ্গে সমান তালে পদক্ষেপ করিয়া, পথের সকল বাধা বিদলিত পূর্ব্বক নব সৃষ্টির স্বপ্নে উন্মাদ।

সিমলা বাণিজ্য বৈঠক—

সম্প্রতি সিমলায় ইঙ্গ-জাপ-ভারতীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে এক মিলন বৈঠক চলিতেছে। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, ইংলণ্ড, ভারত ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য বৈষম্যের বিশেষ করিয়া বস্ত্র-শিল্পের একটা আপোষরফা করা। জাপানী যাদুর সঙ্গে কি ভারত কি ইংরেজ কোন দেশেরই ব্যবসায়ী আঁটিয়া উঠিতে না পারায়, ম্যানচেষ্টার ও ভারতের সঙ্গে অটোয়া-বাণিজ্যচুক্তিতে স্থির হয়, যে ভারতজাত তুলা ম্যানচেষ্টার খরিদ করিবে ও জাপান হইতে আমদানী বস্ত্রের উপর শুল্ক বসান হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ল্যাঙ্কাসায়ার তো চুক্তি অনুযায়ী তুলা খরিদ করিতে পারে নাই, অধিকন্তু জাপান চড়া শুল্ক বসাইবার দরুণ ভারত হইতে তুলা খরিদ বন্ধ করায় ভারতে তুলার বাজারে এক মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়। বাণিজ্যক্ষেত্রে এই সকল স্বার্থ-রেষারেষির জন্য তিনটি দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষতঃ, ভারতের বাজারে জাপানী অবাধ পণ্য প্লাবন রুদ্ধ করিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট শতকরা ৭৫৲ রক্ষণ শুল্ক বসাইয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই। এই তিনটি দেশের মধ্যে বহুদিনের সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপনের জন্যই বর্ত্তমান অধিবেশনের আয়োজন।

এই সিমলা বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য জাপান হইতে যে ১৩ জন প্রতিনিধি আসিয়াছেন, তন্মধ্যে ৮ জন সরকারী প্রতিনিধি এবং অবশিষ্ট ৫ জন বণিক্-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এই জাপানী দলের নেতা হইতেছেন এস সাওয়াদা।

ব্রিটিশ বস্ত্র-শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধির সংখ্যা ৮ জন। এই দলের দলপতি স্যার ক্লেয়ার লীজ ও সেক্রেটারী মিঃ রেমণ্ড ষ্ট্রীট। ল্যাঙ্কাসায়ার বস্ত্রশিল্প-সংশ্লিষ্ট আরও দুইজন মিঃ ল্যাসি ও মিস্ মৌড সেডনও সঙ্গে আছেন।

জাপ প্রতিনিধি এস সাওয়াদা

ভারতের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন লালা শ্রীরাম, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান। ইঁহারা ভারত-গবর্ণমেণ্টের সদস্যগণের পরামর্শদাতার কার্য্য করিবেন। বোম্বাই মিল মালিকগণ তাদের স্বার্থরক্ষার্থ প্রযত্নপর হইয়াছেন। বাংলা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই; অথচ বাংলার শিশু বস্ত্রশিল্পকে জীয়াইয়া রাখাই এখন বাংলার বড় সমস্যা। বাংলায় যে সকল মিল আছে তাদের কোন সম্মিলিত সমিতি নাই। তাই বাংলা আজ এত বড় আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবে অপাঙ্‌ক্তেয়।

আজ কিছুদিন হইল এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর সরকারী, বে-সরকারী বৈঠকের ধূমধাম সমানে চলিয়াছে। কথা-

বার্ত্তা, সলা পরামর্শের অন্ত নাই, কিন্তু আসলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয় নাই। আপন কোলে ঝোল টানিতে সকলেই ব্যস্ত হইলে পরস্পরের মধ্যে যে স্বার্থ-সংঘাত তাহা নিরাকৃত হওয়া সুদূরপরাহত। ভারতের স্বার্থ, ইংলণ্ড ও জাপানের স্বার্থের বিপরীত হইলেও, ভারতের তাহা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার মত শক্তিসামর্থ্য নাই। তাই এতদিন ধরিয়া যে সকল আলোচনা চলিয়াছে তাহার মধ্যে মূলতঃ ভারতের বাজারকে ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে বণ্টিত করিবার কোলাহলই পুনরাবর্ত্তিত হইয়াছে। আদান-প্রদানের হারাহারি লইয়াই যত মারামারি। ভারতের তুলা খরিদের একটা আনুপাতিক ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইলেও, ভারতের বিশেষ করিয়া বাংলার সদ্যজাত বস্ত্রশিল্প বা অন্যান্য কুটীরশিল্পের যাহা বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্রুত মরণের পথে চলিয়াছে। রক্ষা করিবার কোন নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না।'

অনেক আলাপ আলোচনার ফলে জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য আদান প্রদানের যে সকল সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা টোকিও-স্থিত জাপানী কেন্দ্রী সরকারের ও ওসাকার মিলমালিকগণের দ্বারা অনুমোদিত যদি হয়, তবেই চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে সম্মিলনীর সাফল্য সম্বন্ধে নৈরাশ্যের এখনও কোন গুরুতর কারণ হয় নাই।

ইতিমধ্যে বোম্বাই মিল-মালিকগণেরও ল্যাঙ্কাশায়ার প্রতিনিধিগণের মধ্যে বস্ত্রবাণিজ্য বিষয়ে একটা চুক্তি হইয়াছে। বোম্বাই মিল-মালিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত এইচ, পি, মোদী ও মিঃ ক্লেয়ার লীজ সম্মিলিত-ভাবে উক্ত চুক্তি ও পরস্পর হৃদয়-বিনিময়ের সাফল্য সম্বন্ধে যে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মোটামুটি মর্ম্ম এই যে—

বর্ত্তমানে প্রতি পাউণ্ডে ছয় পাই হারে যে কার্পাস-কর আছে তাহা বর্দ্ধিত হইবে না।

ভারতের বস্ত্রশিল্প রক্ষাকল্পে বৈদেশিক আমদানী বস্ত্র ও সূতার উপর রক্ষণশুল্ক বসাইবার জন্য ভারত অধিকারী, তবে ব্যয়ের কম-বেশী বিবেচনায় গ্রেট বৃটেনের বিষয় বিবেচ্য। দেশে সুদিন ফিরিলেও, ভারত সরকারের পক্ষে ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে সমস্ত আমদানী পণ্যের উপর ধার্য্য 'সার চার্জ্জ' উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলে, তখন ভারতীয় পক্ষ গ্রেট বৃটেনের বস্ত্রের উপর শুল্কধার্য্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোন প্রস্তাব করিবেন না।

গ্রেট বৃটেনের কার্পাস-সূতার উপর মূল্য হিসাবে শতকরা ৫৲ এবং নূতনতম পরিমাণ হিসাবে প্রতি পাউণ্ডে ৫ পয়সা হারে এবং বস্ত্রের উপরে যথাক্রমে ৩০৲ টাকা বা প্রতি বর্গ গজ কাপড়ে আড়াই আনা হারে শুল্কধার্য্য হইতে পারে। গ্রেট বৃটেনের কৃত্রিম রেশমের উপর মূল্য হিসাবে শতকরা ১০৲ অথবা কার্পাস এবং কৃত্রিম রেশম সংমিশ্রিত কাপড়ের উপর মূল্য হিসাবে ৩০৲ বা প্রতি বর্গগজে ২ আনা হারে শুল্ক ধার্য্য হইতে পারে।

বিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে যেখানে গ্রেট বৃটেনের পণ্যের সুবিধা হইবে, সেখানে ভারতীয় পণ্য ও মিল-সমূহকে সুযোগ দেওয়া হইবে। ল্যাঙ্কাশায়ার প্রতিনিধি-দল গ্রেট বৃটেন ভারতজাত তুলার ব্যবহার জন্য ও তুলাচাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই সকল চুক্তির কাল ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

বোম্বাই ও বাংলার স্বার্থ এক নয়। বোম্বাইয়ের এই মিলমালিকগণের চুক্তি ও মনোভাবে বাংলা বিস্মিত তো হইয়াছেই, পরন্তু ক্ষতিগ্রস্তও হইবার সম্ভাবনা।

বিমানযোগে ভারতের ডাক—

সম্প্রতি লণ্ডনে স্যার ই জেডিসের সভাপতিত্বে ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজের যে বাৎসরিক সভা হয়, তাহাতে সভাপতি জেডিস্ বিমানযোগে আন্তর্জাতিক ডাক আদান প্রদানের ভবিষ্য বিপুল সম্ভাবনার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

স্থল এবং সমুদ্রপথের অপেক্ষা বিমানপথে গড়ে যাত্রী-প্রতি ইনসিওরেন্স হার ও অপেক্ষাকৃত সস্তা। তারপর সময়ও লাগে কম, সুবিধাও অনেক বেশী। সমুদ্রপথে জাহাজযোগে লণ্ডন ও ভারতের মধ্যে ডাক পৌছিতে

তিন সপ্তাহের কম লাগে না, কিন্তু কিঞ্চিদধিক সপ্তাহেই বিমান-ডাক পৌছায়। লণ্ডন-ভারতের মধ্যে বিমানযোগে ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা খুব বেশীদিন হয় নাই; কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতের অভ্যন্তরে ফীডার সার্ভিসের দ্বারা বিমানযোগে ডাক-বাহনের প্রস্তাব হইতেছে, স্যার জেডিস্ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, যে—ইম্পিরিয়াল এয়ার-ওয়েজকে ডাকমাশুল বাবদ যাহা ভারত-গভর্ণমেণ্ট দেয়, তদপেক্ষা অধিক চার্জ্জ এই ফীডার সার্ভিসের জন্য ধার্য্য হইয়াছে। সভাপতি জেডিস্ ভবিষ্যতে এই বিমান-পথ অষ্ট্রেলিয়া ও উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরপথে নিউফাউল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যুক্ত হইবার আশাও প্রকাশ করিয়াছেন।

স্যার জেডিস

গত ২রা নভেম্বর 'দি হেভিল্যাণ্ড ড্রাগন' নামক উড়োজাহাজ হেসটন সহর হইতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছে। ইহাতে বে-তার-বার্ত্তা আদান-প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। এই উড়োজাহাজ কলিকাতা, রেঙ্গুন ও কলিকাতা-ঢাকা পথে ডাক নেওয়া-দেওয়া করিবে। ইহার পথ বর্ত্তমানে মার্সেলিজ, রোম, টিউনিস্, কাইরো, বাগদাদ্, করাচি হইয়া। বিমানপথের ক্রমোন্নতিতে মানুষের অর্থ-সময়-কাজ সবদিক্ দিয়াই সুবিধা হইবে।
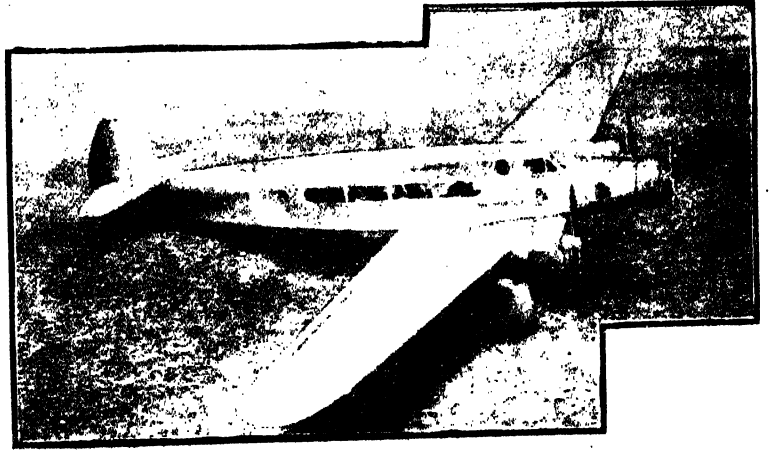
প্যারিস-কলিকাতা বিমানপথ—

ফ্রান্সদেশস্থ 'এয়ার ফ্রান্স' কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত প্যারিস-কলিকাতা-ইন্দো-চায়না বিমানপথে শীঘ্রই এক-রকম নূতন ধরণের উড়োজাহাজ চালাইবার সঙ্কল্প হইয়াছে। সেই উড়োজাহাজের প্রস্তুতিকার্য্য শেষ হইয়াছে। ইহার গতি ও যাত্রীর সকল দিক্ দিয়া সুবিধায় শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিবে বলিয়া কোম্পানী আশা করে।

'এয়ার-ফ্রান্সে'র নূতন ধরণের এরোপ্লেন

বিচিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দুনিয়া—

এ যুগ—প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে মানুষের কৌতূহলও বাড়িয়াছে। নূতনত্বের পথে অভিযান, অজানাকে জানা, অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করা, খেয়ালকে চরিতার্থ করা যেন এ যুগের মানুষকে পাইয়া বসিয়াছে। ধীর-শান্ত-সমাহিত হইয়া জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যকে জানা ছিল প্রাচীনের পেশা; কিন্তু এ যুগের ধর্ম্মই হইতেছে গতি ও প্রাণচঞ্চলতা। কে কাহাকে হারাইয়া জিতিতে পারে, সেই চেষ্টা। মানুষ চলিয়াছে অবিরাম—আস্তে নয়, ছুটিয়া। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা। গানের প্রাণে-রসে নিজেকে মিলাইয়া মিশাইয়া গীত গাওয়া নয়—রেডিও, গ্রামোফোনের ধূম। খেয়ালের বশে পনের বছরের বালকের নায়গ্রা জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিয়া অভিজ্ঞতার্জ্জন, রবারের নৌকা করিয়া পৃথিবীভ্রমণ, বেলুনে চড়িয়া আকাশের উচ্চতম প্রদেশে পরিভ্রমণ, সাঁতরাইয়া সমুদ্র-পার, মরুবক্ষে মোটরাভিযান, সাগরের তলে তলে

পরিভ্রমণ, জলন্ত আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তর পরিদর্শন, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশীর্ষে আরোহণ, উড়োজাহাজের world-flight, non stop-flight, মটরের non-stop-run, সাইকেল, মোটর-সাইকেলে পৃথিবীভ্রমণ, ট্রেণের গতিবৃদ্ধি,

কম্যাণ্ডার সেটলের শূন্যাভিযান

লাফ্-ঝাঁপ, অশ্ব-মানুষের ছুটোপুটি, শূন্য হইতে লাফাইয়া পড়া ইত্যাদি এ প্রাণযুগের বিস্ময়কর বিচিত্র কাহিনী। গতিবেগে মানুষের কৃতিত্বের (world-records) কয়েকটী নমুনা এখানে দেখান গেল—

এরোপ্লেনে—মিঃ বনেট (ফ্রান্স), ঘণ্টায় গতিবেগ ২৭৮১/২ মাইল। মোটরকারে—মেজর সেগ্রেভ, ঘণ্টায় গতিবেগ ২০৩-৭৯ মাইল। মোটরবোটে—'সেপল লিফ' (ইংলণ্ড) ঘণ্টায় গতিবেগ ৮০ মাইল।

বৈজ্ঞানিক 'পেকার্ডির উচ্চ আকাশের ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে বেলুনযোগে ভ্রমণ বিস্ময়কর। তিনি ঘণ্টায় ৭০০ মাইল বেগে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং আশা করেন, ক্রমোন্নতিতে ৩০০০ মাইল বেগে পারিবেন। এই বেগে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে তাঁর অধিক সময় লাগিবে না এবং লণ্ডন-ইউরোপে যাতায়াতে ১০।১২ ঘণ্টার বেশী লাগিতে পারে না।

সম্প্রতি কলংয়ে তিনজন ৩৬০০০ ফীট উচ্চাকাশে উঠিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল আমেরিকার কম্যানণ্ডার টি, জি সেটল আকাশের উচ্চতম শূন্যপ্রদেশে উঠিয়া পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া বেলুনশুদ্ধ নামিয়া পড়িতে বাধ্য হন। মিঃ সেটলের বেলুনসহ ছবি এখানে দেওয়া গেল।

বাদশাহ নাদির শাহ নিহত—

৮ই নভেম্বর বৈকাল তিনটায় আফগানিস্থানের বাদশাহ নাদির শাহ অপ্রত্যাশিতভাবে গুপ্তঘাতকের গুলিতে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জাহির শাহ নামে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক অবস্থা শান্ত।

নাদির শাহ রাজপরিবারেরই একজন ছিলেন। ১৯২৯ সালে দীর্ঘদিনের বিপ্লবের পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

নাদির শাহ

১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিভিন্ন শাসনবিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক নীসে বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু যখন ১৯২৮ সালে ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজা আমানুল্লা জাতির মধ্যে দ্রুত সংস্কার সাধন করিবার

প্রচেষ্টার ফলে ভিস্তিওয়ালার পুত্র বাচ্চা-ই-সাক্কোর অধিনেতৃত্বে এক জাতীয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই অন্তর্বিদ্রোহের ফলে বাচ্চা-ই-সাক্কো হবিবুল্লা নামধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন ও আমানুল্লা রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই সময়ে নাদির খাঁ ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আফগানিস্থানকে বাচ্চা-ই-সাক্কোর হাত হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা সফল হয়।

অতঃপর সর্ব্বসাধারণের অনুরোধে নাদির নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন ও অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পরে ১৯২৯ সালে তিনি সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন ও হবিবুল্লা পলায়ন করেন।

১৯২৯ নবেম্বর মাসে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন।

গীতার যোগ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"জরা-মরণ-ভীত মানুষ মোক্ষার্থে ভাগবতধর্ম্মী হইলে তাহার জ্ঞানবিকাশ হয়। সে ব্রহ্ম, নিখিল অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম অবগত হয়। আর যে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকেই জানিতে চাহে, সে মরণ-কালেও যুক্তচিত্ত হইয়া আমাকেই জানিয়া থাকে।" পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা অষ্টম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ, এই ছয়টী অতি প্রাচীন তত্ত্ব-কথার সহিত মৃত্যুকে উল্লেখ করায় ইহাও তত্ত্বরূপে সাতটী প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। অর্জ্জুন এইগুলি উল্লেখ করিয়াই প্রশ্ন উত্থাপন করেন—

"কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ৮।১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ৮।২"

'হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি প্রকার? অধ্যাত্মই বা কাহাকে বলে? কর্ম্মই বা কি? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাহাকে বলে?'

'হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কিরূপ? কি রূপেই বা ইহাতে উহা অবস্থান করে? মরণকালে সমাহিতচিত্ত পুরুষগণ দ্বারা কিরূপেই বা তুমি বোধগম্য হও?'

এই প্রশ্নগুলি ও ইহার উত্তর ভারতের শাস্ত্রাদি পঠন-পাঠনে প্রত্যেক শিক্ষিত জনের নিকট বিদিত; অর্জ্জুনও যে ইহা না জানিতেন তাহা নহে; কেননা, ধৌম্যাদি ঋষি-গণের নিকট ইঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তবে গীতার উদ্গাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইহার নূতন ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি উন্মুখ হইয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে তিনি যে সাধনার উত্তম রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে একেবারে অভিনব আদর্শ। শাস্ত্রাদির প্রাচীন লক্ষ্য যে অপবর্গ, তাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বেদমন্ত্রে নূতন মূর্ত্তি ধরিয়াছে। জরা-মরণের আতঙ্কে মোক্ষের পরিবর্ত্তে ভগবানে নবজন্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার প্রবল হইয়াছে। যিনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও অজ, শাশ্বত, কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ নহেন, সেই পরম তত্ত্বে উপনীত হইলে, জন্মমরণের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যায়—তখন জাগ্রতেই সমাধি, জন্ম-মরণের মধ্যেই মোক্ষের আস্বাদ অসম্ভব হয় না। এই জীবন-বেদে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বগুলির নূতন ব্যাখ্যা শ্রবণের অভিলাষ তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই সূত্রের বৃত্তি স্বরূপ এক নিঃশ্বাসে ইহার নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন।

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮।৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৮।৪
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্রসংশয়ঃ ॥ ৮।৫

'যিনি পরম অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম, স্বভাবই অধ্যাত্ম; ভূত, ভাব ও উদ্ভব রূপ বিসর্গই কর্ম্ম।

হে দেহভৃতাংবর! নশ্বর পদার্থই অধিভূত, পুরুষই অধিদৈব, এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ স্বরূপ এইরূপ কথিত হয়।

মরণকালে যে আমাকে চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করে, সে আমার ভাবই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।'

অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পুরুষোত্তম কথাটী গীতায় এই প্রথম ব্যবহৃত হইল। পুরুষোত্তম ও পরম পুরুষ একই অর্থে পরে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম শব্দের অর্থ আচার্য্য আনন্দগিরি করিয়াছেন—"ক্ষরাক্ষরাভ্যাং কার্য্যকারণাভ্যাং অতীতস্য ভগবতো ন কিঞ্চিদবেদ্যমস্তীতি সূচয়তি পুরুষোত্তমেতি।" ব্রহ্মাদি নিগূঢ় তত্ত্বগুলির সদুত্তর যিনি দিবেন, তিনি ক্ষরাক্ষর কার্য্যকারণের অতীত ভগবৎ-স্বরূপ; তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবেই দেখিয়াছেন; তাই তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া আখ্যা দিলেম।

ব্রহ্ম সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে শ্রুত্যাদিতে দ্বিবিধ প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। দেহকে অধিকার করিয়া আত্মাও আছেন। ইন্দ্রিয়সমূহ এবং প্রত্যক্ চৈতন্য-রূপে স্বতন্ত্র চৈতন্যও বিদ্যমান আছেন। অধ্যাত্ম বলিতে ইহাদেরই কি বোঝায়? শ্রুতি বলেন, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ"—ইহা দ্বারা যজ্ঞ-কর্ম্ম ও লৌকিক কর্ম্ম উভয়ই কর্ম্ম-বাচ্য, এতদতিরিক্ত কোনরূপ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা, ইহা জানিবার জন্যই অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

ক্ষিত্যাদি ভূতগ্রাম অধিকার করিয়া যে কার্য্য অথবা যাবতীয় কর্ম্মই অধিভূতের অন্তর্গত? অসংখ্য কোটী দেবতার অনুধ্যান প্রবর্ত্তিত আছে, অথবা সূর্য্যাদি হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাতে যে শক্তি অনুস্যূত তাহাই কি অধিদৈব শব্দে লক্ষিত? প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এই সকলের বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতীত কোন নূতন অর্থ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখ-নিঃসৃত হওয়ার আশায় অর্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, ইহা অতঃপর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছেন—"সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ" তাহারা প্রয়াণকালে যুক্তচিত্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হয়। এই অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপ, এই দুইটী প্রশ্নের প্রকার-ভেদে একই উত্তর—জ্ঞানময় আত্মা অথবা পরমব্রহ্ম। দেহের মধ্যে বুদ্ধ্যাদিরূপে তিনি অবস্থিত অথবা তদতিরিক্ত? দেহস্থিত হইলেই বা তাঁহাকে চিন্তা করিবার উপায় কি? আর যদি অভেদরূপ না হইয়া অত্যন্তাভেদ হন অথবা একান্ত ভিন্ন বস্তুরূপেই তিনি বিরাজ করেন, তাঁহাকে অনুধ্যান করার এমন কি পন্থা আছে, যে সেই পরম সঙ্কট আসন্নকালে তাহাতেই উপনীত হইবার মত স্মরণশক্তি বিদ্যমান থাকিবে?

প্রাচীন ভাব ও চিন্তারাশির সমুদ্র উত্তাল-তরঙ্গ সদৃশ; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের উত্তর খুবই সংক্ষিপ্ত। ইহাতে বুঝা যায়, এই সকল বিষয়ের অবতারণা ভারতের পুরাতন জটিল ধর্ম্মতত্ত্বগুলিকে উদ্ভিন্ন করিয়া তাঁহার উৎকৃষ্ট মতবাদই তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্। ব্রহ্ম শব্দের তিনি এক কথায় উত্তর দিলেন—অক্ষর। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ আছে, "দ্বাবিমৌ পুরুষো লোকে ক্ষরাক্ষর এবচ"—ইহাই ব্রহ্ম শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ; কিন্তু এই অর্থ এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেন না। ক্ষরকে তিনি অধিভূত শব্দের অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অক্ষর—যাহার বিনাশ নাই। শ্রুতিতে ইহার সমর্থন-বাণী অনেক আছে; তবে অক্ষর শব্দকে তিনি পরম শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন, ইহাতে সর্ব্বোপাধিশূন্য চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বরূপে লক্ষিত করা হইয়াছে। "পরমং যদক্ষরং জগতাং মূল কারণং তদ্ ব্রহ্ম"—জগতে মূল কারণ যাহা তাহাই ব্রহ্ম। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" "হে

গার্গি, এই ব্রহ্ম বা অক্ষরের অনুশাসনে চন্দ্রদিবাকর বিধৃত হইয়া অবস্থিত। "এতস্মিন্নেবাক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতঃপ্রোতশ্চ"—"হে গার্গি! এই ব্রহ্ম বা অক্ষরে আকাশ ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।"

অতএব শ্রুতির সমর্থনেই ব্রহ্ম এই ক্ষেত্রে সর্ব্বোপাধিশূন্য অক্ষর স্বরূপ হইয়াও সর্ব্বপরিশাসক, সর্ব্বধারয়িতা চৈতন্যরূপেই লক্ষিত হইয়াছেন। এই ব্রহ্মকে পরবর্ত্তী শ্লোকে সমধিক পরিষ্কার করিয়া বলা হইবে। অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। কাহার স্বভাব?—ব্রহ্মের। ব্রহ্মের স্বভাব বলিলে, ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন নির্ম্মল অক্ষর চৈতন্যরূপে আর ধারণা করা চলে না। স্বভাব থাকিলেই রূপ থাকিবে, কর্ম্মবশীভূত ভাব আসিয়া পড়িবে। কিন্তু স্বভাবকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ দ্বিবিধ প্রকার বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—এক নিসর্গ, অন্য স্বরূপ। নিসর্গ—অভ্যাসজনিত সংস্কার; ইহা হইতেই "স্ব-কর্ম্মণাং ফলং ভুঙ্‌ক্তে জন্তু জন্মনি জন্মনি"—আত্মকর্ম্মবশে জীবলোক জন্ম জন্ম ইহাতে নিপীড়িত হয়। কিন্তু যাহা স্বরূপ তাহা "অজন্যস্ত স্বতঃসিদ্ধঃ"। এই ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম বলিতে ব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ ভাব। ইহার পরই কর্ম্মের কথা। আচার্য্যগণ বলেন, ব্রহ্ম ভোক্তৃভাবে প্রতি দেহ অধিকার করিয়া আছেন; তাঁহার এই প্রত্যগাত্ম ভাবকেই স্বভাব বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যায় ভারতের প্রাচীন জীবন-বাদের বিরুদ্ধ মতবাদই কর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রশ্রয় পাইয়াছে। প্রাচীন ভারত পাইয়াছে ব্রহ্মের অক্ষর চৈতন্য; ইহাই পরম বোধে জীবনগতি ইহাতেই নির্দ্ধারিত করার যুক্তি ঐরূপ ক্ষেত্রে খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, কৃষ্ণচন্দ্র দিব্য-জীবনের সন্ধান দিতেছেন। যদি বেদ-বিরোধী যুক্তি ইহা না হয়, বর্ত্তমান ভারত তাহা কি কারণে অস্বীকার করিবে? আমরা এই স্বভাবকে জীব-স্বভাব না বলিয়া অনায়াসে ব্রহ্মেরই স্বরূপ বা স্বপ্রকাশের ভঙ্গী বলিতে পারি। স্বভাবের এই ব্যাপক অর্থ না হইলে কর্ম্মের যে সঙ্কীর্ণ অর্থ আসিয়া পড়ে, তাহা হইতে গীতার যোগ পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠে না।

কর্ম্মের গহন গতির কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে কর্ম্ম শব্দের অর্থ বিসর্গ বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন। বি+সৃজ্ ধাতু। সৃজগৌ ত্যাগে। কাজেই ইহা দ্রব্যত্যাগ-রূপ যজ্ঞ নামেই অভিহিত হইয়াছে। পূজনীয় কোন আচার্য্যই ইহার অর্থ সৃজনশক্তি বলিয়া অবধারণ করেন নাই। সৃজ্ ধাতু সৃজনেও হয়, কিন্তু যজ্ঞরূপ কর্ম্ম হওয়ায় দেবোদ্দেশেই ইহা প্রযুজ্য হইয়াছে। সৃষ্টির গৌণার্থ ত্যাগই এবং "ভূতভাবোদ্ভবকরঃ" কর্ম্মের লক্ষণ হওয়ায় বৈদিক যজ্ঞ কর্ম্মার্থে মানাইয়া গিয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সহিত ইহার বেশ সংযুক্তিও করা যায়।

"অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

যজ্ঞঃ চরুপুরোডাশাদির বিসর্জ্জন অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি-দান। অগ্নি পাঁচ প্রকার—দ্যু, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। আহুতিও পাঁচ প্রকার—শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ। পাঞ্চালরাজ প্রবহণ শ্বেতকেতুকে এই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি ইহার উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। কর্ম্ম এইরূপ যজ্ঞ হইলে, ইহা কিরূপ দুর্ব্বোধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। বেদশাস্ত্রে যজ্ঞ নিগূঢ় রহস্যময়। যজ্ঞ-কর্ম্মকেই যদি বিসর্গ আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে লৌকিক কর্ম্মকে এই কর্ম্ম হইতে বাদ দিতে হয়। গীতার কর্ম্ম ব্যাখ্যা এরূপ নহে, সর্ব্বজাতিকে ভগবানে উঠাইয়া লইবার জন্য কৃৎস্নকর্ম্মই যজ্ঞ-রূপে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ভগবান যাহা করেন তাহাই কর্ম্ম, তাহাই যজ্ঞ। ভাগবত চেতনায় জীব-চেতনার যুক্তিই যোগ। বর্ত্তমান অধ্যায়ে ইহার ব্যবহারিক সাধনার কথাই উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সার কথা—জীব অপ্‌ময় দধ্যাদির দ্বারা যে হোম করে, তাহাতে সেই জীবে এই শ্রদ্ধাহুতি সংবদ্ধ হয়। মরণান্তে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা দ্যু নামক অগ্নিতে সেই শ্রদ্ধাহুতির হোম করেন, তাহাতে সোমরূপ দিব্য দেহ গঠিত হয়। এই দেহে স্বকীয় কর্ম্মফল-ভোগ শেষ হইলে অপ্‌ময় দেহ পর্জ্জন্যাগ্নিতে আহুতি দান করে। বৃষ্টিরূপ আহুতি অতঃপর পৃথিব্যাগ্নিতে পতিত হইলে অন্নোৎপাদন হয়। এই অন্নভূত পুরুষাগ্নিতে অর্পিত হইলে

রেতঃ-সৃষ্টি হয়, যোষিদগ্নিতে ইহার তর্পণ জীবসৃষ্টির কারণ। ইহা নিছক সৃজন-তত্ত্বের আরোহণ ও অবরোহণের রহস্য ময় মন্ত্র মাত্র। ইহাও কর্ম্ম, ত্যাগ ও সৃজন ওতঃপ্রোতঃ ভাবে পরস্পর জড়িত, কর্ম্মকে আমরা ব্রহ্ম স্বভাবেরই স্পন্দনরূপে গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ মনে করি। ইহা ভূতকর, ভাবকর ও উদ্ভবকর। স্বভাবের স্পন্দনে এই তিন প্রকার সৃষ্টি-স্তর পরিলক্ষিত হয়। ভূত যাহা সৃষ্ট, ভাব যাহা সত্তা মাত্র, উদ্ভব যাহা নিরন্তর ভূত ও ভাবের উৎস। পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহার অর্থ অন্যরূপ করিয়াছেন, যথা "ভূতানাং ভাবো ভূতভাবস্তস্যোদ্ভবো ভূতোভাবোদ্ভবস্তং করোতীতি" ইহাপেক্ষা বাক্যটাকে দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া লইলে সৃষ্টি-স্পন্দনের বৈজ্ঞানিক অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

অধিভূত শব্দের অর্থ ক্ষর। যাহা নশ্বর অর্থাৎ দেহাদিভূত; ইহার রূপান্তর ও জন্মান্তর আছে। ইহাই জগৎসৃষ্টির উপাদান, এবং ব্রহ্ম-চেতনা বিধৃত হওয়ার স্থূল ক্ষেত্র, এইখানেই অব্যক্ত মূর্ত্ত হইয়াছে।

অধিদৈব শব্দে পুরুষকে বুঝাইয়াছে। কথাটী খুব সুসঙ্গত হইয়াছে, "পিপর্ত্তি পূরয়তি বলং যঃ অথবা পুরি শেতে চ" যিনি পূরণ করেন, অথবা পুরে যিনি শয়ন করেন। অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে স্পন্দন-রূপ কর্ম্মে ভূতগ্রামাদি যে বিচিত্র সৃষ্টি—যেমন স্পন্দিত জলরাশির মধ্যে চন্দ্রকিরণ হীরক-চূর্ণের ন্যায় ঝকমক্ করিতে থাকে, তদ্রূপ নিরন্তর গতিশীল এই জগৎসৃষ্টির মধ্যে ব্রহ্মের দিব্যদ্যুতি ঝলসিয়া উঠিতেছে, সৃজনের সুষমা এই জন্যই।

এই পর্য্যন্ত সবখানিই নিথর ব্রহ্মের পরিপূর্ণ বিরাট্ রূপ-সৃষ্টি মাত্র। যেন শিল্পী তাঁর নিখুঁৎ তুলিতে মানস সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিলেন, রঙে রেখায় বিচিত্র, চিত্তহারী। এ রূপ দেখিয়া নয়ন গলিয়া যায়, এ রূপ-সাগরে ডুব দিয়া তলাইয়া যাইতেই সাধ হয়; কিন্তু অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিতে হয়, অভাবনীয় অনির্ব্বচনীয় চেতনার অভিনব স্পর্শে! ইহাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে অপূর্ব্ব বেদ-ধ্বনি "অহমেব অধিযজ্ঞঃ"—এই দেহে, এই ভূতাদি গ্রামে দেবতাবৃন্দের লীলানিকেতনে আমিই যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ফলদাতা, ইহাই আত্মবাচী সর্ব্বনাম শব্দ। যাহা এ পর্য্যন্ত বিধেয় হইয়া অস্পষ্ট ছিল, এই কথায় তাহাই অনুবাদিত হইল।

প্রয়াণকালে এই জন্যই 'আমায়' এইরূপ লক্ষণযুক্ত অন্তর্য্যামী রূপে যে স্মরণ করে, সে "মদ্ভাবং যাতি"—ইহাই গীতার আদি মধ্য ও অন্ত কথা। 'ব্রহ্মভাব' ও 'মদ্ভাব' ইহার মধ্যে পার্থক্য কি তাহা পরে বিবেচিত হইবে। গীতার পাঠকদের স্মরণ রাখিতে হইবে, পূর্ব্বে যেরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির বিশ্লেষণ করিয়া এই তিনের সমন্বয়ে এক অমৃত রসায়ন সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ভাগবতপ্রাপ্তির জন্য অনিবার্য্য প্রয়োজন, যাহা অমিশ্রা কেবলা ভক্তি নামে উক্ত হইয়াছে, অতঃপর প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রাদির তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আত্মতত্ত্বে তাহা পর্য্যবসিত করিতে এবং মানবের দিব্য-জন্মদানের অমোঘ পন্থা চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিতে গীতার যোগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই নিগূঢ় সাধননীতিই গীতার ছত্রে ছত্রে সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছি। (ক্রমশঃ)

ঔষধ ও রোগ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

ঔষধ কহিছে রোগে, আমি তব অরি;
অতএব তুমি মোরে চল ভয় করি'।

রোগ কহে, বন্ধু তব এত অহঙ্কার
আমি না থাকিলে বুঝি হ'ত না তোমার।

সঙ্ঘ-বাণী

[আশ্রমী সঙ্কলিত]

[সমষ্টির প্রকাশই যুগের ধর্ম্ম। সে সমষ্টি হবে ভাগবতপরায়ণ, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম। এইরূপ সমষ্টিশক্তির উপরই জাতির সার্ব্বাঙ্গীন মুক্তি নির্ভর করিতেছে। সঙ্ঘ-জীবন মানুষকে কামনাহীন করিয়া গড়িয়া তোলে। মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় এমনই আবদ্ধ, যে ইচ্ছা করিলেও সে একেবারে মুক্ত হইয়া সঙ্ঘ-জীবন গ্রহণ করিতে অক্ষম। সুতরাং স্ব স্ব অবস্থায় থাকিয়াও প্রত্যেক মানুষই ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ব্যষ্টি স্বার্থ অতিক্রম করিয়া কিরূপে বৃহৎ স্বার্থে আপনাকে তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইবে, তাহারই একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সঙ্ঘ দেবতার নিকট মহাষ্টমীর দিনে আমরা প্রাপ্ত হই। যে সকল পুরুষ নারী ভাগবত-জীবন-লাভের আকুলতা প্রকাশ করিয়া আমাদের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার দায়ে সম্পূর্ণভাবে আপনাদের গণ্ডী অতিক্রম করিতে অক্ষম, তাঁহারা ইহা পাঠে নিজের জীবনে কতকটা আলো দেখিতে পাইবেন মনে করিয়া নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

—আশ্রমী]

"মার্কসের ফিলসফিকে রূপ দেবার জন্য লেনিন উঠেছে, ম্যাজ্জিনীর আদর্শকে রূপ দেবার জন্য গ্যারিবল্ডি-কাভুরের অভ্যুদয় দেখা গিয়েছে, জার্ম্মাণীর আদর্শকে বস্তুতন্ত্র করে' তোলার জন্য আজ হিট্‌লারের আবির্ভাব হয়েছে, সেইরূপ ভারতে যুগযুগান্তর ধরে' যে আদর্শবাদ মর্ত্ত্যের বুকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চলে আসছে, তার জন্য একদল মানুষের অভ্যুত্থান হবে, ইহা আমরা কি বিশ্বাস করতে পারি না? পাশ্চাত্যের আদর্শবাদ বহির্ম্মুখী, কিন্তু ভারত চেয়েছে ভগবানকে কেন্দ্র করে' সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। মানুষ তার জীবনের সকল ভোগৈশ্বর্য্য ভাগবতমুখী হয়ে লাভ করবে, প্রতি মানুষ ভগবানের সঙ্গে যুক্তি লাভ করবে, প্রতি কর্ম্মে, প্রতি চিন্তায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে ভগবানের নিত্যতা উপলব্ধি করবে, তার জীবনে ভাগবত ইচ্ছাই লীলায়িত হবে—এই ভাব ও আদর্শ যে কত বৃহৎ কত উদার! ইহাকে রূপ দেবার জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, এবং এ যুগে ব্যষ্টির শক্তি নয়, একটা সমষ্টিকে ইহার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করতে হবে—নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার, ভাগবতপরায়ণ একদল মানুষকে আশ্রয় করে' ভারতের এই সনাতন আদর্শবাদ মর্ত্ত্যের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এই মিশনের জন্যই আমরা সর্ব্বত্যাগী হয়েছি—ইহা যদি প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ বিশ্বাস করে, তা'হলে তার নিছক সঙ্ঘ মূর্ত্তিটা চক্ষের সম্মুখে ধরে' চলার সময় এসেছে। আমি এতদিন করুণা, প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। শিবময়ী করুণা মানুষ লাভ করে'ও তার স্বভাব পরিবর্ত্তন করতে পারে নি। সে শিবত্বের লয় হয়েছে, আজ প্রশ্রয় সংহৃত হয়েছে। এবারে চামুণ্ডা-শক্তি অসুরের বিনাশ সাধন করবেন। এখন আর গোঁজামিল দিয়ে চলা যাবে না। যার যা স্বরূপ বা অবস্থা তাকে তা বেছে নিতে হবে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বা প্রত্যেকের অবস্থাকে ভাল করে' সম্মুখে ধরে' আমি দেখাব। করুণা না থাকলেও, কারও প্রতি আমাদের বিদ্বেষ বা বিরক্তি নেই; প্রত্যেক পুরুষ ও নারী তার স্ব স্ব অবস্থা থেকে ভগবানের পথে যদি চলে, সেটাই হবে প্রকৃত স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থা।

প্রথম—প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জন্য যারা সর্ব্বত্যাগী হতে চায়, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, নিরহঙ্কার হবার পথে চলেছে, এই সঙ্ঘের জন্য জীবন-মরণ পণ করে' গৃহত্যাগী হয়ে বের হয়েছে, একমাত্র ভগবানই যাদের আশ্রয়, সঙ্ঘের সুখদুঃখ, অভাব অভিযোগ, খ্যাতি অপযশ যারা মাথায় বরণ করে' নিয়েছে—এরূপ একদল মানুষ অগ্রদূত হিসাবে দাঁড়িয়েছে, ভবিষ্যতেও এরূপ মানুষ এই প্রবাহে যোগদান করবে। এখানে কোন গোঁজামিল নেই। যে এই 'থাকের' মানুষ

বলে' দাবী করবে, তাকে স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডার, স্বতন্ত্র আহারাদির ব্যবস্থা, অর্থ-ভূষণের ভোগ প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বলে সব দাবী কর্‌বো, অথচ কর্ত্তৃত্বাভিমান, ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডারকে পুষ্ট কর্‌বো, এইরূপ আগাছা শক্তি আর প্রবৃদ্ধ হতে দেবে না। সঙ্ঘের বলে' স্বীকার কর্‌লেই তার সঙ্গে সঙ্গে তার বহির্লক্ষণও প্রকাশ পাবে। সুতরাং এখানে কে কোন্ অবস্থায় রয়েছে, সে বিচার করে' নিতে পারবে। এই থাকের মানুষের জীবনভঙ্গী দুই দিকে প্রকাশ হতে পারে। নিঃসঙ্গ জীবন অথবা যুক্ত-জীবন। যারা যুক্ত-জীবন অর্থাৎ বিবাহিত জীবন গ্রহণ করে' এ পথে চলবে, তাদেরও কঠোর সংযমের ভিতর দিয়ে চল্‌তে হবে। ভাগবত ভোগ যতদিন না অবতরণ করে, ততদিন তাদের ভগবানের আদেশে দাম্পত্যজীবনেও সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হবে মানুষ সাধারণতঃ আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তির জন্য ভোগে প্রবৃত্ত হয়; ভগবান সৃষ্টির রূপ নিয়ে যেদিন মানুষের মধ্যে অবতরণ কর্‌বেন, সেদিনই দিব্য সৃজন (Divine procreation) সম্ভব হবে।

Spirit of renunciation ও spirit of enjoyment—ত্যাগবাদ ও ভোগবাদ—এই দুটো ভারতে চরমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যে ত্যাগের পথে গিয়েছে সে ভোগকে একেবারে অস্বীকার করে' চলেছে; আর যে ভোগে প্রবৃত্ত হয়েছে, সে ভোগবাদকেই জীবনের একমাত্র সুখ বলে' গ্রহণ করেছে—ইহার সামঞ্জস্য আজ পর্য্যন্ত হয় নি। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে এই দুই দিকেরই প্রকাশ দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু ত্যাগের মূর্ত্তি যত শীঘ্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, দিব্য ভোগবাদ আজ পর্য্যন্ত সে ভাবে সার্থক হয়ে উঠে নি। ভারতের আকাশে বাতাসে Spirit of renunciationই প্রবল; তাই এদিক্‌টার একটা প্রকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। এক দিকে ভগবান নিঃসঙ্গ রুদ্র সন্ন্যাস-মূর্ত্তি নিয়ে যেমন প্রকাশমান, তেমনি অন্যদিকে মানুষের মধ্যে সৃষ্টির দ্যোতনা নিয়েও যেদিন তিনি আবির্ভূত হবেন, সেদিনই Divine creation সম্ভব হবে। যুক্ত জীবনের মানুষের নিজেকে কোন অংশে বঞ্চিত করবে না। তাকে ক্লেশের পথের উপর দিয়েই নয়, সমভাবে অনুরাগী হয়ে চল্‌তে হয়। ভগবানের ভোগকে আস্বাদ করার জন্য কঠোর সংযম তাকে গ্রহণ কর্‌তে হবে। স্ত্রীর দুঃখ দেখে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধানের জন্য তার হৃদয়কে তৃপ্তি দিবার দিকে যদি দৃষ্টি থাকে, সে ভগবানের করুণা থেকে বঞ্চিত হবে। বিশ্বাস রাখ্‌তে হবে—ভগবান সকল দুঃখের ভার গ্রহণ করেছেন; যদি তাতে দুঃখই আসে, সে তপস্যা তাকে বরণ কর্‌তে হবে। এই অফুরন্ত ধৈর্য্য ও তপস্যার মধ্য দিয়েই ভাগবত ইচ্ছাকে ধারণ কর্‌তে সমর্থ হবে।

এই গেল সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাগবতপরায়ণ মানুষের অবস্থার কথা।

তারপর, দ্বিতীয় স্তরের কথা—ভোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা যাদের জীবনে সম্ভব হবে না, তাদেরও সঙ্ঘে স্থান আছে। কিন্তু তাদের নিতে হবে বৈধী ভোগের বিধান; সে বিধানের মধ্য দিয়েই তারা চল্‌বে। তাদেরও স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডার থাক্‌বে না। তাদের আয় ব্যয় সমস্তই সঙ্ঘ গ্রহণ কর্‌বে। তারা কিন্তু সঙ্ঘের বিধানকে নিয়মিত ভাবে পালন করে' চল্‌বে। এ বিধান কি, তাহা আর অপ্রত্যক্ষ, গোঁজামিল নেই; আমি যে বিধান তাদের জন্য প্রবর্ত্তন কর্‌বো, তাহাই তারা অনুসরণ কর্‌বে। আনুগত্যের ফলে, তাদের জীবনটাও শনৈঃ শনৈঃ ভগবানের দিকেই চল্‌বে। তারা যত অর্থোপার্জ্জন কর্‌বে, সবটাই সঙ্ঘের অর্থভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট কর্‌বে। স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা সঙ্ঘ কর্‌বে। এই অবস্থার ভিতর দিয়েই তারা নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম হওয়ার পথে চল্‌বে।

তৃতীয় অবস্থার কথা—যে সকল পুরুষ ও নারী সঙ্ঘের অখণ্ড অর্থভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত হতে সমর্থ নয়, তাদের সেখানে স্বাধীনভাবে চল্‌তে দিতে হবে। কিন্তু তারা সঙ্ঘের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে যদি চায়, ইহার ভিতর দিয়েও সম্ভব হবে। সঙ্ঘের আচার-পদ্ধতি তারা পরিবারের মধ্যে প্রবর্ত্তিত কর্‌বে। সেখানেও পুরুষ নারীকে সংযমের মধ্য দিয়ে চলার কথা আছে। তাদের বৈধী ভোগের বিধান অনুসরণ কর্‌তে হবে। অর্থভাণ্ডার স্বতন্ত্র হলেও, তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব তারা নিয়মিত ভাবে

সঙ্ঘের সম্মুখে ধরবে—ইহার ভিতর দিয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমান ক্রমশঃ অপসারিত হবে। মানুষের অভিমান ও অহঙ্কারই নিঃস্বার্থ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না, ভগবানের পথে চল্‌তে হ'লে তাকে নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ ও নিরভিমান হওয়ার তপস্যা গ্রহণ করতেই হবে। যতক্ষণ কর্ত্তৃত্বাভিমান, ততক্ষণ কেহ আপনাকে নিঃশেষে লয় করতে সমর্থ হয় না। উপার্জ্জিত অর্থের উপর সম্পূর্ণ অধিকার তাদের থাক্‌বে, স্বেচ্ছানুসারে ব্যয় করার স্বাধীনতাও তাদের আছে; কিন্তু সে ব্যয়ের একটা হিসাব সঙ্ঘ তাদের কাছ থেকে দাবী করবে।

তারপর, চতুর্থ অবস্থার কথা—এই তিন অবস্থার কোনটাই যে ব্যক্তি গ্রহণ করতে অক্ষম, অথচ সঙ্ঘের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ থাক্‌তে ইচ্ছুক, সে তার পরিবারে শুধু সঙ্ঘের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করুক, তাকে আর কিছু করতে হবে না। ইহার মধ্য দিয়েই সে সঙ্ঘের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারবে।

এই চারি অবস্থার কথা ব্যক্ত করলুম। কত দিক্ দিয়া সঙ্ঘের ব্যাপ্তি সম্ভব, তাহা বুঝ্‌তে পারছ। প্রত্যেকে স্ব স্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে সঙ্ঘে সেবা দান করুক, ভগবানের পথে চলার অধিকারী হয়ে উঠুক। আমরা চাইছি—একটা জাতি গড়ে' তুলতে; সুতরাং একই categoryতে (শ্রেণীতে) সকল পুরুষ নারীকে ফেল্‌তে গেলে জীবনের স্বচ্ছ প্রকাশ হয় না; parasite-এর (পরভোজীর) মত তারা অপরের বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে, নিজেদের জীবনও ব্যর্থ করে। তোমরা বুঝ্‌তে পারছ, সঙ্ঘ কিরূপে সমগ্র জাতিটাকে প্রতি ব্যষ্টিকে স্ব স্ব অবস্থায় রেখেও ভগবানের পথে চলার সুযোগ দান করতে পারে। যারা সঙ্ঘের সঙ্গে যোগ রাখার জন্য উপাসনাটুকু করতেও অসমর্থ, সেখানে সঙ্ঘের দান আর পৌঁছাবে না, কারণ তারা একেবারেই এদিক্ থেকে মুখ ফিরাতে চায়।

আজ আমাকে নির্ম্মমভাবেই শ্রেণী বিভাগ করতে হচ্ছে। সঙ্ঘ চায় তার স্বচ্ছপ্রকাশ। এমন একটা ক্ষেত্র গড়ে' উঠুক, যেখানে শোক দুঃখ, ব্যথা অশ্রু থাক্‌বে না—সে ক্ষেত্র হবে নিত্য বৃন্দাবন, ভগবান সেখানে নিত্য বিরাজ করবেন। সঙ্ঘের মানুষ অসুস্থ হলেও, তাকে সে ক্ষেত্র থেকে দূরে রেখে দিতে হবে, আবার নিরাময় হয়ে সে ক্ষেত্রে যোগদান করবে। সঙ্ঘের আশ্রয়ে দিন কিনে নেবার আর সুযোগ থাক্‌বে না। যে আজ সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, বিরক্তিপরায়ণ, তাকে বিদায় দাও; আর এক মুহূর্ত্ত সে যেন সঙ্ঘের বিশুদ্ধ ক্ষেত্রকে বিষিয়ে তুল্‌তে না পারে।

আমি বীরাষ্টমীর দিনে সকল অবস্থার কথাই তোমাদের নিকট ব্যক্ত করলুম। সুতরাং প্রত্যেকে স্ব স্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে সঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার তপস্যা গ্রহণ কর; শুধু সুযোগ সুবিধা দেখে চলার প্রবৃত্তি যেন না আসে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, কাহারও উপর আমার বিদ্বেষ, বিরক্তি নেই; প্রত্যেক মানুষের যে শ্রেয়ঃ পথ তা তাদের সম্মুখে ধরছি! যদি তারা আমার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, আমার বাণীকে বিশ্বাস করে' তদনুযায়ী জীবনকে গড়ে' তোলার প্রচেষ্টা করে, তবেই জীবনকে ভাগবতমুখী করে' তোলার সন্ধান পাবে—নতুবা যদি ইহার মধ্যে কোন অভিসন্ধি বা নিজের উপর অন্য কিছু আরোপ করে, কোনদিন তারা এ পথে চল্‌তে পারবে না, জীবনকে তারা ব্যর্থ করবে।"

বাংলা ও বাঙ্গালী

কবি কামিনী রায়—

"তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।"

বিরহ-কাতর মাতৃহৃদয়ের উদ্ভ্রান্ত স্নেহব্যাকুলতাপূর্ণ বুকের দরদ দিয়া 'আলো ও ছায়ার' কবি আর এমন করিয়া জাতীয় জীবন আশার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করিবেন না। কবি কামিনী রায় আর ইহ-জগতে নাই। বাণীর একনিষ্ঠ পূজারী বিগত মহাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কবি নাই; কিন্তু আছে তাঁর বাণী, তাঁর বিশ্বাসের বীর্য্য, তাঁর উৎসর্গীকৃত জীবনের সমুজ্জল আদর্শ—

"যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।"

কবি শুধু কথার গাঁথুনি বাঁধিয়া শূন্যগর্ভ যশঃ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিতা হন নাই; জীবন-সাধনায় পরম দৃষ্টি পাইয়াছিলেন, তাইতো শত দুঃখ-শোক-ঝঞ্ঝার মাঝেও তাঁর কণ্ঠ চিরিয়া বাণী উদ্গীত হইয়াছিল 'প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা'। হৃদয়ের সম্প্রসারণে তিনি দেশের দশের সুখে-দুঃখে মিলিয়া মিশিয়া নিজেকে লয় করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁর এ নশ্বর মর্ত্ত্য শরীর-ধ্বংসেও তিনি বিস্মৃত হইবার নয়—সকলের হৃদয়ে তিনি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে চিরন্তন বিজড়িত থাকিবেন। অচঞ্চল অমর 'যৌবন-তপস্যা'র গানই তিনি গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছিলেন চরম নিত্যবস্তু; তাই চরমের ভিতর দিয়াই তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন পরম বস্তু, বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ। জীবনের সাধ্যপ্রেমকে তিনি প্রাণের বিদ্যুদ্বীর্য্য দিয়া সাধিয়াছিলেন। তাঁর জীবনের সে উলঙ্গ চাওয়ার পথে সব কিছুকে উপেক্ষা করিয়া তাইতো তিনি গাহিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—

"এদেহ, ভঙ্গুর দেহ, বেঁকে যাক্,—ভেঙ্গে যাক্;
সরল এ হস্তপদে বল থাক্—নাই থাক্;
খাটিতে না পারি যদি, দশের জীবন জীয়া,
অপরের সুখ দুঃখে, সুখ দুঃখ মিশাইয়া,
প্রেমব্রত করিব পালন।"

৺কামিনী রায়

সাহিত্য, সমাজ, নারীর, দেশের, দশের কল্যাণব্রতে তিনি তিলে তিলে আত্মজীবন ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন। কবির রচিত কবিতার ছন্দে ছন্দে তাঁর এ অনাবিল প্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট। 'আলো ও ছায়া', 'সেবা ধর্ম্ম', 'সত্যাগ্রহী', 'নারী নিগ্রহ', 'নারীর দাবী', 'নারীর জাগরণ' 'মহাশ্বেতা', 'পুণ্ডরীক' প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁর অমর অবদান চিরদিন তাঁকে অমর করিয়া রাখিবে।

তিনি কেবল সাহিত্যিকাই ছিলেন না। বাংলার নারীর লাঞ্ছনা তাঁর কোমল হৃদয়ে অশেষ ব্যথা সৃজন করিত। বস্তুতঃ এই মহীয়সী নারীর তিরোধানে বাংলার মহিলা এক বিশিষ্ট অভিভাবক হারাইলেন, জাতি এক কল্যাণময়ী প্রতিভা ও প্রজ্ঞা হইতে বঞ্চিত হইল। মৃত্যুকালে কবির বয়স ছিল ৬৯ বৎসর। তাঁর পবিত্র অশরীরিণী আত্মা অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনের এই অন্ধকার-মুহূর্ত্তে অলক্ষ্যে আলো দান করিবেন। ওঁ শান্তি!!!

স্মৃতিবাসর—

অতীতে যাঁরা দেশ জাতি দশের বা কোন মহান্ আদর্শের তরে জীবন ঢালিয়া সাধনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষের স্মৃতি-পূজা জাতীয় জীবনে

জাগরণেরই পরিচয় প্রদান করে। প্রতীচ্যের স্বাধীন দেশেও বীরের প্রতি সম্মানার্ঘ্য দিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে—সে কত রকমে- পটে, মূর্ত্তিতে, কত ব্যয়সাধ্য কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ইহবিমুখ ভারত মর্ত্ত্যের বুকে নশ্বর কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অতীতের স্মৃতিকে বাহ্য সম্মান দিবার প্রয়াস কোন দিন করে নাই। উৎসব-অনুষ্ঠান-আচার-আচরণের মধ্য দিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার সুষ্ঠু রীতি সনাতন ভারতের জীবননীতির সঙ্গে অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে নিত্য- কালের জন্য গাঁথিয়া রাখিবার এক অভিনব আয়োজন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার চাপে আত্ম- জীবননীতির উপর যে আস্থাহীনতার প্রলেপ ইদানীং আনিয়া দিয়াছিল তাহাতে জাতীয় জীবন-সৌধের বনিয়াদ অশ্রদ্ধা- উপেক্ষা-দারিদ্র্য ও বিস্মৃতির আঘাতে অনেকখানিই শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। পরানুকরণ সর্ব্বতোভাবে দূষণীয় না হইলেও জাতীয় জীবন যদি তার অতীত বৈশিষ্ট্য, সভ্যতা এবং স্বাধিকারের উপর গড়িয়া না উঠে, তবে তাহা মহিমাহীন ও গৌরববর্জ্জিত হইয়া পড়ে। তাই এই সকল স্মৃতি-বাসর যাহাতে হৃদয়ের সশ্রদ্ধ অবদানে অনুষ্ঠিত হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি থাকা উচিত। অতীতের প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জাতীয় জীবনে একটা অনাহত শক্তিপ্রবাহই সৃজন করিবে।

ভারতীর জাগরণচঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের কীর্ত্তিমান্ বীরের উদ্দেশ্যে জাতির শ্রদ্ধার্ঘ্যদানের যে সাড়া লক্ষে পড়ে তাহা আশাপ্রদ। সম্প্রতি শতাব্দী পূর্ব্বে যে যুগে যুগ-পুরুষ শত বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শতবার্ষিকী শ্রদ্ধা-বাসরে সমগ্র জাতির সঙ্গে আমরাও আমাদের শ্রদ্ধাতর্পণ করিতেছি।

৺রামমোহন মৃত্যু-শতবার্ষিকী

নব-বাংলার জন্মদাতা, স্বাধীনতার অগ্রদূত, শক্তির ধন্যপুত্র রাজা রামমোহন রায় শক্তিপূজার মহাষ্টমীর শুভ- ক্ষণে ইহলীলা সম্বরণ করেন। সে আজ একশো বছর পূর্ব্বে। জ্ঞানে অজ্ঞানে তাঁর অবদান শতাব্দী ধরিয়া দেশ-জাতিকে প্রবুদ্ধ করিয়াই চলিয়াছে। রাজাকে নব্য ভারতের স্রষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। খাঁটি সত্য ও ধর্ম্মজীবনের অটল ভিত্তির উপর জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়াই তাঁর বিদ্রোহী সত্তা ধ্বংস ও সৃজনের যুগপৎ সংগ্রাম আজীবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁর মুক্তিকামী অসাধারণ জীবনের দূরদৃষ্টি বিশ্বের সকল বাধাকে উপেক্ষা করিয়া, রক্ষণশীলদলের গতানুগতিকতাকে পদদলিত করিয়া জাতীয় ভবিষ্যৎকে নিরাময় ও স্বাস্থ্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষা-সমাজ-ধর্ম্মে তাঁর কল্যাণ-হস্তের চিহ্ন চিরোজ্জল রহিবে।

কলিকাতার বুকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা রাজার নিষ্কলুষ জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের বিপুল প্রচেষ্টার বিজয়ী- কীর্ত্তিস্তম্ভ। সর্ব্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার অগ্নি-আকাঙ্ক্ষা জ্বালিয়া দিবার একটা দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে প্রবাহিত হইতে দৃষ্ট হয়। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে হিমালয় উলঙ্ঘন করিয়া তিনি তিব্বতের মুক্ত বায়ুর স্পর্শে ধন্য হইয়াছিলেন। রাজা হিন্দুজাতির ধর্ম্মের, সমাজের, হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনার মধ্যে যেসকল সংস্কার ও বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছিলেন, জাতীয় জীবনের সে অন্ধকার-যুগে তাহা অপ্রীতিকর হইলেও, আজিকার বাংলা তথা ভারত সেই উদার নির্ভীক যুগপুরুষের চরণে মাথা নত না করিয়া পারে না। ধর্ম্মকে দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নামাইয়া আনাইবার একটা অভিনব প্রেরণা রাজার মধ্যে দৃষ্ট হয়। তিনি বলিতেন—"ধর্ম্ম ঈশ্বরের, রাজনীতি কি সয়তানের ?"

সতীদাহ-নিবারণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন, চীনের সহিত ভারতের অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রবর্ত্তন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাসংস্থাপনের প্রচেষ্টা প্রভৃতি বহুমুখী কর্ম্মের সুফল আজ তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে দেশবাসী ভোগ করিতেছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইহাই তাঁহার শেষ যাত্রা—রাজা আর দেশে ফিরেন নাই।

আজ শত বৎসর পরে এই দিব্য সত্যমূর্ত্তির উদ্দেশে আমরা হৃদয়ের পূজার্ঘ্য প্রদান করি।

৺মহেন্দ্রলাল সরকার

বাংলায় নবজাতি গঠনের উদ্যোগ পর্ব্বের অন্যতম পুরোহিত মহেন্দ্রলাল সরকারের শতবার্ষিক জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কেবলমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রেই তাঁর প্রতিভা রুদ্ধ ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কলিকাতার শরিফ, কর্পোরেশনের কমিশনার প্রভৃতি বিচিত্র কর্ম্মভারের সঙ্গে তাঁর বহুমুখী জীবনকে সংশ্লিষ্ট দেখি। বৈদ্যনাথের রাজকুমারী-কুষ্ঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন মহেন্দ্রলাল। কলিকাতার বিজ্ঞানসভা তাঁর জীবনের এক বিরাট্ কীর্ত্তি। ভারতের অন্যত্র তখনও এই বিজ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় নাই; কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই মহাপুরুষের চেতনার ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে বিজ্ঞানচর্চ্চার যে গুরুত্ব তাহা তখনই সম্যক্ প্রতিভাত হইয়াছিল।

তাই আজ তাঁর জন্মের শতবর্ষ পরে, আমরা বাঙ্গালী বাংলার এই মনীষী পুরুষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমাদের অকপট শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করিতেছি।

সন্তরণে বাঙ্গালী তরুণের কৃতিত্ব—

সুযোগ ও সুবিধা পাইলে বাঙ্গালী যে পৃথিবীর যে কোন জাতির সমকক্ষ হইতে পারে, সে প্রতিভা ও সামর্থ্যে, বিমানচালনে, যুদ্ধক্ষেত্রে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী আজ অবিদিত নয়। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার নিষ্পেষণে, দুঃখে, দৈন্যে নিপীড়িত জাতি আজ জাতি-হিসাবে মাথা তুলিতে না পারিলেও, এই পরিপন্থী অবস্থার মধ্য হইতেই জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বাংলার যে কয়েকজন কৃতী সন্তান অসাধারণ জীবনের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলই করিয়াছে।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ সম্প্রতি রেঙ্গুনে গিয়া অবিরাম সন্তরণ করিয়া সভ্যজগতে সন্তরণ-কৃতিত্বে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহা দেশ ও জাতির গৌরব, সন্দেহ নাই।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রফুল্লকুমার কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীতে একাদিক্রমে ৭২ ঘণ্টা ১০ মিনিট অবিরাম সন্তরণ করিয়া পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেন বলিয়া ঘোষিত হয়। পরাধীন জাতির বাধা পদে পদে। চিরদিনের অসম্মানিত যে তাকে সম্মানের আসনে বসাইতে ঈর্ষ্যা-

রেঙ্গুণে সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমারের অভিনন্দন

পরায়ণ মানুষের বাধে। ইহাতে এংলো-ইণ্ডিয়ান মহলে ও অন্যান্য কোন কোন ক্ষেত্রে নানা আপত্তি উঠায়, "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা এই প্রতিযোগিতা 'অফিসিয়াল' ভাবে হয় নাই বলিয়া প্রচার করে ও গত ১৭ই আগষ্ট রুথ লিজিল নাম্নী একজন জার্ম্মাণ বালিকা ৭৯ ঘণ্টা সন্তরণ করেন বলিয়া নজীর দেখায়—যদিও এই প্রচেষ্টায় রুথের মৃত্যু হয়।

ইহাতে বীরহৃদয় নিরুৎসাহ হয় নাই। একটু সুস্থ হইয়াই প্রফুল্লকুমার সদলবলে রেঙ্গুনে যাত্রা করেন। সেখানে ডাঃ ডুগালের নেতৃত্বে একটি কমিটী গঠিত হয়। ২২শে অক্টোবর প্রাতে ৮টা ৬ মিনিটের সময়ে তিনি রেঙ্গুনের এক হ্রদে সন্তরণ আরম্ভ করেন। সেখানকার

অনভ্যস্ত জল, আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তিনি ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট একাধিক্রমে অবিরাম সন্তরণ করিয়া পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেন ও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণকারীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্মান অর্জ্জন করেন। ৫০ ঘণ্টা সন্তরণের পরও তিনি ৫০ গজ দ্রুত সন্তরণের প্রতিযোগিতায় একজন এংলো-ইণ্ডিয়ান যুবককে ১০ গজ পশ্চাতে ফেলিয়া হারাইয়া দিয়াছেন। সন্তরণের শেষ দিনে প্রায় লক্ষ লোক উপস্থিত ছিল। তিনি রেঙ্গুনবাসিগণ কর্ত্তৃক অশেষ সম্মানে সম্মানিত হন ও সাতখানা স্বর্ণপদক ও একখানা রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। প্রফুল্লকুমার ইংলিশ-চ্যানেল না থামিয়া পারাপার হইবার জন্যও অভিপ্রায় করিয়াছেন। তিনি যশস্বী ও দীর্ঘজীবী হইয়া দেশ ও জাতির গৌরবাৰ্জ্জন করুন, ইহাই কামনা করি।

বাংলার তরুণীর অগ্রগতি—

আজিকার জাগরণ-যুগে নারীর দ্রুত প্রগতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নারীর অভিমান আজ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে; নাচে-গানে-বাদ্যে-শিল্পে-সঙ্গীতে-সাহিত্যে-শিক্ষায় সর্ব্বত্রই নারী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিমান-চালনা প্রভৃতি বিপজ্জনক পুরুষোচিত কর্ম্মক্ষেত্র হইতেও নারী পশ্চাৎপদ হয় নাই। যুগের প্রবাহের সঙ্গে তৃণের মত ভাসিয়া না চলিয়া যদি আত্মস্থ হইয়া নারী চলিতে পারে, তবেই তার এ অত্যুগ্র প্রাণচঞ্চলতা জাতিকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিয়া তুলিবে।

কিছুদিন হইতে শিক্ষা ও সঙ্গীত-শিল্পে নারীর জাগরণ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। গত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নারী যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে তাহা নারী-শিক্ষা-প্রগতির প্রকৃষ্ট পরিচয়ই প্রদান করে।

শ্রীমতী রমা বসু এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বি-এ, পরীক্ষায়ও ইনি দর্শন-শাস্ত্রের অনার্সে প্রথম বিভাগের প্রথম হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাতা লেখিকা স্বর্গীয়া রমলা দেবীর ইনি কন্যা ও স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পৌত্রী।

শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্তা এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, পরীক্ষায় ইতিহাসের প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। মেয়েদের মধ্যে বাংলায় বোধহয় ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী অশোকা সেনগুপ্তা গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছেন।

এই বৎসরে মিঃ জে, পি ব্যানার্জ্জির একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অমিয় ব্যানার্জ্জি অক্সফোর্ডের বি-এ অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাংলার শিক্ষার্থিনীর মধ্যে ইনিই এই সম্মান প্রথম লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়ও শ্রীমতী ব্যানার্জ্জী ইংরাজীতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে ষ্টেট স্কলারশিপ পাইয়া ইনি বিলাতে উচ্চশিক্ষার্থ গমন করেন।

ভারতীয় নারীদিগের মধ্যে প্রথম পথপ্রদর্শিকা হিসাবে শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের এম-এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকার করিয়াছিলেন ও বর্ত্তমানে ইতিহাসের প্রাচীন মুদ্রালিপির গবেষণা-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইনি ঢাকার রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষের পৌত্রী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর বুভুক্ষা কি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা কলেজের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিলেই অনুমিত হয়।

সম্প্রতি এলাহাবাদের ৪র্থ বার্ষিক নিখিল-ভারত-সঙ্গীতসম্মেলনে ও প্রতিযোগিতায় বালিকাদের মধ্যে কলিকাতার অষ্টম বর্ষীয়া শ্রীমতী শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং তাহার অপূর্ব্ব সঙ্গীত-নৈপুণ্যে সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়। শ্রীমতী বীণাপাণিও তাহার বিভাগে প্রথম হয় এবং বিশেষ করিয়া 'খেয়ালে' অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। এতদ্ভিন্ন এই সম্মিলনে দেশ-বিদেশের দেড়শত প্রতিযোগীর মধ্যে বাংলার নারী-পুরুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্ব বিভাগেই বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমতী পদ্মাদেবী

শ্রীমতী পদ্মাদেবী বোম্বাইয়ের ফিল্‌ম জগতে ইতিমধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের এই "ফিল্‌ম-ষ্টার" 'বাংলার নাইটিংগেল' বলিয়া অভিনন্দিতা হইয়াছেন। কলিকাতায় ইনি নীলিমা ব্যানার্জ্জী নামে পরিচিতা ছিলেন। বছর চারেক পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই গমন করেন। 'পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা' নির্ব্বাক্ চিত্রে কর্ণাটকী সাজিয়া তিনি প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। সবাক্ চিত্রে 'সতী মহানন্দায়' পদ্মাবতীর যশঃ ও গৌরব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সঙ্গীত-নৈপুণ্যেও তিনি ফিল্ম-জগতে বিশিষ্ট স্থান ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। নীলিমা দেবী আবার স্নেহময়ী মাতা ও গৃহকর্ত্রী।

সমালোচনা

"বস্তির গল্প"—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। খাদি প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা হইতে শ্রীহেমপ্রভা দাশগুপ্তা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

সাহিত্যিক হিসাবে না হইলেও, ব্রতধারী একনিষ্ঠ কর্ম্মী হিসাবে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বাংলায় সুপরিচিত। তিনি নীরব কর্ম্মী, কর্ম্ম তাঁর জীবনসাধনা। 'বস্তির গল্প' লেখার উদ্দেশ্য বোধহয় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া সাহিত্যামোদীদের তৃপ্তি বিধান করা নয় এবং গল্পের আর্ট হিসাবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বও দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু যে হরিজন-সেবায় তিনি হৃদয়ের সবখানি দরদ ঢালিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহারই একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও করুণাপূর্ণ ছবি জীবন্ত হইয়া আলোচ্য গ্রন্থের আটটী গল্পের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রচলিত উপন্যাসের প্রেমাভিনয়ের ছড়াছড়ি না থাকিলেও, এই একান্ত বাস্তব কাহিনীর যে প্রাণ আছে তাহা দরদী মাত্রেরই মর্ম্মস্পর্শ করিবে। সময়োপযোগী বলিয়া বইখানি সকলেরই পড়া উচিত। কাগজ, বাঁধাই ভাল।

ইন্দ্রাণী—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, ৩১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য—২৲ টাকা।

বিপ্লব এসেছে, সে বিপ্লব যে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না—কিন্তু সেই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নারী তার সনাতন উৎসর্গের পথই খুঁজে পাবে—এই হচ্ছে এই উপন্যাসখানির খাঁটি মর্ম্মকথা। বইখানি আমরা পড়েছি—পড়ে' আনন্দ পেয়েছি। প্রতিভাশালী লেখকের লেখনী একটা অনিবার্য্য প্রেরণাস্রোতে যেন ভেসে চলেছে—আর এমনি স্বচ্ছ, সুন্দর, মনের নিখুঁত তরঙ্গভঙ্গিমার সঙ্গে সমানতালে নৃত্য-শীল ভাষা ও সাবলীল প্রকাশ-রীতি গ্রন্থকার পেয়েছেন যা সত্যই অভিনব। উপন্যাসখানিতে রুচিগত মালিন্যের আশঙ্কার কারণ নেই—এইটুকু বলিলেই বোধ হয় এক্ষেত্রে যথেষ্ট হইবে। "ইন্দ্রাণী" অচিন্ত্যবাবুর একখানি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও উপন্যাস হিসাবে সার্থক হয়েছে।

সাময়িকী

"সোণার বাংলা"—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত। শ্রীবারিদকান্তি বসু কর্ত্তৃক সাধন প্রেস, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সডাক বার্ষিক চারি টাকা, প্রতি সংখ্যা এক আনা মাত্র।

সোণার বাংলা সাপ্তাহিক, সবেমাত্র বর্ষ হইয়াছে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ইহা যেন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে—ইহাই প্রার্থনা।

— রাষ্ট্র —

"প্রবর্ত্তকে"র জামীন—

গত ২রা নভেম্বর বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "প্রবর্ত্তকে"র প্রকাশক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, মহাশয়ের উপর নোটিশ জারি হইয়াছে যে, ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে "প্রবর্ত্তকে" যে "বাংলার দুর্দ্দিন ও প্রতিকার" প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন সকল কথা আছে, যাহা প্রেস আইনের ১০ ধারার ৪ আইনে বাধে; অতএব ১৪ই নভেম্বরের মধ্যে ৫০০ শত টাকা কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জমা না দিলে, তিনি পত্রিকা, পুস্তক প্রভৃতি কিছুই আর প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি—

খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে এই দণ্ডাজ্ঞা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। বিগত সপ্তদশ বৎসর "প্রবর্ত্তক" বাহির হইতেছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে না থাকিলেও, দেশের অবস্থা ও মর্ম্ম লইয়া আমরা চিরদিন আলোচনা করিয়াছি। চন্দননগর হইতে "প্রবর্ত্তক" প্রকাশ বন্ধ করা হইয়াছিল—"Sea Customs Act" অনুসারে। তারপর প্রেস অর্ডিন্যান্স যুগে এক হাজার টাকা জামীন তলব হইয়াছিল, ইহার পর সতর্ক-বাণীও পাওয়া গিয়াছে; প্রেস আইনের বন্ধন বাদ গেল না। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনায় আমাদের মনে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে; তাহা মনের সংশয়াত্মক ধর্ম্ম হইতে পারে, এইজন্য তাহা প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ।

আইনের কথা আমরা আমলে আনি নাই—উপেক্ষা বশতঃ নহে, অন্তরের দিকে কোন অশুভেচ্ছা খুঁজিয়া পাই না, অতএব অন্তরের ভাবই ভাষায় ব্যক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় ছিল না; কাজেই নিঃশঙ্ক হৃদয়ে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে প্রেস আইনের আঘাতে বিষয়টা আবার তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। অপরাধী বলিয়া বিবেক সায় দিল না।

প্রেস আইনে যাহা বাধা তাহা চারিটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। অংশগুলি পাঠ করিয়া প্রথমে আমার নিজেরই মনে হইল, অপরাধী হইয়াছি, কাজেই এই অনূদিত অংশটুকু দেখিয়াই সকাউন্সিল গভর্ণর বাহাদুর যে দণ্ড জারি করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বের ও পরের ছত্র ইহার সহিত বিযুক্ত হওয়ায় অংশগুলির যে বিপরীত অর্থ হইয়াছে, তাহা তিনি দেখিবার অবসর পান নাই।

প্রসিদ্ধ "আনন্দ বাজার পত্রিকায়" এই প্রসঙ্গে যে যুক্তিযুক্ত অভিমত বাহির হইয়াছে, তাহা আমাদেরও মর্ম্ম কথা—"......বাংলার দুর্দ্দিন ও প্রতিকার" উপায়-নির্দ্দেশে সমসাময়িক রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা—সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ করিলে সাধারণ লোকও বুঝিতে পারিবে, যে গঠনমূলক কার্য্যের উপরই এই প্রবন্ধটার ভিত্তি;" "......সমগ্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় উপেক্ষিত, প্রবন্ধের মধ্য হইতে ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া কয়েকটা অংশ দেখাইয়া হুকুম জারি হইল......"—আমরা সহযোগীকে ইহার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

অংশগুলি পুনরুদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করা আর সম্ভব নয়। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই সম্বন্ধে বক্তব্যটুকু জানাইয়া রাখি।

"প্রবর্ত্তক" সংগঠনমূলক কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র। অহিংসা-নীতি ইহার কর্ম্মের সুযোগ অথবা কৌশল নহে, ধর্ম্ম। অতএব এই মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি কেমন করিয়া

হিংসাত্মক হইবে, এই ধারণায় অংশগুলির পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া যেটুকু সত্য অনুভূত হইল তাহাই প্রকাশ করিলাম।

প্রথম কথা—"বিপ্লব" শব্দটী বাংলায় যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা সর্ব্বসময়ে ইংরাজীতে "Revolution" বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই নহে। মেয়েরাও সংসারে গোলযোগ দেখিলে বলে—"বাপ্, যেন বিপ্লব বেধে গেছে!" প্রবর্ত্তক "বিপ্লব" কথাটী চিরদিন এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছে, যথা—"জীবন-বিপ্লব", "অন্তর-বিপ্লব" "ভাব বিপ্লব" ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'বিপ্লব' শব্দ এই সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই দিক্ দিয়া প্রথম অংশটী অংশ হিসাবেও দোষযুক্ত নহে, ইহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত মত হইবে।

দ্বিতীয় অংশটী দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা মাত্র। এবং এই অবস্থা যে নানা প্রকার আইনের নাগপাশে সংযত হইয়া আছে, ইহাতে এইরূপ একটা ইঙ্গিত ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু তরুণের চিত্তে ইহা দ্বারা উত্তেজনা-সৃজনের আদৌ সম্ভাবনা নাই; তৃতীয় অংশটীর উপরের প্যারাটী যদি কেহ পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, হিন্দু বাঙ্গালীর সামাজিক দুরবস্থা দেখাইয়া ইহার প্রতিকার যে শাসন নহে, এই কথা বলারই প্রয়াস হইয়াছে; পূর্ব্ব প্যারায় দুর্দ্দশার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই সমাজের প্রকৃত অবস্থাই জ্ঞাপিত হইয়াছে।

শেষাংশের ভাব অনুবাদে ঠিক ব্যক্ত হয় নাই, বিপরীত অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে। এই অংশের মধ্যে "অকস্মাৎ" শব্দটীর অনুবাদ দেওয়া হয় নাই। "শুক্তিতে রজত" ভ্রম হওয়ায় ন্যায়, অকস্মাৎ সহজ দৃষ্টিতে যাহা পড়ে তাহা সত্য নহে, এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। তাহা পরের প্যারা পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কিন্তু আমাদের কথা যখন আঠার বৎসর ধরিয়া বুঝাইতে পারি নাই, আজ যে তাহা পারিব সে আশা রাখি না। তবে দুঃখের কথা, ভাব ও ভাষা বিযুক্ত করিয়া মর্ম্মে যেখানে আঘাত দেওয়া হয়, সত্য দৃষ্টির অভাবই সেইখানে প্রত্যক্ষ হয়। বাংলার দুর্দ্দিন বাঙ্গালীকেই দূর করিতে হইবে, সেই অধিকারটুকু আজ দরকার হইয়াছে। যে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইলে জাতি-রক্ষা হয়, সেই দিকটার বিশ্লেষণ প্রয়োজন-মত করিতে যদি বাধে, তবে সেই ক্ষেত্রে নীরবতাই আশ্রয় করিতে হয়। অন্ধকার ইহাতে কি অধিক ঘনাইয়া উঠে না? স কাউন্সিল গভর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসন বাহাদুরের এই দিকেই আমরা অনুগ্রহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

"Whither India"—

মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা ও পত্র-বিনিময়ের পর, "Whither India" শীর্ষক তিনটী ধারাবাহিক প্রবন্ধে পণ্ডিত জহরলাল যে মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার নূতন মুক্তি-দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দর্শন—আন্তর্জাতিক সমাজ-তন্ত্রবাদ। জহরলাল নিজেকে একজন "সোশ্যালিষ্ট" অর্থাৎ সমাজ-তন্ত্রবাদী বলিয়াই ইতিপূর্ব্বেও খ্যাপন করিয়াছেন—লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে তাহার উল্লেখ ছিল, "Whither India"র তাঁহার সমগ্র চিন্তাপ্রণালী বেশ স্পষ্ট ও জীবন্ত করিয়াই দেশের কাছে ধরিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ঠিকই বলিয়াছেন, জহরলাল যে আদর্শবাদ প্রচার করিতেছেন তাহা তাঁহার চিরপোষিত আদর্শ হইতে একান্ত নূতন ও বিভিন্ন কিছু নহে, তবে তাঁহার সহিত ইহার মনোবৃত্তিগত তারতম্য যথেষ্ট। জহরলাল যেন স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিতেছেন, তিনি নিছক বস্তুতন্ত্রবাদী, ধর্ম্ম, আদর্শবাদ, ভাবপ্রবণতার কোনও ধার ধারেন না—এই সকল জিনিষকেই তিনি এক নিঃশ্বাসে 'ম্যাজিক' বা যাদু শ্রেণীভুক্ত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—যাহা "confuse and befog the mind"—'মনকে ঘোলায়, কুহেলিকাচ্ছন্ন করিয়া তুলে।' মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্র-সাধনা যে এই শ্রেণীরই, এ সম্বন্ধীয় মনোভাবও তাঁহার লেখা পড়িলে গোপন থাকে না। মনে পড়িয়া যায়, বরিশাল কন্‌ফারেন্সে ৺বিপিনচন্দ্রের কথা—তিনিও 'লজিক" ও "ম্যাজিকে"র ধুয়া তুলিয়া সেদিন যেমন মহাত্মার অনুপ্রেরণার বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভের ঝড় তুলিয়াছিলেন, আজ এতদিন পরে মহাত্মার অকপট ভক্ত ও স্নেহাস্পদ জহরলালের মুখে সেই একই কথা শুনিয়াও

আমরা তাদৃশ বিস্মিত হই নাই। কারণ, ইহা শুধু জহর লালেরই কথা নহে, যুগেরই কথা। রুষের 'ঋষি' যে দৃষ্টি লইয়া বলেন—"Religion is the opiate of the people", পণ্ডিত জহরলালও সেই একই দর্শন অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন—"I have no faith in or use of the ways of magic and religion."—"ঐন্দ্রজালিক বা ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কোন প্রত্যয়ও নাই, প্রয়োজনও নাই।" অন্য কথায়, তিনি আজ "the science of politics and the politics of science"—বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র-সাধনায় দেশের প্রাণ নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহেন।

ধর্ম্ম যে একটা কুহেলিকা, এই ধারণা ধর্ম্মশক্তিরই ব্যাভিচারের প্রতিক্রিয়া। ইহার জন্য দায়ী তাঁহারা যাঁহারা ধর্ম্মকে একটা সাম্প্রদায়িক সম্পদ্ করিয়া, সর্ব্বসাধারণকে তাহার অমৃতময় আস্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন। অর্থনৈতিক ধন-তন্ত্রও এই একই স্বার্থ-পূজার প্রকার ভেদ মাত্র। সাম্রাজ্যবাদও ইহারই রূপান্তর। যুগের প্রাণশক্তি এই সকলের বিরুদ্ধে নিদারুণ পুঞ্জীভূত মর্ম্মবেদনার অভিব্যক্তি ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গিরণের মত প্রতিবাদের কণ্ঠ তুলিয়াই শুধুই ক্ষান্ত হয় নাই, একটা প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞেরও অবতারণায় কুণ্ঠিত নহে। "Whither India"য় ভারত কংগ্রেস-সভাপতির মুখে এই প্রলয়-সঙ্গীতের আগমনী রাগিণীই ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। কাজেই ইহার প্রভাব অস্বীকার করিবার নহে। 'ভারতবন্ধু' "ষ্টেট্স্ম্যান"ও পণ্ডিতজীর বিশ্লেষণের সহিত মূলগত ঐক্যমত প্রকাশপূর্ব্বক কহিতেছেন—"Even nationalism to-day must manifest itself as economics, because the world's problem is the economic one and is the creation of the machine."—"জাতীয়তাকেও আজ অর্থনৈতিক মূর্ত্তি লইয়া আবির্ভূত হইতে হইবে; কেন না, জগতের সমস্যা আজ অর্থনৈতিক ছাড়া কিছু নয় এবং এ সমস্যা যন্ত্রশক্তিরই সৃষ্টি।" যে জাতীয়তার সাধনায় ভারতের প্রবীণ ও তরুণ প্রাণ দীর্ঘদিন ধরিয়া আত্মাহুতি দিয়াও আজও সফলকাম হয় নাই, তাহার এইরূপ একটা সুদৃঢ় বস্তুনিষ্ঠ অর্থনৈতিক ভিত্তি-নিরূপণ নানা কারণে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত জহরলালের অকপট সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিক উদ্যমের ফলে, যদি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গতিধারা এই দিকে সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাতে শুভলাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

এই সাধনায় শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য্য। জগতের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা, এবং বিশেষ ভাবে, সোভিয়েট রুষিয়ার রক্তসিক্ত বিরাট্ গণবিপ্লবের পরে, এইরূপ একটা ধারণা ক্রমশঃ অনেকেরই মনে বদ্ধমূল হইতেছে। জহরলাল করাচী কংগ্রেসে পরিগৃহীত এই সম্পর্কিত প্রস্তাবটীর মর্ম্মার্থ পরিস্ফুট করিতে গিয়া মহাত্মাকে জানাইয়াছিলেন, জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি ও মুক্তি সুসিদ্ধ করিতে হইলে, "it is inevitable that the vested interests in India will have to give up their special position and many of their privileges."—"ইহা অবশ্যম্ভাবী যে, ভারতের কায়েমী স্বার্থশক্তিগুলিকে স্ব স্ব বিশেষ প্রতিপত্তি ও অনেক সুবিধাই ছাড়িতে হইবে।" যেখানে জাপানের সামুরাই শ্রেণীর মত মহত্তর দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় এই স্বার্থ-ত্যাগ স্বতঃই সংসিদ্ধ হয়, সেখানে সহজেই জাতির ঐক্য সুরক্ষিত ও অটুট থাকে; নতুবা অন্তঃসংগ্রামে জাতীয়তা ছিন্ন-ভিন্ন ও পরিণামে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সোভিয়েট এই শেষের পথটাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে; তাই বলশেভিক রুষিয়া আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের অগ্রদূত—শুধু সাম্রাজ্যবাদ নহে, জাতীয়তারও অন্তরায়। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, বলশিভিজমের স্বক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিকতার সর্ব্বগ্রাসী অনুপ্রেরণা ধীরে ধীরে শুকাইয়া শীর্ণতর জাতীয়তার উপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে। ফ্রান্সের বৈপ্লবিক জাগরণও ইতিহাসে অনুরূপ ক্রম-পরিণতির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে।

জহরলাল এখনও মনে করিতেছেন—এই স্বার্থলোপ (divesting) খুব মৃদু কোমল ভঙ্গীতে ও যতদূর সাধ্য কম আঘাত দিয়া সম্ভব হইবে। ইহা সম্ভব কেবল তখনই যখন জাতীয়তার অনুপ্রেরণা এতখানি প্রবল ও দুর্নিবার হয় যে, তাহার প্লাবনে ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা

সম্প্রদায়ের স্বার্থ সহজেই ভাসিয়া যায়—যেমন মহাত্মাজীর ডাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং স্বয়ং পণ্ডিতজীর পিতা প্রাতঃস্মরণীয় বৃদ্ধ নেহেরুজী একদিনে স্বর্ণদেউল ছাড়িয়া জাতীয়তার তীর্থক্ষেত্রে রিক্ত বেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সেদিন সারা জাতিও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই ত্যাগের আত্মোৎসর্গের ডাক—কে দিবে? কে দিতে পারে? মানুষের প্রাণ কোন অমর প্রেরণার আহ্বানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে দ্বিধা ইতস্ততঃ করে না, আনন্দে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্বার্থ সর্ব্বস্ব বলি দেয়, নিঃস্ব রিক্ত সর্ব্বত্যাগী বেশে উন্মাদ কণ্ঠে নরনারায়ণের জয়ধ্বনি করে? সে কি প্রেম, কি উন্মাদনা, কি অপার্থিব, অলৌকিক প্রেরণা? এই প্রেরণার মূলানুসন্ধান করিতে গেলেই, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পণ্ডিত জহরলালের মুক্তিদর্শনের আদি-ভূমিকা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে—ধর্ম্মের, আদর্শের, অপার্থিব মহাভাবের পবিত্র যাদুস্পর্শ ব্যতীত ভারতের জাতীয়তা কেন, কোন ব্যাপক সমষ্টিমূলক মুক্তিমন্ত্রকে সিদ্ধ করার মহাপ্রাণের জাগরণ আমরা কোনদিনই আশা করিতে পারি না।

ভারতের মন্ত্রশক্তি মহাতাপসকে আশ্রয় করিয়া যে একটা অলৌকিক জাগরণোচ্ছ্বাস গঙ্গোত্রীধারার মত ভূতলে অবতারিত করিয়া গেল, আবালবৃদ্ধবণিতা কোটী কোটী জনসাধারণের প্রাণতন্ত্রীতে সত্য সত্য বিদ্যুৎস্পর্শ ছোঁয়াইয়া আকুল ও উদ্বেলিত করিল, তাহা ধরিয়া থাকার সামর্থ্য যদি এ জাতির থাকিত, তাহা হইলে এই দিক্-পরিবর্ত্তন, এই দর্শন-ভেদ, এই বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের কসরৎ প্রভৃতি কোনও কিছুরই হয়ত প্রয়োজনই হইত না। পণ্ডিত জহরলাল এই ধৃতিশক্তির উদ্বোধন করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম—কিন্তু সে দৃষ্টি, সে তপস্যা খাঁটি ভারতীয় ভাবের অন্তর-দীক্ষা যেখানে নাই, সেখানে আমরা হয়ত বৃথাই প্রত্যাশা করিতেছি। ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও অর্থনৈতিক যে বিরাট্ জাগরণ নূতন গঠন-মূলক কর্ম্মপ্রবাহে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে তাহার প্রকৃত সূত্রের অনুসন্ধান করিবার জন্যই আমরা প্রত্যেক দেশপ্রেমিককে অনুরোধ করিতেছি।

সর্ব্বদল-সম্মিলন—

ভারতে আবার সর্ব্ব-রাষ্ট্রীয় দলের সম্মিলনের কথা উঠিয়াছে। মিঃ হেল্‌স নামক ভারতহিতৈষী ইংরাজও নাকি এই সম্মিলন ঘটাইতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পণ্ডিত মালব্যজী চিরদিনের ন্যায় আজও ইহাতে আন্তরিক উদ্বুদ্ধ, কিন্তু পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যের অভাবে হয়ত ইহাতে সোৎসাহে উদ্যোগী হইতে পারিতেছেন না। মহাত্মা গান্ধী ইহাতে নিজের ব্যর্থতা জ্ঞাপন করিয়া মিঃ হেল্‌সকে জানাইয়াছেন—এ আয়োজনে তাঁহার তেমন প্রাণ নাই। ঐক্য যেখানে নাই, সেখানে ঐক্যমত আনিবার প্রয়াস প্রশংসনীয় হইলেও, ক্ষেত্রে সাফল্যের আশা খুব কম। মতভেদে জীবনভেদের বীজ নিহিত থাকে বলিয়াই, এই প্রচেষ্টা সহজে সফল হইবারও নহে। মতকে মত মাত্র না রাখিয়া, উহাকে জীবনে পরিণত করিতে যাঁহারা উৎসুক তাঁহাদেরই স্বতঃসিদ্ধ আন্তরিক বিনিময়ে মহাবীর্য্যের উৎপত্তি হয়। অন্যথা, শুধু মতামতের সংঘর্ষে শক্তি ও সময়ের বৃথা অপব্যয় তো ঘটেই, উপরন্তু পরিশেষে ভেদবুদ্ধিই আরও বিষাক্ত হইয়া উঠিবারও সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়-দল মত-গত একটা আপোষ ও সুসামঞ্জস্য বিধান করিয়া যদিই বা একটা অখণ্ড চুক্তিতে উপনীত হইতে পারেন, তাহা ভারতের আসল জনসাধারণের বাণী নহে, ইহাও অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। এ অবস্থায়, সর্ব্বদল-সম্মিলনের কথায় আশার পরিবর্ত্তে আশঙ্কার মাত্রাই সমধিক প্রবল হইয়া উঠিবে, ইহা বিচিত্র নহে।

তাহা ছাড়া, এই মিলনের প্রয়োজন আজ কাহাদের মধ্যে, তাহাও দেখিবার আছে। রাষ্ট্রীয় অধিকারের মাত্রা লইয়া গোলযোগের কথা আমরা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; যাঁহারা মুক্তি-সাধনার একটী ক্রমকেও জীবন দিয়া অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাদের সহিত যাঁহারা শুধু মত মাত্র ধরিয়া ধীরচিত্তে অনুকূল আব্‌হাওয়ার প্রতীক্ষা করেন তাঁহাদের মত-গত ঐক্যানৈক্য বিশেষ ফলপ্রসূ নহে। ভারতের রাজশক্তিও আজ হিন্দু অহিন্দু, কংগ্রেস অ-কংগ্রেস সকলকেই সমতুল্য পর্য্যায়ে দেখেন না, ইহাতে সন্দেহ নাই। মতের বিরোধই এখানে বড় কথা নহে,

ত্যাগ ও সংহতিশক্তির মাত্রা-ভেদ ক্রমেই রাষ্ট্রজীবনে সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। এই মৌলিক অধিকার-ভেদ এক বা ততোধিক সম্মিলনের আয়োজনে দূর হইবার নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে "প্যাক্ট" বা চুক্তি করিয়া যে মিলন তাহাতে 'মুড়ি-মিছরীর এক দর' বাঁধিয়া দেওয়ার মত অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে চুক্তি-বন্ধন করিতে হওয়ায়, সুবিধাবাদী পক্ষই প্রতিষ্ঠার সুযোগ করিয়া লইতে পারে। পুণা-প্যাক্টে ডাঃ আম্বেদকারের কার্য্য ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমরা বলি, সর্ব্বদল সম্মিলন নহে, আজ একটা মিলন-লক্ষ্যে নূতন শক্তিই মাথা তুলিয়া দাঁড়াক, যাহারা মত ও জীবন প্রেম ও ঐক্য মন্ত্র সিদ্ধ করিতেই সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবে। ইহা একমুঠা মানুষের মধ্যেও সর্ব্ব প্রথমে যদি চরিতার্থ হয়, সেই সিদ্ধ-বীর্য্য জাতির অসংখ্য ভেদ-বৈষম্যের মধ্যে আপনাকে নিপাতিত করিয়াও, যথার্থ ঐক্যের শক্তি প্রকটিত করিয়া তুলিবে। লক্ষ্য যেখানে ঐক্য নহে, সেখানে মিলনকে যন্ত্র করিয়া স্ব স্ব দলগত পূর্ত্তি অধিক পরিমাণে আদায় করিয়া লওয়ার স্বাভাবিক প্রেরণা সর্ব্বদল-সম্মিলনকে ব্যর্থ করিয়া দিবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে

মেদিনীপুর—

চট্টগ্রামের ন্যায় মেদিনীপুরের অবস্থা যে অতিশয় মর্ম্মন্তুদ শোকাবহ হইয়া উঠিয়াছে তাহা ইউরোপীয়ান জুট এসোসিয়েশনের কে একজন সদস্য মিঃ জে, পি, বেকারের স্বাক্ষরিত লেখা পড়িলে বুঝা যায়। এই প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজ সহরের দুর্ভাগ্যময় চিত্র দিতে গিয়া লিখিতেছেন—"মেদিনীপুরের অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।" তাঁহার মতে, ইহা ঠিক যুদ্ধের পূর্ব্বে আসন্ন অবরোধের কিম্বা যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত হইবার পর যে অবস্থা হয়, তাহারই অনুরূপ। এই সামরিক অবস্থার জন্য দায়ী যে কারণ-পরম্পরা তাহা লইয়া সবিস্তার আলোচনা আমরা অন্যত্র করিয়াছি, এক্ষেত্রে আর করিব না। মেদিনীপুরবাসী নিরীহ শান্তিপ্রিয়, এ কথা উক্ত মিঃ বেকারও স্বীকার করিয়াছেন। এত দুঃখ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও এই নিরীহ প্রজামণ্ডলী হিন্দুমুসলমানে যে সম্প্রীতি ও সমবেদনার বন্ধন রক্ষা করিয়া চলিয়াছে তাহা ভাবিলে পুলকিত হইতে হয়। মিঃ বেকার বলেন—"মুসলমানদিগকে যে সকল পক্ষপাতিত্বমূলক সুবিধা দান করিয়াছিলেন, হিন্দু ভ্রাতাদের দুরবস্থা দেখিয়া মুসলমানেরাও সেই সব সুবিধা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।"

ঘোর-ঘন কালকাদম্বিনী-কুঞ্জে এ যেন আশার বিদ্যুৎ-কণিকা ঝিলিক দিয়া যায়—মেদিনীপুরবাসীর দুর্ভাগ্য-রজনীতে আজ সমস্ত বাঙ্গালী সহানুভূতি ও আশার দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া আছে।

পীড়িত রাজবন্দী—

রাজবন্দীদের কথা বাংলার নিত্য মনোবেদনার কথা। ইহার উপর যখন একটীর পর একটী তরুণ তাজা যুবকদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দুশ্চিকিৎস্য পীড়ার সংবাদগুলি কাণে আসে, দুশ্চিন্তায় বাঙ্গালীর মন ভরিয়া উঠে। শৈলেশের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা চিরতরে ফুরাইয়াছে; সে সকল কথা আর তুলিব না; সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, ঢাকার যুবক ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দেউলীর বন্দীনিবাসে দারুণ কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এ রোগ তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না। দেউলীতে নীত হইবার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরম্ভ হয় এবং দক্ষিণ হস্তের তালি ও দক্ষিণ পায়ের এক অংশে অকস্মাৎ অনুভবশক্তির হ্রাস হইতে থাকে। এই পীড়া ক্রমশঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসন্ধানের উত্তরে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের পলিটিক্যাল আণ্ডার সেক্রেটারী জানাইয়াছেন—"ইহা অসাড় কুষ্ঠরোগ (Aesthetic Leprosy) বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। বন্দীনিবাসে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে, চিন্তার কোনও কারণ নাই।"

ধনেশচন্দ্র নিজে কিন্তু লিখিতেছেন—..."এখানে এ বিষয়ে কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাই।...পীড়া যে ভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমার এই কুষ্ঠরোগ সারিবার কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না।" তারপর তিনি লিখিয়াছেন—"কি ভাবে যে আমার এই অসুখ হইল তাহা কিছুই বলিতে পারি না। এই অসুখ নিয়া বাঁচিয়া থাকার

কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। মনের অবস্থা বড়ই খারাপ। আমার সঙ্গে দেখা করিয়া লাভ নাই। আমার জীবনটা একেবারে নষ্ট হইবার পথে চলিয়াছে।"

এই হতাশার দীর্ঘশ্বাস পত্রের সঙ্গে তাঁহার পরিবারে আসিয়া যখন পৌছিয়াছে, তখন গভর্ণমেণ্ট আণ্ডার সেক্রেটারীর "চিন্তার কোনও কারণ নাই"—এই সান্ত্বনা-বাণী কতটুকু কার্য্যে লাগিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। ধনেশের মনোবৃত্তি ক্রমে ক্রমে আরও ঘনীভূত নৈরাশ্যদগ্ধ হইয়া পরিণামে কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা ভাবিতেও আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে। বাংলার গভর্ণমেণ্ট এই ভগ্নস্বাস্থ্য যুবককে তাহার অভীপ্সিত কলিকাতায় ট্রপিক্যাল চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য অভিভাবক-দের হস্তে সমর্পণ করিলে কি একটী দুর্ভাবনাময় পরিণাম হইতে নিজেরাও কতকটা দায়মুক্ত হইতে পারিতেন না? অন্ততঃ, দেউলীতে যে সুচিকিৎসা হইতে পারে না তাহার যোগ্য ব্যবস্থা করিতে সরকারী তত্ত্বাবধানেও যদি তাঁহাকে আশু স্থানান্তরিত না করা যায়, তবে এই হতভাগ্য যুবকের জীবনাশা পোষণ করা তাঁহার পরিবারবর্গের পক্ষে কোনমতেই সম্ভবপর নহে। এ দুঃসহ ব্যথার আবেদন কি গভর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিবেন?

"সরকার সেলাম"—

হিজলী জেলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি রাজনৈতিক বন্দীদিগের অভিবাদন সম্পর্কে সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হইয়া যাওয়ার পরে ব্যাপারটী যেমন তেমনি রহিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে হওয়ার হেতু আছে। ৮ই নভেম্বরের "অমৃত বাজার পত্রিকা" পাঠে জানা যায়, পত্রিকার আন্দোলন-ফলে "সরকার সেলাম" এই প্রকার অভিবাদনের দাবী না করিয়া অতঃপর ভদ্রোচিত "সুপ্রভাত" জ্ঞাপন করিলেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সন্তুষ্ট হইবেন। ইহাতে আন্দোলনের সার্থকতায় আমরা সুখী হইয়াছিলাম। ১৩ই নভেম্বরের "এসোসিয়েটেড প্রেসের" বিবরণী হইতে বুঝা যায়, হিজলী জেলে এরূপ প্রথা কোন দিনই বুঝি প্রবর্ত্তিত থাকে নাই। এলবার্ট হলের জনসভায় মুক্ত রাজবন্দী শ্রীতারাপদ লাহিড়ী ইহার প্রকাশ্যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন, সেলামের সংবাদ মিথ্যা নহে, তজ্জনিত অপমানজনক দণ্ডদানও তাঁহার প্রত্যক্ষ ঘটনা, অতএব কর্ত্তৃপক্ষ এ সব অসত্য হইলে অস্বীকার করুন। স্বয়ং গভর্ণমেণ্টের দিক্ হইতে এ সম্পর্কে কোনও বিশেষ কথা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অবিলম্বে প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই তুচ্ছ অথচ তিক্ত আন্দোলন অনায়াসেই নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে পারেন।

মানুষের আত্ম-সম্মানে আঘাত না দিয়াও রাজনৈতিক বন্দীদিগের প্রতি কারাঘটিত আইনগুলি যাহাতে প্রয়োগ করা হয়, তাহাই কর্ত্তৃপক্ষের দেখা উচিত। আইন যদি এমন হয়, যাহা অপমান-কর, তাহার আশু পরিবর্ত্তন হওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য। এ বিষয়ে জন-সভার সভাপতি রামানন্দবাবুর যুক্তিযুক্ত মন্তব্যগুলি আমরা সমর্থন করি।

মৃত্যুর পরে—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র পরলোকগত মিঃ পেটেলের শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া যে পত্রটুকু লিখেন তাহা হইতে জানা যায়, বোম্বাই'এর চৌপট্টিতে ৺লোকমান্য তিলকের পার্শ্বে তাঁহার চিতাশয্যা রচনা করিলে তিনি সুখী হইতেন। বিদেহী মহাপুরুষের প্রতি এই শেষ তর্পণাঞ্জলী দিবার অধিকারটুকু যে কোনও রাজনৈতিক কারণেই হউক, না দিয়া বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট সাধারণ মহানুভবতার দিক্ দিয়াও যেটুকু ছোট হইয়া পড়িলেন তাহা অতীব পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। বীরের প্রতি বীরোচিত আচরণ—বিশেষ তাঁহার মৃত্যুর পরে—অন্ততঃ এইটুকু শিষ্টতা বীরজাতির নিকট আমরা প্রত্যাশা করিতাম। বড়লাট বাহাদুর বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের এ হুকুম নাকচ করিলেই ভাল করিতেন। তাহার উপর বন্দী ভ্রাতা বল্লভভাই পেটেলকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ কার্য্যটুকুর জন্যও অসর্ত্তে মুক্তি না দেওয়ায়, এই কার্পণ্য আরও ব্যথার কারণ হইল। বিসদৃশ হইয়াই লোক-চিত্তে ক্ষত সৃষ্টি করিল। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির মিলনের বন্ধন শিথিল করিয়া তুলে।

— সমাজ —

ভাই পরমানন্দের অভিভাষণ ও হিন্দু-মহাসভা—

হিন্দু মহাসভার সভাপতি উপেক্ষিত, অপমানিত হিন্দু জাতির বিক্ষুব্ধ সত্তার মর্ম্মবাণীই তার স্বরে ঘোষণা করিয়া সমগ্র হিন্দু ভারতের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জাতীয় ঐক্যসাধনের বুঝি পরিপন্থী, এইরূপ একটা আশঙ্কা কোথাও কোথাও জন্মিয়াছে। ইহার যথার্থ হেতু নাই। ভাই পরমানন্দ চুক্তি দ্বারা তথাকথিত মিলনের অভিনয় চাহেন নাই, ইহার ব্যর্থতা নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার আলোকে দেখাইয়া হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সতর্ক করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কথা সুস্পষ্ট এবং তাহা যুক্তিযুক্ত—"মাতৃভূমির প্রতি অনুরক্তি যদি ঐক্যের মূল হয়, তবেই ঐক্যের দ্বারা রাজনৈতিক সংগ্রামে ফল-লাভ হইতে পারে; কিন্তু যে ঐক্যের মূলে রহিয়াছে চুক্তি ও রফা, তাহার দ্বারা দেশের কোনই লাভ হইতে পারে না।" সুবিধাবাদে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা হয় না। অতি কঠোর ও বাস্তব প্রশ্নই তাই তিনি তুলিয়া বলিয়াছেন "দানের ক্ষমতা যখন অপরের হাতে এবং এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, একথা আর বিশ্বাস করা চলে কি? যাঁহারা এখনও সেই ঐক্যে আস্থাবান্, তাঁহাদের ঐক্যের জন্যই নূতন পথ দেখিতে হইবে।"

হিন্দুর যথার্থ দাবী রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায়—আত্মসংগঠন। হিন্দু মহাসভা যদি এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হয়, তবে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া হিন্দু শক্তি মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে পারে। ভাই পরমানন্দ এই পন্থাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাসভার আন্দোলন গঠনমূলক হইয়া না উঠিলে, ইহা সিদ্ধ হইবার নহে। হিন্দুত্বের বীর্য্য প্রাণোৎসর্গ না করিলে জাগে না দেখিয়াই ভাই পরমানন্দ তরুণমণ্ডলীকে এই ত্যাগের সঙ্কেত দিয়া আহ্বান করিয়াছেন। জীবন দিয়াই জাতির জীবন জাগাইতে হয়—এই কথাগুলি সত্যই মহামূল্য ও সুন্দর। "The remedy is there; it is for the Hindu youths to come in the field and practise it for themselves."—'প্রতিকার জীবনোৎসর্গ, হিন্দু তরুণই আত্মাহুতি দিয়া হিন্দু-সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন।' এই মর্ম্মস্পর্শী আহ্বান উত্তেজনা ও আবেগভরে গৃহীত না হইয়া যথার্থ গঠনোদ্যমে যদি তিল তিল করিয়া জীবন ঢালিবার একমুঠা একপ্রাণ মহাকর্ম্মীও গড়িয়া তুলে, প্রসুপ্ত হিন্দুত্বের পুনরুত্থান অসম্ভব হইবে না।

কমিউন্যাল এওয়ার্ডের বজ্রনিক্ষেপ সহিয়া সাইমন কমিশনের দিকে কাহারও কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে। ভাই পরমানন্দ উভয়ের বণ্টনাঙ্ক তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন, সে বরং ছিল ভাল। এ তুলনায় আজ অন্য কোনও লাভ নাই, রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রেরণার অনুপাতে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বড় ধীরে ধীরেই আমাদের অর্জ্জিত হইতেছে। আবার হিন্দু মহাসভা সভাপতির অনুমোদনক্রমে আইনপরিষদ্‌সমূহ দখল করিয়া, যতদিন জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীতে এবং পার্লামেণ্টে সাম্প্রদায়িক শাসনতন্ত্র আলোচনাধীন থাকিবে, ততদিন সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার বিরোধিতা করার যে নীতি গ্রহণ করিলেন, কংগ্রেসের মূলনীতি সংক্ষুব্ধ করিয়া সহসা এই অভিযান কতদূর বর্ত্তমানেই কার্য্যকরী ও শুভপ্রদ হইবে তাহাও বিবেচনার বিষয়। আমাদের মনে হয়, সরকারী কাউন্সিলের ন্যায় বেসরকারী কংগ্রেস-মঞ্চও সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিয়া জাতীয় রাষ্ট্রনীতি এক ও অভঙ্গ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করাই অধিকতর শ্রেয়োনীতি হইত। কংগ্রেস যদি হিন্দু-মুসলমানাদি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের যুক্ত জাতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্র হয়, তবে হিন্দুর পক্ষে যে নীতি শ্রেয়স্কর, অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষেও সেই এক নীতি একই প্রকারে কল্যাণকর ও অবলম্বনীয় হইতে পারিত।

মহাসভার একটী প্রধান প্রস্তাব—বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘে সাম্প্রদায়িক বণ্টন সম্বন্ধে ন্যায়-বিচার-প্রার্থনা। "লীগ অফ নেশন্‌সের" তৃতীয় অধিবেশনে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্বন্ধে যে সন্ধি-সূত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহার মর্য্যাদারক্ষা করিলে তাঁহারা কমিউন্যাল এওয়ার্ড দ্বারা হিন্দুর ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করিয়া এবং "রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র" কৃত্রিম

ভাবে গড়িয়া তুলিয়া ভেদ-নীতির চূড়ান্ত অপপ্রয়োগ এমন করিয়া অবশ্যই করিতে পারিতেন না। কেন না, বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সেই সঙ্কল্প-বাক্যটী এই—

"The Assembly expresses the hope that the states which are not bound by any legal obligation to the League with respect to minorities will nevertheless observe in the treatment of their own racial, religious and linguistic minorities at least as high a standard of justice and toleration as is required by any of the Minority Treaties and by regular action of the Council."

'ভারত যখন আইনতঃ লীগের একজন মৌলিক সভ্য, তখন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ধর্ম্ম-ভাষা-জাতিগত অধিকার-ভেদ লীগের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্বন্ধীয় সন্ধিসূত্র এবং লীগ-সংসদের নিয়মিত ক্রিয়ানুবর্ত্তনেই ন্যায় ও সহিষ্ণুতার আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হউক'—এই দাবী সে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিকট অবশ্যই করিতে পারে এবং রাষ্ট্র-সঙ্ঘেরও সেই দাবী যথাসাধ্য সম্পূরণের চেষ্টা করা উচিত। রাষ্ট্র-সঙ্ঘে বৃটেনের যে স্থান তাহাতে এই আবেদনের উত্তরে লীগ কি ভাব গ্রহণ করিতে পারে, তাহা ঠিক অনুমান করা যায় না; রাষ্ট্র-সঙ্ঘ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলেও, বৃটেনের পক্ষে এ কথা বুঝান শক্ত নয় যে, কমিউন্যাল এওয়ার্ড ভারত-বাসীরই প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ভারত-বাসী এ বিষয়ে নিজেরা কোনও সর্ব্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই বলিয়াই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া এই ভাবে সমস্যার মীমাংসা করিতে যত্নবান্ হন। ইংরাজের এ দায়িত্ব-ক্ষালনের উত্তরে ভারতের কাঁদুনী গাওয়া ছাড়া অন্য কোনও কথা বলিবার কি আছে? তাহা ছাড়া, লীগের কোনও প্রধান সভ্য যখন লীগের মাথার উপর পা দিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াও বিশেষ কোনও বাধা পাইল না—আমরা স্বাধীন জাপানের কথাই বলিতেছি—তখন স্বাধীন চীনের চেয়ে অধম পরাধীন ভারতের দাবী রাষ্ট্র-সঙ্ঘে কতটুকু মর্য্যাদা ও ফল লাভ করিবে, তাহা খুব আশার সহিত আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি একদিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের নিকট স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করিয়া উপেক্ষিত ও হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন; কমিউন্যাল এওয়ার্ডের প্রতিকারে ভারতের এই আবেদন বিশ্বজাতির দরবারে না তাহাকে অধিকতর কৃপাপাত্র করিয়া তুলে, ইহাই দুর্ভাবনা হয়। তবু সুযোগ যখন আছে, সে সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়া হিন্দু মহাসভা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

মুসলমান সমাজে উষ্মাপ্রকাশ—

হিন্দুশক্তির এই অভ্যুত্থানস্পৃহা মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের মনে কিভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহার পরিচয় নানা মোস্লেমমণ্ডলীর এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবের ভাব ও ভাষা হইতে সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতে পারে। নিখিল ভারত মোস্লেম লীগের হাওড়ার অধিবেশনে এরূপ একটী প্রস্তাব যাহা মিঃ মহীয়ুদ্দিন কর্ত্তৃক উত্থাপিত ও সভায় পরিগৃহীত হয়; তাহার প্রকৃত ভাষা বিশদভাবে সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মিঃ মহীয়ুদ্দিন এই সতর্কতাসূচক কথাগুলি বলেন—

"I must at this critical juncture sound a note of warning to the British Government and to the right-thinking members of our rival community in India and abroad that if our negotiations for reconciliation come to an abrupt end and we are deprived of our due rights and privileges despite the pledges and promises both from the British Government and the Hindus, this might drive the Mussulmans to desperation, and the same weapons with which the Hindus seem to have gained their object, namely the beginning of the process of extinction of the Mussulmans from India, might be turned against the precursors of their misfortune, albeit with more force, strength and manliness and God forbids, if such a day ever dawns, it will mark the opening of one of the bloodiest chapter in history, but let us in all sincerity hope it does not."

এই অত্যুগ্র উষ্মার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন, মুসলমান সমাজের এই ভাব ও ভাষা যদি সাম্প্রদায়িক ঘৃণার

উত্তেজক না হয়, তবে আর কোন ভাব ও ভাষায় তাহা হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনা করিতে অক্ষম। ন্যায়তঃ, আমরা এইটুকু বলিতে বাধ্য, হিন্দুমহাসভার কোনও সভাপতির মুখে, বা কোনও দায়িত্বপূর্ণ হিন্দু লেখকের লেখায় মুসলমানদিগকে ভারত হইতে উচ্ছেদ করার সঙ্কল্প এ পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইতে দেখি নাই। মুসলমান ভ্রাতৃগণ যদি দিনে দুপুরে এই বিভীষিকার স্বপ্ন দেখিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে আক্রোশ বৃদ্ধি ও হলাহল প্রকাশ করেন, তাহার বিষময়ী প্রতিক্রিয়া ভারতের রাষ্ট্রজীবনকে বিষাক্ত করিয়াই তুলিবে। হিন্দু চাহে তাহার ন্যায্য দাবী ও অধিকার—মুসলমান বা অন্য কোনও সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করিয়া নয়, পরন্তু প্রত্যেকের ন্যায্য দাবী ও অধিকারের সহিত আপনার দাবী ও অধিকার ন্যায় ও সুবিবেক অনুযায়ী সুসামঞ্জস্য করিয়া। ইহা যে শুধু শূন্য কথা নয়, তাহার জীবন্ত প্রমাণ মহাত্মা গান্ধীর জীবন পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া হিন্দু রাষ্ট্রসাধনার ধারাবাহিক ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসের প্রতি পর্ব্বেই ভূরি ভূরি নজীর দেখান যাইতে পারে। প্রবলপ্রতাপ বৃটিশের ছত্রতলে দাঁড়াইয়া আজ হিন্দুও যেমন আপন রাষ্ট্রীয় দাবী ন্যায়ানুযায়ী সংরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়; মুসলমানসমাজও সেইরূপ দাবী সেই ভাবেই যদি সত্য সত্যই করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের এই ভিত্তিহীন বিভীষিকা ও বিষোদ্গার পরিহার করিয়া স্বাস্থ্যকর আত্মসংগঠন নীতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—অন্যথা ইংরাজ বা হিন্দু কাহাকেও ভ্রূভঙ্গে শাসাইবার চেষ্টা করা সমীচিন হইবে না।

২৭শে কার্ত্তিক।

আশ্রম-সংবাদ

[আশ্রমী লিখিত]

স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাপ্রয়াণ

ব্রহ্মানন্দজী নাই! নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী, তপোমূর্ত্তি পুণ্যস্মৃতি স্বামীজী আজ অমূর্ত্ত! মর্ত্ত্যদেহে বিরাজমান থাকিয়া আর তার সে সহজ সুমধুর সঙ্গ দানে প্রেরণা সঞ্চার করে না। নীরব সে কণ্ঠবীণা! মুগ্ধ শ্রবণে এখনও আসিয়া পশে তাঁর সে উদাত্ত মন্ত্রোদ্গানের প্রতিধ্বনি। স্বামীজীর সেই প্রিয়স্তুতি 'ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং' এখনও সঙ্ঘের আকাশ-বাতাস রণিত হইয়া ফিরে। গৈরিক বসনাবৃত জীর্ণ-শীর্ণ তনুর অম্লান সেই কান্তি, সেই কঠোর সঙ্কল্পভরা মুখখানি, কাতর নয়নে অসমাপ্ত মিশনের বেদনাময় চাহনী, উদার অন্তরের অব্যক্ত ব্যথার সে করুণস্মৃতি তাঁর ইষ্টগোষ্ঠীর চিত্ত হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। আছে স্মৃতি, নাই সে মূর্ত্ত-মানুষ। মনে পড়ে, আজ সঙ্ঘের প্রথম বলি 'মেজ-বৌ'য়ের কথা! গিয়াছে বিদ্যুন্মূর্ত্তি ভাই মুরারজি! নাই খোদা! আছে সুখেন্দুর সুখস্মৃতি! হেমদা'র মহাপ্রয়াণ—আজও বছর ঘুরে নাই। মরণের পরপারে প্রেমমূর্ত্তি সঙ্ঘ-জননীর স্নেহাঞ্চলতলে সঙ্ঘ-স্বজনের অশরীরী আত্মার এ মহামেলা জন্ম-মরণের মাঝে অমর সেতু-রচনারই ইঙ্গিত দেয়। মরণ আজ অমৃতের পসরা লইয়াই সঙ্ঘের দ্বারে দণ্ডায়মান। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী সঙ্ঘ-স্বগোষ্ঠীর মাঝে মরণ ব্যবধান সৃজন করিতে পারে না। অগ্নিময় প্রত্যয়ের আলোতে বিস্মৃতির আবরণ আজ অপসারিত। ব্রহ্মানন্দজী নাই—একথা মরণজয়ী সঙ্ঘধর্ম্মীর চেতনার ক্ষেত্রে ঠাঁই পাওয়াও যে ব্যাভিচার! জাগতিক সম্বন্ধ তো নয়—নিত্য ইষ্ট-বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া যে মধুময় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা পায় তাহা দিব্য, নিত্য—জন্ম-মরণে বিচ্ছিন্ন বিস্মৃত হইবার নয়। রোগ-জীর্ণ দেহভার জীবন-মিশনের

অসমাপ্তির ব্যথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক মায়ের একনিষ্ঠ সন্তান মাতৃ-অঙ্কে শেষ শয়নে শায়িত হইল পুণ্যমহালয়া তিথির এক শুভক্ষণে। সে ছিল ৩রা আশ্বিন ১২-১৫ মিনিট। সজ্ঞ-জীবন কেন্দ্র করিয়া দেবীর আবাহন স্বরু হইয়াছে মাত্র। মায়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অজানা নয়।

বাংলায় তখন অগ্নিযুগ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চঞ্চলতায় শ্রীহট্টবাসীর প্রাণেও এক অভিনব সাড়া

পূর্ব্বাশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার পিতা

তুলিয়াছে। নবজাগরণের এই সন্ধিক্ষণে হবিগঞ্জ মহকুমার সাঙ্গর পল্লীর এক উন্নতশির গুবাক-নারিকেল ঘেরা গৃহাঙ্গনে মনোরঞ্জন ভূমিষ্ঠ হয়। ধরণীর আলো যখন প্রথম শিশুর চোখে ছোঁয়া দিল, ব্যগ্র কৌতূহলে মাতৃ-অঙ্কে ক্ষুদ্র হাত-পা নাড়িয়া বিরাট্ বিশ্বের কোন্ অজানা আনন্দের আস্বাদে সে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বালকের সুঠাম, সুন্দর, স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহাবয়ব জনক-জননীর হৃদয়ে অপার তৃপ্তিবিধান করিত। পাড়া-প্রতিবেশী মুগ্ধনয়নে চাহিয়া থাকিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বালকের সকল প্রাণচঞ্চলতা, ছুটোপুটি, ক্রীড়াকৌতুকের মাঝে ছিল একটা শৃঙ্খলা-সংযম যাহা তাহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল ও পিতামাতা আত্মীয় প্রিয়জনের প্রাণে আশার সঞ্চার করিত। চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই তার ভবিষ্যজীবনে ক্রমপরিস্ফুট হইয়া দিব্যজীবন গড়ায় সাহায্য করিয়াছিল। গতানুগতিক জীবনের সুখভোগ তাহার জীবনে অধিকদিন ঘটে নাই। ভাগ্যবতী মাতা মরিয়া শান্তি পাইলেন। বিপত্নীক পিতা শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের উপর মনোরঞ্জন ও তার জ্যেষ্ঠ প্রফুল্লরঞ্জনের লালন-পালনের ভার পড়িল। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় আজীবন শিক্ষকতা করিয়া সাধুজীবন-যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের উচ্চাদর্শ সন্তানদ্বয়ের চরিত্রগঠনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্ষুদ্র এই পরিবারটীকে কেন্দ্র করিয়া বিধাতা তাঁর অনুরূপ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন। আই, এ পরীক্ষার পর কোন বিপ্লবাত্মককার্য্য সংশ্লিষ্টে প্রফুল্লরঞ্জন ধৃত ও দীর্ঘ ১২ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন। পিতার বুক ভাঙ্গিল। কনিষ্ঠকে লইয়া পুনঃ ভগ্নগৃহে জোড়া দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ইহাতেও বিধি বাদ সাধিলেন। সার্থক এমন পিতামাতা—যাঁদের আশ্রয়ে এমন অসাধারণ পুত্রের জন্ম হয়। অজ্ঞাতে জনক-জননী হাহাকার করে, অলক্ষ্যে দেবতা হাসেন। ভুঁই ফুড়িয়া তো ভগবানের মানুষ জন্মাইতে পারে না।

মনোরঞ্জনের জীবন ছিল এমনি অসাধারণ। পল্লী-গৃহ-প্রাঙ্গণের ক্ষুদ্র আবেষ্টনী দীর্ঘদিন মনোরঞ্জনকে বন্দী রাখিতে পারিল না। স্নেহময় পিতার প্রীতির ডোর ছিঁড়িয়া, তাঁর স্বপ্নভরা রঙীন আশা ভাঙ্গিয়া মনোরঞ্জন অন্তরের অজানা চাওয়াকে সিদ্ধ করিতেই ছুটিল। ব্যর্থ হইল সকল অনুরোধ উপরোধ! ধনৈশ্বর্য্যের মোহ তার এ যৌবনোন্মাদনার পথে আগল দিতে পারিল না। সে ছিল চির-দুরন্ত-দুর্ম্মদ। ইউরোপে তখন সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মনোরঞ্জন ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন সে ম্যাট্রিকুলেশনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। বাধায় কোনদিন তাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। আত্মবৈশিষ্ট্যে সেখানেও সে ভীরু বাঙ্গালীর কলঙ্কমোচনই করিয়াছে।

একটি একটি করিয়া চারিটী বছর কাটিল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল। বৃদ্ধ পিতার মৃতপ্রায় দেহে আবার প্রাণ-সঞ্চার হইল। তিনি নূতন উদ্যমে গৃহসজ্জায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। মনোরঞ্জন সব্‌রেজিষ্টার পদের প্রার্থী হইল, কিন্তু পাইল কেরাণীর চাকুরী—অস্বীকার করিয়া গৃহে ফিরিল—অতৃপ্ত হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য দেশ ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ছয় মাস নিজ পল্লী-ছায়ায় কাটাইল। পল্লীর যুবকদের উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দিন নাই, রাত নাই, তার সে কি আকুল প্রয়াস! গ্রামের দলাদলি, গৃহবিবাদ, মামলা মোকদ্দমা মিটাইয়া আদর্শ পল্লীগঠনের প্রচেষ্টার তার অবধি ছিল না। এই সময়ে সমগ্র গ্রাম দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া একটি বিরাট্ মামলা চলিতেছিল, যাহার পরিণাম ছিল একান্তই শোচনীয়। যুবক মনোরঞ্জনের চেষ্টায়ই শান্তি স্থাপিত হয়। সেজন্য গ্রামবাসীর নিকট মনোরঞ্জনের স্মৃতি চিরস্মরণীয় রহিবে। মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন এই সময়ে সমগ্র দেশময় উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে। আশেপাশের কয়েকজন উৎসাহী যুবককে লইয়া মনোরঞ্জনও মাতিয়া উঠিল। পল্লীর ঘাটে-মাঠে-বাটে সভাসমিতি বৈঠকের বক্তৃতার অন্ত নাই। উত্তেজনার চাঞ্চল্যে নীরব পল্লীর আকাশ বাতাস মুখরিত। যোদ্ধ-প্রাণের যৌবনাবেগে ও উচ্ছ্বাসে, মনোরঞ্জনের সুনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্বাধীন একদল তরুণ ভাসিয়া চলিল। সুদূর হবিগঞ্জ টাউনে চিত্তরঞ্জনের আগমনে বিরাট্ সভা হইবে, মনোরঞ্জন দলবল সহ পদব্রজে ছুটিল। বর্ষার কর্দ্দমাক্ত রাস্তা-ঘাট—ভ্রূক্ষেপ নাই। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী—উদ্বেল, উচ্ছ্বসিত। তরণী নাই। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরিয়া, জামা কাপড় মাথায় বাঁধিয়া সাঁতারাইয়া নদী পার হইল। জীবনের অস্পষ্ট চাওয়াকে রূপ দিতে উন্মাদ তরুণ দিবারাত্র সে সময়ে কি অশেষ যন্ত্রণাই না ভোগ করিয়াছে! ত্যাগের ক্ষেত্রে আত্মদান করিতে সে কুণ্ঠা করে নাই। কিন্তু কোথায় সে তৃপ্তি! আত্মার ক্ষুধা তো মিটিল না। সে সবরমতীতে লিখিল আশ্রয়ের জন্য, জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা-কেন্দ্রের পরিচয় গ্রহণ করিল। কিসে কোথায় তার জন্মগত অধিকার তার সন্ধান তো মিলিল না!

পিতার সাধের সংসারেও সে গৃহ রচনা করিতে পারিল না। বিষের জ্বালা! নীড় বাঁধিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। ছন্নছাড়ার মতই কোন অজানাকে পাইবার জন্যই যেন অজ্ঞাতে সে জীবনের পথ বাহিয়া বাহির হইল। লক্ষ্যহীন সে যাত্রা—অন্তরাত্মার দরদীর সন্ধানে। সকল অস্পষ্টতার কালো মেঘ বিদীর্ণ করিয়া মাঝে মাঝে কোন্

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতার সহিত সহতীর্থগণমধ্যে

আপনার জনের অব্যর্থ ইঙ্গিত বিদ্যুৎ চমকানির মতই তাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। বহির্বিশ্ব বুঝিল না। স্বজন-প্রিয়জন ভাবিল, ছোক্‌রার মাথা বিকৃত হইয়াছে। বাহ্য চেতনাহীনের মতই মনোরঞ্জনের যেদিন পশ্চিম বাংলার ফরাসী টাউনের ভাগীরথীতীরের এক অজানা-অপরিচিত নিভৃত অশ্বত্থ-বেল বনানীর নিবিড়-ঘন ছায়ার তলে গতি স্তব্ধ হইল, সেদিন তার তৃষিত-ব্যাকুল হৃদয়ের সকল চাওয়ারও পরিসমাপ্তি হইল। সে আজ ১২ বৎসরের কথা।

সুদীর্ঘ বার বছরের একনিষ্ঠ সাধনায় মনোরঞ্জন তিলে তিলে মরিয়াছে, আর ব্রহ্মানন্দজীর হইয়াছে জন্ম।

'প্রবর্ত্তকে'র অধ্যাত্মভিত্তির উপর জাতিগঠন-মন্ত্রের উদাত্ত বাণী সেদিন মরমী তরুণ বাঙ্গালীর প্রাণে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সে সময়ে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের জাতি সাধনার বেদীমূলে যে সকল তরুণ তপস্বীর দল আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, তন্মধ্যে তেজস্বী নির্ভীক যুবক মনোরঞ্জন অন্যতম। ইহাদের মধ্যে কত ছিটকইয়া গিয়াছে, নবাগত আসিয়া শূন্যস্থান পূরণ করিয়াছে; কিন্তু আগাগোড়া যে চিহ্নিত সন্তান-দলের আত্মনিয়োগে আজ সঙ্ঘের অধ্যাত্মভাবমূলক গঠনধারা বাংলার বুকের উপর ব্যাপক দিব্যজাতি অভ্যুত্থান-ক্ষেত্র রচনা করিতে চলিয়াছে, সাধকবীর মনোরঞ্জনের বিশিষ্ট অবদান তাহার মধ্যে আছে।

অন্তিমশয্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ভারতের নবসন্ন্যাসের অগ্রদূত হিসাবে তিনি চিরদিন সম্পূজিত হইবেন। আকুমার ব্রহ্মচারী চিরপবিত্র মনোরঞ্জনের জীবনাশ্রয়ে এই অভিনব সন্ন্যাসই প্রবর্ত্তিত হইতে চাহিয়াছিল, যাহা আশৈশব তাকে অজ্ঞাতে আকুল করিয়াছিল। সঙ্ঘজীবনের প্রারম্ভ হইতে এই দিব্য ত্যাগ-প্রেরণাই তার জীবনের সকল চাওয়াকেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। এ সন্ন্যাস ভারতের প্রচলিত মোক্ষ নয়, নির্ব্বাণ নয়, বেদান্তের মায়াবাদ নয়, পরন্তু জীবন-স্বরূপেরই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। ইহা জীবনকে, কর্ম্মকে নাকচ, উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরিয়া দাঁড়ান নয়, বরং জীবনের ভোগৈশ্বর্য্যের মাঝে ত্যাগ-বৈরাগ্যের গৈরিক উড়াইয়া দিব্যজীবন, দিব্য জাতির বেদী সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ব্রহ্মানন্দজীর সন্ন্যাস-জীবন একটা করুণাময় বিয়োগান্ত নাটকেরই মত। আঘাতের পর আঘাত সহিয়া এই পরীক্ষাময় জীবন বীর যোদ্ধার ন্যায় নিঃশেষ হইয়াছে। অতীত সন্ন্যাসের গতানুগতিক সংস্কারের মোহ কাটাইয়া জীবনবাদমূলক এই নবসন্ন্যাসের ভিত্তিপত্তন করিতেই তার জীবনান্ত হয়। সে কি ত্যাগ-তপস্যা নিয়ম-সংযম অনাহার-অনিদ্রা পরিভ্রমণ-পর্য্যটন! আত্মনিবেদিত যোগীর সহজ জীবনের উপর ইষ্টের এ কঠোর পরীক্ষা। উপযুক্ত আশ্রয়েই সংঘটিত হইয়াছিল। স্বামীজীও জীবন দিয়াই সে পরীক্ষার সাফল্য আনিয়াছে। আজ তাই ভাগীরথীতীরস্থিত সঙ্ঘের গগনস্পর্শী "ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দির" জাতির তীর্থ। কালের শত অত্যাচার সহ্য করিয়া, অবহেলায় উপেক্ষায় অতীতের স্মৃতি বুকে জড়াইয়া জীর্ণকলেবর এই মন্দির কিসের অপেক্ষায় কার পথ চাহিয়া উহার উন্নতশির সেদিন পর্য্যন্তও নত করে নাই, কে জানে? কিন্তু ব্রহ্মানন্দজীর আগমনে অযত্নরক্ষিত এই মন্দির-চূড়া সেদিন উষার রাগে প্রথম অনুরঞ্জিত হইয়াই উঠিয়াছিল। আজিকার মন্দিরের সে অভিনব প্রাণচঞ্চলতা গর্ব্বভরা গৈরিক পতাকার সে বিজয়োল্লাসের মাঝে স্বামীজীর অমর অনাবিল স্মৃতি চির অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ব্রহ্মানন্দজী ছিলেন একনিষ্ঠ কর্ম্মী। সামরিক জীবনের সৈন্যোচিত নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল তাঁর সকল কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। জীবনের তুচ্ছ ব্যাপারে, এমন কি রোগশয্যায়ও তাঁর জীবনে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁর ছিল দিনের মত স্পষ্ট ভিতর বাহির। স্পষ্টবাদিতা ছিল তাঁর স্বভাবের ধর্ম্ম। সামঞ্জস্য করিয়া চলা ছিল তাঁর দৃঢ় মত-বিরুদ্ধ। তিনি ছিলেন উচ্ছ্বসিত প্রেমের গৈরিক নিঃস্রাব —কূল যেন পাথর দিয়া ঢাকা। সঙ্কল্পপরায়ণতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। হিমাদ্রির মত উন্নতশির

কোনদিন কোন কারণে কোন বাধায় অবনত হয় নাই। সকল কঠোরতার অন্তরালে তাঁর ছিল শিশুর মত হৃদয়-মনের পবিত্রতা, যাহা তাঁহাকে বিদ্যার্থি-ভবনের ছাত্রদের মধ্যে একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্ঘ-গ্রন্থাগার, শিক্ষা-কেন্দ্র, ময়মনসিং কেন্দ্রাশ্রম প্রভৃতি সঙ্ঘের বিচিত্র কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত। আর্ত্ত-দুঃস্থ-পীড়িতের সেবায় আত্মদান করিতে কোনদিন তাঁর কুণ্ঠা বা দ্বিধা আসে নাই। উত্তর বঙ্গ জলপ্লাবনের সময়ে সিরাজগঞ্জে বন্যা-পীড়িতদের সেবায় তিনি আত্মজীবন উপেক্ষা করিয়া যে ভাবে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই কাল ব্যাধি যক্ষ্মা রোগ আক্রমণ করে।

তারপর দীর্ঘ তিনটী বৎসর মরণের সঙ্গে সংগ্রাম। বিপুল অর্থ ব্যয়, সঙ্ঘ ভাই-ভগ্নীদের আন্তরিক সেবা ব্যর্থ হইল। মরণ তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। মরণের মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে চরম চিকিৎসার্থে তাঁকে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সে কি করুণ বিদায়দৃশ্য! মর্ম্মান্তিক—অশ্রু উথলিয়া উঠে। ষ্ট্রেচারে নীত হইবার পূর্ব্বক্ষণে স্বামীজি উঠিয়া দাঁড়াইল—সঙ্ঘ-চিকিৎসককে আলিঙ্গন করিয়া উপস্থিত আপনার জনদের নিকট বিদায় জানাইলেন। তাঁর একমাত্র আশ্রয়স্থল জীবন-মিশনের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি মন্দিরের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিলেন; তিনবার 'মা' 'মা' রবে মন্দিরাঙ্গন প্রতিধ্বনিত একবার করিয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন—"এই শেষ, আমি আর ফিরিব না।" সে ধ্যানসমাহিত নিথর শান্ত মূর্ত্তি মটরে শায়িত হইল; কিন্তু সত্তা তাঁর পিছনে রহিয়া গেল ইষ্টক্ষেত্রের প্রতি ধূলি-কণাতে মিশিয়া।

মোটরের ভোঁ শব্দের সঙ্গে অসাড় দেহের গভীর অতল হইতে নিঃসাড় কণ্ঠ চিরিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল 'মুক্তি'। শেষ বাণী! সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসানে যেন স্বর্গের দীপ্তি পাণ্ডুর ঠোঁটের কোণে খেলিয়া গেল। মাতৃশক্তি স্নেহের দুলালকে স্বীয় বক্ষে টানিয়া লইলেন। ধীর-মন্থর গতিতে মোটর অদৃশ্য হইল। মুহ্যমান প্রিয়জন মৌন স্তব্ধতায় স্বামীজীর শেষ স্মৃতি বুকে আঁকিয়া ফিরিল।

মাত্র একটী সপ্তাহ! সব শেষ! পুষ্পমাল্য-বিভূষিত প্রাণহীন দেহ শোকশোভাযাত্রা করিয়া সঙ্ঘভ্রাতৃগণ কলিকাতার পুণ্য কেওড়াতলা শ্মশানে সৎকার করিলেন। রৌপ্যাধারে চিতাভস্ম লইয়া সঙ্ঘের ভাই-ভগ্নী কর্ত্তৃক মুহুর্মুহু 'সচ্চিদেকং ব্রহ্ম' নাম-কীর্ত্তনের মাঝে চন্দননগর ষ্টেশন হইতে শোভাযাত্রা সঙ্ঘের ব্রহ্মবিদ্যামন্দিরে আনীত শেষ স্মৃতি সুরক্ষিত হয়। ব্রহ্মানন্দজীর বয়স হইয়াছিল মাত্র ৩৩।৩৪ বৎসর।

স্বামীজীর আত্মার কল্যাণকল্পে ও যোগসূত্র রক্ষার্থে ইষ্টনির্দ্দেশানুযায়ী সঙ্ঘের ভাই-ভগ্নী যথারীতি দশদিন ব্রতধারণ করিয়াছিলেন।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ গ্রন্থাগারের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব

বিগত ২৯শে অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচান্সেলার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ গ্রন্থাগারের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব "যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরে" অনুষ্ঠিত হয়।

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় পুষ্প-মাল্য দ্বারা সভাপতিকে বরণ করার পর সঙ্ঘ-সাধক শ্রীপ্রিয়লাল গাঙ্গুলী বাণীর আবাহনসূচক একটী বৈদিক প্রশস্তি উদ্‌গান করেন। অতঃপর সঙ্ঘের নারীমন্দিরের অধিবাসিনীগণ কর্ত্তৃক সময়োপযোগী ঐক্যতান বাদ্য ও একটি সঙ্গীত হইবার পর চন্দননগরের সুযোগ্য মেয়র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু ও সাহিত্যপরিষদের শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সঙ্ঘ-গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গ্রন্থাগারের তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বমোট গ্রন্থ-সংখ্যা ৪০৮৯, ও ইংরাজি, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় লিখিত মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি কাগজের সংখ্যা এক শত। ১৯৩২-৩৩ সালে গ্রন্থাগারের মোট আয় ৫৮৫॥/৫ এবং ব্যয় ১২৮৮৶১০। আলোচ্য বর্ষে পাঠাগারে পড়ে দৈনিক পাঠকের সংখ্যা—১৩ জন এবং গ্রাহকের সংখ্যা মোট ৪৪৬ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ২১৯, মহিলা ২৬, বালক ১৩৫ ও বালিকা ৬ জন।

তারপর, সভাপতি মহাশয় তাঁর দেশ বিদেশের লাইব্রেরী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার মর্ম্মাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

সভাপতির স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর বক্তৃতা

"...এই গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রাণস্বরূপ ও একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোধানে আমি শোক প্রকাশ করছি। তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করে'

ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনারা সকলে আমার সহিত যোগদান পূর্ব্বক তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করুন।

ব্রহ্মানন্দের তিরোধানে গ্রন্থাগার ও সঙ্ঘ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত মতিবাবু তাঁর চক্ষু অস্ত্রোপাচারের পর চক্ষু রোগ হ'তে মুক্তি পেয়েছেন, তিনি পুনরায় চক্ষুষ্মান্ হয়েছেন। তিনি তাঁর দিব্যচক্ষু সাহায্যে পূর্ব্বের ন্যায় অক্লান্তভাবে সঙ্ঘের ও দেশের কাজে চিরদিন আত্মনিয়োগ করুন, আমি আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনা করি।

...আমি জানি না, কোন্ অব্যক্ত কারণে আমি এই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্বন্ধ —আধ্যাত্মিক বল্‌ব না—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এরূপ আমি অনুভব করি। তাই সঙ্ঘের কথা আমি ভুল্‌তে পারি না, সর্ব্বদা তাদের কথা চিন্তা করি, আলোচনা করি, তাদের বহুমুখী কাজের সংবাদ রাখি—এমন কি, আত্মীয়তা অনুভব করে' মাঝে মাঝে উপদেশ প্রদান ও তিরস্কার করারও স্পর্দ্ধা করে' থাকি। আজ আমার শরীর খুবই অসুস্থ হয়েছিল, এখানে আসতে সমর্থ হ'ব না জেনে একটা সংবাদ পাঠাতে চেষ্টা করি; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তা ঘটে' উঠে নি। এই প্রতিকূল ঘটনা দেখে মনে হ'ল, আমার এখানে আসা একটা কর্ত্তব্য রয়েছে, আমার শরীর অসুস্থ হলেও সে কর্ত্তব্য-ভঙ্গ করলে আপনাদের নিকট অপরাধী হতে হবে, মতিবাবুকে অপরাধী করা হবে—ইহা চিন্তা করে'ই আপনাদের নিকট উপস্থিত হয়েছি।

আপনার লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না—এই যে গ্রন্থাগারটীর প্রতিষ্ঠা, ইহার পিছনে ভাগবত নির্দেশ আছে বলে' আমি মনে করি। যুগে যুগে অন্ধকার আমাদের জ্ঞানালোক আচ্ছন্ন করে' ফেলে, তাকে বিদীর্ণ করার জন্য বহু মহাপুরুষ অবতরণ করেন। আমাদের অজ্ঞানরূপ তমিস্রাকে বিনাশ করার জন্যই এই সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। হজরত মহম্মদের নাম এই ক্ষেত্রে উল্লেখ কর্‌তে পারি। তিনি অন্ধকারে জীবের পথ-প্রদর্শন করার জন্য আজীবন নিজ শক্তি প্রয়োগ করে' গেছেন। তিনি কখনও নিজেকে উচ্চ ভাবে দেখেন নি, পয়গম্বর হতে চান নি, আপনাকে খোদার একজন সামান্য দীপ মনে কর্‌তেন, তাই তাঁর খ্যাতি এত উচ্চে উঠেছিল। যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ মানুষের তমিস্রা বিদীর্ণ কর্‌তে এসেছেন, হজরত মোহম্মদ তন্মধ্যে অগ্রণী।

...আমাদের এই নৈশ অন্ধকার দূর করার সময় এসেছে। বালিকাদের কণ্ঠে দেবীর মাহাত্ম্য শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এই দেবীর আরাধনা দ্বারাই আমাদের তমিস্রা দূর হবে। সেইজন্য গ্রন্থাগারের আমি অত্যন্ত অনুরাগী —বিশেষ, এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে' আমি যার পর নাই আনন্দিত হয়েছি।

আজকের সান্ধ্যঘটনাবলীর পারম্পর্য্যের ভিতর দিয়াও একটা ইঙ্গিত আমি লক্ষ্য করেছি। ফরাসী সরকারের "গয়ং গচ্ছ" নীতি অনুসারে পাঠাগারের সভাধিবেশনের জন্য যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ঘটে উঠে নি। অন্ধকারের মধ্যেই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ আরম্ভ করেছি, অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলো জলে উঠ্‌লো, আবার নিভে গেল, তাতেও আপনারা পশ্চাদ্‌পদ নন। পূর্ব্ববৎ দৃঢ়ভাবেই আপনাদের কাজ চলতে লাগল। অজ্ঞান-তমিস্রা-ভেদ যাদের জীবনের দৃঢ়ব্রত, তাদের এইরূপ আলো ও ছায়ার মধ্যখানেই আপনাদের গন্তব্যপথে যেতে হবে। আপনারাও সে বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইহাই আশ্বাস ও আশা।

যে ছেলেকে তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি দেখেছিলাম, তিন বৎসর পর তার আরও পরিপুষ্ট রূপ দেখার আকুলতা জাগে। ১৯৩১ সালে অক্ষয় তৃতীয়া মেলা ও প্রদর্শনীতে এসেছিলাম, তখন এই গ্রন্থাগারটী ক্ষুদ্রাকারে নিজেদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এখন উহা বাহিরে ব্যক্ত এবং ব্যাপ্ত হয়েছে। বর্ত্তমানে উহার অনুগ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা ৪৫০ শত, ক্রমশঃ বেড়ে বেড়ে ৪ হাজার, ৪০ হাজারও হয়ত হবে। তিন বৎসর পর আর একটা নূতন জিনিষ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা কর্‌ছে—সেটা হ'ল পল্লীসংস্কার সমিতি। এই পল্লীসংস্কার সমিতি আর্ত্তের প্রাণকে শান্তি দেবার একটা বিশেষ অভিব্যক্তি। সঙ্ঘ যে দেশের প্রাণকে বাঁচাবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত, তা এই পল্লীসংস্কার সমিতির প্রতিষ্ঠা হতে বুঝা যায়। মানুষ গড়ে তুল্‌তে হলে সকল বিষয়ের ভেজাল থেকে শিশু জীবনকে রক্ষা করতে হবে। উপযুক্ত পানভোজন, চিকিৎসা ও সেবা দ্বারাই মানুষের জীবন রক্ষা সম্ভব। এবারে এসে বালিকাদের কণ্ঠে যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করলুম তাহাও আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই তিন বৎসরে সঙ্ঘের এই সকল অঙ্গ-সৌষ্ঠবের পরিপুষ্টি দেখে আনন্দলাভ করেছি। ভবিষ্যজীবনে সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্মের সেবায় সঙ্ঘের আরও অঙ্গসৌষ্ঠব দেখ্‌তে পাব বলে' আমি বিশ্বাস করি।

গ্রন্থাগার পরিচালনা করার দায়িত্ব কতদূর তা অনেক গ্রন্থাগারের কর্ম্মকর্ত্তারা বুঝ্‌তে পারেন না। কয়েকজন গ্রামবাসী মিলে 'এস একটা লাইব্রেরী করা যাক্' বলে'

কাজ আরম্ভ করেন। নানা জায়গা থেকে চেয়ে চিন্তে, মেগে, এমন কি কখনও হয়ত "অবলাস্তে" চেয়ে নিয়েও কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করে' লাইব্রেরী আরম্ভ করে' দিলেন। কেউ করেন হরিসভা, কেউ করেন যাত্রা, কেউ পাচালি', কেউ বা ক্লাব—সেই রকম লাইব্রেরীও করেন। এই সকল প্রতিষ্ঠায় একপ্রাণতা না থাকায় আলগা কাজে মঙ্গল হচ্ছে না, হবেও না। কিন্তু সেখানে যে সকল পুস্তক থাকে তা অধিকাংশই আবর্জ্জনা। সে আবর্জ্জনাতে যে বিষ ছড়িয়ে রয়েছে, তাহাই তাঁরা ছাত্রজীবনে পরিবেশন কর্‌তে আরম্ভ করেন। শুধু ছাত্রজীবন নয়, আমাদের নারীসমাজে পর্য্যন্ত এই বিষ প্রবেশ করে' তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। কিন্তু এই গ্রন্থাগার সেই ভয় থেকে আপনাদের মুক্তি দিয়েছেন—এইটাকে আমি ইহার বিশিষ্টতা মনে করি। হুগলী জেলায় আমার বন্ধু কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় Library movement আরম্ভ করেছেন। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে বিশ্বভারত-লাইব্রেরী-movement এরও সূচনা হয়েছে। তাঁদের প্রতিনিধিরা আপনাদের এখানে পদধূলি দিয়ে গিয়েছেন। Library-movement-এর যথার্থ উদ্দেশ্যের পরিচয় না পেয়ে তাঁকে বলেছিলুম, ইহা ঠিক Library movement নয়, Librarians' movement হতে চলেছে। বড় বড় বাড়ী ঘর ও Show কর্‌লেই Library movement সুপথে পরিচালিত হয় না। প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে বাণী-মন্দির বলে' আমাদের পূজা কর্‌তে হবে। নতুবা গ্রন্থাগার দ্বারা যে ফল তা আমরা লাভ কর্‌তে পার্‌বো না, বরং কুফল সম্ভাবনা।

এই হুগলী জেলাতেই পূর্ব্বে "গাঁথ-ঘর" ছিল, সেখানে বহু প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করে' সযত্নে রক্ষিত হত। আজ সে সকল "গাঁথ-ঘর" অন্তর্হিত হয়েছে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-গ্রন্থাগার যদি তাদের শক্তি নিয়োগ করে' সেগুলি উদ্ধার কর্‌তে পারে, তাহলে একটা বড় কাজ করা হবে।

বসন্তবাবু * শিশু-সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সম্বন্ধে দুই একটা কথা আমার বল্‌বার আছে। শিশু-সাহিত্যসৃষ্টির একটা হুজুগ দেশে এসেছে। এই শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে ভয় হয়। শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি করার যে কত বড় দায়িত্ব রয়েছে, তা মানুষ ভাবে না। খাবারের দোকানের দোকানদার অখাদ্য, ভেজাল মিশ্রিত করে' যদি ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে, তার যেমন নরকেও স্থান হয় না, ঠিক সেইরূপ শিশুদের হাতে সাহিত্য দিতে গিয়ে যদি গ্রন্থাধ্যক্ষগণ তাদের চরিত্রগঠনোপযোগী সাহিত্য না দিতে পারল, তাহলে তাদের শৈশব হতেই বিপথগামী করার জন্য প্রত্যবায় দোষে দোষী হতে হবে। এই দিক্ দিয়াও এই গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণের বড় কম দায়িত্ব নয়। মতিবাবুর মুখে একটা কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত হলুম—বর্ত্তমানে গ্রন্থাগারে যে ৪৫০ জন গ্রাহক রয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ক্রমশঃ একটা নৈকট্য, অন্তরতম সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। এই গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়ে যদি ক্রমশঃ আরও বহু পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্র আবদ্ধ হয়, তাহলে ইহা দ্বারা একটা মহৎ কাজ করা হবে। মাসিক সাহিত্যেও যার যত বিদ্যা বা অবিদ্যা আছে সবই ছাপ্‌তে আরম্ভ করেছে। দেশের লোক কি বই পড়ে' মানুষ হ'তে পারে, সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই, শুধু লেখাই যেন তাদের জীবনের সার্থকতা। শিশু মাসিক বা সাহিত্যে এমন জটিল, দুর্ব্বোধ্য পঠিতব্য বিষয় ও ছবি থাক্‌ছে যে, শিশু দূরে থাক্, শিশুর পিতামহের নিকটও তা বোধগম্য হবে না। যত রাক্ষসের গল্প, অনৈসর্গিক প্রেমের কথা—প্রবীণ সাহিত্য পর্য্যন্ত এর কাছে হার মেনে যায়। শিশু কি করে' গড়ে উঠ্‌তে পারে সে সকল লেখা খুব কম সাহিত্যেই থাকে। আমি কোন এক সভায় সভাপতিরূপে মাসিক সাহিত্যে ও শিশু-সাহিত্যে গল্প, উপন্যাসের প্রাবল্যের অনুযোগ করেছিলাম। তদুত্তরে উক্ত সভার একজন পৃষ্ঠপোষক ধন্যবাদ জ্ঞাপনকালে—জানি না এঁরা আজ আমায় কি ধন্যবাদ দেবেন—বলেছিলেন—সভাপতি মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য্য করে' চল্‌লে এবার থেকে আমাদের 'ধারাপাত' ও কথামালা' ভিন্ন অন্য কিছু পুস্তক লাইব্রেরীতে রাখা চল্‌বে না! আধুনিক মানুষের রুচি কোনদিকে, আপনারা এ থেকেই সহজেই বুঝতে পারছেন।

শিশু-সাহিত্য বাছাই করা খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ। গ্রন্থাধ্যক্ষকে সেদিকে খুব সতর্ক হয়েই চলতে হবে। একটা বিষয়ে যাঁরা ভাবেন নি তাঁরা আশ্চর্য্য হবেন—একদিন যে জার্ম্মাণীর সাহায্যে প্রাচ্যের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধারচেষ্টা ও চর্চ্চায় নূতন প্রাণসঞ্চার হয়েছিল, যে জর্ম্মণী বপ্, স্লেগেল গেতে, শিলার, ক্যাণ্ট, হেগেল ও সোপেনহায়ারের জন্মভূমি, সেই জার্ম্মাণীতে হিট্‌লার এখন culture ordinance প্রচার করেছেন। জার্ম্মাণী এখন দেশ থেকে ইহুদী বিতাড়িত কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর এবং বৈদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে কড়া আইন প্রচার করেছেন। ডারউইনের নাম পর্য্যন্ত করার অনুমতি নেই। আইনষ্টিনের মত জগদ্বরেণ্য লোকের তাই আজ এত দুর্দ্দশা।

জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অধিনায়ক হিট্‌লার একদিন

* শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

কুলিগিরি করেছিলেন; আজ জার্ম্মানীতে তিনি এক অপূর্ব্ব স্থান অধিকার করে বসেছেন। হিট্‌লারকে আমি হিংসা করি না—আর হিংসা করে'ই বা করব কি—কিন্তু তাঁর এই পদোন্নতির মূলে পাঠপ্রবণতা অনেকখানি সহায়তা করেছিল, সেই কথাটাই আপনাদের বল্‌ছি। তিনি উদরপূর্ত্তির জন্য অর্থ ব্যয় না করে' পুস্তক ক্রয় করে' পাঠ করতে ভালবাসতেন। নিদ্রা থেকে বিরত থেকে অধ্যয়নে লিপ্ত থাক্‌তেন। এখনও তিনি বলেন 'I wish to read all night"। অথচ তিনি বৈদেশিক culture—'kultur' বিরুদ্ধে এক বেষ্টনী (নরক—hell=বেষ্টনী) সৃষ্টি করেছেন! পাঠের এতখানি প্রেরণা না থাক্‌লে মানুষ কখনও বড় হতে পারে না। এখানে মনে পড়ে যায়, ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টনের সেই কথাগুলি—

"He who kills a man, kills a
reasonable being
He who kills a good book
kills reason itself."

ইণ্ডিয়ান এসেমব্লীর প্রথম সভাপতি স্যার এলেকজেণ্ডার হোয়াইটের পিতা রেঃ মিঃ হোয়াইট বলতেন—"Sell a bed, buy a book।" আমি লণ্ডনের উপকণ্ঠে হেমষ্টেড্‌ হীদ্‌এ তাঁহার বাটীতে গিয়ে একথা শুনে এসেছিলাম। ভারতবর্ষকে একথা চিরদিন পদে পদে শেখান হয়েছে; তাই গীতাদান প্রভৃতিতে এত পুণ্য, তার এখনও এত চলন। সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ হিন্দুর নিত্য কর্ত্তব্য।

কথা প্রসঙ্গে অনেক কথা বলতে হচ্ছে—কথা বেড়ে যাচ্ছে।

মহাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারটী সংযোজিত হয়েছে। ভগবানের নিত্য আশীর্ব্বাদ ইহার উপর বর্ষিত হোক, ভগবানের করুণালাভে ও আপনাদের সকলের সহায়তায় এই গ্রন্থাগার ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতির দিকে অগ্রসর হোক। যাঁরা ইহার সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাও ধন্য হোন—এই প্রার্থনা আমি করি।

আর একটা কথা গ্রন্থাধ্যক্ষের নিকট শুনে খুব আনন্দ হ'ল যে, বাহিরে যে পুস্তক পাঠের জন্য দেওয়া হয় তাহা বিনামূল্যে শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অনুসন্ধান করে' জানলুম—ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। বিশ্বাস দ্বারা মানুষকে যে জয় করা যায়, ইহা তার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত "Faith begets faith"—এই বাক্যের সার্থকতা এই গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যতঃ করেছেন। এই বিশ্বাস দ্বারা পরস্পরের মধ্যে যে সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতি জন্মে তা ভবিষ্য জীবনে সত্যই খুব মধুময় হয়ে উঠে। এ সম্বন্ধে আমার একটা প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা মনে হচ্ছে।

আমি যখন Glasgow'তে গিয়েছিলুম, এক মাদকতা-নিবারণী সভাতে নিমন্ত্রিত হই। সেই সভাগৃহ উত্তম আসবাবে পরিপূর্ণ—পার্শ্বেই light refreshment'এর ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য, সবই আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা। সুইচ্‌ টিপ্‌লে আপনাপনি প্রয়োজন মত খাদ্য-সরবরাহ হয়। চা, কেক ইত্যাদি খেয়ে বাসনটী জলে ফেল্‌লে দিয়ে যায়, আপনাপনি তা ধৌত হয়। সে কথা থাক। খাবার সময়ে কে কি খেলে তার কোন হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। কেবল বাহিরে দুয়ারে দুইটী মেয়ে—যাবার সময়ে এদের হাতে প্রত্যেক মানুষ যত খেয়েছে, তার পরিমাণে দাম স্বেচ্ছায় দিয়ে যায়। কেউ কোন দিন মিথ্যা বলে না। জিজ্ঞাসা করে' জান্‌লুম—এদের কোন দিনই এর জন্য ঠকতে হয় নি। এমন কি শুনলুম—এক ভদ্রলোক একদিন বাড়ীতে চলে গেলে পর তাঁর মনে পড়ল—তিনি একটা কেক বেশী খেয়েছেন, তার দাম দেওয়া হয় নি; তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখে সেই কেকের মূল্যস্বরূপ চিঠির ভিতর ষ্টাম্প পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের এইরূপ ব্যবস্থার পরিচয় পেয়ে আমি সত্যই খুব আনন্দ ও শিক্ষা পেয়েছিলুম। জানি না, মতিবাবুর এমনি কোনও দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণা ছিল কিনা।

আমার ধারণা, যেখানে বিশ্বাসের খেলা চলেছে, সেখানে কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। রসিদ নিয়ে, বণ্ড দিয়ে কাজ করার চেয়ে এই বিশ্বাস দ্বারা কাজ করাই ভাল।

আর একটা কথা—'Study circle' অর্থাৎ গ্রন্থাগারে যে সকল পাঠক আস্‌বে তাদের একত্র নিয়ে পড়বার ব্যবস্থা। এই পাঠের মধ্য দিয়া একটা রসাস্বাদন হয়, পড়বার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল এম, এ পাশ ছেলেও বিশুদ্ধ উচ্চারণ করে' পড়তে পারে না। এই study-circle'-এ প্রত্যেকেই পাঠ অভ্যাস করবে। সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম আলোচনা চল্‌বে, যে গ্রন্থ পাঠ হবে তাহাও সকলের মধ্যে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাক্‌বে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সভ্যগণের মধ্যে "স্বাধ্যায়ে"র একটা ব্যবস্থা আছে, আমি খবর রেখেছি। গ্রন্থাগারেও এইরূপ পাঠের ব্যবস্থা যে পাঠকদের কত উপকারে আস্‌বে, তা তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। এদেশে গাছের তলায় বসে "কথকতা" "পাঠ" দ্বারা কত উচ্চ জ্ঞান লাভ করে' মানুষ তৃপ্ত হ'ত—আজকাল সেরূপ পাঠের ব্যবস্থাও চলে গেছে, মানুষও সে জ্ঞানলাভ থেকে বঞ্চিত।

নিরক্ষর হলেও এই পাঠ-প্রণালীর সাহায্যে শত সহস্র লোক জীবনে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক যে শক্তি অর্জ্জন করতেন, তার নিকট আধুনিক তথাকথিত free compulsory and universal education কিছু নয়। আপনাদের পাঠ গোষ্ঠীর সাহায্যে সে আদর্শ আপনারা ফিরিয়ে আনুন, অক্ষুণ্ণ করুন। আপনাদের কর্ম্মিগণের যাঁরা পল্লীসংস্কারব্রতী তাঁরাও পল্লীগ্রামে একাজের বহু সহায়তা করতে পারেন। কোন্ কোন্ পুস্তক পড়া উচিত, কোন্ কোন্ পুস্তক বর্জ্জনীয়, সে সম্বন্ধেও সাহায্য এবং উপদেশ যথেষ্ট তাঁরা দিতে পারেন। কিছু অবান্তর হলেও আর একটা কথা বলতে চাই। গতবার প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া মেলা ও প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে এসে সে কথা বলেছিলাম। গত বৎসর হুগলী স্বদেশী মেলার উদ্বোধন উপলক্ষেও সে কথার পুনরুক্তি করেছিলুম। আপনাদের কর্ম্মী ও তাহাদের সহচরেরা অন্ততঃ হুগলী জেলার একটা Industrial & Economical survey করতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে educational surveyও সম্ভব। স্থানীয় অভাব ও শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশদভাবে না উপলব্ধি করলে শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য কিছুরই উৎকর্ষ সম্ভব নয়। শুধু ফাঁকা আওয়াজে এসব কাজ হয় না। এই এতগুলি ভাল কাজ সুগঠিত পাঠ-গোষ্ঠীর সাহায্যে সম্ভব। আপনারা যে ৪৫০ শত পরিবারের সম্পর্কে এসেছেন এবং আরও কত শত পরিবারের সম্পর্কে আসবেন—তাদের পুষ্টিকর আহার্য্যের সাহায্যে গড়ে তুলবেন—না বিষপ্রয়োগে বিনাশ করবেন, তা আপনাদেরই হাত। বিলাতী প্রথায় আজকাল একটা নূতন কথার আবির্ভাব মাসিক পত্রের স্তম্ভে দেখতে পাওয়া যায়; মনীষী, মহামনীষী, যোগী, মহাযোগী এবং যুগাবতারেরা কোন্ কোন্ পুস্তক পাঠ করে' তাঁদের গন্তব্য শিখরে উপনীত হয়েছেন তার চর্চ্চা চলছে। 'কথামালা' হতে হোমার, ব্যাস বাল্মীকি, ঈস্‌কিলিস্, সফোক্লীশ পর্য্যন্ত নাম সে তালিকার শোভাবর্দ্ধন করেছে; কিন্তু তাতে লোকশিক্ষার যথার্থ কোন উপকার হয় নি। মহাজনগণের গজকাটিতে মেপে এসব বিষয়ের পরিমাণ হওয়া কঠিন। পাঠকগণের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যাদের, সেই গ্রন্থাগারের সৎসাহসী এবং সৎপ্রাণ কর্ম্মিগণ অভিজ্ঞতার ফলে সে বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। অনেক বই পড়বার দরকার হয় না। আমি একবার একস্থানে পড়েছিলাম—"Dread the man of few books'। ইউরোপ, আমেরিকার লাইব্রেরিয়ানেরাই চলন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। সাহিত্য-বিজ্ঞান তথ্য সম্বন্ধে সকল ইঙ্গিত ও উপদেশই তাদের নিকট পাওয়া সম্ভব। সে শ্রেণীর লাইব্রেরীয়ান-গঠন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ত্যাগী জ্ঞানী যোগীদের মধ্যে সম্ভব বলে' আপাতদৃশ্যে অবান্তর এই সব কথার অবতারণা করছি। জঘন্য উপন্যাসপ্লাবিত দেশে এই সকল সহৃদয় জ্ঞানযোগীর মানুষ গড়ে' তোলার কাজ নিতান্ত প্রয়োজন। বিখ্যাত লেখক এবং সমাজ-দার্শনিক বার্ণাড-শ বলেছেন—"we are no longer in the nursery and nursery tales (modern novels) should be scrapped—" কথাগুলি ঠিক আমার মনে নেই, বাক্যার্থ ঠিক এইরূপই। অতএব যাঁরা লাইব্রেরী সংস্থাপন-রূপ মহাব্রত অবলম্বন করবেন, তাঁদের গুরুদায়িত্বের কথা সর্ব্বদা মনে করা এবং মনে করিয়ে দেওয়া উচিত। নিবিড় পাঠাভ্যাস যার জীবনে সম্ভব হয়েছে, জীবনের অনেক অভাব তার স্বতঃই মোচন হয়। সদ্‌গ্রন্থের ন্যায় সদ্‌বন্ধু অতি দুর্লভ। তাঁরা কোনওরূপ দাবীদাওয়া করেন না, ভালবাসার অত্যাচার করেন না, অপ্রয়োজনে "উপর-পড়া" হয়ে উপদেশ দেন না, নিভৃত আলাপনে "মিথঃসঙ্গীর" সুকুমার কাজ করেন, শক্তি বর্দ্ধন করেন, তাঁকে কোন মাশুল টেক্স 'আবোয়াব' দিতে হয় না। এই রত্নভাণ্ডারের যাঁরা রক্ষক তাঁরা পূজ্য; মণিভ্রমে যারা কাঁচ অন্বেষণে নিত্য উদ্‌ভ্রান্ত তাদের নিজস্ব রত্নভাণ্ডারের পরিচয় দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেন, পরিতৃপ্ত করতে পারেন, তাঁরা নমস্য।

আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই শেষ করছি। গ্রন্থাগারের বর্ত্তমান দৈনিক পাঠক ১৩ জন, উহা ক্রমে ক্রমে আরও বর্দ্ধিত করে' তুলুন। এখানে মতিবাবু ও তাঁহার সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মীগণের উদ্যোগে যে এই লাইব্রেরীতে আরও বহুসংখ্যক পাঠক এসে ভীড় করবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। এই গ্রন্থাগার উত্তোরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করুক, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

মেয়র মহাশয় ও চন্দননগরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের নিকট আমার একটা নিবেদন—বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষ জীবনের এক মাস কাল চন্দননগরে যে বাটীতে অবস্থান করেছিলেন, তাঁর একটা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উক্ত বাটীর গায়ে একটা Tablet প্রোথিত করবেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষকে উদ্দেশ করে' চন্দননগরবাসীর সে civic honour দেওয়া উচিত মনে হয়। Talbetটীর গায়ে কি লেখা থাকবে, এইটীও মনে মনে ভাবছিলুম—"French in Independence of thought and culture"—এ উক্তিতে বোধহয় ফরাসীজাতি ও গভর্ণমেণ্ট প্রীতিলাভ করবেন। গ্রন্থাগার উৎসব উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর অনেক নেশা ছিল। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সভায় উপস্থিত—তিনি বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে তাঁর তামাক খাওয়ার নেশা উল্লেখ করেছেন,

উল্লেখ করেন নি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থসংগ্রহ এবং গ্রন্থসংরক্ষণ নেশার কথা। আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বন্ধু, তাঁর এই কেতাবী নেশার সহচর ছিলেন। তাঁরা এক বাসাতেই থাকতেন, একত্রই এ নেশা করতেন। তখন নিতান্ত শিশু হলেও এই নেশার দোষ আমার অল্প বিস্তর ঘটেছিল, এখনও তার মায়ামোহ কাটাতে পারি নি। অতি সাধারণ বই বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুব্যয়ে ইংলণ্ড নয় জার্ম্মানী থেকে বাঁধিয়ে আনতেন। একবার তাঁর মিতব্যয়ী এক বন্ধু এই অকারণ অর্থব্যয়ের প্রতিবাদ করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর করেন—"এটা করি ভালবাসি বলে—যে কারণে তুমি তোমার কুরূপা পরিবারটীকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত কর।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপূর্ব্ব লাইব্রেরী স্থানভ্রষ্ট। ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর লাইব্রেরীর দশাও তাই। কৃষ্ণনগরের বাজারে তাঁর বহুমূল্য মিল্টনের গ্রন্থাবলীর পাতায় মোড়া চিনি খাইয়াছি। এই কথা স্মরণ করে' এবং অন্যান্য বহু শ্রেষ্ঠ কারণ স্মরণ করে' চন্দননগরের মেয়র এবং অধিবাসিগণের নিকট এই বিদ্যাসাগর স্মৃতি ফলকের আয়োজনের নিবেদন করি।"

হিতবাদী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিকে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ও চন্দননগরের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তর সভাভঙ্গ হয়।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে হিন্দু সম্মিলন

আমরা আজ তিন বৎসর ধরিয়া বাংলায় একটী প্রবল হিন্দু সংহতিগঠনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কংগ্রেস হিন্দু সভা নয়। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পারসীক প্রভৃতি ভারতের নানা জাতি লইয়া ভারতজাতিগঠনের ইহা বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। এই ভারত জাতির মধ্যে হিন্দুর বৃহত্তর স্থান আছে; স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভারত জাতি গড়ায় হিন্দুর বাধিয়াছে; কেননা, সকল জাতিই তাহার বৈশিষ্ট্য-রক্ষায় যত্নবান্; হিন্দু ইহাতে উদাসীন হইতে পারে না, তাহার সত্তায় বাধে, সনাতন ধর্ম্মে আঘাত পড়ে। কংগ্রেস যে জাতি গড়িবে সে জাতির মধ্যে হিন্দুর প্রবল সংহতি-বোধ যদি জাগ্রত না থাকে, তাহা হইলে জাতিগঠনের নামে হিন্দুত্বের লোপ হইবে। কংগ্রেস ইহা চাহে না, সে মুসলমানকে, শিখকে, পারসীককে, তাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম ও বৈশিষ্ট্য যেমন হারাইতে বলে না, হিন্দুকেও স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হইতে উৎসাহ দেয় না।

কিন্তু হিন্দু জাতির যে সুদৃঢ় সমাজশক্তি ছিল তাহার ভঙ্গ হওয়ায় আমরা ছন্নছাড়া হইয়াছি। হিন্দু মহাসভা এদিক দিয়া হিন্দু সংহতির রক্ষায় বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। রাষ্ট্রশক্তির দিকে দৃষ্টি দিয়া হিন্দু মহাসভা, হিন্দু মিশন হিন্দুত্বের জাগরণ চাহে। দেখিতে দেখিতে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য-সঙ্ঘও মাথা তুলিতেছে। মহাত্মা হিন্দুজাতির ভিত্তি তলে যে উপেক্ষিত ও অস্পৃশ্য সমাজ তাহার সমুদ্ধারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। এই সকলই হিন্দুশক্তির জাগরণ-লক্ষণ, সন্দেহ নাই।

আমরা ইহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজেই লাগিব, যদি হিন্দুত্বের গুহায় যে অমৃতময় তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা অবধারণ করিয়া মাথা তুলিতে পারি। হিন্দু সংহতি-গঠনের লক্ষ্য হিন্দুত্বই এবং সেই হিন্দুত্ব বলিয়া বিশেষ বস্তুটা আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলাইয়া গিয়াছে। নাম লইয়াই আমরা গর্ব্ব করিতেছি। বস্তুর উদ্ধারমানসেই আমরা এই সংহতিগঠনে উদ্যোগী।

হিন্দু সমাজ ভাঙ্গিয়াছে। হিন্দু হারাইয়াছে তপস্যা। হিন্দু হারাইয়াছে উপাসনা। হিন্দু হারাইয়াছে বৈরাগ্য; হিন্দু হারাইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য। এইগুলি আমরা যাহাতে পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার জন্যই সম্পূর্ণ এক নূতন ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমরা বাংলার প্রায় দুই কোটী হিন্দুর মধ্যে একটি সংহতিশক্তি গড়িয়া লইতে চাহি। এই সংহতি বাংলায় হিন্দু সমাজের মধ্যে যত প্রকার কর্ম্ম ও গঠনপ্রেরণা আছে তাহার কোনটীর সহিত বিরোধ করিবে না; বরং সহায় হইবে—এই বিশ্বাসে বাংলার প্রত্যেক জেলার হিন্দু প্রতিনিধিদের এই সভায় যোগদান করিতে বলি। আগামী ৯ই ও ১০ই ডিসেম্বর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ চন্দননগরে ইহার অধিবেশন হইবে। ইহার বিশেষ বিবরণ সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তকে পত্র লিখিলে পাইবেন। আমার আশা এই বৎসর বাংলার বিক্ষুব্ধ হিন্দুসমাজের প্রত্যেক দরদী পুরুষ ও নারী আমাদের আহ্বানে সোৎসাহে যোগদান করিয়া হিন্দুর দুরবস্থার প্রতীকারে উদ্যোগী হইবেন।

ইতি—

শ্রীমতিলাল রায়

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.
Printed by Krishna Prasad Ghosh at Prakash Press—61, Bowbazar St. Calcutta.
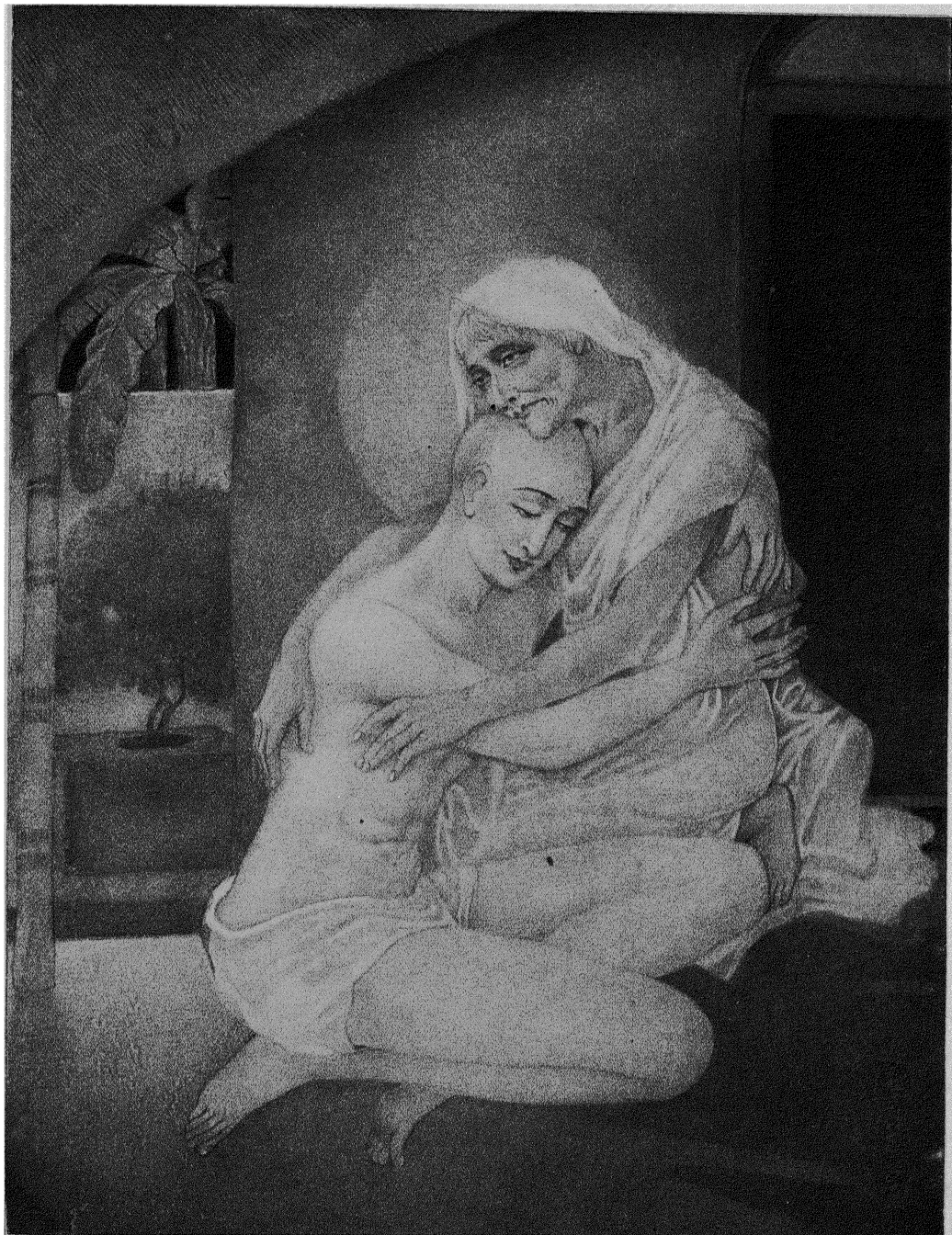
সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর মাতৃসন্দর্শন

[শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]
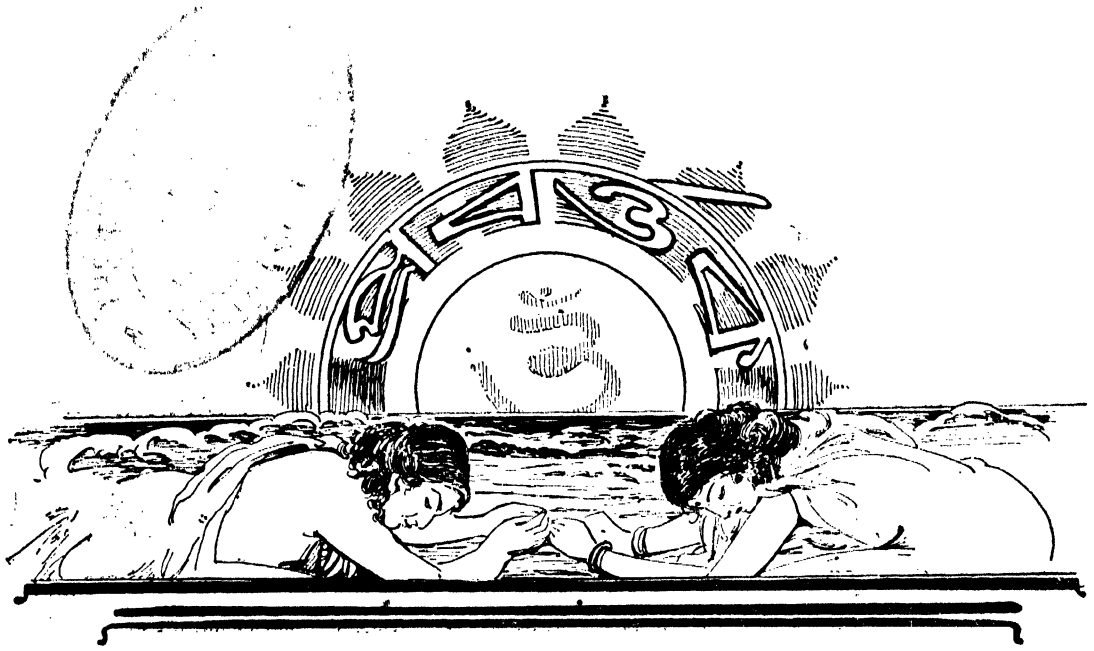
১৮-শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪০ | ৯ম সংখ্যা

আহ্বান

বাঙালী হিন্দুর রাষ্ট্রীয় অধিকারবাদে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত পড়ায় তাহাকে সচেতন হইতে হইয়াছে। আজ সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু ঐক্যবদ্ধ ভাবে হিন্দু সমাজের মর্য্যাদা-রক্ষায় উদ্বুদ্ধ। যে কোন দিক্ হইতেই আঘাত আসুক, হিন্দুত্বের সত্য জাগরণ যদি সম্ভব হয় তাহা বিধাতার আশীর্ব্বাদ-রূপেই স্বীকার করিতে হইবে।

এমন দিন ছিল যে দিন অর্ব্বাচীন যুগের শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে যেন আত্মগৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ মনে করিতেন। আজিও বাঙালী মনীষী এমন অনেক আছেন, যাঁহারা হিন্দু আন্দোলন সাম্প্রদায়িক বলিয়া ফাঁকা ঔদার্য্য দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বার রাজপুতের তের হাঁড়ীর ন্যায় হিন্দু সমাজ মতানৈক্যে ছন্নছাড়া, এই অবস্থায় হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস যাঁহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে তাঁহারা আমাদের প্রশংসার্হ।

হিন্দু আন্দোলন সাম্প্রদায়িক অথবা সঙ্কীর্ণতামূলক, এইরূপ মনোভাব যাহাদের তাহাদের আদ্যন্ত বিকৃত শিক্ষা ও আচারদোষই লক্ষ্যে পড়ে। হিন্দু মহাসভার অধিনায়ক ভাই পরমানন্দ পণ্ডিত জহরলালের হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাপ্রচারের প্রত্যুত্তরে এইরূপ কথা বলিয়াছেন "জহরলাল হিন্দু ছিলেন কবে? তাঁহার স্বভাব গোড়া হইতেই হিন্দু-বিরুদ্ধ শিক্ষা সভ্যতার ভিতর দিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।" হিন্দুত্বের মর্ম্মোপলব্ধি না থাকায় রাষ্ট্রীয় নেতৃপুরুষগণের মুখে হিন্দু আন্দোলনের প্রতিপক্ষে এইরূপ সমালোচনা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে।

এক দল ভূমাধর্ম্মী আছেন—যাঁহারা ভাজেন উচ্ছে বলেন পটল—অদ্বৈতজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মহা-মানবতার স্বপ্ন দেখেন—তত্ত্ব ইঁহাদের পুঁথিগত, অনুভূতি-গত নয়। নামভেদে বস্তুভেদ যে সম্ভব নয়, ইহা তাঁহাদের ধারণায় আসে না। আত্মপরিচয় দিতে যেমন দেহখানি

ও বিশিষ্ট নামটী আমাদের সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হয় অথচ এই দেহের ও নামের পরিবর্ত্তনে যুগে যুগে একই আত্মার পুনরাবির্ভাব ঘটে, তদ্রূপ ভূমার ধর্ম্ম নামভেদে ক্ষুণ্ণ হয় না। এই ভারতবর্ষের একদিন নাম ছিল—"অজনাভ"—সে নামের পরিবর্ত্তনে ভারতের উত্তরে হিমালয় উল্টাইয়া দক্ষিণে আসে নাই। নাম লইয়া বুদ্ধিভেদ অজ্ঞানের পক্ষেই সম্ভব।

আমি ও আমার হিন্দুত্ব, এই দুই লইয়া আমার অস্তিত্ব—এই অস্তিত্ব ভূমারই বিগ্রহমূর্ত্তি। ইহার সংরক্ষণে ঔদাসীন্য আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নহে। হিন্দু সমাজেই এরূপ পাষণ্ড-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুকুলে জন্ম লইয়া হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিতে এই শ্রেণীর লোকের উৎসাহ দেখা যায়। ইঁহারা যত বড় লোকই হউন, যত প্রতিষ্ঠাই ইঁহাদের থাকুক, হিন্দুভারত আজ এই শ্রেণীর হিন্দুকে হিন্দুসমাজের ছদ্মবেশী শত্রু বলিয়া দূরে পরিহার করিবে।

এক্ষণে হিন্দুজাতিকে রক্ষা করার উপায় লইয়া কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় তুলাদণ্ডে হিন্দুসমাজের শক্তি ও অধিকারের ওজন নামিয়া পড়ায় আমরা ক্ষুব্ধ ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমাদের উত্থান-পতনের ওজন-দণ্ডটা যদি কেবল রাষ্ট্রই হয়, তাহা হইলে আমাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। আমরা ধর্ম্মের মানদণ্ডে কিরূপ অবনত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাই সর্ব্বাগ্রে ভাবিবার কথা। সর্ব্বক্ষেত্রেই হিন্দু বাঙালীর অধঃপতনের কারণ—হিন্দুজাতি ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়াছে। এই ক্ষেত্রেই আমাদের সচেতন হইতে হইবে এবং এই ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল মন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া আমরা হিন্দু-সম্মেলন-গঠনের পক্ষপাতী।

রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অধিকার-দানের নিঃস্বার্থ হিসাব না দেখিয়া আমাদের বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। জাতির এক তৃতীয়াংশ অবনত হিন্দু নরনারী উপেক্ষায় অবজ্ঞায় প্রাণহীন, তাহাদের দিকে প্রসন্নদৃষ্টি হৃদয়ের পরিচয়। দেবতার মন্দিরে হিন্দুমাত্রকে সমবেত করার প্রয়াস, তাহাদের মনে উপাসনার প্রবৃত্তি জাগ্রত করা মহত্ত্বের লক্ষণ। বর্ণভেদ-দূরীকরণ, হিন্দুসমাজের দারিদ্র্যপ্রতিকার, হিন্দুনারীর গৌরব ও সম্ভ্রম রক্ষা—এইরূপ অসংখ্য প্রকার সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু কোন্ দিক্ হইতে এই সকল প্রচেষ্টা আমাদের মনকে প্রবুদ্ধ করিতেছে, তাহার বিচার আজ প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, মন্দিরপ্রবেশান্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকেই দেব-বিগ্রহে বিশ্বাসবান্ নহেন। এরূপ হইলে, বলিব না কি ইঁহাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয়। ইঁহারা অবনত, অক্ষরজ্ঞানহীন হিন্দু-সমাজের অন্ধকার ধর্ম্মবিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়া দূর করিতে উদ্বুদ্ধ নহেন; অন্যদিকে যাঁহারা অস্পৃশ্যদিগকে কোনরূপে দেব-মন্দিরে প্রবেশ ও পূজার অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন, বিগ্রহের প্রতি হিন্দু-সমাজের অবনত দিগের যে বিশ্বাস ও আস্থা তাহার পুষ্টি দিয়া জাতিকে ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বলবান্ করিতে পরাঙ্মুখ, মন্দির-দেবতার প্রতি তাঁহাদেরও দৃঢ়প্রত্যয় কতটুকু আছে তাহা সংশয়ের বিষয়। এইরূপ অবস্থায় আন্দোলনের হুজুগেই, হিন্দু-সমাজে পক্ষাপক্ষ-ভেদে আত্ম-হত্যারূপ যে মহাপাপ তাহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করে—আর আমরা নীরব থাকিব কেমন করিয়া!

আমরা চাহি, মন্দিরের ধর্ম্মবিশ্বাস হিন্দু-সমাজের প্রতি নরনারীর অন্তরে জাগ্রত করার জন্য মন্দিরের রুদ্ধ কবাট সর্ব্বজাতির সম্মুখে উন্মুক্ত করা হউক। এই কাজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসীর—পাষণ্ডের নহে। সংগ্রাম তাই বাহিরকে লইয়া তত নহে, যত আভ্যন্তরীণ অবস্থার মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে। আজ আমাদের স্থির করিয়া লইতে হইবে—কোন্ পথে জয়ের নিশান উড়াইয়া আমরা হিন্দুত্বের মহিমা রক্ষা করিতে পারি। এই জন্যই সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সংহতিবদ্ধ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

দেড় শত বৎসর ইংরাজের অধীনেই আমরা নিঃশেষ হইতে বসি নাই—আমাদের হাড়ে ঘুণ ধরিয়াছে শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই। জাতি নিরক্ষর জ্ঞানহীন—এই দেড় শত বৎসর ধরিয়াই নহে। শতাব্দী শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখি, হিন্দুর আদর্শ ও মৌলিক শিক্ষা এ জাতির সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য করিয়াই রাখা হইয়াছিল। লুথারের প্রচেষ্টায় ইউরোপের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা খৃষ্ট-ধর্ম্মের মহিমা ও মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল;

ভারতের হিন্দুধর্ম্ম কিন্তু অতি প্রাচীন, সনাতন হইলেও, হিন্দু জাতির নিকট চিরদিনই অস্পষ্ট। ইহার ফলে অর্দ্ধ জগৎ খৃষ্ট-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত; আর বিশাল হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাবে ম্লান, মুমূর্ষু। নিদারুণ প্রতিক্রিয়া-বশতঃ যে শিক্ষা খাল কাটিয়া কুমীর আনার মত ঘরে আমরা ডাকিয়া আনিলাম, তাহাতে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসারতা কিঞ্চিৎ বাড়িল বটে; কিন্তু জাতির মৌলিক শিক্ষাদীক্ষার ভিত্তি শিথিল হইল। চাণক্যের সেই মহাবাণী আজ অর্থহীন—"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—তাই যে শিক্ষা লাভ করিয়া অর্ব্বাচীন ভারত আজ আলোকোজ্জ্বল, ভারতবাসী সে শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ পদবী গলায় ঝুলাইয়াও সর্ব্বত্র দূরে থাক, নিজের ঘরেই যে আজ লাঞ্ছনায় ম্রিয়মাণ। অধিকন্তু হিন্দুধর্ম্মে আস্থাহীন নরনারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দু-জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে। আজ পুরুষের ন্যায় নারীও দলে দলে যুগপ্রভাবে ভারতীয় ধর্ম্মে ও চরিত্রে আস্থাহীন হইয়া দুর্ভাগ্যের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছে; নতুবা প্রকাশ্য হিন্দুসমাজের বুকে তরুণীর কণ্ঠে এই শূন্যগর্ভ দম্ভ প্রকাশ হইবে কেন যে, তাহারা আর "সতীত্বের আঁস্তাকুড়ে" থাকিতে চাহে না! কোন্ দিক্ দিয়া হিন্দুত্বের পুনরুত্থান প্রয়োজন, কোথায় আজ ধূর্জ্জটীর মত উন্নতগ্রীব হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, তাহার আলোচনা আজ প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য।

দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই—আত্মবিশ্বাস-হীন ব্যক্তি স্রোতের শৈবাল ভিন্ন আর কিছু হয় না। পরের মুখে ঝাল খাইয়া যাহাদের ওষ্ঠপুট রক্তিম, আকুঞ্চিত হয়, তাহারা অধঃপাতে গিয়াছে, তাহাদের মরিতে দাও। ঈশ্বর-বিশ্বাসের যজন, আরাধনা, ধারণা, এই সকল পুনরুদ্ধার করিয়া হিন্দুকে আজ আত্মিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে। ইহার সুষ্ঠু নিয়মিত বিধানপ্রবর্ত্তনের উপায় ও দৃষ্টান্তস্বরূপ কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিচার ও আলোচনা করায় বিলম্ব করিলে চলিবে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলকেই এই সকল কথা বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে বলি।

বেকার-সমস্যায় হতশ্বাস হইয়া নৈরাশ্যের অন্ধকারে আমাদের সংসার, সমাজ যেন আসন্ন প্রলয়ের সম্মুখীন; কিন্তু এই নদীমাতৃকা বঙ্গভূমি, শস্যশ্যামলা নিখিল বিশ্বের ভরণ-শক্তিশালিনী জগদ্ধাত্রীর কোলে বসিয়া এইরূপ দুঃস্বপ্ন কত বড় সম্মোহন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই বাংলার অন্নে, পণ্যে, কৃষিজাত দ্রব্যসম্ভারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী কেবল উদর পূরণ করে না—ঐশ্বর্য্য-গৌরবে শ্রীসম্পন্ন হয়। চীন, জাপান, জার্ম্মানী, মার্কিণ, জগতের সর্ব্বজাতি এই বাংলার মাটী হইতে ধন-সম্পদ্ আহরণ করে, আর আমরা বাঙালী ললাটে করাঘাত করি, কলিকাতার রাজপথে শুষ্কমুখে উমেদার বেশে ঘুরিয়া বেড়াই, ব্যর্থমনোরথ হইয়া আত্মঘাতী হই—এমন আশ্চর্য্য কথা এখনও যে ভাবিবার বিষয় নহে তাহা কেমন করিয়া বলিব! তাই ইহার কারণ ও তথ্য অন্বেষণ করিবার জন্য আমরা বাঙালী হিন্দুমাত্রকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করি। রাষ্ট্র-সাধক বলিবেন—এই সকল সমস্যার প্রতিকার সম্ভব হইবে না, যতক্ষণ আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিব। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা এই মাত্র দিতে পারি যে, রাষ্ট্রীয় সাধনায় হিন্দু বাঙালীকে আমরা নিরস্ত থাকিতে বলিতেছি না। কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়ার অধিকতর যোগ্যতার্জ্জনের জন্য আমরা বাঙালী হিন্দুকে বলিব, পরাধীন অবস্থার মধ্যেও আত্ম-রক্ষার যেটুকু পথ ও সুবিধা আছে তাহা হইতে বিমুখ না হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে সেই সকল পথে ও সুবিধায় সাধ্যমত সংরক্ষণ প্রচেষ্টা করিতে হইবে। পরাধীন হইয়াই আজ মরণের দুয়ারে গিয়া আমরা দাঁড়াই নাই—স্বজাতি-প্রীতি হারাইয়া আমরা আত্মঘাতী হইতেছি। জাতিকে প্রেম ও ঐক্যের বন্ধনে সংহতিবদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে, সকল প্রকার দুর্দ্দশামোচনই সম্ভব হইয়া উঠিবে। তাই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' হইতে হইবে। একই দেবতার মন্দিরে আবার আমরা আচণ্ডালে একত্র হইয়া হরিধ্বনি করিব। তন্ত্র সহজিয়ার দেশে জাতি-বর্ণের ভেদে হৃদয়ভেদ হইবে না। গুণাদি ভেদবশতঃ আকার প্রকারের ভেদ সত্ত্বেও প্রাণের ঐক্য ছিন্ন হয় না, ইহা হিন্দুত্বেরই উত্তম রহস্য। বাংলার নবদ্বীপচন্দ্র আত্মজীবনে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। প্রেমে, ঐক্যে

হিন্দুজাতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার অবশ্যই উত্তম পথ পাইব।

হিন্দুর মস্তিষ্ক-কোষ ধর্ম্মজ্ঞান-পূর্ণ; তাহা আজ মরুভূমি হইতে বসিয়াছে—শাস্ত্রবাণীর বর্ষণাভাবে। দেবভাষাই ধর্ম্মমেঘ, সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যের অমর বাণীই অমৃতবর্ষণ —তাই দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মধ্যে সংস্কৃত-চর্চ্চার আয়োজন করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় অধিকারে বঞ্চিত বলিয়া ইহা বাধিবে বলিয়া মনে করি না। হিন্দুত্বের মর্ম্ম-বীণা বাজাইয়া হিন্দু বাঙালীর ঘরে ঘরে আবার কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণলীলার মধুময় ধূয়ার রোল তুলিতে হইবে। নূতন রাগিণী, নূতন সুরের ঝঙ্কারে হিন্দুজাতির মরা প্রাণে উৎসাহের প্রদীপ জ্বালিতে হইবে। বিলাতের কলের কুলীকে যীশুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে যেমন একদিন বলিত "তাহার কত নম্বর", আজ হিন্দুর অস্পৃশ্য কেন, কয়জন শিক্ষিত ভদ্র নারী ও পুরুষ হিন্দুধর্ম্ম বুঝে ও ব্যক্ত করিতে পারে? এই ধর্ম্মান্দোলন আমরা অবাধে সমাজের মধ্যে আনিতে পারি।

হিন্দুর আত্মা আজ অমুদ্বুদ্ধ। পেটের খোরাকই তাহার বড় কথা নহে, আত্মার খোরাক যোগাইতে হইবে। পেট ভরিলেই আমরা বাঁচিব না। হিন্দু-সমাজে বৃহত্তর ভুঁড়িবিশিষ্ট ধনী ও সম্পৎশালী লোক অনেক আছেন; কিন্তু আত্মার জাগরণ সেখানে সম্ভব হয় নাই। পাষাণ-স্তূপের মত জড়, অসাড়, নির্জীব প্রাণ, একটা জটাধারী সাধু মোহান্ত পাইলে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া বাঁচে। পাপের কড়ি এইরূপ গুরুর চরণে ঢালিয়া তাহারা স্বস্তি অনুভব করে। বিবেকের কষাঘাতে ইহা যেন পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম-প্রাণ জাগে কই? আত্ম-সাধনার রসায়নে আত্মার যে স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় প্রকাশ, তাহা অর্থপুষ্ট ধনীর জীবনের ছন্দে ফুটে না। সম্পদ্ তাই বন্ধন, কর্ম্ম ক্লান্তির কারণ, সংসার মরুভূমি!

আজ ধনী দরিদ্র, বিদ্বান্ মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হিন্দু-জাতির সমগ্র প্রাণকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য আত্মার উদ্বোধন-মন্ত্রে সমগ্র জাতিকে দীক্ষা দিতে হইবে। ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা ব্রাহ্মণের আছে—শূদ্রের নাই, অস্পৃশ্যের নাই, এরূপ নহে। পরাধীনতার ব্যথায় এই মন্ত্রের ঝঙ্কার যে কণ্ঠে উচ্চারিত হয় না, ইহাও নহে। অতএব আমরা অনায়াসে এই জীবনমন্ত্রে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারি।

আমাদের বেকার জীবনভার—মেরুদণ্ডে শক্তি পাইলে এই মুহূর্ত্তে মাটীর উপর আছাড় দিয়া নিক্ষেপ করিতে পারি। চাই শুধু হিন্দুর অমর প্রাণ জাগাইয়া তোলার দৃঢ় সঙ্কল্প। কর্ম্মকে আজ যে ধর্ম্মপথের বন্ধন বলিয়া চীৎকার করে, ঊর্দ্ধলোক হইতে ভাগবৎ-শক্তির অবতরণের আশায় যে জাতিকে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার উপদেশ দেয়, এই মূর্ত্ত সৃষ্টি মায়া বলিয়া যে তুড়ি মারিয়া উড়াইতে চাহে, তাহাদের ভুয়া কথায় আর কাণ দিলে চলিবে না; বরং তাহাদের উদরপূর্ত্তির যে সুযোগ ও সুবিধাটুকু আছে তাহাও রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। খেয়ালের নেশা ছাড়াইয়া জীবনের উন্মাদনায় জাতিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। আজ আমাদের হইতে হইবে শ্রমিক। শ্রমের মূল্য কাঞ্চন-মুদ্রা নহে—অন্তরের শ্রদ্ধা সম্মান দিয়া তাহাকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে হলকাঁধে মাঠে গিয়া দাঁড়াইলে, তাহার কণ্ঠে সম্মানের পুষ্পমাল্য দোলাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হউক। পথের ধারে যে অসংখ্য বিপণিশ্রেণী, হিন্দুযুবক বেসাতী লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলে তাহাদের ললাটে চন্দনের জয়টীকা পরাইয়া দেওয়া হউক। আজ শ্রমের মূল্য আমরা এই ভাবে যদি দিতে সুরু করি, বাঙালী অনতিবিলম্বে বেকার জীবনভার অবহেলে দূরে নিক্ষেপ করিবে। পঁচিশ টাকা বেতনের কেরানীগিরির জন্য পাঁচশত উমেদার জুটে—নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িলে সীবন করার যোগ্যতা তাহাদের নাই। ইহা কি একটা জীবন্ত জাতির পরিচয়?

আমরা এক বস্তু হারাইয়া পঙ্গু, ক্লীব হইয়াছি—সে বস্তু ভাগবত বিশ্বাস। যে ভগবানকে পায়, সে ভাগবত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। ম্যাজিক, মিষ্টিসিজিম্, গুরুগম্ভীর বচন এই সকল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া শ্রমকে মূলধনে পরিণত করিতে হইবে। ঈশ্বর-বিশ্বাস আত্ম-বিশ্বাসরূপে আত্মরক্ষার অমর বীর্য্য হইবে। সহধর্ম্মী ও স্বজাতির প্রতি প্রীতি হইবে জীবনের রসায়ণ। উপাসনার

মন্ত্র হইবে আয়ুঃ ও অমৃত। আমরা ভাগবত জাতি রূপে অভিনব জন্ম লইয়া মাথা তুলিব--ইহাই হিন্দু জাগরণের মূলমন্ত্র হউক।

অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে, কিন্তু হঠকারিতা করিয়া নহে। জ্ঞান-প্রদীপ যদি জ্বালিতে পারি, অন্ধকার যতই ঘনাইয়া থাকুক, তাহা এক মুহূর্ত্তে বিদূরিত হইবে। অপরাবিদ্যার সঙ্গে পরমা বিদ্যার প্রণবধ্বনি কোটী কোটী কণ্ঠে সমুচ্চারিত করার আয়োজন করিতে হইবে। নদী-তীরে, প্রান্তরে, মন্দিরে মন্দিরে সমবেত উপাসনার কণ্ঠ আবার দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত করুক। আহার-নিদ্রার ন্যায় উপাসনার মন্ত্র জীবনের স্বভাব রূপে পরিণত হউক। আজ যাঁহার মস্তিষ্ক আছে, জাতির প্রাণে উৎসাহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য তিনি নব নব বেদমন্ত্র রচনা করুন। যাঁহারা হৃদয়বান্ তাঁহারা উদীয়-মান তরুণের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া এই নবজন্ম-গ্রহণের প্রেরণা তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করুন। শ্রমিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী আজ বাঁচিবার সঙ্কল্প সমগ্র জাতিকে বাঁচাইবার প্রেরণায় সংযুক্ত করুন। হিন্দু-সংগঠনের সাধক কর্ম্মিগণের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি। আমরা অসংখ্য মানুষের মেলা বসাইতে চাহি না—ব্যর্থ আন্দোলনের আস্ফালনে একটা হট্টগোল বাধাইতে প্রস্তুত নহি। মরমী ও দরদীর সংহতি যদি গড়িয়া উঠে, বাঙালী হিন্দু আবার নূতন প্রাণ লইয়া হিন্দুত্বের জয় দিবে। আজ প্রয়োজন হইয়াছে এমনই একদল সমষ্টিবদ্ধ সর্ব্বত্যাগী নরনারী, যাঁহাদের জীবন-মন্ত্র হইবে—"ত্বং হি প্রাণা শরীরে, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"। এই মন্ত্রসিদ্ধ যে জাতি সে জাতি নিবীর্য্য হইয়া থাকিবে কত দিন? এই নবজাতির প্রতিমা গড়ার উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিবার জন্য আমরা নূতন তীর্থযাত্রীদের আহ্বান করিতেছি।

সর্ব্বদা স্মরণ রেখো রসবস্তু—উৎসর্গ। কর্ম্ম যজ্ঞ-স্বরূপ। যজ্ঞে উৎসর্গের বোধ স্থির না থাকলে কর্ম্ম বন্ধন হবে, ফলাফলে আশা ও নৈরাশ্যে দ্বন্দ্ব সৃজন করবে। খুব সাবধান, তোমাদের আত্মদান দেশে নূতন প্রেরণা দিবে, মুক্তির নূতন পথ আবিষ্কার করবে।

কোন জাতির মধ্যে যখন বিশ্বজনীন জীবনপথের নূতন কোন দিক্ ফুটে উঠে, সে জাতির তপস্যা বড় অসাধারণ। হিন্দু-বাঙ্গালীর মধ্যে আজ এই নূতন আদর্শ স্থাপন করার প্রয়াস বড় কম তপস্যার কথা নয়। আমি, তুমি, সে হয়তো সুখী ও নিরাপদ্ হ'তে পারি সকল দিক্ দিয়ে—সমগ্র জাতিকে সচ্ছন্দ পবিত্র জীবনদানের ব্যবস্থা দিতে হবে। সমগ্র জাতি সস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এই আদর্শ অল্প তপস্যায় সাধ্য নয়।

হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, ব্যর্থতায় মনোভঙ্গ নাই, অকাতরে সব কিছুকে তুল্যভাবে বহন কর। নিরন্তর শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জ্জনের ন্যায়, যখন দশ পা এগিয়ে চল, প্রয়োজন হলে পেছিয়ে দাঁড়াতে ইতস্ততঃ করো না। গতি জীবনযাত্রারই অভিব্যক্তি। 'গম্' ধাতু থেকে জগৎ। জীবন যখন অচল হবে, জগৎ থেকে তোমায় বিদায় নিতে হবে, ততদিন গতি যেন নিরবচ্ছিন্ন হয়।

এই গতি আত্মসুখের জন্য নয়, পত্নী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনের জন্য নয়—তোমার জীবনতপস্যা দিয়ে শত সহস্র নিরন্ন, শত সহস্র পতিপত্নী, পুত্রকন্যার ভরণপোষণের সঙ্গে ধর্ম্মজীবনগঠনের ব্যবস্থা হবে; ইহাতেই তোমার অপরিসীম তৃপ্তি—তুমি আজ দীন, কাঙ্গাল সন্ন্যাসীর বেশে জীবন তপস্যায় উদ্বুদ্ধ—সারা জাতিকে এই বেশে দীক্ষা দিও না। তুমি অসাধারণ জীবন নিয়েছ, বহুজনের হিত ও কল্যাণের জন্য। একদিন তোমার সিদ্ধি শত সহস্র অক্ষম পঙ্গু জীবনকে বল দিবে, ঐশ্বর্য্যে আনন্দে উদ্বুদ্ধ করবে—কত গৃহস্থ নরনারী তোমার অবদানে আশার আলোয় উৎফুল্ল হবে, কত শিশুর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠবে। তোমার কিন্তু কেহ নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, গৃহ নাই, কোন আশ্রয় নাই জীবনের, তুমি যে ভগবানে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করেছ, তুমি যে সর্ব্বভূতে তোমার ইষ্টকে দেখে বিশ্বজনের জন্য করুণায় হৃদয় পূর্ণ করেছ! হে সন্ন্যাসী, আজ তোমার হৃদয় উদ্বুদ্ধ হোক—কেহ নাই, তাই তো সকলের দৈন্য দূর করার এমন উৎসাহ, এমন আনন্দে হৃদয়-তন্ত্রে বজ্রগর্জ্জন উঠে, মুক্তি-মন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। শতজন সন্ন্যাসীর জীবন দশসহস্র গৃহস্থ জীবনের অন্ধকারময় গৃহে শ্রী ও শক্তির হোমকুণ্ড জ্বালবে। প্রবর্ত্তকের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তোমরা উদ্বুদ্ধ হও।

* * * * *

যৌবন তুমি প্রতীক্ষা করো' না—অবিশ্রাম চল, তোমার গতি হোক নিরবচ্ছিন্ন।

দেহ তোমার আশ্রয়। দেহ কালের বশ। অমোঘ ইচ্ছাসত্বেও আশ্রয়-বস্তু যখন অচল হবে, প্রভুর সেবা হ'তে বঞ্চিত হতে হবে। তোমার শরীর হবে শিথিল, ইন্দ্রিয়গ্রাম হবে অবসন্ন। ব্যর্থ-কল্পনা জাল বুনে' মানুষকে তুমি তখন বঞ্চিত করবে। যৌবনকে ভোগ কর ষোল আনা, ভোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ সেবায়। দেহখানি ঢেলে দাও প্রভুর কাজে।

উত্তেজনা রেখো না—চাঞ্চল্য রেখো না—সুনিয়মে শৃঙ্খলিতভাবে জীবনকে সংযত কর। কোন কাজ অকাজ নয়। দেহ-রক্ষা, আত্মাকে সচেতন রাখা, দুইই তুল্য কর্ত্তব্য। এক করার তাগিদে, অন্যকে উপেক্ষা করো না—যোগ হচ্ছে সমতা। নির্দ্বন্দ্ব হও!

আহার বিষয়ে যেমন সচেতন থাকবে, পবিত্র পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়া দেবতার ভোগ হয় না, শয়ন ও নিদ্রা যেন পরিপাটী ও গভীর হয়; আত্মার খাদ্য যে উপাসনা তাহাতেও যেন রুচি থাকে। জীবনকে যৌবন যদি গড়ে না নাও, অসময়ে তোমার দীক্ষা ও সাধনা কেবল আশ্রয়ের অক্ষমতা হেতু ব্যর্থ হবে। তোমরা পেয়েছ গতি, পেয়েছ সঙ্কেত, সাধনার নিয়ম, জীবন গড়ার সুব্যবস্থা—হে বন্ধু, কোন দিকে উদাসীন থেক না। প্রভুর কাজে যাদের প্রাণ তাদের দরদ হোক আত্মরক্ষার দিকে প্রবল। তোমাদের জীবন-স্বপ্ন সিদ্ধ করার অনুকূল হোক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

*　　*　　*　　*　　*

তোমাদের আজ থেকে প্রতিদিন অন্তর্গঠনের পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হতে বলি। আজ থেকে তোমরা মৌনব্রত অবলম্বন কর। কত বৃথা বাক্যব্যয় হয়; কত বার বলেছি, প্রয়োজন ব্যতীত কথা কয়ো না; কত যে কথা কও, তার কোন ফল ভগবানে অর্পিত হয় কি? কেবল সংস্কার-সৃষ্টি। কথা, আলোচনা, আন্দোলন বন্ধ কর। আজ থেকে যেন আমার নূতন যুগে, নূতন ভাবের মানুষ।

সাধনার ক্রম ঠিক এইরূপই। এক এক টা স্তরে লম্ফ দিয়ে উঠতে হয়। সেই স্তরে নূতন ভাব দৃঢ় করার জন্য সংযম ও সাধনার প্রয়োজন খুব আছে। সেই স্তরে যখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়া যায়, আবার লম্ফ দিয়ে উঠ্‌তে হয়, আরও ঊর্দ্ধতর ধাপে; প্রতি স্তরে দাঁড়িয়ে স্বভাবের মধ্যে সব কিছু assimilate করতে হয়। পরিপক্ক অবস্থা না হলে দিব্য স্বভাব বলতে যাহা তাহা সুন্দর ও সহজ রূপে দেখা দেয় না—একটা উদ্ভট, উৎকট চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। অপার্থিব চরিত্র কিন্তু সুন্দর ও মধুর। নিজেও প্রশান্ত প্রীতিময়, অতি নিম্নস্তরের লোকও তোমায় দেখে শান্তি ও আনন্দ পাবে।

চেষ্টা করে' অসাধারণ হ'তে গেলে উৎকট ও ভণ্ডই হতে হয়। ভগবানে নিজেকে তর্পণ করতে করতে যে হওয়া তাহাই ভাগবত। দেওয়ার মাত্রা যদি তাকেই পাওয়ার ফিকির রূপে ফিরে' না আসে, তবে সবই বৃথা পণ্ডশ্রম।

সাধনা প্রতিদিন মেপে মেপে দেখা যায়—যতটুকু হয়। এমন বস্তুতন্ত্র পদার্থ বোধ হয় আর কিছু নয়। তুমি, আমি মায়া, অনিত্য—কিন্তু দেওয়ার অর্ঘ্যরূপে যা পাই, যা অনুভব করি, তার ক্ষয় নাই। উৎসর্গ ই আমাদের অমৃতের অধিকারী করে।

স্বাধীন আফগান

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, বি-এ

অভ্যন্তরীণ পরিচয়

বিচিত্র এ দেশ! ততোধিক বিচিত্র ইহার রক্তরঞ্জিত সংগ্রামময় ইতিহাস। আফগান সিংহাসন কেন্দ্র করিয়া যত রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, নৃশংসতা, বিশ্বাসঘাতকতা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার তুলনা অন্যত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। রাজ্যভোগ-লিপ্সায় ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের নির্ম্মম ছুরিকাঘাত, দেশের বুকে বিদ্রোহের অরাজকতা ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। আফগানিস্থানের সিংহাসন চিরকণ্টকিত—সহস্র বিঘ্নসঙ্কুল। যুগ যুগ ধরিয়া শত বাধা-বিপত্তি, আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন, উত্থান-পতন কত আলোড়ন বিলোড়নের কঙ্করময় পথ অতিক্রম করিয়া আজিকার আফগান রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম্ম-কৃষ্টি-সভ্যতা যে রূপ লইয়াছে, তাহার অতীত ইতিহাস খুব সুস্পষ্ট নয়। আফগানিস্থানের আছে প্রাণের প্রাচুর্য্য কিন্তু তাহা একটা ধারাবাহিক ভাবধারাকে ক্রমপরিপুষ্টি করিতে সহায়তা করে নাই। একান্ত বস্তুতন্ত্র পার্থিব ভোগের অত্যুগ্র লিপ্সায় জাতীয় চিত্ত মোহাচ্ছন্ন। প্রাচ্যের এই রাজ্যটির অবস্থিতির দরুণ সে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনকেন্দ্র হইতে পারিত কিন্তু তার বর্ব্বর পাথরের মত অনুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমের যে শিল্পসভ্যতা ও কৃষ্টির আদান-প্রদান-অভিযান অতীতে জলপথ আবিষ্কারের কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা সেখানে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হওয়ায় কোন স্থায়ী অবদান রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আফগানিস্থানেরই প্রতিবাসী পারস্যের অপূর্ব্ব সভ্যতা, সুক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি, বিচিত্র কবিপ্রতিভা, সারাসেনীয় শিল্পকলা পারস্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। পরন্তু দুনিয়ার দরবারে আফগানিস্থানের কি গৌরব-পরিচয় আছে? উহার এমন কোন বিশিষ্ট অবদান নাই, যাহা তাকে সম্মানের আসন দিতে পারে।

খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ ভারতের সভ্যতা, ধর্ম্ম, স্থাপত্যাদি শিল্পকলা আফগানিস্থানের বুকে ক্রমাধিকার বিস্তার করিয়াছিল বা তৎপরে পূর্ব্বের জৈন ও পশ্চিমের জরথুষ্ট্রের ধর্ম্ম-প্রভাব খৃষ্ট-জন্মের পর এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল থাকিয়া কালধর্ম্মে শ্লথ, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আজ ঐতিহাসিকের অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে! এখানকার মাটির ধর্ম্মে উহা ক্রমাত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া ১০ম শতাব্দীর বিজয়ী মুসলমান ধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতাও অতীতকে গ্রাস করিয়া বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের অলক্ষ্য ছায়াপাত, বিচিত্র আচার আচরণের সংমিশ্রণ তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। আধুনিক যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে সমান তালে চলিতে গিয়া কাবুলের যে বিপদ্ তাহা বিশ্ব-স্মৃতিতে এখনও জাগরূক। আফগান রাষ্ট্রীয় চেতনার সুপরিচ্ছন্ন রূপ, জাতিগত মূলসত্তার অমিশ্র বিশিষ্ট মূর্ত্তির যে স্বরূপ, তাহা এখনও অজানা অনুমানের গর্ভেই নিহিত। আফগানিস্থানের রাষ্ট্রবিকাশকে আশ্রয় করিয়া শান্তিপূর্ণ অনুকূল আব্‌হাওয়ায় কোনদিন বিশেষ কোন বৃহত্তর কৃষ্টি, মানবতার কল্যাণকর কোন সম্পদ্ সৃজিত হইবার ইতিহাস পাওয়া যায় না। বিপ্লব-অশান্তি-হত্যা এ রাজ্যের নিত্যকার বস্তু। বিচিত্র পক্ষীর অফুরন্ত কূজনমুখরিত, বহুরূপী ফুলফলশোভিত বৃক্ষলতার কুঞ্জ-মাঝে স্বপ্নঘেরা লোভনীয় আফগান-সিংহাসনের তলে তলে হিংসা, বিপ্লব বিশ্বাসঘাতকতার রক্তনদী চির-প্রবাহিতা। মধ্যএশিয়ায় তাই ইহার 'বেইমান' আখ্যা নিছক ভিত্তিহীন নয়। আফগান জনগণের পতন জাগরণের কাহিনী ইহার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ন্যায় একটা নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, রক্তরঞ্জিত জীবনকাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

সাধারণ বর্ণনা

পাহাড়-ঘেরা স্বপ্নরাজ্য! কোথাও ধূ-ধূ মরুবুকের সুদূর বিস্তারের মাঝে রুদ্র-কঠিন পর্ব্বত-মেখলা দিগন্তে মিশিয়াছে, আবার কোথাও চিরতুহিনাবৃত উত্তুঙ্গ

গিরিশীর্ষে স্বচ্ছ নীলাকাশ আলিঙ্গন করিয়া দণ্ডায়মান। একদিকে বিচিত্র বিশাল মালভূমি অপূর্ব্ব তরঙ্গভঙ্গিমায় লীলায়ত, অপরদিকে স্নিগ্ধসজল ছায়া-শীতল উপত্যকার মালা পার্ব্বত্য-স্রোতস্বিনীর কলরবে মুখরিত। নিবিড় ছায়াঘন ফুলফলভারাবনত চিরশ্যাম বৃক্ষলতাকুঞ্জ ছবির স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়াছে। থরে থরে ফুলের বাসর-শয্যা মনোরম উদ্যান, স্তবকে স্তবকে ফলের পরিশোভা, দ্রাক্ষাকুঞ্জে বুলবুলের কলতান, সে প্রাণ-জুড়ান দৃশ্য তুলনাহীন।

উর্ব্বরভূমি এবং বাকী বৃক্ষলতাশূন্য উচ্চভূমি বেলুচিস্থান ও পূর্ব্ব পারস্যের মরুভূমিতে গিয়া মিশিয়াছে। এই দেশে বরফ গলিয়া নদীতে জল হয় এবং সেচের দ্বারাই অধিকাংশ কৃষিকার্য্য সমাধা করিতে হয়। নদীসমূহের মধ্যে কাবুল নদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং উহা এটোকের নিকট সিন্ধু নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

জলহাওয়ার বৈচিত্র্যও চরম। কাবুল হইতে এক দিনের রাস্তা অতিক্রম করিলেই এমন স্থান দৃষ্ট হয়, যেখানে বরফপাত আদৌ হয় না—আবার দু'ঘণ্টা ভ্রমণের পরে

খাইবার গিরিবর্ত্মের দৃশ্য

পঞ্চনদ ও পারস্যের মধ্যে দেশটী অবস্থিত। ইহার উত্তরে তুর্কীস্থান, দক্ষিণে বেলুচিস্থান। উন্নতশির বিপুল-বিস্তার স্থলেমান গিরিশ্রেণী ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। যাতায়াতের জন্য যে সকল প্রাকৃতিক গিরিবর্ত্ম আছে, তাহা পথিককে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে।

আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ৫৬০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত এবং দাক্ষিণাত্যের দ্বিগুণ হইবে। দেশের কতকাংশ বেশ সুজলা, উপত্যকা-সমন্বিত

এমন জায়গায় পৌছান যায়, সেখানে বরফ কোনদিনই গলে না। গজনী-নিবাসীদের দুই তিন মাস কাল বরফ-পাতের জন্য রুদ্ধ-দ্বারে গৃহ-বাসী হইয়া থাকিতে হয়। কান্দাহারে কদাচিৎ বরফপাত হয়, গ্রীষ্মকালে দারুণ গরম, তপ্ত হাওয়া এবং ঘন ঘন বালি-বৃষ্টি প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। গমই দেশের প্রধান খাদ্য। পুষ্টিকর ফলের তো অভাবই নাই। ধান্য, তামাক প্রভৃতিও যথেষ্ট জন্মে। প্রচুর পরিমাণে ফল ভারতে চালান হইয়া থাকে। উট, গাধা, অশ্বতর, অশ্ব, মেষ প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত

আছে। আফগানিস্থানের অশ্ব প্রসিদ্ধ ও বহুল পরিমাণে ভারতে চালান হইয়া থাকে। গরু প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। মেষ-মাংস এখানকার প্রিয় খাদ্য। উল এবং লোমজ বস্ত্রও যথেষ্ট রপ্তানী হয়।

মোটামুটি আফগানিস্থানবাসীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—আফগান ও অনাফগান। প্রথমোক্তের মধ্যে প্রায় বারটি বংশ দৃষ্ট হয়, তাহাও বহুধা-বিভক্ত। খিলিজী বংশই সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল, প্রায় দশ লক্ষের কাছাকাছি। কাবুলের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে উহার বাস। ইহাদের পরেই আফগানিস্থানের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাধিবাসী ইরাণী বংশ। আফ্রিদিদের আড্ডা সাধারণতঃ

দোস্ত মহম্মদ-খাঁ

পেশোয়ারের পশ্চিমাঞ্চলে। অনাফগানদের মধ্যে তাজকরাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। উজবেক, কাফীর প্রভৃতি জাতিগুলি সাধারণতঃ প্রতিপত্তিহীন রায়ত-শ্রেণীভুক্ত। আফগানিস্থানের আদিম অধিবাসীদের বংশধর বলিয়া ইহারা গণ্য হয়। কৃষি-শিল্পই ইহাদের প্রধান পেশা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আহ্মদ শাহের রাজত্বকালে আফগানদিগের প্রভাব-বৃদ্ধি হয়। ইরাণী আফগানেরা নিজেদের বেন্-ই-ইজরাইলের বংশধর বলিয়া দাবী করিলেও, অন্যান্য পোস্ত-ভাষাভাষী জাতির সঙ্গে সাধারণ-ভাবে পাঠান বলিয়াই পরিচিত। বিভিন্ন পাঠান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মাত্র ভাষা প্রচলিত এবং সকলেই পুরুতুনালী অলিখিত আইন কানুন ও আচরণ মানিয়া চলে। আশ্চর্য্য এই, যে ইহার সঙ্গে পুরাতন হিব্রু ও রাজপুত রীতিনীতির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। সমগ্র আফগান জাতিকে আবার মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—এক গৃহবাসী অর্থাৎ যাহারা ঘর পাতিয়া বসতি করে ও দ্বিতীয় তাঁবুবাসী অর্থাৎ যাহারা তাঁবু স্কন্ধে ঘুরিয়া বেড়ায়।

আফগানিস্থানের রাজভাষা হইতেছে পারসী। হেলমানদের পশ্চিমাধিবাসীরাও পারস্য ভাষাই ব্যবহার করে। উত্তরাঞ্চলে তুর্কী ও পোস্ত ভাষা ব্যবহৃত হয়। পোস্ত এবং পারসী ভাষায় কাব্য-সাহিত্য-কৃষি-শিক্ষা-ধর্ম্ম-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। রেল-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন, কাবুলে বে-তার ষ্টেশন প্রভৃতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষায়তন, সামরিক কলেজ প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা আছে। এই জন্য সম্প্রতি আফগানিস্থানের বহু ছাত্র ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষালাভার্থ প্রেরিত হইয়াছে এবং বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য গৃহীত হইতেছে। সমরোপকরণ-ব্যবহারের কোন বাধা না থাকায়, আফগানিস্থানে প্রায় এক পঞ্চমাংশকেই সৈন্য বলা যাইতে পারে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইতালী, রুশীয়া, পারস্য, তুর্কীর রাজপ্রতিনিধি এখানে আছেন। কাবুলের একলক্ষ লোকের মধ্যেই শাসনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। পারসী-প্রভাবান্বিত হীরাটের সওয়া লক্ষ প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ লাগিয়াই আছে। অধিকন্তু পার্ব্বত্যজাতিসমূহ নেহাৎ চাপে না পড়িলে প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান। আফগানিস্থানের সর্ব্বমোট জনসংখ্যা ৮০ লক্ষের কাছাকাছি এবং আয়তন প্রায় ২৪৫,০০০ হইতে ২৭০,০০০, বর্গমাইল অর্থাৎ ভারতের প্রায় এক চতুর্দ্দশাংশ।

আফগানিস্থানবাসীদের চেহারার বিভিন্নতাও যেমনি, মনোবৃত্তির বৈচিত্র্যও তেমনি। প্রকৃতির বিপুল সমারোহ ইহাদের সুঠাম সৌন্দর্য্য ও বলিষ্ঠ দেহ দান করিয়াছে; কিন্তু চিত্তভূমি নীরস মরুর ধর্ম্মই পাইয়াছে। তাই চারুকলা-সৃষ্টি এ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নাই। আইন-কানুনের বাঁধন বা বিশেষ কোনপ্রকারের নিয়মানুবর্ত্তিতা এদের ধাতে

অসহ্য। সর্ব্বোপরি আফগানদের দেহ-প্রাণে আছে অবাধ প্রকৃতির মুক্ত-ছাপ, যাহা তাহাদের একান্ত স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। আফগান রাষ্ট্র-সমস্যা তাই চিরদিন বিঘ্ন-সঙ্কুল।

— রাষ্ট্র-চিত্র —

প্রাগৈতিহাসিক যুগ—

পৌরাণিক ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যাহা একদা হিন্দু-রাজ্য ছিল, তাহা আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ভাষায় লিখিত না থাকিলেও, ভারতের পুরাণ-উপকথা-ছড়া-ছন্দ মৌন-নীরবে সে চিহ্ন সগৌরবে বহন করিতেছে। হিন্দুরই গান্ধার রাজ্য আফগানিস্থান, হস্তিনাপুরের পুণ্যস্মৃতি সতী গান্ধারী দেবী এই গান্ধার দেশেরই এক ভূপালের কন্যা—সে অতীত হিন্দুসভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন আজও আফগান জাতি বিস্মৃত হইলেও, তাহাদের জীবন-প্রণালীর সঙ্গে বিজড়িত। হিন্দু শাহি বংশ কাবুলে সপ্তম শতাব্দী পরেও, স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তারপর বৌদ্ধ প্লাবনের বিজয়কীর্ত্তির অমর নিদর্শন আফগানিস্থানের মৃণ্ময় গর্ভে আজও প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধেয় উপাদান হইয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাস—

৫০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে আফগানিস্থান পারস্যের একামেনিয়ান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ৩২০ খৃষ্ট পূর্ব্ব আলেকসান্দার আফগানিস্থানের মধ্য দিয়াই তাঁহার ঐতিহাসিক ভারতাভিযান পরিচালন-সময়ে হীরাট ও কান্দাহারের বুকের উপর তাঁর বিজয়-ছাপ অঙ্কিত করিয়া যান। আলেকসান্দারের জেনেরাল সেলুকস নিকটস্থ পঞ্চনদ ও আফগানিস্থান জয় করিয়া সেলুকিড বংশের প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু পরে ভারতের গ্রীক রাজ্য ও কাবুল উপত্যকা মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুইশত বৎসরের মধ্যে আফগানিস্থানের রাষ্ট্র-মঞ্চে গ্রীক, পার্থিয়ান, সিদিয়ান, মধ্য এশিয়ার ইউ-চ জাতির অভিযান-উত্থান-পতন ও সংঘর্ষের লীলাভিনয় আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সবখানি সবিস্তার সুবিদিত নয়। এই বিপ্লব-বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্ত্ত ভেদ করিয়া ইউ-চি জাতি-প্রতিষ্ঠিত কুশান রাজবংশ দীর্ঘদিন নিরাপদে আফগানিস্থানের রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। কুশান রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং উত্তর ভারতের বেনারস ও দক্ষিণে মালয় পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। হুয়ান সাং, এল-বারুণি প্রভৃতি পরিব্রাজকের ইতিবৃত্ত ও বৌদ্ধ সাহিত্য কুশান রাজবংশের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের শেষ

আমীর হবিউল্লা খাঁ

বংশধরগণ তুর্কী-শাহ নামে কাবুল উপত্যকায় রাজ্য করিতেছিলেন বলিয়া হুয়ান সাং কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। নবম শতাব্দীতে হিন্দুশাহি নামে অভিহিত এক হিন্দু রাজবংশ তুর্কী শাহদিগকে পরাজিত করিয়া কাবুলে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন।

মধ্যযুগ—

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী আফগান ইতিহাসের এক যুগান্তর কাল। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ যুগের শেষ শ্মশান-স্মৃতি

ধীরে ধীরে ধূলায় লুটাইল, আরবের মরুবুক বিদীর্ণ করিয়া যে নবীন মোসলেম ধর্ম্ম নূতন আদর্শ ও অভিনব প্রাণ-চঞ্চলতা লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইল, তাহার দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের নিকট আফগানিস্থান মস্তক অবনত করিল। সকল অতীতকে গ্রাস করিয়া বিজয়ী মোছলেম ধর্ম্মবীরগণ আফগানিস্থানবাসীকে এই নবধর্ম্মে দীক্ষা দিল। সে নির্ম্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী রক্তরঞ্জিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজও বিস্মৃতির অতল তল হইতে বেদনার শিহরণ তোলে।

ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লা

সপ্তম শতাব্দীতেই পশ্চিম আফগানিস্থান আরবের খালিফাদের রাজ্যভুক্ত হয় এবং এই সময় হইতেই মোছলেম প্রভাব আফগানিস্থানের উপর ক্রম-বিস্তার লাভ করে। কিন্তু দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাবুল হিন্দুশাহিদের দ্বারাই শাসিত হইয়াছিল। খলিফা-রাজ্যের পতনের সঙ্গে খালিফা-রাজের অধীন যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিল তাহারা খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিল।

মামুদের অভ্যুত্থানের সময়ে অবজ্ঞাত গজনী লোক-চক্ষুর অন্তরাল হইতে সুচঞ্চল হইয়া উঠে। এই গজনীর মামুদ নির্ম্মম লুণ্ঠন-লীলার জন্য ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পরিচিত। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধারা ক্রমক্ষয়িষ্ণু রাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকে।

১১৫২ খৃষ্টাব্দে গজনীর ধ্বংসস্তূপের উপর মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক শক্তিশালী ঘোর-রাজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায়। ভারতের মুসলমান-সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন ইনিই। মহম্মদ ঘোরীর অবসানের পর ঘোর-রাজ্যের প্রভাব বিলুপ্ত হয় ও তাহার বিশাল সাম্রাজ্য শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং স্বল্পকালের জন্য হইলেও আর একবার সারা আফগানিস্থান গিবা শাহীবংশের করতলগত হয়।

১৩শ খৃষ্টাব্দে জেঙ্গিস খাঁ কর্ত্তৃক মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে তৈমুরলঙ্গের অভ্যুত্থানকাল পর্য্যন্ত আফগানিস্থানের অধিকাংশই মোগলের অধীন থাকে। অতঃপর তৈমুরের বংশধর মোগল-সূর্য্য বাবর ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে কাবুল অধিকার করিয়া তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপিয়া মোগল-শাসন আফগানিস্থানে আধিপত্য বিস্তার করে। এই সময়ে কাবুল মোগল-ভারতের প্রদেশরূপে পরিগণিত হয়।

১৭৩৭ ৩৮ খৃঃ পারস্যসম্রাট্ নাদীরশাহ কর্ত্তৃক কাবুল ও কান্দাহার বিজিত হয় এবং ১৭৪৭ খৃঃ তিনি নিহত হইবার পর আফগানিস্থানে পারস্য-শাসনেরও অবসান ঘটে।

আধুনিক আফগান

১৭৪৭ খৃঃ নাদীর শাহকে হত্যা করিয়া আহ্মদ খাঁর সিংহাসনারোহণের পর হইতে আফগানিস্থানে নব যুগের সূচনা হয়। আফগানদের শতধাবিচ্ছিন্ন দেশ এতদিন পর্য্যন্ত বিদেশী কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল, আফগানিস্থানের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম আহ্মদ খাঁর রাজচ্ছত্রতলে কাবুল-কান্দাহার-হীরাট সহ সমগ্র আফগানিস্থানে খাঁটি স্বাধীন আফগান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আহ্মদ খাঁ, আবদালীজাতীয় সেদোজাই বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি 'দুর-ই-দুরাণী অর্থাৎ 'যুগ-রত্ন' খেতাব গ্রহণ করায় তাঁর পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীরা দুরাণী নামে পরিচিত হন। আহ্মদ শাহ আবদালীর ঘটনাবহুল

রাজত্বকালে আফগান-প্রভুত্ব পারস্য, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল-শক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় ও মহারাষ্ট্রের অভ্যুত্থানে শঙ্কিত হইয়া রোহিলাখণ্ডের আফগানেরা ১৭৬১ খৃঃ আহ্মদ শাহকে দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। ফলে, পাণিপথের শেষ যুদ্ধে উদীয়মান মহারাষ্ট্রের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হয় ও আহ্মদ শাহের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্বে দিল্লী হইতে উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ১৭৭৩ খৃঃ আহ্মদ শাহ আবদালীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র সা তৈমুর রাজ্যাধিরোহণ করেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ এই সুবিশাল রাজ্যে বিশৃঙ্খল আরম্ভ হয়। সা তৈমুরের মৃত্যুর পরে তাঁহার পাঁচ পুত্র—হুমায়ুন, জেমান, সুজা, মামুদ ও ফিরোজউদ্দিনের মধ্যে ভীষণ গৃহবিবাদ সুরু হওয়ায় আফগানিস্থানে বিষম রাষ্ট্র বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সময়ে ব্রিটিশের আবির্ভাবে রাষ্ট্রসমস্যা আরও জটিলতর হইয়া উঠে। ইউরোপ-ভারত-আফগানিস্থানের রাষ্ট্র-স্বার্থ পরস্পর জড়িত হইয়া এক চাঞ্চল্যকর সমস্যা সৃষ্টি করে। ইউরোপের বিশ্ব বিজয়কামী নেপোলিয়ান, দক্ষিণ ভারতের আফগান-বংশোদ্ভুত টিপু সুলতান ও আফগান সিংহাসনলিপ্সু-দিগের মধ্যে ষড়যন্ত্র; ফেঞ্চ, ব্রিটিশ, মারাঠ', রোহিলাদিগের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন তথা ভারতের একচ্ছত্র প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লইয়া সংঘর্ষ—সমস্ত রাজনৈতিক আবর্ত্ত ভেদ করিয়া ১৮০৩ খৃঃ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে বিজয়ী ইংরাজ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ইত্যবসরে সা সুজা কাবুল অধিকার করেন। এই সময়ে আমীর আমানুল্লার পূর্ব্বপুরুষ বারাকজাহী বংশের অভ্যুদয়ে আফগানের রাষ্ট্র-পট পুনরায় পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮১৫ খৃঃ অপ্রিয় সা সুজা অল্প দিনের মধ্যেই আফগান বারাকজাহীমন্ত্রী সরফরাজ খাঁর পুত্র ফতে খাঁ ও সিংহাসনচ্যুত মামুদ সার চক্রান্তে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন এবং ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইয়া ভারতে অবস্থান করেন। দ্বিতীয়বার সাহ মামুদ আফগান গদী দখল করেন এবং ১৮১৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; কিন্তু অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত হইল না। ফতে খাঁর প্রবলপ্রভাব-মুক্ত হইতে গিয়া শাহ মামুদ নির্ম্মম ভাবে ফতে খাঁকে অন্ধ ও নিহত করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় মহম্মদ আজিম ও দোস্ত বারাকজাহীদিগের সাহায্যে বিদ্রোহ করার ফলে ১৮১৮ খৃঃ শাহ মামুদ রাজ্য হইতে বিতাড়িত ও মহম্মদ আজিম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। আফগানিস্থানের ভীষণ অরাজকতার মধ্যে ১৮২৩ খৃঃ মহম্মদ আজিমের মৃত্যু হইলে, প্রভুত্ব লালসায় বারাকজাহী ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে যে রক্ত-নদীর ঢেউ খেলিয়া যায়, তাহা সাঁতরাইয়া ১৮২৬ খৃঃ দোস্ত মহম্মদ কাবুল, গজনী ও জেলালাবাদ অধিকার করেন। কিন্তু অন্তরদ্রোহ ও বহির্ঘটনা আবার চতুর্দ্দিকে বিপ্লব-বহ্নি জ্বালাইয়া তুলিল। রুশ-ব্রিটিশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ লইয়া আফগানিস্থান
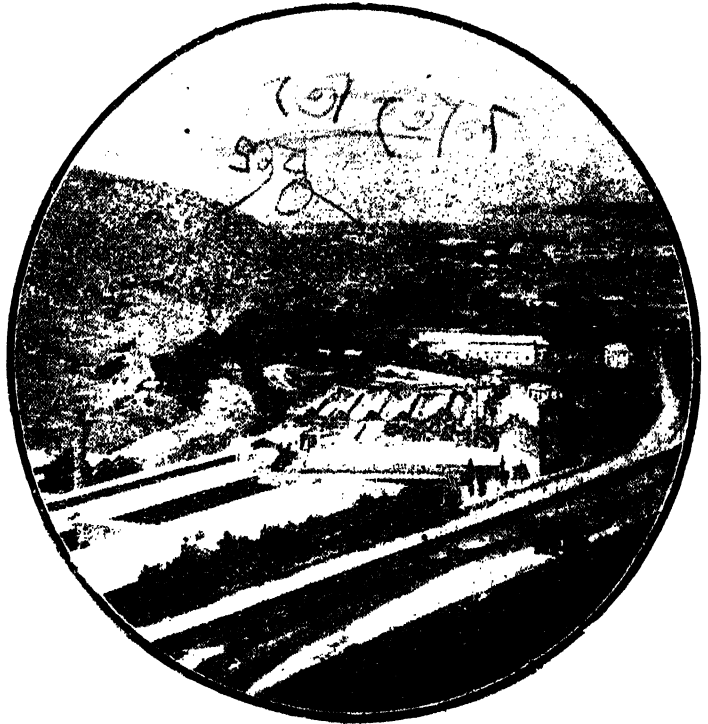
কাবুলের রাজ-ভবনের দৃশ্য

ইংরাজাভিযান (১৮৩৯ খৃঃ), সা সুজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দোস্ত মহম্মদের কলিকাতায় ব্রিটিশ আতিথ্য, আফগান-বিদ্রোহ, ব্রিটিশ সৈন্য ও সেনাপতির বন্দীকরণ-নৃশংস-হত্যা-

৺রাজা নাদীর খাঁ

লাঞ্ছনা-পরাজয়-পলায়ন, স্বাধীন আফগান কর্তৃক ব্রিটিশ-প্রভাব অস্বীকার ও সা সুজাকে হত্যা (১৮৪২, এপ্রিল), ব্রিটিশের প্রতিহিংসা ও দ্বিতীয় অভিযান, দোস্ত মহম্মদের পুনরাবর্ত্তন ও সিংহাসনে অধিরোহণ এবং নূতন খেতাব ('আমীর' বা আফগান-প্রধান) গ্রহণ—ইতিহাসবিদিত। সা সুজার মৃত্যুতে দুরাণী রাজবংশের অবসান হয়।

ইহার পরের ইতিহাস সুবিদিত। ঘরের এবং বাহিরের ঘন ঘন বিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ের দরুণ আফগানিস্থানের বিশাল রাজ্য মাত্র কাবুল, গজনী ও কান্দাহারে (যাহা প্রায় বর্ত্তমান স্বাধীন আফগান রাষ্ট্রের সীমানা) পর্য্যবসিত হয়। মহম্মদ দোস্তের দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সুশাসনে আফগান রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৩ খৃঃ হীরাট দখল করার পর দোস্ত মারা যান এবং রাজ্যে পুনরায় সিংহাসনের দাবী লইয়া বিপ্লব-বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। অবশেষে শের আলি পাঁচ বৎসর লড়াইয়ের পর আমীর হন। রুশের প্ররোচনায় ইংরাজ-দূত কাবুল হইতে দূরীভূত হওয়ায় যে ইঙ্গ-আফগান সংগ্রাম হয়, তাহার ফলে শের আলির পতন ও দোস্তের পৌত্র আবদার রহমান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আবদার রহমান শৃঙ্খলার সহিত দীর্ঘদিন রাজ্যশাসন করিয়া ১৯০১ খৃঃ মারা যান ও তৎপুত্র হবিউল্লা সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ইহার রাজত্বকালে ইঙ্গ-আফগান সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয়, এমন কি গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইসলামের ডাক উপেক্ষা করিয়াও ইনি ব্রিটিশের মিতালি রক্ষা করেন।

১৯১৯ সালে হবিউল্লা আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে, তাঁহার ভাই নসরুল্লা ছয় দিনের জন্য তক্তে বসেন। পিতৃব্য-হস্ত হইতে আমানুল্লা সিংহাসন ছিনাইয়া লন এবং ১৯২৮-২৯শে তিনি তাঁহার প্রতীচ্য মনোবৃত্তি বশে দ্রুত সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। অতঃপর আমানুল্লার ভাই ইনায়েতউল্লা তিন দিনের জন্য আমীর হন ও বাচ্চা-ই-সাকো কয়েক মাস সাময়িক শাসনের পর বিতাড়িত হইলে, জেনেরাল নাদীর খাঁর সুশাসনে আফগানিস্থান পুনরায় ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। বর্ত্তমান বৎসরে ৮ নভেম্বর তারিখে, তিনিও অপ্রত্যাশিত

তরুণ রাজা জাহির শাহ

ভাবে গুপ্তঘাতকের গুলিতে নিহত হইলে তাঁহার একমাত্র বিংশ বর্ষীয় পুত্র জাহির শাহ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আফগান-জাতির বৈশিষ্ট্য—

আফগানেতিহাসের মর্ম্মপরিচয় মিলে উহার স্বাধীনতা-বৈশিষ্ট্যে। পররাষ্ট্রাধীন থাকিয়াও, এ জাতি কোনদিন স্বাধীনতাহারা হয় নাই। রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া শাসন-যন্ত্রের যত উৎপীড়ন চলিয়াছে; কিন্তু চিরদিনই বিভিন্ন পার্ব্বত্য জাতি ও বংশগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দেশের দুর্গম অবস্থার জন্য এই স্বাধীনতা বজায় রাখা ও বিজয়ী সভ্যতার প্রভাবমুক্ত থাকা সম্ভব হইয়াছে। আফগানজাতি বিজাতীয় প্রভুত্ব বা আরোপে স্বাভাবিক সংশয়ী। ইংরাজ-প্রভাবান্বিত সা সুজাকে হত্যা ও আমানুল্লা কর্ত্তৃক ব্রিটিশ প্রদত্ত বার্ষিক-বৃত্তি-পরিহারের কারণও তাহাই। শেসোক্ত ঘটনা আফগানিস্থানের "স্বাধীনতা দিবস" বলিয়া জাতির স্মৃতিতে আজও সম্পূজিত। এই 'স্বাধীনতা দিবসের" প্রথম উদ্বোধন-সভায় আমানুল্লার বিশ্বমানবজাতির মুক্তিকামনা ও আফগান স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ-গ্রহণ আফগান জাতীয় বৈশিষ্ট্যেরই পরম প্রকাশ। জনপ্রিয় আমানুল্লার প্রতীচ্যানুকরণও জাতীয় চিত্তক্ষেত্রে তেমনি প্রতিক্রিয়াই জাগাইয়াছিল।

এই নিছক স্থূল স্বাধীনতাপ্রিয়তার উদ্দাম অভিব্যক্তি দেশের বুকে উষ্ণ রুধির শীতল হইতে দেয় নাই। জাতীয় মন রাষ্ট্রানুগত্য স্বীকার করিতে পারে নাই বলিয়া সুদীর্ঘ কাল স্বাধীন আফগানেতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তাক্ত, ঘন ঘন রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়, নৈরাশ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ। সেই হেতুই স্বাধীন জাতির সুস্থ মনের যে বৃহত্তর অবদান—অখণ্ড মানবতার কল্যাণ—তাহা আফগানিস্থানের এমন রুদ্র শান্ত প্রকৃতির কোলে লীলায়িত হইয়া উঠে নাই। জাতিগত মূল চেতনা একান্ত মাটির বুক আঁকড়াইয়া আছে বলিয়াই ভোগ-তৃপ্তির চরম আদর্শ সিংহাসনকে কেন্দ্র করিয়া এত বীভৎস তাণ্ডবলীলা পিতা-পুত্রে, ভাই-ভাইয়ে, স্বগোষ্ঠী-স্বজনে এমন নির্ম্মম-নিষ্ঠুরতা, হীন নৃশংসতা। প্রগতিশীল বিংশ শতাব্দীর মাত্র ৩২টি বৎসরের মধ্যেই আফগান-সিংহাসনে আট জনকে নৃপতি হইতে দৃষ্ট হয়। শুভ্র বস্ত্রে কালিমা চিহ্নের মতই এই স্বাধীন মুছলিম্ জাতির জগৎ-জোড়া কলঙ্ক এখনও মুছিয়া যায় নাই।

সমর-সচিব শাহ মামুদ

তাই গুপ্তঘাতকের হস্তে নাদীর খাঁর যে অপমৃত্যু আদৌ তাহা অপ্রত্যাশিত নহে। 'গুলবাগের স্বপ্ন মাধুরী-ঘেরা' আফগান-সিংহাসন চির বিপৎসঙ্কুল। বর্ত্তমান আমীর মহম্মদ জাহির শাহের বিনা রক্তপাতে সিংহাসনাধিরোহণ সাময়িক ভাবে নিরাপদ কি না কে জানে?

উপনিষৎসমূহের প্রতিপাদ্য

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি-এ

উপনিষৎসমূহ কি প্রতিপাদন করে ?

ইহার উত্তরে বলিতে হয়, উহারা মোক্ষ বা পরম পুরুষার্থ প্রতিপাদন করে, অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ কি এবং তাহা কিরূপে লাভ করা যায় তাহা বলিয়া দেয়।

পরম পুরুষার্থ কি ?

চার্ব্বাক দর্শন বলে, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগই পরম-পুরুষার্থ ; মরার পর কি হইবে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, কারণ মৃত্যুই জীবাত্মার অবসান।

পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন বলেন, বেদের কর্ম্মকাণ্ডানুসারে যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম করিয়া মরিয়া স্বর্গ, ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগ, পুনরায় রাজা বা সম্পন্ন গৃহস্থ হইয়া জন্মান এবং মরিয়া কর্ম্মানুসারে পুনরপি স্বর্গাদিভোগ, ইহাই পরম পুরুষার্থ।

অন্যান্য সকল দর্শনই পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুকেই হেয় বলেন এবং উহাদিগকে পরিহার করাই যে দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, একথা বলেন। সাংখ্যদর্শন বলেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন বলেন, শুষ্ক কাষ্ঠ বা প্রস্তরের ন্যায় সুখ-দুঃখ-বোধ-রহিত হওয়ার নাম পরম পুরুষার্থ। শাঙ্কর দর্শনের মতে নির্গুণতা-প্রাপ্তিই পরমপুরুষার্থ, ইহাও ন্যায় ও বৈশেষিক মতেরই প্রায় অনুরূপ।

উপনিষৎ শাস্ত্রে বলেন, ইহার কিছুই পরম পুরুষার্থ নাই ; সসাগরা সদ্বীপা সমস্ত পৃথিবীর সাধু এবং সুশিক্ষিত যুবা অধীশ্বর সুস্থ সবল শরীরে বিত্তপূর্ণা বসুন্ধরা ভোগ করিয়া যে আনন্দপ্রাপ্ত হয়েন, তাহার লক্ষকোটিগুণ আনন্দপ্রাপ্তি এবং পুনর্জ্জন্ম রহিত অবস্থায় সেই পরমানন্দে অনন্তকাল স্থিতিই পরম পুরুষার্থ। (তৈ ২।৮, ছা ৮।১৫)

এই পরম পুরুষার্থ কিরূপে লাভ করা যায় ?

এ বিষয়ে চার্ব্বাক মত ও কাম্য-কর্ম্মমার্গ যে উপনিষৎ-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

অন্যান্য সকল দর্শনই বলেন, জ্ঞানেই মোক্ষ বা পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, উহার জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। তন্মধ্যে সাংখ্য দর্শন বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানে ; ন্যায় দর্শন বলেন, "প্রমাণ", "প্রমেয়" প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে এবং বৈশেষিক দর্শন বলেন, "দ্রব্য" "গুণ", "কর্ম্ম", "সামান্য", "বিশেষ" ও "সমবায়", এই ৬ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞানে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়। শাঙ্কর দর্শন বলেন, "আমিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ব্রহ্ম, আমি দেহ নহি" এইরূপ জ্ঞানে মোক্ষ হয়।

উপনিষৎ শাস্ত্র বলেন, এই সব মোক্ষ লাভের উপায় নহে ; যাঁহারা উপনিষৎ-প্রোক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া (ধীরাঃ) সমস্ত-জীবন-ব্যাপী নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা পরম "পুরুষ"-কে তুষ্ট করিতে পারেন, তাঁহারাই শোকজনক জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া পরমপুরুষকে লাভ করেন :—

উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা
তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তে ধীরাঃ ॥ মু ৩।২।১

এই পরম "পুরুষ" কে ?

ঋগ্বেদ বলেন, বিশাল মস্তকযুক্ত (সহস্রশীর্ষা) বিশাল-চক্ষুর্দ্বয়যুক্ত (সহস্রাক্ষঃ) এবং বিশালপদদ্বয়যুক্ত (সহস্রপাৎ) এই পুরুষ তপঃপদার্থ বা Nebula হইতে সৃষ্ট আদিম বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত করিতেছিলেন। (ঋ ১০।৯০।১)

"এই পুরুষমূর্ত্তির মস্তক ছিল মালদহ জেলা জুড়িয়া, দক্ষিণ হস্ত ছিল বর্ত্তমান কালের নর্ম্মদা নদীর পার দিয়া বিস্তৃত, বাম হস্ত বাঁকান অবস্থায় মুখের নিকট বংশী বা শূল ধারণ করিয়া অবস্থিত ছিল, বামপদ গোদাবরী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দক্ষিণপদ বাঁকান এবং বামপদের উপরে অবস্থিত ছিল।"

গোড়ায় এই মূর্ত্তিতে পরব্রহ্ম প্রবেশ করিয়াছেন (তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ—তৈ ২।৬) তাই ইহার নাম বিশ্ব, এই মূর্ত্তি সমস্ত আদিম বিশ্ব ব্যাপিয়া ছিল, তাই পরমব্রহ্মের

নাম বিষ্ণু। তাঁহার এই মূর্ত্তি দর্শন-যোগ্য—জ্ঞানিগণ "বিষ্ণুর" এই পরম পদ অর্থাৎ রূপ সর্ব্বদাই দর্শন করেন (ঋ ১।২২।২০); তাই তিনি "প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম" (তৈ ১।১)। এই বিগ্রহ কাল-কুচকুচে ব্রহ্মশিলা বা গ্রাণাইটপ্রস্তর-নির্ম্মিত ; তাই পরমদেবতার নাম "শ্যাম" (ছা ৮।১৩।১)। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও গীতা বলেন, এই শ্যাম (সুন্দর)কে যে যে ভাবে চাহে সে সেই ভাবেই প্রাপ্ত হয় (ছা ৮।১৩।১, গী ৪।১১)।

আদিম বিশ্ব তাঁহার রূপ, তাই শ্যাম-সুন্দর "বিশ্বরূপ", ইনিই বেদ-সমূহের প্রতিপাদ্য পরম দেবতা—ছন্দসাং ঋষভো বিশ্বরূপঃ (তৈ ১।৪)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরমদেবতাকে পুনঃ পুনঃ বিশ্বরূপ বলা হইয়াছে।

আমাদের প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষগণ এই বিশ্বরূপের বক্ষে বাস করিতেন, তাই ইনি "বাসু"; তাঁহারা ইঁহাকে পূজা করিতেন, তাই ইনি "দেব" ; এই দুই নাম মিলাইয়া হইল "বাসুদেব" (বিষ্ণু পুরাণ ১।২।১২)।

উপনিষৎপ্রোক্ত জ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা কি ?

ভোক্তা—ভোগ্য এবং প্রেরয়িতাকে জানিয়া—অর্থাৎ প্রেরয়িতার প্রেরণা অনুসারে ভোগ্য বা রস-স্বরূপকে সেবা দ্বারা ভোগ করিয়া মুক্তি লাভ করেন ; জীব-হৃদয়ে অবস্থিত এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম বা ত্রিবিধ আত্মার নাম "সর্ব্বং" —ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা (মুচ্যতে), "সর্ব্বং" প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ। (:শ্বে ১।১২।)

ভোক্তা ব্রহ্ম কে ?

ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাই ভোক্তা ব্রহ্ম —আত্মা ইন্দ্রিয়-মনোযুক্তঃ ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ। (কঠ ৩।৪)।

ভোগ্য কে ?

বিশ্বরূপ শ্যামসুন্দরই জীবাত্মার ভোগ্য, বিষয়-সমূহ তাহার ভোগ্য নহে—(রসো বৈ সঃ), আমরা দেখিতেও পাই, তাঁহাকে সেবাদ্বারা ভোগ করিয়া সাধকগণ নিয়ত আনন্দ লাভ করিতেছেন—(রসংহ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী-ভবতি)। (তৈ ২।৭)।

এই শ্রুতিতে "বৈ" শব্দ দ্বারা যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, ঈশোনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে সেই কথার বিস্তার করা হইয়াছে :—

এই জগতে যাহা কিছু অস্থায়ী বস্তু আছে ইহারা তোমার ভোগ্য নহে, ইহারা ঈশ্বরের ভোগের উপকরণ, তুমি ইহাদিগকে তাঁহাতে নিবেদন করিবার অধিকারী ; তোমার ভোগ্য ঈশ্বর অর্থাৎ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্যাম-সুন্দর স্বয়ং। তুমি ইহ-জীবনে বিষয়ভোগের বাসনা ত্যাগ কর এবং অপর মানুষের প্রার্থিত বস্তু (ধনং) অর্থাৎ পরলোকে ইন্দ্রত্ব প্রভৃতিতেও লোভ করিও না। তুমি ইহলোক এবং পরলোকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-ভোগ সম্বন্ধে নিষ্কাম হইয়া সেবা দ্বারা কৃষ্ণকে ভোগ করিতে থাক।

নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর—ইহাই তোমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম এবং সকামকর্ম্ম জনিত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়। (ঈশ ১।২)।

গীতা বলেন, এইরূপ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় ভোগ সম্বন্ধে নিস্পৃহ (গতসঙ্গস্য মুক্তস্য) সাধক যদি উপনিষৎ-প্রোক্ত ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতৃ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়াও কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে (যজ্ঞায়) কর্ম্ম করিতে থাকে, তবে তাহার সমস্ত কর্ম্ম গোড়া হইতে (সমগ্রং) বিলুপ্ত হয়। (গীতা ৪।২৩)।

সেবা দ্বারা যে ভোগ হয় তাহা সকলেই জানেন—মাতা শিশু পুত্রকে ভোগ করেন সেবার ভিতর দিয়া, সুবোধ পুত্র বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ভোগ করেন সেবার ভিতর দিয়া।

প্রেরয়িতা ব্রহ্ম কে ?

কেনোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রেরয়িতা ব্রহ্ম বা হৃষীকেশের কথা আছে। ইনি চক্ষুকে দৃষ্টিশক্তি দেন, নাসিকাকে ঘ্রাণশক্তি দেন, জিহ্বাকে আস্বাদন ও বাক্‌শক্তি দেন, মনকে মনন শক্তি দেন, জীবাত্মা (প্রাণঃ)-কে স্ববিষয়ে প্রেরণ করেন। ইনি অজ্ঞেয় বা অব্যক্ত ব্রহ্ম—কারণ চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি দ্বারা ইঁহাকে ধরা যায় না। ইনি উপাস্য ব্যক্ত ব্রহ্ম বা শ্যামসুন্দর হইতে পৃথক্ (নেদং যদিদমুপাসতে) (কেন ১।১—৮)।

উপাস্য ব্রহ্মের কথা কেনোপনিষৎ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে আছে। ঐ দুই খণ্ডে তাঁহাকে দেবাসুর-সংগ্রামজয়ী "যক্ষং" (পূজনীয় স্বরূপ) এবং তদ্বনং (সম্ভজনীয়) বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে উপাসনা করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে (তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং)। (কেন ৪।৬)।

উপাস্য ব্যক্ত ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ হইতে পৃথক্ অব্যক্ত ব্রহ্মের সম্বন্ধে যিনি বলেন, 'এই ব্রহ্মকে আমি জানি' তিনি ইঁহাকে জানেন না—যিনি বলেন, 'ইঁহাকে জানি না' তিনিই বরং ইঁহাকে জানেন। ইঁহাকে একেবারে জানা যায় না, একথাও ঠিক নহে; আবার ইঁহাকে বেশ জানা যায়, একথাও ঠিক নহে। (কেন ২।১—৩)।

এই অব্যক্ত ব্রহ্ম বা হৃষীকেশ কে যিনি ইহলোকে জানিয়াছেন, তাঁহার জন্ম সফল; যিনি ইহলোকে তাঁহাকে জানেন নাই, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম, জরা, মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। ইনি প্রত্যেক ভূতেই বর্ত্তমান, জ্ঞানিগণ বিশেষরূপ চিন্তা দ্বারা ইঁহাকে জানিয়া [ইঁহার প্রেরণা-মতে কার্য্য করিয়া] মরণান্তর অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (কেন ২।৫)।

এই হৃষীকেশ-তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ গুরুর নিকট হইতে জানিতে হয়। এই তত্ত্বকে যিনি উপেক্ষা করিয়া বেদান্ত-মার্গে অগ্রসর হইতে চাহেন, পথিমধ্যে লুক্কায়িত ক্ষুরের ধারার ন্যায় তত্ত্বের জ্ঞানের অভাব তাঁহার পা কাটিয়া ফেলে, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন না। (কঠ ৩।১৪)।

ইহা অদ্বৈতবাদের নিন্দা। বেদান্তে তত্ত্ব একটি নহে, সাতটি :—

১। ইন্দ্রিয়সমূহ, ২। ইন্দ্রিয়গণের উপরে তাহাদের বিষয়সমূহ, ৩। উহাদের উপরে মন, ৪। মনের উপরে বুদ্ধি, ৫। বুদ্ধির উপরে মহান্ জীবাত্মা বা জীব-ব্রহ্ম, ৬। মহান্ জীবাত্মার উপরে অব্যক্ত ব্রহ্ম বা হৃষীকেশ, ৭। অব্যক্ত ব্রহ্ম বা হৃষীকেশের উপরে পুরুষ বা উপাস্য ব্রহ্ম [ইঁহারই নাম শ্যাম, ইনিই বিশ্বরূপ] ইনিই চরম তত্ত্ব, ইঁহার উপরে আর তত্ত্ব নাই, ইনিই জীবাত্মার পরা গতি। (কঠ ৩।১০—১১)।

উপরোল্লিখিত ৬ষ্ঠতত্ত্ব অব্যক্তব্রহ্ম বা গূঢ় আত্মা—সকল জীবের মধ্যে (সর্ব্বেষু ভূতেষু) অন্তরাত্মা বা অন্তর্য্যামী রূপে প্রচ্ছন্ন আছেন, [অল্পবুদ্ধি লোকের নিকট] ইনি প্রকাশিত হন না, ইঁহাকে সূক্ষ্মদর্শীরা তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা ধরিতে পারেন। (কঠ ৩।১২)।

শুধু সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকিলেই চলিবে না; গুরু করণেরও যে প্রয়োজন আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (কঠ ৩।১৪)।

এই অব্যক্ত ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধবৎ অনাদি, অনন্ত। মহান্ জীবাত্মার উপরের [এবং ৭ম বা চরমতত্ত্ব পুরুষের নীচের] এই ৬ষ্ঠ তত্ত্বকে যে সাধক সাধনের সহায়রূপে জানিয়াছেন (নিচায্য) তিনিই মৃত্যু-মুখ হইতে বিমুক্ত হয়েন, অন্যে হইতে পারে না। (কঠ ৩।১৫)।

বেদান্তশাস্ত্র কি একই বস্তুকে কোথাও অরূপ, কোথাও বিশ্বরূপ, কোথাও অরস, কোথাও একমাত্র রসবস্তু অথবা কোথাও অজ্ঞেয়, কোথাও প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন?

উপরোক্ত সকল প্রহেলিকার সমাধান তৈত্তিরীয় উপ-নিষদের "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্রুতিতে আছে :—

'যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্ ফিরিয়া আইসে সেই ব্রহ্ম বা হৃষীকেশ হইতে ব্যক্ত ব্রহ্ম বা শ্যামসুন্দরের কিসে আনন্দ হয়, তাহা জানিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি জন্ম, জরা, মরণ প্রভৃতি হইতে ভয়-রহিত হয়েন।"

এইরূপ বিদ্বান্‌কে "আমি কেন সাধু কর্ম্ম করি নাই," "আমি কেন পাপ করিয়াছি", এইরূপ চিন্তা পশ্চাত্তাপ দেয় না। যে সাধক ব্যক্ত ব্রহ্ম বা কৃষ্ণের প্রীতিকর কর্ম্মই পুণ্য এবং তাঁহার অপ্রীতিকর কর্ম্মই পাপ, এইরূপ জানেন এবং সর্ব্বদাই অব্যক্ত ব্রহ্মের প্রেরণা অনুসারে কর্ম্ম করেন, তিনি কেবল পুণ্যই করেন, পাপ করিতে পারেন না। এইরূপে তিনি পরমাত্মা (আত্মানং) অর্থাৎ কৃষ্ণকে সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রীত করেন [সুতরাং তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, তিনি পরম পুরুষার্থ লাভ করেন]। ইহাই বেদান্ত বা উপনিষৎ শাস্ত্রের কথা, ইহাই বেদান্ত-প্রোক্ত ধর্ম্মের ভিত্তি (ইত্যুপনিষৎ)। (তৈ ২।৯)।

এই প্রেরয়িতা ব্রহ্ম যদি অব্যক্ত এবং অজ্ঞেয় হয়েন, তবে তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইবে?

কেনোপনিষৎ একটি প্রহেলিকা দ্বারাই এই প্রহেলিকার সমাধান করিয়াছেন :—"প্রতিবোধ-বিদিতং। মতম্" —প্রত্যেক বার জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণের আরম্ভ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিবার সঙ্কল্প মাত্রেই এই অব্যক্ত ব্রহ্মকে জানা যায়, আর উহাই প্রকৃত জানা ; কারণ এই অব্যক্ত ব্রহ্ম বা হৃষীকেশ তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেন, ঐ বিষয়-গ্রহণে বা কর্ম্ম-করণে কৃষ্ণের প্রীতি হইবে কিনা। [ইংরাজিতে ইহাকে Conscience (বিবেক) বলে। ইউরোপীয় সুধীগণ বলেন, Conscience is the voice of God in man]। এইরূপে অব্যক্ত ব্রহ্মকে জানিলেই অমৃতত্বলাভ হয়। যত্ন দ্বারা (আত্মনা) এই শক্তি বা বিদ্যালাভ করিতে হয় এবং এই বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। (কেন ২।৪)।

"জীবাত্মা", "অন্তরাত্মা" ও পরমাত্মার" মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ ?

জীবাত্মা অন্তরাত্মা হইতেও পৃথক্, পরমাত্মা হইতেও পৃথক্ ; কিন্তু অন্তরাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্ম বা হৃষীকেশ এবং ব্যক্ত ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ শ্যাম-সুন্দরের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ, এই উভয়ই শ্রুতিসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে।

জীবাত্মা এবং অন্তরাত্মা যে পৃথক্ এবং এই পার্থক্য না জানিলে যে সাধন চলে না, তাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাওয়া যায় :—

'সাধক নিজের আত্মাকে এবং অন্তরাত্মা বা হৃদিস্থিত হৃষীকেশকে (প্রেরিতারং) পৃথক্ জানিয়া তাঁহা দ্বারা উপকৃত হইয়া অর্থাৎ তাঁহার প্রেরণামতে, সারা জীবন, কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন।' (শ্বে ১।৬)।

আবার জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ শ্যামসুন্দর যে পৃথক্ তাহা কঠোপনিষদে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে :—

'ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন, এই জগতে ব্রহ্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান জীবের হৃদয়াকাশে অবস্থিত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ছায়া এবং রৌদ্রের ন্যায় পৃথক্, ইহারা জীব কর্তৃক অনুষ্ঠিত পুণ্য কর্ম্মের (সুকৃতস্য) প্রবাহ (ঋতং) দুই দিক্ হইতে পান করেন—অর্থাৎ ব্রতগ্রহণ করিয়া সাধক যদি সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সকল কর্ম্মই নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে করিতে থাকেন, তবে একদিকে কৃষ্ণ এবং অপর দিকে সাধক প্রতিনিয়ত প্রীত হইতে থাকেন ; সাগ্নিক গৃহিগণও এই কথা বলেন। [সুতরাং সাধকের এইরূপ ব্রত বা সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত, কারণ তাহাতে ইহজীবনেও সর্ব্বদাই আনন্দ লাভ এবং মরিয়াও কর্ম্ম ফল-দাতা শ্যাম-সুন্দরের কৃপায় পরম পুরুষার্থ বা অখণ্ড পরমানন্দ-প্রাপ্তি হয়]। (কঠ ৩।১)।

কঠোপনিষৎ বেদান্ত শাস্ত্রের সপ্ত পদার্থ বর্ণনে ব্যক্ত ব্রহ্ম পরম পুরুষকে স্পষ্টাক্ষরে অব্যক্ত ব্রহ্ম হৃষীকেশ হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহার উপরে স্থান দিয়াছেন (অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ)। (কঠ ৩।১১)।

কেনোপনিষদের কয়েকটি শ্লোকে 'নেদং যদিদমুপাসতে' এই কথা দ্বারা উপাস্য বা পূজনীয় ব্রহ্ম ও অব্যক্ত ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। (কেন ১।৪-৮)।

আবার কেনোপনিষদেই "চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবো যুনক্তি" এই শ্রুতিতে চক্ষুঃ ও কর্ণের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দাতা অব্যক্ত ব্রহ্মকে দেবঃ অর্থাৎ পূজনীয় বলা হইয়াছে। (কেন ১।১)।

গায়ত্রীতে সৃষ্টিকারী এবং মুক্তিদাতা পূজনীয় স্বরূপকেই (দেবস্য) শুভ-বুদ্ধি-দাতা বলা হইয়াছে। (ঋ ৩।৬২।১০)

"বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ স নোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—এই শ্রুতির কথাও তাহাই। (শ্বে ৪।১)।

পরমাত্মা ও অন্তরাত্মা অর্থাৎ পরমপুরুষ ও হৃষীকেশ বা বিশ্বরূপ ও অন্তর্য্যামীর মধ্যে এই ভেদাভেদ সুচিন্ত্য কি অচিন্ত্য, তাহা সুধীবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে জগৎস্রষ্টা পরব্রহ্ম এবং জীব-হৃদয়-স্থিত ভোগ্য বা উপাস্য-ব্রহ্ম, প্রেরয়িতা বা গুরু ব্রহ্ম এবং ভোক্তা বা সেবক-ব্রহ্মের সম্বন্ধের আলোচনা করা হইয়াছে :—

বেদবেদান্তে এই [জগৎকারণ] পরব্রহ্ম বা শ্যাম-সুন্দরের কথাই ব্যাখ্যাত (উদ্‌গীত) হইয়াছে, তাঁহাতেই জীবহৃদয়স্থিত ভোক্তা বা উপাসক ব্রহ্ম, ভোগ্য বা উপাস্য

ব্রহ্ম এবং প্রেরয়িতা বা গুরু-ব্রহ্ম এবং সৃষ্টির সংকল্পের পূর্ব্বের সন্মাত্র অক্ষর বা নির্গুণ ব্রহ্ম—এখন যিনি হংস বা সর্ব্বত্রগ রূপে জীব ও জড় জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই সকল ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য (অন্তরং) জানিয়া সেই জ্ঞানানুসারে শ্যামসুন্দরের নিষ্কামসেবাপরায়ণ হইয়া (তৎপরাঃ) তাঁহাতে বিলীন হয়েন, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। (শ্বে ১।৭)।

'হংস' শব্দের অর্থ কি ?

হংস কথা গত্যর্থক হন্ ধাতু হইতে হইয়াছে, উহার অর্থ সর্ব্বত্রগ। অব্যক্ত ব্রহ্ম একাই সকল মানুষের ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ শক্তিদান করেন, জীবাত্মাকে নিজ বিষয়ে প্রেরণ করেন ও তাহাকে শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখেন এবং তাহাকে কৃষ্ণের কিসে প্রীতি হইবে, তদ্বিষয়ে প্রেরণা দেন। তিনি এক জীবে আবদ্ধ নহেন, একাই সর্ব্ব জীবে এই সব করেন। প্রত্যেক বীজ হইতে তিনি অঙ্কুর বাহির করেন, অঙ্কুর হইতে ব্রক্ষ উৎপাদন করেন, বৃক্ষ হইতে পুষ্প উৎপাদন করেন, পুষ্পে সুগন্ধ ও মধু সংযোগ করেন। তিনি পৃথিবীকে সূর্য্যের চারি দিকে এবং চন্দ্রকে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরান, তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মযিতা বা "বশী" (ঋ ১০।১৯০।২)। এক কথায় তিনি সমস্ত জীব ও জড় জগতেরই "বশী"। এই তত্ত্ব কতকগুলি প্রহেলিকার আকারে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। (শ্বে ১।৪—৬)।

সন্মাত্র অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম কি সৃষ্টি করিয়াছেন ?

ইহার উত্তরে বলিতে হয় 'না'। 'সৃষ্টি করিয়াছেন পুরুষাকৃতিযুক্ত পরমাত্মা শ্যামসুন্দর। সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই পুরুষাকৃতিযুক্ত (পুরুষবিধঃ) পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না'—'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। (বৃ ১।৪।১)।

বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে

(১) একেবারে গোড়ায় সন্মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, সেই নির্গুণ অতএব ক্লীব ব্রহ্ম (তৎ) চিৎশক্তি গ্রহন করিয়া সঙ্কল্প করিলেন "বহু হইব, জন্মাইব" (তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়)। (ছা ৬।২।৩)।

(২) তিনি তখন সগুণ অতএব পুমান্ (সঃ), তিনি আনন্দ-শক্তি গ্রহণ করিলেন, তাঁহার সৃষ্টির সঙ্কল্প কামনাতে পরিণত হইল, তিনি কামনা করিলেন 'বহু হইব, জন্মাইব' (সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়)। (তৈ ২.৬)।

(৩) তারপরে তিনি পুরুষাকার আত্মারূপে সৃষ্টি-শক্তি গ্রহণ করিয়া জীব ও জড় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। (বৃ ১।৪।১)।

তবেই পাইলাম, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেই ভগবান্ চিৎশক্তি ও আনন্দশক্তির সাহায্যে ত্রিভঙ্গিম, দ্বিভুজ, মুরলীধর শ্যামসুন্দর হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ইঁহাকেই 'শ্যাম' আখ্যা দিয়াছেন (ছা ৮।১৩) এবং ইঁহারই কথা বলেন, যে সাধককে মানসিক ভোগের অবসর দিবার জন্য (ছা ৮।১২।৫) এই আনন্দ-ঘন পরমাত্মা (সম্প্রাসদঃ) সাধকের শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ-সম্পন্ন স্বকীয় শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গিম রূপে (স্বেন রূপেণ) তাহার হৃদয়াকাশে বিরাজ করেন। ইঁহারই নামে "উত্তম পুরুষ"। (ছা ৮।১২।৩)।

ব্রহ্মের বহু হইবার এবং জন্মাইবার সঙ্কল্প এবং কামনা কি ব্যর্থ হইয়াছে ?

না, ব্যর্থ হয় নাই। তিনি জন্মাইয়া ক্ষীরোদসাগরে শয়ন করিয়াছেন, অনবরত সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ তাঁহার গায়ে লাগায় স্বর বাহির হইতেছে, তাই তিনি—

(১) প্রেমিক সাধকের পক্ষে কলবেণুবাদনপর, পরম কারুণিক পালন-কর্ত্তা, তাঁহার বেণুর গীতি রাসলীলার আহ্বান,

(২) মুক্তিকামী সাধকের পক্ষে কু (বা পাপ) অলন-(বিনাশ)কারী মহাকাল; তাঁহার হাতের জিনিষটি বাঁশী নহে, জীবাত্মার দেহবন্ধন-নষ্টকারী শূল। যে স্বরের কথা বলিয়াছি, তাহা পুত্রের বদ্ধাবস্থা দেখিয়া ভৎসনাপূর্ণ রোদন, তাই তিনি রুদ্র।

শ্বেতাশ্বতর ঋষি বলিতেছেন 'শৃগালপ্রকৃতির লোকই (ভীরুঃ—ভীরুকঃ) বলে, তুমি জন্মাও নাই। হে রুদ্র, তোমার যে করুণাময় কল-বেণু-বাদনপর রূপ তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" (শ্বে ৪।২১)।

ব্রহ্মের জন্মের কথা পাইলাম—এখন বহু হইবার কথা। তিনি প্রতি জীবের হৃদয়ে ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরয়িতা রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাই তাঁহার বহু হওয়া।

ব্রহ্মের এই জন্মান এবং বহু হওয়ার উদ্দেশ্য কি?

জীবকে সেবা বা উপাসনার অবসর দেওয়াই এই জন্মান এবং বহু হওয়ার উদ্দেশ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্য বিদ্যা নাম দিয়া এই উপাসনাপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে :—

সাধকের হৃদয়স্থিত "সর্ব্বং" অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতৃ সংজ্ঞক এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম—[সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি চিদানন্দ-ঘন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্ষীরোদ সাগরে যিনি সেইরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন] সেই পর ব্রহ্ম হইতে জাত হইয়াছে (তজ্জ); জীবন-ব্যাপী নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা সাধক তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহাতে বিলীন হইবে (তল্ল), এবং বর্ত্তমানে তাঁহাতেই জীবিত আছে (তদন); ইহা জানিয়া, সাধক শান্ত হইয়া অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া সেই পর-ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন ("সর্ব্বং" খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত)। এই পৃথিবীতে যে রূপ কর্ম্ম করিয়া মানুষ মরে, মরিয়া সে সেই রূপ হয় অর্থাৎ তাহার কর্ম্মানুযায়ী গতি লাভ করে। অতএব [নিষ্কাম হইয়া শ্যামসুন্দরের উপাসনা ও তাঁহার প্রীত্যর্থে সর্ব্বভূত-হিতকর] কর্ম্ম করিবে (ক্রতুং কুর্ব্বীত), [কারণ তাহাই নিঃশ্রেয়স-লাভের একমাত্র উপায়]। (ছা ৩।১৪।১)।

জীবজগৎ, উদ্ভিজ্জগৎ ও জড়জগৎ সৃষ্টি কি ব্রহ্মের নিরর্থক ক্রীড়ামাত্র না উহাতে কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে?

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে নিম্নলিখিত শ্রুতি আছে :—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।

যিনি এক এবং বর্ণ-রহিত অর্থাৎ অদৃশ্য সন্মাত্র ছিলেন, তিনি নানাশক্তি-যোগে গূঢ় অভিপ্রায় লইয়া অনেক "বর্ণ" সৃষ্টি করিয়াছেন। (শ্বে ৪।১)।

তবেই পাইলাম, জীব, উদ্ভিদ্ ও জড় জগতের সৃষ্টি "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩) অর্থাৎ শিশুর ক্রীড়ার ন্যায় নিরর্থক ক্রীড়া নহে; এই সৃষ্টির মূলে গূঢ় অভিপ্রায় আছে। এখন 'বর্ণ শব্দ' হইতে এই গূঢ় অভিপ্রায় বাহির করিতে হইবে। ঐ কথার আভিধানিক অর্থ জাতি, শুক্লাদি রঙ, ককারাদি অক্ষর, বিভাগ, বেষ্টন প্রভৃতি এ স্থলে প্রযুজ্য নহে। শব্দটি বৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, ঐ ধাতুর একটি অর্থ সেবা। অতএব এস্থলে 'বর্ণ অর্থ' করিতে হইবে সেবক, তাহা হইলে শ্রুতিটির অর্থ হইবে :—

শ্যামসুন্দর সেবা-লাভের অভিপ্রায়ে অনেক সেবক সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে মনুষ্য মাত্রেই কৃষ্ণের সেবক হইতেছে। গাভী কৃষ্ণ-সেবার জন্য দুগ্ধ দেয়—সে কৃষ্ণের সেবিকা হইতেছে। হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি কৃষ্ণ-সেবককে বহন করিয়া কৃষ্ণ-সেবার সহায়তা করে—তাহারা কৃষ্ণের সেবক হইতেছে। বৃক্ষ, লতা সকল কৃষ্ণের সেবার জন্য পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি দেয়—তাহারাও কৃষ্ণের সেবক। জল, অগ্নি প্রভৃতি কৃষ্ণের সেবায় ব্যবহৃত হয়, তাহারাও কৃষ্ণের সেবক। মৃত্তিকা, চূণ, বালি প্রভৃতি কৃষ্ণের পূজা-মন্দিরনির্ম্মাণের উপকরণ—অতএব ইহারাও কৃষ্ণের সেবক।

"বিজ্ঞান" কাহাকে বলে এবং বিজ্ঞান লাভের ফল কি?

উপরোক্ত ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত শ্যাম-সুন্দরের নিষ্কাম উপাসনার জ্ঞান বা বুদ্ধিকে বিজ্ঞান বলে এবং তাহার ফল পরমপুরুষার্থ-লাভ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে পাই :—"বিজ্ঞানং যজ্ঞংতনুতে কর্ম্মাণিতনুতেঽপিচ" বিজ্ঞান কৃষ্ণের নিষ্কাম পূজা করায় এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে সর্ব্বভূতের হিতকর নিষ্কাম কর্ম্ম করায়। (তৈ ২।৫)।

সর্ব্বদা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণের সেবা এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে সর্ব্বভূতের হিতকরণকে

ছান্দোগ্য উপনিষদে যথাক্রমে

আত্মনি (পরমাত্মনি) সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য
(কৃষ্ণে সকল ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে স্থাপন)

এবং "অহিংসয়ন্ সর্ব্বভূতানি" (সর্ব্বভূতে মৈত্রীকরণ) এবং গীতাতে "সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রাং" (ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় সমূহ হইতে উঠাইয়া কৃষ্ণে স্থাপন) এবং "সর্ব্বভূতহিতে রতঃ (সন্)" বলা হইয়াছে (ছা ৮।১৫।১, গী ১২।৪) এবং

উভয়ত্র উহাই যে ব্যক্ত ব্রহ্ম (ব্রহ্ম-লোক) বা কৃষ্ণকে পাইবার অর্থাৎ পরমপুরুষার্থলাভের উপায়, তাহাও বলা হইয়াছে।

বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মবিদ্যা একই বস্তু; ব্রহ্ম-বিদ্যার ফলও যে পরম পুরুষ কৃষ্ণকে পাওয়া, তাহা মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন :—

তথা বিদ্বান্নাম রূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং। মু ৩।২।৮

সেইরূপে ব্রহ্মবিৎ নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষে প্রবেশ করেন।

উপসংহার

সকল উপনিষদে একই চিন্তার ধারা আছে, সকল উপনিষদের সাধনপদ্ধতি একই, ইহাই আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি। তাহা যদি হয়, তবে

বিশ্বরূপ পুরাণ পুরুষ (গী ১১।৩৮) কৃষ্ণের নিষ্কাম উপাসনায় মোক্ষ হয় (মু ৩।২।১), ইহাই সকল উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে। গীতাতেও এই পুরুষের নিষ্কাম উপাসনায় মোক্ষ হয়, এই কথা আছে গী ৮।৮, ১০, ২২)।

ঈশোপনিষৎ বলেন, ব্রহ্মবিদ্যা-বিরুদ্ধ কর্ম্ম (অবিদ্যা) অর্থাৎ দুষ্কর্ম্ম এবং কাম্য কর্ম্ম মানুষকে অন্ধকারে (নরকে) লইয়া যায়, এবং কর্ম্মবিবর্জ্জিত জ্ঞান মানুষকে তাহা অপেক্ষাও ঘোরতর অন্ধকারে লইয়া যায়। জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র সমাবেশে অর্থাৎ ভোক্ত, ভোগ্য ও প্রেরয়িতার জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বদা ঐহিক পারত্রিক সকল কর্ম্মই নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে করণে অমৃতত্ব বা নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (ঈশ ৯।১১)।

সুতরাং কাম্যকর্ম্মমূলক মীমাংসা দর্শন এবং কর্ম্মবর্জ্জিত জ্ঞানে মোক্ষবাদী সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক এবং অদ্বৈত জ্ঞান ও সর্ব্বকর্ম্মত্যাগে মোক্ষবাদী উত্তর মীমাংসা বা শাঙ্কর দর্শন বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই বিষয়ের প্রতি আমি সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, কারণ আলোচনাতেই তথ্য নির্ণীত হয়।

পথ-ভোলা

শ্রীঅশ্রুকণা মিত্র

পথ-ভোলা এক পথিক আমি
জীবন-পথের মাঝখানে,
কাতর বড় ডাক্‌ছি তোমায়
নিয়ে যাবে কোনখানে?
সকাল বেলায় যাত্রা করে'
পথের মাঝে সন্ধ্যা হল
চারিদিকে গভীর আঁধার
কোথায় আলো, কোথায় আলো!
হাতটী ধরে' নিয়ে যাবে
বলেছিলে আশার বাণী—
তবে কেন আজকে আমায়
আঁধার মাঝে ফেল্‌লে টানি?
পথের কড়ি নেই বলে' হায়
আলো কি মোর জ্বল্‌বে না,
তোমার দেওয়া সত্যবাণী
জীবনে মোর ফল্‌বে না?

মিথ্যা বলে' সকল ব্যথা
হাসি-মুখে সইব আমি—
তুমি যে মোর সত্যস্বরূপ
এই কথাটী রেখ, স্বামী।
পথের মাঝে সন্ধ্যা এল,
ভয় কি সখা, তাতে আছে!
সদাই যদি তুমি সখা
থাক আমার কাছে কাছে।
আঁধার মাঝে হাতটী তোমার
ধর্‌ব আমি সাহস করে'
তোমার পরশ আন্‌বে হরষ
থাক্‌বে আমার হৃদয় ভরে'।
পথের রেখা সরল হয়ে
লুট্‌বে তোমার চরণতলে
সকল আঁধার আলো হয়ে
পূরব ভাগে উঠ্‌বে জ্বলে॥

ঢেউয়ের পর ঢেউ

(উপন্যাস)

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

— বারো —

সমস্ত সংসারে বিশ্রী একটা গুমোট করে' এলো।

ধরণীবাবুর মাঝে পিতৃস্নেহের সেই উদার প্রশান্তি আর দেখা গেলো না। তিনি কিছুতেই পারলেন না প্রশ্রয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে। অন্ধকারের মৃত একটা ভারের মতো ললিতার উপস্থিতিটা যেন তাঁর বুক চেপে ধরেছে। একটা শূন্য, প্রেতায়িত উপস্থিতি।

প্রথম তিনি মেয়েকে অনেক বোঝাতে গেলেন, আর্দ্র স্নিগ্ধতায়, অবারিত ঔদার্য্যে। পরে দেখালেন ভয়, দুর্ণামের ভয়, দুর্গতির ভয়, তার মুক্তির বিশাল অসহায়তার ভয়। তবু ললিতা তার অভ্রভেদিতা থেকে এক তিল নেমে এলো না।

ধরণীবাবু উঠলেন অবশেষে বিষাক্ত হ'য়ে। কঠিন, কটু কণ্ঠে বললেন,—তবে তুই কী করবি ভেবেছিস্? কে তোর ভার বইবে সারাজীবন?

ললিতা বিবর্ণ মুখে হাস্‌লো। বল্‌লে,—সে ভার আমি নিজেই বইতে পারবো, বাবা। আর ক'টা দিন আমাকে আশ্রয় দাও, পরে আমিই আমার একটা পথ করতে পারবো।

—পথ করতে পারবি? ধরণীবাবু গর্জ্জন করে' উঠলেন : কিন্তু কী পথ আর তোর আছে?

—প্রাণহীন কতোগুলি বিধিবিধানের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনের সমস্ত পথ ফুরিয়ে যায় নি, বাবা। ললিতা কাতর, শুকনো গলায় বললে,—আমার পথও আমাকেই খুঁজে নিতে হ'বে। আমার জন্যে তুমি ভেবো না।

—কিন্তু, ধরণীবাবু অস্থির হ'য়ে উঠলেন : পাগলের মতো এ-সব তুই কী বলছিস্, লিলি? ভাববো না তো বটেই, তুই যদি আবার ফিরে যাস তোর শ্বশুর-বাড়ী?

—আমার যাবার জায়গা কোথায় তা আমি নিজেই ভালো জানি। ললিতা কালো মেঘে কুটিল ইঙ্গিত করে' বিশীর্ণ একটা বিদ্যুৎ-রেখার মতো মিলিয়ে গেলো।

ধরণীবাবু সৌরাংশুর শরণাপন্ন হ'লেন। এ ছেলেটির উপর তিনি ভারি সদয়, ভারি প্রসন্ন। ছেলেটির স্বভাবে এমন একটি ম্লান পরিচ্ছন্নতা আছে, এমন একটি নির্লিপ্ত প্রশান্ততা যে তাকে তিনি শুধু সম্মান করতেন না, বিশ্বাস করতেন। তাকে কাছে ডেকে এনে তিনি বললেন,—তুমি ওকে তবে কিছু বুঝিয়ে বলতে পারো?

সৌরাংশু কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে,—বলে' কিছু বোঝবার আছে বলে' তো মনে হয় না। এখন ওঁর মাঝে প্রবল একটা প্রতিক্রিয়ার সুর এসেছে ; সময়ের আঘাতে আবার তা হয়তো একদিন জুড়িয়ে আসবে। তত দিন একটু প্রতীক্ষা করতে হ'বে বৈ কি।

—সে কতোদিন, তা কে বলতে পারে?

—তবু মিছিমিছি এ নিয়ে জোর খাটাতে গেলে প্রতিপক্ষের মাঝেও অকারণে একটা জোর এনে দেয়া হ'বে। সৌরাংশু স্নিগ্ধ গলায় বললে,—তাতে ফল দাঁড়াবে উল্টো। সময়ের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভালো, আমরা সবাই এক অর্থে সময়ের হাতেই নিজেদের ছেড়ে দিয়েছি।

ধরণীবাবু যেন সান্ত্বনায় ভরে' উঠলেন। বললেন,—তুমিই পারবে, সৌরাংশু। তুমি ওকে বললেই ও তোমার কথা শুনবে। আমি জানি ও তোমাকে খুব মান্য করে। তুমি চেষ্টা করলেই ওকে ওর শ্বশুর-বাড়ী রেখে আসতে পারো।

সৌরাংশু হাসলো। বললে,—কিন্তু ওঁকে ওখানে রেখে আসবারই বা কী মানে আছে? সত্যিই তো, সেখানে ওঁর কিসের আশ্রয়, কিসের আকর্ষণ?

—কিন্তু শেষকালে ওর শ্বশুরও ওকে ত্যাগ করবে নাকি ?

—যিনি ওঁকে ত্যাগ করেছেন তাঁর ত্যাগের চেয়ে তো আর এ বেশি কঠিন নয়। সৌরাংশু ক্লান্ত গলায় বল্‌লে,—তাঁকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করুন, দেখবেন তা হ'লেই আবার তাঁর সঙ্গে সমস্ত ঘর-বাড়ী ভরে' উঠেছে।

—যে নিজে থেকে ফিরে না এলে আর কী করা যাবে বলো ?

—তেমনি উনি নিজে থেকে সেখানে না গেলে আমরাই বা কী করতে পারি ?

—কিন্তু তার একটা কর্ত্তব্য আছে তো ?

— তেমনি মহীপতিবাবুরো তো একটা কর্ত্তব্য ছিলো।

ধরণীবাবু বলবার আর কিছু কথা পেলেন না। নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, ললিতার ওপর ভীষণ অবিচার করা হয়েছে, চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘোরতরো অপমানের বোঝা, চিরন্তন একটা ব্যর্থতার দুর্ব্বহতা, তবু, শত সমব্যথমান মমতা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছেন না তার এই উদ্ধত একাকীত্ব। অসহিষ্ণু গলায় বললেন,—কিন্তু যতোদিন মহীপতি না ফেরে ততোদিন তো ও শ্বশুরবাড়ীতে বসে'ও প্রতীক্ষা করতে পারে। তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দেবার কী মানে আছে ?

—কিন্তু মহীপতিবাবু যদি একেবারেই না ফেরেন ? তাঁর ফিরে আসবার তো কোন গ্যারাণ্টি নেই।

—না-ই যদি ফেরে, কী আর করা যাবে ? হিন্দু-বিধবারা আর তাদের স্বামীর সংসারে টিঁকে থাকে না ?

—তুলনাটা কোনো দিক্ দিয়েই ঠিক হ'লো না বোধ হয়। সৌরাংশু বিনীত হ'য়ে বললে,—প্রথমতঃ ওঁর স্বামী বর্ত্তমান, দ্বিতীয়তঃ সবটাই কেউ আমরা হিন্দু নই। কোনো একটা ধর্ম্মমতের চেয়েও মানুষের বিবেক হয়তো বড়ো জিনিস। হিন্দুত্বের ঋণ শুধতে গিয়ে মনুষ্যত্বে খাটো হওয়াটা কারু-কারু কাছে খুব বেশি কামনীয় না-ও হ'তে পারে।

—তা হ'লে তুমি বলছ স্বামী ও সংসার ছেড়ে দিদি এমনি একটা বিদ্রোহের তুফান তুলে দেবে ? ধরণীবাবুর গলা তিক্ততায় প্রখর হ'য়ে এলো।

—আমি কিছুই বলছি না। সৌরাংশু তার মুখের স্বাভাবিক, সতেজ প্রফুল্লতায় বললে,—আমি শুধু ওঁর চিন্তাগুলিকে অনুসরণ করছি। বিদ্রোহটা কোনো কাজের কথা নয়, তাতে শক্তি নেই, সুষমা নেই। নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার সাময়িক একটা বিকার ছাড়া সেটা কিছু নয়। এই বেলাও তাই ঘটেছে। তাকে দিন্ স্বামী, দিন্ ফিরিয়ে তার সংসার, সমস্ত বিদ্রোহ উপলব্ধিতে আবার দুর্ভেদ্য হ'য়ে উঠবে।

ধরণীবাবু ক্লান্ত, অসহায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন। বল্‌লেন,—সব, সব আমি বুঝি, সৌরাংশু। কিন্তু কোথেকে তাকে কী ফিরিয়ে দেবো বলো ?

সৌরাংশু জিগ্‌গেস করলে : কেন, মহীপতিবাবুর কি কোনো খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না ?

—যাচ্ছে বৈ কি, ধরণীবাবু নিরাশ, নিরানন্দ মুখে বল্‌লেন,—জগদীশবাবু তো তার গতিবিধি নজরে রাখ্‌ছেন, শুনেছি। কতো চিঠি, কতো অনুরোধ, তবু তার ফের্‌বার নাম নেই। ফিরবে কি না তাই বা কে জানে ?

—যদি স্বামীই না ফেরেন, তবে স্ত্রীকেই বা আপনি কী করে' জোর করে' ফিরিয়ে দিতে পারেন ? স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীও তো সন্ন্যাসিনী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে।

—তোমাদের এই আধুনিকতার ঝাঁজ আমি সইতে পারি না, সৌরাংশু। ধরণীবাবু ছটফট করে' উঠ্‌লেন : কিন্তু ধরো, যদি একদিন মহীপতি ফেরে ?

সৌরাংশু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো : তা হ'লে তো কথাই নেই। আমরা তো সবাই সেই পথ চেয়েই বসে' আছি। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?

—কী

—মহীপতিবাবুর বর্ত্তমান ঠিকানাটা সংগ্রহ করুন।

—তারপর ? ধরণীবাবু যেন সমুদ্রের কূল দেখতে পাচ্ছেন।

—তারপর চলুন, ললিতাকে সেখানে আমরা রেখে আসি। ললিতা গেলে হয়তো তাঁকে ফিরিয়ে আনা সহজ হ'বে।

ধরণীবাবু উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন: কিন্তু লিলি সেখানে যাবে মনে করো?

—কেনই বা যাবেন না? তিনি শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন তাঁর স্বামীর কাছে। সৌরাংশু প্রশান্ত গলায় বল্‌লে,—সেদিক থেকে তো চেষ্টা করে' কখনো দেখা হয় নি, দেখুন না একবার।

ধরণীবাবু তার হাত চেপে ধর্‌লেন: তুমি তা হ'লে তার মত করাও, সৌরাংশু। আমি জগদীশবাবুকে লিখে মহীপতির ঠিকানা আনাচ্ছি। তারপর চলো, সবাই মিলে একবার ভেসে পড়ি। ললিতা গিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই সে আর কঠিন থাক্‌তে পার্‌বে না, নিশ্চয়। এতোদিনে তার সেই স্বপ্ন হয়তো ভেঙে গেছে। তাই, তাই,—এখন তার ঠিকানাটা পেলে হয়।

— তেরো —

ললিতা সন্ধ্যার অন্ধকারে সাদা, অশরীরী একটা ছায়ার মতো বসে' ছিলো। যেন আকাশের কোণে জলহীন, অবান্তর একটা মেঘ।

সৌরাংশু আস্তে-আস্তে দরজার ওপারে এসে দাঁড়ালো। থম্‌কে গেলো ললিতার বস্‌বার এই শীতল শিথিলতা দেখে। তার মলিন আলস্যে পুঞ্জিত হ'য়ে আছে যেন ব্যর্থতার ভার, দিনের দগ্ধতার শেষে সন্ধ্যার এই নিরাভ ধূসরতা।

দিনের বেলায় ললিতাকে আরেক মূর্ত্তিতে দেখা গিয়েছিলো, রৌদ্রে ঝল্‌সে-ওঠা তলোয়ারের তীব্রতার মতো। এখন সন্ধ্যার এই মন্থর ঘনায়মানতায় তার বস্‌বার ভঙ্গীটি যেন বিষণ্ণ একটি সুরের মতো করুণ ক্লান্তিতে ভিজে উঠেছে। ঘরে নিঃশব্দতার কতোগুলি প্রেত যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেয়ালগুলি যেন স্পর্শহীন শূন্যতা দিয়ে তৈরি! পৃথিবীতে যেন আর সময় নেই, স্রোত নেই, সব একটি অবিচল, অবাস্তব স্তব্ধতা।

হাত বাড়িয়ে সৌরাংশু তাড়াতাড়ি আলোটা জেলে দিলো।

ললিতা উঠ্‌লো পিছল একটা সাপের মতো সর্ব্বাঙ্গে চমকিত হ'য়ে। বল্‌লে,—কে?

সৌরাংশু এক পা এগিয়ে এসে বল্‌লে,—সুমনা কি আজো আসে নি?

—সুমনা-দি এসেছেন কিনা তা তো আলো না জালিয়েও দেখা যেতো। বস্‌বার ভঙ্গীটা ললিতা ঋজুতায় ধারালো করে' আন্‌লো।

—কিন্তু আপনাকে সেইটেই তো আমার একমাত্র প্রশ্ন ছিলো না। সৌরাংশু নিঃসংশয়ে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে' পড়্‌লো: আপনার সঙ্গে আমার যে আরো অনেক কথা আছে। গভীর কথা।

ললিতার যে কেমন করে' উঠ্‌লো বলা কঠিন। শূন্য চোখে সৌরাংশুর দিকে চেয়ে থেকে একটু বা ভীত, তপ্ত গলায় বল্‌লে,—তবে আলোটা আর জ্বালালেন কেন?

—কিন্তু সেই সঙ্গে তা একটা খুব আনন্দেরো কথা যে। সৌরাংশু হেসে উঠে ঘরের আব্‌হাওয়াটাকে তরল করে' আন্‌লো। বল্‌লে,—আলো না থাক্‌লে সেই আনন্দকে যে স্পষ্ট করে' দেখা যাবে না।

বৃষ্টির আগেকার বিবর্ণ মৃত্তিকার মতো ললিতা প্রতীক্ষায় কঠিন হ'য়ে রইলো।

সবল সপৌরুষে সৌরাংশু বল্‌লে,—আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?

প্রশ্নটার উলঙ্গ তীব্রতায় ললিতার দুই চোখ যেন হঠাৎ ধাঁধিয়ে গেলো। শরীরের অন্ধকারে উঠ্‌লো সে মর্ম্মরিত হ'য়ে। শিহরিত দীর্ণতায় একটি কম্পান্বিত আভা নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। বিহ্বল গলায় বল্‌লে,—সত্যি যাবো। এক্ষুণি, এই মুহূর্ত্তে।

সৌরাংশুর মুখ যেন হঠাৎ এক ফুঁয়ে নিবে গেলো। থতিয়ে, শুকনো গলায় বল্‌লে,—কোথায় যাবেন বলুন তো?

—তা কী জানি? যেখানে হোক্, যেখানে আপনার খুসি। ললিতা লেলিহমান, ধূমল একটা শিখার মতো যেন আবার উঠ্‌লো কেঁপে।

সৌরাংশু ঘেমে উঠ্‌লো। আমতা-আমতা করে' বল্‌লে,—তেমন যাওয়ার কথা তো কিছু বলি নি।

—তবে আমাকে এমনি হাওয়া বদল করিয়ে আন্‌তে চান নাকি? ললিতা হেসে উঠ্‌লো।

—প্রায় তাই। সৌরাংশু সেই হাসিতে যেন একটা স্বস্তির আভাস পেলো: আপনাকে আপনার স্বামীর কাছে নিয়ে যাবার কথা বল্‌তে এসেছিলাম।

—কা'র কাছে?

—মহীপতিবাবুর কাছে। সৌরাংশু ঢোঁক গিলে বল্‌লে,—তাঁর নতুন ঠিকানা পাওয়া গেছে।

ললিতা একমুহূর্ত্ত কোনো কথা কইলো না। আস্তে-আস্তে সরে' গিয়ে জানলার কাছে বস্‌লো, যেখানে এই রূঢ় আলো বেদনায় নরম হ'য়ে এসেছে, যেখান থেকে অস্পষ্ট করে' দেখা যায় পৃথিবীর ধূসর বিশালতা।

ললিতার স্বরটা শোনা গেলো করুণ আর্ত্তনাদের মতো: ঠিকানা পাওয়া গেছে, তবে আমাকে এখন কী করতে হ'বে?

—যদি বলেন, সৌরাংশু সৌজন্যে বিস্ফারিত হ'লো: আমি আর আপনার বাবা আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

—আমার উপর আপনাদের এতো দয়া হ'বার কারণ? ললিতার চোখ অন্ধকারে বন্য পশুর চোখের মতো জ্বলে' উঠ্‌লো।

—দয়ার কথা নয়, সৌরাংশু নিষ্প্রাণ গলায় বল্‌লে,—আপনার বাবা বল্‌ছিলেন কিনা, তাই।

—ও, আপনি কিছু বল্‌ছেন না? ললিতা ফের আলোয় উঠে এলো। বস্‌লো পাশের একটা চেয়ারে। বল্‌লে,—তবু, আপনি ভাব্‌তে পাচ্ছেন আমি সেখানে যাবো, আমি?

—গেলেনই বা। সৌরাংশু শান্ত গলায় বল্‌লে,—আপনার স্বামীর কাছেই তো যাচ্ছেন!

—আমি যাবো তার কাছে ভিক্ষা করতে, তার কাছে, যে আমাকে একদিন—কথাটা ললিতা শেষ করতে পারলো না। একটা অন্ধ রাগে তার মুখ পীড়িত, বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো।

সৌরাংশু নয়, যেন একটা প্রাণহীন যন্ত্রের মুখ থেকে শব্দ বেরুলো: স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীর জন্যে কতো তপস্যাই তো করেন—এ আর আপনার কাছে এমন কী কঠিন প্রত্যাশা করা হচ্ছে?

—আর, স্বামীদের তপস্যা হচ্ছে অস্ত্রীত্বের জন্যে? ললিতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো: হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আমার জন্যে মিছিমিছি নিজেকে ব্যস্ত করবেন না। পৃথিবীতে আরো অনেক সব জটিলতরো সমস্যা আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামান গে।

তার কথা বলার ধরণে সৌরাংশু হেসে উঠ্‌লো। বল্‌লে,—কিন্তু তাঁর যদি একটা ভুলই হ'য়ে থাকে, সে-ভুল ভাঙবার জন্যে চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?

—ক্ষতি তার, ক্ষতি তার মনুষ্যত্বের, যে চেষ্টা করবে। ললিতা যেন নিজের অনুভূতির গভীরতম অন্ধকারে ডুবে গেলো: ভুল কেউ কারুর ভেঙে দিতে পারে না, যদি তা না আপনি ভাঙে। আর তাঁর সেটা ভুলই বা আপনারা কী করে' ভাব্‌ছেন? আর, আপনার-আমার কাছে সেটা ভুল হ'লেই বা কী এসে যায়—সেটা তাঁর কাছে সত্য। তেমনি আমারো হয়তো একটা সত্য আছে—সেই সত্যে আমি একা। ভুল ভেঙে দিয়েই বা লাভ কী?

সৌরাংশু তার এই উক্তির গভীরতাকেও সম্মান করলো না, লঘুকণ্ঠে বল্‌লে,—ধরুন, যদি একদিন সেই ভুল আপনা থেকেই ভেঙে যায়, আর আপনি না গিয়ে তিনিই একদিন সশরীরে ফিরে আসেন, ফিরে আসেন তাঁর সংসারের পরিবেশে, তাঁর স্ত্রীর নির্জ্জনতায়—

ব্যাপারটা যেন কতো অসম্ভব, এমনি একটি ধূসর রেখাহীনতায় ললিতা হেসে উঠ্‌লো। নির্লিপ্ত গলায় বল্‌লে,—আস্‌বেন। ফিরে আস্‌তে তাঁর বাধা কী? আমাদের দুজনের জন্যেই জায়গা এখানে যথেষ্ট, এই পৃথিবীতে। তিনি যদি তাঁর তপস্যায় উত্তীর্ণ না হ'তে পারেন, সেই জন্যে আমিও পারবো না, এমন কথা কোথাও লেখা নেই। তিনি যদি বদ্‌লাতে পারেন, আমিও হ'য়ে উঠ্‌তে পারি নতুন মানুষ, খুঁজে পেতে পারি নতুন

পরিবেশ, নতুন নির্জ্জনতা। ভুল আমারো ভেঙে যেতে পারে, সৌরাংশুবাবু।

—তার মানে, সৌরাংশু ঘরের জোরালো আলোয় যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌লো : তার মানে, উনি যদি কোনোদিন ফিরে আসেনও, আপনি তাঁকে প্রসন্ন পরিপূর্ণতায় গ্রহণ কর্‌বেন না ?

—কী করে'ই বা কর্‌বো ? ললিতা হঠাৎ অদ্ভুত করে' হেসে উঠ্‌লো : আমার জীবনে সে-দিন যে কবে অস্ত গেছে, সেই দিন, যে-দিন সমস্ত দেহে-মনে আমি শুধু অশরীরী স্বামিত্বের ভাবময় একটা বিকাশের প্রতিই বিহ্বল হ'য়ে ছিলাম। আজ সেই বিহ্বলতার মেঘ সত্যের সূর্য্যালোকে গেছে দূর হ'য়ে। এখন ভাবের চেয়ে ব্যক্তিকেই আমি বেশি প্রাধান্য দিতে শিখেছি। আমি আর সে-ললিতা নেই।

—কিন্তু যাকে আপনি সত্য বলে' অহঙ্কার কর্‌ছেন, সে-ও তো একটা ভাব, ভাবের ক্ষণিক একটা ছটা ছাড়া কিছু নয়।

—কক্‌খনো নয়, ললিতা চেয়ার ছেড়ে সেই বিস্ফুরিত দীর্ঘতায় উঠে দাঁড়ালো : সেই সত্য আমি নিজে, নিজেকে নিয়ে আমার নিজের এই রচনা, একান্ত করে' নিজের এই হ'য়ে ওঠা।

ললিতা তার কথার অন্তরালে একটা সুদূর প্রচ্ছন্নতা নিয়ে এলো। সেই প্রচ্ছন্নতার ঘন, উষ্ণ অন্ধকারে অভিভূতের মতো এলো সে এক পা এগিয়ে, সৌরাংশুর চেয়ারের দিকে।

আচ্ছন্ন, অবশ গলায় বল্‌লে,—আর কোথাও নিয়ে যেতে পারেন না ?

সৌরাংশু স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো : আর কোথায় ?

—এই ঘরের, এই পরিচয়ের বাইরে—বহু দূরের বিরাট্ একটা নিশ্চিহ্ন শুভ্রতায় ?

ললিতাকে শোনা গেলো বন্দী অন্ধকারের কাকুতির মতো।

সৌরাংশু প্রখর, স্পষ্টতায় সতেজ গলায় বল্‌লে,—আমি কোথায় নিয়ে যাবো ? এই তো আপনি বেশ আছেন নিজের নিষ্ঠুর সত্য নিয়ে। বল্‌ছিলেন না, সেই সত্যে আপনি একা, আপনি নিজেই যথেষ্ট। মিছিমিছি আর কাউকে তবে ব্যস্ত কর্‌ছেন কেন ?

ললিতার মুখে আর একটিও কথা এলো না, ঘরের আলো তার মুখের সমস্ত আর্দ্রতা যেন শুষে নিলো। সে বস্‌লো গিয়ে ফের সেই জানলার ধারে, ক্লান্তিতে রাশীভূত হ'য়ে। স্তব্ধতায় হঠাৎ সে গেলো মুছে, তার বস্‌বার এলোমেলো আলস্যে।

ঘরে ঘনিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো কথা-না-বলার করুণ অন্ধকার।

ললিতা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে রুক্ষ গলায় বল্‌লে,—আপনি তবে আর বসে' আছেন কেন ? সেই দিন থেকে যে সুমনা-দি আর আস্‌ছেন না পড়াতে, তা তো জানেনই।

—হ্যাঁ, যাই। সৌরাংশু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মিথ্যা কথা, সৌরাংশু স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলো ললিতার এই ভঙ্গীটা কোমল প্রতীক্ষার ভঙ্গী, আনমিত বশ্যতার, তাতে নেই তার সত্যোপলব্ধির কোনো তীক্ষ্ণতা। তার মাঝে আজো যেন কাঁদছে একটি ঘর, তপ্ত সুনিবিড় একটি তৃষ্ণা, মুমূর্ষু একটি মরীচিকা। সেই দিন তার আজো অস্ত যায় নি, তার দীর্ঘায়মান বিধুর ছায়াগুলি এখনো তার জীবনে লেগে আছে।

(ক্রমশঃ)

—বৈচিত্র্য—

বায়ুর বেগ মাপিবার যন্ত্র

বেগ-মানযন্ত্র—

ব্যোমযান দুর্ঘটনার বার্ত্তা মাঝে মাঝে শুনা যায়। ইহার কারণ, মহাশূন্যের বায়ুর গতিবেগ-নির্ণয়ের উপযুক্ত উপায় অনেক সময়ে বৈমানিকগণের হাতে থাকে না। যন্ত্ররাজ আমেরিকার ডেট্রয়েট সহরে ফোর্ড এয়ার-পোর্টে সম্প্রতি ইহার প্রতিবিধানের একটা উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। চিত্রে যে বেলুনটী পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহা উদজানে পরিপূর্ণ। ইহা মুক্ত করিবামাত্র থিওডলাইটের সমীপবর্ত্তী লোকটী তাহার উত্থানের গতিবেগ পরিমাণ করিতে থাকেন এবং এইরূপে উর্দ্ধবাহী বায়ুপ্রবাহেরও গতিবেগ নিরূপিত হইয়া যায়। বৈমানিকেরা ইহার সাহায্যে কখন কতদূর উচ্চ পর্য্যন্ত নিরাপদে উঠা যায়, তাহা অনায়াসেই অবধারণ করিতে পারিবেন।

মৃত্যু-রশ্মি—

হত্যার জন্য নয়, পরন্তু মানুষের জীবন-রক্ষার জন্যই এই মৃত্যু-রশ্মির আবিষ্কার হইয়াছে। "কোল্ড ক্যাথোড রেজ" নামে ইহা বৈজ্ঞানিক মহলে পরিচিত। জার্ম্মনীর হ্যামবার্গ ফার্ম্মের সি এইচ এফ মুলার এক্স-রে টিউবের প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ী—এই মৃত্যুরশ্মি লইয়া শেষ পরীক্ষার সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। "ক্যাথোড রেজ" ঠিক বলিতে গেলে একপ্রকার

মৃত্যু-রশ্মির আলো

তরল বিদ্যুৎ-প্রবাহ। সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু, এমন কি সকল প্রকার জীবন্ত প্রাণি-কোষে ইহা স্পর্শ করিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা মরণ-মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই জন্যই ইহার নাম মৃত্যু-রশ্মি রাখা কিছুমাত্র অযৌক্তিক হয় নাই। দারুণ কর্কট-রোগের (cancer) চিকিৎসার্থে ইতিপূর্ব্বে রেডিয়ম ব্যবহৃত হইতেছিল, কিন্তু তাহা খুব মহার্ঘ—এক গ্র্যাম রেডিয়মে এখনও খরচ পড়ে ৭৫,০০০ ডলারের কম নয়। নবাবিষ্কৃত মৃত্যু-রশ্মি ইহার স্থলে অনায়াসে প্রযুজ্য হইবে। কারণ, জীবাণু-নাশী ক্ষমতায় "ক্যাথোড রেজ" রেডিয়মের চেয়ে কোনও অংশে ন্যূন নহে, অথচ ইহার উৎপাদনের উপায়ও যেমন সরল তেমনি অল্প ব্যয়-সাধ্য। এই ছবিখানির মূল ফটোগ্রাফি মৃত্যু-রশ্মির আলোকপাতেই গৃহীত হইয়াছিল।

আসল-নকল—

খাঁটি জহুরী নাকি চোখের দৃষ্টি দিয়াই সাচ্চা নকল ধরিতে পারেন; কিন্তু ইহা সব সময়ে সহজ নয়। বিশেষ, ঘরের অতি বড় পাকা গৃহিণীর চক্ষে যখন অত সহজে খাঁটি-মেকী ধরা পড়ে না, তখন তাঁহাদের সুবিধার জন্য কোন যান্ত্রিক উপায়ের সাহায্য পাওয়া গেলে তাঁহারা খুসীই হইবেন, সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য দেশে নবাবিষ্কৃত ফিলিপ্‌স এক্স-রে যন্ত্রে খাঁটি ও কৃত্রিম মুক্তা অনায়াসে চিনিয়া লওয়া যায়। উপরোক্ত চিত্রে, বৈজ্ঞানিক স্বামীর সম্মুখে এমনি এক প্রতীচ্য-গৃহিণী কি আনন্দে নূতন কষ্টি-যন্ত্রে মুক্তার স্বরূপ যাচাই করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন।

কষ্টি-যন্ত্র
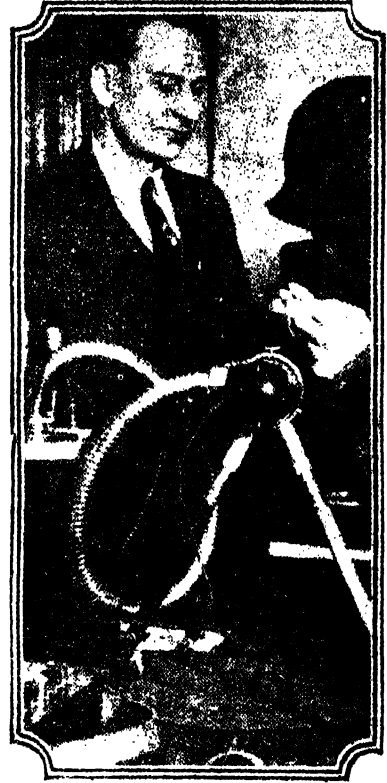
রাজা রামমোহন রায়

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

প্রবর্ত্তক পত্রের একজন পরিচালক লিখিয়াছেন, "রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ আপনার নিজের লেখা আশা করিয়াছিলাম। উহা কি পাওয়া যাইতে পারে না?" পাওয়া যাইবে না কেন? অবশ্যই পাওয়া যাইবে। সাদর নিমন্ত্রণ যখন আসিয়াছে, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে। প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা বা উৎকর্ষ বিষয়ে বিচার আমার নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণ মানব বা অতিমানব বা মহামানব অতীত-গর্ভে বিলীন হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে ভালমন্দ কথা-বার্ত্তায় তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না। যাঁহারা তাঁহার পশ্চাৎ রহিলেন বা পরে আসিবেন, সে সব কথা ও আলোচনায় তাঁহাদের "ইষ্টাপত্তি" সম্ভব। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কর্ম্ম-পন্থার বিশিষ্ট ও গুহ্য আলোচনা মুসোলিনি, হিট্‌লার, ডি, ভেলেরা, বা ওডফির কাজে লাগিতে পারে; বল্‌ড্‌ইনের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই—কারণ তিনি বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডে সে শ্রেণীর কর্ম্মপন্থার চেষ্টা বলে নিবারিত হইবে।"

কিন্তু ভাব বা চিন্তার রাজ্যে একথা খাটে না। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিতেছে, আসিবে ও আসিয়াছে, চিরদিন আসিবে।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিক "বিরহ-উৎসব" (বৈষ্ণব তত্ত্বানুমোদিত কথা) উপলক্ষে দেশে-বিদেশে প্রবন্ধ-প্লাবন হইয়াছে, অকথা, কুকথা, সুকথার ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আসল কথা পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া এখনও মনে করিতে পারা যাইতেছে না।

২৭শে সেপ্টেম্বর রাজার মৃত্যুদিনে অল্পবিস্তর সমারোহ হইয়াছে; "ছুটী-ছাটা", জলহাওয়া, সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি অজুহাতে ও ওজরে বিরাট্ মহাসমারোহ বাকী আছে। ইতিমধ্যে যেমন হয় হইয়াছে—দলাদলি, গুঁতাগুঁতি ও বাদাবাদি সমারোহের বিরাটত্বে বাধা দিয়াছে ও দিতেছে এবং বোধহয় দিবে।

তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। রাজার মাপ আকবরি-গজে, "রিসার্চ্চের" আধুনিক ছোট মাপ-কাঠিতে তাঁহার মহত্ত্বের হ্রাস হইবে না এবং তাহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি ভ্রান্ত আক্রমণে বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমা হ্রাস হইবে না। সর্ব্বত্রই মোটা বড় কথা থাকিয়া যাইবে, তাহা চিরকাল টেঁক-সই।

যুগ-প্রবর্ত্তক, যুগ-নিয়ামক, যুগনেতা রামমোহন যুগ-পাবন না হইলেও তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরে বহুযুগের উপর যে ছাপ মারিয়া গিয়াছেন তাহা উঠিবার, মুছিবার ও ধুইবার নয়।

সুদূর আমেরিকা হইতে জনৈক তীর্থযাত্রী রাজার জন্মস্থান রাধানগরে বহুদিন হইল রাজার স্মৃতিসৌধ অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন। চতুর পল্লীবাসী তাঁহার পৈত্রিক রাজ-রাজেশ্বরের দোলমঞ্চ দেখাইয়াছিলেন। ভক্তিপ্রাণ তীর্থ-যাত্রী সেই মঞ্চ নত-মস্তকে অভিবাদন করেন এবং মঞ্চের তুলসীতলার মাটী রেশমী রুমালে বাঁধিয়া লইয়া যান। দেশে যাইয়া হয়ত আমেরিকান প্রথামত মিউজিয়াম ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাহা বিতরণ করিয়া থাকিতে পারেন।

তারপর, রাধানগরে রামমোহন স্মৃতি-সৌধ-নির্ম্মাণের বিফল চেষ্টার যুগ; নির্ম্মাণচেষ্টার বিফলতায় বা সাফল্যে সে পুণ্য-স্মৃতির প্রতি মর্য্যাদা বা অমর্য্যাদার ইতরবিশেষ সম্ভাবনা নাই। হয়ত সে অসম্পূর্ণ সৌধের ভগ্নপ্রস্তর-খণ্ড কোনদিন সঙ্গোপনে আমেরিকায় নীত হইবে এবং প্রকাশ্যে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হইবে। আপাততঃ "বিরহ-উৎসব" উপলক্ষে রাধানগরে তীর্থ-যাত্রা স্থগিত আছে। ইতিমধ্যে স্মৃতি সৌধ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়, ইহা আশা এবং প্রার্থনা—না হয়, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

বার বার এ প্রসঙ্গে আমেরিকার কথা মনে হইতেছে এবং উল্লেখ করিতেছি, তাহার কারণ আছে। আমেরিকার আধুনিক আধ্যাত্মিক চর্চ্চার প্রধান স্তম্ভ Comparative

religion ; ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মত বিচার ও আলোচনা সাহায্যে ধর্ম্মমাত্রের মূলসূত্র ও সত্য "আপেক্ষিক"ভাবে প্রণিধান এই চর্চ্চার উদ্দেশ্য। রাজা রামমোহন রায় এই চর্চ্চা ও শাস্ত্রের জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বহু মহাকার্য্যের মধ্যে তাঁহার এই কার্য্য মহত্তর। এই সূত্র ও সত্য ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া চিকাগো Parliament of religions-এর প্রথম অধিবেশন হয়। স্বামী বিবেকানন্দের এইখানেই প্রথম প্রকাশ ও বিকাশ। এই মহা অধিবেশন উপলক্ষ করিয়া মিসেস হাস্‌কেল নামে এক ধর্ম্মপ্রাণ ধনী মহিলা 'Barrow's Lecture' প্রণালী স্থাপন করেন। চার বৎসর অন্তর আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এ বৎসরের নির্ব্বাচিত বক্তা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গত ২৫শে নভেম্বর তারিখে তিনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার বাটীতে শুভাগমন করেন। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যথেষ্ট আলোচনা হয় এবং Comparative religion সম্বন্ধে তিনি রাজার স্থান উর্দ্ধে অতি উর্দ্ধে নির্দ্দেশ করেন। এই সমন্বয়-বাদের মধ্য দিয়াই রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব।

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে আর এক রহস্য অনুমিত হইবে। হুগলী জেলায় জাহানাবাদ (আধুনিক আরামবাগ) মহকুমার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম। অদূরে সেই মহাকুমারই মধ্যে কামার-পুকুর গ্রামে রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পরমহংসদেবের শত বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা রাজা রামমোহনের শত বার্ষিক "বিরহ উৎসব" করিতেছি। পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ Comparative religion-এর শ্রেষ্ঠ চর্চ্চার স্থান Chicago Parliament of religions'এর প্রথমে অধিবেশনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত-সম্মত যে সমন্বয়-ধারার আস্বাদ পাইয়াছিলেন, সেই ধারা অবলম্বন করিয়া পরমহংসদেব-প্রণোদিত পথে বেলুড়মঠে বিরাট্ ভাব-ধারার সৃজন করেন। এই আত্মিক নৈকট্য ও আত্মীয়তার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কৃতজ্ঞ আমেরিকা এখনও এবং পূর্ব্বে বেলুড় মঠের সাহায্য-কল্পে অজস্র অর্থ সরবরাহ করিতেছে এবং করিয়াছে। অচিরে সেই সাহায্যে বেলুড়ে নব-সৌধ নির্ম্মাণের সম্ভাবনা আছে। তাহাতেও রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত Comparative religion এবং পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব প্রবর্ত্তিত বিরাট্ সমন্বয়বাদের জয়-জয়কার হুগলী জেলার পুণ্য সংস্থান অবলম্বন করিয়া হইবে। রামমোহনের সমন্বয়-ভাবধারা-রহস্যের বিষয় অনুধাবন করিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। রামমোহন উচ্চশ্রেণীর সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণসন্তান; "উন্নত আলোকমার্গ" প্রাপ্ত হইয়াও, তিনি চিরদিন উপবীতধারী। তিনি বারংবার আদেশ প্রচার করিয়া-ছিলেন যে, মরণের পরও যেন তাঁহার দেহ হইতে ব্রাহ্মণের গৌরব-সূচক উপবীত অপসারিত না হয় এবং তাহা হয়ও নাই। সেই উপবীত রাজার পাগড়ী ও মস্তকের কেশের সহিত ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীতে তাহা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম হইতে চ্যুতিবশতঃ তাঁহার দায়াদগণের মধ্যে বিষয়-বণ্টনের ব্যাঘাত না হয়, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার এ বিষয়ে এত দৃষ্টি ছিল। তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণোচিত-পদ্ধতিতে পুষ্পচন্দন, ধূপ-ধুনা সাহায্যে কৌষিক বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বেদীর উপর হইতে বেদালোচনা করিতেন, উপাসনা করিতেন। আধুনিক প্রথামত "পৌত্তলিককতা"র তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে বা গ্রন্থে প্রয়োগ নাই। হিন্দুমাত্রেই "পৌত্তলিক" বা প্রতিমা পূজক নহে—একথা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; তাই হিন্দুর বেদ, উপনিষদ্ ও মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের ভিত্তি। তিনি যথেষ্ট মর্য্যাদা করিতেন, বাইবেল এবং কোরাণের প্রতি। মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারীর প্রিয় ছাত্র রাধানগরের "মুন্সি-চালায়" আরবী, পার্শী পড়িয়া মুসলমান-ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং মুসলমানেরই ভাষায় তিনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। কোরাণের প্রতি তাঁহার এক সময়ে এত ঝোঁক ছিল যে, কোরাণ অবলম্বন

করিয়া নবধর্ম্মে প্রচার করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

আরও একটু অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, বাল্যে তিনি স্বীয় পরিবারের মধ্যেই শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে দ্বেষ-ভাব দেখিয়া ব্যথিত এবং কৌতূহলী হইতেন; অভিরাম গোস্বামীর কৃষ্ণনগরে এবং নদীর পরপারে নিজের জন্মগ্রামে নিজালয়ে রাজরাজেশ্বর এবং নিজগ্রামস্থ সর্ব্বাধিকারি-গৃহে রাধাকান্ত ও শীতলা শালগ্রামের পূজা দেখিতেন; খানাকুল গ্রামে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ ঘণ্টেশ্বর মহাদেবের পূজা দেখিতেন, অদূরে কণাদপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচর্চ্চা দেখিতেন—জন্মগ্রাম রাধানগরে স্থাপিত পঞ্চমুণ্ডী আসনে তান্ত্রিক ব্যাপার লক্ষ্য করিতেন এবং শূন্যপুরাণাশ্রয়ী ধর্ম্মপূজার আয়োজনও দেখিতেন। সহজেই বুঝা যায়, এই অদ্ভুত ধর্ম্মমত-পার্থক্যের আলোড়ন এবং আন্দোলনে শিশুর মন, বালকের মন ও তরুণের মন কত দূর আলোড়িত, কৌতূহলী এবং ব্যথিত হইত। রাধানগরের অদূরে ছিল ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণের ধরমপুরের মসজিদ, আরও কিছু দূরে ছিল উত্তর ভারত হইতে ঝাড়খণ্ডের পথে পুরী পুরুষোত্তম-তীর্থে যাইবার প্রধান পথ। সাধু সন্ন্যাসীর জনতায় নিকটস্থ অতিথিশালা সর্ব্বদা মুখরিত হইত। উড়িষ্যা হইতে সদ্যপ্রত্যাগত সর্ব্বাধিকারী বংশ উড়িষ্যা-পথযাত্রীগণকে সাদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত করিয়া ধন্য হইতেন। বালক রামমোহন সেই সাধু-সন্ন্যাসিগণের সেবায় সদা নিরত থাকিতেন—তাঁহাদের সাহচর্য্যে প্রভূত আনন্দ ও উপকার লাভ করিতেন। যে ধর্ম্মসমন্বয়-ধারার ইঙ্গিত পূর্ব্বে করিয়াছি, এই অপূর্ব্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই তাহার উদ্ভব ও পুষ্টির সম্ভব হইয়াছে। বালক রামকৃষ্ণও উড়িষ্যা পথপার্শ্বস্থ কামারপুকুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী অতিথিশালায় এইরূপ সাধু-সজ্জনের সাহচর্য্যে উপকৃত ও আনন্দিত হইতেন। এই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের অধিকারী জাহানাবাদ মহকুমার দুইটী গ্রামে রামমোহন ও রামকৃষ্ণের উদ্ভব সম্ভব এবং

কথাপ্রসঙ্গে রামমোহনের পরিবার এবং সর্ব্বাধিকারী বংশের সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হইল। রামমোহনের পিতা এবং রামমোহনের আরবী, পার্শী শিক্ষক রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী অভিন্ন হৃদয় এবং সহৃদয় বন্ধু ছিলেন। উভয় পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থে দেখা যায় যে, রামমোহনের কনিষ্ঠা পত্নী যদুনাথের সহিত একত্র তীর্থভ্রমণ করিয়াছিলেন। তীর্থভ্রমণ গ্রন্থে একাধিকবার সে কথার উল্লেখ আছে। "রমাপ্রসাদ রায়ের বিমাতা"—"রমাপ্রসাদ রায়ের মাতৃদেবী" বলিয়া উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য যে, প্রথম বাঙ্গালী জজ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় রামমোহনের পুত্র।

পিতামহ মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারীর শিষ্য রামমোহন যদুনাথের পিতা মথুরামোহনের বন্ধু ছিলেন। সে কালে পিতৃবন্ধুকে পিতৃস্থানীয় মনে করার কুসংস্কার ছিল; সেইজন্য এখনকার মত তখন কৃতীপুত্র মাতাকে "মাতা" বলিতে সঙ্কোচ করিয়া জননী বলিতেন না এবং পূজনীয়া রমণীগণকে অমুকের মাতা বা অমুকের বিমাতা বলিতেন, অমুকের স্ত্রী বলিতেন না। যদুনাথের তীর্থভ্রমণ গ্রন্থে তীর্থসঙ্গিনী রামমোহনের বণিতাকে যদুনাথ একাধিক বার—"রমাপ্রসাদ রায়ে"র বিমাতা ও মাতৃদেবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত তীর্থভ্রমণ-গ্রন্থের ৩৬, ৪৫ এবং ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রামমোহন রায়ের বংশের ও রাধানগর সর্ব্বাধিকারী বংশের নিকট আত্মীয়তার আর একটু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি পণ্ডিতপ্রবর "পুরোহিত" পত্রিকায় প্রকাশিত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সামাজিক ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

"মহাত্মা রাজা রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের সহিত তাঁহার মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারীর অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল। উভয়েরই সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ঘটিত একদা যখন খানাকুলের জমিদারী নিলামে উঠে, তখন রায় মহাশয় রামনারায়ণকে কহিলেন, "দেখ সাঙ্গাৎ! তুমি যে জমিদারী লইবে মনে কর, তাহাই লও। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা এই জমিদারীটি আমার হয়'। ইহাতে উক্ত সর্ব্বাধিকারী এই

উত্তর করিলেন, 'আমার স্বগ্রামস্থ জমিদারী লইতে প্রথমাবধি অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু তুমি আমার সাক্ষাৎ ও ব্রাহ্মণ। তুমি যখন বলিতেছ, তখন ইহা তোমারই হইবে'। নিয়মিত দিনে নিলামের সময়ে রায় মহাশয় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। রামনারায়ণ উক্ত বন্ধুর নামে উক্ত জমিদারী ক্রয় করেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করান। তিনি ইহার মূল্য শুনিয়া বসিয়া পড়েন। 'এত টাকা কোথায় পাইব, তবে তুমিই লও' এই কথা বলেন। রামনারায়ণ তাঁহাকে কহেন 'তুমি যখন ইহা লইবে বলিয়াছিলে, তখন আমি ইহা কিছুতেই লইব না; তুমি এখন ইহা লও; তোমার হস্তে যখন অর্থ আসিবে, তখন আমায় ইহার মূল্য দিও'।

এই ইতিহাস হইতে রামমোহনের জন্মস্থানের নাম সম্বন্ধে অবশিষ্ট সন্দেহ তিরোহিত হওয়া উচিত। সেই গ্রামের নাম—"রাধানগর", "রঘুনাথপুর" নয়। এসম্বন্ধে সম্প্রতি সংবাদপত্রে বাক্-বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে; Civilian O'Malley সাহেব সম্পাদিত ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার অফ বেঙ্গলে, ভ্রমসঙ্কুল বিবরণ হইতেই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি। O'Malley সাহেব লিখিয়াছেন—Radhanagar or Raghunathpur immediately north of (Khanakul) Krishnanagore was the home of Raja Ram-mohan Roy, the well-known reformer and founder of the Brahmo Samaj. It is now the property of his grandson *Raja* Piyarimohan Ray.

রাধানগর আমার স্বগ্রাম; দ্বারকেশ্বর বা কানা নদীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত। রঘুনাথপুর গ্রাম দ্বারকেশ্বরের পশ্চিম পারে অবস্থিত। রামমোহনের জন্মের বহু পরে তাঁহার পিতা লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে উঠিয়া যান এবং তাহার বহু পরে রামমোহন রঘুনাথপুর গ্রামে স্বয়ং স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করেন। রঘুনাথপুরেই রামমোহনের বংশধরগণের আবাসস্থান। O'malley সাহেব উল্লিখিত "রাজা" প্যারীমোহন রায় বলিয়া কোন ব্যক্তি কোন কালে ছিলেন না। রামমোহনের পৌত্র রমাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু প্যারীমোহন রায় কখনও রাজোপাধি লাভ করেন নাই। Civilian O'Malley সাহেব হয়ত স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের ইণ্ডিয়ান গেজেটীয়ারের প্রথম সংস্করণ অবলম্বন করিয়া ভ্রমক্রমে উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং রঘুনাথপুরের জমিদার বাবু প্যারীমোহন রায়ের মধ্যে গোলযোগ করিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। বাবু প্যারীমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর বাবু হরিমোহন রায় আমোদপ্রিয়, খামখেয়ালী অথচ উদার-প্রকৃতি যুবক ছিলেন। আলু পটলের ব্যবসা, যাত্রাদলের ব্যবসা প্রভৃতি কোন ব্যবসাই তাঁহার বাদ পড়িত না। বর্ষার দিনে জলপ্লাবিত আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নৌকারোহণে তিনি সারি-গান গাহিতেন। তিনি কৌতুকবশে সর্ব্বদা একটা কথা বলিতেন:—রামমোহনের পুত্র হওয়া উচিত ছিল দেবেন্দ্রনাথ আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র হওয়া উচিত ছিল রমাপ্রসাদ। বিধাতার এইরূপ একটা গোড়ার গলদেই আমাদের গলদ হইয়াছে। হরিমোহনের ধর্ম্মপ্রাণা বিধবা পত্নী খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলের জনহিতকর নানা ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তিনি দেশের 'বড়-মা", বংশে রামমোহনের ধর্ম্ম-প্রবণতা ও পরার্থ চেষ্টা এই মহীয়সী রমণী রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কতদূর কি হইবে ভগবান জানেন। রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে যে অজস্র সাহিত্য-সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে "wee-diddle-dee এবং "wee-diddle-dum"-এর পার্থক্যবিস্তারের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। রামমোহনের মাথার ও পাগড়ীর পরিধি কত ছিল, সে বিষয়ে অনেক গবেষণা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে গবেষণা চলিতেছে, তাহার মুসলমানীকে শৈব-মতে বিবাহ সম্বন্ধে এবং তদ্‌গর্ভজাত পুত্র সম্বন্ধে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে, এবং হুগলী জেলা কোর্টে মামলা মোকদ্দমায় দলিলের দোষ, সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োগ প্রভৃতি দোষ এবং গ্রামস্থ প্রতিবেশিগণের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ মামলা মোকদ্দমা সম্বন্ধে—আরও গবেষণা চলিয়াছে, তাঁহার তিব্বতভ্রমণের কাল্পনিকতা সম্বন্ধে, রাজসেবা সময়ে গুণাগুণ সম্বন্ধে এবং তদানুসঙ্গিক অনেক প্রসঙ্গে এতদ্ব্যতীত

গবেষণা জয়যুক্ত হউক, তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু রামমোহনের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মানব মাত্রেই অপূর্ণ। মহামানব এবং অতিমানবও সেই নিয়ম অতিক্রম করিতে পারেন না ; কারণ তাঁহারা মানব।

আমাদিগকে দেখিতে হইবে—রামমোহন হইতে কি পাইয়াছি, যাহা পূর্ব্বে পাই নাই। তাঁহার এই শ্রেষ্ঠ দানই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। ইতিহাস তাহার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছে এবং দিবে। গবেষণা মুখে যে সকল ভ্রম সংশোধন হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা গ্রহণীয় এবং সম্মানযোগ্য, কিন্তু তাহাতে বিরাট্ কীর্ত্তির ভাতি ম্লান হওয়া অসম্ভব।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুর সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, রঙ্গপুর তাহার অন্যতম। সেই জন্য বাংলা-সরকার-দপ্তরে কাগজপত্র হইতে রাজার কর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; অতএব তাহার এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তাহার পর সরকারী কাগজপত্র, আদালতের কাগজপত্র সূক্ষ্মতর রূপে সন্ধান আরম্ভ হয়। কৃতী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ও গবেষণাকারিগণ ছোট বড় অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

গবেষণার মুখে রাজার সতীদাহ সম্বন্ধে কীর্ত্তির পরিমাণ কিছু কমিয়াছে, সে কথা পরে বলিব। সতীদাহ সম্বন্ধে রাজা যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাহাতেই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে "প্রবর্ত্তক" এই কথাটার প্রথম প্রয়োগ ও ব্যবহার দেখিতে পাই। ইহা রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত কথা ও আখ্যা ; অতএব প্রবর্ত্তক-পত্রের-পরিচালক-গণের পক্ষে ইহা সুসংবাদ—কিন্তু উক্ত-পুস্তিকায় যে ভাবে ও উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তক কথার ব্যবহার হইয়াছে, তাহা সুখকর নহে। 'প্রবর্ত্তক' উক্ত পুস্তিকায় বোধহয় সতীদাহের সপক্ষে উক্তি ও যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন ; আর 'নিবর্ত্তক' তাহার বিরুদ্ধ ও বিপরীত মত পোষণ করিতেছেন। এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর অবলম্বনে রাজা নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আইন সাহায্যে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার মতাবলম্বী হিন্দুগণের সহায়তায় সতীদাহ প্রথা ১৮২৯ সালে নিষেধ করেন। ঘোর আন্দোলন ও আপত্তি নিবারণকল্পে তিনি আপত্তিকারিগণকে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিতে বলেন। ১৮৩০ সালে আপিল নামঞ্জুর হয় এবং বিধিবদ্ধ আইন বজায় থাকে। একদিনে এ প্রথা নিষেধ হয় নাই, বহুদিনব্যাপী আপত্তি ও আন্দোলনের ফলে তাহা হইয়াছিল, লর্ড ওয়েলেস্‌লী ১৮০৫ সালে তদানীন্তন নিজামত আদালতে জজদিগকে সতীদাহের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কারণ হিন্দু-শাস্ত্রের মর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের মত না লইয়া সহমরণ প্রথা নিষেধ করা তাঁহার সঙ্কল্প ছিল না। আদালতে পণ্ডিতগণের মত লইয়া জজেরা গভর্ণর জেনারেলকে জানান যে পণ্ডিতেরা তাহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। নিজামত আদালত কলিকাতা সহরের ভিতর সহমরণপ্রথা নিষেধ করেন কিন্তু তাহাতে সহরের বাহিরে যাইয়া সতীদাহ প্রথার প্রাবল্য তিরোহিত হয় নাই। অতএব কর্ত্তৃপক্ষেরা পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে আদেশ করেন যে, সহরের লোককে বুঝাইয়া শুঝাইয়া যেন, এ প্রথা নিবারণের চেষ্টা হয়। নিবারণচেষ্টা কল্পে ১৮০৫ হইতে ১৮২৯ সাল পর্য্যন্ত তুমুল আন্দোলন চলে। রাজা রামমোহন সে আন্দোলনের অগ্রণী ; একদিনে মুখের কথায় আন্দোলন কৃতকার্য্য হয় না—ইহাতে বিচিত্র কি ?

আজ ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক বহু সমস্যা সম্বন্ধে বহু আন্দোলনের ফলেও ভারতে জাতীয় জীবন সম্বন্ধে এমন একটা কথাও উঠে নাই, বোধহয় উঠিতেও পারে না, যাহা রামমোহন তোলেন নাই এবং যাহার সম্বন্ধে বিশদ ব্যবস্থার তিনি চেষ্টা করেন নাই।

রামমোহন-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন ত্রিধারায় বিভক্ত —আদি ব্রাহ্ম সমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। ইহাদের মধ্যে কোন সমাজে রামমোহনের কত দূর প্রতিপত্তি তাহা বাহির হইতে সকল সময়ে ঠিক বোঝা যায় না। কোন কোন সমাজের কোন কোন

সভ্য অবজ্ঞার কথা বলিতে ত্রুটি করেন না, কোন কোন সমাজের ট্রাষ্টীগণও ব্রাহ্ম কি অ-ব্রাহ্ম তাহা বুঝা যায় না। পরম দুঃখের বিষয় হইলেও, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

রামমোহন সকলের—রাধানগরের রামমোহন, হুগলী জেলার রামমোহন, বাংলার রামমোহন, ভারতবর্ষের রামমোহন—সমগ্র ভারতে সকল শ্রেণীর নিকট পূজার্হ এবং পূজিত। সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিতেছে। ইউরোপগমন সময়ে কেপ-কলোনী অবস্থান কালে ফ্রান্সের স্বাধীনতাসূচক বিজয়-বৈজয়ন্তীকে অভিবাদন করিতে গিয়া তাঁহার পদস্খলন হয় এবং পা ভাঙ্গিয়া যায়, সে কথা দক্ষিণ আফ্রিকা এখনও মনে রাখিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান কালে সে কথা আমি সেখানে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শুনিয়াছিলাম। তাই চেষ্টা করিয়া সেখানেও এই শতবার্ষিকউৎসব আয়োজনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, সকল সভ্য-জাতির আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারার কেন্দ্রস্থল জেনেভা নগরে রাজার অমর কীর্ত্তি বিঘোষিত হউক এবং তথায় উপযুক্ত কীর্ত্তির নিদর্শন সংস্থাপিত হউক। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 'লিটন-কমিটী'র সদস্যরূপে যখন ব্রিষ্টল নগরে গিয়াছিলাম, তখন নগরের উপকণ্ঠে 'Stapleton-Grove' (ষ্টেপ্‌ল্‌টন্ গ্রোভ্) নামক রাজার শেষ আবাসগৃহের উদ্যানস্থ চেষ্ট-নাট্ (Chest-nut) গাছের তলার ক্ষণকাল বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলাম। সেই স্থানেই রাজার প্রথম সমাধি হয়; সেখানে একখানা পাথরমাত্র পড়িয়া ছিল, অন্য কোন স্মরণ-চিহ্ন ছিল না। এখন কি হইয়াছে জানি না, সেই বিমূঢ় অবস্থাতেই অদূরে Arno's Vale (আর্ণোজ ভেল্) নামক রম্য সমাধিক্ষেত্রে গিয়া রাজার শেষ সমাধিস্থান দেখিলাম, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যয়ে ও চেষ্টায় সংস্কার সত্ত্বেও সে সমাধি এখন ভগ্নপ্রায়। প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, কেপ্‌টন্, জেনাভা, ব্রিষ্টল নগরে রাজার উপযুক্ত স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত হউক; প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রধান ধর্ম্মচর্চ্চা-কেন্দ্রে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রাজার যশ ও কীর্ত্তি বর্ত্তমান সমাজের মঙ্গলার্থে বিঘোষিত হউক। মনের আশা মনেই রহিয়া গেল; অর্থাভাবে ও আভ্যন্তরীণ বাগ্‌বিতণ্ডার ফলে কোন প্রস্তাবই বিশেষভাবে কার্য্যে পরিণত হইল না।

তাহাতেই বা আসিয়া যায় কি! আমাদের কাজ আমরাই করিলাম না। আমরাই হঠিলাম, আমরাই ঠকিলাম। ডক্টর সেলর ম্যাথুসের কথায় রাজার স্থান উর্দ্ধে—বহু উর্দ্ধে।
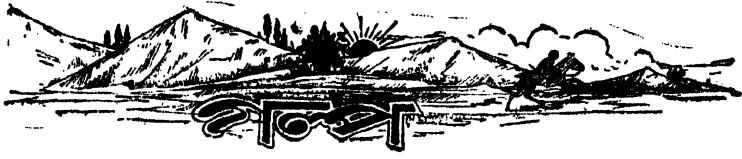
হলাহল

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বিজয়ার কয়দিন পরেই। ছাদের উপর একেলা চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম।

দুপুরে ঘটা করিয়া মেঘ উঠিয়াছিল। গর্জ্জন শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, এক পশলা বৃষ্টি হইবে বুঝি। কয়দিন হইতে যা গুমট পড়িয়াছে এক পশলা বৃষ্টি হওয়া দরকারও। কিন্তু দেখিতে দেখিতে কোথায় বা গেল মেঘের ঘটা, কোথা বা গেল গর্জ্জন! মেঘ কাটিয়া গেল। এখন তো চমৎকার চাঁদ উঠিয়াছে। উঠিয়াছে বটে, কিন্তু গুমট কাটে নাই।

অকস্মাৎ এক ঝলক হাওয়া গায়ে লাগিল। দেহ যেন জুড়াইয়া গেল। মন আপনা-আপনি গাহিয়া উঠিল—বায়ু বহে পুরবৈঞা।

বায়ু পুরবৈঞা বহে নাই। বহিয়াছিল পশ্চিম দিক্ হইতে। তবু অনেকক্ষণের পর হাওয়া বহিলেই ওই গানটিই মনে পড়ে। দক্ষিণ সমীরণের সম্বন্ধেও গানের অভাব নাই বটে, কিন্তু পূবে হাওয়ার কথা তারও আগে মনে আসে। কেন আসে বলিতে পারিব না। বোধ করি মনে-মনে আমরা সবাই সারাক্ষণই বিরহী—প্রিয়া কাছে থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি। যা পাইয়াছি, তারও চেয়ে বেশী আমরা চাই। যা পাওয়ার নয়, তারই তরে যত আমাদের হাহাকার।

বায়ু বহে পুরবৈঞা···

কিন্তু পূবালী বায়ুকে ভালো করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবার অবসর পাইলাম না। নারীকণ্ঠের শীর্ণ, তীব্র আর্ত্তনাদ একবার উঠিয়াই থামিয়া গেল। থামিয়া গেল কি? না, এখনও গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে, বাহির হওয়ার পথ পাইতেছে না?

মনটা অকস্মাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মাথার উপরে নিমেঘ আকাশে শরতের চাঁদ অপূর্ব্ব যাদু বিস্তার করিয়াছিল। আমার ছাদের আলিসায় টবে-টবে যে ফুল ফুটিয়াছিল তাহার গন্ধ ভুর্ ভুর্ করিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। বহুক্ষণের পরে এখন মৃদু-মন্দ বাতাসও বহিতেছে। আমি গাহিতেছিলাম, বায়ু বহে পুরবৈঞা ···অকস্মাৎ নারী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ! আমি আচ্ছন্নের মতো বসিয়া রহিলাম।

সেই মুহূর্ত্তেই সিঁড়িতে অনেকগুলি পায়ের দুপ্ দাপ্ শব্দ হইল। আমি ব্যস্ত হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

—কি, কি, কি হয়েছে?

আগে আসিতেছিল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কমল, তার পিছনেই তার বোন নির্ম্মলা এবং সব শেষে অমল। সে তো একেবারে মালসাট মারিয়াছে।

একসঙ্গে সবাই চীৎকার করিয়া উঠিল—শীগ্‌গির আসুন, এতক্ষণ বোধ হয় মেরেই ফেলেছে।

মেরেই ফেলেছে! দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। সকলে পাশ কাটাইয়া আমাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

সিঁড়ির মুখেই বৌদি দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর একটু ওদিকে রেলিঙে ভর দিয়া আমার স্ত্রী অস্থিরভাবে মেঝেয় পা ঠুকিতেছিলেন। একবার তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলাম।

—ঠাকুরপো, হয় ওদের এবাড়ী থেকে তাড়াও, নয় আমরাই এ বাড়ী ছেড়ে দিই। রোজ রোজ এ চীৎকার আর সওয়া যায় না।

আমার মগজের মধ্যে পূর্ববৈঞ্চা বায়ু তখনও কুণ্ডলী পাকাইতেছিল। ছুটিতে ছুটিতে নামিয়া আসিতেছিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপারটি তখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বৌদির কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে চিররুগ্ন বলিলেই হয়। সেই জন্যই বোধ হয় তাহার তেজও বেশী। আমার পাশে দাঁড়াইয়া সে তখনও গর্জ্জাইতেছি—মেরেই ফেল্‌ব, ব্যাটাকে আজ মেরেই ফেল্‌ব।

আমার উত্তেজনা কিন্তু দ্রুতবেগে কমিয়া আসিতেছিল। হতাশভাবে বলিলাম—কিন্তু আমরা এর কি করতে পারি বলুন। ওঁর স্ত্রী, উনি, যদি···

—উনি যদি মেরেই ফেলবেন?

—তা আমরা কি করব?

—কি করবে? ওকে থামে বেঁধে আপাদমস্তক চাব্‌কাবে। হতভাগার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? ভদ্রলোক! চোয়াড় কোথাকার!

সত্যই। আমিও আর পারিতেছিলাম না।

দাদার যত বয়স বাড়িতেছে ততই নজর নীচু হইতেছে। এত বড় বাড়ীতে আমরা থাকি সে যেন কিছুতেই ওঁর সহ্য হইতেছিল না। একদিন দেখি রাজমিস্ত্রী আনিয়া দেওয়াল গাঁথিয়া আমাদের পিছনের অংশটা পৃথক্ করিয়া দিলেন। এবং তার কয়দিন পরেই ওই ভদ্রলোক সস্ত্রীক আসিয়া ওই বাড়ীতে উঠিলেন। কি? না নূতন ভাড়াটে।

ভাবিতে ভাবিতে নীচে গেলাম, আজ রাত্রিটা যাক্। কাল ইহার বিহিত করিব।

কিন্তু পরদিন সকালে আমি কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আপন মনে বাহিরের ঘরে একখানা বই পড়িতেছি, এমন সময় ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা কমই হয়। দুই একদিন মাত্র দেখিয়াছি। আলাপ কোনোদিন হয় নাই। অপরিচিত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া চাহিতেই চিনিতে পারিলাম —ও, হ্যাঁ। একবার ডেকেই পাঠিয়েছিলাম বটে। বলুন।

ভদ্রলোক একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

কিন্তু কি করিয়া যে কথাটা পাড়িব, ভাবিয়া পাইলাম না। অকারণে বইখানির পাতাগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম। আরও মুস্কিলে পড়িলাম, তাঁর মুখের পানে চাহিয়া। এমন বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ী চেহারা কচিৎ চোখে পড়ে। দেহ স্থূল নয়, বরং শীর্ণ। চক্ষু দুইটিও বৈষ্ণবের মতো ভাসা ভাসা নয়, বরং কোটর-প্রবিষ্ট। কিন্তু ভদ্রলোক এত নম্র যে, চোখ তুলিয়া কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারেন না। আর ঠোঁটের কোণে হাসি লাগিয়াই আছে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, যাহার প্রহারের চোটে স্ত্রী আর্ত্তনাদে গগণ বিদীর্ণ করে তাহার কণ্ঠস্বর যে এত মধুর, একথা আমি অত্যন্ত ভাবিতে পারি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, লোকটিকে আগে যদি না দেখিতাম, তাহা হইলে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভুল লোককে ডাকিয়া আনিয়াছে বলিয়া লজ্জিত হইতাম।

যাই হোক, কথাটা পাড়িতেই হইল। অন্দরের দিকের বারান্দায় পর্দ্দার অন্তরালে শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরা পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা ঘরে বসিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

কথাটা পাড়িলাম বটে, কিন্তু এই ভাবে :

—দেখুন···অবশ্য আপনার পারিবারিক ব্যাপারে আমার কথা বলা ঠিক নয়···কিন্তু···ক্রমেই ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে···(একবার ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া দেখিলাম)···মানে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি··· বুঝলেন না?

ভদ্রলোক কথাটা বুঝিলেন। নতমুখে বসিয়া একটুক্ষণ কি যেন ভাবিলেন। একবার কৈফিৎস্বরূপ কি যেন বলিবার জন্য মুখ তুলিলেন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বলিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আমি আবার কহিলাম—আজকে মাসের দশ তারিখ।

এখনও কুড়ি দিন আপনি সময় পাচ্ছেন। এর মধ্যে বাসা একটা খুব দেখে নিতে পারবেন।

ভদ্রলোক অস্থিরভাবে রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া বলিলেন—হ্যাঁ তা পার্‌ব। আমার নিজেরও এখান থেকে কোর্টে যাওয়া দূর পড়ে। এ বাসাটা সেজন্য বদলাতে হ'তই। একটা বাসাও দেখে রেখেছি। কেবল... ..

ভদ্রলোক কি একটা কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন এবং অকারণেই কোঁচার খুঁট দিয়া চশমা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

আমি কহিলাম—সে বাড়ীর কি কোনো অসুবিধা আছে।

—অসুবিধা? নাঃ, কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। দিব্যি বাড়ী।

—তাহ'লে সেই বাড়ীতেই তো উঠে যেতে পারেন।

—পারি। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে······আমার স্ত্রীকে নিয়ে। তিনি······

হয়তো তাঁহার স্ত্রীর আপত্তি আছে। বোধ হয় এমন নির্জ্জনে বাড়ী যেখানে তাঁহাকে খুন করিয়া ফেলিলেও কেহ রক্ষা করিতে আসিবে না। স্বামী যাঁহার এত বড় পাষণ্ড, তাঁহার লোকালয় ছাড়িয়া দূরে যাইতে ভরসা হওয়ার কথা নয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার স্ত্রীর আপত্তিটা কি?

—আজ্ঞে না। তাঁরও আপত্তি নেই। কি জানেন, পূর্ণ অন্তঃসত্বা অবস্থায় তাঁকে অন্য বাসায় নিয়ে যেতে আমিও সাহস পাচ্ছিলাম না। তাই ভেবেছিলাম...তা হোক। এমনই বা কি অসুবিধা। বৌবাজার আর এমনই বা কি দূর? কি বলেন।

কিছুই বলিলাম না। দ্বারের পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হইতে এক ঝলক হাওয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আর দ্বারান্তরাল হইতে মেয়েদের চাপা কণ্ঠের অস্ফুট হাস্যধ্বনি।

ভদ্রলোকের কথা বলিবার ভঙ্গীটি চমৎকার। প্রত্যেক কথার মধ্যে কেমন একটা আত্মীয়তাস্থাপনের প্রয়াস আছে। প্রয়াসই বটে, কিন্তু বোধ হয় অভ্যাসের ফলে সহজ হইয়া আসিয়াছে। এখন আর চোখে পড়ে না।

বলিলাম—দেখুন, আপনাকে যে যেতেই হবে এমন কথা বলছিলেন। বিশেষ এই রকম অবস্থায়। তবে এখানে যদি থাকতে হয়, একটু শান্তভাবে থাকতে হবে। ওরকম গোলযোগ···

ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে বলিলেন—শান্তভাবে? ও কি আমাকে শান্তভাবে থাকতে দেবে, ভেবেছেন? ও চায় ওকে খুন করে আমি ফাঁসী যাই। বিশ্বাস হচ্ছে না? না হ'লে আর কি করব? কিন্তু এ সত্যি কথা। কি দুঃখে যে ওর গায়ে হাত তুলতে হয় সে আমিই জানি।

বাহিরে আবার একবার চাপাকণ্ঠে হাস্যধ্বনি উঠিল। আমিও না হাসিয়া পারিলাম না।

বলিলাম—যাক্ গে।

উত্তেজিতভাবে হাত নাড়িয়া ভদ্রলোক বলিলেন—না, যাবেই বা কেন? এক পক্ষের চীৎকার শুনেই আপনারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে বসে আছেন। আমার পক্ষের কথাটা শুনুন, তাহলে বুঝবেন ব্যাপারটা কি।

ভদ্রলোক যাহা বলিতে লাগিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার অব্যবহিত পরেই তাহার বিবাহ হয়। তখন তাহার বয়স ষোলো, এবং তাহার স্ত্রীর আট কি নয়। বর্ত্তমান কালে এমন অঘটন এদিকে ঘটে না, কিন্তু যে অঞ্চলে তাহার বাড়ী, সেখানে এখনও এরূপ বাল্যবিবাহ হামেশাই হইতেছে। তবে বরপণের ঠেলায় ক্রমেই অল্পবয়সে মেয়ের বিবাহ দেওয়া পিতার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠিতেছে। এই দিক্ দিয়া সমাজ-গঠনে বরপণের দান স্বীকার করিতে হইবে।

দু'জনেই তখন ছেলেমানুষ। তাহার যদিও বা কিছু লজ্জা-সঙ্কোচ ছিল, বধূর একেবারেই সে বালাই ছিল না। বাপ-মা সকলেই বসিয়া আছেন, তাহাদের সামনেই হয়তো কাঁচা পেয়ারা কচ্‌মচ করিয়া চিবাইতে চিবাইতে বধূ আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল—শোনো।

মায়ের জন্য ততটা নয়, কিন্তু বাবাকে তাহার অত্যন্ত

ভয়। বধূর আহ্বান সে শুনিয়াও শুনিল না। কিন্তু তাহাতেই কি নিস্তার আছে? তাহার একটা হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বধূ ঝঙ্কার দিয়া বলিল—শুনতে পাচ্ছ না? কালা না কি?

তখনি তাহার একটা আঙুল ধরিয়া টানিয়া অত্যন্ত কোমল সুরে অনুনয় করিল—চল না। কী চমৎকার যে একটি পেয়ারা পেকেছে! পেড়ে দেবে এসো না।

সে ঝাঁকি দিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া পালাইয়া বাঁচিত। কিন্তু বধূর লজ্জা নাই। স্বামীর পিছনে সেও ছুটিত। আঁচল লুটাইয়া মাটিতে পড়িয়াছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

দু'জনে দিনরাত্রি খিটিমিটি, দিনরাত্রি ঝগড়া। নির্লজ্জতা সম্বন্ধে স্ত্রীকে কত উপদেশ দিত। কিন্তু কে কাহার কথা শোনে! হয়তো হঠাৎ এক সময়ে এক গলা ঘোমটা টানিয়া দিল। তাহার পরম গম্ভীর পিতা পর্য্যন্ত সে দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিতেন। আবার হয়তো কোথায় বা স্বামী, কোথায় বা শ্বশুর! বাড়ীর ছেলেগুলার সঙ্গে চাঁদের আলোয় উঠানময় ঘুরপাক খাইতেছে। সে কী সুতীক্ষ্ণ হাসির লহর।

কিন্তু তারপরে একদিন এই দুরন্তপণাও কোথায় অন্তর্হিত হইল। চরণের সে চঞ্চলতাও রহিল না, অকারণ উচ্চ হাসির লহরও আর রহিল না। শত শাসনেও যাহা হয় নাই, ধীরে ধীরে সেই সকল দুরন্তপণা কবে যে বন্ধ হইয়া গেল, কেহ টেরও পাইল না। শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা সে কোনোদিনই টানিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাহার উন্মুক্ত মুখে এমন একটি সহজ স্নিগ্ধতা ফুটিয়া উঠিল যাহার পরে আর তাহার উপর নির্লজ্জতার অপবাদ দেওয়া চলিত না।

এমনি চলিল বহুদিন। কিন্তু এত সুখ তাহাদের অদৃষ্টে সহিল না। আজ তাহাদের কলহের চোটে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কলিকাতা শহরে তাহারা আজ নূতন আসে নাই। যখন যে পাড়ায় ছিল, সে পাড়ার মেয়েরা হয়তো এখনও তাহার স্ত্রীর সুমধুর ব্যবহার মনে-মনে স্মরণ করে।

কিন্তু সুখ কি সকলের অদৃষ্টে বেশীদিন সয়? তাহাদেরও সহিল না। তিনদিনের জ্বরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র একদিন অকস্মাৎ তাহাদের সকলকে ছাড়িয়া গেল। তখন তাহার বয়স দুই বৎসর। তাহার মৃত্যুর পর তিনমাস স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না।

এই মৃত্যুরও ইতিহাস আছে। ছোট, কিন্তু মর্ম্মান্তিক।

কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাদের একটি নূতন উড়িয়া ঠাকুর নিযুক্ত হইয়াছিল। দেখিতে নিতান্ত বাচ্চা, কিন্তু মেঘে-মেঘে বোধকরি বেলা হইয়াছিল। তাহা বোঝা যায় তাহার পাকা-পাকা কথায় এবং রন্ধননৈপুণ্যে। সে যাহাই হউক, কতকটা বয়স অল্প বলিয়া এবং কতকটা এত অল্প বয়সে পেটের দায়ে চাকুরী করিতে সুদূর বিদেশে আসিতে হইয়াছে বলিয়া তাহার উপর ইহাদের স্বামী-স্ত্রী দুইজনেরই স্নেহ পড়িয়াছিল যথেষ্ট। কিন্তু স্নেহ ও বিশ্বাসের মর্য্যাদা সকলে রাখিতে পারে না। এই ব্রাহ্মণবটুও পারিল না। ধীরে ধীরে তাহার কথা ফুটিল। গৃহকর্ত্তার অসাক্ষাতে মাঝে-মাঝে গৃহিণীর কথার মুখে-মুখে উত্তর দিতে লাগিল। গৃহিণী ছোট ছেলের মুখে পাকা পাকা কথা শুনিয়া কখনও হাসিত, কখনও ধমক দিত।

কিন্তু একদিন হঠাৎ গৃহকর্ত্তার সুমুখে পড়িয়া উড়িয়া ঠাকুরের আর লাঞ্ছনার শেষ রহিল না। ভদ্রলোকের অনুমান, খোকাকে লইয়াই কিছু একটা কাণ্ড অব্যবহিত পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিবে। সে আফিস হইতে ফিরিয়া তাহার ঘরে আসিবার সময়ে শুনিতে পাইল, ঠাকুর যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিয়া মায়ের উপর পুত্রের অন্যায় আচরণের শোধ তুলিতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এমনিতেই তাহার শরীর ও মন তাতিয়া ছিল, সে আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। সে তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। অতঃপর তাহার থামিয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটা চড় মারিতেই কোথা হইতে রাজ্যের ক্রোধ আসিয়া তাহার বুদ্ধি ও স্থৈর্য্যকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না—পাগলের মতো ঠাকুরটার সর্ব্বাঙ্গে কিল ও ঘুসি, চালাইতে লাগিল।

অবশেষে তাহাকে লাথি মারিয়া সিঁড়ি হইতে নীচে ফেলিয়া দিল।

ঠাকুরটা যদি বয়স্ক হইত তাহা হইলে এত বড় প্রহারের পর নিঃশব্দে পলায়ন করিত। কিন্তু সে নিতান্তই বাচ্চা, এবং অল্প বয়সে পাকিয়া গিয়াছে। পলায়ন অবশ্য সে করিল। কিন্তু এমন সকাতরে ভগবানের কাছে তাহার শিশু পুত্রের মৃত্যুকামনা করিতে করিতে পলাইল যে ঘরে বসিয়া তাহার স্ত্রী শিহরিয়া উঠিল। স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—ওগো, ওকে শীগ্‌গির ফিরিয়ে নিয়ে এসো। শুনচ না, আমার খোকনকে কি অভিশাপ দিতে দিতে যাচ্ছে!

ভদ্রলোক তখনও রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

একবার বলিল—হুঁঃ! অভিশাপ!

তারপর নিঃশব্দে কাছারীর পোযাক ছাড়িতে লাগিল।

সদর দরজার বাহিরে কে যেন তখনও গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল। বধূ তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। সদর দরজা একটুখানি ফাঁক করিয়া দেখিল, ঠাকুরই বটে। তাহার দুই চোখে দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। রাগে সে থাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। একটা অস্ফুট স্বর মাত্র কণ্ঠ দিয়া বাহির হইতেছে। তখনও সে চলিয়া যায় না। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দরজার দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু বধূ দরজা ফাঁক করিতেই সে একবার চমকিয়া উঠিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, আর দেখা গেল না। বাহিরের বারান্দার এক কোণে তাহার কাপড় শুকাইতেছিল। বোধ হয় সেইটার মমতাতেই ছেলেটা অতক্ষণ নীচে দাঁড়াইয়াছিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভদ্রলোক এমনভাবে চুপ করিলেন যে, মনে হইল গল্পের এই শেষ। নিঃশব্দ কক্ষে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী, বাহিরে আরও অনেকে উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে তাহাও এখান হইতে অনুভব করিতেছি। কিন্তু ভদ্রলোক আর কথা কহে না। তাহার ঘাড়টা নীচের দিকে এমনভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, যেন গ্রন্থীগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে।

আমি একবার কাশিলাম।

ভদ্রলোক চমকিয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

গলাটা একবার ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি অভিশাপ বিশ্বাস করেন?

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, করি না।

—করেন না?—বলিয়া ভদ্রলোক এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল, যে আমি ভয় পাইয়া গেলাম। চোখের তারা আমার মুখের উপর নিবদ্ধ, কিন্তু দৃষ্টি আমাকে অতিক্রম করিয়া কোন্ দূর রহস্যলোকে চলিয়া গিয়াছে।

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে কহিল—কিন্তু আমার খোকনের মৃত্যুক্ষণে সেই অভিশাপ আমি স্পষ্ট শুনেছি। আমি শুনেছি, আমার স্ত্রীও শুনেছেন। এ কি মিথ্যে?

প্রত্যুত্তরে আমি বলিতে যাইতেছিলাম, সবই আপনাদের মনের ভুল। কিন্তু অনর্থক কথা বাড়াইবার ইচ্ছা হইল না। চুপ করিয়া গেলাম।

ভদ্রলোক আপন মনেই বলিলেন—তাই হবে। মিথ্যেই হবে। কিন্তু তারপর শুনুন:

অতঃপর সামান্য কারণেই দুজনে ঠোকাঠুকি বাধিতে লাগিল।

ভদ্রলোকের বিশ্বাস, পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তাহার স্ত্রী তাহাকেই দায়ী করিয়াছে। এবং স্বামীর এত বড় অপরাধ কিছুতে মার্জ্জনা করিতে পারিতেছে না। কিন্তু স্বভাবতঃ যে কলহপরায়ণ নয়, তাহার পক্ষে কলহ করিতেও সময় লাগে। তাহার স্ত্রীরও সময় লাগিল; কিন্তু সেও বেশী নয়।

দেখা যাইতে লাগিল, কারণে-অকারণে ভদ্রমহিলা সব সময়েই উত্তেজিত হইয়া আছে। তাহার বাক্যযন্ত্রণায় চাকর ব্যতিব্যস্ত। ক্রমেই শুধু মুখ নয়, হাতও পাকিতে লাগিল। সময়ে-অসময়ে প্রহার খাইয়া ছেলেমেয়েরা তো সশঙ্ক। প্রথম-প্রথম ভদ্রলোক এ সমস্ত দেখিয়াও দেখিত না, শুনিয়াও শুনিত না। বেশীর ভাগ সময়ে সেই

নীচের বসিবার ঘরে কাটাইত। কিছুদিন হইতেই তাহার প্র্যাক্‌টিস্ বেশ জমিয়া আসিতেছিল। মামলা-মোকদ্দমার নথিপত্র ঘাঁটিতেই যথেষ্ট সময় যাইত। তাহার উভয় পুত্রের মৃত্যুর পর তাহার কেমন একটা অবসাদ আসিয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সে কোনো ব্যাপারেই কথা কহিতে ইচ্ছা হইত না।

অনেক সময়ে দেখা যায়, একই ঘটনা বিভিন্ন মনের উপর বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করে। সাধারণতঃ নিকটতম জনের মৃত্যুতে মানুষের মন কোমল হয়। লোহার মতো শক্ত মনও শোকের আগুনে তরল হয়—অণুতে অণুতে সে বাঁধন থাকে না। ছেলে-মেয়েরা যখন ভদ্রলোকের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাদের মধ্যে আর একজনকে না দেখিয়া গভীর শূন্যতায় তাহার বুকের ভিতরটা হু-হু করিয়া উঠে। অথচ সেই একই ঘটনায় আর একজনের স্বভাবতঃ-কোমল, তরল মন যেন জমিয়া বরফ হইয়া গেল। সকলের মনের পাত্র ভরিয়া যে কেবলই অপরূপ মাধুর্য্যেই টলটল করিত, এখন সে শুধু সংঘাতের সৃষ্টি করে। এই পরিবর্ত্তনের কথা যতই ভাবে ভদ্রলোকের বিস্ময়ের ততই আর সীমা থাকে না। অথচ এও সত্য—অত্যন্ত নিষ্ঠুর-ভাবে সত্য।

ছেলেমেয়েদের নিগ্রহ দেখিয়া মাঝে-মাঝে সে জ্বলিয়া উঠিত; কিন্তু তবু স্ত্রীর রুক্ষ, নির্ম্মম দৃষ্টির সামনে কিছুতে গিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। অভিশাপের মাহাত্ম্যে তাহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। বিশেষ করিয়া ওই অশিক্ষিত, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ-শাবকের অভিশাপের যে কোনো শক্তি নাই, সে বিষয়েও তাহার সংশয় নাই। তথাপি স্ত্রীর অত্যন্ত কর্কশ, অত্যন্ত তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে পড়িলেই সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। তাহার ক্রমাগত মনে হইত, সে অপরাধী। স্ত্রীকে তাই যত দূর সম্ভব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত, এবং ছেলেদের অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন দেখিলেও গোপনে চোখের জল মুছিয়া তাহাদের অঙ্গে পরম স্নেহে হাত বুলাইয়া দিত। তবু মুখ ফুটিয়া পত্নীকে একটা কথাও বলিতে সাহস করিত না।

ভদ্রলোক বলিল—সব চেয়ে মজার কথা জানেন মশাই, আমি যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণ আপনি বাড়ীর পাশ দিয়ে দশবার যাওয়া-আসা করুন, এতটুকু সাড়াশব্দ শুনতে পাবেন না। যেই আমি বাড়ী ফিরলাম, অমনি আরম্ভ হ'ল যত গোলমাল। বড় ছেলেটার এমন ক'রে কাণ মলে দিলে যে সে চীৎকারে বাড়ী মাথায় করলে। ছোট মেয়েটা ক্ষিধেয় কেঁদে মরে গেলেও গৃহিণীর ধ্যান ভাঙবে না। এর ওপর তাঁর নিজের চীৎকার তো আছেই। এত অশান্তি কতদিন মুখ বুজে সওয়া যায় বলুন? আমিও মানুষ তো!

এত অশান্তি ভদ্রলোক বেশীদিন সহিতেও পারে নাই। সেদিন আফিসে একটা মামলা হারিয়া সে বাড়ী ফিরিল। মক্কেলও টাকা ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। আর যে কোনো দিন সে টাকা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, সে সম্ভাবনাও কম। বাড়ী ফিরিতেই সুমুখে পড়িল ছোট মেয়েটা। চারিদিকে তাহার চীনামাটির টুকরা ছড়ানো আর একদিকে একটা তেলের বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে। মেঝেতে তেল থৈ-থৈ করিতেছে। ভাগ্য ভালো, যে মেয়েটা ভাঙা চীনামাটির টুকরাগুলায় হাত দেয় নাই। সে শুধু একবার করিয়া থাবা দিয়া তেল লইতেছে আর পরমানন্দে পেটে মাখিতেছে।

এই মনোরম দৃশ্য দেখিয়া ভদ্রলোকের মনপ্রাণ অবশ্য শীতল হইয়া গেল না। কিন্তু অতটুকু ছোট মেয়েকে ধমক দিয়াই বা লাভ কি?

ভদ্রলোক শুধু বলিল—বাঃ! খুব চমৎকার কাজ পেয়েছ, দেখছি!

মেয়েটি ইহাকেই প্রশংসা মনে করিয়া তাহার একমাত্র সম্বল সুমুখের দুটি ছোট ছোট দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিন্তু বেচারী প্রাণ ভরিয়া হাসিবারও অবকাশ পাইল না। অকস্মাৎ ঝড়ের মতো উদ্দাম গতিতে তাহার মা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ওইটুকু মেয়ের কচি গালে ঠাস ঠাস করিয়া গোটা কয়েক চড় বসাইয়া দিল। ফুটফুটে মেয়ে; সঙ্গে সঙ্গে গালে আঙুলের দাগ বসিয়া গেল। মেয়েটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইল। গৃহিণীর কাণ্ডে সে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

বিরক্তভাবে বলিল—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? মেয়েটাকে মারলে কেন?

বহুদিন পরে আজ দুজনে কথা হইল। এবং সে সম্ভাষণ এইভাবে।

স্বামীর কথায় গৃহিণী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। অদ্ভুত ভঙ্গীতে চোখ পাকাইয়া বলিল—হ্যাঁ, হয়েছে মাথা খারাপ। আমি পাগল হয়েছি, ক্ষেপেছি। তোমরা এসো না কেউ আমার কাছে।

ভদ্রলোকও ঝাঁকিয়া বলিল—তুমি খবর্দ্দার কোনো-দিন ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত দেবে না।

—হাত দেব না? খুন ক'রে ফেল্‌ব আমার সাম্‌নে পড়লে। সেই হতভাগা যেখানে গেছে সব কটাকে সেখানে পাঠাব। তবে আমার নাম ·····

এই প্রথম।

সাধারণ দৃষ্টিতে এ অবশ্য কিছুই নয়। এ ঝগড়া কয়জন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয় না? হয় অবশ্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভাব হইতেও দেরী হয় না। কিন্তু এ তো তা নয়। এখানে একটি মেয়ের মন কেবলই বেঁকিয়ে আছে। তাহার বুকের মধ্যে কি হইতেছে ভগবান জানেন, কিন্তু অহর্নিশি থাকিয়া থাকিয়া অনল উদ্গীরণ করিতেছে। আর একজন ক্রমাগত মুখ বুজিয়া সহিয়া সহিয়া এখন সহিষ্ণুতার সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মন তাহার তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু এতদিনের ব্যবহার, ভদ্রপরিবারের বদ্ধমূল সংস্কার ঠেলিয়া সে তিক্ততা বাহিরে প্রকাশ হইতে পারে নাই। এইবার সেই বাঁধ ভাঙ্গিল। এখন হইতে দুজনে মুখোমুখি হইলেই কলহ বাধিতে লাগিল। সে কলহের কখনও পর্য্যাপ্ত কারণ থাকে, আবার কখনও অতি তুচ্ছ কারণে; কখনও বা সম্পূর্ণ অকারণেই বাধে।

—তোরা মর্ মর্ মর্। সে গেল আর তোরা যেতে পারিস্ না? যারা অখদ্যে তাদের মরণ হবে না তো; যম যে তাদের ভুলে থাকে!

ভদ্রলোক নেক্‌টাই বাঁধিতে বাঁধিতে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আধ মিনিট আর কোনো কথা শোনা গেল না। কেবল হাতা-বেড়ির দ্রুত নাড়াচাড়ার শব্দ।

—নিজের ছেলেমেয়ের জামাকাপড় যে দিতে পারে না, সে গলায় দড়ি দেয় না কেন? ঘেন্না পিত্তি থাকলে তো দেবে! অন্য লোক হ'লে এতদিন গলায় দড়ি দিত, কিম্বা বিষ খেত।

আবার হাতা-বেড়ি নাড়াচাড়ার শব্দ।

আগে হইলে ভদ্রলোক ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত বুলাইয়া একথা-সেকথায় জানিয়া লইত, কাহার জামা নাই, কাপড়ই বা নাই কাহার। কিন্তু দুজনে যেভাবে দিন-রাত্রি কলহ চলে, তাহাতে ছেলে মেয়েদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করে। সে আর দাঁড়াইল না। তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন ঝগড়া করিবার সময় নয়।

কিন্তু কোর্ট হইতে ফিরিয়াই সে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—ছেলেমেয়েদের জামা নেই, তা বল নি কেন?

গৃহিণী তখন কতকগুলা ছেঁড়া কাপড় শেলাই করিতেছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল।

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি আবার বল্‌ব কি? তোমার চোখ নেই? দেখতে পাও না?

—না, দেখতে পাই না। কিন্তু তোমার তো দাঁতের বাদ্যির কামাই নেই। দিনরাত্তির আমাকে যমের বাড়ী পাঠাতে পার, আর এই কথাটা বল্‌তে পার না?

—দশবার ক'রে যমের বাড়ী পাঠাই কি সাধে? তুমি না হয় চোখ-কাণের মাথা খেয়ে ব'সে আছ। আমি তো তা নেই। ছেলেমেয়েদের ছেঁড়া জামা কাপড় দেখলে আমাকে তাই লোককে যমের বাড়ী পাঠাতে হয়। তা তোমার ভয় নেই। তোমাকে যম নেবে না।

ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বলিল,—আস্পর্দ্ধা বেড়েছে, নয়?

—হ্যাঁ, বেড়েছে আস্পর্দ্ধা। চোখ রাঙ্গাচ্ছ কি, মারবে না কি?

—হ্যাঁ, মারব।

গৃহিণী একেবারে চীৎকার করিয়া বলিল,—মারো না,

মারো না দেখি, কত বড় বাপের ব্যাটা। মারো, মারো, না মারো তো তোমার বাপের দিব্যি থাকে,—গুরুর দিব্যি থাকে।

বলিয়া গৃহিণী একেবারে তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিল। ভদ্রলোক আর থাকিতে পারিল না। আজন্মের সংস্কার, শিক্ষা, সব ভুলিয়া স্ত্রীর গালে প্রচণ্ড এক চড় কষিয়া দিল। সে আঘাত সহিবার ক্ষমতা ওই অতি রুগ্ন মেয়েটির ছিল না। সে শুধু একবার 'মাগো' বলিয়া টলিতে টলিতে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। ভদ্রলোক আর একটা ঘুঁসি মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি 'মা মা' বলিয়া মায়ের বুকের উপর, মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

ভদ্রলোক আর দাঁড়াইল না। আপিসের পোষাকেই বাহির হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে গৃহিণীর জ্ঞান হইল। ছেলেমেয়েগুলি তখনও তাহাকে ঘিরিয়া কাঁদিতেছে। বহুদিন পরে সে আজ তাহাদের বুকের কাছে টানিয়া লইল। ভয়ে ও ভাবনায় তাহাদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। মায়ের বুকের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে। কিন্তু যাহার উপর এত বড় নির্য্যাতন গেল, তাহার চোখে এক ফোঁটা জল নাই। বহুক্ষণ সে পাথরের মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ হইয়া বাহিরের দূর আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর একে একে সকলকে লইয়া রন্ধন-শালায় গেল। চাকরটা অনেকক্ষণ হইল উনানে আগুন দিয়াছে।

ছেলেমেয়ে, চাকর-বাকরের সম্মুখে এত বড় একটা কাণ্ড করিয়া ভদ্রলোকের অনুতাপ ও লজ্জার অবধি ছিল না। সে বাড়ী ফিরিল অনেক রাত্রে। বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতে চাকরটা উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরের আলোটাও জ্বালিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভদ্রলোক নিষেধ করিল। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাহিরের ঘরের সোফাটা খুঁজিয়া পাইল এবং জুতা-জামা সমেত সেইখানেই অবসন্নের মতো শুইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়েই উপরের সিঁড়ির মাথার আলোটা জ্বলিয়া উঠিল। এ আলো যে কে জ্বালিয়া দিল, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু উপরের ঘরে যাইবার মতো সাহস তার হইল না। চাকরটা খাবারের কথা বলিতেই সে শুধু বলিল,—খাবার আন্‌তে হবে না। শুধু এক গ্লাস জল রেখে যা'।

কিন্তু মানুষের জীবনে লজ্জা ও অনুতাপের আয়ুঃ অতি স্বল্প। ইহাদের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দেখিতে দেখিতে একজনের জিহ্বা ও আর একজনের হাত বেশ পাকিয়া উঠিল। এখন গৃহিণী কথায়-কথায় স্বামীর উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মুখে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে। স্বামীর প্রহারে স্তব্ধ হইয়া সে বসিয়া থাকে না, তারস্বরে চীৎকার করিয়া চারিদিকের প্রতিবেশীর কানে খবরটা পৌঁছাইয়া দেয়। ছেলেমেয়ে ও চাকরের সম্মুখে স্ত্রীর সঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়া স্বামীও এখন লজ্জিত হয় না। এবং ছেলেমেয়েগুলিও এমনি তৈরী হইয়া গিয়াছে যে, এত বড় কাণ্ডেও তাহাদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা পরম নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত মনে আপন আপন কাজ করিয়া যায়, যেন কাণ্ডটা তাহাদের বাড়ীতে হইতেছে না, হইতেছে কোনো অপরিচিত দূর প্রতিবেশীর গৃহে।

সকলেরই সহিয়া গিয়াছে, সহিতেছে না কেবল আমাদের এবং আমাদের মতো আরও যাহারা এই বাড়ীটির চারিদিকে বাস করিতেছে।

আসামী যেমন করিয়া রায়ের জন্য বিচারকের মুখের দিকে করুণ-নেত্রে চাহিয়া থাকে, ভদ্রলোক কথা শেষ করিয়া তেমনি ভাবে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেখানে বোধ করি একটি বিষণ্ণ ম্লান ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক ধীরে ধীরে কহিল,—দোষ আমার নেই, এমন কথা আমি বলি না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু ওই যে বল্‌লাম, কত বড় দুঃখে যে স্ত্রীর গায়ে হাত দিই সে কথা ত সবাই বুঝবে না।

হয়তো বুঝিবে না। আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি, আমাদের নীতিশাস্ত্র নর-নারীর জীবন-যাত্রার রাজপথ নানা অনু-

শাসন দিয়া একেবারে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহার বাহিরে কেহ একটি পা' বাড়াইলে আমরা কোনো মতে সহ্য করি না। এবং যে লোক বাহিরের কণ্টকাকীর্ণ কুপথে পা বাড়াইল সে যে কত বড় দুঃখে এ কাজ করিতে বাধ্য হইল, তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করি না। জানি, একটু পরে আমারই ঘরে আমার লাঞ্ছনার শেষ থাকিবে না। কিন্তু তবু ভদ্রলোককে এ কথা বলিবার মতো সৎসাহস কিছুতে সংগ্রহ করিতে পারিলাম না যে,—তোমাকে আগামী মাসেই ও বাড়ী ত্যাগ করিতে হইবে।

বরং আমার মুখের ভাবে ভদ্রলোক এইরূপই অনুমান করিয়া গেল যে, তাহাকে ও বাড়ীতে রাখিতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই। এত বড় ঔদার্য্যের হেতু কি তাহাও জানি না। কিন্তু যখনই তাহার পানে চাহিয়াছি, মনে হইয়াছে তাহার শ্রান্ত চোখের তারায় তারায় যেন একটি মৃত শিশুর ছায়া-ছবি কেবলই দোল খাইতেছে।

বিবক্ষু

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

কোন্ সে বুকের হঠাৎ-সাড়ায়
উঠ্‌লো জেগে অবশ-পাখী,—
'সেইটুকুনের' রঙীন্ আশায়
ভুল্‌তে আমি পার্‌বো না কি!
একের পরে একে একে
কতই ছবি নিলেম এঁকে;—
মনের কোণে উছল-কথা
মার্‌ছে কেবল উঁকিঝুঁকি,
বল্‌তে এ'সে লজ্জা পেলেম—
এম্‌নি রয়ে' গেলেম মূকই!

আসার কালে উজাড় ক'রে
এনেছিলেম যতেক দাবী,
আনায়-কাণায় ভ'রে ভ'রে
এনেছিলেম শতেক ভাবই;
প্রকাশ ক'রে বল্‌তে যে'য়ে
মুখের পানে রইনু চে'য়ে,
সাজানো মোর বুকের কথা
ভাষায় তবু ঝর্‌বে নাকি—
বিবক্ষা মোর র'য়েই যা'বে
আশার নেশা ভর্‌বে না-কি!

'ভুলি-ভুলি'—মনে করি,
'বলি-বলি'—হয় না বলা;
লাজে-মূলে গুম্‌রে মরি—
তিয়াসাতে শুখায় গলা।
আশার আশে সন্ধ্যা হ'ল—
হুকুম এ'লো—'তল্পী তোল';
একটুখানি মুখের কথা—
'ওগো তোমায় ভালবাসি';
কাছে এ'সে ভাঙ্‌লো বীণা—
কেমনে সুর পরকাশি!

অসবর্ণ-বিবাহ ও হিন্দুসমাজ

শ্রীনলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ব্রাহ্মণকন্যার সহিত বৈশ্যের পুত্রের বিবাহ হিন্দু-ধর্ম্ম ও নীতির বিরোধী, সনাতনপন্থীরা মত প্রকাশ করায় প্রবর্ত্তক "সমাজ" শীর্ষক প্রতিবাদ প্রবন্ধে পুরাকালের দেবযানীর সহিত যযাতির বিবাহ উদাহরণ স্বরূপ ধরিয়া ইহাকে ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আজ একটু আলোচনা করিয়া নিজ সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম। পুরাকালের ঐ বিবাহের কারণ অনুসন্ধানে বুঝা যায়, দেবযানীর উচ্ছৃঙ্খলতায় ঐ বিবাহ হইয়াছিল। স্বাভাবিক নিয়মে হয় নাই। এও জানা আছে—দেবযানীর গর্ভজাত সন্তান যযাতির বা সমাজের কোন শ্রেয়ঃ করে নাই। ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তান পুরুই করিয়াছিল। তাই যযাতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকেই সিংহাসন দিয়া যান। তাহা সত্বেও এই চন্দ্র-বংশীয় রাজার ব্রাহ্মণকন্যা গ্রহণজনিত পাপ ভারত-দেবতাও সহ্য করেন নাই।

পুরাকালের কয়েকটী ঘটনা যে আজ উচ্ছৃঙ্খলতার পোষকতারূপে ধরা হইতেছে, সেই কালেও যে ঐ সব সর্ব্বসাধারণের অনুমোদিত ও স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দেবযানীকে বিবাহ করিতে প্রথম যযাতির ভয়, ব্যাসদেবকে গ্রহণ করিতে অম্বালিকার ভয়জনিত চক্ষু মুদিত করা ও পাণ্ডুবর্ণ হওয়া, পঞ্চ-স্বামী গ্রহণজনিত দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় বিদ্রূপ করা ইত্যাদিতে বুঝা যায়, সেই কালেও ঐসব কাজ সর্ব্ব-সাধারণ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া মনে করিত না। আজ যেমন হিন্দুধর্ম্মবিরোধী অনেক কাজ (সর্দ্দা বিল ইত্যাদি) রাজশক্তির সাহায্যে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে, সেই কালেও বোধ হয় ক্ষমতাবান্ ব্রাহ্মণ ও রাজশক্তি মিলিয়া ধর্ম্মবিরোধী অনেক কাজ রাজশক্তির সাহায্যে চালাইয়া দিত। এই পাপ নাশ করিতেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের দরকার হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে ব্যাসদেবের রক্ত-সংশ্রবে যে রাজশক্তি তাহা পৃথিবী হইতে মুছিয়া যায়, দ্রৌপদীর কোন সন্তান রাখা হয় নাই, পরে যদুবংশও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—এক কথায় বলা যাইতে পারে, চন্দ্রবংশীয় রাজশক্তি সমূলে নির্ম্মূল করা হয়।

হয়ত কেহ বলিবেন, পাণ্ডব-পৌত্র পরীক্ষিৎ যখন কুরুক্ষেত্রের পর প্রথম রাজা, তখন ব্যাসের রক্ত-সম্পর্কিত রাজশক্তি কুরুক্ষেত্রের পর ছিল না বলিলে চলিবে কেন? পাণ্ডবদের মধ্যে পাণ্ডুর কোন রক্ত-সংশ্রব ছিল না। পাণ্ডু ছিলেন পাণ্ডবদের লৌকিক পিতা। পাণ্ডবেরা কুন্তী ও মাদ্রীর তপস্যালব্ধ সন্তান। তাহা ছাড়া পরীক্ষিৎকে অশ্বত্থামা মাতৃগর্ভে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যোগবলে বাঁচান—অর্থাৎ পাণ্ডুর লৌকিক সংশ্রব হইতেও ছাড়াইয়া খাঁটি ক্ষত্রিয় রাজারূপে পরীক্ষিৎকে খাড়া করা হয়। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। নতুবা

ভাই ভাই যুদ্ধ ও এত লোকক্ষয় ধর্ম্ম-যুদ্ধ আখ্যা পাইতে পারে না।

এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, হিন্দুর চতুর্ব্বর্ণ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। ইহারা ভগবানের অভিপ্রেত পৃথক্ সৃষ্টি। পুরাকালে ব্রাহ্মণের অসংযমে অথবা নূতন সৃষ্টির খেয়ালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের রক্ত-মিশ্রণে অনুলোম প্রতিলোমে যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা পাপ বলিয়াই ত শ্রীকৃষ্ণ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুণ্য ও সত্য যাহা, তাহার ধ্বংস হইতে পারে না। এইটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে হিন্দুর তত্ত্ব-নির্ণয় সহজ হইয়া পড়ে।

তবে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সফল হইল না কেন? ইহার মূল কারণ, শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের অহমিকা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা লইয়া সংঘর্ষ নয়—সামঞ্জস্য বলা যাইতে পারে। কুরুক্ষেত্রের পর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের কোন সংঘর্ষ হয় নাই। পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, তাহার দ্বারা বেদেরই প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। উহাও জীবনেরই লক্ষণ ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের পর নূতন রাষ্ট্রে-বেদের আবশ্যকতা হ্রাস করিয়া, নিজ মতবাদকে ধর্ম্মরূপে প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে! ইহাকে যদি বেদের অতিক্রম বা পূরণ বলা হয়, তাঁহাকে অহমিকা হইতে মুক্তি দিতে পারা যায় কি? জীবের ধর্ম্ম-রক্ষা অর্থাৎ বেদের রক্ষার জন্যই ত জীব অবতার প্রার্থনা করে। বেদ অপূর্ণ বলা আর ভগবানকে অপূর্ণ বলা যে একই কথা। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের ঐ পথ গ্রহণ করিবার যে একেবারে কারণ ছিল না, বোধ হয় তাহা নয়।

গীতা পড়িলে বুঝা যায়, ঐ সময়ে জনসাধারণ আত্মীয়-ধ্বংসে ও লোকক্ষয়জনিত শোকে মুহ্যমান হওয়ায় লোকমত শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠে এবং অন্যদিকে বেদব্যাসের সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল দেখিয়া বেদের শক্তিতে সন্দেহ জন্মিলেও, বেদ সত্য বলিয়াই হউক অথবা বহু বৎসরের সংস্কার-বশতঃই হউক—বেদরক্ষায় লোকের আগ্রহ থাকে। এই ভাব ধর্ম্মের ও সমাজের অনিষ্টকর মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জনসাধারণকে সান্ত্বনা দিতেই বোধ হয় গীতা প্রচার করিয়া, বেদের উপরে যাইতে না পারিলে মুক্তি বা নির্ব্বাণ পাওয়া সম্ভব নয়, ইহা বুঝাইয়া দিয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার বন্দোবস্ত করেন। হইলও তাই। ব্রাহ্মণের তপস্যায় ব্রাহ্মণেতর জাতি-সৃষ্টি বুঝিতে স্থূল ব্রাহ্মণের দেহ-ভোগের ফল স্বরূপ ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণেতর জাতি-সৃষ্ট হইতে পারে বুঝিয়া ব্যাস যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলে তিনি নিজেই টিকিবেন না দেখিয়াই বোধ হয়—গীতাকে লয়-মুখী আধ্যাত্মিক গ্রন্থরূপে শ্রাদ্ধাদিতে পাঠের উপযুক্ত স্বীকারে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া, শ্রীকৃষ্ণই বেদ-স্রষ্টা ভগবান, ইহা জন-সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া গুরুবাদের সৃষ্টি করিলেন। হিন্দুর অধঃপাতের পথ মুক্ত হইয়া গেল।

যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে সমাজের শিক্ষকরূপে ছিলেন, এখন তাঁহারা মুক্তিদাতা গুরুরূপে স্থান করিয়া লইতে তৎপর হইলেন। তখন মন্ত্র রচিত হইল—

"ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরুবাদ মুক্তির সহজ উপায় মনে করিয়া সমাজ এতই পর-নির্ভরশিল হইল, যে আয়াসসাধ্য বৈদিক মতে উপাসনার কোন আবশ্যকতাই আর মনে করিল না। গুরুর পায়ের আঙ্গুল চোষা জলপানে মুক্তির আরও সহজ উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায়, উহা ব্রাহ্মণকে ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সামান্য জ্ঞানবান্ লোককে স্বার্থপর ও ভোগপরায়ণ করিয়া তুলিল। উপাসনার মোড় একেবারে ফিরিয়া গেল, যাহার ফলে মহাবীর ও বুদ্ধ জাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিতে তাঁহারা তৎপর হইলেন। গুরুবাদের জয়-জয়-কার হইল—সমাজের রক্ষাশক্তি আর রহিল না। সমাজ এতই উচ্ছৃঙ্খল হইল যে, মাতৃত্বের পবিত্রতা বুঝিতে কি বুঝায়, তাহা ভুলিয়া গেল।

সুপ্রাচীন এসিরিয়ন, পণি ও বেবিলিয়নগণের মধ্যে হোমানুষ্ঠান, বলিপ্রথা ইত্যাদি যে কিছু বৈদিক মতে উপাসনা চলিত, সেইখানেও বৌদ্ধপ্রভাব ছড়াইয়া মাতৃত্বের ঘোর অবমাননায় পাপের হাহাকার উঠিল। তাই বোধ হয়, সত্যের মহিমায়, মাতৃত্বের প্রাধান্য বুঝাইতে বিনা স্থূল পুরুষ সংশ্রবে অবিবাহিতা রমণীর গর্ভে যীশুখৃষ্টের

জন্ম হয়। যীশু খৃষ্ট লোকমত বুঝিয়াই বোধ হয় বৌদ্ধমতে তপস্যা আরম্ভ করেন এবং নিজে অবিবাহিত থাকেন। কাজে কাজেই মাতৃশক্তির অবমাননা ও গুরুবাদের প্রাধান্য ঘুচিবার পথ মুক্ত হইল না।

তাই বোধ হয় ভগবানের অব্যর্থ বিধানে আরবের মরুপ্রান্তে মহম্মদের জন্ম হয়। তিনি যজ্ঞার্থে পশুবধ, ধর্ম্ম-যাজকের বিবাহ, বালিকা-বিবাহ, পুরুষের বহু বিবাহ, স্ত্রীলোকের একবার বাধ্যতামূলক বিবাহ, দৈনিক উপাসনা, উপবাস ব্রত, ধর্ম্ম-যাজকের প্রাধান্য, ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য-প্রথার অনেক কিছু পুনঃপ্রচার করিয়া সুদৃঢ় সমাজশক্তির উন্মেষ করেন—এবং তিনি নিজকে ভগবান বলিয়া প্রচার করিলেন না, সমাজের শিক্ষকরূপেই রহিলেন। অর্থাৎ তিনি গুরুবাদ একেবারে অস্বীকার করিলেন।

খৃষ্টিয়ান জাতির এক সম্প্রদায় এখনও মেরীর উপাসনা করেন এবং আর এক সম্প্রদায় ধর্ম্ম-যাজকের বিবাহ মানিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য উপাসনার প্রতীক মাতৃ-শক্তির পবিত্রতায় সৃষ্ট যে খৃষ্টিয়ান জাতি এবং ব্রাহ্মণ্য প্রথায় সৃষ্ট যে মুসলমান জাতি, তাঁহারা এখন রাষ্ট্র শক্তিতে শক্তিমান্। নিছক গুরুবাদে রাষ্ট্রশক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। চীনে ও জাপানে রাষ্ট্র-শক্তি আছে বটে; কিন্তু তদ্দেশীয়েরা নিছক গুরুবাদী নন। তাহাদের মধ্যে নাটু উপাসনা নামে এক প্রকারের উপাসনা আছে, যাহা শক্তি-উপাসনারই নামান্তর। ভারতে যে নিছক গুরুবাদী শিখ সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা যে রাষ্ট্র বজায় রাখিতে পারেন নাই, তাহা তো দেখাই যাইতেছে। গুরখা-রাজ শক্তির উপাসক। অবশ্য উনি হিসাবের বাহিরে।

বর্ণাশ্রমে জাতিভেদের বিরোধীরা এখন বলিতে চাহিবেন—জাতিভেদ নাই বলিয়াই ঐ ধর্ম্মীদের রাষ্ট্রশক্তি আছে—ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এই উক্তি একেবারে অজ্ঞানজ বলিয়াই মনে হয়। যেদেশে ঐ ধর্ম্মীর উদ্ভব হইয়াছে, সেই দেশে ভারতের মত বর্ণভেদ, জাতিভেদ পূর্ব্ব হইতেই ছিল না। আমাদের অস্পৃশ্য জাতির মধ্যেও যে ভাবের জাতিভেদ আছে সেই ভাবের জাতিভেদ তাহাদের সেইখানে যে ছিল, ইতিহাস-পাঠে তাহা বুঝা যায়। ঐভাবের জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা স্বাধীনই ছিলেন। কিন্তু ঐ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছিল। ঐ দুই ধর্ম্মী জন্মিয়া, সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া তাঁহাদের জাতীয়তা আরও সুদৃঢ় করিয়াছেন বটে; কিন্তু বংশ-গৌরব অব্যাহতই রাখিয়া-ছেন। মহম্মদ নিজ বংশের মেয়ে অন্য বংশে বিবাহ দিতে কখনও মত দেন নাই। মাতৃ-শক্তির অবমাননাকারী যতই ধর্ম্মের আদর্শপ্রচারে যত্ন করুক না কেন, তাহাদের সেই চেষ্টা অরণ্যে রোদনই হয়, তাহারা মনুষ্য-পদ-বাচ্য থাকিতে পারে না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান তাঁহার অব্যর্থ বিধানে আমাদিগকে ঐ দুই ধর্ম্মীর অধীনে রাখিয়া আমাদের মূল কি এবং কোথায়, বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা বুঝিলেই আমাদের মুক্তি সন্নিকট হইবে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভবের পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে বর্ণভেদ ছিল, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তবে কখন হইতে জাতিভেদের আরম্ভ, আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলির আলোচনায় বুঝা যায়, এই বর্ণভেদ, জাতিভেদের আরম্ভ সৃষ্টির আদি হইতে। সৃষ্টিতত্ত্বে আছে—বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক। সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণে সৃষ্টি। এই তিন গুণ এক অখণ্ড সত্তারই অভিব্যক্তি। ঐ অখণ্ড সত্তা তাঁহার সত্ত্ব-গুণ প্রাধান্যে—ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব-মিশ্রিত রজোগুণ প্রাধান্যে ক্ষত্রিয়, রজোমিশ্রিত তমোগুণ প্রাধান্যে বৈশ্য এবং তমোগুণ-প্রাধান্যে শূদ্র যথাক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তমের পর আর গুণ নাই; তাই পঞ্চম বর্ণ নাই। মানুষ অজ্ঞানতা নিবন্ধন ব্যাভিচারী হওয়ায় প্রতিলোমে যে সৃষ্টি হইল, তাহারা অবর্ণরূপে জন-সমাজে স্থান পাইল। এই তত্ত্ব গীতাকারও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—ওঁ তৎ সৎ; এই তিনটী শব্দের দ্বারা বিধাতা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাকাল বলিতে সৃষ্টির আদিকে বুঝাইতেছে। উপরে বর্ণিত অখণ্ড সত্তা আর গীতার বর্ণিত বিধাতা একই কথা। ওঁ বলিতে অ-উ-ম, অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ বুঝায়। তাই ওঁ দিয়া ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন, বুঝিতে হয়, এবং ঐ তিন গুণ দ্বারা চতুর্ব্বর্ণ যথাক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন বুঝাইতেছে।

এই চতুর্ব্বর্ণ একই সত্তার অভিব্যক্তি বলিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইপ্রকার একই হিন্দু-বিধিরূপ দেহের যে ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহাদের কাজও যে ভিন্ন ভিন্ন, তাহাও গীতাকার স্বীকার করিয়াছেন। ইহা অবিশ্বাস করিয়া, কোন যুক্তি-বলে ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতায় ব্রাহ্মণেতর জাতি-সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে, বুঝিয়া উঠা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, তখনও হিন্দুর উপর ভিন্ন জাতির কোন আক্রমণ ছিল না। Arms Act-ও ছিল না। সকলেই স্বপ্রধান ছিল। এখনও ব্রাহ্মণ বলিলেই বাবুরা লাঠী লইয়া মারিতে উঠেন। তখন কিসের খাতিরে তিনটা জাতি—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—তাহাদের হাতের অস্ত্র ব্রাহ্মণ-ধ্বংসের জন্য প্রয়োগ না করিয়া, ব্রাহ্মণের অভাব অভিযোগ পূরণ করিবার জন্য তৎপর হইল! এমন ন্যায়বান্ লোক কেহই কি তখন ছিল না, যে শূদ্রবর্ণ সৃষ্টি করিতেও একটু আপত্তি করিল না। তাই বলা যাইতে পারে, চতুর্ব্বর্ণ-সৃষ্টি ঐ বিধাতা বা অখণ্ড সত্তার অর্থাৎ পরমাত্মার অভিব্যক্তি। বহু পুরাতন বলিয়াই ইহা আমাদের ধারণাতীত হইয়া পড়িয়াছে। এখন অনেকে পিতামহের নাম মনে রাখিতে পারেন না; আর আদি-সৃষ্টির ধারণা করা কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের আদি কারণ পরমাত্মা স্ত্রীও নন, পুরুষও নন—দুইয়ের একত্র সমাবেশ; এইখানে রূপ-কল্পনা কঠিন—জীবজগতের সাধ্যাতীত বিষয়। তবে তিনি যখন বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি 'মা' হইয়াই এই বিশ্ব প্রসব করিলেন অর্থাৎ সৃষ্টি করিলেন—ইহাই বেদ নির্দ্দেশ দেন। খৃষ্টীয়ান মুসলমানের গ্রন্থে আছে—প্রথম আদি পুরুষ—যাঁহাকে আদম বলা হয়—সৃষ্ট হইয়া-ছিলেন—পরে তিনি একা হইলেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গিনী একজন স্ত্রী তাঁহার বামভাগের অস্থি লইয়া সৃষ্ট হইলেন। আমাদের কথা—তিনি স্ত্রী সৃষ্টি না করিয়া, বহু পুরুষ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেন স্ত্রী করিলেন কেন? ইহাতে এই বুঝা যায়, যে সৃষ্টির বীজ-রূপ নির্গুণ পুরুষ এবং ঐ বীজ-প্রকাশক শক্তি-রূপ সগুণ প্রকৃতির সমবায়ই পরমাত্মা, বিধাতা, খোদা বা গড্। কিন্তু ঐ শক্তি ত্রিবিধ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ এবং বীজ অসংখ্য অর্থাৎ অসীম। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই বোধ হয়—খৃষ্টীয়ান মুসলমানের গ্রন্থে আদি-পুরুষের অর্দ্ধেক ভাগ স্ত্রী না বলিয়া একটী অস্থি হইতে স্ত্রী-সৃষ্টি বলা হইয়াছে।

যদিও ঐ বীজ অসীম, কিন্তু শক্তির সাহায্য ব্যতীত তাঁহার প্রকাশ হইতে পারে না। এই সত্য স্থূলে-জীব-সৃষ্টির নিয়ম চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতি যখন সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, পুরুষ বীজ নিক্ষেপ ককিয়া নির্লিপ্ত থাকেন। প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রী ঐ বীজ তাঁহার গর্ভে ধারণ করিয়া, নিজ শক্তিতে প্রথম ভ্রূণ অর্থাৎ মূলাধার হইতে সহস্রার—পরে হাত, উরু, পা বর্দ্ধিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সন্তান প্রসব করেন। এইরূপে কয়েক বার সন্তানের মাতা হইলে, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি চলিয়া যায়—অথচ তাঁহার জীব-দেহের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি অবিকৃত থাকিয়া, নিজ সন্তানের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন।

ইহা দেখা যায়, যে এক পুরুষ হইতে বীজ না লইয়া, বহু পুরুষ হইতে বীজ লইলে নারী তাহার শক্তির বহির্ভূত সন্তান প্রসব করিতে পারেন না; কিন্তু এক পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিলে বহু সন্তানের পিতা হইতে পারেন, অথচ বীজের ক্ষয় হয় না। তাই বোধ হয়, বেদান্তবাদীরা বলিয়া থাকেন, ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম যে জগৎ ছাড়া প্রকাশ হইতে পারেন না, তাহা জানিয়াও তাঁহারা জগৎ মিথ্যা কেন বলেন, ইহা বুঝা কঠিন। এই ব্রহ্ম অর্থাৎ বীজ—জগৎ অর্থাৎ শক্তি ব্যতীত প্রকাশ হইতে পারেন না বলিয়াই ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন। এক স্ত্রী যাঁহার আছে, তিনি ইহা বুঝিতে পারিবেন।

এখন হইত বলা হইবে, বিশ্বের মূলা প্রকৃতি যখন এক, খৃষ্টিয়ান মুসলমানের গ্রন্থেও যখন আদমের এক স্ত্রীর কথা আছে, তখন একজন হইতে চারি বর্ণে চারি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিবার কোন সদ্‌যুক্তি থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক। প্রত্যেক গুণই

স্বপ্রধান। সত্তার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া যথাক্রমে প্রত্যেক গুণের প্রাধান্যে প্রকাশিত হইতে হইলে চারি ভাগ হয়। তাই বুঝিতে হয়, প্রকৃতি চারি ভাগ হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এক গুণ হইতে অন্য গুণের খেলা একেবারে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে। মাত্রাধিক্য হইয়া চারিভাগে উহাদের প্রকাশ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে, সৃষ্ট পদার্থ এক রকম এবং একই গুণবিশিষ্ট হইত, বহু রকম ও চারিগুণবিশিষ্ট হইত না। এমন কোনও সৃষ্ট পদার্থ নাই, যাহাতে চারি গুণের কাজ দেখা যায় না।

এই সত্য আশ্রয় করিয়াই বোধ হয় মুসলমানদের মধ্যে পুরুষের চারি স্ত্রী গ্রহণ করিবার নিয়ম আছে। আমাদের বেদেও আছে—পূর্ব্বে এক ঋক্ ও সাম ছিল। ঋক্ সামকে বলিল—এস, আমরা প্রজার জন্য মিথুন হই। সাম বলিল, না। তখন ঋক্ দুই হইয়া সেই কথা আবার বলিল; তাহাতেও সাম বলিল, না। পরে ঋক্ তিন হইয়া তাহাই বলিল, তখন সাম সম্মত হইল। তিনটী ঋক্-সংযোগে সাম-গান হয়। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় হিন্দুসমাজ পুরুষের বহু জায়া-গ্রহণ তখন দোষজনক মনে করিত না।

ঋক্ প্রকৃতিকে এবং সাম পুরুষকে বুঝাইতেছে। প্রকৃতির ইচ্ছাতেই সৃষ্টি, পুরুষের ইচ্ছায় নয়। এই সত্য স্থূলে পশুর দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যাইবে। স্ত্রী পশুর যখন সৃষ্টির ইচ্ছা জাগে, তখন পুং-পশু আসিয়া মৈথুন করে। স্ত্রী-পশু বীজ গ্রহণ করিলে পুং-পশুর মৈথুনের ইচ্ছাই থাকে না। এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে মূলাপ্রকৃতি তাঁহার নিজ গুণে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া, তাঁহার সত্তা হইতে বীজ গ্রহণ করিয়া প্রথম ব্রাহ্মণ, পরে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং নিজে অবিকৃত থাকিয়া নিজ সন্তানদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সন্তানেরা নিজ কর্ম্মফলে তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্টি দেবতাদি, গ্রহ, উপগ্রহ দ্বারা চালিত হইয়া, জন্মান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ সপ্তলোকে আসা যাওয়া করিতেছেন। পরে সৎকর্ম্মে অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কর্ম্মে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবেন। যেমন স্থূল মায়ের সৃষ্টি শক্তি চলিয়া যাইবার পরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিয়া পরে বার্দ্ধক্যে মৃত্যু আছে, সেই প্রকার মূলা প্রকৃতিও তাঁহার সৃষ্ট জীবজগৎ মহাপ্রলয়ে আপন সত্তায় লীন হইবেন। বেদের এই নির্দ্দেশে বিশ্বাস না করিয়া, পরমাত্মা নিত্য নূতন মনুষ্য সৃষ্টি করিতেছেন মনে করিয়া, জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে এত চেষ্টা হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুভূতির অভাবই যে সূচিত করিতেছে, ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

এখন হয়ত প্রশ্ন হইবে—আদিতে যে বর্ণভেদে, জাতি-ভেদ, তাহা ত স্ত্রীকে লইয়া, পুরুষকে লইয়া নয়—স্থূলে উচ্চবর্ণের মেয়ে নিম্ন বর্ণের পুরুষ হইতে বীজ লইয়া সৃষ্টি করিলে, সেই সৃষ্টি মায়ের বর্ণের জাতি না হইয়া অবর্ণ বা অন্ত্যজ বলা হয় কেন? আদি-বীজ যে নির্ম্মল নির্গুণ, একবার সগুণ প্রকৃতির দ্বারা প্রকাশিত হইলে তাঁহার ঐ নির্গুণত্ব থাকে না। তিনি যে গুণে প্রকাশিত হইলেন, সেই গুণ পাইয়া বসেন। তাই সৎকর্ম্ম আশ্রয় করিয়া উচ্চ যোনিতে আবার জন্ম না লইলে, তাঁহার ঐ গুণের সম্যক্ পরিবর্ত্তন হয় না। ইহা জন্মান্তরের এক গভীর রহস্য। অবশ্য মা যদি স্থূল পুরুষ সংশ্রব ছাড়া নিজ তপস্যায় সৃষ্টি করেন, তবে সেই সন্তানের মায়ের বর্ণে জাতি হইবে—যেমন পঞ্চ পাণ্ডব, পরীক্ষিৎ, যীশুখৃষ্ট। অভিমন্যুর ঔরসে, এবং শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র-বলে পরীক্ষিতের জন্ম—আমি নিজে ঐ বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্ নই। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ক্ষত্রিয় একেবারে রহিল না দেখিয়াই ভগবান খাঁটি ক্ষত্রিয়-বীজ-রক্ষার জন্য অল্প-বয়স্কা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যীশুখৃষ্টেরই মত পরীক্ষিতের জন্ম দিলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া মানেন, তাঁহারাও বোধ হয় আমার মতে মত দিতে আপত্তি করিবেন না। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে—জাতিভেদে ক্ষত্রিয়শক্তি রক্ষা করিয়া রাষ্ট্র বজায় রাখা ভগবানের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই অভিপ্রেত ছিল।

জাতিভেদে সৃষ্ট রাষ্ট্রশক্তি—আর জাতিভেদ-বর্জ্জিত রাষ্ট্রশক্তি এক পর্য্যায়ভুক্তও বলা যাইতে পারে না। কারণ, এখন সকলেই জানেন, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে সকল জাতি-ভেদবর্জ্জিত রাষ্ট্রশক্তি আছে, তাহা তাহাদের দলপুষ্টির জন্যই

ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহারা তাহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করাকেই বিশ্বের মঙ্গল মনে করে। কিন্তু পূর্ব্বে যে জাতিভেদমূলক রাষ্ট্রশক্তি ছিল, তাহা কোন দিন নিজ দলপুষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয় নাই। অত্যাচারী রাজার প্রজা-পীড়ন নিবারণ করিতেই ঐ শক্তির প্রয়োগ হইত। অত্যাচারী রাজাকে নিধন করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীকেই সিংহাসন দিয়াই এই শক্তি ফিরিয়া আসিত। এই যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বর্ণভেদে জাতি-ভেদ ও মাতৃশক্তির উপাসনা, ইহা ছিল বলিয়াই ভারত রাষ্ট্র বজায় রাখিতে পারিয়াছিল।

এই ভাবের প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রাণ রাষ্ট্রশক্তির উন্মেষের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া, গত বৎসর "প্রবর্ত্তকে" এক আলোচনা-পত্র পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মকে অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যকে অবিকৃতভাবে স্বীকার করিতে বলায় "প্রবর্ত্তক" আমার ঐ মতকে জাতি-ব্রাহ্মণের ক্ষমতা চলিয়া যাওয়ায় হাহাকার বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মে জাতি-গঠন হইয়া আসিতেছে দেখাইয়া ঐ সম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেন। মুক্তিকামী মানুষকে জীবনের শেষভাগে বৈষ্ণব হইতে হয়, ঠিকই; কিন্তু উহা ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা—অর্থাৎ উহা জীবন লয়ের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, গঠন করে না।

ইহাও বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত, যে ভারতে যখন রাষ্ট্রশক্তি ছিল, তখন ঐসব মতবাদী সম্প্রদায় বাহির হয় নাই। মুসলমানের সময় হইতেই ঐসব সম্প্রদায় বাহির হইতে আরম্ভ করে। এই পর্য্যন্ত ঐসব সম্প্রদায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তির উন্মেষের কোন কাজই হয় নাই—কেবল সামঞ্জস্যের চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, ঐশী নিয়মে প্রজার উপর রাজার এক moral influence থাকে। ঐ influence-এর ফলে মতবাদী বাহির হইয়া রাজ-ধর্ম্মীর সঙ্গে সামঞ্জস্যে তৎপর হয়। এই সামঞ্জস্য হইয়া গেলে, জাতি প্রকৃত পরাধীন হয় অর্থাৎ রাজার রাজ্য-জয় সফল হয়। কেন না, সামঞ্জস্য হইয়া গেলে, পরাধীন বলিয়া প্রজার মধ্যে অনুভূতিই থাকে না। এই অনুভূতি সুপ্ত হওয়াকে যদি স্বাধীনতাপ্রাপ্তি মনে করা হয়, ইহার মতন মূর্খতা কিছু থাকিবে কি?

পরাধীনতার সময়ে যে সকল মতবাদী সম্প্রদায় বাহির হয়, তাহাদের দ্বারা পরাধীন জাতির কোন শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। প্রজারা রাজার এক moral সম্পত্তি-বিশেষ। রাজ্যজয়ের পর, প্রজার জমির নীচে যে খনি পাওয়া যায় তাহা রাজার প্রাপ্য বলিয়া রাজভাণ্ডারই পূর্ণ করে; সেই প্রকার প্রজার বিশিষ্ট মতবাদ হইতে যে সব সম্প্রদায় বাহির হয় তাহাও রাজার প্রাপ্য বলিয়া রাজশক্তিরই বলাধান করে। তাই পরাধীনতার সময়ে যে সকল মতবাদ বাহির হইয়াছে, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, যে ধর্ম্ম ও নীতি অবলম্বনে নিজধর্ম্মী রাষ্ট্রশক্তি আমাদের ছিল সেই ধর্ম্ম ও নীতির অবলম্বন ব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আমাদের উদ্ধারের অন্য উপায় হইতেই পারে না। কাজে কাজেই আমাদিগকে রামরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ব্রাহ্মণের মেয়ের সহিত বৈশ্যের পুত্রের বিবাহ আমাদের উদ্ধারের পথ নয়। উহা হীন উচ্ছৃঙ্খলতা যে!

এখন হয়ত বলা হইবে ব্রাহ্মণ তো মৃত। এখন ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব, যে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম পালন করিব? যাঁহারা এখনও হিন্দু আছেন, তাঁহারা এখনও ব্রাহ্মণ দেখেন। যেমন জীবদেহের মূলাধার হইতে সহস্রার একই সূত্রে গাঁথা—ইহা প্রাণ বা জ্ঞান—ইহার যে কোন স্থানে শক্ত ঘা পড়িলে জীবের মৃত্যু হয়—হাত, উরু, পা কার্য্যক্ষম না থাকিলে জীবের মৃত্যু হয় না, চলিতে ফিরিতে কষ্ট হয় মাত্র—ঠিক সেই প্রকার চতুর্ব্বর্ণবিশিষ্ট হিন্দুবিধি-রূপ দেহের মূলাধার হইতে সহস্রার হইল ব্রাহ্মণ। তাই এই ব্রাহ্মণ না থাকিলে 'হিন্দু হিন্দু' শব্দই নীরব হইয়া যাইত। হাত, উরু, পা কার্য্যক্ষম না থাকিলে দেহীর যাহা অবস্থা হয়, আজ হিন্দুর অবস্থা হইয়াছে তাই। রোগে ধরিয়া পা মোটা হইয়াছে না বুঝিয়া, ইহাকে স্বাস্থ্যের উন্নতি মনে করা হইতেছে। এইরূপ ভুল বুঝিয়া আমাদের বিকৃত-মস্তিষ্ক চিকিৎসকগণ সর্দ্দাবিল ও অস্পৃশ্যতাপরিহারের জন্য মন্দিরপ্রবেশ-বিল রূপ বিষ-প্রয়োগে ঐ ক্ষীণ প্রাণটুকু

বাহির করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছেন। এই বিসর্জ্জনের বাদ্যের মধ্যে, বৈদিক ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়, এই মতপ্রকাশ-রূপ প্রবন্ধ "প্রবর্ত্তকে" স্থান পাইয়াছে দেখিয়া একটু আশার সঞ্চার হইল—তাই আজ এই আলোচনায় উৎসাহ পাইলাম। বৈদিক মতে উপাসনা বলিতে সৃষ্টিশক্তিরই উপাসনা বুঝায়। এই সৃষ্টিশক্তি চতুর্ব্বর্ণে পর্য্যবসিত। ইহা অখণ্ড সত্তার স্বাভাবিক প্রকাশ। এখানে উচ্চ নীচ বুঝিবার কোন কারণ নাই। সকল বর্ণও স্বপ্রধান—অথচ একই সূত্রে গাঁথা। জন্মগত চতুর্ব্বর্ণ স্বীকার করিয়া যাহাতে সকলে স্ব স্ব বর্ণানুযায়ী চলিয়া একই সত্যের প্রকাশে তৎপর হয়, তাহাই এখন সকল হিন্দুরই কর্ত্তব্য।

যাঁহারা পৌত্তলিক নন—অর্থাৎ নিরাকারের উপাসক, তাঁহারা দেখি উপাসনার সময়ে ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়াই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন। ভগবানের অর্থাৎ পরমাত্মার পুরুষ-ভাগ নির্গুণ। তাই তাঁহারা অজানিত ভাবে হইলেও, পরমাত্মার মাতৃভাগেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। সদ্যজাত শিশু মা-কে না জানিয়া, না চিনিয়া যেমন তাহার অভাব অভিযোগ পূরণ করার জন্য কাতর ক্রন্দন করে এবং সেই ক্রন্দন প্রথম মাতৃ-কর্ণেই সাড়া দেয়, তেমনি সৃষ্ট জীব যে ভাবেই উপসনা করুক না কেন, তাহা প্রথম সৃষ্টিশক্তি মায়ের নিকটই পৌছায়। ভূমিষ্ঠ শিশু মাতৃস্তন্যে ও স্নেহে বর্দ্ধিত হইয়া মায়ের ইঙ্গিত না পাইলে যেমন পিতাকে চিনিতে পারে না, সেই প্রকার সৃষ্ট জীব সৃষ্টি-শক্তির গুণে বর্দ্ধিত হইয়া অর্থাৎ সৃষ্টিগুণ বুঝিয়া সৃষ্টি-শক্তির ইঙ্গিত না পাইলে নির্গুণ সত্তাকে বুঝিতে বা চিনিতে পারে না। সৃষ্টিগুণ বুঝা অর্থে সৃষ্টিশক্তিকে আত্মস্থ করা, সৃষ্টিশক্তিকে অস্বীকার করা নয়। কারণ, গুণে সৃষ্ট বলিয়া সৃষ্টজীব গুণাতীত হইতে পারে না। গুণাতীত প্রলয়ের অবস্থা। সেইখানে উপাসনা—অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম নীরব। জীবের এমন অবস্থা যদি কোন দিন হয়, তাহা দ্বারা কোন কর্ম্মই সম্ভব নয়, যুদ্ধ করা ত ভিন্ন কথা। তাই মনে হয়, ত্রিগুণাতীত হও, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও ইত্যাদি উপদেশ যুদ্ধে নিয়োজিত করিবার জন্য হইতে পারে না, যুদ্ধ-শেষে শোক অপনোদন করিবার জন্যই ঐ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল—অর্থাৎ শিশুকে চাঁদ আনিয়া দিবার ভান করিয়া ইহা ঘুম পাড়ান মাত্র। এখন একটু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, সৃষ্টিশক্তিগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গুণাতীত পরমাত্মাকে চিনিতে মায়ের ইঙ্গিত পাইবার উপযুক্ত হইতে হইলে মাতৃভাবের উপাসনা ব্যতীত অন্য প্রকার উপাসনায় ঐ ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে না বলিয়াই বেদ মাতৃভাবের উপাসনাই নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

এই বেদকে যে যুগে যুগে ধ্বংস করিবার চেষ্টা, তাহার কারণ ব্যক্তিগত অহমিকা। ইহা নিছক অজ্ঞতা বা আসুরিক ভাব। ব্রাহ্মণজাতির ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি ঘৃণা কারণ নয়। সময়ে সময়ে যে সকল বিশিষ্ট লোকের মতবাদ বাহির হয়, বেদের নির্দ্দেশ থাকিলে তাঁহাদের মতবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। তাই মতবাদ-প্রচারে চঞ্চল হইয়া তাঁহারা বেদ-ধ্বংসে তৎপর হন—সে ব্রাহ্মণই হউন বা ব্রাহ্মণেতর জাতির কেহই হউন। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন এই আসুরিক ভাবের একেবারে লয় হইবে না। এই সংগ্রাম বরাবরই চলিবে। অথচ বেদ যেমন আছে, তেমনই থাকিবে।

হিট্‌লারের জার্ম্মাণী—

জার্ম্মাণী বলিতে আজ হিটলারকেই বুঝায়। জার্ম্মাণী ও হিটলারের স্বার্থ এক। স্বদেশ-স্বজাতির কল্যাণ-কামনায় হিটলারের জীবন উৎসর্গীকৃত। দেশকে সর্ব্বোতোভাবে স্বাধীন করা ছাড়া হিটলারের দ্বিতীয় কামনা—আকাঙ্খা নাই। জার্ম্মাণীর কতখানি হৃদয়াধিকার তিনি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা গত নির্ব্বাচনের ফল হইতেই অনুমান করা যায়। হিটলারের আত্মবিশ্বাস ছিল; তাই তিনি অস্ত্রসংবরণ ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ-পরিত্যাগ সমস্যা লইয়া পুনর্নির্ব্বাচনের আয়োজন করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন-সভায় শতকরা তিরানব্বইটি ভোটই তিনি পাইয়াছেন। চার কোটীর অধিক জার্ম্মাণ নরনারী তাঁকে ভোট তো দিয়াছেনই, অধিকন্তু অন্তরের নিঃসংশয় বিশ্বাসের অর্ঘ্যও নিবেদন করিয়াছেন।

মৃতপ্রায় উপেক্ষিত জার্ম্মাণ জাতির প্রতি অঙ্গে তিনিই সঞ্চার করিয়াছেন নব জাগরণের প্রাণ-চঞ্চলতা। অসাড় অসহায় জার্ম্মাণীর সম্মুখে তিনি ধরিয়াছেন নূতন আদর্শ, স্বাধীন জার্ম্মাণীর অপূর্ব্ব স্বপ্ন। অভিনব জীবনের রাগিণীতে আজ আপামর জার্ম্মাণ উদ্বুদ্ধ। দেশাত্মবোধের উদাত্ত সুর তরুণ জার্ম্মাণীর রক্ত-মাংসে, শিরা-প্রশিরায় ঝঙ্কৃত।

বিগত মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ হৃতসর্ব্বস্ব বিগতগৌরব জার্ম্মাণীর মরু-শ্মশান বুকের উপর কালভৈরব হিটলারের জন্ম; বিজিতের উপর বিজয়ীর স্বার্থ-চাপ, নিষ্ঠুর নিপীড়ন, অবিচার, অপমানকর সর্ত্ত, জয়োন্মাদ ইউরোপ-আমেরিকার অবিমৃষ্যকারিতার চরম পরিণতি ভার্সাই সন্ধি হিটলার-বাদকে পরিপুষ্ট করিয়াছে, লোকার্ণের অস্ত্রসংবরণ অছিলায় জার্ম্মাণীর উন্নতশির চিরাবনত করিয়া রাখিবার বিজয়ী রাষ্ট্রের আকুল প্রচেষ্টা জার্ম্মাণ নাজি দলের বে-পরোয়া মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয়ই দিয়াছে। জার্ম্মাণীতে নাজির অভ্যুত্থান যাদু নহে বা একদিনেও সম্ভব হয় নাই। একটা স্বাধীন সভ্যজাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের, বিগত জাতীয় মর্য্যাদা ও সম্মান পুনরুদ্ধারের ইহা তিল তিল প্রয়াসের ফল। সকল অর্থনৈতিক চাপ, অসহনীয় ঋণভার, সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংসস্তূপের তলে তলে যে বিদ্রোহ জাতীয় চেতনায় গুমরিয়া গুমরিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে জাগিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তাহারই উলঙ্গ স্বরূপ হার হিটলার। নব্য জার্ম্মাণীর সত্যকার চাওয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে হিটলারের মধ্যে। জাতীয় সত্তার এই নিষ্কলুষ মূর্ত্তি তাই আজিকার জার্ম্মাণীতে দেবতার আসনে সম্পূজিত। সম্প্রতি হিটলারের জন্মোৎসব যে আগ্রহ ও সমারোহে হইয়াছে তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। সারা দেশ এই উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়াছিল। দ্বাদশ বছরের পূর্ব্বেকার পথ-চারী সাধারণ অজ্ঞাত সৈনিক যুবক আজ বিশ্বের 'বিস্ময়'। জার্ম্মাণীর হিটলার তাঁর অদম্য প্রাণের সেই যাদুকরের সোণার দাবীর স্পর্শে জাতীয় জীবনের আমূল সংগঠনের মধ্য দিয়া ঘুমন্ত উপেক্ষিত দেশকে আজ দুনিয়ার রাষ্ট্র-দরবারে হিটলারের জার্ম্মাণী বলিয়া সম্মানের আসনে বসাইতে সমর্থ হইয়াছে।

উদ্যম-মূর্ত্তি অসীম-সাহসিক বীর হিটলারের জাতীয় মুক্তি-সাধনার অদমনীয় সঙ্কল্প হিমালয়ের মতই অচল। পৃথিবীর কোন বাধা, শত হুমকী, সহস্র বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁর উদ্দীপ্ত বুকের উৎসাহানল নির্ব্বাপিত করিতে অসমর্থ। জার্ম্মাণীর স্বার্থ-রক্ষার জন্য তিনি রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সহিত জার্ম্মাণ জাতির সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন, নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের সকল প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতার যে সাম্য-মৈত্রীর পতাকা-তলে অসামঞ্জস্য, অবিচার ও উৎকট বৈষম্যের অভিনয় তাহার স্বরূপ তিনি দুনিয়ার হাটের মাঝে ফুটাইয়া ধরিয়াছেন। হিটলারের স্পর্দ্ধিত বাণী—"We are ready

to go into every international conference, participate in every negotiation and sign treaties, but only as equals. .

I won't have Germany treated as a second-class nation. Either you give us equality or you will never see us again."

উচ্চ-নীচ, সমানে-অসমানে যে সন্ধি তাহা বিশ্বের কল্যাণ সাধনে সমর্থ নয়। উহার গর্ভেই থাকে অহঙ্কারের বীজ, যাহা একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া বিপ্লব অশান্তি সৃজন করে। জীবন-মরণের সমস্যার দায় হইতে মুক্ত করিয়া জার্ম্মাণ জাতিকে সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ করাই হিটলার গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরাধীন শৃঙ্খলিত জাতির আন্তর্জাতিকতার প্রতি দরদে তিনি আস্থাহীন। স্বজাতি-সহানুভূতিহীন কমিউনিষ্টদের উচ্ছেদ-কামনায় তাই তিনি বদ্ধপরিকর। বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারে জাতির ভিতরে জাতীয়তা-বোধ জাগাইবার প্রচেষ্টা বর্ত্তমানে অনেকখানি সাফল্য-মণ্ডিত। অর্থনৈতিক জাতীয়তার উপর ভিত্তি করিয়া হিটলারিজমের সকল কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া ও দেশের অপরাপর ছোট বড় রাজনৈতিক দলগুলিকে গণ্ডীবদ্ধ স্বার্থ-দ্বন্দ্ব হইতে জাতির বৃহত্তর কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করিবার সফল প্রচেষ্টার জন্য নাজি গবর্ণমেণ্ট লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তরুণ জার্ম্মাণ হিটলারবাদের ভিতর সত্যকারের অর্থ ও রাষ্ট্রমুক্তির আলোর সন্ধান পাইয়াছে। সমাজসংস্কারেও হিটলার জার্ম্মাণীর মুসোলিনী।

একটা অমিশ্র জার্ম্মাণ জাতির অভ্যুত্থান-কামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া হিটলার জার্ম্মাণীর বুকের উপর প্রলয়-নাচন সুরু করিয়া দিয়াছেন। ইহুদী জাতির উপর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, আইনষ্টাইনের মত মনীষীকে উপেক্ষা এই লক্ষ্যসিদ্ধির পথে গতি অপ্রতিহত ও বিঘ্নহীন করিবার উদ্দেশ্যেই। তবু তাঁর এই একান্ত আপাত-সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা-বোধক মনোবৃত্তি যে কি পরিমাণে আন্তর্জাতিক চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহা বর্ত্তমান হিটলারিজমকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা সুকঠিন। বিশ্বের অশান্তির মূল কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"The
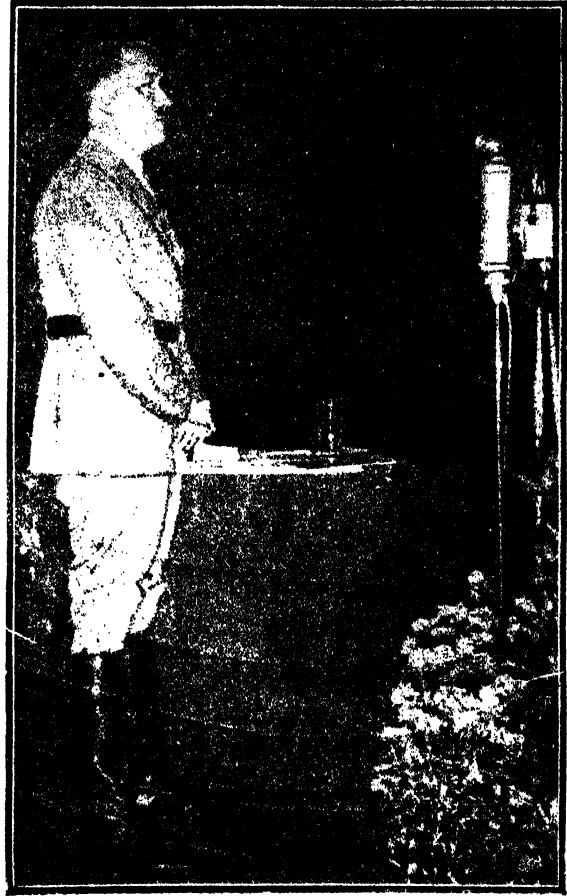
নির্ব্বাচনে হিটলার

deepest roots of the miseries of to-day, lie in the division of the world into conqueror and the conquered and the degradation of a great people into a second-class nation."

ঠিক এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই আজিকার হিটলারের জার্ম্মাণী মাথা তুলিয়াছে। পিতৃভূমিতে মনের শান্তিতে খাইয়া পরিয়া স্বাধীন থাকা ও বিশ্বের স্বাধীন জাতিদের সং

সমানাধিকার লাভ করাই তাঁর সকল আন্দোলনের নিবিড় উদ্দেশ্য।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের রিক্ততা—

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের ছোট্ট একটি দ্বীপ। উহা ব্রিটেনের অধীন ৭০ বৎসর যাবৎ সায়ত্ত-শাসন ভোগ করিয়া আসিতেছে; কিন্তু আভ্যন্তরিক দলাদলি ও বহির্দুনিয়ার সঙ্গে স্বার্থসঙ্ঘর্ষে আঁটিয়া উঠিতে না পারায় সম্প্রতি বিপন্ন হইয়া পড়ে। দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় শাসনতন্ত্র অচল হইয়া পড়িবার উপক্রম হয়। বর্ত্তমানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ অলদারদাইস্ স্বদেশের কল্যাণকামনায় ব্রিটেনের ক্রাউন-কলোনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই নব শাসনতন্ত্রে রাজপ্রতিনিধির হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে, যদিও তিনজন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডবাসী ও তিনজন ব্রিটিশ সভ্য গবর্ণরের পরামর্শদাতারূপে থাকিবেন। কুইবেক প্রদেশ কানাডার সঙ্গে যুক্ত হইবে। এই পরিবর্ত্তনে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

পাইয়া ধন হারাইবার অনুতাপ অনিবার্য্য। আত্ম-দুর্ব্বলতায় স্বাধীনতার অমৃত আস্বাদ হইতে এ জাতি বঞ্চিত হইল।

মার্কিণ-সোভিয়েট বাণিজ্য-সন্ধি—

মার্কিণ ও সোভিয়েটের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি হইয়া গিয়াছে। প্রতীচ্যে সোভিয়েট এতদিন পর্য্যন্ত অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। কিন্তু অর্থসঙ্কটের চাপে পড়িয়া জাতির পর জাতি সোভিয়েটকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য মুখে স্বীকার না করিলেও, অন্তরে অন্তরে প্রস্তুত হইতেছে। এই চুক্তিতে মার্কিণের লাভবান্ হইবার আশা আছে; কারণ সোভিয়েট সরকার আমেরিকা হইতে ৫০ মিলিয়ান ডলার মূল্যের কাঁচা তুলা ও ৩০ মিলিয়ান ডলার মূল্যের তুলাজাত দ্রব্য নিজের দেশে চালাইয়া দিতে পারে। কমপক্ষে উভয় জাতির মধ্যে বৎসরে ৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও অধিক মূল্যের বাণিজ্য আদান-প্রদান হইবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান। মিঃ এল, এম, কারা খাঁ আমেরিকায় প্রথমে সোভিয়েট দূত রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং রুষ-পররাষ্ট্রসচিব লিটভিনফ সভাপতি রুজভেল্টের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছেন। সোভিয়েট বাণিজ্য-শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য কয়েক বছরের জন্য অর্থসাহায্য করিবারও কথা হইয়াছে।

রুজভেল্ট-লিটভিনফ চুক্তির সপক্ষে ও বিপক্ষে দুনিয়ার রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ অনেক কথাই বলিয়াছেন।

মিঃ লিটভিনফ

চীনের রাষ্ট্র-স্বার্থ ও প্রশান্ত মহাসাগরের বাণিজ্য-প্রভুত্ব লইয়া মার্কিণ-জাপান সঙ্ঘর্ষ অসম্ভব নয়। মার্কিণ-সোভিয়েট চুক্তিদ্বারা প্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থ-সংরক্ষণের অভিপ্রায় যে না আছে, তাই বা কে জানে? ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এই সন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—"He who sups with the devils needs a long spoon."

ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। সহজ ভাবে যে এই বিল সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইবে, তাহা আশা করা যায় না। সিলেক্ট কমিটীতেই ইহার নমুনা মিলিয়াছে। সেখানেও বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের ভাবী শাসনসংস্কারের অগ্রদূত এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক ভিত্তিও বলা চলে।

ষ্টেট বনাম অংশীদারী ব্যাঙ্ক, মুদ্রা বিনিময়ে বাট্টার হার হ্রাস পূর্ব্বক পণ্য-মূল্যবৃদ্ধি, বড়লাট ও ভারতসচিবের কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি লইয়া নানারূপ তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

সিলেক্ট কমিটীতে মোটামুটি ষ্টেট-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী যাঁরা তাঁরা সংখ্যায় কম। এঁদের যুক্তি এই যে, অংশীদারী ব্যাঙ্কের চেয়েও রাষ্ট্রপরিচালিত ব্যাঙ্ক

অধিক পরিমাণে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। সরকারী ব্যাঙ্ক প্রয়োজনানুযায়ী সরকারী কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারিবে এবং ইহার মূলধনও সম্পূর্ণরূপে সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। সরকারী ব্যাঙ্ক রাজনৈতিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ইংলণ্ডেও ব্যাঙ্ক অফ-ইংলণ্ডের উপর সরকারী প্রভাব সোস্যালিষ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলেও, অধিকাংশই তাহা পছন্দ করেন না। ভারতে অংশীদারী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারও চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বড়লাট ও ভারতসচিবের প্রভাব-মুক্ত ইহা হইতে পারিবে না। সমস্যার অন্ত নাই। তবুও সিলেক্ট কমিটিতে অংশীদারী ব্যাঙ্কের সপক্ষে ১৫ ও বিরুদ্ধে ১০ভোট ছিল। ব্যবস্থা-পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠেরা অবশ্যই বিরুদ্ধ তর্ক তুলিবেন।

স্পেনে অন্তর্দ্রোহ—

প্রত্যক্ষভাবে স্পেনে বর্ত্তমানে কোন বিদ্রোহ না দেখা গেলেও, অসংখ্য দলের মাঝে পরস্পর বিবাদ, রাষ্ট্র-ধর্ম্ম-সমাজের স্বার্থ লইয়া সঙ্ঘর্ষ লাগিয়াই আছে। এই সকল সঙ্ঘর্ষের গভীরে বিদ্রোহীর মনোবৃত্তি স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। শতধাবিচ্ছিন্ন স্পেনের আকাশ-বাতাস আজ অরাজকতা অশান্তির গুমোটে বিষায়িত। বিদ্রোহ, আভ্যন্তরিক বিবাদের আশঙ্কা স্পেনে যে কোন মুহূর্ত্তে করা যাইতে পারে।

স্পেনে দ্বিতীয়বার রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রায় বিংশাধিক দল স্পেন-গবর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। স্পেনিশ কোর্টিজে সোস্যালিষ্ট প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১১০, ইহা মোট সদস্যসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও বেশী। এই সোস্যালিষ্ট দলের নেতা ও বর্ত্তমানের প্রধান মন্ত্রী এজানা। চরমপন্থী ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ কয়েকটি দল মিলিয়া সোস্যালিষ্ট দলের হস্ত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

স্পেনের নব নির্ব্বাচনে এই দুই দলের মধ্যে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছে। সোস্যালিষ্ট-বিরুদ্ধবাদী দলের জয়লাভের একটা কারণ এই, যে এইবার স্পেনের প্রায় ৮০ লক্ষ নারী দেশের অরাজকতা দূর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। পোপ এবং ক্যাথালিকেরাও এই দলকে সাহায্য করিতেছেন। ভোট-বৈশিষ্ট্য এই যে পুরুষ অপেক্ষা নারী ভোটারের সংখ্যাই অধিক। সোস্যালিষ্টরাও উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহ এবং অন্তর্বিপ্লবের ভয় দেখাইতেছেন। সরকারও সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা স্পেনিশ কোর্টিজ পাহারার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। তবে স্পেনে বর্ত্তমানে কোন একটি দলেরও একাধিপত্য নাই।

স্পেনের বিপন্ন শাসন-ভবন

ব্রিটিশ ভারতের বাণিজ্য খতিয়ান—

১৯৩২-৩৩ সালে ব্রিটিশ ভারতে সর্ব্বমোট আমদানী মালের মূল্য ১৩৩ কোটি টাকা এবং রপ্তানী মালের মূল্য

১৩৬ কোটি টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আমদানী পণ্যের শতকরা ৫ ভাগ অথবা ৭ কোটি টাকা এই বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রপ্তানী মালের শতকরা ১৫ ভাগ অথবা ২৫ ভাগ অথবা ২৫ কোটি টাকা কম্‌তি হইয়াছে। রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর বৃদ্ধি হওয়ায় বহির্বাণিজ্যের পণ্য আদান-প্রদান করিয়া ৩ কোটি টাকা ঘর হইতে বিদেশে বাহির হইয়াছে।

জাপান হইতে আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপান হইতে আমদানী মালের মূল্য ছিল ২০,৪৮ লক্ষ টাকা এবং ভারত হইতে জাপানে রপ্তানী মালের মূল্য ছিল ১৪,০৫ লক্ষ টাকা। ১৯৩১-৩২ সালের তুলনায় ১৯৩২-৩৩ সালে ৭,১৬ লক্ষ টাকার বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; তন্মধ্যে ২ লক্ষ টাকা রপ্তানী ও ৭,১৪ লক্ষ টাকা আমদানী হিসাবে। জাপান হইতে আমদানী দ্রব্যের মধ্যে তুলাজাত জিনিষ, নকল রেশম, জুতা, কাঁচ, চীনামাটির দ্রব্যাদিই প্রায় সারা আমদানী মালের শতকরা ৮২ ভাগ।

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে তূলা প্রায় ৩ কোটি টাকার ও পাটজাত দ্রব্যের প্রায় ১½ কোটি টাকার কম রপ্তানী হইয়াছে।

আমদানী জিনিষের মধ্যে বিদেশজাত শিল্প-দ্রব্যের পরিমাণই বেশী। ১৯৩১-৩২ সালে উহার মূল্য ছিল ৩৫ কোটি টাকা কিন্তু গত বৎসরে (১৯৩৩ মার্চ্চ পর্য্যন্ত) তৎপরিবর্ত্তে ৪৭ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩১-৩২ সালের অনুপাতে যথাক্রমে আলোচ্য বর্ষে শতকরা ৩৩ ও ৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩২-৩৩ সালে ভারত হইতে মোট ৬৫½ কোটি টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে উহার মূল্য ছিল ৫৮ কোটি টাকা। আলোচ্য বর্ষে মোট রৌপ্য আমদানীর মূল্য হইতেছে ৭৩ লক্ষ টাকা। উহার মূল্য ১৯৩১-৩২ ও ১৯৩০-৩১ সালে ছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ও ১২ কোটি টাকা।

মোটের উপর মাল-সোণা-রূপার আমদানী রপ্তানীর হিসাব ধরিলে দেখা যায়, ব্রিটিশ ভারতের বহির্বাণিজ্যের আদান-প্রদানে আলোচ্য বর্ষে ৬৮ কোটি টাকা ভারতের অনুকূলে [illegible]াইয়াছে। এই হিসাবে ১৯৩১-৩২ ও ১৯৩০-৩১শে ও যথাক্রমে ৯০ কোটি ও ৩৮ কোটি টাকা ভারতের অনুকূলেই ছিল।

শতাব্দীর একচতুর্থাংশ ধরিয়া দুনিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়গত আদান-প্রদানে ভারতের অবস্থা অনুকূলই পরিদৃষ্ট হয়। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী যুদ্ধের পূর্ব্ব ৫ বৎসরের গড় ছিল ৭৮ কোটি টাকা, যুদ্ধের পর হইতে ১৯২৩-২৪ পর্য্যন্ত ঐ গড় ছিল ৫৩ কোটি টাকা এবং তৎপর ৫ বৎসরের গড় ছিল ১১৩ কোটি টাকা। ১৯৩১-৩২ সালে উহা দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৩৫ কোটি টাকায়; গত বিশ বৎসরের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কম। ১৯২০-২১ ও ১৯২১-২২ সালে এই খতিয়ান ভারতের প্রতিকূল ছিল।

হিসাবের কড়ি কাগজের পৃষ্ঠায় বেশ আশার সঞ্চার করিলেও আসলে কিন্তু ভারতের সার্ব্বজনীন দারিদ্র্য হইতে জনসাধারণ মুক্তি পায় নাই। পাটের বাজার যখন গরম ছিল তখন বাঙ্গালী-চাষী দু'পয়সার মুখ দেখিলেও, তাহা বছর না ঘুরিতেই জমিদার মহাজনের পেট ভরাইতে ও বৈদেশিক বিজলী বাতি, ছাতি-লাঠী কিনিতেই নিঃশেষ হইয়াছে। টাকার মূল্য খতাইয়া দেখিলে সাময়িকভাবেও যে তাহাদের চিরন্তন দুরবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

তারপর, ভারতের এই সামুদ্রিক বাণিজ্যের দুইটী দিক্ লক্ষ্য করিবার আছে। আলোচ্যবর্ষে আমদানী বৃদ্ধি হইবার হেতু এই যে স্বদেশী আন্দোলনের হুজুগে ভাঁটা পড়ায় স্বদেশী দ্রব্যক্রয়ের উপর জনসাধারণের চিত্তের আবেগও স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। স্বদেশী শিল্পের সদ্যজাত কারখানাগুলি আবার সহানুভূতির অভাবে মরিতে বসিয়াছে। বৈদেশিক, বিশেষ করিয়া জাপানের সস্তা মালে বাজার পুনরায় ছাইয়া ফেলিতেছে।

আর একটা ভাবিবার দিক হইতেছে এইযে, ভারত সোণা রূপা বহির্বাজার হইতে খরিদ না করিয়া ঘরের সঞ্চিত ধন বাহির করিয়া যদি দেয়, তবে বাণিজ্যে মোটা লাভ দেখা আশ্চর্য্য নয়। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ভারতের সোণা রপ্তানী যে সুরু হইয়াছে তাহা সপ্তাহের পর সপ্তাহ অবাধে চলিয়াছে। আমেরিকা বা অন্যান্য স্বাধীন দেশ কিন্তু সোণার সঞ্চয়ের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

দেওয়াসের বিপত্তি—

দেওয়াস মধ্য-ভারতের একটি সামন্ত রাজ্য। সম্প্রতি ভারত সরকার দেওয়াসের মহারাজকে যে চরমপত্র দেন তাহারই ফলে দেশের দৃষ্টি এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

কিছুদিন হইতে দেওয়াস রাজ্যে অর্থসঙ্কট-জনিত বিশৃঙ্খলা ঘটে। বিশ্বজনীন অর্থকৃচ্ছ্রতা এই প্রতিকূল অবস্থা আরও উৎকট করিয়া তুলে। শাসক শাসিত উভয়েরই পকেটে টান পড়ায় অতৃপ্তি, অশান্তি ও তৎপরে মনোমালিন্য ঘটে। এ অপ্রিয় অবস্থা প্রতিকার রাজার সামর্থ্যে কুলায় না বলিয়াই বোধ হয় রাজা তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন। অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগে রাজার স্বাস্থ্য-ভঙ্গও হইয়া পড়ে; কিন্তু মাদ্রাজে সুচিকিৎসাধীন না থাকিয়া সরাসরি পণ্ডিচারীতে গিয়া তিনি আড্ডা গাড়েন। সেই জন্যই বোধ হয় ব্রিটিশ সরকারেরও বিশেষ করিয়া চোখ পড়ে। তবে দেওয়াস-রাজ ও ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সকল চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের আদান প্রদান হয়, তাহাতে মনে হয় যে, উভয়ের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধের সংঘর্ষ সুরু হয় বছর ছয়েক আগে, দেওয়াস-রাজের এক পারিবারিক গোলযোগকে কেন্দ্র করিয়া। আভ্যন্তরিক রাজপরিবারের ভিতরের সংবাদটুকু যে কি তাহা সবিশেষ জানা যায় না। তবে মহারাজার সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে, রাণী কয়েক বৎসর হইল দেওয়াস রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভাই কোলাপুরের মহারাজার আশ্রয় লন। বছর তিন চার পূর্ব্বে পুত্রও মায়ের পথানুসরণই করেন। রাজ-রাজড়ার ঘরের কথা সকলের জানিবার অধিকার না থাকিলেও, ইহা সুনিশ্চিত, যে মহারাজার ঘরে বাইরে অশান্তির চাপা আগুন তলে তলে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

ভারত গভর্ণমেণ্ট মহারাজকে রাজ্যে ফিরিয়া বিশৃঙ্খল শাসনব্যাপার ও দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার সুনিয়ন্ত্রণ এবং সুব্যবস্থা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কড়া তাগিদ দেন। শূন্য রাজকোষ! রাজা না ফিরিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ চাহিয়া বসিলেন এবং অনেক মিনতি করিয়া একটুখানি করুণা-প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। এ সব বড় বড় সমস্যার এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই; তবে ভারত গভর্ণমেণ্ট দেওয়াস রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা-স্থাপনের ভার সাময়িকভাবে হইলেও, নিজ হস্তেই লইয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা যেন ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। কাশ্মীর, ভরতপুর, আলোয়ারের কথা বিস্মৃত হইতে না হইতেই দেওয়াসের আবির্ভাব। সামন্ত রাজ্য-গুলির সেকেলে শাসনতন্ত্রের যুগোপযোগী সংস্কার করিবার দিন আজ সমাগত। অচেতনতা ও উপেক্ষা ধ্বংসের বীজকেই প্রবৃদ্ধ করিবে।

আমেরিকায় বরোদার গাইয়োকাড়—

এবারকার চিকাগো বিশ্বজনীন মহামেলার উদ্বোধন-অভিভাষণে বরোদার গাইয়োকাড় জগতের ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য ও

বরোদার মহারাজা

পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়া মানবতার যে মিলন-সম্ভাবনীয়তার আদর্শ দুনিয়ার সামনে ধরিয়াছেন তাহাতে হিন্দু ধর্ম্মের

মূলনীতিই পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দুনিয়া আজ ঐক্যবদ্ধ; কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থের অসামঞ্জস্য লইয়া আজ বিশ্বময় যত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। একমাত্র ধর্ম্ম-চেতনার উপর ভিত্তি করিয়া যদি জগতের জীবন জাগে, তবেই মহামানবের মহামিলন-স্বপ্ন মর্ত্ত্যের বুকে বস্তুতন্ত্র রূপ লইবে।

কালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এক ভোজ সভায় তিনি কালিফোর্ণিয়ার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া বলেন যে, এই দেশের সঙ্গে তাঁর স্বদেশের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে এবং সেখানে ব্যবসা-কৃষি-শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা তিনি বরোদায় প্রবর্ত্তিত করিবেন। আগামী বৎসরেও পুনরায় তিনি আমেরিকায় যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ট্রাভাঙ্কোরের নূতন দেওয়ান—

মিঃ টি আষ্টিনের অবসরের পর সম্প্রতি স্যার মহাম্মদ হবিবুল্লা ট্রাভাঙ্কোরের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ট্রাভাঙ্কোরের মুসলমান দেওয়ান এই প্রথম।

অন্যত্র হিন্দু-রাজ্যে মুসলমান দেওয়ানের অবশ্য নজীর আছে। মহীশূরে স্যার মিরজা ইস্‌মাইল ও পাতিয়ালায় স্যার লিয়াকৎ খাঁ দেওয়ান পদে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সাগরপারে ভারতীয় শ্রমিক—

ভারতের এমন একদিন ছিল, যে দিন সে সাগরপারে পাঠাইত আলোকের দূত—ভারতের সত্য-সভ্যতা-ধর্ম্মকে দুনিয়ার আঁধার বুকে ছড়াইয়া দিবার জন্য; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সমুদ্রে পাড়ি দিতেছে জাহাজ-ভর্ত্তি শ্রমিকের দল এক টুক্‌রা রুটির খোঁজে। বিস্মৃত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে এ অতীত গৌরব-মহিমা যখন স্মৃতির কোঠায় জাগিয়া উঠে, তখন যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে অভিভূত হইতে হয়। কি ছিলাম আর কি হইয়াছি!

দূরত্বের একটা স্বপ্নময় মোহ আছে। অভিজাত-নিপীড়িত বুভুক্ষিত জন-সমাজের সম্মুখে যখন বৈদেশিক বণিকের অর্থলুব্ধ এজেন্টের দল অর্থোপার্জ্জনের রঙ্গীন চিত্র মেলিয়া ধরে, তখন ভবিষ্যতের আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই স্বদেশ-স্বজন ছাড়িয়া হাসিমুখে ক্ষুধিত নরনারী সারি দিয়া জাহাজে উঠে। কিন্তু কঠোর বাস্তব জগতের সম্মুখীন হইয়া চিরবঞ্চিতদের এ মোহস্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। সে কল্পনার ঈপ্সিত স্বর্গের বদলে পায় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটান ছাড়া উপায় থাকে না। সেই অসহায়দের মর্ম্মন্তুদ বেদনার নীরব হাহাকার বে-দরদী আবহাওয়ার বুকে শূন্যতায় আছাড় খাইয়া পড়ে। মানুষের প্রতি মানুষের এই নির্ম্মম উৎপীড়ন, অত্যাচার-বঞ্চনার করুণ কাহিনী ব্যথিতের প্রাণে শিহরণ তুলে। কিন্তু তেমন জন ক'জন? বিশ্বব্যাপী দলবদ্ধ স্বার্থ-লিপ্সুদিগের ষড়যন্ত্রে ব্যথার অশ্রু-আঁখি কোণেই শুকাইয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনায়া, মালয় প্রভৃতির জনশূন্য প্রান্তরের বুকে কৃষি-বাণিজ্য-খনির কাজের শ্রমিকের জন্য শ্বেত ঔপনিবেশিকরা ভারত হইতে এমনি করিয়াই কুলী আমদানী করে। চা-বাগানের কুলী-সংগ্রহের কথা ভারতে সুবিদিত। দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া জাহাজের পর জাহাজ ভর্ত্তি করিয়া মাল-চালানের মতই আলো-বাতাস-হীন ডেকে ক্ষুধার অন্নান্বেষণকারীদের সাগরপারে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। এই কুলীরা মধ্য-দক্ষিণ-ভারতবাসীই বেশী।

ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রায় সহর হইতে বহুদূরে। এই স্থানগুলিও প্রায়ই ব্যাধিপ্রপীড়িত। জঙ্গল কাটিয়া নূতন আবাদ, খনির ভিতরে প্রাণান্ত পরিশ্রম, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, মনিবের বুট-লাথি-চোখরাঙ্গানী সহিয়া হতভাগাদের মরণের পানে চাহিয়া দিন গুজরাণ ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। সূর্য্যের অনুদয়ে বিলাসহীন মলিন শয্যাত্যাগ, বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকা অনুসরণ, উপকরণহীন কাফি ও অপুষ্ট অপ্রচুর আহারে উদরপূর্ত্তি তাহাদের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। জীর্ণ কুটীর-তলে উপেক্ষিত জীবনের সে ক্লান্ত কণ্ঠ-চিরা রাগিণী সভ্যতা-বিলাসী মানবতার পাষাণ হৃদয়দ্বারে বিকট হাস্যরোল তুলিয়া বৃথাই প্রতিধ্বনি করিয়া ফিরে। দুঃসহ জীবন-

ভারের লাঘব করিতে নেশার অর্ঘ্য মরণের পথেই অজ্ঞাতে এদের ঠেলিয়া দেয়।

সভ্যতার বুক হইতে এ কলঙ্করেখা মুছিয়া ফেলিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর মহনীয় প্রচেষ্টা বিরুদ্ধ বাধায় তাঁর জীবন বিপন্ন করিয়াছিল। ইহাতে সেখানকার ভারতীয় শ্রমিকের অসহায় অবস্থার বীভৎস রূপ আরও স্পষ্ট হইয়াই উঠিয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিকার-প্রচেষ্টা কতটুকু সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহাও অবিদিত নয়। কেনায়ার শ্রমিকের করুণ ক্রন্দন এখনও নীরব মন্দা হয়। অর্দ্ধাহারী, অনাহারী, বেকার শ্রমিক কর্ম্মহীন নিরুপায় অবস্থায় পথে ঘুরিয়া মরে। মালয়ের রবার-ক্ষেতের ভারতীয় কুলীর একটি চিত্র আঁকিয়া দেখাইলেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে। ১৯১৭ সালের কথা। ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টায় স্থির হয়, যে সাবালক শ্রমিক দৈনিক ২৫ সেণ্ট অর্থাৎ প্রায় ছয় আনা করিয়া পারিশ্রমিক পাইবে। তখন রবার-ব্যবসায়ীরা প্রায় শতকরা দু'শো তিন'শো গুণ লাভ করিত। কিন্তু ১৯২৮ সালে ভারতবাসীদের আন্দোলনের ফলে ও ভারত-

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত ভারতীয় শ্রমিক

হয় নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বেও কবীন্দ্র রবীন্দ্রের নিকট কেনায়ার ভারতবাসী। সে ব্যাকুল নিবেদন তাদের অশেষ লাঞ্ছনার বার্ত্তাই বহন করিয়া আনে। মালয়ের ভারতীয় শ্রমিকের দুঃখ এখনও ঘুচে নাই। যদিও ১৮৭২ সালে মালায় ও ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে শ্রমিক-সংগ্রহের একটা বিধিবদ্ধ আইন হইয়াছে, কিন্তু শ্রমিকের ন্যায্য কড়ির সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজও হয় নাই।

এইটুকুতেই দুঃখের অবসান নয়। বিত্তহীন, জমিহীন শ্রমিকের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না, যখন কারবারের অবস্থা গভর্ণমেণ্টের পীড়াপীড়িতে এই দৈনিক আয় ধার্য্য হয় মাথাপিছু পুরুষের জন্য ৫০ সেণ্ট, স্ত্রীর ৪০ সেণ্ট, এবং বালকের ২০ সেণ্ট। কিন্তু বছর দুই পরেই মালয় সরকার এই চুক্তি পাল্টাইল। ১৯৩০ সালে রবারের বাজার পড়িয়া যাওয়ায়, দৈনিক মজুরী আরও কমাইবার জল্পনা কল্পনা চলিল এবং বহু শ্রমিককে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়াও দেওয়া হইল।

শুধু মালয়ে নয়, সর্ব্বত্রই ভারতীয় শ্রমিকের এই দুরবস্থা। ক্রমে নিষ্ঠুর নিষ্পীড়নে কুলীদের সুপ্ত চেতনা

জাগিল। স্বগৃহে আপনার জন্মভূমিতে ফিরিবার জন্য সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য দেখা দিল। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মালয় হইতে দেড় লক্ষেরও অধিক শ্রমিক ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়াছে ১৯২৯ সালে ১৪৩৫ জন, ১৯৩০ সালে ৬৯০ জন, ১৯৩১ সালে ১৪১০ জন ও গত বৎসরে ২৪৭৮ জন।

দেশ-বিদেশে এমন ঘুরাঘুরি যেমনি ব্যবসায়ীর পক্ষে হানিকর, তেমনি ভারতবাসীর পক্ষেও অপমানজনক। শ্রমিকদিগের যদি জমি বাড়ীর সুবিধা-সুযোগ দিয়া স্থায়ী বসবাসের সুবন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণকর।

সঙ্গীত-আসর—

মাষ্টার কৈলাস ব্যাস আট বছরের ছেলে। গত মিরাট সঙ্গীত-মজলিসে তার অসাধারণ সঙ্গীত-নৈপুণ্য সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে।

শিশু ওস্তাদ কৈলাসনাথ ব্যাস

প্রফেসর দেবধর ফ্লোরেন্সের আন্তর্জাতিক সঙ্গীত-মজলিসে ভারতের পক্ষ হইতে যোগদান করিবার জন্য সম্প্রতি ইউরোপ গিয়াছেন। তিনি এই উপলক্ষে ইংলণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন সঙ্গীত-কেন্দ্র পরিদর্শন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় সঙ্গীত-শিল্পের উন্নতি-কল্পে প্রফেসর দেবধরের সুনাম পূর্ব্ব হইতেই আছে।

ব্রত-গন্ধর্ব্ব-নিকেতনের ডাইরেক্টর পণ্ডিত ওঁকোরানাথজী ও রয়েল একাডেমী অফ মিউজিকের নেতা স্যার হেনরী উডের মিলন সঙ্গীতজগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই মিলনের মধ্য দিয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সঙ্গীতধারার অন্তরঙ্গ পরিচয় ও আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথজী
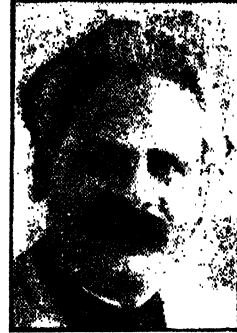
কুমারী সাতারা দেবী প্রফেসর শুকদেবের তৃতীয় কন্যা। ইনি নৃত্য ও সঙ্গীতে বেনারসে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ত্রিলোকের 'আউরৎ-কা-দিল' ফিল্মের ইনি অভিনেত্রী হইবেন।

কুমারী সাতারা দেবী

সনাতনী

(যথার্থ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

গেছে,—
গেছে তারা বহুদিন
মরুময় করি' প্রাণ, আঁধারি' সংসার,—
জীবনের ভোগ-তৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গে গেছে,
অর্থহীন—স্বাদহীন সব।
উচ্চপদে স্পৃহা,
জনসেবা দারুণ মদিরা,
সব একে একে অন্তর্দ্ধান,
শ্মশান প্রতীক এবে
জীবনের খেলা॥

রূপে-গুণে দেবোপম সরল কুমার
রূপডালি নাতিনীর দল—
সুধাধারা বহাইত জীবন-প্রদোষে;
অন্তর্হিত একে একে।
কর্ত্তব্যের দারুণ আহ্বানে,
কর্ত্তব্যের যূপকণ্ঠে বাঁধা বলি মত
দিন পরে গণিতেছি দিন।
চেয়ে আছি অসীমের সসীম প্রান্তর শেষে,
গণিতেছি কবে আসে দিন॥
সান্ত্বনার অলস আশায় চলিনু শ্রীধামে,
দিগন্ত ব্যাপিয়া বেলাভূমি,
শুষ্ক বালুরাশি আমার এ প্রাণের মতন;
নীল আকাশের কোলে, নীল ঊর্ম্মিমালা—
অসীমের স্বরূপ প্রকাশ।
শান্তিদাতা, শান্তিময় জগন্নাথ-পদে,
কতই কুটিনু মাথা; নাহি শান্তি-রেখা।
নিরাশায় ভরিল হৃদয়,
যেই পথে এসেছিনু সে পথে ফিরিনু॥

দূর পর্ব্বতের কোলে ঊষর প্রান্তর,
তার কোলে নিভৃত পল্লীর শোভা,
স্থির ধীর বিরামের অনন্ত আলয়।
সর্ব্ব-শোভা-সম্বলিত মধুর বনানী।
শান্তিহীন হৃদে কিন্তু মধুরিমা কোথা?
বনানীর স্নিগ্ধ শোভা না দেখে নয়ন।
সম্মুখে রয়েছে পড়ে' উদ্যান-বাটিকা
সুশোভিত ফল ফুল—নানা আভরণে
প্রকৃতির যত শোভা ঢেলেছে তথায়;
অপূর্ব্ব সৌরভে পূর্ণ বনানী প্রান্তর।
হেঁট মাথে আছি বসে' ঊষর হৃদয়ে।
ঊষর প্রান্তর যেন বাড়াইছে জ্বালা,
শোভাময় বিটপীর করি' শোভা নাশ॥

চিত্ত বিনোদন হেতু অসংখ্য কুসুম
যত্নে সুরক্ষিত পার্শ্বে, সেবক শ্রদ্ধায়,
উদ্যানের সর্ব্ব শোভা করিয়া হরণ।
ধীরে ধীরে অগ্রসরি' উদ্যানপালক—
বহু পুরাতন ভৃত্য সনাতন মাঝি
নমিয়া সম্ভ্রমে আসি' দাঁড়াইল দূরে।
নয়নে করুণারাশি, মুখে নাই কথা;
ক্ষণেক নীরব রহি, ধীরে ধীরে কয়—
"হাকিম তুমি ত বাবু, জান তুমি সব,
দণ্ড-মুণ্ড-কর্ত্তা তুমি ন্যায়ের পালক,
বিচার কর না বুঝি—
ন্যায়ের পালন তবে করিবে কেমনে?
উদ্যানের শ্রেষ্ঠ শোভা কুসুম-সম্ভার
আনিয়ে দিয়েছে তব সেবার কারণ॥

জান বাবু, কত শ্রমে পালিনু এসব,
কত যত্নে করেছি লালন?
কে ভাবিল সে সব কাহিনী,
সেবা হেতু সেবক তোমার করে আহরণ;
নাহি ভাবি' চিন্তি'
ক্রুর হস্তে বৃন্তচ্যুত করিল কুসুমে,
এনে দিল তব পাশে সেবার কারণ।
সনাতন মাঝি তব ভাবে নি সে কথা,
ভাবে নি কতই যত্নে পালিয়াছে সবে।
ভাবিয়াছে শুধু তব সেবা কথা,
এনেছে তুলিয়া।
কই বাবু, আমি কি বলেছি কিছু—
আমি কি কেঁদেছি?
জানি শুধু যাহার সেবার তরে এদের সৃজন
তারি সেবা তরে হয় এর তিরোধান।
কাল, পাত্র নাহি মানে, মানে প্রয়োজন।
বিধাতার প্রিয় জনে টানেন বিধাতা—
এই নিত্য পথ; এই নিত্য লীলা
সনাতন নাহি জানে ইহার অধিক॥"

ব্রহ্মসূত্র, গীতা, ভাষ্য রাখিনু তুলিয়ে
শুনাইল সনাতন সনাতনী বাণী,
হৃদয় হইল পূর্ণ অপূর্ব্ব শান্তিতে।
উষর প্রান্তর-কোলে পর্ব্বতের শোভা
অপূর্ব্ব মহিমাপূর্ণ হইল চকিতে॥

গীতার যোগ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি"—এই কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেন পরবর্ত্তী শ্লোকে

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" ৮।৬

'যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সে সর্ব্বদা সেই সেই ভাবনা দ্বারা ভাবিত সেই সেই বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

ইহা হইতে যোগের অকাট্য নীতিই প্রকট হয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—জীবন ভোর যে যে ভাবনায় অতিবাহিত করে, মরণের পর চিত্ত সেই ভাবনা-সংযুক্ত হইয়া তাহাই যে লাভ করিবে, ইহা খুবই সঙ্গত কথা। ভরত রাজার মৃগত্ব-প্রাপ্তির উদাহরণ পুরাণে এইজন্যই পরিদর্শিত হইয়াছে। অতএব "মদ্ভাব"-প্রাপ্তির জন্য সাধককে জীবন-ভোর একনিষ্ঠ হইয়া ইষ্টকেই স্মরণে রাখিতে হইবে; এইজন্যই সমগ্র জীবনটাই যে যোগ তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

'মদ্ভাব' ও 'তদ্ভাব', এই দুইটীর বিচার আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বার বার বলিতেছেন, যে যাহাকে অনুধ্যান করিবে, সে তাহাকে পাইবে; "তুমি আমাতে সর্ব্বদা অবস্থিত হও, আমার প্রীতির জন্য আত্ম-সুখ-দুঃখের হিসাব ছাড়িয়া দাও, আমি তোমায় মুক্তি দিব।"

হিন্দু-ধর্ম্মীর নিকট ইহাই সমস্যা। ভারতের ধর্ম্ম-জীবন পাকিয়া ঝুণা হইয়া গিয়াছে। ইষ্ট বলিতে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা ভাব নাই; এই জন্য ভারতের হিন্দু জাতির মধ্যে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্ম বস্তু সর্ব্বত্র—অতএব সাধক যে কোন আশ্রয়ে আপনাকে উন্নীত করিয়া ধরিতে পারে, এবং জীবনের সমস্তখানি আয়ুঃ সেই এক বস্তুতে সংযুক্ত রাখায়, অন্তকালে তদ্ভাব প্রাপ্তি তার অবশ্যম্ভাবী।

এই 'তদ্ভাব' ও 'মদ্ভাব' এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের পার্থক্য সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণের উপাসকের কর্ণে ইষ্ট-বাণী—"মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ"। অন্য সম্প্রদায়ও বলিতে পারে, তাহাদের ইষ্ট-বাণী এই একই মন্ত্রে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করে। কিন্তু বিভিন্ন ইষ্টাশ্রয়বশতঃ, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে তুল্য ভাবে দেখিবে না।

ইহার মীমাংসা পূর্ব্বেও দেওয়া হইয়াছে; পরবর্ত্তী শ্লোকে এই সঙ্কেত পুনশ্চ তিনি দিতেছেন—

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥" ৮।৭

এই হেতু সর্ব্বকালে আমাকে চিন্তা কর, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, এবং মনোবুদ্ধি আমাতে সমর্পণ কর। এইরূপ হইলে আমাকেই লাভ করিবে, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।'

সারা জীবন নিরন্তর যে কোন বস্তুতে চিত্ত স্থির থাকিলে মরণ-কালে তাহার লাভ হয়, এই যুক্তি অকাট্য; কাজেই মদ্ভাব-প্রাপ্তির জন্য, প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে 'আমার' অনুধ্যান যুক্তজীবন লাভের প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ইহা করিতে হইলে, যে হেতু জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কার ও অভ্যাস বশতঃ এক বস্তুতে চিত্ত স্থির হয় না, অতএব চিত্ত-জয়ের জন্য আত্মসংগ্রামের প্রয়োজন। এবং শেষ কথা, মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত ইষ্টে তুলিয়া দিতে হইবে। ইহাই গীতার যোগ ও সাধনার রহস্য।

সর্ব্বভূতেই নারায়ণ আছেন—এই জ্ঞান ভারতে শুধু কথা মাত্র নহে, ইহা হিন্দু-জাতির নিগূঢ় অনুভূতি। জাতি অতি প্রাচীন, অভিজ্ঞতা তার তাই অপরিসীম। কাজেই ইষ্ট-ভেদ বাহ্যতঃ হইলেও, সেই একই অদ্বয়-বস্তুই এ জাতি ইষ্টস্বরূপ গ্রহণ করে। সেই ইষ্টে এইরূপ নিষ্ঠা স্থির হইলে, তাহার ভাগবত-প্রাপ্তিই হইবে। রূপ-ভেদ হইলেও প্রাপ্তি-বস্তুতে ভেদ হইবে না। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ-মূর্ত্তিই সাধকের একমাত্র উপাস্য-কেন্দ্র নহে; সেই অজ, শাশ্বত, সনাতনকে যে কোন আশ্রয়ে স্থাপন করিয়া ভারতের সাধনা। জীবনকাল নানা বিষয়ে চিত্ত অস্থির থাকিবে আর মৃত্যুকালে গঙ্গালাভে সে কৃতার্থ হইবে, এইরূপ হয় না। সাধারণ মানুষ ভাগবত-প্রাপ্তিকে কিন্তু এমনই সহজ করিয়া লইয়াছে। সারা জীবন বিষয়-চিন্তা করিয়া যখন কেহ মরিতে বসে, তখনই তাহার কর্ণে ভগবানের নাম দেওয়া হয়। গঙ্গাতীরে তাহাকে লইয়া আসা হয়। বিকলেন্দ্রিয় মুমূর্ষুর মৃত্যু-বিপ্লব যে কি ভীষণ, সে কথা বুঝে কে? জীবনে ইষ্ট-জ্ঞান যাহার হয় নাই, হরি, কৃষ্ণ, কালী এই সব ঈশ্বর-বাচক মন্ত্র তার কাছে অর্থহীন। তাই পূর্ব্ব শ্লোকে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া মরে, সে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, বলিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে, "সর্ব্বেষু কালেষু" এই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন; অর্থাৎ মৃত্যুকালে যাহাকে স্মরণ রাখিয়া মুক্তি লইতে হইবে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা রক্ষা না করিলে, এই সঙ্কট-কালে ইহা সম্ভব নয়; আর এই স্মরণ রাখা একটা সংগ্রাম, সমগ্র মন ও বুদ্ধি তন্ময় না হইলে ইহা হইবার নহে।

কিন্তু যে বস্তুতে তন্ময় হইয়া মৃত্যুকালে যাহা পাইব তাহা "মদ্ভাব" হইবে, এমন কি কথা আছে? সাধনা যদি ঠিক হয়, আশ্রয়-ভেদ যতই হউক, অদ্বয়-বস্তু-লাভই হইবে। নিত্য-স্মরণে এবং মনোবুদ্ধির লয়ে, ঈশ্বর চৈতন্যের স্ফুরণ হয়—ইহা সাধনার অব্যর্থ বিজ্ঞান। মন ও বুদ্ধি সংস্কার ও সংশয়ের ক্ষেত্র। এই দুই বস্তুর যখন লয় হয়, তখন বুঝিতে হইবে, মানুষ ঈশ্বর ভিন্ন অন্যান্য দেবতার উপাসনা আর করিতেছে না। অন্যান্য দেবতার উপাসনার হেতু শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।" মন বুদ্ধির লয় হইলে, কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া যে সাধনা, তাহা প্রত্যক্ষ ভাগবতারাধনা এবং ইহা মৃত্যু আসিয়া কেশাকর্ষণ করিলে হয় না সর্ব্বকালে, জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে, সবখানি আয়ুঃ দিয়া করিতে হয়। এইরূপ সাধক শাক্ত হউন, গাণপত, শৈবাদি যাহাই হউন, অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বই লাভ করিবেন।

এই বার মন ও বুদ্ধি ইষ্ট-সংযুক্ত করার উপায়ের কথা তিনি বলিতেছেন—

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥" ৮।৮

'হে পার্থ, অভ্যাস-যোগ-যুক্তিতে অনন্যমন দ্বারা দিব্য পরম পুরুষ লাভ করা যায়।'

অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। মরণ-

হালে অন্বয় ভগবৎপ্রাপ্তি নিত্য ভগবদনুস্মরণে সিদ্ধ হয়। এক্ষণে এই ভগবত্তত্ত্ব লাভ কি বস্তু, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিবৃত করিতেছেন। এই শ্লোকে ইষ্টবস্তু যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বা আশ্রয়ে সীমাবদ্ধ নহে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

যে পরম দিব্য পুরুষে যুক্তি-লাভ জীবনের লক্ষ্য, তাহা অভ্যাস-যোগ দ্বারা অনন্যচিত্ত হইলেই পাওয়া যায়। ইহাই অন্তরঙ্গ সাধনার সঙ্কেত। অভ্যাস—"স্বজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহঃ।" চিত্তে একের উপর অখণ্ড প্রত্যয় রক্ষা করা। কোনরূপ বিরুদ্ধ প্রত্যয় সমুদিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা দূরে নিক্ষেপ করা। পূর্ব্বে, এই জন্যই বলা হইয়াছে—"মামনুস্মর যুধ্য চ"। এই অভ্যাস-রূপ যোগ সিদ্ধ হইলে, চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, তখনই ইষ্ট-বস্তুর যে দিব্য পরম রূপ, তাহাই সবখানিকে ভরাইয়া তুলে।

দিব্যং অর্থাৎ দ্যোতনাত্মকং, এই কথায় ভাগবত স্বরূপ বুঝাইতেছে। স্বরূপ অর্থে "সশ্রীকং নারায়ণং" অর্থাৎ শক্তি-সমন্বিত ভগবানকেই বুঝায়। কাজেই ইহার সহিত পরম শব্দ যুক্ত থাকায়, গীতার পুরুষোত্তম-বাদকেই এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

গীতার পুরুষোত্তমবাদ নূতন নহে। পুরাণাদিতে, বিশেষ ভাগবতে ইহা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। সাংখ্যের ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ, গীতার ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের কতকটা অনুরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাংখ্যকার অব্যক্তকে প্রধান বলিয়াছেন, তাহার জ্ঞ অর্থাৎ পুরুষের সহিত অবিভাজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ভাগবত-বিশ্বাসীর অনুভূতিতে, এই পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ-তত্ত্ব। ভাগবত শাস্ত্র বলেন—

> যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ।
> তত্ত্বং ব্রহ্মপরং জ্যোতিরাকাশমিববিস্তৃতম্॥
> যোমায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্।
> বিভর্ত্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ॥
> যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া।
> ত্বমাত্মতন্ত্রং ভগবান্ প্রতীমহি॥

অর্থাৎ তোমার তত্ত্ব আশ্চর্য্য! এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব তোমাতে প্রকাশ পায় এবং বিশ্বমধ্যে তুমিই প্রকাশিত হইয়া থাক। এই তত্ত্ব পরম ব্রহ্ম এবং পরম জ্যোতিঃ-স্বরূপ। ইহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। হে ঈশ! তুমি বহুরূপা মায়া দ্বারা এই বিশ্বকে সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিতেছ, অথচ স্বয়ং বিকারশূন্য। তোমার ক্ষমতা প্রকাশ হয় না, তুমিই সেই আত্মা, আমরা যেন তোমাকে জানিতে পারি।

"তত্ত্বং ব্রহ্মপরং জ্যোতিঃ"—ইহারই প্রতিধ্বনি গীতায় শুনা যায় "পরমং পুরুষং দিব্যং"। কেবল ইহাই নহে, গীতার "মামেতি" হওয়ায় লক্ষণ ভাগবত শাস্ত্রে অতিশয় পরিষ্কার রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে—

> স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্।
> বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্॥
> অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং।
> পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥

অর্থাৎ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যিনি, তিনি বহু জন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার পরে আমায় লাভ করেন ইত্যাদি—ইহাই "মামেতি"।

ব্রহ্ম এইখানে অব্যক্ত তত্ত্ব, অক্ষর স্বরূপ। ইহার পর উক্ত হইয়াছে—কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণুপদ-লাভ হইয়া থাকে।

পাঠকদের স্মরণ রাখিতে হইবে—এই ক্ষেত্রে "পদ"-প্রাপ্তির কথাটী। ইহা তুরীয় নহে। এই জন্যই পুনরায় উক্ত হইতেছে, "যখন আমার ও দেবগণের অধিকার শেষ হইবে, তখন লিঙ্গ-দেহ শেষ হওয়ায় সকলেই প্রপঞ্চাতীত পদপ্রাপ্ত হইবে।"

যিনি পরম ও জ্যোতিঃ-স্বরূপ পুরুষোত্তম, তাঁহাতে অবস্থিত বা উপনীত হইতে পারিলে, মায়াদেহ থাকে না, জীবের নবজন্মই হয়। এই যে ভাগবত জন্ম, ইহার যে উত্তম রহস্যময় সাধন, তাহা এখনও আমরা ধরিতে পারি নাই। তিনি যতক্ষণ পরম ও জ্যোতিঃ-স্বরূপ ততক্ষণ বুঝিতে হইবে—সৃষ্টির দ্যোতনা তাঁহারই; এই মূল ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীব-চৈতন্য যদি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা ধর্ম্মের ব্যভিচার। ভারতে ইহাই ঘটিয়াছে।

প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি আচার্য্য রামানুজের ব্যাখ্যায় সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে—"আদি-ভরত-মৃগত্বপ্রাপ্তিবদিতি ঐশ্বর্য্যবিশিষ্টতয়া মৎসমানাকারো

ভবতি"। মৃগ-স্মরণে মৃগত্ব-লাভ হয়, কাঁচপোকার সান্নিধ্যে তৈলপায়ীর রূপান্তর সিদ্ধ হয়; আর দিব্য পরম পুরুষের প্রতি চিত্তের একাগ্রতায় তদাকার-প্রাপ্তি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যিনি প্রপঞ্চ-সৃষ্টির মূল কারণ, তাঁহাতে যুক্ত জীবন যাহার, তাহার দেহ ভৌতিকবৎ প্রতীত হইলেও ইহা দিব্য দেহ, ঈশ্বরচৈতন্যময়। সর্ব্বকালে যাহার মন এইরূপ ঈশ্বরচৈতন্যে অনুশীলিত হয়, সে ভিন্ন ভাগবত জন্ম ব্যাপার অন্যের উপলব্ধিগম্য নহে। ভারতে এইরূপ এক অসাধারণ ভাগবত-স্বরূপ প্রাপ্ত জাতিগঠনের প্রেরণাই ভাগবত-ধর্ম্মে ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

শ্রুতির তত্ত্ব-বস্তু হইতে এই তত্ত্বের যে কোনই প্রভেদ নাই, ইহা প্রদর্শনের জন্য নিম্নের দুইটী শ্লোক শ্রুত্যাদির শাস্ত্র হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে—

"কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মনোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ॥
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন।
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্।
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

'কবি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, পুরাণ অর্থাৎ অনাদি-সিদ্ধ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সর্ব্ববিধাতা, অচিন্ত্য-স্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ, প্রকৃতির অতীত, পরম দিব্যপুরুষকে যে ব্যক্তি স্মরণ করেন, তিনিই মরণ সময়ে একাগ্রচিত্তে ভক্তিসমন্বিত হইয়া যোগপ্রভাবে ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণবায়ুকে রক্ষা করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন।'

চমৎকার সমস্যার সমাধান।

এই দেশ ও জাতির অভ্যুত্থান এইরূপ আত্মার জাগরণ ভিন্ন সম্ভব নহে। যে জাতির মধ্যে এইরূপ অসাধারণ চরিত্রের মানুষ গড়িয়া উঠে, সে জাতিই জগৎ ধন্য করিতে পারে। ভারতে ইহা আজও যদি সম্ভব হইয়া না থাকে, মানবোন্নতির দিগদর্শনের এই অভ্রান্ত স্বপ্ন উদীয়মান জাতিকে প্রবুদ্ধ করিবে।

দুইটী শ্লোকে কেবল পরম পুরুষের বিবরণ প্রদর্শিত হয় নাই, কি প্রকারে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারও সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকদ্বয়ের পরেই ইহার সাধন-তত্ত্বও কথিত হইয়াছে।

আশ্রয় ও আশ্রিত, এই দুই তত্ত্বের সমন্বয়ে ইষ্ট-বস্তু নিরূপিত হয়। এক ছাড়িয়া অন্যের অনুধ্যান বন্ধ্যার সন্তান তুল্য নিরর্থক চিন্তা। এই জন্যই সহজিয়া-ঋষির কণ্ঠে ধ্বনি উঠিয়াছিল—"আমি তো আশ্রয় হই, রমণ-কালেতে গুরু তুমি।" কত বড় শ্রুতিসিদ্ধ বাণী এই সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, মরমী ভিন্ন অন্যকে বুঝাইবার নহে।

তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু তত্ত্বের আশ্রয়ও তাহাতে ভিন্ন করিয়া দেখা মূর্খতা। পুরুষের আশ্রয় প্রকৃতি; এই আশ্রয়ে তিনি লীলায়ত। "মায়িনমপি মায়াতীতম্"—স্মরণের বস্তু এই তত্ত্ব। ইনি সর্ব্বজ্ঞ। অতীত ও অনাগত কিছুই তাঁহার অবিদিত নয়। কেননা, তিনি সনাতন, সকল কারণেরই তিনি কারণ-স্বরূপ; কাজেই তাঁহাকে অনাদিসিদ্ধ বলিতেও দোষ হয় না, তিনি সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। তিনি অপরিমিত-মহিমত্ব হেতু মনোবুদ্ধির অধিগম্য নহেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অনুভূতির বাহিরে নহেন। তিনি সূর্য্যের ন্যায় স্বরূপ-প্রকাশক—"আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকার তাঁর অনুধ্যানে দূর হয় বলিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নহে। অকৃত্রিম ভক্তি-সহকারে অন্তঃকালে এইরূপ পুরুষের স্মরণ যাঁহার অব্যাহত থাকে, তিনি যে এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে পাইবেন, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।

প্রাণ-বায়ুকে ভ্রূমধ্যে উত্তোলিত করিয়া পুরুষোত্তমের দর্শন-লাভ হয়। যোগ-বলই ইহার সহায় বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সাধন-রহস্যের উত্তম সঙ্কেত আছে, তাহা পরে ব্যক্ত করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

যবনিকা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সব কান্নাই এক সময়ে থামে। এবাড়ীর কান্নাও থামিল।

অমলবাবুর সংবাদ লইতে প্রদ্যোৎ আসিয়াছিল; সে সংবাদ নিদারুণভাবে সে পাইয়াছে। এখন আর তাহার এ বাড়ীতে থাকার কোন প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা করিলে দরজা হইতে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াই সে চলিয়া যাইতে পারিত। বুঝি যাওয়াই তাহার পক্ষে শোভন। কিন্তু তাহা হইল না।

বিমল কমল তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধার শোকের আবেগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তিতে কাণায় দরজার কাছেই বসিয়া ধুঁকিতেছেন। অমলবাবুর ছোট ছোট ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীরা অবাক্ হইয়া কজনের মুখের দিকে চাহিতেছে। দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অমলবাবুর দুই বোন।

প্রদ্যোতের সমস্তই অদ্ভুত লাগিতেছিল। কেমন যেন তার আজ মনে হইল, এই পরিবারটির সহিত সম্বন্ধ তাহার মাত্র দুদিনের নয়। ইহাদের সুখ দুঃখ, আশা ভরসার সহিত তাহার জীবন অনেক আগে হইতেই বিধাতা অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাদের ভার তাহাকেই বহন করিতে হইবে, ভাগ লইতে হইবে ইহাদেরই সম্পদ্ ও বেদনার। এ সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার তাহার উপায় নাই।

বৃদ্ধা খানিক পরে একটু শান্ত হইয়া বলিলেন—"ঘরে গিয়ে বসবে চল বাবা, কতখানি পথ হেঁটে এসেছ না দুপুরবেলায়!"

প্রদ্যোৎ সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না।

জীবনের তুচ্ছতম দাবীও মৃত্যুর চেয়ে বড়, একথা মানুষ বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই বোঝে, মৃত্যুর শূন্যতা তাই বার বার ভরিয়া উঠে জীবনের কোলাহলে, সমাধির রিক্ততা ঢাকিয়া যায়।

অত বড় মৃত্যুর ছায়ার তলাতেই তারপর আরম্ভ হইল প্রতিদিনের জীবনের গতি। ছেলেরা উঠানে খেলা করিতেছে, রান্নাঘরে বিকালে খাবারের জন্য বুঝি উনুন ধরান হইতেছে। চারিধারে জীবনের ছোটখাট ব্যস্ততা।

প্রদ্যোৎ বিমল কমলকে লইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেন আরও অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, পিছনের বাঁশবনের ভিতর মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার শব্দ শোনা যাইতেছে, মনে হয় বৃষ্টি শীঘ্র নামিতে পারে।

ঘরের ভিতর আলো-অন্ধকারে বসিয়া দুই ভাইয়ের কাছে প্রদ্যোৎ অমলবাবুর শেষ কয়দিনের সমস্ত সংবাদই লইল। জর বন্ধ হইলেও শরীর যে অমলবাবুর সারে নাই তাহা সে নিজেই দেখিয়া গিয়াছিল। তারপর জোর করিয়া একদিন পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়া তিনি আবার জরে পড়েন। দেখিতে দেখিতে সে জর সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। চিকিৎসা যে পয়সার অভাবে একেবারে হয় নাই তাহা নয়। স্থানীয় ডাক্তার নিজে হইতেই যথেষ্ট দয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগ তখন চিকিৎসার অতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারদিন পূর্ব্বে সকালবেলা হঠাৎ বুঝি হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়াই অমলবাবু মারা যান।

এসকল কথার মধ্যে হঠাৎ কমল বলিল—"আমরা এখান থেকে চলে যাব জান, রাঙাদা? মা বলেছে, আমরা এবার মামার বাড়ী যাব।"

বিমলও সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ মামার বাড়ী যাবে! তুই যেমন বোকা! মামার বাড়ী আমাদের আছে নাকি? এক মামা ছিল, সেত কবে মরে গেছে।"

কমল বিমলের এ কথাবার্ত্তা না শুনিলেও, এ সংসারের অবস্থাটা বোঝা প্রদ্যোতের পক্ষে কঠিন হইত না। এই বিপদের পর ইহাদের সংসার কেমন করিয়া চলিতেছে,

ভবিষ্যতেই বা কেমন করিয়া চলিবে, প্রদ্যোতের তাহাই এখন জানিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু ছোট এই দুটি ছেলের নিকট সে সংবাদ লওয়া যায় না। অমলবাবুর মার কাছেও গায়ে পড়িয়া সে কথাটা জিজ্ঞাসা করা উচিত হইবে কিনা, সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

অনেকক্ষণ বাদে সে জিজ্ঞাসা করিল—এ গাঁয়ে তোমাদের আপনার লোক কেউ নেই, বিমল?

"আপনার লোক!" বিমল বেশ ভাবনায় পড়িয়াছে বোঝা গেল; কমলকে কিন্তু ভাবিতে হইল না। চট্‌পট্ সে জবাব দিল—"হ্যাঁ, আরও অনেক লোক আছে, রাঙা-দা। তুমিও চেন না। ওই ওধারে, রতনদের বাড়ি, আর এই বাঁশবাগানের পাশে কেষ্ট, নন্দ, হাবু—"

তাহার কথার মাঝে ধমক দিয়া বিমল বলিল—"তুই থাম! ওদের বুঝি আপনার লোক বলে? ওরা কি আমাদের কেউ হয়। না আমাদের ভালবাসে? কেষ্টর বাবা আমাদের বাঁশবাগান খানিকটা কেড়ে নিয়েছে, জান রাঙাদা?"

দুই ভাইয়ের কথা হইতে আর কিছু না হউক, এ সংসারের আবেষ্টনটির আভাষ কিছু-কিছু প্রদ্যোৎ পাইতেছিল। চারিদিকের লোক ও স্বার্থপরতার মাঝে এই পরিবারটি নিজেদের অধিকারটুকুও যে ভাল করিয়া বজায় রাখিতে পারিতেছে না, এটুকু তাহার বুঝিতে বাকী ছিল না। তাহার বিস্মৃতির যবনিকা এখনও সমান ভাবেই সমস্ত অতীতকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। তবু কেমন যেন তার মনে হয়, গ্রামের এই শ্বাসরোধকারী স্বার্থপরতার আব্‌হাওয়ার সহিত সে অপরিচিত নয়। জীবন যেখানে নিস্তেজ নির্জীব ভাবে মৃত্যুর সাথে দুর্ব্বল ভাবে বোঝাপড়া করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেখানকার মন্থর স্রোতের ক্লেদ ও গ্লানি যেন সে ভাল করিয়াই জানে।

কিন্তু এই সংসারটির জন্য সে কিই বা করিতে পারে, ক্ষমতাই তাহার কতটুকু! কোন রকমে ভাগ্য-ক্রমে তাহার নিজের জীবিকাটুকু সে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের সামান্য সাহায্য সে করিতে পারে; কিন্তু এই পরিবারটির সমস্যা তাহাতে মিটিবে কি? সত্য কথা বলিতে গেলে, এই সংসারটিকে খাড়া করিয়া তোলা কি সম্ভব? অমলবাবুও ত এই চেষ্টাই করিয়াছিলেন এবং এই চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রাণও দিতে হইয়াছে। ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তি ইহাদেরই জন্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

ইহাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সত্যই প্রদ্যোৎ কোন কূল দেখিতে পায় না। কিন্তু একটা কথা সে ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারে। ইহাদের সহিত নিজের ভাগ্যকে বিচ্ছিন্ন করিতে আর সে পারিবে না, বিচ্ছিন্ন করিতে সে চাহে না। ইহাদের ভার যত গুরুভারই হোক, তা বহন করতে তাহার নিজেরই একটা স্বার্থ আছে। চারিধারের শূন্যতার মাঝে এইবার সে পাইয়াছে একটা আশ্রয়, পাইয়াছে এমন একটা অবলম্বন যাহার দ্বারা নবজাগ্রত জীবনকে কিছু পরিমাণে অন্ততঃ সে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে।

সমস্ত ব্যাপারটার ভিতর ভাগ্যের হাত বুঝি অনেক-খানি আছে। এই পরিবারটির সহিত পরিচয়, অমলবাবুর মৃত্যু সমস্তই যেন ঘটিয়াছে অদৃশ্য কোন নিবিড় ইঙ্গিতে! সে ইঙ্গিত প্রদ্যোৎ উপেক্ষা করিতে পারিবে না। একদিন অমলবাবুকে সে ঈর্ষ্যা করিয়াছে, আজ ভাগ্য তাহাকে যেন পরীক্ষা করিবার জন্যই সেই আসনে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে। পশ্চাৎপদ হওয়া আর তাহার সাজে না, হইতে সে চাহে না।

বাহিরে খানিক আগে হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, হঠাৎ আকাশ যেন আর জলভার ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ঘর-দোর অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাতার চালের কত দিন সংস্কার হয় নাই কে জানে! খানিক বাদেই উপর হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া জল চুয়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল।

কমল উৎসাহভরে বলিল—"আমাদের ঘরে আরও জল পড়ে জান, রাঙাদা! চল না, দেখবে চল না!"

প্রদ্যোৎ কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আপনা হইতে যে ভার সে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে চাহিতেছে, তাহার গুরুত্ব সে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল।

খানিক বাদে বৃষ্টির ভিতর ভিজিতে ভিজিতে অমলবাবুর মা ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। "গাঁয়ের পথঘাটের যা অবস্থা, কাদায় কাদা হয়ে গেছে এর মধ্যেই। যাবার যে বড্ড কষ্ট হবে।"

প্রদ্যোৎ বলিল—"আজ আর যাব না মা, বৃষ্টি না হলেও যেতাম না।"

রাত্রেও বৃষ্টি থামিল না। অমলবাবুর ঘরেই প্রদ্যোতের শুইবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। খাওয়া দাওয়া সারিয়া সেখানেই সে আসিয়া বসিয়াছিল।

দাদার ঘরের দিকে কমল ও বিমল ইহার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই মাড়াইত না। আজ কিন্তু তাহাদের ঘর ছাড়িবার কোন লক্ষণ নাই। দু'জনেই যে রাঙাদাদার সহিত শয়ন করিবে, এ ব্যবস্থা তাহারা নিশ্চয়ই করিয়া লইয়াছে।

প্রদ্যোৎ রাত হইতেছে দেখিয়া তাহাদের ঘুমাইতে যাইতে বলিল; কিন্তু সে কথা কে শোনে!

কমল একটা অজুহাতও খুঁজিয়া বাহির করিল। বার কয়েক পীড়াপীড়ি করিতে সে বলিল—"ও ঘরে কেমন করে শোব! বড্ড জল পড়ছে যে!"

কমল ওঘরে শুইতে গেলে বিমলের অধিকার কায়েমী হয়, সে তাই প্রলোভন দেখাইয়া বলিল—"যা না, বড়দি গল্প বলবে'খন।"

গল্প সম্বন্ধে কমলের কিন্তু কোন প্রকার আসক্তি আর নাই দেখা গেল। অনায়াসে দাদাকে সে সৌভাগ্যে উপভোগ করিতে অনুমতি দিয়া সে বলিল—"তুমি যাও না। তুমিইত গল্প ভালবাস!"

রাঙাদার কাছে নিজের মর্য্যাদা বাঁচাইয়া বিমল বলিল, "আহা ওসব ছেলেমানুষী গল্প বুঝি আমি ভালবাসি! আমি বই-এ ওর চেয়ে কত ভাল গল্প পড়ি।"

বাক্‌যুদ্ধে কে শেষ পর্য্যন্ত পরাস্ত হইত বলা যায় না, কিন্তু সেই সময়ে মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। মায়ের কথার উপর বুঝি কথা চলে না, নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবে কমল বিমলকে রাঙাদার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যঘরে শুইতে যাইতে হইল। বিমল যাইবার সময়ে কাণে কাণে বলিয়া গেল, যে কাল ভোর হইলেই সে আসিবে এবং রাঙাদাকে লইয়া এমন এক জায়গায় বেড়াইতে লইয়া যাইবে যে কমল হাজার চেষ্টা করিলেও তাহাদের ধরিতে পারিবে না।

দাদার এ দুরভিসন্ধি কিন্তু কমল ধরিয়া ফেলিয়াছে, দেখা গেল। অর্দ্ধেক পথ হইতেই একবার ফিরিয়া আসিয়া সে চুপি চুপি প্রদ্যোতের কাণের কাছে বলিয়া গেল—"দাদা, কাল লুকিয়ে বেড়াতে যাবে বল্লে, না রাঙাদা! দাদার চেয়ে আমি অনেক ভোরে উঠ্‌ব, দেখো।"

অমলবাবুর মা ঘরের ভিতর আসিয়া বসিয়াছিলেন। এইবার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"এঘরে ঢুকতে যে আর ইচ্ছে করে না বাবা; কিন্তু তোমায় শুতে দেব, এমন একটা ঘরও নেই।"

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সান্ত্বনা দিবার নিস্ফল চেষ্টা না করিয়া প্রদ্যোৎ চুপ করিয়া রহিল। খানিক বাদে বৃদ্ধা একটু শান্ত হইলে সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের এখন চলবে কি করে?"

সামান্য একটা প্রশ্ন। কিন্তু ইহার জন্যই সমস্ত সন্ধ্যা ধরিয়া যেন প্রদ্যোতের নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। সাধু সঙ্কল্প অত্যন্ত সহজেই করা গিয়াছিল; কিন্তু কাজের বেলায় এত বাধা আসিবে, তাহা প্রদ্যোৎ ভাবে নাই। এই পরিবারটির সহিত নিজের ভাগ্যকে জড়াইয়া লইতে সে চায় বটে; কিন্তু ইঁহারা তাহার সে চেষ্টাকে যে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। সত্য-সত্যই কোন আত্মীয়তার সূত্রই তাহাদের মধ্যে নাই। সামান্য একটু সহানুভূতি হইতে ঘনিষ্ঠতার স্তরে একেবারে নামিয়া আসা সহজ নয়, বুঝি শোভনও নয়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাই প্রদ্যোৎ দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে কাটাইয়াছে। গায়ে পড়িয়া উপকার করিতে যাওয়ার ভিতরও কেমন একটা নির্লজ্জতার আভাষ পাইয়া তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবলই মনে হইয়াছে, ইঁহাদের অভাবের খোঁজ লইতে গিয়া কোন রকম অপমান সে না করিয়া বসে। হাজার হইলেও সে বাহিরের লোক—অমলবাবুর

পরিচিত বন্ধু মাত্র। এ সংসারের সহিত পরিচয়ও তাহার গভীর হয় নাই। কমল বিমলের শিশু-মন অনায়াসে তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে বটে ; কিন্তু বড়দের মনোভাব তেমন না হইতেও পারে, না হওয়া অস্বাভাবিকও নয়। তাহার নিঃসঙ্গতার মরু হইতে যে আগ্রহ লইয়া সে এই দরিদ্র সংসারটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে, ইহাদের কাছে তাহা বাড়াবাড়ি বলিয়াও মনে হইতে পারে। হয়ত সত্যই সে অধিকারের সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন করিয়া তাই প্রদ্যোৎ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া রহিল। কিন্তু প্রদ্যোতের আশঙ্কা বোধ হয় অমূলক। বৃদ্ধা সহজ-ভাবেই এ প্রশ্ন গ্রহণ করিয়াছেন, মনে হইল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি হতাশভাবে বলিলেন—"কি বল্‌ব বাবা, চলবার ত কোন উপায়ই দেখছিনে।"

সাহস পাইয়া প্রদ্যোৎ বলিল—"বিমল কমলের পড়া-শুনারওত একটা ব্যবস্থা দরকার, বেশী বয়স হয়ে গেলে আর মন বসবে না।"

অমলবাবুর মা বলিলেন—"তার চেয়ে আরেক ভাবনা যে আমার বড়, বাবা! বিমল কমল ছোট ছেলে, বেঁচে থাকলে মোট বয়েও খেতে পারবে, কিন্তু নির্ম্মলার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, এখন বিয়ে না দিলে আর যে মুখ দেখাতে পার্‌ব না। এরি মধ্যেই লোকে কত নিন্দে করছে।

প্রদ্যোৎ এদিকের কথাটা সত্যই ভাবে নাই। খানিক নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল—"এখন আপনাদের আর কি আছে?"

"আর?" বৃদ্ধা হতাশভাবে বলিলেন—"নেবুর মাইনে-টুকুই সম্বল ছিল এতদিন। এখন এই ভদ্রাসনটুকু শুধু আছে, এই বেচে টেচে তোমরা যদি মেয়েটাকে পার করে' দিতে পার।"

"মেয়ে না হয় পার হল ; কিন্তু ভদ্রাসন গেলে থাকবেন কোথায়, ছেলেপুলেরা খাবে কি?"

বৃদ্ধা চিরন্তন রীতি অনুযায়ী ভাগ্যের দোহাই পাড়িয়া বলিলেন—"ভগবান যা যাপাবেন। কিছু না থাক, গাছতলা ত আছে, ভিক্ষে ত এখনো মেলে।"

প্রদ্যোৎ চুপ করিয়া ছিল, বৃদ্ধা আবার বলিলেন—"বিক্রী না করলেও, জায়গা-জমি যেটুকু আছে রাখতে ত পারব না বাবা। নেবু বেঁচে থাকতেই একটু একটু করে' চারধার থেকে সবাই ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছিল। খিড়কির পুকুরটা জোর করে' মুখুজ্যেরা ভরাট করলে, বখরার দাম দিলে না। দাখিলাপত্র ত নেই, কে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে। বোসেরা বাঁশবাগানের অর্দ্ধেকটা দখল করে' নিয়েছে এরই মধ্যে। এখন ত ওদের আরো সুবিধে হ'ল। দুটো নাবালক ছেলে আর মুরুব্বির মধ্যে আমি অথর্ব্ব বুড়ো একটা মেয়ে মানুষ ; এখন ত যা খুসী তাই করবে। তার চেয়ে ও বেচে দেওয়াই ভাল। নেবুর অসুখের সময় থেকেই পালেরা ক'ভাই মিলে কিনতে চাইছে। দর যাই হোক, টাকা কটাত পাওয়া যাবে।"

প্রদ্যোৎ এতক্ষণে বুঝি অনেকটা জোর পাইয়াছে। দৃঢ়ভাবে সে বলিল—"লোকে ফাঁকি দিয়ে নেবে বলে' জলের দামে বিক্রী করতে হবে? তা হতে পারে না মা।"

বৃদ্ধা হতাশভাবে বলিলেন—"আমাদের হয়ে দাঁড়াবার যে কেউ নেই বাবা!"

প্রদ্যোৎ চুপ করিয়া রহিল।

প্রদ্যোৎ এখনও পর্য্যন্ত সেই বোর্ডিং-এই আছে ; বিদেশে পড়াইতে যাওয়ার কাজটি শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেই হইল। সকাল বিকাল সে টিউশনি করে। অমলবাবুর মত রাত্রে একটা পাইলেও তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু অমলবাবুর মত সে ইহাতে ক্ষুব্ধ নয়। বিক্ষোভ তাহার মনের দিগন্তে কোথাও নাই, সমস্ত আকাশ উৎসাহের আলোয় ঝলমল করিতেছে।

প্রদ্যোতের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে, অন্ধকার যবনিকার উপর দেখা দিয়াছে রূপালি তন্তুজাল। আশা হয়, অচিরে সমস্ত শূন্যতা সূক্ষ্ম সেই তন্তুর বুনানিতে ঢাকিয়া যাইবে। স্মৃতির সঞ্চয় তাহার মনে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ইহার মধ্যেই। জীবন তাহার একটা কেন্দ্র পাইয়াছে প্রদক্ষিণ করিবার মত। তাহারও নিজস্ব একটা জগৎ এখন আছে, সে জগতে তাহার নিশ্চিন্ত অধিকার। ইহারই জন্য ভাগ্যের কাছে সে কৃতজ্ঞ।

কি ছোটখাট ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়াই তাহার মনে

উৎসাহ ও আনন্দের এমন ঢেউ উঠিতেছে, ভাবিলে অবশ্য অবাক্ হইতে হয়। অসাধারণ কিছুই তাহার মধ্যে নাই। অমলবাবুর মতই সে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া ছেলে পড়ায়। মিতব্যয়িতার চরম আদর্শ হইয়া পয়সা বাঁচায় ও সপ্তাহের ছয়টি দিন একটি দিনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারেই যেন পরম রহস্যের স্বাদ আছে। উত্তেজনা আছে দুরূহতম সাধনার। প্রদ্যোতের সমস্ত মন ইহাতেই তন্ময় হইয়া থাকে, আপ্লুত হইয়া যায় অদ্ভুত আনন্দ-রসে। সে যেন নূতন কিছু সৃষ্টি করিতেছে, নূতন এক জগৎ, মানবেতিহাসের নূতন এক অধ্যায়। সাংঘাতিক রোগভোগের পর সারিয়া উঠিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অনুভূতি প্রখরতর হইয়া উঠে, মন অতিরিক্ত তীক্ষ্ণভাবে সমস্ত জীবনের স্বাদ যেন পায়। প্রদ্যোৎ রোগ নয়, একেবারে মৃত্যুর শূন্য তমিস্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে জীবনের অসীম তৃষ্ণা লইয়া। প্রখরতম অনুভূতি, সূক্ষ্মতম জীবন-বিলাসিতার ক্ষুধা লইয়া সে জাগিয়াছে। তাহার কাছে কিছু তুচ্ছ নয়। অভ্যাসের ক্লান্তিতে জীবনের স্বাদ যাহাদের কাছে বিরস হইয়া আসিয়াছে, প্রদ্যোতের সুতীক্ষ্ণ উপভোগের মর্ম্ম বোঝা তাহাদের সাধ্য বুঝি নয়।

ইতিমধ্যে বার কয়েক প্রদ্যোৎ দারবাক যাতায়াত করিয়াছে। পরিবারটির সহিত সম্বন্ধ তাহার সহজ হইয়া আসিতে বিলম্ব হয় নাই। সম্বন্ধ সহজ করিবার পথে সব চেয়ে সাহায্য করিয়াছে অবশ্য অমলবাবুর দুটি ভাই। তাহাদের ভালবাসা অন্তরঙ্গতার পথ মসৃণ করিয়া দিয়াছে।

শনিবার সকাল হইতেই প্রদ্যোতের আজকাল ঘুমটা কেমন করিতে থাকে আনন্দে, উত্তেজনায়। বোর্ডিং-এর অধিকাংশ বাসিন্দাই চাকুরে, শনিবারটির দিকে তাহারাও উৎসুকভাবে সারা সপ্তাহ চাহিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের কাহারও অনুভূতির ততখানি তীব্রতা বুঝি নাই।

সুপারী নারিকেলের বন, তাহারই ছায়ায় পাতার ছাওয়া একটি বাড়ী—শুকনো মাটির আঙ্গিনা তাহার খটখট করিতেছে। একধারে ফুটিয়াছে ডালিম গাছের ফুল। সমস্ত ছড়াইয়া একটি শীতল মধুর গন্ধ উঠিতেছে ছায়াস্নিগ্ধ বাতাসে। ক্ষণে-ক্ষণে এসমস্ত প্রদ্যোতের মনে পড়িয়া যায়। নূতন প্রেমের কল্পনার মত এই ছবিটি অদ্ভুতভাবে তাহাকে নাড়া দেয়, অপ্রত্যাশিতভাবে ঢেউ তুলিয়া যায় তাহার সারা মনে। তাহারও আছে নিভৃত এক আশ্রয়, ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিবার, স্নেহ ও সহানুভূতির উত্তাপে আরাম করিয়া দিনযাপন করিবার একটি নীড়, একথা ভাবিতেই তাহার মনে আনন্দ-শিহরণ জাগে।

বড়দির ছেলেমেয়ের জন্য নূতন কি খেলনা কিনিবে, নূতন কি জিনিষ কমল বিমলের জন্য আনিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে পড়াইতে যায়। পড়ানটা তেমন ভাল করিয়া জমে না বোধ হয়। বিকালের জন্য তাহার মনটা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

বাজার সে দুপুর বেলাই শেষ করিয়া রাখে; কোথায় অসময়ের একটু আনাজ, পাড়াগাঁয়ে যাহা একেবারে দুষ্প্রাপ্য, কোথায় সস্তা একটি খোলশ মূল্যের তুলনায় চাকচিক্য যাহার অত্যন্ত বিস্ময়কর, দিদির কাঁথা সেলাইএর জন্য গুলিসুতা, কমলের লাট্টু ঘুরাইবার জন্য একটা লেত্তি, বিমলের লিখিবার জন্য একটা রুল-টানা খাতা, রান্নাঘরের জন্য একটা সস্তা কাঠের চাকী, অনেক কিছুই তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয়।

তাহার আয়োজন বিকালের আগেই সম্পূর্ণ হয়। তারপর ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেও যেন তাহার তর্ সহে না। সময় যে কত মূল্যবান্, তাহা সে একাই যেন বুঝিয়াছে।

ট্রেণ কিন্তু যথাসময়েই প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়ায়। ছোটখাট কোঠাটি লইয়া প্রদ্যোৎ তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় জানালার ধারে গিয়া বসে। তাহার পর তাহার মনের উল্লাসের প্রতিধ্বনি তুলিয়া ট্রেণ ছাড়ে। প্ল্যাটফর্ম্ম, ওভার-ব্রিজ, সহরের জীর্ণতম একটি অংশ দেখিতে দেখিতে পিছনে ফেলিয়া ট্রেণ বিস্তীর্ণ উদার মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়ে। বর্ষা শেষ হইয়া আসিতেছে। দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত দুলিতেছে হরিৎ সমুদ্র, চাষাদের গ্রাম তাহারই মাঝে মাঝে দ্বীপের মত ভাসিতেছে এবং সমস্ত দৃশ্যের উপর পড়িয়াছে হয়ত অস্ত-রবির লোহিতাভ আলো—বিষণ্ণ

মধুর হাসির মত। পরম পরিতৃপ্তিতে প্রদ্যোৎ জানালার ধারে মাথা রাখিয়া চোখ ছুটি মুদিত করে। জীবনের স্বাদ এত মধুর, এমন অপরূপ!

দূর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে, নির্লিপ্ত ভাবে সে গ্রামকে সেদিন যে বিচার করিয়াছিল তাহারই রূপ আজ তাহার কাছে একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

ছোট একটি ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ থামে। তাহাতে আগের সমস্ত পথটি যেন প্রদ্যোতের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। মুখস্থ হইলেও, সে পথটি পুরাতন কবিতার মত মধুর। প্রতিবার ট্রেণ সেটিকে আবৃত্তি করিয়া যেন নূতন অর্থ, নূতন ইঙ্গিত তাহার কাছে উদ্ঘাটিত করিয়া যায়। কোথায় ছোট একটা সাঁকো, ট্রেণের আওয়াজ ভঙ্গী হইতে না হইতে মিলাইয়া যায়। শীর্ণ একটু জলপথ গিয়াছে এধারের প্রান্তরের সহিত ওধারের মিতালি করিতে। ছোট একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া কোথায় ছোট একটি চাষাদের গ্রাম সরল দিকচক্রপাল-রেখাকে ভাঙ্গিয়া বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। তাহার পর বুঝি বিস্তীর্ণ এক জলা, আসন্ন-সন্ধ্যায় ম্লান আলো পড়িয়া আছে সৃষ্টি-ক্লান্ত বিধাতার অবসাদের মত—প্রাণের স্পন্দন নাই। নাই বর্ণ ও রেখার ব্যঞ্জনা, অসীম ধূসর শূন্যতা, মনে হয় ইহার শেষ নাই। কিন্তু ট্রেণ তাহাও পার হইয়া যায়, আবার দেখা যায় শস্যশ্রী-আন্দোলিত প্রান্তর, মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা জলপথ, ডোঙা বাহিয়া চাষী চলিয়াছে দূর গ্রামের দিকে। তারপর জীর্ণকায়া একটি নদী, কোন সুদূর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে অশ্রু-ধারার মিনতির মত। ট্রেণের স্বর গাঢ় হইয়া আসে আবেগে, কাঁপিয়া ওঠে বুঝি একটু, গতি মন্থর হইয়া আসে। খানিক পরেই আসিয়া পড়ে লেভেল ক্রসিং। লোহার গেট ধরিয়া নীল জামা গায়ে লাল পাগরীবাঁধা পয়েন্টসম্যান দাঁড়াইয়া আছে। প্রদ্যোৎ তাহাকে চেনে, জানে তাহার গুমটি-ঘরটি। যে ছেলেটি গেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত নাড়িয়া ট্রেণকে উৎসাহ দেয়, গেটের ওপারে দুই চাকা গরুর গাড়ী লইয়া যে গাড়োয়ান অপেক্ষা করে, মাথায় পিঠে মোট লইয়া যে সমস্ত চাষী পুরুষ ও নারী ট্রেণের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহারাও যেন তার পরিচিত।

তারপর কোথায় কোন গলা লাইন ছুটিয়া বাহির হয় ট্রেণের পথ হইতে সচকিত অজগরের মত, কোথা হইতে দেখা যায় ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের বরাভয় নীল-আলো, কোথায় গ্রাম ছাড়া-ছাড়া কয়েকটি ঘর-বাড়ী লাইনের ধারে ট্রেণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে—সমস্তই তাহার জানা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। আকাশ ও পৃথিবী এবার অন্ধকারে যেন এক হইয়া, একাকার হইয়া যাইবে তাহারই ভিতর ছোট ষ্টেশনের অনুকূল আলোগুলি অন্তরঙ্গ স্নেহ-সম্ভাষণের মত অনুগ্র মধুর মনে হয়।

প্রদ্যোৎ ট্রেণ হইতে নামে। ট্রেণ ধীরে ধীরে ষ্টেশন ছাড়িয়া যাইতেই প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে নামিয়া লাইনগুলি পার হয়। ওধারেও কাঁকর বিছানো দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম্ম। মেহেদী গাছের বেড়ায় রেলিঙ এখন অস্পষ্ট দেখায়, করোগেটে ছাওয়া ষ্টেশনের একটি শেড, সেইটেই ওয়েটিংরুম, সেইটাই টিকিট করিবার স্থান। ষ্টেশনের নাম-লেখা একটী বাতি—টিকিট ঘরের দেওয়াল হইতে সামান্য একটু আলো শেডের অন্ধকারে মিলাইয়া দিয়াছে। সেই শেড্ পার হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া প্রদ্যোৎ পথে নামে। খানিকটা শূন্য প্রান্তর পার হইয়া ষ্টেশন হইতে পথটি সোজা গিয়া নিকটের গ্রামের ঘন-বিন্যস্ত-গাছপালায় পুঞ্জীভূত অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে প্রদ্যোৎ একবার বুঝি পিছন ফিরিয়া চায়। শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এই পরিচ্ছন্ন ষ্টেশনটিরও একটি আকর্ষণ তাহার কাছে আছে। তাহার জীবনের সঙ্গে এই ষ্টেশনটির ছবিটিও মিশিয়া গেছে আজকাল।

বড় রাস্তা হইতে, মাঠের উপরটায় আলের পথ সেখান হইতে ঝাউতলায় নালার উপরকার খেজুর-গুঁড়ির সাঁকো পার হইয়া, গ্রামের ভিতরকার সঙ্কীর্ণ অন্ধকার আঁকাবাঁকা গলি, চাষীদের সরাই-এর ধার দিয়া, সজিনাফুল ছড়ানো মেটে বাড়ীর কানাচ দিয়া, পানা পুকুরের কোণ ঘেঁসিয়া তারপর অন্ধকারে দীর্ঘ পথ। সবই প্রদ্যোৎ উপভোগ করিতে করিতে পার হইয়া যায়। এ গ্রামের প্রতি কোন বিতৃষ্ণা আর তাহার নাই। ইহার পরিত্যক্ত আরণ্য-রূপই এখন যেন তাহার কাছে মূল্যবান। তাহা

মনের আনন্দরসে এ গ্রামের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির রূপও মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

তারপর প্রথম বাড়ী গিয়া অন্ধকার সদর দরজায় ছোট একটি টোকা দেওয়া—তাহার উত্তেজনার বুঝি তুলনা নাই। যত ধীরেই সে আঘাত করুক, ভিতরে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল কাণ সজাগ হইয়া আছে তাহার জন্য। কমল বিমলের উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠ। তাহার হাত হইতে পুঁটুলি কাড়িয়া লইবার জন্য ঝগড়া। বড়দিদির একটু ভৎসর্না।

তারপর গ্রামের ঝিল্লি-মর্ম্মরিত শীতল অন্ধকারে দাওয়ার উপর মাদুর বিছাইয়া ম্লান প্রদীপের আলোয় পুঁটুলি খুলিবার অনুষ্ঠান। চারিধারে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কমল একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে তাহার উপর। ধীরে ধীরে রূপকথার পুরীর মায়া-পেটিকা বুঝি খোলা হয়।

"ওমা এর মধ্যেই কপি কোথায় পেলে?" বড়দিদির কণ্ঠে আনন্দ ও বিস্ময়ের সুর। হঠাৎ প্রদ্যোতের পকেট হাতড়াইয়া একটা জিনিষ পাইয়া কমল আনন্দে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠে। বিমল সঙ্গে সঙ্গে ওঠে তাহার আবিষ্কারের সন্ধান লইতে। কিন্তু কমল এ আনন্দ-সংবাদ ত লুকাইয়া রাখিবে না। সমস্ত পৃথিবীতে সে যে ইহার রাষ্ট্র করিতে চায়।

"আমার লাট্টু লেত্তি, লাট্টু লেত্তি: ছোড়দার চেয়ে ভাল!" গ্রামান্তরের লোকের সে আনন্দধ্বনি শুনিতে পাওয়া উচিত।

এইবার মুখভারের ভাণ করিয়া প্রদ্যোৎ পুঁটলিটা একটু মুড়িয়া রাখে। হতাশভাবে বলে—"নির্ম্মলার উল্ পাওয়া গেল না, বড়দি। সহরের মেয়েরা আজকাল উল্ বোনা ছেড়ে দিয়েছে। দোকানে তাই রাখে না।"

বড়দিদি এ দুষ্টামিতে সাহায্য করেন। হাসিয়া বলেন—"তাই ত ভারী মুস্কিল হল যে!"

নির্ম্মলা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে—"আমি কি উল্ আন্‌তে বলেছিলাম নাকি?" ঔদাসীন্যভরে সে সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করে।

মা মাঝে পড়িয়া বলেন—"আহা, কেন ওকে রাগান বাবু! এই ত রয়েছে উল্!"

তাহার পর উল্ বাহির হয়, বাহির হয় কয়েকটি খেলনা। অন্ধকার মুখর হইয়া ওঠে আনন্দ-কোলাহলে। লাটাই-এর বদলে রুলটানা কপি-বুক পাইয়া শুধু বুঝি বিমলই একটু অপ্রসন্ন বোধ করে। কিন্তু সেভাব তাহার ক্ষণিক। কপি-বুকের লিপিকুশলতাকে পরাস্ত করিবার উৎসাহে মাদুর হইতে কমলকে বিতাড়িত করিয়া সে সমারোহ করিয়া, খাতাপত্র দোয়াত পাতিয়া বসে।

সুমিষ্ট একটি সংসারযাত্রা। কে বলিবে, মৃত্যুর ছায়া এখনো এ সংসারের উপর হইতে অপসৃত হয় নাই! কে বলিবে, লোভ ও স্বার্থপরতা নিঃশব্দে ওৎ পাতিয়া আছে এ দুর্ব্বল সংসারের চারিধারে। বলিবার প্রয়োজন কি? সকল কথা সব সময় স্মরণে করিতেও নাই।

মনের উপর যবনিকা ফেলারও বুঝি প্রয়োজন আছে। যবনিকা শুধু আড়ালই করে না, উজ্জ্বলও যে করিয়া তোলে নিজের পটভূমিতে সে কথা ত প্রদ্যোৎ জানে। না জীবন-বিধাতার এইটুকু অনুগ্রহের জন্যই সে কৃতজ্ঞ। রহস্যসাগরে ঘেরা বায়ুর এ দ্বীপের যথার্থ মূল্য, সত্যকার সার্থকতা সে বুঝিয়াছে। স্বপ্ন ও সত্যে মিলাইয়া নশ্বর এক শৌধ নির্ম্মাণ করিবার অধিকার, জীবনের অপরূপ মুহূর্ত্তগুলিকে উপভোগ করিবার সৌভাগ্য, ইহারই কি তুলনা আছে।

এইবার নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পালা। মেয়েরা রান্নাঘরে গিয়াছে। ছেলেরা যে যার খেলা কাজ লইয়া মত্ত। মাদুরের এক ধারে বসিয়া, হেলান দিয়া শুইয়া প্রদ্যোৎ সামনের স্নিগ্ধ শীতল অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে। অপরূপ শান্তি আর স্তব্ধতা তারকাখচিত আকাশে, অনির্ব্বচনীয় প্রশান্তি তাহার মনে। মাধুর্য্য-রসে তাহার মন ভরিয়া গেছে। বিশুদ্ধ প্রাণের সুমধুর আলস্য সঞ্চারিত হইয়া গেছে তাহার দেহে।

ঘনকৃষ্ণ বিস্মৃতির যবনিকা কি ঢাকিয়া গেছে রূপালি সুতার জালে? অকূল সমুদ্রের নিঃসঙ্গ বন্ধ্যাদ্বীপ কি শ্যামল হইয়া উঠিল জীবনের স্পর্শে, মুখর হইয়া উঠিল জীবনের কোলাহলে? তাহাই ত মনে হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ হিন্দুসম্মেলনের

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীমতিলাল রায়ের অভিভাষণ—

হে বরেণ্য সভাপতি মহাশয়, সমবেত
সুধীবর্গ ও সুহৃন্মণ্ডলী,

এই সেই ভাগীরথী-তীর, যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গের নূপুর-শিঞ্জনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিয়া উঠিয়াছিল—এই সেই ভাগীরথী-তীর, যেখানে রামপ্রসাদের সুধাবিগলিত কণ্ঠস্বর মাতৃ-মহিমার ঢেউ তুলিয়াছিল, এই সেই ভাগীরথী-তীর, যেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমিয়শীতল কণ্ঠের ঋক্-মন্ত্রে বাঙ্গালী নব-জীবনের সন্ধান পাইয়াছিল—আর এই সেই ভাগীরথী-তীর, আজ যেখানে বাংলার মুকুটমণি, শাস্ত্রদর্শী, নবযুগের অন্যতম অগ্রপুরোহিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণকে এই সঙ্কটযুগে শ্রদ্ধার আসন দিয়া নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইতেছি। আপনাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন করি। শ্রীশ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা, আমাদের এই মহাযজ্ঞ সার্থক হউক।

ভারতের অবনতি ঘটিয়াছে দুই চারি শত বৎসরে নহে; দুই চারি হাজার বৎসর ধরিয়া বিশ্বের পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতনের চরম সীমার অভিমুখে ছুটিয়াছে। যুগে যুগে অবতারপুরুষেরা আসিয়াছেন, এই মরণ-পথ আগুলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু পতনের বেগ আত্যন্তিক রূপে কেহই রোধ করিতে পারেন নাই। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস উত্থানপতনের ভিতর দিয়া ভারতের অধোগতির মাত্রাধিক্যই প্রদর্শন করে। ক্ষাত্রশক্তির পর, দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে ব্রহ্মণ্যশক্তিরই অভ্যুত্থান-চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করিতেছি।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ যেখানে হার মানিয়াছেন, শঙ্কর, রামানুজ, নিমাই, রামকৃষ্ণ সেখানে ভারতের জীর্ণ তরীর হাল ধরিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখিলে আজিও দেখা যায়, ব্রহ্মণ্য-প্রতিভার যুগই চলিয়াছে। দেড় শত বৎসর ইংরাজ-রাজত্বেও জাতীয় অভ্যুত্থান কল্পে ব্রাহ্মণেরই উদ্যত মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে পড়ে। তাই একদিন এই সভায় ভট্টপল্লীর শিরোভূষণ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়কে আমি শাস্ত্রমূর্ত্তি আখ্যায় বন্দনা করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। আজ আমাদের পুরোভাগে এই পুণ্য-যজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান হোতার আসন অধিকার করিয়া যিনি সভার গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাকেও ব্রহ্মণ্যমহিমার সাক্ষাৎ বিগ্রহমূর্ত্তিরূপেই অন্তরের পূজা নিবেদন করিতেছি। ভারতের ব্রহ্মণ্যশক্তি যদি জাগ্রত না হয়, এই প্রলয়-জল-তরঙ্গ-রোধ হইবার নহে। ঋষি অরবিন্দও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

এই সম্মিলনীর লক্ষ্য—হিন্দুত্বের জাগরণ। হিন্দুজাতির মধ্যে প্রেম ও ঐক্য ইহার জন্য প্রয়োজন। ধর্ম্মে বিশ্বাস, ভগবানে বিশ্বাস, আপনার উপর বিশ্বাস প্রতিপাদিত না হইলে এই প্রেম ও ঐক্য সিদ্ধ হয় না। ভারতের শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি, ভারতের অতীত গৌরব ও মহিমার প্রতি, অতীতের পূর্ব্বপুরুষগণ ও বর্ত্তমান যুগের মনীষিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের আত্ম-প্রত্যয়ের মূল দৃঢ় করিতে পারে। শ্রদ্ধাবান্‌ই জ্ঞানলাভ করে—এই মহাবাণী আমরা যেন চিরদিন স্মরণ রাখিতে পারি।

অধঃপতনের হেতু আবিষ্কৃত হইলেই, মূল রোগের চিকিৎসার দিকে লক্ষ্য পড়িতে পারে; পল্লবগ্রাহী আন্দোলনে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইতে চাহে না—আর তাহাতে সমাজের প্রকৃত কল্যাণও সাধিত হয় না। যাঁহারা হিন্দু-জাতির পুনরুত্থানের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ, হিন্দুত্বকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী, উন্মাদ—তাঁহারাই আমার এই কথা বুঝিবেন। এখানে আমি পতনের যে বৃহত্তর কারণ চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান, অতি সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

জগতের এমন কোন দেশ নাই, কোন জাতি নাই, যে দেশে, যে জাতির মধ্যে ভারতের ন্যায় দীর্ঘ দিন ধরিয়া

এমন ভীষণ গৃহবিবাদ চলিয়াছে। ইউরোপে খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে ধর্ম্মবিরোধ উপস্থিত হইলে, শত বৎসরের মধ্যেই সে বিরোধ শেষ হইয়া যায়; আর ভারতবর্ষে কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ধর্ম্মবিরোধের ফলে যে গৃহ-বিবাদের আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কুরুক্ষেত্র এই বিরোধের উৎকট ও সাংঘাতিক অভিব্যক্তি মাত্র। শুধু জ্ঞাতিবিরোধের হেতুবশতঃই দুর্য্যোধন সূচ্যগ্র ক্ষেত্র-দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নাই; ইহার মূলে ছিল ধর্ম্ম ও আদর্শের বিরোধ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হিন্দুভারতকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; প্রাচীন হিন্দুসমাজ তাহা সহজে স্বীকার করেন নাই। এই পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিরোধের নিদর্শনই হিন্দু-সমাজে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

বৈষ্ণবে, শাক্তে, জৈনে, বৌদ্ধে, শৈবে, গাণপত্যে সংঘর্ষের বীভৎস চিত্র কাহারও নিকট অবিদিত নহে। সেদিন পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মী শাক্তদের পাষণ্ড বলিয়া গালি দিয়াছে। এখনও অনেকে বিল্বপত্রকে তে-ফড়কার পাতা বলেন, জবাফুলকে ওড় ফুল বলেন। তাই দেখি, মুসলমানগণের আক্রমণকালে হিন্দু-মন্দির যখন চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে, বৌদ্ধগণের কণ্ঠে তখন উপহাসের বাণী; আর হিন্দুরাজ্যের অভ্যুত্থানে বৌদ্ধকীর্ত্তিকলাপ যখন লোপ পাইতেছে, তখন হিন্দুর উল্লাসধ্বনি—প্রতিবিধিৎসার ইহা যে কি বীভৎস মূর্ত্তি, আত্মবিরোধের ইহা যে কি বিষময় চিত্র, তাহা ভাবিলে আজও শরীর শিহরিয়া উঠে! কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে কথা আজও আমরা কেহ ভাবিয়া দেখিতেছি না। হিন্দুত্ব মহিমাহীন, বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয়চ্যুত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক প্রভাবও লুপ্তপ্রায়—আজ জাতি লইয়া ব্রাহ্মণে অব্রাহ্মণে, স্পৃশ্যে অস্পৃশ্যে মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত। কোন ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যু-সংঘটন যেমন কালসাপেক্ষ, এই বিরাট্ জাতি তেমনই পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া কেবলই মরণস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত্যু-বেগ রোধ করা কোন ব্যক্তি অথবা সংহতিবদ্ধ রাজশক্তির পক্ষেও সম্ভব হয় নাই।

আমরা আজ বাংলাদেশের কথাই আলোচনা করিব। বাঙ্গালী হিন্দু যেন মরণের তুষারশীতল আবর্ত্তে নিঃশেষ হইতে বসিয়াছে। এ দুরবস্থার সীমানির্দ্ধারণ আর সম্ভব নহে।

বাংলার ইতিহাস নাই, আত্মবিস্মৃতির অতল জলে তাহা আজ লয় পাইয়াছে; খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিলে তাহা সর্ব্বজন-গ্রাহ্য হইবে না। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার সহিত হিন্দু বাঙ্গালীর সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান করেন—তাঁহার হিন্দু সাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রচেষ্টার কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ইঁহার উত্তরাধিকারী আদিত্য সেন এবং তৎপরবর্ত্তী গুপ্ত-রাজবংশ হিন্দুর পুনরুত্থানের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছিলেন।

৭ম শতাব্দীতে হুয়েন সাং নামক একজন চীন পর্য্যটক বাংলায় আগমন করেন। এই সময়ে তিনি বাংলার সর্ব্বত্র বৌদ্ধমঠ ও হিন্দুমন্দির দুইই দেখিয়াছিলেন। একাদশ সহস্রের অধিক বৌদ্ধ পুরোহিত বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা করিতেন—হিন্দুধর্ম্মেরও তুল্য প্রভাব ছিল।

তারপর, বোধ হয় ৮ম শতাব্দীতে রাজা জয়ন্তের আবির্ভাব। শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের পর, দ্বিতীয় বার ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বাংলার বৌদ্ধরাজ ইঁহার নিকট পরাজিত হন। রাজা জয়ন্তই আদিশূর নামে প্রসিদ্ধ হন। বাংলায় হিন্দুধর্ম্মের যে জয়পতাকা উড়িল, তাহাই এদেশে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার সূচনা। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধ-প্রভাবে বাংলার আদি ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভা ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, তাই রাজা আদিশূর কাণ্যকুব্জ হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রতিপক্ষে অন্য মতও আছে, যে বাংলায় আদৌ বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ছিল না। বাঙ্গালীর সেই মৌলিক আদি-সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করা এই প্রবন্ধে সাধ্য নহে। এই সকল জটিল তত্ত্বের মীমাংসার ক্ষেত্রও ইহা নহে। তবে বাংলায় যে ধর্ম্মবিপ্লবের মাত্রা খুবই প্রবল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮ম শতাব্দীর পর হইতেই বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ধারাবাহিক অভ্যুত্থান পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে গুপ্তরাজগণ এই হিন্দুধর্ম্মেরই প্রবল পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে

হিন্দুর কীর্ত্তিকলাপ নির্ম্মূল হইয়াছিল—গুপ্তরাজগণের শাসনেই পুনরায় বেদ, যজ্ঞ, দেববিগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার পর পালরাজগণের আবির্ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১২শ শতাব্দীতেও দেখি, ধর্ম্মপাল বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন। অতএব, বাংলার হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ বিপ্লবের আবর্ত্তে ক্রমশঃ ক্ষীণ-প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল!

১১১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেনকে আমরা বাংলার মহীপাল-রূপে দেখি। তিনি তন্ত্রমতে দীক্ষা লইয়াছিলেন। অনেকের ধারণা, বৌদ্ধবাদকে আত্মসাৎ করিবার জন্য বাংলায় তন্ত্র-সাধনার প্রবর্ত্তন। বল্লাল সেনের রাজত্ব-কালেই হিন্দু-সমাজের পুনঃ-সংস্কার হয়।

আদিশূরের আনীত বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ এই দুই তিন শত বৎসরের ধর্ম্ম-বিপ্লবে একপ্রকার নষ্টপ্রায় হইয়াছিলেন। যাঁহারা বাংলার সহজধর্ম্মে উপবীত মাত্র ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের নামটুকু রক্ষা করিতেছিলেন, বল্লাল সেনের আনীত সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। বাংলার প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ তখনও অতিশয় ক্ষীণকায় ছিল। কথায় আছে—

পাঁচ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই।
এ ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই॥

লক্ষাধিক গ্রামবিশিষ্ট বাংলাদেশ, তাহার মধ্যে মাত্র ছাপ্পান্ন-খানি গ্রামে যে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে বৈদিক হিন্দুসভ্যতা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। বাংলায় তাহার কোন নিজস্ব ধর্ম্ম ছিল বলিয়া যদি বিশ্বাস করিতে হয়, অথবা বৈদিক ধর্ম্মই বাংলার আদি ধর্ম্ম বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, উভয়ই বৌদ্ধবাদের গ্রাসে লয় পাইয়াছিল। বৈদিকধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে দীর্ঘকাল সংগ্রামের ফলে বাংলায় অসংখ্য প্রকার উপধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মবিরোধ ও ধর্ম্ম-মিশ্রণের অবাধ গতিতে সম্প্রদায়-ভেদেই আমরা জর্জ্জরিত হই নাই, আত্মরক্ষার দায়ে জাতিভেদের প্রাচীর তুলিয়াও আমরা আত্মঘাতী হইয়াছি।

বল্লালসেন যে কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তন করেন, তাহা বৈদিক চাতুর্ব্বর্ণ্য-সৃষ্টির বিজ্ঞানেরই পুনঃপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে প্রাচীন হিন্দু সমাজের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতেই ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য গড়িয়া উঠে। বলা বাহুল্য, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত। আজিকার মত বর্ণাশ্রমের অচলায়তনে সেদিন হিন্দুজাতি এমন করিয়া বন্দী হয় নাই। প্রাণহীন দেহে যেমন অনেক বিকৃতি দেখা দেয়, মুমূর্ষু হিন্দু সমাজে তেমনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিকৃত মূর্ত্তিই আমরা সন্দর্শন করি। বল্লালসেন গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিভাগ করেন। হিন্দু জাতিকে রক্ষা করার জন্য নূতন করিয়া ব্রাহ্মণ পুনর্গঠন করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই প্রচেষ্টা কথঞ্চিৎ সফলকাম হইতে না হইতেই, মুসলমান আক্রমণের ফলে বাংলার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনরায় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। ধর্ম্ম-মিশ্রণের ফলে যে সকল সম্প্রদায় বাংলায় মাথা তুলিয়াছিল, ব্রাহ্মণ্যপ্রতিভার হ্রাস হওয়ায় এই সকল ধর্ম্মগত ভেদ-বিসম্বাদের কোনও প্রতিকার হইল না। ১২শ শতাব্দীতেই ময়নামতীর গান, শূন্য পুরাণ, বৌদ্ধ ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতিতে কথিত উপধর্ম্মরাজির প্রচারে দেশ ছাইয়া গেল। এই সময়ে বাংলায় নাথ সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু নাথ সম্প্রদায় নহে, ডোম, কপালী, হাড়ি প্রভৃতি জাতির মধ্য হইতে নব নব ধর্ম্মাচার্য্যগণ বিবিধ সম্প্রদায়ের নেতৃস্বরূপ উত্থিত হইয়াছিলেন। বজ্রযানাদি সহজিয়া সম্প্রদায় এই সিদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাবেই লোক-সমাজে ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে দেশের জনসাধারণ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেন—কোথাও স্বেচ্ছায়, কোথাও অনিচ্ছায়। ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষাদানও তাঁহারা পাপ বলিয়া মনে করিতেন। এই অবস্থায় লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণ্যশক্তি আশ্রয় করিয়া রাজ্যশাসনের আয়োজন করেন; কিন্তু বাংলার জাতি ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সম্বন্ধের ব্যবধান এমনই সুদূর হইয়া পড়িয়াছিল, যে মুসলমান আক্রমণে লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গালী জাতির বিশেষ সহায়তা না পাইয়া সহজেই পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন।

এই সময়ে বাংলায় শতকরা দুইজনের অধিক ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব ছিল।

১০২১ হইতে ১১৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের উপর উপর্য্যুপরি মুসলমান আক্রমণ চলিতে থাকে। "গান্ধার হইতে জলধি শেষ"—হিন্দুজাতির প্রভুত্ব রাহুগ্রস্ত শশীর ন্যায় এই আক্রমণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পতন হয়। ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশ মুসলমানদের অধিকারে ছিল। এই ৫ শত বৎসর বাংলায় কি কৌশলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব-বিস্তারের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা অবধারণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৫শ শতাব্দীতে বল্লালসেনের কৌলীন্যপ্রথার সূত্র ধরিয়া দেবীবর মেল-বন্ধন প্রচেষ্টায় হতপ্রাণ ব্রাহ্মণদের পুনরুদ্বন্ধ করেন। এই ১৫শ শতাব্দীতে তাই দেখি, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান। বাংলাদেশে এই সময়ে সংস্কৃত-চর্চ্চার যেরূপ অনুশীলন হইয়াছিল, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ হয় নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই রঘুনন্দনের স্মৃতি বাংলার হিন্দুসমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার আয়োজন করিল। ভারতের স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা দেশের জন্য বোধ হয় লিখিত হয় নাই; কেননা, যে আকারে ইহা বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহাতে বাংলার সহিত এই সকলের মৌলিক সম্বন্ধ অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। ভারতীয় শাস্ত্রাদি পাঠে বাংলার পরিচয়ই যেন মিলে না। ১২শ শতাব্দীতে ভবদেব গঙ্গোপাধ্যায় 'দশকর্ম্ম পদ্ধতি' ও 'ব্যবহার তিলক' রচনা করেন। বাংলায় হিন্দু-আদর্শ-রক্ষার ইহাই হইল বাঙ্গালীর শাস্ত্র। রঘুনন্দনের অভ্যুদয়ে বাংলায় হিন্দুজাতির উত্থান-লক্ষণ প্রকাশিত হইল। স্মৃতি-রচনার সহিত বাংলায় ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পঠন-পাঠনের ধুম পড়িয়া গেল। আর এই সঙ্গে লোকগুরু শ্রীচৈতন্যের মুখনিঃসৃত অনর্গল অমিয়-সঙ্গীত বাংলায় হিন্দুজাতি-গঠনের ক্ষেত্রে সত্যই অমৃত-বর্ষণ করিল। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অধিকার-ভুক্ত করিতে ব্রাহ্মণেরা অসমর্থ হইয়াছিলেন, অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত সেই বাঙ্গালী জাতিকে শ্রীচৈতন্য দেখিতে দেখিতে অনায়াসে হিন্দুজাতি করিয়া তুলিলেন। বাংলার এই অপরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র আজও বুঝি সম্যক্ মর্ম্ম দিয়া আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

জাতিগঠনের পক্ষে ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান উপাদান। মহম্মদের ধর্ম্মান্দোলন ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবে সূচিত হয়। ধর্ম্মোন্মত্ত আরবগণ ৭ম শতাব্দীতে আফগানিস্থান জয় করিয়া লয়। ইহাই ভারতের প্রসিদ্ধ গান্ধার দেশ। আজও গান্ধার-দেশীয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণকারকে হিন্দু ভারত মনীষার যোগ্য পূজা দিতে কাতর নহে। ইহার পর চারি শত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র ভারতের উপর মুসলমানের আধিপত্য ইস্‌লাম ধর্ম্মাধিকারেরই বিজয়বৈজয়ন্তী। খৃষ্টান জগতের জয়ও এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসেরই ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বিরোধে ও সংঘর্ষে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক জিদ্ ধর্ম্মের নামান্তর হইয়া উঠিয়াছিল, তাই ভারতের কোটি কোটি নরনারী মাথা রাখিবার ঠাঁই হারাইল। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দীর্ঘ দিন পরে জাতির প্রাণে ধর্ম্মবিশ্বাসের আগুন জ্বালাইয়া, বাংলায় এক নবজাতি-গঠনের প্রয়াস করিলেন। ইহার পূর্ব্বে যদিও বৌদ্ধ ভারত নাকচ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর হিন্দু ভারতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজের মধ্যে অনেকেই তাঁহার মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিতে কুণ্ঠা করেন নাই। বিশেষতঃ, সহজিয়া-তন্ত্র-প্রধান বাংলায় তাঁহার প্রভাব ততখানি দৃঢ়মূল হয় নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব হাজার হাজার বৎসরের অসংখ্য খণ্ড খণ্ড উপধর্ম্মের উপর কি এক অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া অতি অল্প কালের মধ্যে বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় এক ধর্ম্মবেদী গঠন ও তাহার উপর এক অখণ্ড-জাতি-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিলেন। ভাগবত ধর্ম্ম যদি হিন্দুধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে আমরা নিঃসংশয়ে বলিব, শ্রীচৈতন্যই বাংলায় চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপরে ভাগবত সূত্রে গ্রথিত করিয়া, ভাগবত প্রেমের রসায়নে হিন্দু বাঙ্গালীকে অভিনব আকারে প্রতিষ্ঠা দিলেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য-ফুৎকারে বাণী-রূপে যে দিব্য-নীতি-গঠনের সঙ্কেত

দিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য যেন সেই বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ হইয়া নব জাতির ভ্রূণমূর্ত্তি বাংলায় স্থাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাতি, ধর্ম্ম, আচার সব ডুবাইয়া এক অদ্বয় ভগবানে নিখিল জাতিকে উঠাইয়া তুলিবার জন্য, নানা দেবদেবীর উপাসনা ছাড়িয়া একই দেবতার চরণে জাতীয় আত্মসমর্পণের দীক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কম্বু-কণ্ঠে তাহারই প্রতিধ্বনি বজ্রনিনাদ তুলিয়াছে —

সংসারী বৈষ্ণবঃ কৃষ্ণোপাসকঃ পরমঃ সুধীঃ।
দেবান্ পূজয়েৎ যোহি সোঽবৈষ্ণবো ভবেৎ ধ্রুবম্॥

সংসারী হইলেও কৃষ্ণোপাসককে বৈষ্ণবপ্রধান বলিতেও তিনি কুণ্ঠা করেন নাই; কিন্তু অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা যাহারা করেন, তাহাদের তিনি অবৈষ্ণব বলিয়াছেন। একই অদ্বয় ব্রহ্ম-মূর্ত্তির চরণে কোটি কোটি নরনারীর অবনত শির কোনরূপ বিরোধ বা সংঘর্ষের সৃজনে সাধিত হয় নাই, পরন্তু জীবনের আচার ও হৃদয়ের অনাবিল প্রেমই ইহার উপকরণ হইয়াছে। 'একজাতি, এক ভগবান' না হইলে জাতীয় জীবন সিদ্ধ হয় না। নিঃসঙ্কোচে তাই তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে —

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

শূদ্র, নীচ, চণ্ডাল বা যবন—ভগবদ্ভক্ত হইলে তাহার জাতি-দর্শন যে করে, তাহার নরক-গমন হয়। ইহাই ভারতের ভাগবত জাতির স্বপ্ন সিদ্ধ করার অমোঘ সঙ্কেত; তাই এই কথার আদৌ প্রতিবাদ নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ভাগবত-ভক্ত জাতি অতীতের সম্পূর্ণ প্রভাব-মুক্ত হয় নাই বলিয়া লোকাচার-বিরুদ্ধ হওয়ার আতঙ্কে ছত্রিশ জাতির ভেদে ও পার্থক্যে আত্মরক্ষায় অন্ধ হইয়াছে; শ্রীচৈতন্যের সে ভাগবত জাতি এইরূপে স্বধর্ম্ম-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া কত বড় সুযোগ যে হারাইয়াছে, তাহা ভাবিলে নয়নে অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠে। ঠিক এই সময়েই পঞ্চনদে গুরু গোবিন্দের জাতি শতকরা ২০ জন হিন্দুকে লইয়া প্রবল সংহতি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-রসায়নে কোটী কোটী আসাম, বাংলা, উড়িষ্যার নরনারী ধূলায় গড়াগড়ি দিল, কিন্তু প্রবল জাতি-রূপে মাথা তুলিল না। বাংলায় অধঃপতনের এমনই প্রবল বেগ, যে তাহা রুদ্ধ করিয়া উজান-স্রোতের প্রবর্ত্তন সে যুগেও সম্ভব হইল না।

এই তো গেল ইংরাজ-পূর্ব্ব যুগের বাংলার হিন্দুজাতির একটা রেখাচিত্র। ইংরাজ-রাজত্বেও তাহার একটা রূপ আছে। ১৮শ শতাব্দীতে ইংরাজ ভারত আক্রমণ করেন। আশ্চর্য্য, এই সময়ে বাংলায় জাতিগঠনের অতীত সকল প্রয়াসই যেন যাদুবলে ব্রাহ্মণগণ কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছেন—বৈষ্ণবজাতি অথবা শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ভাগবত জাতি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মধ্যে বেমালুম তলাইয়া গিয়াছে। বাংলার যে তন্ত্র-ধর্ম্ম বৌদ্ধগণের বিরুদ্ধে উৎকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাও জীবন-বেদ ছাড়িয়া পরম নির্ব্বাণ লাভ করিতে ছুটিয়াছে। শাক্ত উপাসকের সর্ব্বজয়ী শক্তি রামপ্রসাদের কণ্ঠে নির্ব্বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। বৌদ্ধের ধর্ম্মরাজ শিবঠাকুর সাজিয়াছেন, বৌদ্ধ তান্ত্রিকের ডাকিনী দেবী চণ্ডীমূর্ত্তি আর হারীতী দেবী শীতলা ঠাকুরাণী হইয়া হিন্দুসমাজের দুয়ারে দাঁড়াইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। নাথ-সম্প্রদায়ের শক্তিপীঠ কালীঘাট হিন্দুর মহাতীর্থ হইয়া সব একাকার করিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মহাপ্লাবনে বাংলার সকল সম্প্রদায় চুবান খাইতেছিল; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দীর্ঘ অভিযান সিদ্ধ হইতে না হইতে ইংরাজের আক্রমণে আবার তাহা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহা অতিক্রম করিয়াও হয়তো ব্রাহ্মণ্য আদর্শবাদ বাংলায় একচ্ছত্র ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রবর্ত্তন করিত, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সে আশারও ভঙ্গ হইল। ছিয়াত্তরের নিদারুণ মন্বন্তরে বাংলার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। বাঙ্গালী জাতি সেদিন প্রলয়-দোলায় দুলিয়াছিল। কেবল আহারাভাবে বাংলার এককোটী লোক এই দুর্য্যোগে মরিল। পুরাতন বাংলার ইহা মৃত্যু-চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেন অতীতের দ্বন্দ্ব সংগ্রামের সমাধান অসম্ভব বুঝিয়া, বিধাতা বাঙ্গালী জাতির জীবন-নাট্যের উপর একটা খণ্ড যবনিকাপাত করিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী একটা নূতন জাতি। তাহারা যেন একটা নূতন জন্মলাভ করিয়াছে।

যে ষড়যন্ত্র-কুশল দূরদর্শী ব্রাহ্মণ্যশক্তি বাংলার বিকৃত ও মিশ্র ধর্ম্ম সংহরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি-রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, দৈব পীড়নে তাহা শিথিল হইল বটে; কিন্তু নবযুগারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের আত্মাই আবার নূতন আকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। বিগত হাজার বৎসরের নানা দুর্য্যোগে ও বিপ্লবে যে শক্তি পরাজয় স্বীকার করে নাই, খৃষ্টান সভ্যতার তীব্র আলোকে তাহার নয়ন ঝলসিয়া উঠিল বটে; কিন্তু সে প্রচণ্ড কিরণ-জাল বিদীর্ণ করিয়া তরুণ তপনের ন্যায় সে শক্তি মাথা তুলিল, তাহা ব্রাহ্মণেরই বিগ্রহ-মূর্ত্তি—নব যুগের পুরোহিত রাজা রামমোহন রায়।

সমাজ-ধর্ম্মের আবর্ত্তে বাংলায় বেদ উপনিষদের নাম-গন্ধ ছিল না; পৌরাণিক ভারতের আদর্শে, স্মৃতি-শাস্ত্রাদির শাসনে বাংলায় হিন্দু জাতির মূর্ত্তি গড়া হইতেছিল —রাজা রামমোহন অনাদি যুগের সভ্যতা আদর্শের খনি হইতে রত্ন উত্তোলন করিলেন। আবার বেদের পঠন পাঠন, উপনিষদের শিক্ষা বাঙ্গালী জাতির নিকট সহজ হইয়া উঠিল। ইউরোপের লুথারের ন্যায় হিন্দুর ধর্ম্ম-তত্ত্ব তিনি সর্ব্বজনবিদিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড সনাতনী ব্রাহ্মণ্যশক্তিও মাথা তুলিতেছিল। বংশগত অধিকার এইরূপে নষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, মনে করিয়া উহা রামমোহনকে অহিন্দু করিয়া ছাড়িয়া দিল। কিন্তু এই অহিন্দুর প্রবল প্লাবনে হিন্দু ধর্ম্মের উপর পুনরায় যে উপধর্ম্মের প্রভাব বাড়িতেছিল তাহা ভাসিয়া গেল। সত্যই বাংলায় নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হইল। ইংরাজী শিক্ষায় খৃষ্টান-ধর্ম্ম-গ্রহণের সহজ সুযোগ আর রহিল না। বাঙ্গালীর নূতন ইতিহাসের আরম্ভ এইখানে।

সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, জাতীয়তা, কোন দিক্ আর বাদ রহিল না—বহু শতাব্দীর লুপ্ত প্রাণ সহস্র ধারায় পুনঃ উৎসরিত হইল। যে জাতি বেদ-ধর্ম্ম বহন করিয়া যুগ যুগ অভিযান করিয়াছে, সেই জাতি অভিনব বেশে আবার নূতন চেতনা লইয়া দেখা দিল। বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, ঈশ্বর-চন্দ্র, ভূদেব, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, ইঁহারা সকলেই নবযুগের কর্ণধার। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ; কিন্তু সঙ্কীর্ণতা-দোষ-দুষ্ট না হওয়ায় নিখিল বাঙ্গালী জাতির প্রাণে ইঁহারা যে অমৃত সিঞ্চন করিতে পারিলেন, তাহার ফলে বাঙালী শিথিল গুণের মর্য্যাদা দিতে। ব্রাহ্মণ্য-জ্ঞান আর শুধুই বংশগত রহিল না—রমেশচন্দ্র প্রচার করিলেন ঋগ্বেদ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের জয় দিলেন শিশিরকুমার, কেশবের জীবন-মন্ত্র বাঙ্গালী কাণ পাতিয়া শুনিতে দ্বিধা করিল না, সিংহগ্রীব বিবেকানন্দের কণ্ঠে বেদান্তের জয়-ধ্বনি উঠিল—বাঙ্গালী শিখিল জাতি-ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে গুণ-ব্রাহ্মণের পূজা, যোগ্য জনের চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনে কোথাও আর বাধিল না, জাতি-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল।

বলিয়াছি, ১৯শ শতাব্দীতে হিন্দু বাঙ্গালী যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা প্রাচীন হিন্দুত্ব হইতে কিছু পৃথক্ ধরণের। জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান বিপ্লবে যখন বাংলায় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তখন রঘুনন্দন নূতন ভঙ্গীতে চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রতিষ্ঠার সূচনা করিলেন। তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালীকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া একদিকে ব্রাহ্মণ ও অন্যদিকে শূদ্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ক্ষেত্র-রচনাই হইয়াছিল। ইংরাজ-যুগে সবই উল্‌টাইয়া গেল। নিখিল হিন্দুজাতির প্রাণে ব্রাহ্মণত্ব-লাভেরই প্রেরণা জাগিয়া উঠিল। উপবীত-গ্রহণের ধুম আজিও নীরব হয় নাই। ইহা জাগরণেরই লক্ষণ। সাধ্যবস্তু যত উন্নত ও উৎকৃষ্ট হইবে, জাতি-চরিত্র ততই ঊর্দ্ধমুখী ও উন্নত হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণের অধিকারবাদে সর্ব্বজনের তীব্র স্পৃহা জাতীয় আত্মার অভ্যুত্থান সম্ভব করিয়া তুলিবে। ব্রাহ্মণের দৃঢ় মুষ্টি আজ যদি শিথিল করিতেও হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। নিখিল বিশ্ব-জাতিকে ইস্‌লাম ও খৃষ্টান করার আকাঙ্ক্ষায় এই উভয় ধর্ম্মী উদ্বুদ্ধ; আর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মই যদি ভারতের প্রাণ হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে কেবল ভারতের দীক্ষা নহে, সমগ্র বিশ্বকে ব্রাহ্মণ করিবার উৎসাহ-স্পন্দন নিঃসংশয়ে জাগরণের লক্ষণ বলিতেও আমাদের বাধে না। ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্যতা যদি সমগ্র জাতি অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের বেদ আজ সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল বলিয়া মনে করিব। মনে রাখিতে হইবে—উপবীত-গ্রহণই ব্রাহ্মণের লক্ষণ নহে। ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শবাদ ও কৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রায় দুই হাজার বৎসরের বাংলা অসংখ্য প্রকার জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আবর্ত্ত ভেদ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বৈদিক ও অবৈদিক আচারব্যবহারের সংঘর্ষে আজ বাংলায় আমরা হিন্দু বলিতে ২ কোটী ৪০ লক্ষ নরনারীকে পাইয়াছি। তন্ত্র, সহজিয়া, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে আমরা বৌদ্ধ বাংলাকে হিন্দু করিয়াছি; এক্ষণে বাঙ্গালী জাতিকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ছাঁচে ঢালাই করিয়া তুলিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পরিপূর্ণ জয় হয়। সেই চেষ্টারই আরম্ভ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আদিম ও মধ্য যুগের বাংলার স্বভাব ও সংস্কার ইহার বিরুদ্ধ হওয়ায় প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান বাংলার শত জন নরনারীর মধ্যে ১৬ জন ব্রাহ্মণ, ১৪ জন জলচল জাতি ও অবশিষ্ট ৭০ জন জল-অচল জাতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব বাংলায় হিন্দু-জাতি বলিয়া যদি কিছু আজ গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে ইহাদের কাহাকেও বাদ দিয়া তাহা হইবার নহে। হিন্দুর অধিকাংশ নরনারীকে অবজ্ঞেয় করিয়া রাখিলে, ২ কোটী ৪০ লক্ষ লোকের মনে এক-জাতি হওয়ার বোধ উন্মেষ করা সম্ভব নয়, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

বৌদ্ধ বাংলার জাতি গিয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার দিগ্বিজয়ে বাঙ্গালীকে আবার নূতন করিয়া গড়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে বাংলার অবস্থার কথা এখানে বিশেষ ভাবে তুলিব না—কেন না, বিরুদ্ধ শিক্ষার ধারণা ভেদ করিয়া জাতির সত্য মর্ম্মপরিচয় গ্রহণের সুদিন এখনও উপস্থিত হয় নাই। মহাভারতের যুগে পুণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি বাসুদেব নামে এক মহাপ্রতাপশালী নরপতির কথা পাওয়া যায়, ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড় বাংলারই নামান্তর, ইহা পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে বাংলা দেশ যদি আর্য্য-সভ্যতারই ক্ষেত্র ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে উহা পরিচিত বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যে নহে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। বাংলার বৈশিষ্ট্য বৈদিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে গ্রাসিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর তন্ত্র ও পুরাণ সেইরূপ বেদানুগত হওয়ার ফলে বাংলার উপর প্রাক্-বৌদ্ধ যুগেও ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার অভিযান লক্ষ্যে পড়ে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বাংলার অন্য এক রাজা সমুদ্রসেন ও তৎপুত্র চন্দ্রসেন পরস্পর ভিন্ন পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ পাই। অষ্টাদশ দিন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ চলিয়াছিল। ষোড়শ দিনে সমুদ্রসেন সাত্যকির হস্তে এবং চন্দ্রসেন কুরুরাজ কর্ত্তৃক নিহত হন। এই সকল দৃষ্টান্ত প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে বাংলার শৌর্য্য বীর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কুরুক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এক নরপতি সংগ্রাম করেন—ইহার নাম ব্যাঘ্রদত্ত। পাঞ্চাল-রাজ্য হইতে ইনি গিয়াছিলেন। অনূপ দেশের আর এক ব্যাঘ্রদত্ত কুরুপক্ষে যুদ্ধ করেন। মগধ-রাজপুত্র অন্য এক ব্যাঘ্রদত্তের নামও এই মহা-সংগ্রামেতিহাসে পাওয়া যায়। ব্যাঘ্রদত্তের অপভ্রংশ বাগ্দী কিনা, সুধীগণ অনুমান করিবেন—কেবল বাংলায় এই বীর জাতির সংখ্যা এখনও ২০ লক্ষের অধিক হইবে। কিন্তু ইহারা জল-অচল অস্পৃশ্য।

ব্রাহ্মণই বাংলায় জাতিগঠন-যজ্ঞ প্রথম আরম্ভ করেন। জাতিগঠনের ছাঁচ বর্ণাশ্রম। এই ছাঁচে যাহাদের ঢালাই করা যায় নাই, তাহাদের এই প্রকারে জল-অচল করিয়া রাখা কিছু অসম্ভব মনে হয় না। বলিয়াছি, বাংলায় একটা নূতন বর্ণাশ্রমপ্রথা-গঠনের উদ্‌যোগ-পর্ব্বই চলিয়াছে। অতএব অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার নিজস্ব সভ্যতা ও আদর্শবাদ ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতাকে কুক্ষিগত করারই প্রচেষ্টা করিয়াছে।

জাতি ছিল না। জাতীয় বোধের অভাব জাতি-সংগঠনের অন্তরায়। যাহাদের ইহা ছিল, তাহাদের আক্রমণেই আমরা হতপ্রায় হইয়াছি। স্বদেশবাসীর মধ্যে ঐক্যাভাব, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও আদর্শবাদ বাংলাকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইস্লামের ন্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বাংলায় প্রবল হইয়াছিল, বাংলার অবৈদিক আদর্শ ও সভ্যতাবাদ হয়তো জাতিগঠনে উদাসীন ছিল না; কিন্তু ওতঃপ্রোতভাবে বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রভাবের আক্রমণে বাঙ্গালী কোন ধর্ম্মই দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারে নাই—সমুচ্চ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মই আজ বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। যাহারা তত্ত্বদর্শী, স্পষ্ট জাতিগঠনের এই সঙ্কেত তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে, ধর্ম্ম যখন জাতিগঠনের উপাদান, তখন এক ধর্ম্ম-বন্ধনে আমরা এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিব কি না। একই ঈশ্বর-বিশ্বাসের অগ্নি-দীক্ষায় এই বিশাল হিন্দুজাতি ঐক্যবদ্ধ হইবে কি না। ধর্ম্ম-বিপ্লবেই আমাদের মস্তিষ্ক বিচলিত, অসংখ্য মতবাদ বর্ত্তমান 'ইজম'গুলির ন্যায় আমাদিগকে অন্ধ করিয়াছে। জাতিকে স্থির করিয়া লইতে হইবে, যুগ-যুগান্তরের সংগ্রাম সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আজ যে মহিমামণ্ডিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম বীরবেশে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাহা বরণ করিয়া, আমরা বৈদিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জাতি ও দেশের জয় দিব কি না। অর্ব্বাচীন বাংলা যেন এই ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার কথা শুনিয়াই আমায় কোনও অন্ধ সঙ্কীর্ণ আভিজাত্যের উপাসক মনে না করেন—আমি বলিতেছি, ভারতের এক বিজয়ী সভ্যতা ও আদর্শবাদের কথা।

যদি আমরা বাঁচিতে চাই, বেদবিশ্বাসের প্রবর্ত্তনেই বাঁচিব। কেননা, ভারতে বর্ত্তমান যুগে যে সকল ধর্ম্ম-মত শৈবালদলের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার উপর ভর করিয়া এই বিশাল জাতির প্রতিষ্ঠা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ইহা ব্যতীত বৈদিক ধর্ম্ম ভিন্ন এমন যুগপৎ উচ্চ জ্ঞানমূলক ও কর্ম্মমূলক ধর্ম্ম কোথায়? ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এই বেদ-ধর্ম্মেরই নব সংস্করণ। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা গুরু-চণ্ডালের ন্যায় নব্য বঙ্গের ভীতির কারণ হইয়াছে; তাই বলিতেছি, ব্রাহ্মণ বলিতেই পঞ্জিকার শীর্ণকায় যষ্ঠিহস্তে ব্রাহ্মণের চিত্র কেহ মনে আনিবেন না। বৈদিক আদর্শ ও সভ্যতার সংস্কার সাধন করিয়া এ জাতির সুদৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা চাই।

বৈদিক ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের কথা আছে; ইহা যদি গুণগত হয়, আপত্তির হেতু কোন পক্ষেই হওয়া উচিত নহে। প্রাচীন ভারতে তাহাই ছিল। উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রমাণের প্রয়োজন নাই। আমাদের চাওয়াকেই রূপ দিতে হইবে।

বর্ণ-ধর্ম্ম জীব-ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ও নৈসর্গিক অনিবার্য্য প্রকাশ। বৌদ্ধযুগে চামারের পুত্র চামারই হইত; কিন্তু তাহার অন্যান্য পুত্র গুণভেদে অন্য বৃত্তি লইলে কেহ আপত্তি করিত না। ব্রাহ্মণশাসিত ভারতে জাতি-বর্ণ জন্মগত হওয়ায় চামারের শত পুত্রকে চামারই হইতে হইবে। কিন্তু বর্ণের উৎপত্তি-ক্ষেত্রের মূলে এই নীতি ছিল না। ব্রাহ্মণের সকল পুত্র ব্রাহ্মণ হন নাই। ক্ষত্রিয়-তনয়ও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। আমরা মনে করি, গুণভেদে যদি বর্ণ রক্ষা হয়, ভারতের তত্ত্ব ম্লান হইবে না। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রাকৃতিক গুণ-প্রকাশ একই আকার প্রকারে অভিব্যক্ত হয় না। ভারতের মেধা ও অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম—বর্ণাশ্রম ও গুণভেদে কর্ম্মগত আচারগত স্বাতন্ত্র্য হিন্দু সভ্যতার এক অপূর্ব্ব শিক্ষা ও রহস্য।

প্রকৃতি-ভেদে অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনাও অনিবার্য্য। বহুর মধ্যে একের অনুভূতি জাগাইয়া তোলাই ইহার সমাধান। ব্রাহ্মণ যে ভারতের বিচিত্র ভঙ্গী ও ভেদ আত্মসাৎ করিয়া হিন্দু-জাতিরূপে এত বড় একটা বিশাল মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা একেবারে দায় বশতঃ নহে; জীবনের মৌলিক বিজ্ঞান দর্শন করিয়াই হিন্দু জাতির বিরাট্ কলেবর গড়িয়া তোলায় তাঁহারা আপত্তি করেন নাই।

হিন্দু তাই অমর জাতি। রক্ষণশীলতার মধ্যেও গতির লক্ষণ কোন দিন স্তব্ধ হয় নাই। তামস প্রকৃতি রক্ষণশীলতা নহে। এই বৃত্তি আমাদের মধ্যে স্থান পাইলে, ব্যবহারিক জগতে হিন্দুর প্রাণ নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে। এই কারণেই বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস হওয়ায় উহা আজ ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে। রক্ষণশীলতার মধ্যে ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা আজ আর বাঞ্ছনীয় বলিয়া কেহ মনে করিতেছেন না।

৬৩২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ পরলোকে গমন করেন। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ইস্‌লাম-ধর্ম্মীর প্রভাব আদৌ ছিল না। ভারত ছিল হিন্দুস্থান, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ১২০৪ খৃঃ বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগলেরা বাংলাদেশের রাজা হন। এই সময়ে বাংলার শতকরা ৯০ জন নরনারী নানা প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই চারি পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মণ্যপ্রভাব বাংলাকে কি ভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তোডড় মল্ল বাংলায় যখন রাজস্ব

নির্দ্ধারণ করিতে আসেন, মুসলমানদের অধীনে বাংলায় তখন বার ভূঞার মধ্যে দশজন হিন্দু ছিলেন। বাঙালী রাষ্ট্র-শক্তি-হারা হইলে, ব্রাহ্মণ্য-শক্তি বাংলায় হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য আদর্শের উত্তম সংস্করণ হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মে মুসলমানকেও গ্রহণ করা হইয়াছিল, ইহা হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অথচ বাংলায় এই সময়ে প্রায় এক কোটী লোক নানা কারণে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালী হিন্দুর আত্মরক্ষার ইতিহাস অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম লোক-গণনা হয়, তখনও বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল। কিঞ্চিদধিক এই পঞ্চাশ বৎসরে বর্ত্তমান বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটী ২২ লক্ষ ১২ হাজার ৬৯ জন, আর মুসলমানের সংখ্যা ২ কোটী ৭৮ লক্ষ ১০ হাজার ১০০ শত জন অর্থাৎ হিন্দু শতকরা ৪৩ জনে দাঁড়াইয়াছে। ভারতের অঙ্গে বঙ্গদেশ আর হিন্দুপ্রধান বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে না। হিন্দুজাতি ভারতের এক প্রান্ত হইতে যেন আজ নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতিকার-চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে এখন সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ ব্রাহ্মণ আছেন। ১ কোটী ৫০ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালী অস্পৃশ্য; অবশিষ্ট শূদ্র; অতএব বাংলার হিন্দুজাতিকে বাঁচিতে হইলে, অস্পৃশ্যবোধ মন হইতে দূর করিতে হইবে। আমরা গৃহবিবাদে নিরত থাকিলে, অতঃপর নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বিবাদের প্রধান কারণ—ধর্ম্ম। বাংলার ১॥ কোটী লোক অস্পৃশ্য, ইহা জাতিদোষ নাও হইতে পারে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে ইহাদের দীক্ষা দেওয়ার হয়ত সুযোগ ঘটে নাই। কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বাঙ্গালীকে ব্রাহ্মণ্যশক্তি শনৈঃ শনৈঃ হিন্দু করিয়া তুলিতেছে। মুসলমান-যুগের পর পুনরায় পররাষ্ট্রের আক্রমণ না হইলে, সম্ভবতঃ হিন্দু বাঙ্গালী আজ ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার প্রভাবে প্রবল জাতি রূপেই দেখা দিত; অকস্মাৎ পাশ্চাত্যের প্রভাবে হিন্দুত্বকে আবার এক নূতন ভাব ও আদর্শ আত্মসাৎ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হইতে হইয়াছে।

আজিকার বিপ্লব ও নৈরাশ্য ভয়ের কারণ নহে। আজ ভবিষ্যতের জন্যই আমাদের বাঁচিবার ও চলিবার পথ স্থির করিয়া লইতে হইবে। কোন্ আদর্শ লইয়া আমরা জাতি রূপে মাথা তুলিব? আজ যুগ-বিপ্লবের সন্ধি-পর্ব্বে যদি ব্রাহ্মণ্য আদর্শ বোঝা বোধে মাথা হইতে নামাইয়া বাঙ্গালী জাতিকে মাথা তুলিতে হয়, সে যে কি প্রচণ্ড সংঘর্ষ তাহা আমরা আজ অনুমান করিতে পারি না। হিন্দু হইয়া আত্মরক্ষার ইচ্ছাও যে সহজে পূর্ণ হইবে তাহাও নহে; তবে হিন্দুত্বের সর্ব্বজয়ী ভিত্তি এই সঙ্কটকালে বাঙ্গালীকে দুর্জ্জয় জাতিরূপে এখনও প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। এইজন্য কেবল দেখিয়া লইতে হইবে, বাংলার বিশিষ্ট ভাব ও সাধনা ব্রাহ্মণ্য আদর্শবাদের মধ্যে স্থান পায় কি না? বেদধর্ম্মের বিশালতার মধ্যে ইহা অসম্ভব হইবে না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। বাঙ্গালী জাতি নিঃসঙ্কোচে প্রাচীন বেদ-ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া বাংলার জাতিগঠন-যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারে।

এই জাতিসংগঠন কর্ম্মে রাষ্ট্রকে ইহার সহিত সংযুক্ত করা বিধেয় মনে করি না। হিন্দুকে সংহতিবদ্ধ করিতে হইলে, বাহিরের বিচিত্র আচার ব্যবহার হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য আমাদের জাতীয় আচার ও ব্যবহারের প্রয়োজন-মত বর্জ্জন, গ্রহণ ও পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়; কিন্তু আসল কথা—এই জাতিগঠনের মধ্যে হিন্দুর আস্তিক্য-বোধ মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে হইবে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস জাগ্রত না হইলে, হিন্দু-সংহতি সম্ভব নহে। জাতি বাঁচে, কেবল বাঁচার জন্য নহে, পশ্চাতে থাকে তার সুমহান্ উদ্দেশ্য। হিন্দুর জীবননীতি বিজ্ঞান-সম্মত। আমরা লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি মাত্র; এখনও খাঁটী হিন্দু হইতে পারি নাই। যদি লক্ষ্যে উপনীত হই, সমগ্র বিশ্বের গুরুর আসন এই জাতি অধিকার করিতে পারে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস বলিতে জাগ্রত ঈশ্বরানুভূতির কথাই বলিতেছি। বেদ-বিজ্ঞান ইহার সনাতন আপ্ত প্রমাণ। কোটী কোটী হিন্দু বাঙ্গালী স্বেচ্ছামত ধর্ম্ম-বিশ্বাস যদি গড়িয়া তুলে অথবা একজন প্রতিপত্তিশালী ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যদি আত্ম-বিশ্বাসের কেন্দ্রে দুর্ব্বল মনোবৃত্তি-পরায়ণ অনেক ব্যক্তিকে একত্র

করিয়া আপন আপন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জয় দিতে চাহেন, এই প্রাচীন হিন্দু-জাতিটার ভিত্তি সত্যই অধিকতর শিথিল হইয়া পড়িবে। ইহাতে আমরা নিজেদের নিশ্চিহ্ন করার পথই প্রশস্ত করিব। বেদোক্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুগত হইলে যদি আত্মার অভ্যুত্থান নিঃসংশয় হয়, তাহা হইলে আমরা দর্পান্ধ হইয়া ইহা অস্বীকার করিব কেন? ভারতের সাধনায় চিত্ত-ক্ষেত্র শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন হয়। গুণ ও প্রকৃতি বশে আমাদের আচার ও স্বভাব পরস্পর হইতে পৃথক্ হইলেও, আমরা এক জাতি, আমাদের একই ভগবান। বাঁচিবার জন্য তাই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহার জন্য অতীতে ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব ও শক্তি দেউলিয়া হইয়াছে; তাই আজ সঙ্ঘশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। বাংলায় দৃঢ়-সংবদ্ধ সঙ্ঘ-শক্তি দ্বারা হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে ধর্ম্ম ও ভাগবত বিশ্বাসের আগুন জ্বালাইয়া তপস্যার ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রথমে বাঞ্ছনীয় মনে করি। এই জন্যই হিন্দু-সংগঠন ব্রতের মধ্যে রাষ্ট্রের স্বার্থ টানিয়া আনিতে ইচ্ছা করি না।

উপসংহারে বক্তব্য, হিন্দু-জাতিকে যদি বাঁচিতে হয়, তাহাকে নিম্নোক্ত চতুরঙ্গ সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। শরীর রক্ষা করার তাগিদই বাঁচার সঙ্কেত নহে। আত্মার জাগরণ সিদ্ধ হইলে, আশ্রয়-বস্তু দেহাবয়ব সবল ও সুস্থ হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ যদি জাগে, দেহের রোগ বিদূরিত হইবে। এই জন্য আমরা প্রত্যেক হিন্দুকে উপাসনা-মন্ত্রে দীক্ষা লইতে বলি। এই উপাসনা-মন্ত্রের শুধু আবৃত্তি নহে, হিন্দুর সাধন-তত্ত্বকে জাগ্রত করিতে হইবে। হিন্দুকে সঙ্কল্প লইতে হইবে, ভগবানে নবজন্ম-গ্রহণের। এই সঙ্কল্প-রক্ষার জন্য সর্ব্বকালে ইষ্টের অনুধ্যান বিশ্বাসকে দৃঢ় ও রূপবন্ত করে। গীতায় "সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর" কথার আমি প্রতিধ্বনিই করিতেছি। ইহার জন্যই প্রত্যেক হিন্দুকে অন্ততঃ ত্রিসন্ধ্যা যজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রেরণা দিবার সঙ্গে, প্রত্যেক হিন্দু যাহাতে সাধনপরায়ণ হয়, তাহার জন্য মনীষিবর্গকে জাগ্রত থাকিতে হইবে।

ভাগবত উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে অখণ্ড হিন্দু জাতিকে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের কেন্দ্র-ক্ষেত্র দেব-মন্দির। এই জন্য প্রত্যেক হিন্দু পবিত্র বেশে, শুচি, স্নাত, দীক্ষিত হইয়া দেবতার মন্দিরে যাহাতে নিয়মিত যোগদান করে, পূজা ও উপাসনায় তাহাদের চিত্ত যাহাতে অভিষিক্ত হয়, সে ব্যবস্থা চাই। এই দিক্ দিয়াই অস্পৃশ্যতা দূর করার ব্যবস্থা হইলে হিন্দু মাত্রই ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমাদের সব কিছু করিতে হইবে আত্মসংঘর্ষকে বাদ দিয়া। যাহাতে গৃহ-বিবাদ ঘটে, এমন আন্দোলন মুমূর্ষু কালে বাঞ্ছনীয় নহে। দেড় কোটী অস্পৃশ্য দেখিয়া চৌদ্দ লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে মুষ্টিমেয় সনাতনীকে উপেক্ষা করা যায়, এই হিসাব বিজ্ঞতার পরিচয় নহে। হিন্দুর মধ্যে এই সম্প্রদায় ক্ষুদ্র হইতে পারে, তুচ্ছ নহে। এক চাণক্য একটা রাজ্য-ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন, এক কণা আগুনও সর্ব্বনাশের কারণ হয়। পক্ষান্তরে, অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ যদি মনে করেন, জ্ঞান ও তপস্যা বলে দেড় কোটী হিন্দুকে উপেক্ষা করিয়াও তাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের জয় দিবেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত কথা নহে—সংখ্যার প্রভাব আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমরা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিতেছি।

হিন্দু জাতির মহত্ত্ব ও অমরত্ব অবধারণ করার উপায়—হিন্দুর ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য প্রভৃতির অনুশীলন। ইহার অনুবাদ মাত্র পঠন পাঠনে মৌলিক গ্রন্থের রস-বোধ সম্ভব নহে। হিন্দু জাতির মধ্যে দেবভাষার প্রবর্ত্তন চাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মও যে এখনও মাথা তুলিয়া আছে, তাহার পশ্চাতে আছে গভীর দার্শনিকতা ও পাণ্ডিত্য। এখনও আমরা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য কেবল বাংলায় ১৬৫ জন পদাবলীপ্রণেতার নাম পাই। নারীও বেদমন্ত্রের রচয়িত্রী ছিলেন। পদাবলীপ্রণেতৃগণের মধ্যে নারীর স্থানও আছে। যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে বাঙ্গালী জাতি অভিনব মূর্ত্তিতে নিজেদের উন্নীত করিয়া ধরিবে, সে ধর্ম্ম-তত্ত্ব হিন্দু মাত্রের অধিকার-সঙ্গত করার একমাত্র উপায়—সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রচার।

তারপর, আত্মরক্ষার যে ব্যবহারিক দিক্ তাহাও উপেক্ষার নহে। আমরা মহামারীতে মরি, দারিদ্র্য-পীড়ন হেতু; সেই দারিদ্র্য-নাশ মূলতঃ ঈশ্বর-বিশ্বাসের রসায়নেই হইবে। তবে হিন্দু আন্দোলন এমন নহে, যে একের পর

অন্যটী প্রকাশ হইবে। উপাসনা, অস্পৃশ্যতা পরিহার, সংস্কৃত-শিক্ষার প্রচার, ইহার সঙ্গে যুগপৎ স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। মূলধন না থাকিলেও শ্রমকে উদ্যত করিতে আমাদের যেন না বাধে। বাংলায় বেকার-সমস্যার কারণ আমাদের অলসতাই। বাংলায় উড়িয়া, বেহারী, মাদ্রাজী, চীনা প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশবাসী ও বিদেশী অন্নের সংস্থান করে, বাঙ্গালীর সংস্থান নাই—ইহা সত্য কথা নহে। মরণপথের যাত্রী, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়াছে। চামড়া বিঁধিয়া ঔষধ-প্রয়োগে রক্ষা পাইব না; অন্তরবীণায় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ঋক্ ধ্বনি তুলিয়া আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে বীরের ন্যায় উদ্যত হইতে হইবে।

হিন্দু মুসলমানে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, আমরা এই আড়াই কোটী হিন্দুর সংহতি-সৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে চাই। ফিকির করিয়া কাজ হাঁসিল করিতে গিয়া যদি আত্মকলহের মাত্রা বাড়ে, সে কাজ স্থগিত রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করি। আজ দুই হাজার বাঙ্গালী স্বজাতির মধ্যে সংঘর্ষ সৃজন না করিয়া এই চতুরঙ্গ সাধনায় যদি অবহিত হয়, আমি জোর করিয়াই বলি, আগামী ৫০ বৎসরে বাংলায় হিন্দু জাতির নবমূর্ত্তি হইবে। যে জাতি ভাগবত বিশ্বাসের বেদীর উপর দাঁড়ায়, সে জাতির বল, বিভূতি, ঐশ্বর্য্য গোপন থাকিবে না। আমি সভয়ে হিন্দু-সংগঠনের একটা অস্পষ্ট সঙ্কেত মাত্র দিলাম। হিন্দু-সংগঠন-যজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্ আজ উপনীত, তাঁহার নির্দ্দেশ আমরা অকুণ্ঠে পালন করিব। সমবেত সুধীবর্গ, আমার মর্ম্ম-কথার ত্রুটি দোষ ছাড়িয়া হৃদয়ের অবদান-ভাগ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। ওঁ স্বস্তি! ওঁ হরি ওঁ!!*

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ, চন্দননগর
১লা পৌষ, ১৩৪০ সাল।

শ্রীমতিলাল রায়

সমালোচনা

জাগৃহি—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। মূল্য—২৲ টাকা। যুগের ভাব মূর্ত্তি লইয়াছে—"জাগৃহি"তে। মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী, পড়িতে পড়িতে অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হয়। পাষাণ-ঠাকুরের ঘুম যদি দলিত অস্পৃশ্যের করুণ কান্নার সুরে না ভাঙ্গে, তবে নব জাগরণের গানেই দেশ ভরিয়া দিতে হইবে—মানুষের অন্তর্য্যামীকে জাগাইবার এই উদ্বোধন-সঙ্গীতেই এই গ্রন্থখানির আরম্ভ ও শেষ, অথচ উপন্যাসের রস-বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ইহাতে কোথাও ক্ষুন্ন হয় নাই—লেখিকার পক্ষে ইহা কম গৌরবের ও সাফল্যের পরিচয় নয়। এই উপন্যাসখানি লেখিকার একটী সার্থক সৃষ্টি; এখানি নিঃসংশয়ে জাতিগঠন সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে।

— সাময়িকী —

বিধিলিপি—জ্যোতিষঃ-বিষয়ক মাসিক-পত্র। স্বনামধন্য জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রী জ্যোতিঃ বাচস্পতি সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য—৩।৵০ মাত্র। তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা চলিতেছে। "বিধিলিপি"র পিছনে আছে একটী জ্যোতির্ব্বিৎ-সংসৎ—যাঁহাদের গবেষণা ও সাধনার ফল এই মাসিকখানির মধ্য দিয়া প্রচারিত হইতেছে। এই সাধনা যে জীবন্ত, তাহা এই মাসিকের পুনর্জন্ম হইতেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। সম্পাদক ও তাঁহার সহতীর্থমণ্ডলীর সুমহান্ উদ্দেশ্য—জ্যোতিষকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। কাজটী কত দুরূহ ও কঠোর তপঃ-সাধ্য, তাহা তাঁহারা জানেন—জানেন বলিয়াই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, এই আশা দুরাশা বলিয়া মনে করি না। "বিধিলিপি" মাসে মাসে পড়িতে সত্যই আনন্দ হইত ও হয়—এখনও উহার প্রতীক্ষায় থাকি—এইটুকু বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা হয় না। আমরা উদ্যোক্তৃবর্গের উদ্যমের সাফল্য প্রার্থনা করি।

---

*প্রবর্ত্তক হিন্দু-সম্মেলনের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ উপরে প্রকাশিত হইল—সম্মেলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের অভিভাষণ আগামী সংখ্যার প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত হইবে। স্থানাভাবে সম্মেলনের অন্যান্য বিবরণও

— রাষ্ট্র ও সমাজ —

দুর্দ্দশার প্রতিকার—

গত সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজ-সভায় বাংলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন; ইহাতে দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, বিপ্লব-দমন ও সর্ব্বশেষে দেশ-ব্যাপী আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কি করিতে চাহেন, দেশবাসী তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার ও ভাবিবার সুযোগ পাইয়াছে। কথাগুলি নানা কারণে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

ইহা সত্য, যে বর্ত্তমানে কোনও বিষয়ে যদি শাসক ও শাসিত সমভাবে গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করেন, সে বিষয় - বিপ্লব-দমন। এই রক্তপাতমূলক বাম-মার্গী আন্দোলন সম্বন্ধে আজ বোধ হয় কুত্রাপি দ্বি-মত নাই। দেশের স্বচ্ছ রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের পথে ইহা যে কত বড় অন্তরায়, সে সম্বন্ধে সকলেই মনে-প্রাণে অনুভব করিতেছেন এবং অকপটচিত্তে এই মত সকলেই যেখানে যতভাবে সম্ভব প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠা করেন নাই। দেশ ও গভর্ণমেণ্ট উভয়েই এই সমাজ-বিরোধী নীতির মূলোচ্ছেদ করিতে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই ক্ষতিকর আন্দোলনের উচ্ছেদকল্পে শুধুই কঠোর ঔষধ-প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে। স্যার জন এণ্ডার্সনও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন, যে এই লক্ষণ-মূলক চিকিৎসায় যদিও উপসর্গ দূর হয়, তাহাতে ব্যাধির গভীর মূল নিশ্চিহ্ন হয় না। তাঁহার নিজের কথা, "steady pressure rather than any spectacular demonstration of force."—এই সংযত নীতি দেশকে কিছু আশ্বস্ত করিবে।

বিপ্লব-দমনে গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর ক্রমশঃ সহযোগিতা পাইতেছেন, ইহাও স্যার জন এণ্ডার্সনের উক্তি হইতে বুঝা যায়। এই সহযোগিতার ক্ষেত্র যাহাতে আরও ক্রম-প্রসারিত হয়, তাহাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু লাট সাহেবের মুখে "Experience shows that the law may still have to be strengthened in certain respects; that matter is in hand"—এই কথা-গুলি হিন্দু বাঙ্গালীর প্রাণে ভীতি ও সংশয় ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে; কেন না, তাঁহার মনে বাঙ্গালী-হিন্দুই যে 'টেরোরিজমের' জন্মদাতা ও পরিপোষক, এই ধারণা বদ্ধমূল, ইহা তাঁহার উক্তি পড়িলেই বুঝা যায়। এই ধারণা না থাকিলে, তিনি কেন বলিবেন যে—"the movement is essentially a Hindu movement"—বিপ্লব আন্দোলন মূলে হিন্দু আন্দোলনই, হিন্দুদের কল্পিত স্বার্থ-সিদ্ধি-মানসেই এক শ্রেণীর হিন্দু যুবক এই আন্দোলনকে পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ ধারণা হিন্দুর পরিচ্ছন্ন গতিকে সঙ্কুচিত করিয়াই তুলে।

অধিকাংশ বিপ্লবী যুবক হিন্দু, এই হেতুই হিন্দুজাতির স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া তাহারা স্বীয় কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করে, ইহা কেমন করিয়া সত্য বলা যায়? কোন হিন্দু সংহতি বা প্রতিষ্ঠান তাহাদিগকে বিপ্লবের মন্ত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রণোদিত করিয়াছে—ইহা মনে করিবার হেতু বা প্রমাণ নাই। অধিকন্তু, বিপ্লব-নীতি হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনার বিরুদ্ধ নীতি—হিন্দুর অন্তরাত্মা ইহাতে আদৌ সায় দেয় না। শ্রীযুক্ত বি, সি, চাটার্জ্জীর এ সম্বন্ধীয় অসতর্ক উক্তি গভর্ণমেণ্টের এই ধারণা উৎপাদন কিয়ৎপরিমাণে পরিপোষণ করিয়াছে কি না, আমরা

বলিতে পারি না; কিন্তু গভর্ণরের এই কথায় হিন্দু-সমাজ যে ক্ষুব্ধ, সন্ত্রস্ত, মর্ম্মাহত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্যার জন এণ্ডার্সন অবশ্য বলিয়াছেন, কতিপয় হিন্দু-বিপ্লবীর জন্য সমগ্র হিন্দু-সমাজকে দায়ী করা যায় না; কিন্তু এ কথায় সকল আশঙ্কা দূর হয় না। ব্যাধির চিকিৎসা সমগ্র সমাজ-দেহ ধরিয়াই চলিবার সম্ভাবনা নাই কি? ফলতঃ, দেখা যায়, দমননীতির ব্যাপক প্রভাব নিরীহ হিন্দুপ্রজাসাধারণের উপর যেভাবে স্থানে স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু-সমাজ চিন্তাকুল ও আপনাকে একান্ত নিরাশ্রয় ভাবিয়াই হতাশ, মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা স্যার জন এণ্ডার্সনকে মিনতি করিয়া জানাইতে চাহি—বিপ্লবকে প্লেগ, বিসূচিকা, ম্যালেরিয়ার মতই সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক সমাজ-ব্যাধিরূপে দেখা হউক—ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-ভঙ্গী আনিয়া শাসন-সমস্যা জটিল করিয়া তুলিয়া লাভ নাই; কর্ত্তৃপক্ষের রাজ্যশাসন-নীতি পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া যদি এক শ্রেণীর প্রজাসাধারণের মনে আতঙ্ক ও সংশয়ই ঘনাইয়া উঠে, তাহা শুভাবহ হইবে বলিয়া আমরা আদৌ ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

তারপর, বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার প্রতিকারের কথা। শুধু বিপ্লববাদের ক্ষেত্ররূপে নহে, সমগ্র হিন্দু-সমাজের ঘোর নৈরাশ্যপূর্ণ মনোভাব সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া স্যার জন্ বাস্তবিকই যেটুকু দরদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

এইখানেই মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সত্যই একটী গূঢ় ব্যথার তন্ত্রীতে স্পর্শ দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা অনুভব করি। প্রস্তাবন শুধু কথায় নিবদ্ধ রাখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, অবিলম্বে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-বিভাগ হইতে একটী "অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ড" সূচনা ঘোষণা করিয়া তিনি সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। এই বোর্ডের সভ্যমণ্ডলী বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত হওয়ায় ইহাতে দেশের পক্ষ হইতে বিশেষ বলিবার কিছু নাই; শুধু এইটুকুই আমাদের বলা উচিত, যে কয়েকটী বেসরকারী সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইলেও, যে আব্‌হাওয়া ও নির্দ্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদের কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া বুঝা যায়, সেখানে বিষয়টীর গুরুত্বানুসারে তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা ও অভিমত-প্রকাশের যেন সুযোগ থাকে।

জহরলাল ও হিন্দুসভা—

পণ্ডিত জহরলাল হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মহাসভা সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার প্রত্যুত্তরে ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি হিন্দু নেতৃবৃন্দের উক্তি ও ইহা লইয়া নানা তিক্ত বাদানুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সে বেদনাময় প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না; কিন্তু এই সম্পর্কে দুই একটী প্রয়োজনীয় কথা এইস্থানে আলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। কেন না, জাতিকে অন্তরের এই সকল জটিল কুঝটিকা বিদীর্ণ করিয়াই মুক্তি সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

পণ্ডিত জহরলাল দেশহিত-ব্রতী আত্মত্যাগী রাষ্ট্র-নেতা। তাঁহার বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতার আব্‌হাওয়ায় প্রকৃত জাতীয়তার ভাব ও সাধনা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। তাই তাঁহার পক্ষে হিন্দু মহাসভার ন্যায় বিশিষ্ট নামধারী সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কার্য্যকলাপ স্বাস্থ্যকর জাতীয় জীবনের মূলতঃ হানিজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নহে, জাতির অস্তিত্ব-রক্ষার জন্য তথাকথিত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির বিলয়-সাধনই একমাত্র পথ কি না, তাহাও আজ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সম্প্রদায় শুধু সম্প্রদায় নহে, জাতির উপাদান। এই উপাদানগুলির সম্পূর্ণ পরিণতি ও সুসঙ্গত সন্নিবেশের উপরই কি ভারতে সংহত জাতি-শক্তির অভ্যুদয় নির্ভর করিতেছে, অথবা উপাদানগুলি নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়াই এই জাতি-শক্তি সিদ্ধ করিবে?

ভাই পরমানন্দ ভাবিয়াছেন, জাতীয়তার জন্য আপনার দাবী যতখানি সাধ্য ভুলিতে গিয়া হিন্দু দিনের পর দিন রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোণঠাসা হইয়াই পড়িতেছে; হিন্দু গভর্ণমেণ্ট ও প্রতিবেশী সম্প্রদায়, উভয়েরই নিকট প্রবঞ্চিত ও তাহার

সম্বন্ধে অবিচারের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে—এই নিষ্ঠুর কঠিন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়া কেমন করিয়া একটা ভূয়া মিলনের প্রত্যাশায় হিন্দু মরণ বরণ করিতে ছুটিবে? জাতির সংহতিশক্তি সুস্থ ও প্রবল করিয়া তুলিবার জন্যই তাহাকে সাম্প্রদায়িক দাবী ও অধিকারগুলি ন্যায় ও বিবেকের উপর সুরক্ষিত করিতে হইবে ও প্রবল সংহতিত্বের সহায়তায় আপনার যথার্থ স্থান জাতি-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই অভিজ্ঞতা ও চিন্তা এত জলন্ত বস্তুতন্ত্র, যাহা সরাসরি অযৌক্তিক বা উপেক্ষণীয় মনে হয় না।

পক্ষান্তরে, পণ্ডিত জহরলালের কথা, "Personally, I am convinced that nationalism can only come out of the ideological fusion of Hindu, Muslim, Sikh and other groups in India."—হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক উপাদান আন্তরিক ক্ষেত্রে সংমিশ্রিত করিয়াই ভারতে নব-জাতি জন্মলাভ করিবে—এই ধারণাটীও সুমহান্, মহিমাময় আদর্শের দ্যোতক, অনাগত যুগমন্ত্রের সুর ও ছন্দঃ যাহার মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই জহরলালের মনের ব্যথা ঠিক কোথায়, তাহা এই কথাগুলি হইতেই মর্ম্ম দিয়া বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ফলতঃ, ভারতের জাতি-সাধনা আজ যে সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপনীত, তাহাতে এই উভয় পথের যে কোনও একটা বাছিয়া না লইলে, কেহই এক পা আর আগাইতে পারেন না। ভাই পরমানন্দ হিন্দু সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও সংহতিবদ্ধ হইতেই ডাক দিয়াছেন, এ ডাক হিন্দুর অন্তরোত্থিত বলিয়াই আমারা বিশ্বাস করি, আমাদের অন্তরের সুরে ইহা মিলাইয়া লইতেও বাধে না; পক্ষান্তরে পণ্ডিত জহরলালের আদর্শের উদ্দানও আমরা মিথ্যা বলিয়া পরিহার করিতে পারিনা। জাতীয়তার সাধনায়, কংগ্রেসের মধ্য দিয়া এই আদর্শের সুরেই ভারতবাসী রাষ্ট্র-জীবন বাঁধিয়া তুলিতে চাহিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে সফলকাম হইতে পারে নাই; পারে নাই, তাই বলিয়া যে কোন দিনই পারিবে না, ইহাই বা কি করিয়া বলা যায়! পণ্ডিতজী বলেন—"That it will come I have no doubt; but it will come from below, not above." মহাত্মা গান্ধীর মুখেও তাঁহার এই প্রকার আন্তরিক বিশ্বাসের কথা গভীরতর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের মধ্য দিয়া পাইয়াছি। এই বিশ্বাসের অগ্নিশিখা অনির্ব্বাণ থাকিতে সংমিশ্রণের আদর্শ দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

তাহা হইলে কোন পথ, কি উপায়? আমাদের কথা, যেমন করিয়া হউক, সংহতি-বীর্য্যই সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই মূল, ইহাই আসল কথা। যদি হিন্দুত্বকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের এই সিদ্ধ বীর্য্য দানা বাঁধিয়া উঠে—তাহাতেই বা ভয় কি? আপত্তি কিসের? জানিতে হইবে, সে রূপ হিন্দু-রাজ বা হিন্দু জাতীয়তা নয়, ভারতের মর্ম্মসত্তাই তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে—যে কেহ ভারতকে মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহার পরিপূর্ণ স্থিতি ও আত্ম-সাফল্য তাহার মধ্যেই আছে। মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পারসীক—কে না এই মৌলিক সংহতি-সাধনার রসে আপনাকে ডুবাইয়া, মিশাইয়া, ভারতের অখণ্ড জাতিশক্তি-রূপে আপনার অক্ষয় অটল স্থান করিয়া লইতে পারে? ভবিষ্যতের তরুণ এই সংহতি-বীর্য্য জীবন দিয়া সফল করিতে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইবে—ইহা আমরা দিব্য নেত্রে দেখিতে পাইতেছি। আমরা সেই দিকেই জাতি-সাধনার নূতন দিক্ নির্ণয় করিতে হিন্দু-মুসলমানাদি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল দেশকর্ম্মীকেই আহ্বান করি। ইহা না হইলে, ভারতে নূতন রাষ্ট্ররচনার সত্য গোড়াপত্তনই আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

— শিক্ষা —

শিক্ষা-সম্মেলন—

সম্প্রতি সরকারী শিক্ষা-মন্ত্রী মিঃ নাজিমুদ্দীনের আহ্বানে গভর্ণমেণ্ট হাউসে শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সেই সভায় প্রচলিত শিক্ষা-নীতির সংস্কার ও উৎকর্ষ কল্পে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মিঃ নাজিমুদ্দিন বলেন, যেহেতু গভর্ণমেণ্ট অর্থ-কৃচ্ছ্রতা

প্রযুক্ত ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না, এবং অর্থাভাব-প্রপীড়িত বিদ্যালয়গুলির দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই, ফলে বাংলায় সেকেণ্ডারী শিক্ষা ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপনীত হইতেছে; অতএব ইহার প্রতিকার স্বরূপ উক্ত স্কুলগুলির সংখ্যা কমাইয়া পরিচালনার সুব্যবস্থা ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করা কর্ত্তব্য। ডাঃ জেঙ্কিন্সও ইহাই প্রস্তাব করেন; তিনি বলেন, "In all probability 400 schools, properly organised and controlled, would ensure far more efficient education than was at present possible."

সভায় প্রস্তাবটী ঠিক এই আকারে গ্রাহ্য না হইলেও, যেন ইহার ভূমিকা-স্বরূপ একটা educational survey অর্থাৎ শিক্ষার জরীপ লওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী সকলে যে শিক্ষা-মন্ত্রীর প্রস্তাবনায় একমত হইতে পারেন নাই, তাহা এইভাবে উহাকে সময়ের হাতে ফেলিয়া দায় এড়াইবার ভঙ্গী হইতেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। রাজা রামমোহন রায়ের যুগ হইতে স্যার আশুতোষের যুগ পর্য্যন্ত যে শিক্ষার ধারা বাঙ্গালীকে ভাল বা মন্দ যে ভাবেই হউক অভিষিক্ত করিয়া আসিতেছিল ও যাহা বহু আয়াসে ক্রমশঃ প্রসারতা লাভ করিতেছিল, তাহা সঙ্কুচিত ও বিশীর্ণ করার প্রস্তাবনা কর্ত্তৃপক্ষের মাথায় উঠে কেন?

বাংলায় সরকারী শিক্ষা-নীতির ক্রম-বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলে, এই প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের "এডুকেশন্যাল ডেস্প্যাচে" দেখা যায়, কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কোচ-নীতির ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিলেন; সে কথা খুবই স্পষ্ট—"It is far from our wish to check the spread of education in the slightest degree by the abandonment of a single school to propagate decay."

পরে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের হান্টার কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ জোর দিতে গিয়াও এই কথা বলিয়াছিল—"It would be altogether contrary to its policy to check or hinder in any degree the further progress of higher or middle education." ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড কার্জ্জন "ইউনিভার্সিটি কমিশন" বসাইয়া সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা-নীতি সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহার মূলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, ইহা আজ অস্বীকার করিবার নয়—কিন্তু সেই কমিশনও হাই-স্কুলগুলির ক্রম-বৃদ্ধির ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজনীয় মনে করে নাই। ১৯১৭ সালে যে বিখ্যাত "স্যাডলার কমিশন" বলিয়াছিল, তাহাতে 'বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে তখনকার হাই-স্কুলগুলির সংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী,' এইরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও, সংখ্যা-হ্রাসের কোনই প্রস্তাবনা করা হয় নাই; বরং সেকেণ্ডারী এডুকেশন আরও সুদৃঢ় ও ব্যাপক করিবার জন্যই ছাত্রদের বেতন বাদে খাস সরকারী তহবিল হইতে অতিরিক্ত ১৷৹ কোটী টাকা বার্ষিক ব্যয় বাংলার জন্য অবধারিত হইয়াছিল। এইরূপে দেখা যাইতেছে, শাসন-পক্ষ চিরদিন প্রজাপক্ষের সহিত সংযুক্ত হইয়াই স্বকীয় শিক্ষা-নীতি দেশে বদ্ধমূল করার ধারাবাহিক প্রয়াস করিয়া আসিতেছিলেন; তবে আজ এমন কি কারণ ঘটিল, যাহাতে এই নীতি বর্জ্জন করিয়া শিক্ষার অভিনব ধারায় সংস্কার সাধন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। বাংলার গভর্ণর প্রসঙ্গান্তরে যে বলিয়াছিলেন, "......the product of an educational system built up in better days", তাহা হইতে কি বুঝিতে হইবে, অতীতের শিক্ষা-পদ্ধতি বর্ত্তমানে আর খাপ খাইতেছে না, তাহার কারণ, অবস্থা এত দূর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে বিগত দিনের আনুকূল্যটুকুও আর আমরা পাইব না? ইহা সত্য হইলে, আমাদিগকে বলিতেই হইবে, অন্ততঃ শিক্ষার প্রগতি ক্রমোন্নতির অনুকূলে নয়, প্রতিকূলেই চলিয়াছে।

সভার কার্য্যশেষে শিক্ষা-মন্ত্রী গভর্ণরের একখানি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন:—"There may be some who think that the opportunity of the Conference should have been taken to discuss a matter of great importance to all educationists in this province—I refer to the spread of subversive doctrines amongst students in

schools and colleges. The infection of the minds of the youths of the conntry by such doctrines is, I am sure, you will all recognize, a menace to the true interests of the rising generation itself, as it is to Government and to the established order, social and economic, in this province. The subject is one, which Government cannot and do not intend to neglect. But it was decided when the agenda for this Conference was drawn up, that it was hardly germane to a discussion of the frame-work of our educational system, which is the purpose for which this gathering has been convened."

গভর্ণরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত না থাকিলেও, এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য শিক্ষা-নীতির পুনর্গঠন-সভায় অন্তর্ভুক্ত না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ভালই করিয়াছেন। আবার বাংলার ১২০০ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা-হ্রাস করিলে সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও কমিয়া আসিতে বাধ্য হইবে, এবং ফলে কলেজগুলি অনিবার্য্য ক্রমে শুকাইয়া মরিবে। ইহাতে উচ্চ শিক্ষালাভের পথ সংরুদ্ধ হইবে, ইহাই আমাদের বাঙ্গালীর আশঙ্কা।

তারপর, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাত হইতে সেকেণ্ডারী শিক্ষার পরিচালন ভার একটী স্বতন্ত্র বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হইলেই, যে আসল সমস্যাগুলির পূরণ হইবে তাহা মনে হয় না। বাংলার পুরুষব্যাঘ্র স্যার আশুতোষ যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার আভিজাত্য ও পরিচালনের স্বাধীনতার সংরক্ষণ কল্পে প্রাণপণে প্রয়াস করিয়াছিলেন, কি গভর্ণমেণ্ট, কি স্বতন্ত্র বোর্ড, কোন পক্ষ হইতে সেই অভিজাত্য ও স্বাধীন-কর্ত্তৃত্ব ক্ষুন্ন না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ও গৌরবের বিষয়। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে এই ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয় নিজেই যাহা করিতে পারেন, সেখানে গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ব-বিদ্যালয় উভয়ের মধ্যে আবার একটী নূতন বোর্ড স্থাপন করিয়া শিক্ষা-তন্ত্র সমধিক বিভক্ত ও জটিল করিয়া কি লাভ হইবে? শিক্ষা-সম্মেলনে গঠন-মূলক প্রশ্নগুলি ভাল করিয়া উত্থাপিত হয় নাই। গভর্ণরের উদ্বোধন বক্তৃতার যেটুকু আদর্শ পরিকল্পনার ইঙ্গিত ছিল, তাহাও আলোচনায় সম্যক্ রূপে পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। বাংলার গুরু ও জটিল শিক্ষা-সমস্যাগুলি গভীর ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া যদি একটা সুমীমাংসায় উপনীত হইতে হয়, গভর্ণমেণ্ট, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর মধ্যেই আলোচনা নিবদ্ধ রাখিলে যে আশা সফল হইবে মনে হয় না—বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের কলেজ ও স্কুল হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া এই সভায় প্রেরণ করিলে সম্মেলনটী যথার্থ সুনির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-মূলক বলিয়া নির্ভর করা যাইতে পারে এবং কোথায় বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আসল ত্রুটি, বিচ্যুতি, অভাব নিহিত তাহা কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সহায়ে সুনির্ণীত হইতে পারে। এই প্রণালীতেই প্রতিকারের প্রকৃত কার্য্যকরী উপায় আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা।

টেক্স্ট-বুক-কমিটী—

সম্প্রদায়িকতার বিষ আজ শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে নহে, সমাজ, শিক্ষা, নাগরিক জনসেবার প্রতিষ্ঠান, সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতেছে। এ সর্ব্বনাশী বিষ-ক্রিয়ার শেষ কোথায়, তাহা আমরা জানি না। প্রকাশ, এই সম্প্রদায়িক মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সরকারী শিক্ষা-বিভাগের পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচক সমিতি সত্যের অপলাপ করিয়াও নাকি সুকুমারমতি তরুণদের পাঠ্যগুলির সংস্কার করাইতেছেন। সত্য মিথ্যা তাঁহারাই বলিতে পারেন, সংবাদপত্রে এই কমিটীর পাঠ্য-সংস্কার সম্বন্ধে সম্প্রতি যে একখানি রহস্যাভিজ্ঞের পত্র বাহির হইয়াছে, কমিটীর পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও প্রতিবাদ আমরা দেখি নাই—পত্রখানি কৌতূহলপ্রদ বলিয়া আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন—

"আলাউদ্দিন খিলিজী দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার পিতৃব্য সুলতান জালালুদ্দীন খিলিজিকে হত্যা করাইয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। টেক্স্ট-

বুক-কমিটীর আদেশে এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকে থাকিবে না।

সুলতান মহম্মদ তোগলক যে অত্যাচারী ও খামখেয়ালী ছিলেন ও তাহার ফলে নিরীহ হতভাগ্য প্রজারা নানাপ্রকার নির্য্যাতন ও দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, এ সব কথা মুছিয়া দিতে হইবে।

মোগল-শিখ সংঘর্ষে গুরু অর্জ্জুন, বান্দা, তেগবাহাদুরের হত্যা-কাহিনী আর ইতিহাসে রক্ষা করা চলিবে না। আরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ নীতি ও মন্দির-ধ্বংসের কাহিনী, জিজিয়া করের কথা এবং তাহারই ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের হেতু নির্দ্দেশ ভারতের ইতিহাসে অতঃপর আর উল্লেখ করা হইবে না। আফজাল খাঁ শিবাজীকে অগ্রে আক্রমণ করেন, এ কথা কোনও ঐতিহাসিক লিখিতে পারিবে না; এমন কি, সোমনাথ মন্দিরও যে গজনীর মামুদ লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন আহরণ করেন, এ কথাও সত্য বলিয়া আজ ছেলেমেয়েরা জানিতে পারিবে না, তাহারা জানিবে—মামুদকে পুরোহিতেরা স্বেচ্ছায় ধন দান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।"

টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর নির্দ্দেশ-মত বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া দিলেই কি করিয়া ঐতিহাসিক কঠোর সত্য মিথ্যা হইয়া যাইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই বিদ্যালয়ের শিশুরাই তো একদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গণ্ডী কাটিয়া বাহিরে আসিবে এবং তখন তাহাদের স্বাধীন অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানে যে চক্ষু ফুটিবে, তাহার পর আর তারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর একবিন্দু শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারিবে? কবিও যে গাহিয়াছেন—

"অয়ি ইতিবৃত্ত-কথা ক্ষান্ত কর মুখের ভাষণ
ওগো মিথ্যাময়ি।
তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।"

শিক্ষা-সচিব মিঃ নাজীমুদ্দীনকে আমরা উদার হৃদয় দূরদর্শী রাজ-পুরুষ বলিয়াই জানি—তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-কালে টেক্‌ষ্ট-বুক-কমিটীর কর্ণধারগণ এইরূপ বাংলার শিক্ষা-বিভাগকে দুরপনেয় সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কে কলঙ্কিত না করেন, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শিশুর অন্নে বিষ পরিবেষণ করার মত মহাপাপ যে আর পৃথিবীতে নাই!

— অর্থনীতি —

টাকার মূল্য—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে সিলেক্ট কমিটী হইতে এই মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, যে ইংলণ্ডের প্রচলিত মুদ্রা পাউণ্ডের সহিত টাকার যে সম্পর্ক আছে তাহা রক্ষা করা এবং টাকার মূল্য আপাততঃ ১৮ পেনীই থাকা উচিত। এই বিষয় লইয়া ভারতীয় ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিজ্ঞগণের মধ্যে নানা মতামত শুনা যাইতেছে। বোম্বাই এর ব্যবসায়িগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিলেক্ট কমিটীর মত স্বীকার না করিয়া টাকার মূল্য কমাইয়া ১৬ পেনী, ১৪ পেনী, এমন কি ১২ পেনী করাই উচিত স্থির করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালাইবার জন্য মিঃ বিষণজীর সভাপতিত্বে তাঁহারা একটী কারেন্সী লীগ স্থাপন করিয়াছেন। দিল্লী লাহোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের সকল প্রধান সহরেও ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতায়ও ইঁহারা প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন এবং ডাঃ রবীন্দ্রনাথকে মধ্যস্থ করিয়া তাঁহারা ডাঃ রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী ধুরন্ধরগণের নিকট তার-যোগে ইঁহাদের বিরুদ্ধ মতের নিরসন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কারেন্সী লীগ প্রচার করিতেছেন—আমেরিকা, জাপান ডলার বা ইয়েনের দর কমাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত তো হন নাই, বরং সমধিক সুবিধাই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। ভারত যদি অর্থকৃচ্ছ্রতার পীড়ন হইতে মুক্ত হইতে চায়, তাহারও টাকার মূল্যহ্রাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আচার্য্য রায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ডাঃ এম-রায়, শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু প্রভৃতি অর্থ-শাস্ত্রবিৎ ও ব্যবসায়াভিজ্ঞ বাঙ্গালী নেতৃগণ এই মত স্বীকার করেন না—তাঁহারা বলেন, অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে যাহাই হউক, বাংলার কৃষকদের পক্ষে মূল্য হ্রাসে মঙ্গল হইবে না। ইহাতে পাট বা ধানের দাম বিশেষ বাড়িবে না; কিন্তু বাঙ্গালী কৃষক বিদেশ হইতে যে সব

জিনিষ ক্রয় করে তাহার জন্য ১৲ টাকা দিয়া যেখানে ১৮ পেনীর মাল পাইতেছে সেখানে ১৬, ১৪ বা ১২ পেনীর মাল পাইয়া ক্ষতিগ্রস্তই হইবে। ইহা ছাড়া, এই মূল্যহ্রাস প্রস্তাবের মূলে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বোম্বাইওয়ালা মহাজনদের যে চিরদিনের একটা চাল-বাজীই ভিতরে ভিতরে নাই তাহাই বা কে বলিল? কেন না, মুদ্রা-বিনিময়ের এই নূতন হারে বিদেশের আমদানী যন্ত্রপাতির, বিশেষ বস্ত্রবয়নের কলকব্জার দর বাড়িয়া যাওয়ায়, বাংলার নূতন যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের অসুবিধা ঘটিবে, অথচ যাহাতে বাঙ্গালীর অসুবিধা তাহাতে সুবিধাটুকু বোম্বাইওয়ালারাই ভোগ করিবে, কারণ তাহাদের বাঙ্গালীর মত নূতন কল-কারখানার এখন আর তেমন প্রয়োজন নাই। কেবল বাংলার কথা ছাড়িয়া, সাধারণ ভাবে ধরিলেও, বহির্বাণিজ্য ছাড়া, ভারত গভর্ণমেণ্টের হোম-চার্জ্জ, আমলাদের বেতন, ভাতা, পেন্সন প্রভৃতি বাবদ যে প্রচুর টাকা ভারতবাসীকে দিতে হয়, সেই সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের আরও অধিক টাকা খরচ করিতে হইবে, ইংলণ্ডের নিকট ভারত গভর্ণমেণ্টের ঋণ বাবদ যে সুদ দিতে হয় তাহাতেও বেশী টাকা বাহিরে চলিয়া যাইবে—ফলে সরকারী তহবিলে যে টানাটানি পড়িবে তাহা মিটাইতে জনসাধারণেরই পিঠে করের বোঝা বাড়িবে না কি!

এই সম্পর্কে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ প্রভৃতির স্বাক্ষরিত যে বিবৃতিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, তাঁহারা বোম্বাই কারেন্সী লীগের সহিত একমত হইয়া টাকার মূল্য কমাইতেই পরামর্শ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার নানা বক্তৃতায় ও লেখায় যুক্তি ও তথ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, আচার্য্য রায় প্রমুখ অর্থ-নৈতিকগণের পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার কারণ নাই; বরং ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে, আরও বহু পূর্ব্ব হইতে ১৮ পেনীর স্থলে ১৬ পেনী টাকার দাম করাই উচিত ছিল—ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতি এই টাকার মূল্য হ্রাস-করার উপরেই নির্ভর করে। বোম্বাই-এর দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে তিনি বলেন, এই পুরাতন কচকচি টানিয়া আনা এক্ষেত্রে ঠিক নয়; কারণ, বোম্বাই যখন অধিকাংশ কলকারখানা বসায়, তখন টাকার দর ১৬ পেনীই ছিল, এখনও তারা কাপড় তৈরীর কল-কব্জা প্রতি বৎসর বাঙ্গালীর চেয়ে দশগুণ বেশীই কিনিয়া থাকে। বরং বাঙ্গালীর স্বার্থের দিক্ দিয়া তিনি দেখাইতে পারেন, বহির্বাণিজ্যে বোম্বাইওয়ালাদের চেয়ে বাঙ্গালীদেরই বেশী লাভবান্ হইবার কথা। শুধু গত বৎসরেই বাঙ্গালী বোম্বাই-এর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ মাল বিদেশে রপ্তানী করে নাই, মোটামুটি রপ্তানীর বাজারে বাঙ্গালীই অধিক পরনির্ভরশীল—বাংলার পাট শতকরা ৯৫ ভাগ বিদেশে না বিক্রয় করিলে চলে না, কিন্তু বোম্বাই-এর তুলা তাহাদের নিজেদের কলকারখানাতেই তাহারা অর্দ্ধেকখানি উপযোগ করিয়া থাকে। আরও শ্রীযুক্ত সরকারের মতে, টাকার মূল্য-হ্রাস ছাড়া বাংলার উদীয়মান শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখার আর দ্বিতীয় উপায়ই নাই।

এইরূপে দেখা যায়, উভয় পক্ষেই যুক্তি যথেষ্ট। বিশেষতঃ অর্থনীতির ন্যায় অতি জটিল দুর্ব্বোধ্য ক্ষেত্রে, যেখানে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যেই এত মতভেদ স্বাভাবিক, সেখানে জনসাধারণের সহজ সাধারণ মস্তিষ্ক যে একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় যাহাতে চিকিৎসা-বিভ্রাট না ঘটে, তাহার জন্য আমরা বাংলার সকল মনীষীকেই একত্র হইয়া একটা যুক্ত মীমাংসায় উপনীত হইতে অনুরোধ করিতেছি। এ যুগ সংহতির যুগ; চিন্তায় ও জীবনে সংহতিবদ্ধ আয়াস ও প্রয়াসই আমাদের জটিল পথে যথার্থ আলো ধরিতে পারে—অন্যথা অর্থ-ধুরন্ধরগণের বিচ্ছিন্নভাবে মতামত ও যুক্তি-প্রকাশের ফলে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াই পড়িতেছি। ব্যবসায় ও সাধারণ জীবন-ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় জীবনপুষ্টির সম-সূত্রেই বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রা কোন দিক্ দিয়া অধিক জটিল ও বিপন্ন হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য অতি সাবধানেই আমাদের প্রত্যেক পা-টী ফেলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সম্মিলিত মাথা ও মন লইয়াই আজ সকল সমস্যা আমাদের মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে একদিন

(প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র)

স্নেহের কল্যাণী,—

তোমার চিঠি পেয়ে জান্‌লাম, পড়া-শুনার মধ্য দিয়ে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সঙ্গে যে পরিচয়টুকু লাভ করেছ, তাতেই তোমার বেশ ব্যাকুলতা জন্মেছে এখানে আসার জন্য। মানুষ যতই আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ুক, অসীমের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কিন্তু কখনই হয় না। একটা বৃহত্তর জীবনের ছবি যখন কালির আঁচড়ে কাগজের বুকে চোখের সাম্‌নে মনের কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে ফুটে উঠে, তখন অন্তরের গোপন কোণ থেকে একটা উদ্বুদ্ধতা জেগে উঠে তা জীবনে পাবার জন্য। দূর হতে সব কিছুই বেশ লোভনীয় লাগে, কিন্তু নৈকট্যে পুরাণো স্বভাব বিদ্রোহ করে' সব ঘুলিয়ে দেয়। এত দূর থেকে তোমার আসার সুযোগ নেই বলে আমার চোখ দিয়ে জিনিষটা দেখ্‌বার ও মন দিয়ে জান্‌বার আকুলতা পুনঃ পুনঃ জানিয়েছ। সুযোগ করে উঠ্‌তে পারি নি এতদিন। প্রবৃত্তিও খুব ছিল না,—থাক্‌বার অবসরও নেই। এ নিত্যকারের দৈন্য-পীড়িত জীবনে একঘেয়ে পেটের চিন্তা ছাড়া আর ভাল-মন্দ কোন চিন্তারই ঠাঁই থাকতে পারে না। সঙ্ঘের কলিকাতার বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রটি রোজই কিন্তু মনে করিয়ে দিত তোমার মিনতি ও আমার অবসরহীন জীবনের অপর আর একটা দিকের কথা। এদের বহুবাজারের বাড়ীর পাশ দিয়েই আমার প্রত্যহের যাতায়াতের রাস্তা। সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলাম। সেদিন হঠাৎ যেমন মনটায় বলা, অমনি গিয়ে কলিকাতাস্থ কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ। যাওয়া স্থির হ'ল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার শেষ ট্রেণে।

চন্দননগর আশ্রমে যখন পৌছন গেল, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। আমরা ছিলাম জন কুড়িক। শুন্‌লাম, পরের দিন সঙ্ঘ-মায়ের তিরোভাবোৎসব। আশ্রমে একেবারে নিশুতি। একটি প্রাণীও জেগে নেই। একটু আশ্চর্য্য ঠেক্‌লো, বিশেষ রাত্রি-প্রভাতেই উৎসব। কৌতূহল হ'ল, অনুসন্ধানে বুঝ্‌লাম,—এদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। যুক্ত আহার-বিহার-শয়ন-নিদ্রা। ঘুমটুকুর যে মূল্য আছে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, যখন দেখ্‌লাম, কুড়ি জন লোকের নিদ্রার ব্যবস্থা নীরবেই করা হ'ল—এতটুকুও শব্দ নেই, কোলাহল নেই। ঘুমন্ত যারা তারা জান্‌লেও না, এতগুলো অতিথির সমাগম। ঘরের দরজাগুলি ছিল খোলা,—বুঝ্‌লাম, এ ব্যবস্থা পূর্ব্বেরই।

নূতন জায়গা, ঘুম আস্‌তে একটু দেরী হ'ল। চোখ বুঝে কত কি ভাবনা! একটা কথা বারে বারে মনে হতে লাগ্‌ল, যে একটি দিনের তরে হ'লেও অন্ততঃ ব্রিটিশ রাজ্য ছেড়ে ফরাসী রাজ্যে আসা গেছে। চন্দননগর কলিকাতা থেকে মাত্র মাইল একুশ, কিন্তু এ সুযোগ আজও হয়ে উঠে নি।

২২ শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার। ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি বিদ্যুতের আলোতে ঘর ভরা। ঘড়িতে দেখি ভোর চারটা বাজ্‌তে ৫ মিনিট বাকী আছে। খড়ম-স্লিপারের এলোমেলো ধ্বনি। মুখে কারও কথাটি নেই, যার যার মত বাহিরে চলেছে। শীতের রাত, লেপ ছেড়ে উঠ্‌তেও আমি নারাজ। কিন্তু পূর্ব্ব হতেই সঙ্কল্প ছিল সঙ্ঘের জীবন-প্রণালীর সঙ্গে নিখুঁত পরিচয় লাভ করার।

তাই অবশ দেহটাকে টেনে তুলে' অনিচ্ছায়ই সকলের পিছন পিছন চল্‌লাম। মাতৃ-মন্দিরের সম্মুখে সারি দিয়ে সকলেই দাঁড়াল। নীরব-মৌন। ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা চারিটার সংকেত হ'ল। সমবেত কণ্ঠস্বর শেষ নিশার নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে আঁধার আকাশে মিশে গেল। যে সকল মন্ত্রের উদ্গান হ'ল, তার সারমর্ম্ম দু'টো লাইন থেকেই বুঝে নিলাম। লাইন দুটো এই—"প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রাম্ অনুবর্ত্তয়িষ্যে," আর "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" এ থেকেই বুঝ্‌তে পারবে এদের দৈনন্দিন জীবনারম্ভের ভঙ্গীটি।

আমার কিন্তু বেশ লাগ্‌লো। বহুদিন পরে অন্তরে

যেন একটু সজীবতা অনুভব করতে লাগ্‌লাম। নিজের পায়ের উপর ভর করে' পুনঃ পুনঃ দাঁড়াবার চেষ্টা-ব্যর্থতা, আশা-নিরাশার অবসাদ কেটে গিয়ে কোথা থেকে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বইল। সূর্য্যের আলোয় গৃহাঙ্গন ছেয়ে গেলে ঘুম থেকে উঠি। জেগেই দেখি, বিশ্বের ব্যস্ততা। তুলনায় ম্রিয়মানতাই আসে। অন্তরের এ দৈন্যতা বুঝেও স্বভাব-দোষে তা দূর করা সাধ্যে কুলিয়ে উঠে না।

শীতের ভোর চারটা—তখনও আঁধার কাটে নি। নিস্তব্ধ পল্লী। নীরব প্রকৃতি। হরিবোল দিয়ে একটা মরা শ্মশানে নিয়ে গেল কি পুড়িয়ে ফিরে এল। বেড়াইচণ্ডীর শ্মশান-ঘাটের চিতার আগুন মাঝে মাঝে জ্বলে' উঠ্‌ছিল। প্রিয়বিরহিণী এক নারীকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ থেকে থেকে শ্রবণে পশে' ভাবিয়ে তুল্‌ছিল।

উপাসনান্তে গত রাত্রের আগন্তুকদিগের সঙ্গে স্থায়ী আশ্রমীদের কুশল-বার্ত্তা হৃদয়-বিনিময় চল্‌তে লাগ্‌ল। প্রীতিপ্রফুল্ল হাসি সকলের ঠোঁটেই ফুটে উঠেছে। অচেনা, একটি পাশে দাঁড়িয়ে নির্ব্বাক্ হয়ে সব দেখে যাচ্ছি। বাহ্য আদর-আপ্যায়নের সঙ্কোচ হতে মুক্তি পেতে পনর মিনিটের অধিক লাগে নি। কোথা দিয়ে এক হয়ে গেল, বুঝ্‌বারও অবসর পেলাম না। বয়ঃ-কনিষ্ঠ যারা নিজের থেকেই নামের সঙ্গে 'দা', বড়রা 'ভায়া', 'বাবু' যোগ করে' ডাকা সুরু করে' দিয়েছে। কত দিনের যেন সব পরিচিত! আশ্রমজীবন, এমন অজানার সঙ্গে দৈনন্দিন এদের কারবার। আমার যে একটা আলাদা অস্তিত্ব, বাড়ী, ঘর, কুল-শীল আছে—তার পরিচয় যেন এদের কাছে নিরর্থক। আমাকে ও আমার সম্ভাবনীয়তাকে ঘিরেই তাদের সকল জানার সার্থকতা। ৪—৫ টা শৌচ-আচমন-হাত-মুখ-ধোওয়ার পালা। তাড়াহুড়ো দেখে মনে হ'ল যেন ভোরের গাড়ীতে বিদেশগমনের উদ্যোগ পর্ব্ব চল্‌ছে।

সাড়ে চারটা বাজ্‌তেই দিকে দিকে তন্দ্রাজড়িম নিঝুম পাড়া, বৃক্ষলতার বুক বিদীর্ণ করে' শঙ্খধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌ল। এ যেন উষার আগমনী জানিয়ে নিদ্রা-তমসাচ্ছন্ন পুরবাসীর কানে কানে লজ্জা-দেওয়া জাগরণী গীতি! প্রবর্ত্তক-ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের সু-উচ্চ চূড়া হতে সুমধুর বেদগান অদূর মজসিদের আজানধ্বনির সঙ্গে মিলে মিশে নিশিপ্রভাতের আগেই বিশ্বনাথের চরণ স্পর্শ করল। ভারতীর মন্দিরে মহামানবের মিলনের অভিনব সঙ্কেত সত্যিই সেদিন আমায় মুগ্ধ করেছিল।

পাঁচটা বাজ্‌তেই মাতৃ-মন্দিরে নীরবে যে যার আসনে উপবেশন করল। সন্ন্যাসী-শিক্ষক-ছাত্রের প্রভাত-ফেরীর দল 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি' গান গেয়ে ফিরল। পুরনারী—প্রতিবাসীর ঘুম-ভাঙান এ টহল মানুষকে ভগবানে উন্নীত করারই অপূর্ব্ব কৌশল। সে মনমাতান সঙ্গীতের রেশে কর্ম্মক্লান্ত চিত্ত আমার এক অজানা অনন্তের টানে ঝিঁমিয়ে আস্‌ছিল।

৫—৫৷৷০ টা স্বাধ্যায় ও ধ্যান।

৫৷৷০ টা হইতে ৬ টা সমবেত উপাসনা।

পূব-গগন রাঙিয়ে উষার আলো উকিঝুকি মারছিল। অনতিদূরে অচঞ্চল, কাঁচের মত স্বচ্ছ পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জল দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সারি সারি বট-অশ্বত্থ মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে। ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃক্ষরাজির মাঝে শিবমন্দির, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আশ্রমপ্রাঙ্গণ, ফুল-পরি-শোভিত পুষ্পোদ্যান, সব্জী-বাগান—নিশার অন্ধকারা-বসানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। নীরব-নিস্তব্ধ এই প্রকৃতির মাঝে সমবেত নারী-পুরুষের কণ্ঠে মন্ত্রোদ্গান-ধ্বনি অন্তরে অদেখা অতীতের বেদমুখরিত তপোবন-স্মৃতি জাগিয়ে দিল। মুহূর্ত্তের হ'লেও জীবনের সে অনাস্বাদিত আনন্দের রেশ কোন দিন বিস্মৃত হবার নয়। দৈনন্দিন জীবনের প্রথম সুর ভগবানের চরণে নিবেদন করার যে তৃপ্তি, তা সেই দিনের সেই শুভ মুহূর্ত্তে প্রথম অনুভব করলাম।

৬—৭টা খেলাধূলা, ব্যায়াম, চরকাকাটা ইত্যাদি।

৭টায় সঙ্ঘগুরু কর্ত্তৃক উৎসবের উদ্বোধন।

শ্রীশ্রী৺রাধারাণী দেবীর তিরোভাব উপলক্ষে এই উৎসব প্রতি বৎসর এই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। ইনি সঙ্ঘ-গুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের সহধর্ম্মিণী। এঁর মর্ত্ত্যজীবন আশ্রয় করে'ই সঙ্ঘের আত্মসমর্পণ-যোগ মূর্ত্তি নেয়। ৺রাধারাণী দেবীর চিতা-ভস্ম আশ্রমে সমাধিস্থ আছে। আর এই উলঙ্গ সন্ন্যাসী—কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই

অথচ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। কষিত কাঞ্চনের মত গায়ের রং, উন্নত কপোল, ভাসা ভাসা চক্ষু। ইনিই এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, স্রষ্টা, ঋষি। এই লোকটীর সপক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা অনেক দিন হতে শুনে আস্‌ছি। আমার কিন্তু প্রথম দর্শনেই ভক্তি-শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল। সংশয়ী মন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যেন কেমন বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়্‌ল। আশ্রম ত্যাগ করে' আসার পর ক্রমশঃ সে সম্মোহন কেটে আস্‌ছে।

উৎসুক অনুগত শিষ্য-শিষ্যায় মন্দির ভরা। গুরুর ধ্যান-স্তিমিত নয়ন। নিস্পন্দ-নিথর দেহ। ৪৫ মিনিট সমানে একটানা একটা সুরের মত অনর্গল বলে' গেলেন। বল্‌বার ভঙ্গীতে মানুষ মুগ্ধ না হয়ে পারে না। প্রবর্ত্তকের অন্তর্যোগের কথা—সাধনার ইঙ্গিত। সব না বুঝ্‌লেও, কিন্তু খুব ভাল লাগ্‌ল। গতানুগতিক জীবনধারার মাঝে যেন একটা অভিনব ছন্দের আস্বাদ পেলাম। মোটের উপর একটা অখণ্ড অমিশ্র বিশ্বাসের অগ্নিমূর্ত্তি—উৎসর্গের হোমকুণ্ড জ্বেলে নিজের সবখানি আহুতি দিয়ে বাঙ্গালীকে জাগার জন্য আহ্বান দিচ্ছেন।

৮—১০ পর্য্যন্ত চণ্ডীপাঠ।

তারপর, জলখাবার। বিশেষ, নবান্নের ব্যবস্থা আজই করা হয়েছিল বলে' জলখাবারের পরিপাটিটি ছিল ভালই।

শুদ্ধ স্নাত হয়ে আবার ১২টায় উপাসনা ও স্বাধ্যায়। ১২৷৷০টায় মধ্যাহ্ন আহার। উৎসবের জন্য মধ্যাহ্ন আহারের অবশ্য সেদিন কিছু বিলম্ব হয়েছিল।

আহারের পর সঙ্ঘের দর্শনীয় বিষয়গুলো ঘুরে ঘুরে দেখ্‌লাম ও সঙ্ঘ-সভ্যদিগের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় কর্‌লাম। সময়-মত পরে সে বিষয় লিখার ইচ্ছা রইল।

অপরাহ্ণ ৪টায় সঙ্ঘ-গুরু ঘণ্টাখানেক 'গীতা' সম্বন্ধে বল্‌লেন। অভিনব ব্যাখ্যা। গীতার উদ্দেশ্য—মুক্তি-মোক্ষ নয়, পরন্তু জীবনবাদ। পাশ্চাত্যের 'ইজম্'কে সাফল্যমণ্ডিত কর্‌তে প্রতীচ্যবাসী প্রাণপণ করেছে কিন্তু 'গীতা'কে জীবনগত কর্‌তে ৫০০০ বৎসর ধরে' আমাদের দেশ পারে নি। ভারতের মাটি-জল-বায়ু গীতাশিক্ষার অনুকূল ক্ষেত্র। বাইরের মতবাদ নিয়ে ভারতবাসী যতটুকু নাড়াচাড়া করেছে, ততটুকু শ্রম নিজস্ব এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে' দিলে ভারতীর মন্দির আজ মহা-মানবের মিলনতীর্থে পরিণত হত।

কেমন করে' তা সম্ভব হত, সে সম্বন্ধেও সবিশেষ বুঝালেন। যুক্তিযুক্তই বলে' মনে হ'ল। বর্ত্তমান তরুণ মন ও জাতি-সাধনার উপযুক্ত করে' এ শাস্ত্রব্যাখ্যা বেশ যুগোপযোগী। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের উদ্দেশ্যও যতটা অনুমিত হ'ল এই রকম কিছু একটাই হবে। 'গীতা'-সভায় দীঘাপাতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় ও তাঁর পুত্র উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর সঙ্ঘের নারী-মন্দিরের পক্ষ থেকে কুমার বাহাদুরকে এক অভিনন্দন দেওয়া হল। মেয়েদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করার সময় বা সুযোগ হয়ে উঠে নি। তবে যে কয়েকটি উপলক্ষে যতটুকু একত্র হয়েছি, তাতেই যতটুকু ধারণা করে' নিতে পার্‌লাম। বেশ সলজ্জ অথচ নিঃসঙ্কোচ ভাব। ব্রতধারিণী, কুমারী, বিবাহিতা, ব্রহ্ম-চারিণী হলেও মুখে তৃপ্তির আভাস, বসনে-ভূষণে ত্যাগ-তপস্যার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে নিবিড় নৈকট্যের মাঝেও একটা দূরত্ব যে রক্ষিত হয়, তাহা দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। শেষ পর্য্যন্ত না দেখে বা নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিচয় না পেয়ে, এ দেব-দেবী-সৃষ্টির সাফল্য শেষতক কি দাঁড়ায় তা বলা যায় না। তবে সাধনক্ষেত্রে যে মেয়েদের বাদ দেওয়া হয় নি, এইটেই তৃপ্তিকর।

মেয়েদের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চ্চা মুখ্যভাবে প্রবর্ত্তিত করা হয়েছে। এটা সুলক্ষণ। তাঁদের ধারণা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই, যে ইহা ভিন্ন ভারতীয় মস্তিষ্ক গড়ে' উঠা সম্ভব নয়। সঙ্ঘে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীও আছে। যে রেটে এরা এদিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে মনে হয়, শীগ্‌গীরই নবদ্বীপ ভট্টপল্লীর পরেই ভারতীয় শিক্ষার তীর্থরূপে একেবারে নগণ্য হবে না।

সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দেই কেটে গেল।

সন্ধ্যা ৭ টায় আবার সমবেত উপাসনা ও স্বাধ্যায়। ৮ টায় আহার। রাত্রি ৯ টায় পুনরায় মাতৃ-উপাসনা। তারপর শয়ন। সাড়ে নয়টার সময়ে সারা আশ্রমের আর কোথাও টুঁ শব্দ নেই। সকলেই স্ব স্ব শয্যা নিয়ে অনুচ-

স্বরে ১০৮ বার 'ওঁ সচ্চিদানন্দময়ী মা' নামোচ্চারণ করে। দৈনন্দিন জীবনারম্ভের ভঙ্গীও যেমনি, সমাপ্তিও তেমনি। দেখাদেখি আমিও সুরু করলাম কিন্তু শেষ হল কি না জানি না। ঘণ্টার শব্দে যখন জাগ্‌লাম, তখনও লুপ্ত স্মৃতির মত মনে হতে লাগ্‌ল, যেন নাম করা শেষ হয় নি, এ প্রবাহ কোন দিন শেষ হয় বলে'ত বোধ হল না।

সঙ্ঘে একটি দিন মাত্র, কিন্তু এ অপূর্ব্ব আস্বাদ-স্মৃতি জীবনের পৃষ্ঠা থেকে কোন দিন মুছে যাবার নয়। এই সঙ্ঘ-সাধকদের বহির্জীবনের কর্ম্মব্যস্ততা দেখে আমার যে একটা অন্যরূপ ধারণা ছিল, তা কিন্তু এই স্বল্প পরিচয়েই বদ্‌লে গেছে। ধর্ম্মবাদ, মতবাদ নিয়ে এখানে মাথা ঘামানোর লক্ষণ কিছু দেখ্‌লাম না। ধর্ম্ম-বস্তুটি জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত (attitude of life), না পাওয়ার অপরিতৃপ্তি লক্ষ্যে পড়্‌ল না। অধিকাংশ ব্যষ্টি-পারিবারিক জীবনের যে আজিকার অভাবজনিত হাহাকার, চিন্তাক্লিষ্টতা তার একান্ত অভাব এখানে। এত বড় পরিবার, বছরে খরচ বিশহাজার টাকার কম হয় বলে' মনে হয় না; কিন্তু সে কথা কেউ এতটুকু ভাবে বলে'ও নিশ্চিত কর্‌তে পার্‌লাম না। নিজের উপর ভার রাখার যে একটা উদ্বিগ্নতা তা এদের নেই। তবু কিন্তু এরা স্বাবলম্বী। কামিনী-কাঞ্চনকে দূরে পরিহার করে নি। শিক্ষা ও অর্থ—সাধকদের সাধ্য উপায়, ভাগবৎ ঐশ্বর্য্য। দিবা-রাত্র কর্ম্মব্যাপৃত। তাই বোধহয়, নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য দেখলাম না। নিশ্চিন্তে ঘি-দুধ-মালপো-সেবী নিষ্কাম সাধকদের নাদুস্-নুদুস্ দেহের তুলনায় এই জিনিষটে আমার খুব স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। নিজের হাতে এরা চরকা কাটে, তাঁত বোনে। নিত্য চরকা কাটাটা এদের সাধনার অঙ্গীভূত। শ্বেত শুভ্র খদ্দরবিভূষিত নরনারীকে দেখে তৃপ্তি ও আনন্দ পেলাম।

সঙ্ঘের ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির, নারী-মন্দির, লাইব্রেরী, চতুষ্পাঠী, অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের ও জীবনধারণের অন্তঃ-বহিঃপরিচয় পরে দিবার ইচ্ছা রইল। এখন থেকে নিবিড়ভাবে একটু মিশ্‌ব।

প্রেম-প্রীতি নিও, ইতি আশীর্ব্বাদক

—'দাদা'।

[*পত্রখানি লেখকের ঝুলি হইতে সংগৃহীত

—আশ্রমী]

আশ্রম-সংবাদ

[আশ্রমি-লিখিত]

শ্রীশ্রী৺রাধারাণী দেবীর তিরোভাবোৎসব

২২শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রী৺রাধারাণী দেবীর সাম্বাৎসরিক তিরোভাবোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃ ৭টায় সঙ্ঘ-গুরু এই উৎসব উদ্বোধন করেন।

সঙ্ঘদেবীর জীবনক্ষেত্রে সঙ্ঘ-বীজ আত্মসমর্পণ-যোগ সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের পবিত্র আশ্রম-ভূমির প্রতি রক্তকণা আজ দেবীর করুণাস্পর্শে ধন্য। সঙ্ঘ-জননীর শেষ পূত-চিতাভস্মের উপর মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন ভারতীয় ভাব-সিদ্ধবিগ্রহ। তপস্যানিরত সন্তানব্রতীর দল সেই তপোবীর্য্যকে মর্ত্ত্যের বুকে সিদ্ধরূপ দিবার জন্যই উদ্যত। বাৎসরিক এই অনুষ্ঠান তাহারই বহিঃপ্রকাশ। স্নেহের সন্তানগোষ্ঠীর এই শ্রদ্ধার্ঘ্য অলক্ষ্যে সঙ্ঘ-জননী গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁর ব্রত তিনিই পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে মনীষীর সমাবেশ

অগ্রহায়ণ মাসটি সঙ্ঘ-জীবনে এক প্রকার উৎসবময়। বিভিন্ন মনীষীর শুভাগমনে আশ্রমভূমি ধন্য হইয়াছে। আমরা আমাদের হৃদয়ের অনাবিল আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা মাননীয় অতিথি মহোদয়গণকে জ্ঞাপন করিতেছি।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যোগ্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও শ্রীনিকেতনের অন্যতম একনিষ্ঠ কর্ম্ম-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত গৌর গোপাল ঘোষ মহাশয়কে প্রথমবারে আমরা আমাদের মধ্যে পাইয়া অন্তর-পরিচয়ের সুযোগ লাভে কৃতার্থ হইয়াছি।

কয়েকদিন পরেই পুনরায় সুসাহিত্যিক 'কুষ্মাণ্ড'য়ের লেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস, রথীন্দ্রবাবু ও তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী প্রতিমাদেবীকে আমাদের মধ্যে নিবিড়ভাবে পাইয়া অকপট হৃদয়-বিনিময় ও ভাবের

আদান-প্রদানের অমূল্য সুযোগ আমরা পাই। মাননীয় অতিথিবৃন্দ ও সঙ্ঘের নারী-পুরুষের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ প্রীতি-বৈঠকে বসে। চারুবাবুর হাস্য-রসিকতা, রথীন্দ্র নাথের বিনয় ও ভব্যতা এবং প্রতিমা দেবীর সলজ্জ নম্রতা বিশেষ করিয়া আমাদের চিত্তপটে যে প্রীতি ছাপ রাখিয়া যায়, তাহা কোনদিন মুছিবার নয়।

২২শে অগ্রহায়ণ মাতৃ-উৎসবের দিন দীঘাপাতিয়ার কুমার সুলেখক, ধার্ম্মিক-প্রবর কুমার হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় ও তাঁহার পুত্র আশ্রমে শুভাগমন করেন। তিনি বলেন, যে মানবজীবনের চরম সার্থকতা ধর্ম্মাশ্রয় ভিন্ন সম্ভব নয়। রাজনীতিকে মুখ্য লক্ষ্য না করিয়াও, burning patriotism থাকিতে পারে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া যে জাতিগঠনের প্রয়াস করিতেছে তাহা দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। কুমার বাহাদুরের ধর্ম্ম-প্রাণতা, বিনয় ও ভব্যতা আমাদের সাতিশয় মুগ্ধ করিয়াছে।

পরলোকে রমণীরঞ্জন

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ একটা বস্তুতন্ত্র জীবন-সাধনার ক্ষেত্র। ভাব-সাধনায় মানুষ উভয়-কুল বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে জাতি-কুল-মান, এমন কি দেহ-চেতনাকেও বিসর্জ্জন দিয়া মুহূর্ত্তের সঙ্কল্পে একেবারে ভগবানে নবজন্ম লাভ করিতে হয়। ভাবের ঘরে গোঁজামিল না থাকায় বিদ্রোহী অতীত সংস্কার, অবিশুদ্ধ স্বভাবকে উপেক্ষা করিয়াই সাধকের আগাইয়া চলার রীতি। প্রচণ্ড অন্তর-গতির সঙ্গে যুক্তি রাখিয়া চলিতে অসমর্থ দেহ-মন মাটির বুকে মুষ্ড়িয়া পড়ে। যুগ যুগান্তের পুঞ্জীভূত সংস্কার চেতন-গতির দাপটে প্রলয় সৃষ্টি করে। নব কলেবরের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন হয় দেবতার অবিকৃত বীর্য্য অবধারণ করার জন্য। তাই সঙ্ঘের বুকে ঘন ঘন মৃত্যু-মহোৎসব সঙ্ঘ-দেবতার অচল অটল বেদীপ্রতিষ্ঠারই অমর সূচনা।

হেমচন্দ্র ও ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতি ম্লান হইতে না হইতেই রমণীরঞ্জনের পরলোকগমন সঙ্ঘ-হৃদয়ে নূতন ক্ষতের সৃষ্টি করিল। রমণীরঞ্জন ছিলেন চট্টল-সঙ্ঘের শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রাণস্বরূপ। তাঁর মৃত্যুতে শুধু প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ নয়, সমগ্র চট্টল একজন নীরব কর্ম্মযোগীকে হারাইল।

১৮৯৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার শাকপুরাগ্রামে রমণীরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। একটা বৃহত্তর জীবনের বীজ তাঁর আবাল্য কৈশোরের প্রতি ঘটনাটির মাঝে যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তাঁহার পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র সদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। সৎশিক্ষার ভিতর দিয়া দেশাত্মার জাগরণের সুষ্ঠুপ্রয়াস তাঁহার জীবনে বরাবরই লক্ষিত হয়। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে একটা উন্নততর জীবনের আদর্শ ও দৃঢ় চরিত্র লাভ করার অনিবার্য্য প্রয়োজন, ইহার গোড়া হইতে বুঝিয়াই রমণীরঞ্জন ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়েই প্রাণায়াম অভ্যাস আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সুগঠিত দেহে হৃদ্‌রোগ দেখা দেয়। জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত এই পীড়ায় তাঁহাকে ভুগিতে হয়।

১৯২১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রবর্ত্তকের নির্ম্মাণ যজ্ঞের আহ্বানে রমণীরঞ্জন মা, ভাই, গৃহ ছাড়িয়া প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে যোগদান করেন। পূর্ব্বেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। এইবার তিনি সত্যই জীবনের 'মিশন' খুঁজিয়া পাইলেন। প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার ছাড়া জাতিগঠন বা জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নয় বুঝিয়া রমণী-রঞ্জন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জাতীয় শিক্ষাদান কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। সুকোমলমতি শিশু-হৃদয়ে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করিবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প তাঁহাকে ২৪ পরগণাস্থ মালা বিদ্যাপীঠে টানিয়া লইয়া যায়। তথায় দীর্ঘ দশ বৎসরকাল তাঁহার নীরব আত্মদানের ফলে তথাকার শিশু এবং যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এক নূতন প্রাণস্পন্দন জাগিয়া উঠে। এই সময় হইতেই তিনি সঙ্গীত এবং অভিনয়কে জাতীয়ভাব-প্রচারের বিশেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেন। জাতীয় ভাবোদ্দীপক "বিজয়সিংহ," "আনন্দমঠ" প্রভৃতি অপ্রকাশিত নাটকগুলি তাঁহার সে সময়কার রচনা। তাঁহার রচিত "বিজয়সিংহ" নাটক চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠে অনেকেরই শুনিবার সুযোগ হইয়াছে। শুধু অভিনকারী বালকদের প্রাণে নয়, শ্রোতাদের প্রাণেও যে পুলক-স্পন্দন জাগিয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ যখন বিদ্যার্থিভবন আরম্ভ করা স্থির করেন, তখন উহার ভারগ্রহণ করিবার জন্য রমণীরঞ্জন মালা বিদ্যাপীঠ ছাড়িয়া চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। ব্যাপক শিক্ষাকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ এবং প্রেরণা ছিল অনেকখানি। নিবিড়ভাবে দেশের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনের জন্য তিনি বিদ্যার্থিভবনের ছাত্রদের লইয়া মাঝে মাঝে পল্লীভ্রমণে বাহির হইতেন এবং তথায় পল্লীবৈঠক করিয়া আবৃত্তি ও অভিনয় সংযোগে পল্লীর বুকে জাতীয় ভাব ছড়াইবার আয়োজন করিতেন। তাঁহার উৎসাহে ক্ষুদ্র বিদ্যার্থিভবন বর্ত্তমান প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়।

ছেলেরা ছিল তাঁহার প্রাণ। তাহাদের জীবনের অতি ক্ষুদ্র কাজেও তাঁহার সাহায্যহস্ত চির উদ্যত থাকিত।

এইখানে আসিয়া তাঁহার শরীর বিশেষ ভাল ছিল না, পেটের অসুখ লাগিয়াই ছিল। পরে ১৯৩২ সালের নবেম্বর মাসে দুরন্ত যক্ষ্মারোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে। এই কাল-ব্যাধির হাত হইতে তিনি আর মুক্তি পাইলেন না। কালব্যাধিতে ভুগিবার সময়েও তাঁহার কর্ম্মোৎসাহ হ্রাস পায় নাই। দুরন্ত রোগযন্ত্রণার সামান্য একটু উপশম হইলেই তিনি তাঁহার প্রিয়কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতেন—তখনও তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য যুগোপযোগী 'নবজন্ম' 'দিদিমণি', 'পুরু' 'দুইবিঘা বাস্তু' প্রভৃতি নাটক-রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

নানাভাবে এক বৎসরকাল চিকিৎসিত হওয়ার পরও চট্টগ্রামের ডাক্তারেরা যখন তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন, তখন গত ১৪ই অক্টোবর তাঁহাকে চিকিৎসার্থ যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতালে পাঠান হয়। তথায় তাঁহার রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে। মৃত্যুর সপ্তাহখানেক মাত্র পূর্ব্বেও, তাঁহার জন্য চিন্তিত হইতে বারণ করিয়া তিনি তাঁহার সহসাধক বঙ্কিমবাবুকে তথা হইতে বিদায় দেন। গত ২৬শে নবেম্বর রবিবার অপরাহ্ন ৪-১৫ মিনিটের সময়ে সেই সুদূর হাসপাতালেই তিনি দেহত্যাগ করেন। কলিকাতা প্রবর্ত্তক ভবনস্থ সঙ্ঘভ্রাতৃগণ এবং অপর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময়ে, কেওড়াতলা শ্মশানে স্বামী ব্রহ্মানন্দের চিতার পার্শ্বে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

অন্তিমশয্যায় রমণীরঞ্জন

রমণীরঞ্জনের স্বভাব-মধুর চরিত্র জানা-অজানা বহুলোকেরই হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে, তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে সঙ্ঘের এবং দেশের অনেকখানি ক্ষতিই হইল। বিধাতার বিধান নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া চলা ছাড়া উপায় নাই!

শিক্ষয়িত্রী চাই

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, :61, Bowbazar St., Calcutta.
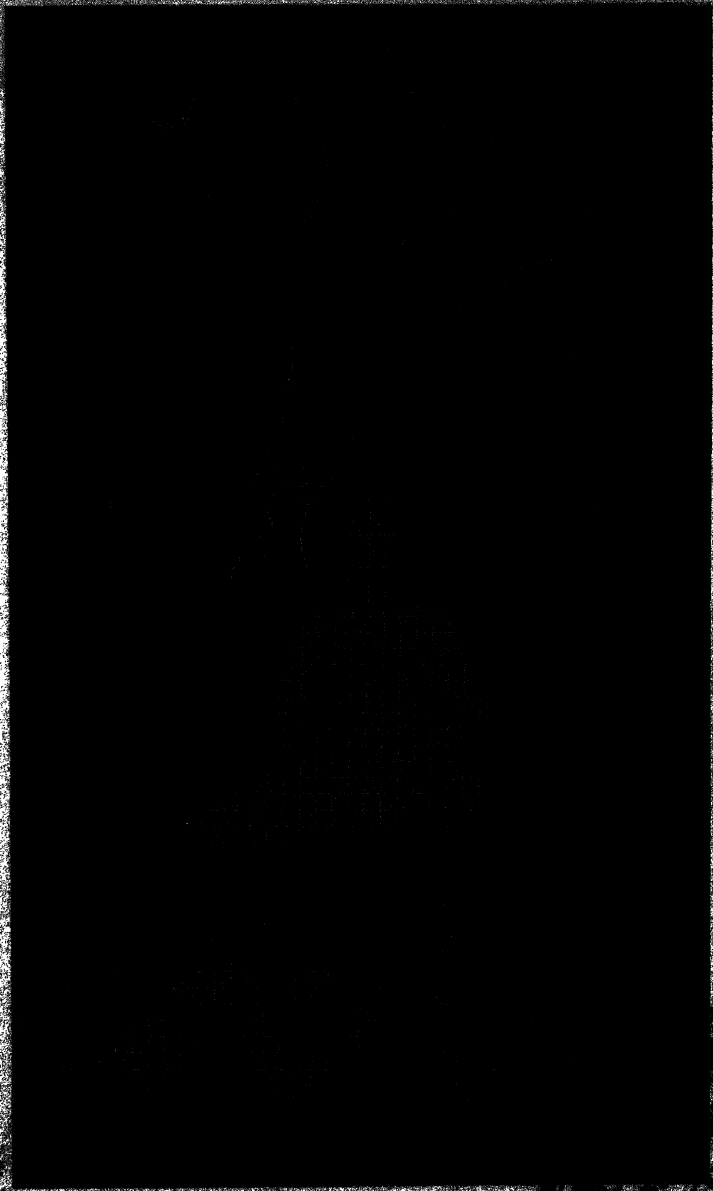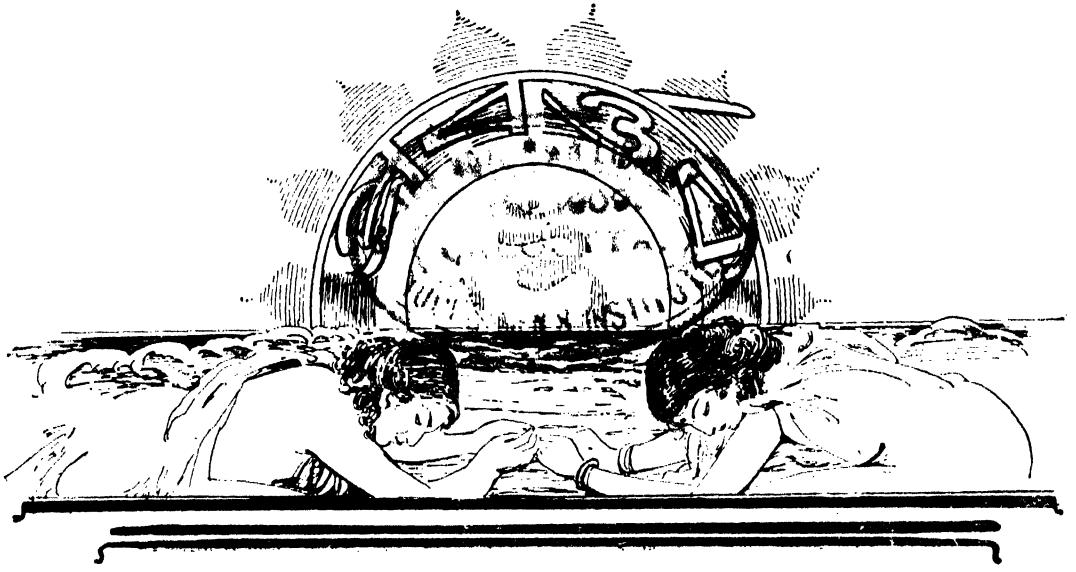
১৮-শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৪০ | ১০ম সংখ্যা

উৎসবে

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অনুরাগী বন্ধুগণ এবং প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ভাব-ধারায় অভিষিক্ত দীক্ষিত নারী ও পুরুষের নিকট আমার মর্ম্মকথা জ্ঞাপনের প্রার্থনা জানিয়ে জীবনের এই সন্ধিক্ষণে, একান্ত ভাবে কয়েকটা আত্ম-কথাই নিবেদন করছি। সঙ্ঘের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক বিষয়ের অস্পষ্টতা ইহাতে দূর হতে পারে।

শুনেছি—দেহ, বাক্য ও মনের জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত কোন পাপই বিনা প্রায়শ্চিত্তে মানুষকে রেহাই দেয় না। সে পাপ কৃত, কারিত, অনুমোদিত ত্রিবিধ প্রকারেই ঘট্‌তে পারে; অথবা কে জানে—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—জন্মিলেই মৃত্যু আছে, অতএব মৃত্যু দেবতার আহ্বানে দেহ বুঝি ভেঙ্গে পড়ে! দীর্ঘদিনের অভ্যাস নিরন্তর শ্রমের বোঝা সে আর বহন কর্‌তে চাহে না, কিন্তু বিশ্রামের অভ্যাসও করিনি—কাজেই ভাগবত প্রেরণার সঙ্গে শরীরের এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ একটা নূতন কাজের মত আমায় ঘিরে ধরেছে। সঙ্ঘের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ফাঁক পেলেই বলার দাবী তাই স্বাভাবিক।

আমার এই জন্মদিনে তোমাদের অন্তরের অকপট অবদান একদিক্ দিয়ে আমায় লজ্জা দেয়। লজ্জা দেয়, কেননা ভগবানের যে বাণী শুনেছিলাম, তা সিদ্ধ করার সবখানি সুযোগ নিতে পারিনি, পিছিয়ে পড়েছি অনেক-খানি। দেহ-মনের জড়তা আমায় যত না বাধা দিয়েছে, দেশের ভাব ও কর্ম্ম-প্রেরণার তুমুল তরঙ্গে নাকানি চুবানি খেয়ে ব্যর্থ করেছি সময় ও শক্তি প্রচুর; আর সাগ্রহে দুই হাত বাড়িয়ে তোমাদের প্রদত্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান মাথায় তুলে নিতে আনন্দ আমার কম নয়; কেননা, তোমাদের মত এতগুলি মানুষকে আমি বুঝাতে পেরেছি এই একান্ত দুর্ব্বোধ্য ও এক প্রকার অসাধ্য বস্তুটাকে কার্য্যকরী-রূপে। আনন্দের মাত্রা আমার হৃদয়-পাত্র উপচিয়া দেয়,

যখন দেখি শত শত পুরুষ নারী আজ প্রবর্ত্তকের সঙ্কেতকে রূপ দিতে সর্ব্বত্যাগী। ভগবানের আশীর্ব্বাদকেই আমি মূর্ত্তি দিতে চেয়েছি, ভারতের সনাতন চাওয়াকেই রূপ দিতে আমার জন্ম। এইজন্য সঙ্ঘের ভাবধারার মধ্যে আমার নিজের কোন বৈশিষ্ট্য নাই, সবই ভগবানের। এই পূজা, তাই অতি সন্তর্পণে শ্রদ্ধার সঙ্গে, আমি তাঁর চরণেই নিবেদন করে' দিলাম। তিনিই তোমাদের অতঃপর বিশুদ্ধতর ঋতময় পথে পরিচালিত করুন।

স্বপ্ন ছিল জীবনের সাথী। যৌবন-যুগেও ছিলাম একা। স্বপ্ন নিয়েই দিবারাত্রি কেটে যেতো। দেহের সাধন ছিল না; মন খোরাক পেতো উপর থেকে। মনটা তাই যতখানি উর্দ্ধলোকে আলোয় আনন্দে মুক্ত-বিহঙ্গের ন্যায় পাখা মেলে উড়ে বেড়াতো, দেহটা তার সঙ্গে যুক্তি না পেয়ে, ধূলায় গড়াগড়ি দিত সারাক্ষণই। বাল্যের ধূলি-কালিমা জননীর করপল্লব স্পর্শে মুছে যেতো; কিন্তু যৌবনের পাপ তিনি ঘুচাতে পারেন নি। সে কলুষ নাশে যে তরঙ্গিণী ঢল দিয়ে নেমে এসেছিল আমার সবখানি বুক প্লাবিত করে, সে জাহ্নবী-ধারাই ছিল আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা, সহায় ও আত্ম-সংগ্রামের একমাত্র আশ্রয়। সে আজ নাই, ফল্গুধারার ন্যায় অন্তর্হিত। আজ বার্দ্ধক্যের সন্ধিক্ষণে মনের সঙ্গে দেহের যুক্তি দিতে গিয়ে দেখি, শুধু ঝেড়ে মুছে শরীর মনটা পরিচ্ছন্ন রাখাই কাজ নয়, এই দুটার সংস্কার আছে, রূপান্তর আছে। মনটা ছিল অসাধারণ, তাই আজ বেঁচে তৃপ্তি; দেহটাকে আজ মনের প্রখরতর গতির সঙ্গে নূতন জন্ম দিতে পারি না, সে প্রয়াস আর সিদ্ধ হবে কি? মোক্ষের কামনাও শ্রীগৌরাঙ্গের কথায় নিছক কপটতা এবং এই কথায় আমার অগাধ প্রত্যয়; অতএব চাওয়া কিছু বাখি না। তা'ছাড়া অতীতেও দেখেছি, চেয়ে কিছু পাই নি; যেটুকু সম্বল নিয়ে তোমাদের সামনে আজ দাঁড়িয়ে আছি, তা ভগবানেরই দান। ভবিষ্যতে যদি এ দেহের প্রয়োজন থাকে, সে ভার ভগবানেরই। তবে ভাগবত কর্ম্ম-সাধনের জন্য চাই যে দিব্য মন, দিব্য প্রকৃতি ও দিব্য দেহ—ইহা মুক্ত-কণ্ঠে চীৎকার করে ব'লে যাই। আমার হয়তো শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছান হ'লো না। হয়তো তাঁর ইচ্ছা ছিল, এই পর্য্যন্ত নিয়ে আসা। আমি কিন্তু দেখ্‌ছি, ভগবানের দেওয়া তোমাদের জীবনে ষোলআনা পূর্ণ হবে; তোমরা হ'বে পূর্ণযোগের সিদ্ধ বিগ্রহ।

ডাঙ্গা থেকে সমুদ্রের বুকে ক্ষুদ্র তরীটিকে নামিয়ে নিয়ে যেতে কি আয়াস নাবিকের, দেশ ও সমাজের পরিস্থিতির মধ্যে যে ঝড়, যে তুফান, তা বিদীর্ণ করে অন্তর্য্যামীর ডাকে সাড়া দিতে দীর্ঘদিন গেছে তেমনি কেবলই দ্বন্দ্বে, অন্তরের ও বাহিরের সহিত সংঘর্ষে সংগ্রামে। মনটা একেবারে জড় নয়, নতুবা দেখা যেতো দেহের মত, চিত্তও পিষে রক্তাক্ত হ'য়ে গেছে, অর্দ্ধেক আয়ুঃ ও শক্তি আমার এই খানেই নিঃশেষিত। মনের ভিতর দিয়ে যে প্রতিধ্বনি দেহ-চেতনার কাছে এসে পৌঁছেছিল, তা যে আমার জীবনের আসল সুর, তা বুঝে নিতে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। অতি বালসুলভ ক্রীড়া-চাঞ্চল্যে আমার দিন কাটেনি আদৌ—বরং খেলেছি যৌবনের শেষে যখন প্রৌঢ়ত্বের কোটায় এসে পা দিলাম; সে খেলা স্বভাবের উদ্দাম আনন্দ নয়; তার ভিতর ছিল অভিসন্ধি—এই জন্যই খেলায় দেহ ও মন যেমন হাল্‌কা খোলসা হয়, আমার ভাগ্যে তা ঘট্‌তো না, শ্রমের বোঝাই বাড়্‌তো। দেহ ও মনের অবসন্নতা খেলায় ঘুচ্‌তো না, কিন্তু তৃপ্তিতে বুক ভরে যেতো। এই খেলার ছলেই খুঁজে পেয়েছিলাম সেই সব মনের মানুষ, যাদের সঙ্গ আজও ছাড়ার উপায় নাই—এই কথা কেবল আমার পক্ষে নয়, উভয় পক্ষেই। যাক্ সে কথা।

বাল্যের আশ্রয় মাটীর দেবতা যৌবনে এসে বিদায় নিলেন; নিরাশ্রয় বলে' নিজেকে কিন্তু সেদিনও ভাব্‌তে পারিনি। কেননা, সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব-জীবনটা ঘন হ'য়ে এমনই মাতিয়ে তুল্‌লো—জীবনের সবখানি যেন একটা নেশাখোরের মত সেদিন মনে হ'লো। অন্তরের অস্পষ্ট ভাবধারার নিরন্তর বর্ষণ থেকে রেহাই পেলুম। স্বভাবের সুগম পথেই আমার মুক্তি ও স্বাস্থ্য, বুকভরা নিঃশ্বাস নিতে গিয়েই তাসের ঘর ভেঙ্গে পড়্‌লো। সংসার-জীবনটা একটা প্রলয়ের পর বিরামের মত, এসেছিল ক্ষুদ্র আয়ুঃ নিয়ে। তারপর চলেছি—বিরামহীন যাত্রা।

ধর্ম্মের আন্দোলন সুরু হ'তে না হ'তে, দেশ ও জাতীয়তার বিপুল শোভা-যাত্রার দৃশ্যে চিত্ত আমার ঝুঁকে পড়লো এমন সবেগে যে, কোথায় রইলো জীবন-যাত্রার সাধারণ পথ। যত বাধা পদ-চাপে চূর্ণ ক'রে, দেশ-দেবতার ডাকে একেবারে পথে এসে দাঁড়ালাম ঘর ছেড়ে। আমায় তাড়া দিয়েই সে যেমন এসেছিল হঠাৎ ঝড়ের মত, তেমনি একদিন অকস্মাৎ ছেড়ে গেল দম্‌কা বাতাসের মত আমায় আঘাত দিয়ে; চিহ্ন রেখে গেল এমন গভীর এবং সুস্পষ্ট যে, বোধ হয় আমি সত্য যাহা তাহা গলা ফেড়ে বল্‌লেও, কেউ তা বিশ্বাস করবে না। দেশ ও জাতীয়তার মার্কা আমার হয়েছে ট্রেডমার্ক; তবে ইহা আমি গৌরব ও মহিমার দানরূপেই বরণ করে থাকি।

দেশ ও জাতীয় ধর্ম্মের প্রবাহে ভেসে এসেছিলেন দীর্ঘতমা ঋষির ন্যায় ভাগীরথী বেয়ে যে ঋষি, তাঁর মন্ত্রে ছিল অভিনবত্বের মধুময় ঋক্। সে বাণী আমার কাণের ভিতর দিয়া মরম বিদ্ধ করেছিল। বীজ কালে অঙ্কুরিত হয়, বৃহৎ বিটপী দেশ ছেয়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। অধ্যাত্ম-সাধনের অমরবীর্য্য গ্রহণ করার জন্য হৃদয়-ভূমি যেন প্রস্তুত হয়েছিল। ধর্ম্মকর্ম্মের চেয়ে যোগ হ'লো জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্। লক্ষ্য হলো অহংকার ও বাসনা ক্ষয় করা। উদ্দেশ্য, স্বপ্ন, সব সেদিন ছাড়ার সাধনায় চিত্ত থেকে মুছে গেল। পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, জীবন-মরণ, সত্যই সেদিন এক হ'য়ে জীবন-যন্ত্রে ঝঙ্কার উঠ্‌লো "ত্বং হি প্রাণা শরীরে।" কেহ তো আর ছিল না— সেদিন আজিকার মত আপন রূপে, সব ডুবিয়ে দিয়েছিলাম একের মধ্যে নিঃশেষে; কেবল একজন ছিল বাকী। সে যে আমার মত ডুবে মরেনি, তা খেয়াল ছিল না। সে যে জীবন-মরণের সাথী হয়ে আমায় এমন ক'রে নাকাল করবে, তাও ধারণা করিনি। এই গোপন সত্যটার প্রকাশ হ'লো ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। বর্ত্তমান যুগের সেই আরম্ভ-কাল আজও আমার স্মরণের মধ্যে বজ্রের ন্যায় নিষ্ঠুর, অথচ জীবন চেতনা-রক্ষার অক্ষয় উৎস হ'য়ে আছে। সে বিস্মরণের প্রলেপে মুছে যাওয়ার নয়। দেহের মেরুদণ্ডে গ্রন্থীর পর গ্রন্থী যেমন জীবন-কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, আমার জীবন-ধারার মাঝে এমনই এক একটা নিষ্ঠুর বজ্রাঙ্কিত চিহ্ন গভীর ক্ষত সৃজন ক'রে রেখেছে। সুখ, স্বস্তির ইহাই কিন্তু সহায়। জীবনকে জাগ্রত রাখার এইগুলিই চৈতন্য-কেন্দ্রের ন্যায় আমার চিত্ত জাগ্রত ক'রে রেখেছে।

ধর্ম্মের লক্ষ্য যে মুক্তি মোক্ষ, তাহা সূর্য্য-প্রকাশে কুয়াসার ন্যায় এক মুহূর্ত্তে তিরোহিত হ'লো। সাধন-ভজন আত্ম-জীবনকে উন্নত করার যে আকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন যোগাতো তা নূতন মন্ত্রে আহুতি দিতে সুরু করলো। জীবন হ'লো বিশ্ব-মানবের জন্য। নিজেকে অধ্যাত্ম-চেতনার স্তর থেকে বিদায় দেওয়ার আহ্বান অবজ্ঞা করার উপায় ছিল না, আজও এই প্রত্যয়ের অনির্ব্বাণ প্রদীপ সমান ভাবেই জ্বল্‌ছে; বরং উজ্জ্বলতর হয়েছে। সঙ্ঘের সাধন ব্যক্তির জন্য নয়, মানব-জাতির জন্য।

যোগ হঠযোগ নয়, রাজযোগ নয়, ভক্তি, কর্ম্ম, বা জ্ঞানযোগ নয়। আত্মসমর্পণ জীবনকে ভাগবত করতে পারে। আত্মসমর্পণ যোগই পূর্ণযোগ, অধ্যাত্ম-যোগ। এই যোগ শাস্ত্রের নিয়মিত আচার অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে না। এইখানে ভগবান সাধক; দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্র। মানুষের বিচার এই ক্ষেত্রে কোন কাজেরই নয়। শাস্ত্রের নিরিখ ছিদ্র বাহির করে মাত্র, জীবন গড়ে না। জীবন উন্নত ও ভাগবত হয়, ঈশ্বর যখন সাধক হয়ে আধারে আবির্ভূত হন। ইহা সেই উত্তম রহস্য, যাহা কেবল "অধ্যাত্ম-যোগাধি গমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকো জহাতি।" এই একমাত্র পথ, এই একমাত্র উপায়—মৃত্যুকে জয় করার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

ধর্ম্মই জীবন। ধর্ম্মই লক্ষ্য। ধর্ম্ম ভিন্ন জীবনের আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। এই ধর্ম্মের সঙ্কেত পাগল ক'রে তুল্‌লো। সমগ্র জগৎ যদি ইহা সংশয়ের চক্ষে দেখে, ভগবান যেখানে স্বয়ং সাধক, সেখানে তাহা অনায়াসে অস্বীকৃত হওয়া বিচিত্র কথা কিছু নহে। ভরসা ইহা ছাড়া আর কি! প্রতিপদ বাধায় কণ্টকে রক্তাক্ত, তবুও কি আশায় অন্তহীন পথে যাত্রা সম্ভব হয়? প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছিল, যোগ যেমন বিশ্ব-মানব জাতির জন্য, সাধনও তেমনি ভগবানেরই। সাধক স্বয়ং ঈশ্বর, ইহা ব্যতীত যে

খণ্ড চেতনা তাহার বিনাশ-কামনাই সেদিন একমাত্র কর্ম্ম। বৃত্রাসুরবধের বজ্রধ্বনিতে জীবন মুখরিত হ'লো। কামনা ও অহঙ্কারের বিনাশ-কোলাহলে কর্ণ বধির, সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম স্তম্ভিত, সব স্তব্ধ হ'য়ে গেল। চিরজয়ী শাশ্বত পুরুষের নূতন সৃজনের প্রেরণা স্বর্গ হ'তে ভাগীরথী-ধারার ন্যায় যখন নেমে এলো, আর ধূর্জ্জটির বেশে সে প্রবাহ মাথা পেতে নেওয়ার আশ্রয় যখন মিল্‌লো, তখনই বুঝা গেল—একটা গঠনের প্রেরণা নিয়েই অন্তর্য্যামী জেগেছেন। কোন্ পথ দিয়ে তিনি কোথায় বিশ্বকে নিয়ে চলেছেন, সে হিসাব দর্শন পুরাণ, বেদ উপনিষদ্ কেবল মুখরিত করেছে, সমাধানের মন্ত্র উচ্চারণ করেনি। ইতিহাস, বিজ্ঞান তার সন্ধান দিবে, ইহা দুরাশা। একান্ত নিঃস্ব ক্ষেত্রে সৃষ্টির বীজ বিপুল অভাবের আবর্ত্ত বিস্তৃত ক'রে তুল্‌লো—ঋণের মাত্রায়। এমন স্বপ্ন-বিভোরতা যোগ-শক্তির পক্ষেই সম্ভব। তখন ভাব্‌বার অবসর ছিল না যে, এই বুভুক্ষু বাংলায় প্রকৃতির অজস্র দান অতলে তলায়। এখানে সুদের টাকায় সৃজন সম্ভব হবে! কিন্তু সে কথা ভেবে দেখ্‌বে কে? মানুষের কর্ম্ম-প্রেরণা জাগে ভোগ ও সুখকে কেন্দ্র ক'রে; তপস্যার উপর ভিত্তি ক'রে যে সৃষ্টি, সে ঋণ-রূপে তপস্যাকেই নামিয়ে নিয়ে এলো—১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ সুদসহ এই ঋণই শোধ করেছি। সে ঋণের মাত্রা লক্ষাধিক টাকা। সুদের হিসাব অঙ্কের পর অঙ্ক তুলে যখন চক্ষে পড়ে, আজও স্বভাব মন মুহ্যমান হয়। কিন্তু ঈশ্বরের বিধান অলঙ্ঘ্য, অমোঘ। আজ এই কঠোরতর তপস্যার সীমায় দাঁড়িয়ে দেখি—সম্মুখে উজ্জ্বল, আনন্দময় সৃষ্টি—সমগ্র পৃথিবী সেখানে পরিতৃপ্তি পাবে।

আমি আজ যে ধর্ম্মের নিশান লক্ষ্য করেছি তাহা সনাতন; যে আচার জীবনে প্রকাশ পায়, তাহা সত্যের আচার, তাহাই বেদাচার। আচারের মূল কথা, ভাগবত চেতনায় থাকার ব্যবস্থা মাত্র। যেখানে ইহার উৎকট চেষ্টা, সেখানে আচারের বিকৃতি; শাস্ত্রের সহিত বাক্যগত ঐক্য, তত্ত্বতঃ ষোলআনা ফাঁকি। আমি এক আচার-মন্ত্র পেয়েছি; তাহা এক কথায় তোমাদের বলি—সর্ব্বকালে আত্ম-চেতনায় থাকার জন্য জাগ্রত ভগবানের স্পর্শানুভূতির দীক্ষা, তারপর তাঁর মুখের বাণীর সর্ব্বাঙ্গীন অনুসরণ। জীবন যখন সিদ্ধ হবে, তখন তাহাই যে অব্যর্থ শাস্ত্র, তাহা কেহ আর অস্বীকার কর্‌বে না।

শরণ, স্মরণ আর কীর্ত্তন—এই তিন আত্মচৈতন্য-রক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র। আশ্রয় দিতে হবে ভগবানকে নিজের খণ্ড-চৈতন্য অপসারিত ক'রে। ভাগবত বীর্য্যাধার এই আধার, এই স্মরণ সর্ব্বকালে রক্ষা কর্‌তে হবে। আর জীবনের সকল কর্ম্মেই ঈশ্বর-মহিমা বিঘোষিত হবে। অহঙ্কার ও কামনার বড়াই নয়, এই জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চাই। গীতার বাণী স্মরণ রেখো—

"সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ"। সর্ব্বকালে ভাগবত-চৈতন্য সজাগ রাখার জন্য, স্বভাব ও সংস্কারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম আছে। যেখানে ভগবান জাগেন, সেখানে এই কুরুক্ষেত্র স্বাভাবিক। সারা জীবনের যুদ্ধ অবসান-আজ শান্তিপর্ব্বে। দীর্ণ দেহ লইয়া তোমাদের সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটা চরম বাণী উদ্গান করি। সঙ্ঘ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা অন্যের থাকুক, তোমাদের যেন তাহা বিচলিত না করে।

মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ-কে আশ্রয় ক'রেই হয়। প্রেয়ঃ আপাতসুখকর; শ্রেয়ঃ তপঃ-সাপেক্ষ। কিন্তু এই পৃথিবীতে তপস্যার সৃষ্টি আদৌ নাই; ইহার বীজমন্ত্র ভারতে আছে। সে মন্ত্রের সাধন মোক্ষের কারণ হয়েছে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে ভগবান পাঞ্চজন্যে শুনিয়েছেন যে, এই মোক্ষ জীবন মরণ থেকে মুক্তি নয়, এই মোক্ষ ভগবানে জীবত্বের লয়; ভাগবত-জন্মলাভই এই মর্ত্ত্যের ত্রিতাপ-জ্বালা-নিবৃত্তির অমোঘ পন্থা।

জীবন যদি হয় সত্যের, ভগবানের কোন কর্ম্মই বন্ধনের নয়। যাহা ভাগবত তাহা কেবল একের কল্যাণের কারণ নয়, বিশ্বের হিত তাহাতে সাধিত হয়। এই কল্যাণ-সাধনের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম মার্গই প্রসিদ্ধ। কর্ম্ম কৃৎস্ন। ভগবান যাহা করেন, তাহাই কর্ম্ম। তার্কিক বলেন, তিনি যদি ব্যাভিচার করেন, হত্যাকারী হন; এই বিচার যোগীর নয়। যোগী জানেন—তিনি সর্ব্বভূত-মহেশ্বর; বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিবিধিৎসা জীব-ধর্ম্ম, ঈশ্বর

ধর্ম্ম নহে। শাস্ত্রযুক্তিও বলে, এই বিচার আত্মজ্ঞান-লাভের উপায় নহে। তিনি প্রকাশ হন—

"তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।"

অকাম ও বিগতশোক ব্যক্তির মনাদি প্রসন্ন হয়। এই প্রসন্নতার মাঝেই আত্মাকে ও আত্মার মহিমাকে জানা যায়। আর ইহাই ভারতের সাধ্য। এই সাধনাই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের একমাত্র লক্ষ্য। অন্য মিশ্র জীবন সঙ্ঘের হিতকারী নয়।

এই ভাগবত ধর্ম্মের প্রচারপ্রচেষ্টাও অহঙ্কার। ভাগবত-তত্ত্ব স্বপ্রকাশ; তাহা স্বতঃই সম্প্রসারিত হয়। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কিছু করা অর্থে, অহং ও কামকে প্রশ্রয় দেওয়া; যাহা নিত্য নহে, তাহাকে আশ্রয় করা। এই ধর্ম্মের জন্য কিছু করাই পাপ। কেন না,

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

শাস্ত্র, যুক্তি, মেধা ইঁহাকে মিলায় না; ইনি যাঁহাকে বরণ করেন, সেইখানেই ইনি লভ্য, সেইখানেই আত্মার তনু প্রকাশ পায়। এই শ্রুতিবাক্য যথার্থ প্রত্যয় করা সম্ভব হয় না, প্রেরণা মোহরূপে যখন মানুষকে পেয়ে বসে। তোমাদের স্বয়ং ভগবান বরণ করেছেন; অতএব, এই বিষয়ে তোমাদের নিশ্চেষ্টতাই তাঁহাতে আশ্রয় করা। তাঁহাকে স্মরণে রাখা তাঁহার মহিমা-প্রকাশের একমাত্র অনুষ্ঠান। অতএব এই দিব্যাচারই তোমাদের জীবনের অভিব্যক্তি।

ধর্ম্ম জীবন-ধারণের জন্য; জ্ঞান আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ রাখা; ভক্তি ভগবানে সর্ব্বকালে যোগযুক্ত থাকার অনুভূতি। সঙ্ঘের কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিশাল; কেন না, ভূতগ্রামের বিরাট্ শরীর-পূর্ত্তির দাবী সীমাহীন। জ্ঞানও অন্তহীন; কেন না, ভাগবত-চৈতন্য কেবল "মহতো মহীয়ান্" নহেন, তিনি "অণোরণীয়ান্"—কোন দিকেই ইঁহার সীমা নির্দ্ধারণ সম্ভব নহে। এই প্রবুদ্ধ চৈতন্যযুক্ত যে জীবন, সেখানে ভক্তির মন্দাকিনী নিত্য প্রবাহিতা।

আন্দোলন নহে, আলোচনা নহে, তর্ক নহে, জয় পরাজয় নহে—আত্মারাম হ'য়ে, স্বধর্ম্মপালন করাই সঙ্ঘের কর্ম্ম। কেহ কাহারও কথায় কাণ দিবে না। বিশেষ যাহা ধ্রুব নহে, সত্য নহে, তাহা তোমায় সদ্-বাণী দানে নিরস্ত হবে না, অধিকতর বিরূপ অধ্রুব, অসত্য, ক্ষুদ্রতর মিথ্যাকে নিরসন করতে পারে; সত্যের সৃষ্টি সত্য হ'তে সত্যেই প্রকাশিত হবে। আজ এই সত্যের দিশারী যিনি তাঁকে আহ্বান করি; তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করে' বলি—

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা,
জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়—
আবিরাবির্ম এধি।"

ওঁ শান্তিঃ!

শ্রীমতিলাল রায়।

জীবনের লক্ষ্য আছে। জ্ঞানী অজ্ঞানী নির্ব্বিশেষে এই লক্ষ্যের চরিতার্থতা প্রত্যেককে কর্‌তেই হবে। সনক সনন্দাদি ঋষি যোগাশ্রয় করেছিলেন মোক্ষের জন্য; কপিলের জ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্মার যোগ সৃষ্টির জন্য। দশগ্রীব রাবণ তপস্যা বরণ করেছিলেন ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লক্ষ্যে রেখে; শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন; বুদ্ধের সাধনা জীবের প্রতি করুণার টানে—এমনি বহুতর দৃষ্টান্ত ভারতেতিহাসে বিরল নয়।

এ যুগেও দেখি—মহাত্মা গান্ধীর জীবন-তপস্যা ভারতের মুক্তি বা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য; শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন—পর-মনকে নামান—এমনি কত বল্‌ব! আসল কথা, কল্পের স্বপ্নকে কেউ অতিক্রম কর্‌তে পারেন না। আশ্চর্য্য, যে মানুষই স্বপ্ন দেখেন, তাঁর জাগ্রত জীবনের পিছনে থাকে একটা বিরাট্ অনুভূতির আশ্রয়—সেইখানেই যে জ্ঞান-ঘন পুরুষ লুকিয়ে আছেন তা অনেক সময়ে আমরা ভুলে যাই আর কেন বলে' প্রশ্ন তুলি। স্বপ্নের তলে এই বাহিরের জীবনটা কত সময়ে অচেতন হ'য়ে পড়ে থাকে, কিন্তু তাতে দেখা-শুনা, হাসা-কাঁদা, আহার-নিদ্রাদি কিছুতেই বাধে না। স্বপ্ন যখন দেখি, তখন কি জীবন্ত দেহটা যে ছেড়ে আছি, তা স্মরণ থাকে? স্বপ্নের মাঝেই আবার এমন স্বপ্নও দেখি যে, মাঝে মনে হয় আমরা ঘুমিয়ে যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি; কিন্তু সে স্বপ্ন আর তেমন জমাট আনন্দের হয় না।

এই যে জীবন-স্বপ্ন—এটা কার স্বপ্ন? স্বপ্নের মাঝে স্বপ্ন দেখ্‌ছি, মনে হওয়ার মত যখন অনন্ত পুরুষের চেতনা জেগে উঠে, তখনই স্বপ্নের নেশা ফিকে হয়ে যায়। আগাগোড়াই স্বপ্ন—কিন্তু তাই বলে' কর্‌বে কি! একি তোমার স্বপ্ন যে ভাঙ্‌বে! ভাগবত-কার তাই বলেন—দেবতাদের স্বপ্নকাল অথবা পুরুষোত্তমের কল্প-স্বপ্ন যেদিন শেষ হবে, প্রপঞ্চ-জগৎ সেইদিনই তাঁহাতে লয় পাবে; তার আগে রাবণও স্বপ্ন দেখেন আর রঘুপতি রামচন্দ্রও স্বপ্ন দেখেন—স্বপ্নের গুণভেদ মাত্র। তবে দুঃস্বপ্নের চেয়ে সুখ-স্বপ্ন অধিকতর প্রীতি ও আনন্দের—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতির স্বপ্ন সুস্বপ্ন বল্‌তে হবে।

এই তো ব্যাপার! শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভূতি, সব মিলিয়ে জীবন-ভোর সাধনায় জানা গেল—একটা বিরাট্ কল্প-স্বপ্ন দেখ্‌ছি। স্বেচ্ছায় স্বপ্ন দেখা, কিন্তু ইহা সেই সৎ অর্থাৎ পুরুষেরই স্বপ্ন। ভক্তই হই আর পাষণ্ডই হই, স্বপ্ন ভিন্ন কিছু তো নেই—স্বপ্নে বিকট চীৎকার করি কিম্বা আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হই—দুইই লীলা-মাত্র।

স্বপ্ন দেখার থাক বা দল আছে। প্রেমের স্বপ্ন যখন একদল দেখ্‌ল, তখন অন্য দল ব্যাদ্‌ড়া-পাড়া গড়ে' তুল্‌ল। বুদ্ধদেবের দয়ার স্বপ্নের পার্শ্বেই কাপালিক তান্ত্রিকের হিংসার স্বপ্ন। সু-স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন ভেদে ভক্ত ও পাষণ্ডের লীলা। বেদব্যাস বা পতঞ্জলি যখন ঈশ্বর-বিশ্বাসের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন, তখন চার্ব্বাক নাস্তিকতার

স্বপ্নে দল গড়ছেন। তুমি দেখছ ভোগের স্বপ্ন আমি দেখছি মোক্ষের—ইহাই তো রহস্য, সত্যই অনির্ব্বচনীয় রহস্য।

আজ স্বরাজ্যের স্বপ্নে একদল মানুষ বিভোর, সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় জড়িয়ে থাকার অন্য দলও আছে। Super-mind পর-মন নামাবার স্বপ্নের পার্শ্বেই পশুবৃত্তি-পরায়ণ মনের অনুশীলনও বাদ যাবে না। স্বর্গ-রাজ্যের স্বপ্ন যে ভারতের তার উপর চেপে বসল ভৌতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন এমন জোর করে' যে আজিও তার ছাড়ান নেই।

কথা তাই স্বপ্ন নিয়ে! পেট ফাঁপা থাকলে লোকে বলে—কি ছাই এলোমেলো স্বপ্ন দেখলুম! তেমনি চিত্ত যার চঞ্চল, তার স্বপ্নের একটা ছন্দ নেই, সামঞ্জস্য নেই। চিত্ত স্থির হলেই স্বপ্নটা কায়েমী হয়। এইরূপ যাদের হয়েছে, তাদের স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের মূলেও এমনি একটা কায়েমী স্বপ্ন। যারা সে স্বপ্ন-সূত্রের সন্ধান পায়নি, তাদের হয় তো অন্য স্বপ্ন দেখতে হবে। কিন্তু যারা এই স্বপ্ন দেখার জন্য চিহ্নিত, নির্দ্দিষ্ট তাদের চিত্ত সংযত, একনিষ্ঠ, একাগ্র হলেই স্বপ্ন-দ্রষ্টার সহিত তারা যুক্তি পাবে—সঙ্ঘের স্বপ্নে তাদের পাগল হতে হবে। উন্মাদ না হওয়া তার পক্ষে মনের রোগ ছাড়া আর কিছু নয়—যদি সে পুরুষ বা নারী সঙ্ঘের স্বপ্ন-কল্পিত মানুষ হয়।

সে কি উন্মাদনা! নিদ্রা নেই! এই যে নিদ্রা নেই, ইহাও স্বপ্ন—তাই আসলে হাত পড়ে না। পুরুষের আনন্দ ইহাতেই। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" স্বপ্ন দিব্য জীবন—দিব্যজাতি-গঠন। কি মজা! তারা কাতারে কাতারে লোক-সংগ্রহ করছে—উটজ শিল্পে, বিদ্যা-ক্ষেত্রে, ধর্ম্মের মন্দিরে, নানা ছলে তাদের আহ্বান ছুটেছে। কি উৎসাহ! অর্থসাধনায় যারা রক্তমুখী হয়ে আত্মদান করেছে, পারুক্ না পারুক্ তারা স্বপ্ন দেখছে—ঐ মাথা তুলল অসংখ্য কর্ম্মক্ষেত্র, স্বর্ণচূড় অট্টালিকা, ঐ সারি সারি বিদ্যামন্দিরের উন্নত গম্বুজ গগন স্পর্শ করল, ঐ দেব-মন্দিরের শীর্ষভাগ অরুণালোকে ঝলসিত হয়ে উঠল,—ঐ কৃষি-ক্ষেত্রে সোণার লাঙ্গল দুগ্ধফেন-নিভ গো-যূথ টেনে বেড়ায়—পল্লীতে পল্লীতে উপাসনার শঙ্খ বাজে—পথে পথে বেণী দুলিয়ে কুলবালা পবিত্রতার নির্ম্মাল্য রূপে ভেসে বেড়ায়—সে কি শুভ-দর্শন চারু স্বপ্ন!

জাতি-গঠনের এই শুভ-স্বপ্ন—যার যেমন সে তেমনি করে'ই দেখছে। অন্তরিন্দ্রিয় ফুটে উঠলে, সব স্বপ্নই নিজের মধ্যে এনে দেখা যায়। সব অবান্তর বাদ দিয়ে স্বরূপের স্বপ্নটীকেই বেছে ফুটিয়ে ফলিয়ে তুলতে হয়—নতুবা সর্ব্বানন্দে বিভোর হয়ে থাকা যায় না।

স্বপ্ন ঘন হয়ে রূপ নেয় স্বপ্নদ্রষ্টার ঐকান্তিকতায় আর স্বপ্নদর্শী দলের প্রত্যেকের ইহার সহিত পরিপূর্ণ যুক্তিতে। দলের মধ্যে অসন্তোষের কারণ, এই স্ব-স্বপ্নে আস্থাহীনতা—অন্যের স্বপ্নে ভাগ নেওয়ার হ্যাংলা-ভাব। নিপুণ স্বপ্ন-দ্রষ্টা সেই, যে অন্যের অংশে হাত বাড়ায় না—নিজের স্বপ্নকে নিখুঁত করে' দেখে' ফুটিয়ে তোলে।

আজ আমি এমনি এক বিশিষ্ট স্বপ্ন-দ্রষ্টার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদের আহ্বান দিই—এস, মজা করি। যেদিন মাতৃ-গর্ভে জন্মেছি, সেদিনই স্বপ্ন-জগতে আসি নি; যেদিন কল্পারম্ভ হয়েছে সেইদিনই স্বপ্নের সুরু। এই স্বপ্ন থেকে অব্যাহতিলাভের স্বপ্ন আমার নয়।

যে স্বপ্ন আমাদের কল্প-স্বপ্ন, সেই স্বপ্নে আজ নিষ্ঠা চাই, বিশ্বাস চাই, ঐকান্তিকতা চাই। স্বপ্ন সিদ্ধ করাই পুরুষের পরমানন্দ। অবধিহীন আনন্দ—বল, ওঁ স্বস্তি!

* * * *

মানুষের যে আনন্দ ও উৎসাহ—কি নিয়ে? বিচার কর, সে জাগার ফল কি দেখ। রক্তমাংসের উত্তেজনা--আমোদ প্রমোদ কৌতুকের জন্য মনের উন্মাদনা—কতটুকু! আর তোমাদের জাগরণ ভেবে দেখ কোন্ বস্তু লক্ষ্য করে। ইহা কি অবসাদে ম্লান হবে, নত হবে? জাগো রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে ঐ উষারাগের দিকে দৃষ্টি রেখে। এ জাগা কোন সাময়িক ঘটনা বা উৎসব উপলক্ষ করে নয়; এ জাগা আত্মার জাগরণ—তুমি কেমন করে এই দিব্য জাগরণ ক্ষুণ্ণ করবে! যদি নিরন্তর অনুভব কর যে চলেছ ভগবানের অভিসারে, ভোরে উঠে' দেবতার মন্দিরে উপনীত হওয়ার সাজ সজ্জা আছে, নিজেকে শুচি ও পবিত্র করার অনুষ্ঠান আছে। জাগো বন্ধু, জাগো, জাগাও এই সুপ্ত দেশকে, জাগাও জননীকে, জাগাও শিশু, বালক, তরুণ-তরুণীকে, নিজে জাগো,—সবাই জাগবে। এই ২৪ কোটি হিন্দুকে জাগাবার আর কোনও উপায় নাই। ভগবানকে সম্মুখে রেখে এই যে দীর্ঘযুগ অনাহত প্রবাহে ভেসে চলেছি ইহা অমোঘ, ইহার ব্যর্থতা নাই, প্রত্যবায় নাই। এখন কেবল জাগার কলরবে জগতে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে' যেতে হবে। যে প্রশ্ন করবে—কি হবে ইহাতে, সে আমাদের মধ্যে সয়তান—নিজে জাগবে না, জাগার মানুষদের বুদ্ধি ভেদ ঘটাবে—এইরূপ আত্মসংশয়ীদের কথায় কাণ দিও না। কেবল জাগার গানে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত কর।

জাগো মন্দির, জাগাও মাটীর প্রাণ পর্য্যন্ত—জাগো আশ্রমবাসী, জাগাও তরুলতায় প্রাণ, জাগাও জাহ্নবীর জল—জাগাও, জাগাও, জাগাও, উন্মাদ হও। জাগো আমার ভারতের নারী, ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করো, সঙ্কীর্ণতা ছাড়ো, প্রভুর হৃদয় নিয়ে উদ্বুদ্ধ হও। আজ দেবীর আরাধনা-যুগে তোমাদের কণ্ঠও নীরব রেখো না, তোমাদের পূত জীবনপ্রবাহে দেশের পল্লীগৃহ, সংসার, অবিরাম আনন্দ সৃজন করুক, নূতন শক্তি, নূতন নূতন প্রাণ জাগুক—জাগো, আমার আকুল কণ্ঠের আর্ত্তনাদ তোমরা উপেক্ষা ক'রো না।

পাঞ্চজন্য

জাগাইলে মোরে সারাদিন ধরি
সারা নিশি টানাটানি।
কে শুনিবে এবে, অচেনা এ ভবে
পাঞ্চজন্য মহাবাণী॥
ঘুমাইয়া আছে, এলাইয়া তনু
বধির শ্রবণ সব।
স্বপন আবেশে চমকিয়া উঠে,
কিলি কিলি কলরব॥
শ্মশান চিতায় শব দেহ পুড়ে
শোক, তাপ, ব্যাধি, জরা।
উলু দিয়া ফিরে উৎসব-মুখে
কাড়াকাড়ি করে মড়া॥
আনিলে কোথায় ত্বরিত চরণে
শঙ্খটী ধরায়ে করে।
বসিলে বাজাতে বিদারি হৃদয়
ফুৎকারে ফুৎকারে॥

ঝরিল রুধির কণ্ঠ রণাহল
আরাব উঠিল ঘোর।
কেহ না জাগিল, একি সম্মোহন
অরণ্যে-রোদন মোর॥
ঘুমান'র শেষ হয় নি এখন
তমিস্রা অলস ভোগ।
আছে অবশেষ শেষ হ'তে দাও
ভোগ হোক মহারোগ॥
শোণিত নিঙাড়ি—চুমুক নিঃশেষে
নাচিয়া গৃধিনী শিবা।
প্রেতপুরী ভরি শবের গুদাম
শর্ব্বরী নাশুক দিবা॥
যদি মনে পড়ে ডেকো সেইদিন
মরণের মহাধুমে।
তুলিব আবার জয়-শঙ্খরব
ভাঙ্গাতে ভীষণ ঘুমে॥
মরণ বিদারি বহিবে উজান
সৃজনের সুরধুনী
জীবন-রাগিণী উছলি উঠিবে
*আমার মুরলী শুনি॥

অনুশাসন ও বৌদ্ধ-নীতি

শ্রীগুরুদাস রায়

পরলোকগত ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধযুগে মাতাপিতার প্রতি যে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হইত, অনুশাসনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ সম্মান প্রদর্শন শিক্ষা অনুশাসনাবলীর অন্যতম মূলতত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তৃতীয় গিরিলিপিতে মাতাপিতার শুশ্রূষা অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপে চতুর্থ, একাদশ ও ত্রয়োদশ গিরিলিপিতেও এই বিষয়ের প্রতি প্রজাবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এই সম্বন্ধে উল্লেখ হইতে আমরা সহজেই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

এইরূপে শিক্ষকগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বয়োবৃদ্ধসেবার কথাও বহুস্থলে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অবশ্য অশোকানুশাসনে অহিংসা সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। অনুশাসনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে অহিংসার প্রতি রাজচক্রবর্ত্তীর যে উত্তরোত্তর ভক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহার নিদর্শন উত্তমরূপে পাওয়া যায়। একথা সকলেই বিদিত আছেন যে, কলিঙ্গবিজয়ে যে রক্তপাত হয়, তাহা হইতেই অশোকের রাজ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং এই স্থানেই অহিংসার প্রতি তাঁহার আসক্তির প্রারম্ভ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, রাজ-ভোজনাগারে জিহ্বার পরিতৃপ্তির জন্য যে জীবহত্যা হইত, তাহারই নিষধাজ্ঞা প্রচারিত হইল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে ২৬ বৎসর পরে তাঁহার পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে অশোক বহু জন্তুকে অবধ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাহাতে কোন প্রকারে সামান্য জীবও ধ্বংস না পায়, তজ্জন্য তুঁষ দগ্ধ করা, এমন কি, বৎসরের প্রায় ৬ মাস মৎস্য-বিক্রয় সম্বন্ধেও নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল।

অহিংসার জন্যই দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী নিজ বিরাট্ রাজ্য ব্যতীত চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র, এমন কি সুদূর সিংহলে এবং মিত্ররাজ আন্তিয়োকসের রাজ্যে, অধিক কি, মিত্ররাজের নিকটবর্ত্তী রাজ্যেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মনুষ্য ও পশু উভয়েরই জন্য ঔষধ সংগ্রহ, পথিপার্শ্বে কূপ খনন ও বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল। ভিন্ন স্থান হইতে ভৈষজ ও ফলবৃক্ষ সংগৃহীত হইত। কেবল মনুষ্যের জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হয় ন্যাই; পরন্তু সামান্য কীটের কথাও রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, খুব সম্ভব অশোক এই কারণে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

'চিকীছাকতা মনুশ চিকীছা চ পশুচিকীছা চ" দৃষ্টে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই স্থলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথাই বলা হইয়াছে। কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, দুর্গাভ্যন্তরে চিকিৎসালয়-স্থাপন তৎকালে প্রচলিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান পাটলিপুত্রের বর্ণনাকালে সুন্দর দাতব্য চিকিৎসালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ফাহিয়ানের সময়ে পাটলিপুত্র অনেকাংশে গৌরবহীন হইয়াছিল। সুতরাং অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্রে যে দাতব্য চিকিৎসালয় থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ বহু শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের চিকিৎসালয় দেখিয়া বলিয়াছেন যে, উহা মৌর্য্যসম্রাটের চিকিৎসালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। বস্তুতঃ, তৎকালে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে যে এরূপ কিছু ছিল, তাহা আদৌ অনুমান করাও যায় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ক্রীতদাসকে সাধারণতঃ ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত; কিন্তু অশোকের অনুশাসনাবলী-পাঠে ভারতবর্ষে যে ইহাদিগকে অন্য দৃষ্টিতে দেখা হইত, তাহার

প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম গিরিলিপিতে ইহা বেশ বুঝা যায়, তথায় ক্রীতদাসের প্রতি সদাশয়তা প্রদর্শনের অনুজ্ঞা লিখিত হইয়াছে। কেবল অনুশাসনে নহে, মৌর্য্যযুগ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক-দূত মেগাস্থেনিস বলিয়াছেন যে, কোন ভারতীয়ই ক্রীতদাস হইতে পারিত না। অর্থ-শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, কেবল চারিটি কারণে কোন আর্য্য ক্রীতদাসরূপে পরিগণিত হইত। ক্রীতদাসকে সুদৃষ্টিতে দেখা হইত। তাহাকে শব বহন বা উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করিতে হইত না, ক্রীতদাস-পীড়ন নিষিদ্ধ ছিল। ক্রীতদাস সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত এবং প্রভুর ক্ষতি না করিয়া সে যাহা অর্জ্জন করিতে পারিত, সে-ই তাহার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহার মৃত্যু হইলে তাহারই আত্মীয়গণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত বলিয়া ভৃত্যগণের বিশেষ অধিকার ছিল। তাহাদিগকে বিদেশে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল এবং তাহাদিগকে ঘৃণিত কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইত না। অধিকন্তু, ক্রীতদাস স্বাধীনতাও পাইত।

সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং সকল ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অশোকের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। নবম ও দ্বাদশ গিরিলিপিতে আমরা দেখিতে পাই যে, অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, তিনি অন্য ধর্ম্মকে হেয়জ্ঞান করিতেন না, অনুশাসনে ইহা নানা স্থানে পরিস্ফুট রহিয়াছে, নবম ও দ্বাদশ গিরিলিপিদৃষ্টে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। "স্বধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা যেন সামান্য বিষয়েও না হয়।" এমন কি, কোনও কোনও কারণে তিনি পরধর্ম্মীদিগের পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দ্বাদশ গিরিলিপিতে নিম্নোক্ত উপদেশ রহিয়াছে—"পরধর্ম্মীদিগকে পূজা করিলে, স্বধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি হয় এবং পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়; এরূপ না করিলে স্বধর্ম্মীদিগের ক্ষতি ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। বরাবর পাহাড়ে আমি যে কয়টী গিরিলিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছি তাহা হইতে জানিতে পারি যে, তিনি আজীবক সম্প্রদায়ের উপাসনার জন্য দুর্ভেদ্য পর্ব্বত কাটিয়া সাতটী গুহা-মন্দির রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি আনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ পরধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্ব-সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে। সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক—ইহাই তাঁহার অন্তরের কামনা ছিল।

এই জন্যই দেখিতে পাই যে, তিনি মুক্তহস্তে বৌদ্ধ-তীর্থ ও বৌদ্ধসঙ্ঘে অর্থ বিতরণ করিলেও, তিনি হিন্দু-সন্ন্যাসীদের বাসস্থান-নির্ম্মাণে অর্থদানে কার্পণ্য করেন নাই। এখনও কাশ্মীর প্রদেশে কথিত হয় যে, দেবমন্দির-নির্ম্মাণে অশোক তদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। যদিও অর্থশাস্ত্রে (১৩৫) আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা পরাজিত জাতির ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, তথাপি কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে, বিধর্ম্মিগণকে দুর্গাভ্যন্তরে যেন স্থান দেওয়া না হয়, তাহাদিগকে শ্মশানভূমির বহির্দ্দেশে বাসভূমি দিতে হইবে। কিন্তু অশোকের অনুশাসনে আমরা দেখিতে পাই যে, বিধর্ম্মিগণও যথেচ্ছা বাস করিতে পারিত। এই সামান্য দৃষ্টান্ত হইতে আমরা অশোকের ধর্ম্মমতের মূলতত্ত্ব ধারণা করিতে পারি।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ অশোকের শাসনপদ্ধতির নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে, মৌর্য্যযুগে অপরাধীদিগকে ক্লেশ দেওয়া হইত। অনুশাসনে "পরিক্লেশ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ অনুমান সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। উক্ত ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের অষ্টম, নবম ও একাদশ অধ্যায়গুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

অর্থশাস্ত্রের এই অধ্যায়সমূহে আমরা এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই, যাহা হইতে আমরা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মত গ্রহণীয় বলিয়া লইতে পারি। অপিচ, তৎকালে যে এরূপ নির্য্যাতন করাই হইত না, আমরা তাহারই প্রমাণ পাই। মৌর্য্যযুগে, কোন বিচারক অন্যায়রূপে পীড়ন করিলে দণ্ডনীয় হইতেন। কারাগারাধ্যক্ষও নির্য্যাতন করিলে দণ্ডনীয় হইতেন। অনুশাসনেও আমরা দেখিতে পাই যে, বন্ধন বা দৈহিক দণ্ডে লোক যেন ক্লেশ না পায় এবং তজ্জন্যই রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান

করা হইয়াছে, যাহাতে তাঁহারা দণ্ডদান বিষয়ে অতিরিক্ত কঠোরতা প্রকাশ না করেন। অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে, অপরাধী জরিমানা না দিতে পারিলে বেত্র দ্বারাই তাহাকে আঘাত করা হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয় দণ্ডবিধির পর্য্যালোচনা করিলে অশোকযুগের দণ্ডবিধি অত্যন্ত সমুন্নত ও দয়ার পরিচায়ক বলিয়া সহজেই মনে করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, যিনি সামান্য কীট-পতঙ্গাদির ক্লেশাপনয়নেও যত্নবান্ ছিলেন, তিনি যে মনুষ্যকে যন্ত্রণা দিবেন, ইহা কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না।

প্রথম গিরিলিপিতে "সমাজ" বলিয়া একটি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কথাটির আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতের একটি সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অশোকানুশাসনে লিখিত হইয়াছে যে, "এই স্থানে কোনও পশুকে বলি দিয়া তাহার দেহ লইয়া হোম করিবে না; অথবা কোনরূপ সমাজ করিবে না। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সমাজে অনেক দোষ দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ একটি সমাজ আছে, যাহাকে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী উপকারক মনে করেন।"

এই 'সমাজ' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? দুই প্রকার সমাজের উল্লেখ দেখা যাইতেছে। এক প্রকার, যাহা নিন্দনীয়; অন্য প্রকার, যাহা অনুমোদনীয়।

হরিবংশে আমরা একরূপ সমাজ দেখিতে পাই। মহাভারতেও সমাজের উল্লেখ আছে। কুরুপাণ্ডবগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে সমাজের ব্যবস্থা হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-ক্ষেত্রেও সমাজের উল্লেখ আছে। এই তিন ক্ষেত্রেই নরপতিগণ সমাজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রেও সমাজের উল্লেখ আছে। দুইটির দৃষ্টান্ত পাই। বিনয় ২।৫, ২,৬ এ কয়েকজন শ্রমণ ও ভিক্ষু সমাজ এবং ৪,৩৭,১ এ ভিক্ষুগণের স্নানাহারের সমাজের চিত্র পাই। এই শেষোক্ত সমাজের কথাই অশোক অনুমোদন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত সমাজে মঞ্চ ও পর্য্যঙ্ক স্থাপনা করিয়া মদ্য, মাংসের এবং অভিনেতার এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইত; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বার সার্থকতা করা হইত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মোৎসব হইত। বাৎসায়ন তাঁহার "কামসূত্রে" প্রথমোক্তের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে অভিনেতৃবর্গ সমবেত হইয়া অভিনয় করিতেন। জাতকেও এইরূপ সমাজ প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয় যে, অভিনেতৃবর্গ একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া যে অভিনয় করিতেন, তাহাকে সমাজ বলা হইত। যে "সমাজে" মদ্য, মাংস ব্যবহৃত হইত, অবশ্য অশোক সে সমাজের প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না। অশোকের সমাজে ধর্ম্মালোচনা হইত এবং এইরূপ সমাজই তিনি উপকারী মনে করিতেন।

ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের যে সকল পথ গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে উৎকীর্ণ অনুশাসন-লিপিই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাচীন ভারতে, বিশেষতঃ মৌর্য্য-যুগের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে এই অমূল্য অশোকানুশাসনাবলীর প্রতি অধিকতর দৃষ্টি-নিক্ষেপ প্রয়োজনীয়। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে অশোকানুশাসনের অনেক দুরূহ স্থল বোধগম্য হইয়াছে। তথাপি যেভাবে এই অনুশাসন পাঠ করা প্রয়োজন, তাহা নানা কারণে হইয়া উঠিতেছে না। অনুশাসন-প্রতিলিপির একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুপাঠ্য সংস্করণেরও প্রয়োজন।

"আমি শূদ্র"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমি শূদ্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার বাপ ছিল শূদ্র, আমার পিতামহ ছিল শূদ্র, আমার প্রপিতামহ ছিল শূদ্র, এইরূপ অগণিত বংশক্রমে আমরা শূদ্র। আমার মা ছিল শূদ্রাণী, তার মা ছিল শূদ্রাণী, তার মা ছিল শূদ্রাণী, এইরূপ মায়ের দিক্ হতে দেখিতে গেলে সকলেই ছিল শূদ্রাণী। আমার খুড়া, জ্যেঠা, মামা, মেসো, পিসে, আত্মীয়-স্বজন সকলেই শূদ্র; আমি বিবাহ করিয়াছি শূদ্রের কন্যা, তাহারাও শূদ্র। তাহাদেরও আমার মত শূদ্রদের ঘরে বিবাহ হইয়াছে; আমাদের গ্রামে যে পাড়াতে আমাদের বাস সেই পাড়াতে প্রধানতঃ আমাদের স্বজাতীয়েরা বাস করে; সেই পাড়ার নাম আমরা যে জাত, সেই জাত থেকে হইয়াছে।

ছেলে বয়স থেকে শুনিয়া আসিতেছি যে, আমরা শূদ্দুর—তাহার প্রমাণও যথেষ্ট পাইয়াছি। যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন যদি কোন ব্রাহ্মণ সহপাঠী ছেলের সহিত তাহার বাড়ী যাইতাম, তখনই শুনিতে হইত, যে আমরা শূদ্দুর। কেবল শুনিতে হইত এমন নয়, অনেক সময়ে ভালরূপে বুঝিতে হইত, যে আমরা শূদ্দুর। যখন স্কুলে পড়িতাম তখন আমি শূদ্র, তাহা বড় শুনিতে পাইতাম না; তবে স্কুলের ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হলে তখন আমি শূদ্দুর, এই কথাটা কখন কখন শুনিতে পাইতাম। শুনিতাম—বেটা ছোট জাত, কিম্বা বেটা ছোট লোক। স্কুল ছাড়িবার পূর্ব্বেই আমি এই দুই পরিচয়ে ভাল করিয়া অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। যখন চাকরী করিতে আফিসে ঢুকিলাম, তখন দেখিলাম, যে আমার মত দুই তিন জন ছাড়া সকলেই হয় ব্রাহ্মণ, না হয় উচ্চ জাত। আফিসে সকলেই কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে, সেখানে সকলের সহিত কাজ লইয়া সম্পর্ক; আফিসে শূদ্দুর কিম্বা ছোট জাত কিম্বা ছোট লোক, এ সব কথা বড় শুনিতে পাইতাম না। তবে মনে মনে কে কি বলিতেন বা না বলিতেন, তাহা জানি না। আফিসে যাঁহারা চাকরী করিতেন, তাঁহাদের বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে কখনও কখনও নিমন্ত্রণ হইত, সে সব স্থলে আমি যে শূদ্র তাহা বড় বুঝিতে হইত না। দু-এক সময়ে ইঙ্গিত পাইতে হইয়াছিল। এক স্থানে স্মরণ আছে, ইঙ্গিতটী বিশেষ প্রশস্তই হইয়াছিল।

আমার এখন বয়স হইয়াছে। আজ কয় বৎসর হইল পেন্‌সেন লইয়াছি। কলিকাতাতেই বাস করি। সহরে কেহ কাহার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না, গ্রামের মত সমাজ নাই। আমি যে শূদ্র কিম্বা ছোট জাত তাহা বড় শুনিতে হয় না। আমি এক সময়ে ভাবিতাম, যে একজন ব্রাহ্মণই বা কেন ব্রাহ্মণ হইল, আর আমিই বা কেন শূদ্র হইলাম? হয়ত পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-ফলে এরূপ বিধান হইয়াছে। এরূপ বিভাগ পৃথিবীর কোন দেশে নাই, কখন ছিল তাহারও প্রমাণ নাই। পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মফল কি কেবল এই দেশে ফলে? বাঙ্গালা দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ৬ জন হিন্দু ব্রাহ্মণ বিভাগের অন্তর্গত, আর বৈদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বাকি চুরনব্বই জন হিন্দু শূদ্র। এই শতকরা চুরনব্বই জন হতভাগ্য হিন্দু পূর্ব্বজন্ম-কৃত কোন্ পাপ-ফলে এই জন্মে শূদ্র হইয়া পৃথিবীর সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া করিয়া এই দেশে জন্মিয়াছে? কোন্ সুকৃতি-ফলেই বা জন কতক লোক সকল দেশ ছাড়িয়া এ দেশে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছে; আর কোন্ দুষ্কৃতি ফলে কোটী কোটী নরনারী শূদ্র হইয়া এ দেশে জন্মিয়াছে? এ রহস্যের মর্ম্ম আমি কখনও বুঝিতে পারি নাই।

আমি একবার একজন শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি কাহারও স্মরণে থাকে না। পূর্ব্বে জাতিস্মর বলিয়া কেহ কেহ থাকিতেন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের

কথা তাঁহাদের স্মরণ থাকিত; এখন পৃথিবীতে পাপের প্রাবল্য হেতু সে প্রকার লোক আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তুমি শূদ্র-বংশে জন্মিয়াছ, সেই কারণে তুমি শূদ্র, ইহাতে সংশয় থাকিতে পারে না। এ জন্মে যদি সুকৃতি সঞ্চয় করিতে পার; পর-জন্মে হয়ত কোন উচ্চ কুলে জন্ম লাভ করিতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "আমি শূদ্র-বংশে জন্মিয়াছি, তাহা সত্য, কিন্তু কতদিন হইতে এই শূদ্র বংশ আরম্ভ হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "অনাদি, অনন্ত, আবহমান কাল হইতে এই ভাব চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভেই প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মা, যিনি এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, পৃথিবীর যাবতীয় নরনারী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচাদি যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহা হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে পরিষ্কার প্রমাণ আছে—

ব্রহ্মা সৃজন্মুখে বিপ্রান্ ক্ষত্রিয়ানপি বাহুতঃ।
উরুভ্যামসৃজদ্বৈশ্যান্ পদ্ভ্যাং শূদ্রানিতি স্থিতিঃ॥

ইহার অর্থ, এইরূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু-যুগল হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "এখন যে সকলে বলে, উহা একটি রূপক মাত্র।" তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "রূপক কাহাকে বলে?" আমি বলিলাম যে, উহা কল্পনার সাহায্যে কোন বক্তব্য বিষয় গল্পাকারে লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় আমাকে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে কোন কথাই শ্রুতি-মধুর ছিল না; পরিশেষে তিনি বলিলেন, "তুমি খৃষ্টান হওগে যাও। তোমার এমন বুদ্ধি, তোমার হিন্দু থাকা উচিত নয়।" ইহার পর হইতে আমি আর শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতের নিকট যাই নাই।

একটি কথা মনে হয়, আমরা শূদ্র, আমাদের থাক বাঁধিয়া দিল কে? একটা প্রসিদ্ধি আছে, যে আমরা ছত্রিশ জাতে বিভক্ত, কথাটা কিন্তু সত্য নয়। আমরা যে কত ভাগে বিভক্ত তাহা কেহ জানে না; সকলগুলি একত্র করিলে অন্ততঃ পাঁচ শত ভাগ হইবে। এ সকল বিভাগ কে করিল? ইহাদেরও পূর্ব্ব-পুরুষগণ কি ব্রহ্মার অথবা অন্য কোন প্রজাপতির দেহের অংশ হইতে নির্গত হইয়াছিল? এ প্রকার যুক্তির কোথাও প্রমাণ নাই। আর এক কথা, এই প্রকার আমাদের মধ্যে ভাগ হওয়া এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে। কলিকাতার নিকট তিনপ্রকার হাড়ী আছে, তাহারা এখন ভিন্ন ভিন্ন জাত হইয়াছে। প্রথম প্রকার হাড়ী শূকর চরায়; দ্বিতীয় প্রকার হাড়ী নাড়ী কাটে; তৃতীয় প্রকার হাড়ী ইংরাজদের বাড়ীতে বাবুর্চ্চি হয়। ইংরেজদের বাড়ীর বাবুর্চ্চি হইবে বলিয়া ব্রহ্মা যে কতকগুলি লোককে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, তাহা যেন একটু কষ্ট-কল্পনা! আমি বলিতে পারি না, আমার ভুলও হইতে পারে।

আমরা যে ছত্রিশ জাতিতে বিভক্ত, সে কথাটা আমার মত যাহাদের জাত, তাহাদের পক্ষেই খাটে। বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি জাতি-রা এই ছত্রিশ জাতি হইতে পৃথক্। শুদ্ধ ভাষা বলিবার জন্য আমি ছত্রিশ জাতি শব্দ ব্যবহার করিতেছি। বাস্তবিক, আমাদের নাম সত্বিক জাত। যদি একজন বৈদ্য বা কায়স্থকে সত্বিক জাত বলা যায়, তাহাদের ক্রোধের পরিসীমা থাকিবে না।

আমি একটা কথা মনে মনে ভাবি, যে একজন বৈদ্য ও আমি, আমরা দুই জনেই শূদ্র; তিনি যেন দাস-গুপ্ত লিখেন, আমি লিখি কেবল দাস; স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময়ে আমার নাম জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি প্রথমে দাস বলিয়া পরিচয় দিই। আমার বাপ কখন নিজেকে দাস বলিয়া পরিচয় দেয় নাই; আমরা যে জাত সেই জাত ছিল তার উপাধি। আফিষেও আমার উপাধি ছিল দাস, আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর দাস উপাধি গ্রহণ করিয়াছি। দাস নাম এখন আমার মৌরসী মোকরবী স্বত্ব হইয়াছে; আমি এখন পাকা-পোক্ত দস্তুর-মত সর্ব্ববাদিসম্মত দাস। বলিতেছিলাম, একজন বৈদ্যও দাস, আমিও দাস। একজন বৈদ্যও ইংরাজী স্কুলে পড়িয়াছে, আমিও পড়িয়াছি। একজন বৈদ্যও চাকরী করে, সেও আফিষের বাবু; আমিও চাকরী করিতাম, আমাকেও বাবু বলিয়া ডাকিত। তবে সেই বা কেন সৎ-শূদ্র, আর আমি কেন সত্বিক জাত হইলাম? ইহার এক

উত্তর থাকিতে পারে—শাস্ত্রে আছে, যে ব্রহ্মার পদযুগল হইতে শূদ্রেরা নির্গত হইয়াছিল; হইতে পারে, বৈশ্যেরা হাঁটুর কাছ থেকে বাহির হইয়াছিল, আর আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ গোড়ালি হইতে বাহির হইয়াছিল। এ যুক্তি শাস্ত্র-সম্মত। অনেকে বোধ হয় পায়ের চেটো থেকে, কেহ কেহ কড়ে' আঙ্গুল থেকে বাহির হইয়াছিল, ইহারা আমাদের অপেক্ষা নীচ।

বর্ত্তমান সময়ে জাতি-ভেদ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাই। অনেকে বলেন, আমাদের আর্য্য পূর্ব্ব-পুরুষগণ অনেক তপস্যা করিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া এই প্রথা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে কোন দেশে, কোন সময়ে এরূপ প্রথা কখন উদ্ভাবিত হয় নাই; তাহার কারণ, কোন দেশে কোন সময়ে এরূপ তপস্যা বা চিন্তা করিবার শক্তি কাহারও হয় নাই।

কি করিলে সৎ-শূদ্র হয়, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ আমার মত সত্বিক জাতদের একটি বিশেষ ভাবিবার বিষয়। আমি এখন চতুর্ব্বর্ণের কথা বলিতেছি না, বাঙ্গালা দেশে যে অগণিত জাত আছে, আমি তাহাদেরই কথা বলিতেছি। আমার নিজের বিশ্বাস, এই জাত কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহা আপনা আপনি হইয়াছে। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত উপরে যে শ্লোকটি আমায় বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত জাতি-গঠনের কোন সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালা দেশে কেবল দুইটি মাত্র ভাগ ছিল, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর। এই ব্রাহ্মণেতরদের নাম হইয়াছে শূদ্র। এই শূদ্রদিগের মধ্যে কতকগুলি হইল সৎ-শূদ্র, আর বাকি হইল আমার মত সত্বিক জাত। এই সত্বিক জাতের উদ্ধারের কোন উপায় নাই। বৈদ্যদিগের ভিতর কেহ বা পৈতা নেয়, কেহ বা নেয় না। রামপ্রসাদ সেন নিজেকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন। আমি শুনিয়াছি, ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত নদীয়া জেলার বৈদ্যেরা গলায় পৈতা ধারণ করিতে পারিত না, কোমরে রাখিত; এখন সকল বৈদ্যই আপনাদিগকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদের এই ক্রমোন্নতি নিজেদের চেষ্টায় হইয়াছে; কেহ সাহায্যও করে নাই, কেহ বাধাও দেয় নাই। আমি সত্বিক জাতের মধ্যে একজন, আমাদের কথা ছাড়িয়া দিই; সুবর্ণ-বণিক্, সাহা প্রভৃতি জাতদের মধ্যে বিদ্যা, অর্থ, চরিত্রের অসদ্ভাব নাই। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁহারা কোন অংশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ অপেক্ষা ন্যূন। কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন সুবর্ণ বণিক্ কিম্বা সাহাকে কোন প্রকারে হীন বলিয়া মনে করেন না, আপনাদের মধ্যে পান-ভোজন সম্বন্ধেও কোন প্রভেদ করেন না। তবে এই দুই সম্প্রদায় ও ইহাদের মত আরও অনেক সম্প্রদায়কে সমাজে কেন হীন বলে?

আমি সত্বিক জাত হইলেও, দুই এক স্থল ব্যতীত আমাকে জাতের জন্য অপমান বা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কলিকাতায় দেখিতে পাই, ভদ্র সমাজে অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজে পান-ভোজনে অথবা শিষ্টাচারে জাতের কথা উঠে না। এ সকল বিচার পল্লীগ্রামেই হয়। এ এক অদ্ভুত অবস্থা! যাহা শিক্ষিতসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহা কেবল অশিক্ষিতদিগের মধ্যেই আছে, তাহাই হইল সামাজিক বিধি! এ এক অদ্ভুত সমাজ, যে সমাজে যাহারা শিক্ষিত ব্যক্তি তাহাদের কথা বা কার্য্যের কোন মূল্য নাই।

আমি ভাবি, আমাদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া কাহার কি লাভ হইতেছে? পূর্ব্বে শুনিতাম, ব্যবসা-মূলক জাতি করিয়া দেশে ব্যবসা রক্ষিত হইতেছে, কথাটা আদৌ সত্য নয়। যেদিন হইতে মুসলমানেরা এদেশে আসিয়াছে, সেদিন হইতে কোন ব্যবসা হিন্দুদিগের নিজস্ব নাই। এখন কলিকাতায় কেবল মুসলমান ছুতার কিম্বা চীনে ছুতার দেখিতে পাওয়া যায়; জুতার কাজ করে, কিম্বা চামড়ার কাজ করে, তাহারাও চীনে কিম্বা মুসলমান। এখন যে কেহ যে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করে, সে সেই কাজ করিতে পারে। তাহাকে বাধা দেবার কাহারও সাধ্য নাই। সাত শত বৎসর হইতে এদেশ পরাধীন হইয়াছে, এই সাত শত বৎসর কাহাকেও কোন কর্ম্মে আবদ্ধ রাখিবার ক্ষমতা হিন্দুদিগের হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। ব্যবসা-মূলক জাতি-ভেদ হিন্দুরাও পরিত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্বে একজন সূত্রধর নিজের ছেলেকে নিজের ব্যবসা শিখাইত; এখন যদি তাহার

পয়সা হয়, সে কখনও নিজের ছেলেকে ছুতোরের কাজ শিখাইবে না। সে তাহাকে স্কুলে পড়াইবে, কলেজে পড়াইবে, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার করিবে, কখনও ছুতোর হইতে দিবে না; অথচ সেই ছেলের জাতি রহিয়া গেল সূত্রধর, আর সমাজে স্থানও রহিল সূত্রধরের। ইহা এক বিচিত্র অবস্থা। তাহার পিতা, পিতামহ এক সময়ে সূত্রধরের কাজ করিত বলিয়া তাহারা এক সময়ে সূত্রধর জাতি হইয়াছিল; তাহাদের পুত্র পৌত্র সূত্রধরের ব্যবসা করে না, তথাপি তাহাদের ব্যবসা-পরিচায়ক সূত্রধর জাতিতেই রহিয়া গেল।

আরও রহস্যের কথা মনে আসে, কর্ম্মকার লোহার কাজ করে, সে সৎ-শূদ্র, তাহার জল চলে; একজন স্বর্ণকার সোণারূপা লইয়া কাজ করে, তাহার জল অচল। যে লোহা পিটে, সে শুদ্ধ; আর যে সোণারূপা পিটে সে সে অশূদ্র—এ প্রহেলিকার উত্তর কে দিবে? আরও একটু রহস্যের কথা আছে। একজন হাড়ী আঁতুর-ঘরে প্রসূতির নাড়ী কাটে, সেই হাড়ী অচল, অস্পৃশ্য। একজন ডোম মড়া ছোঁয়, সেও অস্পৃশ্য। একজন মেথর ময়লা ছোঁয়, সেও অস্পৃশ্য। কিন্তু একজন ডাক্তার সেও নাড়ী কাটে, মড়া ছোঁয়, তাকেও ময়লা স্পর্শ করিতে হয়; কিন্তু এমন কাহারও বাপের সাধ্য নাই, যে একজন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য কিম্বা অপর বিভাগ-ভুক্ত ডাক্তারকে অস্পৃশ্য বলে। ডাক্তারীর ন্যায়, এমন ব্যবসা নাই যে শিক্ষিত হিন্দু বাঙ্গালী এখন না করে। কিন্তু যে ফুলের চাষ করে, তাহাকে কেহ জাতে মালী বলে না; যে লোহার ব্যবসা করে, তাহাকেও কেহ কামার জাতি বলে না। ইহার নাম আমাদের সমাজ-বন্ধন, সমাজ-শাসন, সমাজ-পালন ও সমাজ-রক্ষা!

আমি উপরে বলিয়াছি, আমি একজন সত্বিক জাত; আমাদের জল অচল। জন্মাবধি আমি কি দেখিয়াছি? আমি দেখিয়াছি, আমার বাপকে কেহ নাম ধরিয়া ডাকে নাই, 'ওরে' তাহার সম্বোধন ছিল। তাহার নামটা যতদূর বিকৃত করা যায়, সেই বিকৃত নামে সকলে তাহাকে ডাকিত। প্রায় সকল সময়ে তাহারা তাহাকে তুই বলিত, দুই এক সময়ে যখন তাহাকে দিয়া কাজের প্রয়োজন হইত, তখন তুমি বলিতে শুনিয়াছি; আমার বাপকে কেহ আপনি বলিয়াছে তাহা শুনি নাই। গ্রামে ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে কখন কদাচিৎ আমাদের নিমন্ত্রণ হইত। এ প্রকার নিমন্ত্রণের একটা কড়ার থাকিত; সেটা লিখিত পঠিত নয়, তবে সেটা সকলে জানিত ও মানিত। আমার বাপ গিয়া উঠানটা পরিষ্কার করিয়া দিবে, কলাপাতা কাটিয়া আনিয়া দিবে, ভদ্রলোকদের তামাক সাজিয়া দিবে, দু'একটা ফাইফরমাস খাটিবে, তাহার পর সে খাইতে পাইবে। আমাদের গ্রামে নিয়ম ছিল, ব্রাহ্মণেরা খাইয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট পাতে আমাদের খাইতে হইত।

আমাদের মত জল-অচলদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালার বাহিরে একত্র করিলে এখনও প্রায় দু'শ চল্লিশ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালী আছে। এই দু'শ চল্লিশ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে এক-শ পঞ্চাশ লক্ষ জল-অচল। এই আমাদের সামাজিক শাসন আর এই আমরা হিন্দু জাতি!

আমাদের মধ্যে গ্রামে যদি কেহ পরিষ্কার ধুতি, কামিজ পরে, চাদর গায়ে দেয়, জুতা পরে, তাহা হইলে গ্রামের ভদ্রলোকেরা কেহ হাসে, কেহ বিদ্রূপ করে; কেহ বা বলে, 'বেটা ভারি বাবু হয়েছে', আর কেহ বা ঘাড় নাড়ে, আর বলে 'কলিকালে, আরও কত কি দেখ্‌তে হবে!' আমাদের গ্রামে বাবুদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া আমাদের মতন লোক ছাতা মাথায় দিয়া যাইতে সাহস করে না। পূজার সময়ে আমাদের ছেলে মেয়ে যদি ঠাকুর দেখিতে যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে উঠান হইতে দেখিতে হয়, দালানে উঠিবার সিঁড়িতে পর্য্যন্ত উঠিতে আমাদের অধিকার নাই, পাছে ছোঁয়া যায়। আমাদের মত জাতের লোকেরা যখন পুষ্করিণী কিম্বা নদীতে স্নান করিতে যায়, তখন তাহাদিগকে ভদ্রলোকেরা যেখানে স্নান করে সেখান হইতে দূরে থাকিতে হয়। আমরা সর্ব্ববাদি-সম্মত কেবল ছোট জাত নই, আমরা ছোট লোক, আমরা নিজেরাও তাহা মনে করি। ভগবান আমাদের যেমন করিয়াছেন সেই ভাবে থাক

আমাদের উচিত। আমরা ছোট জাত, ব্রাহ্মণ দেখিলে দণ্ডবৎ করি; সে ব্রাহ্মণ বুড়োই হ'ক কিম্বা ছেলেই হ'ক—কেননা, বড় সাপটিও সাপ, ছোট সাপটিও সাপ। ব্রাহ্মণের পদধূলি কি পাদোদক আমরা মাথায় দিই, বুকে মাখি, মুখে দিই। আমরা ছোট জাত, ব্রাহ্মণ কিম্বা উচ্চ জাতের লোক যেখানে থাকেন, সেখান থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত, তাহা আমরা জানি। যে ঘরে তাঁহাদের জল থাকে সে ঘরের মধ্যে আমরা যাই না; আমরা যদি যাই সে জল অপবিত্র হবে। সে ঘরে বিড়াল কুকুর গেলে জল অপবিত্র হয় না। তাঁহারা যখন আমাদিগকে তামাক সাজিতে বলেন, হুঁকা থেকে কল্‌কিটা নামাইয়া দেন; কেন না আমরা ছুঁলে হুঁকোর জল অশুদ্ধ হবে। প্রাতঃকালে আমাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যাহারা জানে যে ঘুম থেকে উঠে যদি কেহ তাহাদের মুখ দেখে তাহা হইলে দিনের মধ্যে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। আমাদের মধ্যে যদি কেহ কোন পূজা করে, তাহা হইলে সে দেব-দেবীরও ছোটজাত হয়, সে দেবতাকে কোন ব্রাহ্মণ বা উচ্চজাত দেবতা বলিবে না। আমাদেরও ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা পতিত ব্রাহ্মণ; তাঁহারা নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন, ভয়ও পান—জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, আমরা বর্ণ-ব্রাহ্মণ। আসল ব্রাহ্মণেরা কি উচ্চ জাতেরা আমাদিগকে যত ঘৃণা করেন, তদপেক্ষা আমাদের ব্রাহ্মণ-দিগকে শতগুণ অধিক ঘৃণা করেন। হিন্দু-নাপিতে আমাদের নখ কাটে না, হিন্দু-ধোপাতে আমাদের কাপড় কাচে না। তাহারা মুসলমানদের কাপড় কাচে ও মুসল-মানদের নখ কাটে। যাহাদের কথা বলিতেছি, তাহারা সকলেই আমাদের মত জল-অচল এবং অস্পৃশ্য। উপরে বলিয়াছি, দু'শ চল্লিশ লক্ষ বাঙ্গালীর মধ্যে এক শ' পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দু-বাঙ্গালী স্বধর্ম্মীদিগের চক্ষে অস্পৃশ্যও এরূপ অপবিত্র যে তাহারা জল ছুঁইলে সে জল অপবিত্র হয়।

আমি কিন্তু সাত্বিক জাত হইলেও নিজে অস্পৃশ্য বা জল-অচল নই। আমাকে কেহ ছোটজাত বলিয়া ঘৃণা করে না, তুই বলে কেহ কথা কয় না। আমি পরিষ্কার কাপড় পড়িলে কেহ হাসে না; আফিষের দরোয়ানেরা আমাকে বাবু বলিত, সাহেবরাও বাবু বলিত। আমি ইংরেজীতে চিঠি লিখি, আমাকেও ইংরেজীতে লেখে, চিঠিতে 'মাই ডীয়ার' বলিয়া সম্বোধন করে, আমার চিঠির উপর 'বাবু' লিখা থাকে।

আমি মনে মনে ভাবি, দুশ চল্লিশ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে এক শ পঞ্চাশ লক্ষ নরনারীকে কুকুর শিয়াল অপেক্ষাও অধম অবস্থায় রাখিয়া হিন্দু বাঙ্গালী জাতির কি লাভ হইতেছে? এখন হিন্দু বাঙ্গালীদের যেরূপ দুরবস্থা, পূর্ব্বে কখন সেরূপ ছিল না; সকল হিন্দুই তাহা জানে, আর দিন কতক বাদে ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে হীন হইবে। দু-শ চল্লিশ লক্ষ হিন্দুদিগের মধ্যে একশ পঞ্চাশ লক্ষ স্বধর্ম্মীদিগকে এই ভাবে রাখিলে বাঙ্গালী হিন্দু জাতির কি শক্তি বাড়িতেছে? আমাদের মত লোক লইয়া বাঙ্গালী হিন্দু জাতির কি উপকার হইবে? মানুষ আর পশুতে এই প্রভেদ যে মানুষের আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে, পশুর তাহা নাই। যেরূপ আচরণ আমাদের মত সত্বিক জাতেরা শত শত বৎসর হইতে সমাজে ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহাতে আমাদের মধ্যে আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকার সম্ভাবনা কোথায়? আমরা ছোট জাত, আমারা ছোট লোক, ইহাই আমরা জানি; যে ভাবে আমরা আছি সেই ভাবে আমাদের থাকা উচিত, আমরাও তাই থাকি। তাই ভাবি, ১৫০ লক্ষ নরনারীকে পশু করিয়া রাখিয়া কাহার লাভ হইতেছে?

আমি ছেলে বয়স থেকে ন্যাশানেল কংগ্রেস বা জাতীয় মহা সমিতির নাম শুনিয়া আসিতেছি; দুই একবার সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতাও শুনিয়াছিলাম; আমি নিজে কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই নাই। প্রথমতঃ চাকরীর ভয় ছিল; তাহার পর দেখিতাম, রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে হইলে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে হয়; সে ক্ষমতা আমার ছিল না। আমার মত সামান্য লোকের সাহস হয় না যে, সভা সমিতিতে গিয়া বক্তৃতা দিই। যদিও কখনও কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই নাই, তথাপি বিষয়টা কি তাহা কিছু কিছু বুঝি। যাহারা সংবাদ-পত্র পড়ে, রাজনৈতিক আন্দোলন

কাহাকে বলে, তাহারা তাহা বোঝে। ছেলে বয়সে ইংরেজী ইতিহাস পড়িয়াছিলাম; জাতি কাহাকে বলে—জাতি-গঠন, জাতীয় উন্নতি, জাতীয় বিশেষত্ব, জাতীয় শক্তি, জাতীয় গৌরব, এ সকল কথা ইংরেজী পুস্তকে অনেক পড়িয়াছি, ইহাদের অর্থও কিছু কিছু বুঝি। চাকুরী করিতে হইলে পরীক্ষা পাশ করিতে হয়; পরীক্ষা পাশ করিতে হইলে বই মুখস্থ করিতে হয়. আমি সেই অনুরোধে বই মুখস্থ করিয়াছিলাম এবং সেই সূত্রে জাতি সম্বন্ধে আমার ভালরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। ইংরেজ-জাতির ইতিহাস স্কুলে বিশেষ করিয়া পড়িতে হয়, আমিও ইংলণ্ডের ইতিহাস ভাল করিয়া মুখস্থ করিয়াছিলাম। সেই কারণে জাতীয় মহাসমিতি একপ্রকার পরিচিত শব্দই বোধ হইত। ইংলণ্ডে পার্ল্যামেণ্ট আছে, আমেরিকাতে কংগ্রেস আছে; ভাবিতাম, আমাদেরও ন্যাশানেল কংগ্রেস অর্থাৎ জাতীয় মহাসমিতিও ইহাদের সহিত এক জাতীয় সামগ্রী। সেই জন্য ছেলে বয়সে আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যে যোগ না দিলেও, সে সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে যাহা লিখিত হইত, আগ্রহের সহিত পড়িতাম, এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত তর্ক বিচারও করিতাম।

সে ছেলে বয়সের কথা, এখন বয়স হইয়াছে; দু' একটা কথা মনে হয়—ইংলণ্ডে ও অপর দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়, সে সকল স্থানে দেশের লোক তাহাদের মহাসভাতে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠায়; সেই প্রতিনিধিরা দেশের লোকের অভাব অভিযোগ মহাসভাতে উত্থাপন করে। সেখানে সেগুলির বিচার হয়, যাহা ন্যায়ানুগত তাহাই সিদ্ধান্ত হয়, সেই ভাবে দেশের লোকের অভাব অভিযোগের পূরণ হয়। সকল দেশেই লোকের অধিকার বলিয়া সামগ্রী আছে; আমাদের দেশে দেশের লোক, তাহাদের অভাব, তাহাদের অধিকার, এ সকল শব্দের অর্থ কি? আমি শূদ্র। 'সেবা ধর্ম্মঃ শূদ্রাণাং'—ব্রাহ্মণদের সেবা শূদ্রদিগের একমাত্র ধর্ম্ম। আমাদের দেশের লোক হিন্দুসমাজ বলিয়া কোন কথা তর্ক করিবার সময়ে ভিন্ন স্বীকার করে না। আমাদের নাম ইতর অর্থাৎ পৃথক্। সে স্থলে আমরা আমাদিগকে কি করিয়া দেশের লোক বলিয়া দাবী করিতে পারি? আমাদের মত সত্বিক জাতদের সহিত ভদ্রলোকদের কোন সম্বন্ধই নাই। আমরা যে স্থানে বাস করি, ভদ্রলোকেরা সেখানে জন ধরিতে কিম্বা খাজনা আদায় করিতে ভিন্ন কখন আসে না। আমরা অস্পৃশ্য, আমাদের সুখ দুঃখ, আমরা খাইতে পাই কি উপবাস করি, আমাদের মরণ বাঁচন, এ সকল কথা লইয়া ব্রাহ্মণেরা কি অপর উচ্চ জাতেরা কখনও যে সময় ক্ষেপণ করেন, তাহা শুনি নাই। ভদ্রলোকদের চক্ষে আমরা অতিশয় ঘৃণিত, আমরা যেখানে থাকি, আমাদের ঘর দুয়ার এরূপ অপবিত্র যে, সেখানে গেলে ভদ্রলোকদের স্নান করিতে হয়। সংসারে যাহা কিছু দুষ্কর্ম্ম আছে, ভদ্রলোকদের মনে ধারণা, আমরা কেবল তাই করি। আমরা চুরি করি, সিঁদ কাটি, ডাকাতি করি, জেল খাটি, আমরা মদ খাই, তাড়ি খাই, লোকের সঙ্গে দাঙ্গা করি, সত্য কথা কাহাকে বলে আমরা জানি না; আমরা স্নান করি না, আমাদের ঘরে কখনও ঝাঁট পড়ে না, আমাদের মধ্যে পুরুষেরা চোর, মেয়েরা অসতী; ধর্ম্ম কাহাকে বলে আমরা জানি না; আমাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলই ঘৃণিত, সকলই অপবিত্র—আমাদের হইতে যতদূরে থাকা যায় উঁচু জাতেরা তাই চেষ্টা করেন।

আমি যতদূর জানি, ভদ্রলোকেরা ভদ্রলোক, আর স্কুলের ছেলেদের লইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করেন। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাশ বৈদ্য ছিলেন, রামগোপাল ঘোষ কায়স্থ ছিলেন, ইহারা সকলেই উচ্চজাত—নবশাখদের মধ্যে কেবল কৃষ্ণদাস পালের নাম মনে হয়। তবে তিনি কাগজে লিখিতেন, ঠিক যে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেন, তাহা বলা যায় না। এক'শ জন হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে তের জন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ, সতর জন নবশাখ, এই ত্রিশ জনকে বাদ দিলে বাকি হিন্দু বাঙ্গালী শতকরা সত্তর জনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত কি সম্বন্ধ? এই সত্তর জনের মধ্যে আটান্নজন হিন্দু বাঙ্গালী আমার মত জল-অচল সত্বিক জাত। আদার বেপারীর জাহাজের সংবাদের সহিত যে সম্বন্ধ, আমাদের মত জাতের সহিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সেই সম্বন্ধ। উপরে জাতীয় উন্নতি, জাতীয়

শক্তি, জাতীয় গৌরব, এ সকল কথা বলিয়াছি—আমাদের মত সাত্বিক জাতদিগের সহিত ঐ সকল কথার সম্বন্ধ কি? যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলন করেন, তাঁহাদিগকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আমার ইচ্ছা হয়। দু'শ চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে আমাদের মত এক'শ পঞ্চাশ লক্ষ লোককে এই ভাবে রাখিয়া হিন্দু জাতির জাতীয় উন্নতি, জাতীয় শক্তি, জাতীয় গৌরব কি ভাবে বৃদ্ধি পাইবে তাহা ত বুঝিতে পারি না। আর এক'শ পঞ্চাশ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু বাকি নব্বই লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দুর স্বদেশী, স্বজাত ও স্বধর্ম্মী!

'রাধা'

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্

হে বৈষ্ণব কবি, ব্রজের 'রাধিকা' তোমারই
অপূর্ব্ব রচনা,
প্রেমের পুলক রাগে, জেগেছিল বুকে তব,
রাধার কল্পনা;
সৌন্দর্য্য সাগর বুঝি, করিয়া মন্থন তুমি,
সাজালে রাধায়,
রাধারে ঘিরিয়া, কবি, ফুটালে প্রেমের ছবি,
স্বর্গ সুষমায়;
বাঁশরীর রব শুনি, গভীর নিশীথে ধনী,
গৃহ ছে'ড়ে তার,
দয়িত মিলন তরে, করেছিল অভিনব,
প্রেম অভিসার;

যৌবন মাধুরী লয়ে, যমুনার তীর বেয়ে,
ছুটেছিল রাধা,
চরণ শিঞ্জিনী তার, বেজেছিল রিনি, রিনি,
মানে নাই বাধা;
রাধার যা কিছু ছিল, মাধব চরণে দিল,
—দিয়ে হ'ল সুখী,
রাধিকার মণিবন্ধে, মাধব পরায়ে দিল,
পুণ্য প্রেম রাখি!
যে প্রেম কণিকা পে'লে, সব দুখ যায় দূরে,
সেই প্রেমে বালা,
মাধবে জড়াল বুকে, সুনিবিড় প্রেমসুখে,
গলে দিল মালা!

প্রিয়ার মালিকা গলে, প্রেম বিনিময় ছলে,
রাধার অধরে,
হরি দিল বার বার, চুম্বন অনিবার,
কত না আদরে!
সে ভক্ত এমনি করি', পূজে প্রাণ মন ভরি,
হরি যে তাহার,
বৈষ্ণব কবির গানে, সেই কথা শুধু মনে,
হয় বার বার,
কবির তুলিতে আঁকা, প্রেমের গগনে রাকা,
রাধা অতুলনা,
সৌন্দর্য্য মাধুরী ভরা, কবি হৃদয়ের এক
অপূর্ব্ব কল্পনা!

অশ্বের মুষ্টি-যুদ্ধ

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, বি-এ

বিপুল বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে মানুষের বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র বিস্ময়কর নিয়োজন। কৌতূহলেরও অন্ত নাই। এই প্রবৃত্তিই তাকে অনাবিষ্কৃত কত নিত্য নূতন রাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটনে সাহায্য করে। পশুর ভাষা ও স্বভাব, পাখীর গানের ছন্দ জানিতে মানুষের অজ্ঞাত অরণ্যানীতে অভিযান বর্ত্তমান যুগের খেয়াল। বনের বাঘকে ঘরের কোণে পোষ মানাইবার প্রচেষ্টা, বিষধর সর্প লইয়া খেলা ও তার মুখে চুমো খাওয়া নিছক কৌতূহল ছাড়া আর কি! এমনি করিয়াই মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডার নব নব অভিজ্ঞতায় ও জ্ঞানে পূর্ণ হইয়াছে, তার প্রয়োজন মিটাইতে কত অজানাকে সে আমদানী করিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে বনের বানর ও বনমানুষ দিয়া ঘানি টানান বা জাঁতা পেষাণও আশ্চর্য্য নয়।

সার্কাসের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া অশ্বদ্বয় করমর্দ্দন করিতেছে

অশ্বের মুষ্টিযুদ্ধ—অসম্ভব কথা! অভ্যাস ও চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই। দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়ান আত্ম-বিশ্বাসের উপর ভর করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, অসম্ভব কথাটা কেবল নির্ব্বোধের অভিধানের বস্তু। বন্যজন্তুকে মানুষের দৈনন্দিন কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিতে এই মানুষই সমর্থ হইয়াছে। মরুবুকে উটের উপকারিতা তুলনাহীন। উত্তর মেরুর জমাট বরফের উপর দিয়া কুকুর স্লেজগাড়ী টানিয়া সেখানকার অধিবাসীর যে কল্যাণ সাধন করে, তাহা তাদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য। পৃথিবীর বহু স্থানে, বিশেষ করিয়া তুর্কীতে 'মুরগীর লড়াই' কোন্ আদিম যুগ হইতে প্রচলিত। স্পেনে 'বৃষ-যুদ্ধ' সেদিনও সর্ব্বসাধারণের আমোদের বস্তু ছিল। সার্কাসে সর্ব্ব দেশেই জীব-জন্তুর বিস্ময়কর খেলা দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জনের প্রথা আছে। সম্প্রতি চন্দননগর কৃষ্টির মেলায় সামান্য টিয়া-পাখীর অদ্ভূত কৃতিত্ব শত শত দর্শককে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিল। শিক্ষা-দাতাকে তারিফ না করিয়া পারা যায় না। টিয়াপাখীর মুখে কেবল রামনাম বুলি নয়, দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁবুর দ্বারদেশে টিয়াপাখীর প্রজ্বলিত লৌহশলাকা ঘূর্ণন, অভ্যন্তরে বন্দুক ছোড়া, গাড়ীটানা প্রভৃতি কত কি শিক্ষা-বৈচিত্র্যের নিদর্শন! এখানেও যে অশ্বের মুষ্টিযুদ্ধের পরিচয় দেওয়া হইতেছে,

"সিগারেট" হস্তে দস্তানা পরিতেছে

তাহাও মানুষের শিক্ষাকৌশলের বিচিত্র সার্থকতাই প্রমাণিত করে।

বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে ঘোড়দৌড়, অশ্বারোহণ প্রভৃতি বিচিত্র ব্যাপারে অশ্বের যত কৃতিত্ব দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে
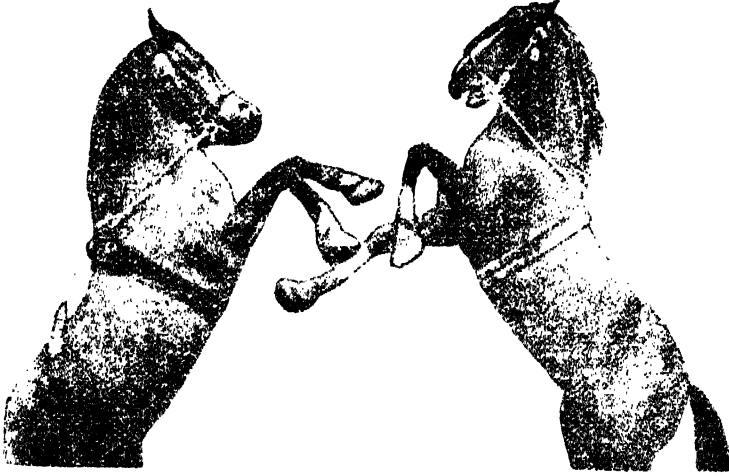
'চালি" ও "সিগারেটে"র মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ

মিঃ এ, বি, পাউয়েল যেমন করিয়া চতুষ্পদ জন্তুকে শিক্ষা দিতে ও বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তেমনি অন্যত্র খুব কদাচিৎই লক্ষিত হয়।

সার্কাস-জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই পাউয়েলের জীবন এবং বিভিন্ন জন্তুর মাঝেই তিনি লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হন। পশুকে শিক্ষা দিবার কাজেই তাঁর সারাজীবনের সবখানি শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। এ কার্য্যে তিনি সাফল্যও লাভ করিয়াছেন প্রচুর। সার্কাসে তাঁর অতুলনীয় অশ্বারোহণ-প্রণালী অসীম সাহসিকতার নিদর্শন। পাউলের চলমান সার্কাস যুক্তরাজ্যে ও ইউরোপখণ্ডে সুবিদিত।

সার্কাস-জীবনের অবসর সময়টুকু তিনি বিচিত্র জীব-জন্তুকে প্রকাশ্য সার্কাসের দর্শনীয় ও কৌতুকপ্রদ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর এই দীর্ঘ শ্রম ও অভিজ্ঞতার চরম ফল দৃষ্ট হয়, অশ্বের মুষ্টিযুদ্ধ-শিক্ষায়।

এই মুষ্টি-যোদ্ধা রত্ন-দুইটার নাম—'চালি' ও 'সিগারেট'। দু'জনই বিদেশী, জাতিতেও বিভিন্ন। সিগারেট আরব-জাতীয় এবং চালি তুর্কীজাতীয়। দু'জনই সযত্ন লালিত-পালিত। দু'জনেরই তেল-কুচকুচে চেহারা ও হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গসৌষ্ঠব—দেখিলে চোখ জুড়ায়। চালির রং ধূসর-কটা; সিগারেট দেখিতে ঝুলের মত কালো। সিগারেট কালো হইলেও ওর স্বভাবটি কিন্তু খুব ভাল; বেশ গা-ঘেঁষা এবং ছোট্ট ছেলেটির মত প্রভুর পিছন পিছন ফেরে। চালির মেজাজ ভারী রুক্ষ—একটু ফাঁক পাইলেই বাঁকিয়া বসে। কণ্টিনেণ্টে সার্কাস দেখাইবার সময়ে চালিকে লইয়া প্রথম বছরটা পাউলের যে দুর্ভোগ ভুগিতে হয়! চালির চালাক হইবার কারণ এই যে, মুষ্টিযুদ্ধ শিখিবার আগে সে বাল্য-খেলায় অভ্যস্ত ছিল। নিত্য চাতুরী করিতে করিতে তার চরিত্রও তেমনি গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথমটা তাই সর্ব্বদাই তাকে চোখে চোখে রাখিতে হইত। চালি ও সিগারেটের মুষ্টিযুদ্ধ শিখিবার পিছনে বেশ একটু কৌতুকপ্রদ ইতিহাস আছে।
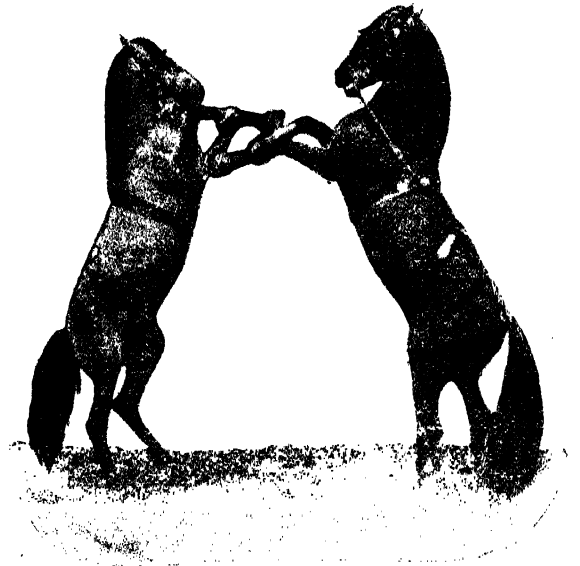
উভয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে

চালি ও সিগারেট কেবল নূতন আসিয়াছে; দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব তখনও ভাল করিয়া জমিয়া উঠে নাই, যদিও

দু'জনেই এক জায়গায় এক আস্তাবলেই থাকিত। চার্লি পাকা খেলোয়াড়; তার একটি সুদৃশ্য জিনও ছিল। সিগারেট নূতন, কেবল খেলা শিখিতেছে, তাই তার তখন পর্য্যন্ত কোন সাজ-সরঞ্জাম ছিল না। ঘটনাক্রমে একদিন অনিবার্য্য প্রয়োজনে চার্লির জিনখানি বেচারা সিগারেটের কালো পিঠে ব্যবহার করা হইয়াছিল। এতে গর্ব্বিত চার্লি যে ভীষণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিল, তা তার তখনকার হাব-ভাবেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সারা দিনেও চার্লির রাগ পড়ে নাই, যদিও সিগারেট এই অভিনব সজ্জার জন্য বেশ হর্ষোৎফুল্লই হইয়াছিল। ঘটনা চরমে দাঁড়াইল, যখন দু'জনে আস্তাবলে এক জায়গায় হইল। সে কি বিরাট্ চীৎকার—ধস্তাধস্তির শব্দ! উৎকট হ্রেষা-রবে সকল নফর-চাকর দৌড়িল, প্রভু পাউয়েলকে খবর দেওয়া হইল। চার্লি ও সিগারেট তো বন্ধনমুক্ত হইয়া কামড়া কামড়ি, লাথা-লাথি সুরু করিয়াছে। থামান কি যায়! পাউয়েল যখন পৌছিলেন, তখন ঘোড়া দুইটী পিছনের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া সামনের দুই পা দিয়া 'হাতাহাতি', 'ঘুষাঘুষি' সুরু করিয়াছে।

বাম পাদ যুদ্ধোদ্যত অশ্বদ্বয়
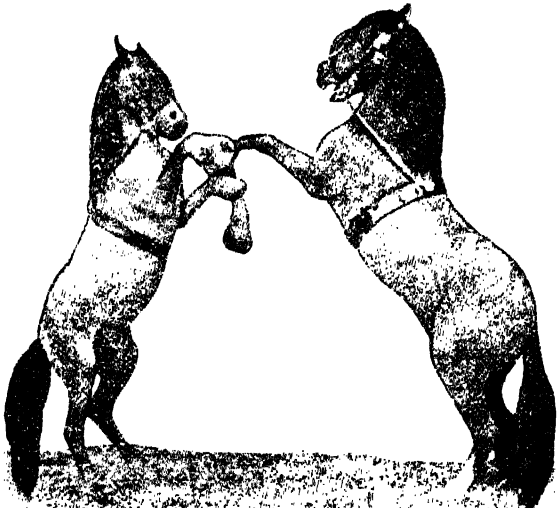
প্রভুর উপস্থিতিতে উন্মত্ততা থামিল। নিরীহ সিগারেট লজ্জায় অধোবদন হইল, উদ্ধত চার্লি রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল।

পশুজীবনের এই তুচ্ছ ঘটনা পাউলের বিগত অভিজ্ঞতার উপরে এক নূতন আলোকপাত করিল। ঘোড়া-গরুর মত উন্নত পশুদের যে আছে একটা চেতনা ও অনুভূতি, তা সেদিন তাঁর কাছে স্পষ্ট করিয়াই যেন ধরা দিল।
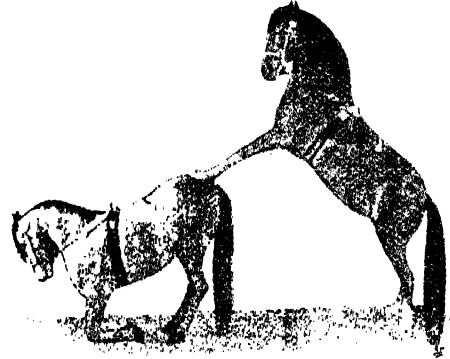
মুষ্টিযুদ্ধের সময়ে পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করায় একবার 'ফাউল' হইয়াছে

গর্ব্বিতা প্রতীচ্যা রমণী যেমন কালা আদ্মীর হাওয়া সইতে পারে না, তেমনি পশুদের মধ্যেও আছে জাতি-বর্ণ বিচার। চার্লি ও সিগারেটের ক্ষোভ তীক্ষ্ণদর্শী পাউয়েল নিবিড়ভাবে বুঝিয়াই তার সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন পরের দিন হইতেই। এই বিখ্যাত অশ্বদ্বয়ের মুষ্টি-যুদ্ধ-শিক্ষারম্ভের গোড়ার কথা।

কিন্তু এ যে কি বিরাট্ তপঃসাধ্য ব্যাপার তা যাঁর অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন। পাউলের অসীম ধৈর্য্য-সংযম-তিতিক্ষার তুলনা মিলে না। একটি দিনের তরেও তিনি বিরক্ত হন নাই বা বেত ব্যবহার করেন নাই। তার চোখের ইঙ্গিত বা কদাচিৎ মৃদু বেত্রাঘাতই যথেষ্ট। পুরো দুইটি বৎসর লাগিয়াছিল তাহাদিগকে দস্তানা পরান শিক্ষা দিতে। অবশ্য চার্লি ও সিগারেট ঘোড়া হইলে কি হইবে, তাদেও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। দু'হাজার অশ্বের মধ্যে এই দুইটীর জোড়া মিলে কিনা সন্দেহ।

পাউয়েল-পরিচালিত সার্কাসের সকল ক্রীড়া-কৌতুকের

মধ্যে চার্লি ও সিগারেটের মুষ্টি-যুদ্ধই সবচেয়ে উপভোগ্য, star item বলা যাইতে পারে। ইহাই পাউয়েলের সার্কাস সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

"সিগারেট" ক্লান্তি অপনোদন করিতেছে

এদের মুষ্টি-যুদ্ধ একেবারে নিখুঁৎ—কোথাও একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিবার যো নাই। সারা খেলার মধ্যে এতটুকুও ভুল-চুক বা অন্যায় (foul) হয় না। কখনও একজন আর একজনের পেটের নীচে বা অ-খেলোয়াড়ের মত পশ্চাদ্‌ভাগে বা নিম্নদেশে আঘাত করে না। মানুষে-মানুষে মুষ্টি-যুদ্ধের সময়ে সুযোগ পাইলে তারা কখন কখন অন্যায়ের প্রশ্রয় দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে না কিন্তু চার্লি ও সিগারেট দৈবাৎ নিয়মের বাহিরে যায়।

পাকা খেলোয়াড়ের কায়দায় সার্কাস আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়াই তারা পিছনের পায়ের উপর সোজা দাঁড়াইয়া পরস্পরের সম্মুখের পদদ্বয় দ্বারা 'করমর্দ্দন' পূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভের ইঙ্গিত জানায়। প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় কায়দা-মাফিক্ পায়তাড়া কষে এবং খেলা যখন পুরা দমে চলিতে থাকে, তখন সুযোগমত একজন আর একজনকে মারিতেও কসুর করে না—যা খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়ের পক্ষেই উপভোগ্য। পাউয়েল উভয়ের মধ্যস্থতা করে। এক একটা রাউণ্ড এমনি ভাবে বন্দোবস্ত হয়, যাহাতে ঘোটকদ্বয়কে অধিকক্ষণ পদভরে দাঁড়াইয়া কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে না হয়। এই মুষ্টি-যুদ্ধের আমোদজনক দৃশ্যটুকু এই যে, প্রতি রাউণ্ডের শেষেই উভয়ে পায়তাড়ার ভঙ্গিতে পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া কিছুক্ষণ অর্দ্ধচক্রাকারে পায়চারী করে, যাহাতে শ্রান্তি অপনোদন ও শ্বাস-প্রশ্বাস খেলিবার উপযুক্ত অবসর মিলে। আবার উভয়েই অগ্রসর হইয়া যখন মুষ্টি-যুদ্ধ সুরু করে, তখন আর এক রাউণ্ড আরম্ভ হয়। খেলার শেষ দিক্‌টায় পাউয়েলের শিক্ষার সম্পূর্ণতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধ হয়, যখন প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় পরস্পরকে হারাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার ভাণ করে। সেই সময়ে উভয়ের হাবভাব দেখিয়া মনে হয় যেন বীরযুগল কতই না ক্রুদ্ধ ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে!
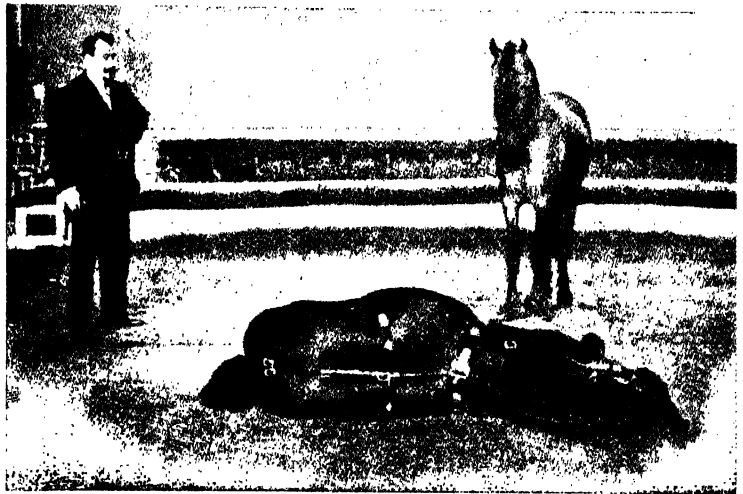
চার্লির সজোর মুষ্ট্যাঘাতে সিগারেট ভূমিতে পতিত হইলে, রেফারী কর্ত্তৃক জয়-পরাজয় ঘোষিত হইল

সর্ব্বশেষে চার্লির এক সজোর মুষ্ট্যাঘাতে সিগারেট সশব্দে করাতের গুঁড়া-ছিটান ভূমির উপর পতিত হয় এবং রেফারী কর্ত্তৃক জয়-পরাজয় ঘোষিত হইলে পরাজিত

সিগারেট বিমর্ষ ভাবে উঠিয়া দাঁড়ায়। সমবেত দর্শকমণ্ডলীর হর্ষধ্বনির মাঝে বিজয়ী চার্লি সাফল্যের অভিবাদনপূর্ব্বক সগর্ব্বে প্রস্থান করে; আর পরাজয়ের বেদনাভিভূত বেচারা সিগারেটের পা যেন চলে না, সান্ত্বনার ভাণে সহযোগী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ধীরে অতি ধীরে সে ক্রীড়াস্থান পরিত্যাগ করে।

আন্তর্জাতিক মানুষের মধ্যেও যেমন খেলা-ধূলার মধ্য দিয়া হৃদয়ের প্রেম-প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়, তেমনি চার্লি ও সিগারেটের মাঝেও পূর্ব্বজাতি-হিংসা বিস্মৃত হইয়া পরে উভয়ে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল।

ছায়ার মায়া

(গল্প)

শ্রীসুধীরকুমার সেন

চক্রধরপুরের গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া উত্তরদিকে যতই চলিয়া যাও, খালি তাল-তামাল-হিন্তালের দুর্ভেদ্য বন। বাঁ-দিকে বিস্তৃত মাঠ, অসীম শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করিতেছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে মরুভূমির মত দেখায়। এই মাঠ পার হইলে মোহনপুর পরগণার আরম্ভ। আর বন পার হইলে কি, তাহা গ্রামের লোক আজিও বলিয়া উঠিতে পারে না।

চক্রধরপুর গ্রামের বাসীন্দাদের মুখে মুখে বহুদিন ধরিয়া একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছিল; লোকে বলিত যে, প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক ঐ বন হইতে বাহির হইয়া আসে। বন হইতে মাইলখানেক দূরে বেতসী নদী, গভীর রাত্রে বহুদূর হইতে তাহার জলকল্লোল শুনিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকটী বন হইতে বাহির হইয়া সারাপথ যেন কাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই নদীর দিকে যায়। নদীর ধারে পৌঁছিয়া তাহার খোঁজা শেষ হইয়া যায় এবং তারপর শ্রান্তভাবে সে একটা বালিয়াড়ির উপর সে বসিয়া থাকে। মেঘের মতো তার চুল, চাঁদের মতো তার গায়ের রং। সারারাত্রি ঐ বালিয়াড়ির উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সেই সময়ে নদী-কল্লোল শান্ত হইয়া যায়, জলের স্রোতঃ আর পাড়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়ে না। ভোরের আলোর সঙ্গে সেই সুন্দরী বাতাসের সাথে মিশাইয়া যায়।

গ্রামের ছেলেরা বৃদ্ধদের মুখে এই গল্পটা কম করিয়া পঞ্চাশ বার শুনিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে সেই মায়াবিনী নারীর চুলের দৈর্ঘ্য, শাড়ীর রং, দেহের জ্যোতিঃ হুবহু বর্ণনা করিতে পারিত। পূর্ণিমার রাতে যে পথ আলো করিয়া সুন্দরী চলিত, নদীতীরে যে বালিয়াড়ির উপর সে বসিত, তাহাও তাহাদের চোখের সামনে ভাসিত।

গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের মতো নীলুও এই গল্পটা বহুবার শুনিয়াছিল। আর সেই রহস্যময়ী নারী সম্বন্ধে তাহার শিশুমনের কৌতূহলেরও অবধি ছিল না। গ্রামের বৃদ্ধেরা, যাঁহারা স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক হারু-ঠাকুরদা ছাড়া আর কেহই জীবিত নাই। হারু-ঠাকুরদা একদিন গভীর রাত্রে মোহনপুর হইতে ফিরিবার পথে এই সুন্দরীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেদিন ছিল পূর্ণিমা, এবং বনের পথে আলো এবং ছায়া পড়িয়া স্থানটা অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া হারু-ঠাকুরদার হাতের লণ্ঠনটা নিভাইয়া দিল। সেই সময়ে একটী স্ত্রীলোক বন হইতে বাহির হইয়া আসিল। হারু-ঠাকুরদা সেই রমণীর পিছু লইয়াছিলেন। সে অনেক-দিনের কথা, তখন বয়স ছিল অল্প, সাহস ছিল দুর্জ্জয়।

সে রাত্রে তিনি আর বাড়ী ফেরেন নাই। পরের দিন সকালে ব্যাপারীরা তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় নদীতীরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, তুলিয়া লইয়া আসে।

শিশু-বয়সে মায়ের কোলে শুইয়া নিস্তব্ধভাবে কতবারই না নীলু এই গল্প শুনিয়াছে। ছেলেবেলা হইতেই নীলু ছিল কল্পনাপ্রবণ, দুঃসাহসী। নিস্তব্ধ রাতে মায়ের কোলে শুইয়া গল্প শুনিতে শুনিতে তাহার মন বহু বার চক্রধরপুর গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া দুর্গম বনের মধ্যে সেই সুন্দরীকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। মা গল্প বলিতেন, ছেলে 'হুঁ' দিয়া শুনিত। হঠাৎ তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মা ভাবিতেন ছেলে ঘুমাইল; চোখে হাত বুলাইয়া দেখিতে গিয়া, দেখিতেন চক্ষু মেলা—ছেলেকে ডাকিতেন, ছেলে নিদ্রোত্থিতের মত সাড়া দিত। ও যেন সেই রূপকথার রাজপুত্র, স্বপ্নভঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিয়াছে সমুদ্রপারের রহস্যপুরীর অভিমুখে, যেখানে বন্দিনী রাজকন্যা যুগযুগান্তর ধরিয়া কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া দিন কাটাইতেছে। মেঘের মত তার চুল, আলোর মতো তার গায়ের রং। কত রাত্রে তাহার শিশু-মন মায়ের কোলের সুখশয্যা ছাড়িয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া, বল্লম আঁটিয়া নদীর পাড়ে ছুটিয়া গিয়াছে। সুন্দরী কিন্তু দেখা দেয় নাই, দূর হইতে মিলাইয়া গিয়াছে।

ছেলেরা বলিত: কই, তুই যা দেখিনি, দেখি তোর কত বড় সাহস! শুধু গেলে হবে না, আমরা কি আর দেখ্‌তে যাব, তুই গেছিস্ কি না গেছিস্? সেই নদীর পাড়ে, সেই বালিয়াড়ির পাশে একটা খোঁটা পুঁতে রেখে আস্‌তে হবে। পারবি?

নীলু বলিত: যাব একদিন।

ছেলেরা বলিত: কবে আর যাবি? সে যদি আসা বন্ধ করে' দেয়?

নীলু চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিত। ছেলের দল হাসাহাসি করিয়া বলিত: ছাই সাহস! যেমনি চেপে ধরেছি, অমনি চুপ! যার সাহস থাকবে সে আজই চলে যাবে, এই দোল-পূর্ণিমার রাতেই—

সেদিন দোল-পূর্ণিমা। নীলু বাড়ী ফিরিয়া মাকে শুধাইল: মা, সেই মেয়েলোকটী এখনও নদীর ধারে আসে?

মা কাজ করিতেছিলেন কাজের দিকে চোখ রাখিয়াই মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন: হুঁ।

নীলু আবার শুধাইল: দোল-পূর্ণিমার রাতে আস্‌বেই, না, মা?

মা আবার মাথা নাড়িলেন।

নীলু বলিল: আমি তাকে দেখ্‌তে যাব মা?

মা বলিলেন: ওকথা বল্‌তে নেই, নীলু। ঠাকুর-দেবতা তাঁরা, রেগে গেলে কি রক্ষে আছে? মা হাত দুইটা তুলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

সেদিন রাতেও বিছানায় শুইয়া নীলুর মন একবার সেই বনের দিকে পা বাড়াইয়াছিল কি না কে জানে, না বিছানায় শুইয়া দুঃসহ আবেগে ছটফট্ করিয়াছিল শুধু। সে রাতে চাঁদের আলো ছিলো অফুরন্ত, বেতসী শান্ত স্রোতস্বিনীর মতো কুলু-কুলু ধ্বনিতে বহিয়াছিল।

সে বার আষাঢ় আসিতে না আসিতেই, বর্ষা আর বেতসী মিলিয়া চক্রধরপুর গ্রামখানাকে ধুইয়া দিয়া গেল, তাল-তমাল-হিন্তালের বনের মাথায় মাথায় বর্ষা নামিল। জলে ক্ষেত ডুবিয়া গিয়াছে, পথের দুই পাশে, এখানে-ওখানে আগাছাগুলি বর্ষার জল পাইয়া মাথা উঁচাইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিজা মাটীর গন্ধে বাতাস একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে। উপরে, আকাশে, মেঘের গর্জ্জনের বিরাম নাই; আর নীচে তাহারই তলে চিরশান্ত বেতসী ক্ষুধিতা রাক্ষসীর মতো অবিশ্রান্ত গর্জ্জন করিয়া ডানদিকের পাড় ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ছুটিয়াছে। রাত্রিতে, বিছানায় শুইয়া বেতসীর কল-কল ধ্বনির সহিত সেই পাড় ভাঙ্গিয়া ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া জলগর্ভে পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

কোন্ পথিকের আসিবার আশায় আশায় তরুণী প্রকৃতি যেন আপনার বরাঙ্গ অতি সযতনে সাজাইয়াছিল, কাণে বনফুলের গহনা পরিয়াছিল, বনলতা দিয়া কবরী-সজ্জা করিয়াছিল, মাথায় সুনীল শাড়ীর ঘোমটা তুলিয়া

দিয়াছিল, বুকে নদীর হার এলাইয়া দিয়াছিল, সে পথিক আসি-আসি করিয়াও আসিল না, আসিবে-আসিবে বলিয়াও তাহার আসা হইল না, দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া সুন্দরী বিরহ আর সহিতে পারিল না, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। মাথার ঘোমটা খসিয়া পড়িল, সারা গগনে কালো চুল এলাইয়া দিয়া মেয়েটি বসিয়া রহিল।

নীলুর বয়স তখন ষোলো ছাড়াইয়া সতেরোয় পা দিয়াছে। সেই মায়াবিনী নারীর কথা আজও তাহার মনে আছে। আজও সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে, বনের প্রান্ত দিয়া আলের উপরকার পথ বাহিয়া একটী রমণী নদীর দিকে চলিয়াছে, চাঁদের আলোর মত তার গায়ের রং, মেঘের মত কালো তার মাথার চুল। আকাশে মেঘ ডাকিতে থাকে, নদীজলের পাড়ে আছড়াইয়া পড়িবার শব্দ কাণে আসে। কোনো দিন বা দেখে, নদীর পাড়ে বালিয়াড়ির উপরে বনের দিকে পিছন ফিরিয়া সুন্দরী বসিয়া, সারা পিঠে কালো চুলের রাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পায়ের কাছ দিয়া শান্ত বেতসী নিঃশব্দে বহিয়া যাইতেছে।

সেদিন রাত্রেও বুঝি এমনি বৃষ্টি নামিয়াছিল। বাজের আওয়াজে আর কাণ পাতা যায় না। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ, বেতসীর পাড় ধ্বসিয়া পড়ার আওয়াজ, সমস্ত মিলিয়া আকাশে এক শব্দের তাণ্ডব জুড়িয়া দিয়াছে।

গভীর রাতে নীলুর ঘুম ভাঙ্গিল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সে একবার জানালাটা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল, তারপর নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া পথে নামিয়া আসিল। বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে। আকাশের ঘোরও অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছে। নীলু সেই কৰ্দ্দমাক্ত সঙ্কীর্ণ পথের উপর দিয়া চলিল। বৃষ্টির জল পাইয়া পথের উপর আগাছা কোথাও কোথাও এতো বড় হইয়া উঠিয়াছে, যে পথ চিনিয়া লইবার যো নাই। চক্রধরপুর গ্রামের সীমানা পার হইয়া নীলু ক্ষেতের আলের উপর দিয়া হাঁটিতে লাগিল। আলগুলি অনেক জায়গায় জলে ডুবিয়া গিয়াছে, কোথাও বা মাথা জাগাইয়া আছে। মাঠ পার হইয়া নীলু সেই বিস্তীর্ণ বনভূমির মুখামুখি দাঁড়াইল। অন্ধকার দুর্ভেদ্য— যত দূর চোখে পড়ে, একবিন্দুও আলোর রেখা দৃষ্টিগোচর হয় না।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীলু ঘামিয়া উঠিল। ভয়ে নয়; ভয় কাহাকে বলে, এই সতেরো বছরের জীবনে তাহা সে জানে না। কি এক অপূর্ব্ব অনুভূতি তাহার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! পথের পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় কি একটা গাছ, রাত্রে চেনা যায় না। নীলুর হঠাৎ মনে হইল, ঐ গাছের আড়াল দিয়া আলের পথ বাহিয়া কে যেন চলিয়াছে, এলোচুল সারা পিঠে এলাইয়া পড়িয়াছে। নীলুর চমক ভাঙ্গিল, তাহার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে, দুই হাত দিয়া চক্ষু রগড়াইয়া সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। অন্ধকার নিবিড়, পাশের মানুষকেও হয়ত চেনা যায় না, কিন্তু নীলুর বোধ হইল, সে যেন স্পষ্ট দেখিতেছে, সেই সুন্দরী চলিয়াছে, চাঁদের মত তার রং, মেঘের মত তার চুল।

হাজার বছরের স্বপ্নভঙ্গে, রাজপুত্র হঠাৎ একদিন নিশীথ রাত্রে জাগিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছে সেই স্বপ্ন-পুরীর উদ্দেশে, যেখানে বন্দিনী রাজকন্যা বাতায়নে বসিয়া মোহাবিষ্টর মত দিন কাটাইতেছে। চোখে এখনও স্বপ্নের ঘোর লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া, রাজপুত্র প্রথম দেখায় রাজকন্যাকে চিনিতে পারে নাই; তাই ভাবিয়াছিল, শুধাইবে তুমি—

নীলুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় কে? বাতাসে গাছের পাতাগুলি ঝির্-ঝির্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, পাতা হইতে জল মাটীতে ঝরিয়া পড়ার শব্দ কাণে আসিল। আড়াল হইতে সরিয়া আসিয়া আলের দিকে চাহিয়া সে দেখিল, যত দূর দৃষ্টি যায় কোথাও জন-মানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। মাথার উপর দিয়া একটা বন্য পাখী তীব্র চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। নীলু সেই আলের পথ বাহিয়া নদীর দিকে চলিল।

এতক্ষণ ধরিয়া সে অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতেছিল, হঠাৎ বেতসীর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ার আওয়াজে চমকিয়া উঠিল। চৈত্রের সেই শীর্ণ, দুর্ব্বলা নদীটা অকস্মাৎ যেন রুদ্রের নাটমন্দিরে নাচের মহলা দিবার জন্য নাচিয়া উঠিয়াছে—কি এক সর্ব্বনাশী ক্ষুধায় বালিকে মাটীকে আঁকড়িয়া ধরিয়া দুই হাত নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইতেছে। বালিয়াড়িটাতেও ভাঙ্গন ধরিয়াছে, কিন্তু এখনো একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। নীলু বিস্মিত হইয়া বালিয়াড়িটার দিকে চাহিল। কে একটী মেয়ে যেন ঢালু দিক্‌টায় বসিয়া পা দুখানি জলের দিকে ঝুলাইয়া দিয়াছে, জল নাচিয়া নাচিয়া পায়ের আঙ্গুল ছুঁইয়া আবার ছুটিয়া যাইতেছে, সারা পিঠে তাহার ঘন কালো এলো-চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বেতসীর রুদ্র মূর্ত্তি-মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, বাতাসের শব্দ আর শোনা যায় না। নীলুর কাণে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও দীর্ঘ ও কর্কশ বলিয়া বোধ হইল, দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ পাড় ধ্বসিয়া পড়ার আওয়াজ কাণে আসিল, বাতাস আশে-পাশে শোঁ-শোঁ শব্দে ঘুরিতে লাগিল। বালিয়াড়ি শূন্য, জলের দিকে পা ঝুলাইয়া কেহই বসিয়া নাই, শুধু একটা শব্দের তাণ্ডব নীলুর কাণে অবিরত আঘাত করিতে লাগিল। সেই নদী-স্রোতে ভাঙ্গিয়া পড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কে যেন আর্ত্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল: আমি এইখানে শত-শত বৎসর ধরিয়া বাঁধা পড়িয়া আছি; মুক্তি খুঁজিয়াছি, পাই নাই—এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে আমায় উদ্ধার কর।

আকাশে সেই মেয়েটী আজিও কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছে, গহনা খুলিয়া ফেলিয়াছে, সিন্দুর মুছিয়াছে, সমস্ত আকাশে কালো চুল মেলিয়া দিয়া বসিয়া আছে।

নীলু সেই রাত্রে পাগলের মত নদীর ধারে বনের মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইল। কখনও দেখে সুন্দরী আগে-আগে চলিয়াছে, সমস্ত পথ আলোয় ছাইয়া গিয়াছে, বাতাসের সর্ব্বাঙ্গে কাহার দেহের পরিত্যক্ত সুবাস! চলিতে-চলিতে সুন্দরী কখনও বা গাছের আড়াল হইয়া যায়; নীলু রুদ্ধনিঃশ্বাসে সেই দিকে ছুটিয়া যায়, কিন্তু আর দেখা পায় না। আবার দেখে, দূরে প্রান্তরের কর্দ্দমাক্ত পথে সেই রমণী পা টিপিয়া-টিপিয়া চলিয়াছে, ভীরু পদ-শব্দও যেন বাতাসের গায়ে মিশিয়া কাণে ভাসিয়া আসে। তারপর চমক ভাঙ্গিয়া যায়, বাতাস শোঁ-শোঁ শব্দে নীলুকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে থাকে, সমস্ত প্রান্তর, নদীতীর, বনভূমি যেন একটা মর্ম্মভাঙ্গা চীৎকারে মুখরিত হইয়া ওঠে: আমি এই পথে শত শত বৎসর ধরিয়া বাঁধা পড়িয়া আছি; মুক্তি খুঁজিয়াছি, পাই নাই—আমায় উদ্ধার কর। সেই উন্মুক্ত আকাশ-তলে দাঁড়াইয়া নীলু চীৎকার করিয়া শুধাইল: তুমি কোথায়? উত্তর আসিল: এইখানে। সমস্ত বনভূমি হইতে সেই উত্তরের প্রতিধ্বনি আসিল। নীলুর কাণে কাণে বেতসী, মাথার উপরের অনন্ত আকাশ, সম্মুখের দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, বনভূমি সকলেই যেন সমস্বরে বলিতে লাগিল: এইখানে, এইখানে—

পরের দিন দ্বিপ্রহরে নীলুকে যখন গ্রামের লোকেরা অনেক খুঁজিয়া বনের এক অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পথে পাইল, তখন তাহার চৈতন্য নাই। তাহারা নীলুকে ধরাধরি করিয়া বাড়ী লইয়া আসিল। বিকাল বেলা মোহনপুর হইতে এক ওঝা আসিল। ওঝা বাঁচিবার আশা দিল, কিন্তু আশঙ্কা করিল যে, স্মৃতিশক্তি বিলোপ হইতে পারে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নীলুর জ্ঞান হইল, কিন্তু সে স্মরণ করিয়া কোনও কথাই কহিতে পারিল না, শূন্য দৃষ্টিতে সারা ঘর যেন কাহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

ওঝা বলিল: এখন যেখানে বন রহিয়াছে, ঐখানে কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এক প্রতাপশালী জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল কেদারেশ্বর রায়। তখন বাংলাদেশে বার-ভূঞার শাসন চলিতেছে। কেদারেশ্বরের স্ত্রী অপর্ণা যেমন ছিলেন রূপসী, স্বামীকে ভালোবাসিতেনও

তেমনি প্রাণের মতন। জমিদার একবার ঐ বেতসী নদীর ওপারে প্রজামহলে গেলেন। সেখানে বিষ দিয়া নায়েব তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। এদিকে অপর্ণা স্বামীর কোন খবর না পাইয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন; কাহারো সহিত কথা কহিতেন না; আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিলেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও বা অর্থহীন প্রলাপ বকিতেন। প্রতি রাত্রে তিনি একলা অন্দর হইতে বাহির হইয়া ঐ পথ ধরিয়া নদীর তীরে আসিয়া বালিয়াড়ির উপর বসিয়া থাকিতেন। একদিন রাত্রে বালিয়াড়ির উপর হইতে পা পিছলাইয়াই হউক আর আত্মহত্যায়ই হউক, তিনি নদীগর্ভে প্রাণ দিলেন। তাহার পর শত-শত বৎসর চলিয়া গেছে। কিন্তু এখনও পূর্ণিমার রাত্রে তাঁহাকে বন হইতে বাহির হইয়া সেই নদীর দিকে আসিতে দেখা যায়।

ওঝার কথাই সত্য হইল, নীলুর স্মৃতিশক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। সে কাহারও সহিত কথা কহিত না, ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ একদিন অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল, গ্রামের লোক তাহাকে আর দেখিতে পাইল না।

তাহার পর বৎসর বহু বার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছে গিয়াছে। চৈত্রে গ্রামের পথে আকন্দ, ঘেঁটু ফুলের মেলা বসিয়াছে, গ্রীষ্মে মোহনপুরের মাঠ তৃষ্ণায় মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করিয়া আশপাশ জ্বালাইয়া পুড়িয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, আবার বর্ষা আসিয়াছে। গভীর রাত্রে বৃষ্টি যখন থামিয়া গিয়াছে, বাতাস মোহাবিষ্টের মত স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, বেতসীর পাড়ভাঙ্গার শব্দ আর শোনা যায় নাই, গ্রামের অনেক লোক রুদ্ধদ্বার গৃহের সুখশয্যায় ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া যেন কাহার মর্ম্মভাঙা চীৎকার শুনিয়াছে: তুমি কোথায়? কোনখানে?

তারপর আবার বাতাস হু-হু শব্দে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, বৃষ্টির শব্দ তাহার সহিত মিশিয়াছে; বেতসীর জলকল্লোল কানে আসিয়াছে, আর কিছুই শুনিতে পায় নাই।

মিলনের অন্তরায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিশ্র বি-এ
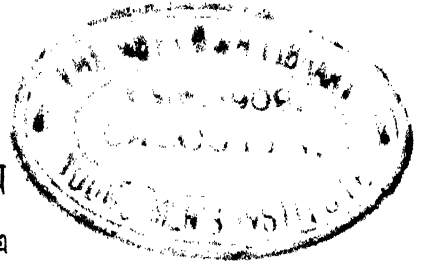
মিলনের বাধা এই দেহখানি মোর
আজিকে ভাঙিয়া ফেল, জীবন-দেবতা।
পরাণের গলে বাঁধি পরাণের ডোর
আজিকে শুনাও মোরে মিলনের কথা।
দেহের কারার মাঝে বাঁধিয়া আমারে
কত, বল, ঘুরাইবে মরীচিকা মত?

ক্ষুধা-তৃষ্ণা সুখ-দুঃখ আলোক-আঁধারে,
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে নিবে টানি' কত?
পারি না সহিতে আর বিরহ-যাতনা;
কাঁদে প্রাণ মৃত্যু-স্নিগ্ধ মিলনের লাগি'।
দেহ সাথে ভস্ম হ'য়ে বাসনা-কামনা,
মুক্তি-লোকে আত্মা থাক্ চিরকাল জাগি'॥

ভুলিতে চাহি না আর মায়ার কাঁদনে।
আত্মারে বাঁধিয়া রাখ আত্মার বাঁধনে॥

চিত্রের প্রাণ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

একটী চিত্র বা আলেখ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, সেই প্রতিকৃতি কি ভাব প্রকাশ করিতেছে তাহা সুস্পষ্ট জানা উচিত। প্রত্যেক প্রতিকৃতিতে এক একটী সুষুপ্ত ভাব, আকার, ইঙ্গিত ও ভঙ্গিমায় প্রকাশ করাই হইল শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মুখ্য উদ্দেশ্য কিরূপ প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, ইহার উপরেই আলেখ্যের উৎকর্ষগত তারতম্য নির্ভর করে। কিন্তু অনেক সময়ে এইরূপ দেখা যায় যে, আলেখ্য ও প্রতিকৃতি বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভিতর কি মুখ্য নিভৃত উদ্দেশ্য তাহা আলোচনা করা হয় নাই বা তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করা হয় নাই। এইরূপ আলেখ্য দেখিলে দ্রষ্টার মন বিষণ্ণ ও ব্যথিত হয়। ইহাকে নিস্তেজ প্রাণহীন আলেখ্য বলে। অধিকাংশ স্থলে নূতন চিত্রকর বা অদূরদর্শী শিল্পী প্রাণহীন চিত্র বর্ণিত করিয়া থাকে।

চিত্রে প্রধান অঙ্গ হইল প্রাণ বা জীবন্ত শক্তি, যাহা দর্শন বা অনুভব করিলে দ্রষ্টার মনে এক নব ভাবের উৎস উথলিয়া উঠে। তিনি আনন্দে বিভোর হন। তাঁহার মন অচিরে উচ্চ স্তরে গমন করিয়া জগৎকে অন্যরূপে, অপর চক্ষুতে দর্শন করিয়া থাকে এবং শিল্পী সুকৌশলে কোন আদর্শ বা কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য বিকশিত করিতে চাহিতেছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিল্পীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তির সঞ্চার হয়। ইহাকেই বলে চিত্রের প্রাণ।

এই প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে শিল্পী ধ্যান-মগ্ন হইয়া, তন্ময় হইয়া নিজের ভিতর সেই প্রাণ-শক্তি জাগ্রত করিবেন। সেই প্রাণ-শক্তি বা চৈতন্য-বোধ শিল্পীর ভিতর যে ভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে, যত স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিবে, শিল্পীর তুলিকাও বর্ণ-সংযোগে আলেখ্য বা প্রতিকৃতির ভিতর তাহা তেমনিভাবে সন্নিবেশ করিবে। শিল্পী সুষুপ্ত অবস্থা হইতে প্রাণকে যেমন যেমন প্রবুদ্ধ করিতে পারিবেন, ঠিক সেইরূপ প্রাণের প্রতিকৃতিই তাঁহার চিত্রে প্রকটিত হইবে। শিল্পী এই অবস্থায় স্বয়ং বিভোর তন্ময় হইয়া যান ও ভূতগ্রস্তের ন্যায় রেখা ও বর্ণ যোগ করেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রেরণার মর্ম্মও অনেক সময়ে সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করিতে পারেন না, কারণ বিচার-বুদ্ধি তাঁহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে না। জগতে যে সব বিশিষ্ট চিত্র বিরচিত হইয়াছে, তাহাদের শিল্পী স্বয়ং তন্ময় বা ভাবাবিষ্ট হইয়াই সেই সমুদয় অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, গভীর ধ্যান ও চিত্রাঙ্কন একই ব্যাপার। উভয় ক্ষেত্রে একই প্রকার মানসিকবৃত্তি। গভীর ধ্যানে একটী বা যুক্ত ভাব রূপ গ্রহণ করিয়া স্পষ্টতঃ সম্মুখে প্রতীয়মান হয়, সেই ধ্যানাবস্থায় দৃশ্যমান রূপে বর্ণ, অবয়ব, সৌষ্ঠব সকলই পরিলক্ষিত হয় এবং ধ্যানী পুরুষ বিভোর হইয়া ক্রমশঃ সমাধির অবস্থায় উপনীত হন। সে সময়ে তাঁহার দেহ-জ্ঞান, স্থান-জ্ঞান, কাল-জ্ঞান কিছুই থাকে না, কেবল মাত্র অভীষ্ট ভাবটী বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত থাকে এবং ধ্যানী একপ্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়া শুধু ধ্যেয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাকে সাধারণ ভাষায় ইষ্ট-দর্শন বলা হয়। ভক্তির ভাষায় যাহা ইষ্টদর্শন বা দেব-দর্শন বলিয়া উক্ত হয়, দার্শনিকের ভাষায় তাহাই অধ্যাস নামে সুপরিচিত। ধ্যানের নিবিড় ঘন অবস্থায়, সূক্ষ্ম বা কারণ শরীরে যে সকল প্রক্রিয়া হইতেছে, তাহা চিত্তাকাশে প্রতিবিম্বিত হয়। আর চিদাকাশে বা অরূপ গুণাতীত অবস্থায় নিজ শক্তি উপর্য্যুপরি দর্শন করিলে তাহাও ক্রমে রূপ ধারণ করে এবং উপরে বর্ণ-সংযুক্ত হয়। ঊর্দ্ধস্তরই চিদাকাশ এবং তন্নিম্ন অবস্থাকে চিত্তাকাশ বলে। এই চিত্তাকাশে অভীষ্ট ভাব প্রতিবিম্বিত হয়। ইহাকে দার্শনিক মতে অধ্যাস বা super-imposition, কখনও কখনও ভাব-দর্শন বা visualisation of the ideaও বলা যায় এবং ভক্তির ভাষায় তাহাই ইষ্ট-দর্শন।

এই হইল সাধারণ ধ্যানের প্রক্রিয়া। ভক্তিমান্‌ বা জ্ঞানীলোক এই অবস্থায় যাইতে সতত প্রয়াস করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত চিত্রকর এই অবস্থায় মন বা

অন্তরাত্মাকে উত্তোলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখেন, যেরূপ ভাব ভঙ্গী, যেরূপ গঠন, যেরূপ নেত্রের দৃষ্টি, যেরূপ বল তাহাই পটের উপর বিভোর অবস্থায় অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ইহাই হইল প্রকৃত আলেখ্য। এইরূপ চিত্রেই প্রকৃত প্রাণ-সঞ্চার হয়।

বিগ্রহ-পূজা-কালে আমরা দেখিতে পাই যে, সকল দেবতারই পূজার পদ্ধতি একপ্রকার, কেবল মাত্র ধ্যানের অংশ বিভিন্ন। এক এক বিগ্রহের এক এক ধ্যান আছে। সেই ধ্যানানুযায়ী এই বিগ্রহের অবয়ব নির্ণীত হইয়াছে। কোন ধ্যানী মহাপুরুষ ধ্যানাবস্থায় সম্মুখে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে বিভোর হইয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন; পরে অন্তেবাসিগণকে তিনি তদ্রূপ ধ্যান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে সেইরূপ ধ্যান করিলে অভীষ্ট মূর্ত্তির দর্শন মিলিবে। কালক্রমে সেই পূর্ব্বশ্রুত উপদেশানুযায়ী জড়বস্তু দিয়া তাহার প্রতিকৃতি রচিত হইল। এইরূপেই বিগ্রহ-নির্ম্মাণের সূচনা। মূর্ত্তি-শিল্পীকে নির্ম্মাণকালে সেই বিগ্রহের ধ্যান স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। শিল্পী কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা দিয়া বিগ্রহের রূপ নির্ম্মাণ করেন। ধ্যানীর অবস্থা হইল—প্রথম ধ্যান, তাহার পর রূপ-দর্শন, তাহার পর সাধারণের জ্ঞাপনার্থে জড়বস্তু দিয়া প্রতিকৃতি কল্পনা। কিন্তু কালক্রমে তাহার বিপরীত প্রণালীতে প্রথমে জড়বস্তুতে রূপদর্শন করিয়া, পরে উচ্চতর ধ্যানের অবস্থায় পৌঁছিবার প্রয়াস চলিল—ইহাই হইল সাধারণ দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রথা।

চিত্রশিল্পেও ঠিক এই প্রকার মনোবৃত্তি পরিচালিত হয়। ধ্যানী যে ইষ্টরূপের উচ্চাঙ্গ ধ্যানে আত্মসমাহিত করিয়া মুক্তপুরুষ হন, শিল্পীও সেই বস্তু পটে প্রতিবিম্বিত করিবার প্রয়াস করেন। এইজন্য শিল্পীকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ধ্যানী হইতে হয়। ইহাই প্রাণসঞ্চারণার মূল। এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ধ্যানী ব্যক্তি অভীষ্ট রূপদর্শন করিয়া বিভোর হইলেন, শিল্পী তাহা প্রতিবিম্বিত করিবার প্রকাশ করিলেন, আর দার্শনিক তাহার কারণ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইলেন। দার্শনিক প্রশ্ন তুলিলেন—এই যে রূপ নেত্রগোচর হইতেছে, যাহা স্পষ্ট দেখিতেছি, তাহার কারণ কি? তিনি এইস্থলে অপর পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধ্যানী ও শিল্পী উভয়ের মধ্যেই কিঞ্চিৎ ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব আছে, যাহাকে ললিত ভাব বলা যায়, অর্থাৎ Sentiment-এর আভাস আছে। কিন্তু দার্শনিক এই ললিত ভাব বা Sentimentকে একেবারেই বিদূরিত করিলেন। অপর দুই ব্যক্তি যেমন বিগ্রহ দেখিয়া অভিভূত হন, দার্শনিক সে ভাবে অভিভূত হন না; নির্ম্মম ও নিরপেক্ষ হইয়া তিনি আত্মশক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বিচার করেন।

চিত্রের বা অভীষ্ট রূপের ক্রীড়াসমূহ অর্থাৎ অঙ্গ-সঞ্চালন বা কোনপ্রকার ভাব ভঙ্গী করিয়া কিরূপ অন্ত-নিহিত ভাব উহা প্রকাশ করিতেছে, তাহা তিনি অসংশ্লিষ্ট (detached) হইয়া আলোচনা করেন। ইহাকেই বলে দার্শনিকের মনোবৃত্তি। একই ধ্যেয় বস্তু তিন শ্রেণীর লোক তিন প্রকারে দর্শন করিলেন। ধ্যানী অনেক পরিমাণে গাম্ভীর্য্য ও আত্মসংযমের ভাব রাখেন; কিন্তু সাধারণ ভক্ত যদি ঘটনাক্রমে এই অভীষ্ট রূপ বা ইষ্ট দর্শন করিতে পান, তাহা হইলে অশ্রু, পুলক ইত্যাদি চাপল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বিলুণ্ঠিত হন। ভক্তের পক্ষে ইহা উচ্চাঙ্গের অবস্থা হইতে পারে; কিন্তু দার্শনিক বা গভীর ধ্যানী এই সকল ভাবোচ্ছ্বাসকে চাপল্যের ক্রিয়া বা জ্ঞানের অন্তরায় বলিয়া পরিত্যাগ করেন। এইজন্য দার্শনিক ও ভক্তের এস্থলে মিলন হয় না। এখানে উদ্দেশ্য যদিও একই ধ্যেয় বস্তু, বহুপ্রকার লোক তাহা বহুভাবে দর্শন করিতেছেন এবং অপরের নিকট স্বীয় অনুভব প্রকাশ করিতে প্রয়াস করিতেছেন। পরন্তু শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, চিত্রের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করা। বর্ণ-সংযোগে পারিপাট্য, রেখাঙ্কনের নিপুণতা বা অন্য কোন প্রক্রিয়া কোন কার্য্যকরী হইবে না, যদি চিত্রে বা আলেখ্যে প্রাণসঞ্চারের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয়। এই প্রাণসঞ্চার করা এবং নিভৃত, অস্পষ্ট এবং অব্যক্ত ভাষায় ইহা চিত্রের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত করাই শিল্পীর একমাত্র লক্ষ্য। চিত্রের সমস্ত তারতম্য এই মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে।

চিত্রাঙ্কন-কালে প্রথমে মস্তক, তাহার পর হস্ত, বক্ষ ও

তনুর অন্যান্য অঙ্কিত করিতে হয়। ইহা হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু চিত্রকর নিজ :মনোমধ্যে একটা বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ করিয়া লন, যদ্দ্বারা চিত্রের সমস্ত ভাবটী প্রস্ফুটিত করেন—ইহাকে ভাবব্যঞ্জক অঙ্গ বা point of emphasis বলা হয়। কেহ বা গ্রীবা বক্র করিয়া এই ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কেহ বা এক বা উভয় হস্ত বিশেষ অবস্থায় সঞ্চালনের ভাব দেখাইয়া হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন; কেহ বা বক্ষ, কটি, কি অপরাংশ দিয়া নিভৃত ভাবটী প্রস্ফুটিত করেন; এমন কি পদ-সঞ্চালন বা পদবিক্ষেপ দিয়াও সমস্ত মনোগত ভাব্ প্রকাশিত হইতে পারে। যথা, দ্রুতপদে কিরূপ গমন করিবে; হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে, হঠাৎ হস্তী ক্ষিপ্ত হইল, সে অবস্থায় আরোহীর কিরূপ মনের অবস্থা হইবে, তাহা চরণ দিয়াই প্রকাশ করা যায়। হর্ষ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি ভাব চরণের নানা ভঙ্গিমা দিয়া প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া এমন কি অঙ্গুলীসঙ্কেত বা চক্ষের দৃষ্টি দিয়াও বহুপ্রকার ভাব বিকাশ করা যাইতে পারে। এই জন্য দৃষ্টির বহুপ্রকার বর্ণনা আছে। এই এক এক প্রকার দৃষ্টি এক এক প্রকার মনের ভাব বিকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটী দিতেছি—ogling, lechering, redolent eyes, askance ইত্যাদি অসিত, সিত, লোহিত, ত্রিভাগ, ভাস্বর, চঞ্চল, মধুর, অধীর, সঞ্চরমান, আয়তেক্ষণ। নাসিকা দিয়াও অনেক প্রকার ভাব দেখান যায়। দাড়ি বা চিবুক যদি সঙ্কোচ বা হ্রস্ব করি, তাহা হইলে হাস্যোদ্দীপক মূর্ত্তি হয়। শিল্পীর এইজন্য ভাবব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিরূপ অবস্থায় কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। এই ভাবব্যঞ্জক অংশ দিয়া অন্তর্নিহিত সুষুপ্ত ভাব প্রকাশ করিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম করিলে চিত্রে দোষ পরিলক্ষিত হয়।

ভাবব্যঞ্জক অংশে যদিও বিশেষ ভাবটী পরিস্ফুটিত করিবার প্রয়াস করা হয়, কিন্তু চিত্রের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও সেই ভাব সঞ্চারিত করা আবশ্যক। এক অংশ দিয়া বিশেষ ভাব পরিস্ফুটিত করিলে দেহের অপর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিরূপ পরিলক্ষিত হয় ও পরিচালিত হইয়া থাকে, এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিপুণ শিল্পীর কার্য্য। যথা, চরণ দিয়া হর্ষ প্রদর্শিত হইতেছে; কিন্তু তদনুযায়ী হস্ত, হস্তের অঙ্গুলী, চক্ষু, ভ্রূ, ললাট, নাসিকা, বক্ষ বা কটিদেশ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইলে ও সঞ্চালিত হইলে সামঞ্জস্য রাখা যায়, তাহা শিল্পীর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। অনেক শিল্পী এইস্থলে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন। অর্থাৎ এক অঙ্গ দেখিলে অপর সকল অঙ্গের কিরূপ অবস্থা বা গতি হইবে, তাহা পরিদর্শন করিতে পারেন না। অসামঞ্জস্য হইলে, চিত্রের সৌন্দর্য্য বা প্রাণ স্পষ্ট প্রস্ফুটিত হয় না। একখানি পটের উপর তুলিকা দিয়া বর্ণ লেপন করাকেই চিত্র বলে না। বর্ণ হইতেছে আবশ্যক-অনাবশ্যক অংশ। বর্ণ ত্যাগ করিয়াও উচ্চাঙ্গের চিত্র বিরচন করা যায়। বর্ণ অনেক সময়ে চিত্রের ত্রুটি আবৃত করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে 'আবশ্যক-অনাবশ্যক' অংশ বলিতেছি। কিন্তু রেখা অঙ্কিত করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্য-ভাব রাখা এবং ভাবব্যঞ্জক অংশের সহিত অপর সকল অংশের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা চিত্রের সাফল্যের কারণ হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে চিত্র বিফল হইল। এই সকল কথা চিত্রে বলিবার বিষয় নহে। এই সকল বিষয় শিল্পী গভীর চিন্তা ও ধ্যান করিয়া উপলব্ধি করিলে বুঝিতে পারিবেন; ইহা এত সূক্ষ্ম ও জটিল, যে সব কথা ভাষা দিয়া প্রকাশ করা যায় না।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যভাবের একটী উদাহরণ দিতেছি। চিত্রকর যদি সমস্ত দেহ ও অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দুইটী চরণ অর্থাৎ জানুর নিম্নভাগ ও হস্তধৃত যষ্টির ভূমিসংলগ্ন নিম্নভাগ পরিদর্শন করাইতে পারেন, তাহা হইলে চরণদ্বয়, গুল্ফ ও যষ্টির কিয়দংশ দিয়া অঙ্কিত ব্যক্তির বয়স, মনোভাব, এমন কি সমস্ত মনোভাব অস্পষ্টভাবে পরিদর্শন করা যায়। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর চিত্রে এই ভাবটী বেশ ফুটিয়াছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যের জ্ঞান থাকিলে, এইরূপ চিত্র অঙ্কন করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে চিত্র হইল নীরব ভাষায় সমস্ত সুষুপ্ত মনোভাব প্রকাশ করা। জিহ্বাকৃত শব্দের কোন আবশ্যক নাই। কেবল মাত্র ভাব-ভঙ্গী, চক্ষের দৃষ্টি এবং অবয়বের ভাবব্যঞ্জক অংশ দিয়া সমস্ত মনোভাব প্রকাশ করা যায়।

নাটকে বা কাব্যে যাহা একখানি বড় গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করা যায়, শিল্পী গুটীকতক রেখা অঙ্কন করিয়া তাহাই দেখাইতে পারেন। তুলিকার দ্বারা বর্ণ প্রলেপ করা চিত্রের প্রধান অংশ নহে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, শিল্পী নিজ অন্তরে সুযুপ্ত প্রাণ বা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিয়া অভীষ্ট চিত্রকে মূর্ত্তিমান্ অবলোকন করিবে এবং সেই দৃষ্ট মূর্ত্তি বর্ণ ও তুলিকার দ্বারা পটের উপর আকার ও ইঙ্গিত দিয়া অঙ্কিত করিবে। এ স্থলে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানা আবশ্যক, যে মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী মনের গতি কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিলে, প্রত্যেক ভাবকে প্রত্যক্ষ ও মুক্তিমান্ দেখা যায়। প্রত্যেক ভাবের রূপ, বর্ণ ও অবয়ব আছে। ইহাকে বলিয়াছি ভাবদর্শন বা visualising the ideas. ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ জানেন, রাগ রাগিণীর মূর্ত্তি আছে। সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া রাগ রাগিণী অভ্যাস করিতে হয়। বলিয়াছি, ভক্তি-শাস্ত্রে ইহাকেই ইষ্টদর্শন কহিয়া থাকে।

মনস্তত্ত্বানুযায়ী মন সাধারণতঃ কাম-লোক বা নিম্নস্তরে থাকে; তাহার পর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিলে রূপলোকে অবস্থান করে। তদূর্দ্ধে উঠিলে ভাব-লোকে আসীন হয় এবং তৎস্থান হইতে জ্ঞান-লোকে যায়। তাহার পর আনন্দময় লোক ও অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। এই ষড়বিধ মনের স্তর-বিভাগ আছে। শিল্পী ভাব-লোকে মন উত্তোলন করিলে, অর্থাৎ একাগ্র হইয়া কোন ভাবের ধ্যান করিলে, সেই ভাবটী প্রত্যক্ষ হইয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। শিল্পী ধ্যানাবস্থায় যে মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতেছেন তাহা কখনও সম্যক্‌রূপে অঙ্কিত করিতে পারেন না; কারণ তাহা সম্ভব নহে। তবে কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস দিবার জন্য আকার ইঙ্গিত দিয়া তিনি পটের উপর রেখা অঙ্কিত করেন। শিল্পীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে অভীষ্ট চিত্রটী দেখান নহে। তিনি দর্শকের মনকে প্রথম অবস্থায় নিজের সহিত প্রথম কয়েক ধাপ উর্দ্ধে তুলিয়া দিয়া এবং গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়া স্বয়ং প্রচ্ছন্ন ভাবে অপসৃত হন। এই স্থান হইতে দর্শক নিজের শক্তি অনুযায়ী অর্থাৎ নিজের মন যত দূর তুলিয়াছেন তদনুযায়ী অপর উচ্চ ভাব সকল চিত্রে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। এই হইল প্রকৃত উচ্চ শ্রেণীর চিত্রের লক্ষণ। যদি সম্পূর্ণ ভাবে কোন চিত্র বর্ণিত বা অঙ্কিত হয়, যাহাতে দর্শকের আর কোন আকাঙ্খা থাকে না, পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহাকে photograph বলে; শিল্পীর মাধুর্য্য তাহাতে প্রকাশ পায় না। উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর উদ্দেশ্য হইল—দর্শকের মনে উচ্চ ভাবের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেওয়া। এই স্থলে সাধন-ভজন, ধ্যান ও শিল্প-কার্য্য একই হইয়া যায়। অধিকন্তু শিল্পকার্য্যে কবিত্ব বা মাধুর্য্য শক্তি সন্নিবেশিত হয়, যাহা কঠোর দর্শনশাস্ত্রে প্রকাশ করা যায় না। ভক্তি-ভাবের সহিত চিত্রের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে; কারণ উভয়ই সত্যকে বা উচ্চ ভাবকে মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া দেখিতে চায়, কঠোর রুক্ষ ভাব ইহাদের অভীপ্সিত নহে। এই হইল ভারতীয় উচ্চ শ্রেণীর চিত্রের লক্ষণ-নির্ণয়।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। ইউরোপীয় মতে, বাহ্যজগতে যাহা দেখিব, তাহাই সম্পূর্ণ বিন্যাস করা কর্ত্তব্য, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে—অর্থাৎ প্রকৃতির অনুলিপি মাত্র দিলেই হইল। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, প্রকৃতিতে যে বস্তু নিরীক্ষণ করি, তাহা সম্পূর্ণভাবে কি অনুলিপিত করা যায়? সেই বর্ণ, সেই সেই মুখভঙ্গী কোনপ্রকারেই অনুকরণ করা যায় না। ইহা না প্রকৃতির অনুলিপি হইল, না ভারতীয় উচ্চাঙ্গের চিত্রের ভাব-পরিচায়ক হইল। ইহা কতক পরিমাণে বর্ণ-সংযুক্ত ফটোগ্রাফের কাজ হইল। ইহাতে মনের উর্দ্ধদিকে যাইবার কোন প্রয়াস রহিল না। দর্শন হওয়াতেই মন পরিতৃপ্ত হইল। ভারতীয় ভাবের সহিত ইউরাপীয় ভাবের এইখানেই বিশেষ পার্থক্য আছে। ইউরোপীয় চিত্র গ্রীকদিগের আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রীক ও রোমানদিগের আদর্শ ভারতীয় আদর্শ হইতে বিশেষ ভাবে পৃথক্, উভয়ে মধ্যে বহুধা অনৈক্য আছে। উদাহরণ দিতেছি। একটী গাড়ী রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহার চিত্র অঙ্কণ করিলে বিশেষ কিছু পরিলক্ষণ করা যায় না। কিন্তু পথভ্রান্ত গাড়ী কিরূপ

মুখ উত্তোলন করিয়া যাইতেছে, ইহার চিত্র দেখিলে সকলে বিমোহিত হয়। এস্থলে ইহা মনে রাখা আবশ্যক, যে, প্রকৃতির গাড়ী অঙ্কিত হইতেছে না; কিন্তু শিল্পীর গাড়ী অঙ্কিত হইতেছে। শিল্পী নিজ মনকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, এক অংশে পথভ্রান্ত গাড়ী-রূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং অপর অংশে শিল্পীরূপে তাহা অঙ্কন করিতেছেন অর্থাৎ এরূপ পথ-ভ্রান্ত হইলে শিল্পীর কি প্রকার মন, কিরূপ চক্ষু হয়, তাহা গাড়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। পক্ষান্তরে, শিল্পী স্বয়ং পথ-ভ্রান্ত গাড়ীরূপ ধারণ করিয়াছেন। অপর একটা উদাহরণ দিতেছি। বৃক্ষ মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। সকলে দেখিতেছে। কিন্তু শিল্পী শোকার্ত্ত বা হৃষ্ট বা বিমর্ষভাবে নহে—বৃক্ষ দর্শন করিলেন ও অঙ্কিত করিলেন। শিল্পীর বৃক্ষটী যেন শিল্পীর মন ও ভাব অনুযায়ী হৃষ্ট হইতে পারে, শোকার্ত্ত হইতে পারে, ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব ধারণ করিতে পারে। বৃক্ষ হইতে পুষ্প পড়িতেছে, ইহা ত সাধারণ ব্যাপার। কবি বলিলেন যে, বৃক্ষ শোকার্ত্ত হইয়া পুষ্প আভরণ উন্মোচন করিল। ইহাও যেমন কবিত্বের পরিচায়ক অর্থাৎ কবির মনোভাব বৃক্ষ দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, শিল্পীও সেইরূপ নিজ মনোভাব বৃক্ষ দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্থলে ইউরোপীয় বর্ণ-মিশ্রিত ফটোগ্রাফের সহিত ভারতীয় ভাবের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এইরূপে সায়ংকালে গিরিশৃঙ্গ-দর্শনে যেন কোন ধ্যানী পুরুষ মহাসমাধি-মগ্ন। ইহাই হইল চিত্রের ভিতর কবিত্ব-শক্তি অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুকে শিল্পীর ভাবানুযায়ী অপরূপ ভাবে দর্শন। ইহা না হইলে উচ্চাঙ্গের চিত্র-রচনা হইল না।

সংক্ষেপে বলিলে—শিল্পী আপনার অন্তর মধ্যে প্রাণকে সচেতন করিয়া চিত্রে সন্নিবেশিত করিবেন। এই প্রাণপ্রদর্শনই হইল চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি চিত্রের ভিতর প্রাণসংযোগ না হয়, তাহা হইলে সেই চিত্র প্রাণহীন মৃত শিল্প। বর্ণ বা রেখার সহিত ইহার কোন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ নাই। বর্ণ রেখা কেবল মাত্র আনুষঙ্গিক বস্তু; কিন্তু প্রাণ একটী স্বতন্ত্র বস্তু। যে সকল চিত্র জগৎ মধ্যে জীবন্ত চিত্র বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে, সেই সকল চিত্রের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে একটী প্রাণ বা জীবন দেখা যায়। শিল্পীর উদ্দেশ্য হইল নিজের ভিতর প্রাণ প্রবুদ্ধ করিয়া চিত্রে তাহা সন্নিবেশিত করা এবং উপযুক্ত দর্শক বা ধ্যাননিরত ব্যক্তি এই চিত্র দর্শন করিলে চিত্রে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থাপিত প্রাণ সেই দর্শকের ভিতর সুষুপ্ত প্রাণকে জাগরিত করিবে। তাহা হইলে যোগ্য দর্শক চিত্রের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এক কথায়, শিল্পী প্রাণ বা জীবন্ত শক্তি চিত্রে সন্নিবেশিত করিবেন এবং চিত্র হইতে দর্শকের ভিতর সেই প্রাণ সঞ্চারিত হইবে। এই প্রাণ বা জীবন্ত শক্তি সাধারণ চিত্রে দেখা যায় না, কেবল মাত্র উচ্চাঙ্গের চিত্রে বা প্রতীকেই পাওয়া যায়। এইরূপ ভাব-সংযুক্ত চিত্র বর্ণ দিয়া বা প্রস্তর দিয়া গঠিত হইতে পারে। দর্শকের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করাই উদ্দেশ্য; কেবল প্রস্তর বা বর্ণ তাহার আধার শক্তি বা Medium of transmission. শিল্পী ও দর্শকের এই বিষয়টী বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। কোন চিত্র চিরস্থায়ী ও প্রশংসনীয় হইল এবং অপরখানিতে কোন প্রাধান্য আসিল না—এই প্রাণ-সঞ্চারই হইল তাহার প্রধান কারণ। এই প্রাণেরই অপর নাম সুষুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে হিন্দু-সম্মেলনের সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের অভিভাষণ

পশ্চাতে পূর্ণমানবতার নিষ্কম্প ভিত্তিতে অধ্যাত্মবলে সুপ্রতিষ্ঠিত, পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণের জগদ্বরেণ্য আদর্শ-রাজি, সম্মুখে জড়বিজ্ঞানের নবীনালোকে সমুদ্ভাসিত প্রতীচ্য সভ্যতার প্রলোভনময় আপাতমনোহর বিচিত্র চিত্রাবলী—এই দুই'এর মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি আমরা—আত্মকলহে বদ্ধপরিকর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হিন্দু-জনতা অর্থাৎ ভারতীয় ২৫ কোটি হিন্দু নর নারী। প্রাণধারণের অনুকূল জীবিকাসংগ্রহের জন্য যে অনিবার্য্য পৃথিবী-ব্যাপী জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে—দ্রুতপদে অগ্রসর না হইলে, তাহাতে পরাজয় এবং তাহার ফলে জাতীয় ভাবে ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্দ্ধান অবশ্যম্ভাবী। অন্য দিকে পশ্চাতের পুণ্য ও মঙ্গলময় আদর্শরাজিকে চিরবিস্মৃতির অগাধ সমুদ্রে বিসর্জ্জন দেওয়াও অসম্ভব এবং তাহা নবোদ্বুদ্ধ জাতীয় জীবনগঠনের অনুকূলও নহে। গৃহবিবাদে ও আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীনতায়, সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হইবার শক্তিও নাই—ধর্ম্মমূলক জাতীয় শিক্ষার ঐকান্তিক অভাবে, পশ্চাতের চিরন্তন পুণ্য আদর্শ-রাজির প্রতি শ্রদ্ধাও ক্রমশই ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইতেছে বলিয়া পশ্চাতে অকম্পিত-মনে ফিরিবার সামর্থ্যও নাই—এমন সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়া আমরা কি করিব? কেমন করিয়া জাতীয় জীবন রক্ষা করিব? ইহাই হইল ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে বর্ত্তমান কঠোর সমস্যা। এই সমস্যার শীঘ্র সমাধান ব্যতিরেকে সমগ্র হিন্দু-জাতির শ্রেয়ঃ ও শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহা এক্ষণে অভিজ্ঞ হিন্দুমাত্রেই বুঝিতেছেন, এবং বুঝিতেছেন বলিয়াই আজ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রেরণায় এই চন্দননগরে পুণ্য ভাগীরথীতীরে নিখিল বঙ্গীয় হিন্দু-সম্মিলনের এই শুভ অধিবেশন।

আত্মশক্তির প্রতি ঐকান্তিক অবিশ্বাস ও তন্মূলক অবসাদই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অবনতির মূল কারণ এবং সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের দুরপনেয় প্রতিবন্ধক। এই সর্ব্বনাশকর অবিশ্বাস ও অবসাদকে সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় জীবন যে অচিরে বিধ্বস্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই—এই কথাই আপনাদিগকে জানাইবার জন্য আজ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। বহুকাল-ব্যাপী ভগ্নস্বাস্থ্যের ও বার্দ্ধক্যের বলবত্তর বাধার প্রতি লক্ষ্য করি নাই। আশা করি, আপনারা আমার এই ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠের করুণ নিবেদনের প্রতি কিয়ৎ কালের জন্য অবধান-দানে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

বহু দূরের অতীত যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত হিন্দু সভ্যতার বা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী ইতিহাসের পরিচয় যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন—হিন্দু অন্যধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ-পর নহে; কাহারও সহিত বিরোধ না করিয়া, শান্তভাবে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিলেই হিন্দু আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করে। হিন্দুর বিশ্বাস, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, প্রত্যেক মানবের নিজ নিজ প্রকৃতির অনুকূল ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-লাভ হইয়া থাকে। তাহার সেই ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়াকে হিন্দু পাপ কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। এই উদার ধর্ম্ম-

নৈতিক মতই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের সনাতনত্বের ব্যবস্থাপক।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬।
—গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়।

নিজ নিজ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিয়াই মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, নিজ প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানব কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে তাহাও শুন। যিনি সকল প্রাণীর প্রবৃত্তিকে উৎপন্ন করেন, যিনি সংসারের সকল বস্তুতেই ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই শ্রীভগবান্‌কে নিজ কর্ম্মের দ্বারা অর্চ্চনা করিলেই মানব সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

হিন্দুর নিকট সনাতন ধর্ম্মে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে কোন পার্থক্য নাই। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ স ধর্ম্মঃ" যাহার দ্বারা মানবের অভ্যুদয় ও নিরতিশয় শ্রেয়ঃসিদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ দ্বারা অধিকারীর পক্ষে স্ব স্ব প্রকৃতির অনুকূল শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না—ইহাই হইল সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার উপদেশ। সুতরাং এই উপদেশানুসারে পরিচালিত সনাতনধর্ম্মী হিন্দুর সহিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কোন মানবের বিরোধ নাই, থাকিতেও পারে না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত বিরোধ বা সঙ্ঘর্ষ না থাকিলেও, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ আজ সমগ্র ভারতে হিন্দুর সহিতই ধর্ম্মমত লইয়া হিন্দুর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে এবং নানা কারণে এই বিরোধ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া আজ হিন্দু জাতিকে গৃহবিবাদে ও প্রতিবেশি-বিরোধে দুর্ব্বল করিতেছে। এই বিবাদ, এই মতানৈক্য ও এই স্বজনবিচ্ছেদ কিসে প্রশমিত হয় এবং তাহা দ্বারা হিন্দুর লুপ্তপ্রায় সঙ্ঘশক্তির কিসে পুনরুদ্বোধন হয়, তাহারই নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমরা এই সম্মিলনীতে সম্মিলিত হইয়াছি—ইহা যেন আমাদের মধ্যে কেহ বিস্মৃত না হন, ইহাও আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন।

যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না বা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজের ইচ্ছানুসারেই বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত এই হিন্দু সম্মিলনের ঐকমত্য আমি সম্ভবপর বলিয়া মনে করি না। কিন্তু, যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত উপায় ব্যতিরেকে হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না—এই বিশ্বাস যত্নের সহিত হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, অথচ নানা কারণ বশতঃ বিরাট্ হিন্দুশাস্ত্রসমূহের সমুচিত অনুশীলন করিয়া তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অপারগ—তাঁহাদিগের সমক্ষে শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ এবং তাহার নিগূঢ় রহস্য বুঝিবার সাধনসামগ্রী কি প্রকার, তাহার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান সমস্যার সার্ব্বজনীন মীমাংসা কি হইতে পারে—তাহারই নির্ণয়ের জন্য এই সম্মিলনের আয়োজন। ইহা শাস্ত্রবিশ্বাসী ধর্ম্মমূলক জাতীয় অভ্যুদয়কামী বঙ্গীয় হিন্দুজনসাধারণের সম্মিলন, ইহা আমাদের সকলেরই মনে রাখিতে হইবে।

শাস্ত্র আমাদিগকে স্পষ্টভাবে—নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিয়া দিতেছে—যাহার সেবা করিলে আমাদের সর্ব্বপ্রকার ঐহিক অভ্যুদয় ও পরিশেষে নির্ব্বাণপরমা শান্তি লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রের এই উপদেশ, ইহাই যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিতই অঙ্গীকার্য্য যে, আমরা যথার্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবে করিতেছি না বা ইচ্ছা থাকিলেও করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি তাহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা—বাঙ্গালী হিন্দু—আজ সর্ব্বপ্রকার ঐহিক অভ্যুদয় হইতে এমন শোচনীয় ভাবে বঞ্চিত হইতাম না। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত অভ্যুদয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, ধর্ম্মানুষ্ঠানে কেবল পরকালেই অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, ধর্ম্ম সুখে ও শান্তিতে এই ধরাধামে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নহে, উহা কেবল মরণের পর মঙ্গল লাভ করিবার জন্য—এ বিশ্বাস এখনও যাঁহারা হৃদয়ে সযত্নে পোষণ করিয়া থাকেন এবং এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে বদ্ধপরিকর, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাঁহাদেরই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান ভারতের প্রকৃত মনোভাব নহে।

শাস্ত্র বলিতেছে—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্—আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সাধন। অরোগী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে না পারিলে, ধর্ম্ম ও অর্থ, কাম ও মোক্ষের কোনটীই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের—শুধু হিন্দুশাস্ত্রের কেন?—সকল মনুষ্যসমাজের ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ। বাঙ্গালার হিন্দুজাতির বৃত্তিসঙ্কটবশতঃ অর্থার্জ্জনের সামান্য উপায় ভীতিজনকভাবে উত্তরোত্তর ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বাঙ্গালী হিন্দুজনসাধারণের আবশ্যক জীবিকা সংগ্রহ করিবার শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রাণপণে চেষ্টা করিতেই হইবে। এইরূপ চেষ্টা যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহা না করিয়া পরলোকে কল্যাণ-প্রাপ্তির যাহা সাধন তাহারই অনুষ্ঠান সর্ব্বাগ্রে আস্তিক হিন্দুমাত্রের কর্ত্তব্য, এবং ইহাই বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ত্তমান যুগে একমাত্র ধর্ম্ম, এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোনও বাঙ্গালী-হিন্দু জীবিকাসমস্যার সমাধানকে একান্ত ঐহিক বলিয়া অধর্ম্মবোধে পরিত্যাগ করিবে এবং পরলোকের দিকে চাহিয়াই দিনযাপন করিবে, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে।

এইরূপ বর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়া বাঙ্গালী-হিন্দু বর্ণাশ্রমের যথাযথ অনুষ্ঠান দ্বারা বৃত্তিসাঙ্কর্য্য না ঘটাইয়া আত্মীয়স্বজনের প্রতিপালন করিবে এবং তাহাদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে সনাতন হিন্দু-সমাজের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া পড়িবে—এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজের পরিচালনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতানুসারে বাঙ্গালীহিন্দু-সমাজ চলিতে পারে না, এখনও চলিতেছে না এবং তথাকথিত বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসংস্থাপনের পূর্ব্বে যে চলিবে, তাহারও কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

জীবনসঙ্কটে পড়িলে জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের ও শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন করিতে পারে—এইরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। ইহা হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ সকলেই প্রায় একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। শূদ্রও স্ববৃত্তি-দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে না পারিলে বৈশ্যবৃত্তি বা কোন কোন ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, ইহাও ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই—আজ বাঙ্গালী-হিন্দুর যে বিরাট্ দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহার প্রতিকারার্থ আমাদিগকে বাধ্য হইয়া নূতন নূতন বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ বৃত্তিবিনিময়কে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই আপদের দিনে আপদ্ধর্ম্ম গ্রহণ বাঙ্গালার হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং তাহা ঋষিগণেরও সর্ব্বথা অনুমোদিত, সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে বর্ণ বা আশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয়-ভয়ে বাঙ্গালী হিন্দুগণের পক্ষে জীবিকার্জ্জনের অনুকূল কোন প্রকার বৃত্তিই পরিত্যাজ্য নহে। যাহাতে আমাদের মধ্যে চাকরীর স্পৃহা কম হয়, কৃষি ও বাণিজ্য করিবার জন্য প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, তাহাও আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

উপায়ান্তর না পাইয়া অন্নসংস্থানের জন্য এই বিপদের দিনে যে কোন ব্যবসায়ই ব্যক্তিগতভাবে বা মিলিতভাবে অবলম্বিত হইলে তাহা নিন্দনীয় নহে; প্রত্যুত চাকরী করা অপেক্ষা তাহা শতগুণে শ্রেয়স্কর এবং সর্ব্বথা হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরূক থাকা উচিত। গৃহস্থাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রতিপালনের জন্য সকল হিন্দুরই এই বৃত্তি-সঙ্কটের দিনে জীবিকার্জ্জনের অনুকূল নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা বৈশ্যবৃত্তির প্রসারণ এবং ধর্ম্মরক্ষার্থ অত্যাচার-পর প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বল ও বিপন্ন নর-নারীকে রক্ষা করিবার জন্য, হিংসা, ক্রোধ ও দম্ভবর্জ্জিত আত্মত্যাগমূলক ক্ষাত্রবৃত্তির অবলম্বনও একান্তভাবে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই নাম গুণগত বৈশ্য ও ক্ষাত্রবৃত্তি। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর জাতীয় অস্তিত্বের রক্ষণ যে এইরূপ আপদ্ধর্ম্মের অবলম্বনের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা কি আজ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে?

মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে লিখিয়াছেন 'সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌযুগে'—আমরা কিন্তু বেদব্যাসের এই উপদেশের প্রতিকূল আচরণই করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে সঙ্ঘশক্তিগঠনের যাহা প্রতিকূল, তাহাকেই আমরা সনাতনধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইতে উদ্যত। আর সঙ্ঘশক্তি-গঠনের যাহা অনুকূল, তাহাকেই অধর্ম্ম বলিতে সঙ্কোচ

বোধ করি না—সঙ্ঘশক্তি ব্যতিরেকে জাতির জীবনরক্ষার আর কোন উপায়ই আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে, শাস্ত্রও কলিযুগে সঙ্ঘশক্তিকেই ত্রিবর্গ-সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। আমরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে জাতিগত-বৃত্তিগত-শিক্ষাগত-দীক্ষাগত-প্রতিষ্ঠাগত ও পদমর্য্যাদাগত উৎকর্ষাপকর্ষের প্রাচীরকে দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর—দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া এই শতধা-বিভক্ত জাতিকে আরও সহস্রধা বিভক্ত করিতেছি, একান্ত অবলম্বনীয় সঙ্ঘশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছি এবং তাহাতে কোন প্রকার সঙ্কোচও বোধ করিতেছি না। আমাদের এই প্রকার ধর্ম্ম ও লোকবিরুদ্ধ মনোবৃত্তিই আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রবল প্রতিবন্ধক।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায় স্মরণাতীত-কাল হইতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রানুশীলন করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ তাঁহাদেরই উপদেশানুসারে এপর্য্যন্ত যাবতীয় ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। গুরুতা, পৌরোহিত্য ও শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থাদান ও শাস্ত্রপাঠার্থী ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে প্রাত্যহিক আহার এবং বাসস্থান দানের সহিত যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যাপন—এই কয়টী ধর্ম্ম-সংরক্ষণের অত্যাবশ্যক সাধন-স্বরূপ কার্য্য ইঁহারাই করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে ইঁহাদের সকল কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া জন-সমাজে ইঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য, বহু পাশ্চাত্য-শিক্ষিতঃ ব্যক্তিই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়; আমার বিবেচনায় ইহা হিন্দু-সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ব্যাপার। জ্ঞানগরিমোদ্দীপ্ত, আত্ম-ত্যাগোদ্ভাসিত, স্বেচ্ছায় অঙ্গীকৃত দারিদ্র্য ও সনাতন-ধর্ম্মরক্ষার্থ ঐকান্তিক আগ্রহ বঙ্গের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সম্প্রদায়কে হিন্দু-সমাজের রক্ষকের গৌরবান্বিত পদে অনাদিকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। মতের ঐক্য হইল না বলিয়া ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত, বা স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করিয়া ইঁহাদিগকে ছাটিয়া ফেলিয়া সমাজসংস্কারের চেষ্টা করা হিন্দুমাত্রেরই গর্হণীয় কর্ম্ম। কালবশতঃ ক্ষাত্র, বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম্মের পতনের সঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ও শূদ্রের গুরু, পুরোহিত ও অধ্যাপকের নানা প্রকার ত্রুটি সম্ভবপর ও স্বাভাবিক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ না থাকিতে পারে। তাঁহাদের সেই ত্রুটির পরিহার যাহাতে হয়—তাঁহাদের সমাজনেতৃত্বশক্তি যাহাতে সর্ব্বজন-স্বীকৃত ভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাঁহাদের পুণ্য-কার্য্যের দ্বারা হিন্দু-সমাজ ব্যাপকভাবে যাহাতে লাভবান্ ও শক্তিসম্পন্ন-হইতে পারে, তাহারই জন্য আমাদিগের এই সময়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। অভ্যুদয়কামী শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের যথার্থ নেতার কার্য্য তাঁহারা যাহাতে অনায়াসে ও নিঃসঙ্কোচে সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের গৌরব ও সারবত্তাকে জাজ্জ্বল্যমানভাবে হিন্দুজনসাধারণের সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুমাত্রের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

মহাত্মা গান্ধিজীর হরিজন আন্দোলনে এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সহিত সংস্কারকামী নব্য হিন্দুজনতার বিরোধ সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা যে বর্ত্তমান সময়ে কোনরূপেই স্পৃহণীয় নহে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই স্বজাতি-বিরোধের ভয়াবহ দুর্দ্দিনে উভয় পক্ষকেই সাবধান হইতে হইবে। বহু শতাব্দীর উপার্জ্জিত সংস্কারকে কোন মনুষ্যসমাজ এক দিনেই সমূলে উৎপাটিত করিয়া উরগ-ক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিবে—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অপরদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রাবল্য যেরূপ অপ্রতিবিধেয় ভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে তথাকথিত নিকৃষ্টকুলে দৈববশতঃ জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া মনুষ্যতার দৃষ্টিতে মানুষ তথাকথিত উৎকৃষ্ট জাতিতে সমুৎপন্ন অপর মানুষ অপেক্ষা অনন্তকালের জন্য নিকৃষ্ট ও অস্পৃশ্যই থাকিয়া যাইবে—এইরূপ যে অপরিবর্ত্তনীয় সিদ্ধান্ত, ইহা মনুষ্য-কৃতই হউক বা সাময়িক শাস্ত্রকৃতই হউক, সর্ব্বথা সর্ব্বজনের নিকট সমাদরণীয় হইতে পারে না—ইহাও অবিসংবাদিত সত্য। এরূপ সমস্যার সমাধানে হিন্দু সমাজের একটী বিশিষ্ট রীতি আছে। শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই ইতিহাস-প্রমাণিত রীতির অবলম্বনে

বাধা ঘটাতেই বর্ত্তমান সমাজে এত প্রকার আলোড়ন। সমাজ আত্মস্থ, আত্ম-সমাহিত হইয়া যাহাতে সেই রীতির অনুসরণ করিতে পারে—তাহাই আজিকার দিনের প্রধান প্রয়োজন। আইন অথবা সংস্কার-বিরোধী অযৌক্তিক মনোভাব যাহাতে ইহার অন্তরায় না হয়—আজ সমাজনেতৃগণের স্থির ধীর বুদ্ধিতে অযথা দ্বেষ ও পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া তাহারই আলোচনা দ্বারা সমাধান নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার জড়বিজ্ঞান-প্রসূত দেহাত্মবাদের প্রবল আঘাতে, হিন্দু সভ্যতার মূলভিত্তি জন্মান্তরবাদ ও শ্রুতি-প্রামাণ্যে বিশ্বাস উত্তরোত্তর শিথিল হইয়া যাইতেছে -হিন্দু সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থকুল পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছে। জাতীয় শিক্ষার পরিবর্ত্তে কেবল ধনার্জ্জনের অনুকূল হইবে এই আশায় প্রবর্ত্তি বিশৃঙ্খল জাতীয়-ভাব-বিধ্বংসিনী শিক্ষার প্রভাবে—আমাদের সন্তানগণ চরিত্রসম্পদ্‌লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ব্রহ্মচর্য্যের ঐকান্তিক অভাবে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বেই তাহারা স্বাস্থ্যহীন এবং নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইতে বসিয়াছে। অনাবিল যৌবনের উৎসাহ, ধৈর্য্য ও স্বাবলম্বন হইতে তাহারা প্রায় সকলেই বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। স্বধর্ম্মপরায়ণতা ও সর্ব্ব-শক্তিময় শ্রীভগবানের অপার করুণায় দৃঢ়বিশ্বাসের শান্তিময় প্রসন্নতা তাহাদের পক্ষে গগনকুসুম প্রায় হইয়া পড়িতেছে। নিম্নস্তরের তথাকথিত নীচজাতিগণের মধ্যেও দারিদ্র্য ভীষণভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, ভবিষ্যৎ অন্নবস্ত্রের অভাব ভাবনারূপ ভীষণরাক্ষসের করালগ্রাসে পড়িবার বিভীষিকায় তাহার সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া কাল কাটাইতেছে। প্রাচীনকালের যাত্রা, কীর্ত্তন, পাঁচালী ও কথকতা প্রভৃতির অভাব উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাওয়ায়, তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও নৈতিক বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষোচিত সংস্কারসমূহ বিধ্বস্ত-প্রায় হইয়া আসিতেছে, নূতন কোন পথ ধরিবার অনুকূল শিক্ষার ও সামর্থ্যের অভাবে তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। সকল সমাজেই স্বেচ্ছাচারিতা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের প্রিয় ও অভ্যস্ত সকল প্রকার আচার ও অনুষ্ঠানে বিশ্বাস ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ইহা সকলই অদূরভাবী অনির্দ্দেশ্য বিরাট্ সামাজিক বিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ। ইহাই হইল বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা। এ হেন চারিদিকে বিভীষিকাসঙ্কুল সঙ্কটময় অবস্থায় পড়িয়াও আমরা যদি পরস্পরে বিরোধ করিয়াই চলি, সকল দিক্ হইতে বিশ্বাস, প্রেম ও নির্ভরের সুখময়, আশাময় ও শক্তিসঞ্চারক মৈত্রী-বন্ধনে আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া, স্বজাতির রক্ষার ও অভ্যুদয়ের পথকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধরিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া কায়মনোবাক্যে প্রযত্নপরায়ণ না হই, তাহা হইলে বাঙ্গলার হিন্দুজাতি শীঘ্রই কোন রসাতলের অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে পতিত হইবে, তাহা বিধাতৃপুরুষই বলিতে পারেন, আমাদের কল্পনার ক্ষীণালোকে তাহা যথাযথ ভাবে উদ্ভাসিত হইবার নহে।

এই সকল ভয়াবহ বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় এই যে, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে ধার্ম্মিক হইতে হইবে ও হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে সর্ব্বাগ্রে সমুদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহারই প্রভাবে সমগ্র হিন্দু-সমাজকে অধ্যাত্ম শক্তির প্রতি দৃঢ়তর আস্থাসম্পন্ন করিতে হইবে। ইহাই হইল আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এই কথাই আপনা-দিগের সম্মুখে আমার অদ্যকার অভিভাষণের মুখ্য বক্তব্য। কেমন করিয়া সেই বিলুপ্তপ্রায় ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে এই ভারতে পুনরুদ্বুদ্ধ ও দেদীপ্যমান করিতে পারা যায়, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি—তাহা বলা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করি। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ্য। সেই ব্রাহ্মণের স্বরূপ কি? তাহা শ্রীমহাভারতে দেখিতে পাই—

> শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
> নিত্যব্রতী সত্যপরঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
> সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
> তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর, এই দ্বিবিধ শৌচ এবং সদাচারে যিনি সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত, যিনি যজ্ঞশিষ্টভুক্, যাহার সেবা ও অকপট ভক্তিতে গুরুজন প্রসন্ন থাকেন, নিত্যব্রতপরায়ণতা যাঁহার স্বভাব, আর যিনি কায়মনোবাক্যে সত্য প্রতি-

পালন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সত্য, দান, অহিংসা, অনৃশংসতা, অসদাচরণে লজ্জা, সর্ব্বভূতে দয়া এবং তপস্যা যাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

জাতিতে ব্রাহ্মণ না হইয়াও এই সকল গুণভাজন হইলে যে কোন ব্যক্তিই এই মহাভারতোক্ত গুণগত ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে, ইহাই হইল সনাতন হিন্দুশাস্ত্র-সমূহের সিদ্ধান্ত। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকার গুণগত ব্রাহ্মণ্য আমাদের দেশে বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। এই শ্লোক দুইটীতে যে কয়টী গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকারী হইতে হইলে কেবল যে জাতিব্রাহ্মণ-কুলে জন্মের আবশ্যকতা আছে, ইহা কোন. শাস্ত্রগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আমাদের সমাজশরীরে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে এই সকল গুণের ঐকান্তিক অনাদর আসুরভাবকেই সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতির মধ্যে সঞ্চারিত ও দৃঢ়মূল করিবার জন্য নিজের সমগ্র শক্তির প্রয়োগ করিতেছে। এই আসুরভাবের স্বরূপ বর্ণনপ্রসঙ্গে ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরা সুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়ালব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ।
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে ঽশুচৌ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

গীতা ১৬ অধ্যায় ৭—২০।

আসুর-ভাবগ্রস্ত মানবগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বোধক বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে না, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ তাহাদের নাই, সত্যপরায়ণতা তাহাদের নাই, তাহারা বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা কোন বাস্তব তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, ইহা মানে না; এই সংসার কোন পরমার্থ সদ্‌বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা তাহারা বুঝে না। ঈশ্বরের সত্তায় তাহাদের বিশ্বাস নাই, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর ভোগাভিলাষই মানবসৃষ্টির কারণ, ইহাই তাহারা মনে করিয়া থাকে। এই মানবসৃষ্টির প্রতি পূর্ব্বজন্মের কোন প্রকার অদৃষ্টাদি কারণ হইতে পারে না, ইহাই তাহাদের ধারণা। এই প্রকার দৃষ্টির দ্বারা পরিচালিত অল্প বুদ্ধি ঐ সকল আসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন মানব আত্ম-নাশার্থই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহারা ক্রুরকর্ম্ম সমূহে নিয়ত থাকে। তাহারা লোক-শত্রু, লোকসমাজের ক্ষয় যাহাতে হয়—এইরূপ কার্য্যেই তাহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উহাদের দম্ভ, মান ও মদের ইয়ত্তা থাকে না, যাহার পূরণ হওয়া প্রায়ই সম্ভবপর নহে—এইরূপ অভিলাষের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা মোহ বশতঃ নানা প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের ক্রিয়ানিচয় সর্ব্বদাই অশুচি হইয়া থাকে। ইহারা আমরণকাল পর্য্যন্ত ধনার্জ্জনাদি বিষয়ে অসীমচিন্তাপরায়ণ থাকে; ঐহিক সুখভোগই ইহাদের নিকট একমাত্র পুরুষার্থ।

শত শত আশাপাশ দ্বারা ইহারা সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে। ইহারা নিয়তই কামও ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়। পার্থিব-বিষয়-ভোগের জন্য ইহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায়সমূহের দ্বারা অর্থ-সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল মূঢ় ব্যক্তিগণ কেবলই ভাবিয়া থাকে—আজ আমার এই লাভ হইল, কাল আমার অমুক মনোরথ পূর্ণ হইবে, আজ আমি এই সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছি, কাল এত অর্জ্জন করিব, আজ এই শত্রুর দমন করা গেল, ভবিষ্যতে অপর শত্রুগণকেও দমন করিব। আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোক্তা, আমিই সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, আমিই বলশালী আর আমিই সুখী, আমি মহাকুলীন, এ-জগতে কে আমার সমকক্ষ হইতে পারে? আমি দান ও যজ্ঞ করিয়া আনন্দ ভোগ করিব, ইত্যাদি। অজ্ঞানবিমোহিত হইয়া ইহারা কামভোগেই আসক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের চিত্ত নানা বিষয়-চিন্তায় সর্ব্বদা অস্থির থাকে। নিজ অসৎ কর্ম্মের ফলে ইহারা অশুচি-নরকেই পতিত হইয়া থাকে, ধনমানমদমত্ত হইয়াই সময় যাপন করিয়া থাকে। দাম্ভিকতার প্রভাবে ইহারা লোকে আমার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও যশ হইবে, এই বুদ্ধিতে যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সর্ব্বদাই ইহাদের অহঙ্কার হঠকারিতা, দর্প, কাম ও ক্রোধ বিদ্যমান থাকে। ইহারা আত্মদেহে এবং অপর প্রাণিসমূহের দেহে অংশরূপে প্রবিষ্ট আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অপরের গুণোৎকর্ষ ইহারা সহিতে পারে না। এতাদৃশ কঠোর-চিত্ত ঈশ্বর-বিদ্বেষপর নরাধমগণকে আমি এই সংসারে সর্ব্বদাই আসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! ঐ মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং আসুর জন্মে আমাকে লাভ করিতে না পারিয়া উত্তরোত্তর নানাপ্রকার অধম গতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্য নামধেয় মানব-জাতির মধ্যেই এই আসুরভাব বা দেহাত্মাভিমান-মূলক ভোগ-বিলাস-পরায়ণতা ক্রমেই দৃঢ়মূল হইয়া প্রসার লাভ করিতেছে। ইহার পরিণাম ব্যক্তিগত ও জাতিগত হিংসা-প্রবৃত্তি ও পৃথিবীব্যাপিনী অশান্তি। এই বিরাট্ হিংসা-প্রবৃত্তি ও অশান্তিকে বিদূরিত করিয়া ভারতে এবং ভারতকে নিমিত্ত করিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলে সার্ব্বজনীন শান্তি-প্রতিষ্ঠাই সনাতন হিন্দু সভ্যতার প্রধানতম লক্ষ্য। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সেই সার্ব্বজনীন শান্তিপ্রতিষ্ঠা কখনই মানব-জাতির মধ্যে সম্ভবপর নহে। অগ্রে এই শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে যথাসম্ভব গুণগত ও জাতিগত ভাবে যে পর্য্যন্ত সম্যগ্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতির মধ্যে অশান্তির তীব্রবহ্নি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইবে। এই পৃথিবীব্যাপী অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত করিয়া সুখময়, শান্তিময় ও প্রসাদময় বিশ্বজনীন ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের গুরুভার ভারতে হিন্দুকুলে প্রসূত দৈবভাব-সম্পন্ন মানব-সমূহেরই উপর অনাদিকাল হইতে বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইহাই হইল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে, ইহাকে রক্ষা করিয়া ভারতে হিন্দুকুলে পুণ্য জন্মলাভের পরিপূর্ণ সার্থক্য বিধান করিতে হইলে, আমাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ্য-ভাবকে জাগাইতে হইবে ও প্রসারিত করিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জাগরণ ও প্রসারণ হইলেই আবার ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুব্যবস্থিত হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং ইহাই আমার আবাল্য-সঞ্চিত আশা।

হিন্দু যে মোহনিদ্রার বিবশতা ছাড়িয়া শাস্ত্রদর্শিত উদারপথে চলিবার শক্তিলাভপূর্ব্বক বিশ্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জাগরিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতুই নাই। যদি কোন হেতু থাকিত, তাহা হইলে এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির মধ্যে সেদিনও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় মহামন্ত্রের দ্রষ্টা পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ এদেশে জন্মগ্রহণ করিতেন না বা তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য বর্ত্তমান যুগে বিশ্বজনীন শান্তির সর্ব্বোচ্চ পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া স্বামী বিবেকানন্দও আমাদের মধ্যে আসিতেন না বা আসিলেও তাঁহাকে বা শ্রীপরমহংসদেবকে বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাপদেশকরূপে মনে করিয়া সকল মনুষ্যসমাজে তাঁহার দৈব শান্তির বাণী শুনিবার জন্য এত উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল আগ্রহও পরিদৃষ্ট হইত না। পরমহংস দেব ও

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবই যে বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম-জীবনের নবজাগরণে মঙ্গলময় উষার কার্য্য করিয়াছে, ও বাঙ্গালী হিন্দুকে গুণগত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মলাভের অনুকূলভাবে জাগরিত করিয়াছে—তাহার প্রমাণ বঙ্গদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের প্রতিষ্ঠা আর তাহারই সঙ্গে ভারতের নানা প্রদেশে মিশনের শাখাপ্রশাখার প্রতিষ্ঠা ও উত্তরোত্তর প্রসার। পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত আদর্শকে হিন্দুজনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, যথার্থ ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিশ্বজনীনভাবে এই ভারতে পুনঃসংস্থাপনের জন্য আরও নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান বঙ্গের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘের মধ্যে আশীর্ব্বাদ-ভাজন দেশভক্ত স্বজাতিহিতব্রত উদারমনাঃ ত্যাগী ও কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি। এই প্রকার সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান-গুলিই সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে নব জাতীয়জীবন-সঞ্চারণের অনুকূল উৎসাহ ও প্রচেষ্টার নিদর্শন। দেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ত্যাগী, অকপট, পরিশ্রমী ও ধর্ম্মপরায়ণ যুবকবৃন্দের উৎসাহের সহিত এই সকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। এই সকল কর্ম্মী যুবকই ভারতের নবজাগরিত আধ্যাত্মিক জীবনে সনাতন ব্রাহ্মণ্যশক্তির আদর্শকে বর্ত্তমান অবস্থার অনুকূল ভাবে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইবে। কেবল সভাসমিতিতে বক্তৃতা বা সংবাদপত্রে প্রচার করিলেই যে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান আসুরভাবের অনুকূল মতিগতির পরিবর্ত্তন হইবে—এরূপ আশা করা যায় না। এই সকল বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসী কর্ম্মীযুবকসমূহের নিঃস্বার্থ, রাগদ্বেষ-হিংসা-বিরহিত, একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক জীবনের কঠোর সাধন দ্বারা স্বদেশ ও স্বজাতির অকপট সেবা ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্ববিধ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। সুতরাং এই প্রকার প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রতি হিন্দু নরনারী মাত্রের সানুগ্রহ ও সস্নেহ দৃষ্টি একান্ত অপেক্ষণীয়। আমার অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাসের একটী শ্লোক আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি—

সে শ্লোকটী এই—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি সর্ব্বং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

প্রাচীন যাহা কিছু, তাহা সকলই শোভন—ইহা হইতে পারে না। এইরূপ নূতন যাহা কিছু, সে সকলই দোষযুক্ত হইবে, ইহাও হইতে পারে না। সৎপুরুষগণ স্বয়ং ভালমন্দ পরীক্ষা করিয়া যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, মূঢ় ব্যক্তির বুদ্ধিই পরকীয় বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

মহাকবি কালিদাসের এই অমূল্য উপদেশানুসারে চলিবার সামর্থ্য যেন আমাদের অপ্রতিহত থাকে—ইহাই আমার অদ্যকার শেষ নিবেদন। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ !!!

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ চন্দননগর,
১লা পৌষ, ১৩৪০ সাল।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

—বৈচিত্র্য—

স্থূলকায় --- --- পরিবার—

পার্শ্বে যাদের ছবি দেওয়া গেল, এদের বাড়ী লস্ এঞ্জেলেসে—ওয়েষ্ট পরিবার বলিয়া সাধারণতঃ সেই দেশের লোক-সমাজে পরিচিত। পরিবারটীর বৈশিষ্ট্য এই যে পরিবারের ছোট-বড় সকলেই স্থূলকায়—ইহা যেন তাদের বংশানুক্রমিক সম্পদ্। ওয়েষ্ট পরিবারের কর্ত্তা এবং কর্ত্রীর ওজন যথাক্রমে ২৮২ ও ২১০ পাউণ্ড। আঠার বছরের যুবা লিওনার্ড ও ষোল বছরের কৈশোর বার্ণার্ডের ওজন যথাক্রমে ৪১৫ পাউণ্ড ৩৪৪ পাউণ্ড। দু'বছর বয়স্ক এণির ওজন ৩৬ পাউণ্ড এবং জেসি জিনের বয়ঃক্রম মাত্র চার বৎসর, কিন্তু ওজনে ৭৫ পাউণ্ড।

স্থূলকায় পরিবার

এই পরিবারটি এ প্রদেশের কৌতূহলের বস্তু।

শিম্পাঞ্জীর ক্ষৌরকার্য্য—

প্রচলিত দেশী কথায় বলে—'কামালে-জুমালে বর'। সাজ গোছ, পরিপাটি-পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়া কুৎসিৎও নেহাৎ সুন্দর না হইলেও একটু-আধটু চক্‌চকে হয়। চেহারার খানিকটা জলুস যে খুলে তা অস্বীকার্য্য।

ছবির শিম্পাঞ্জীটির আদরের ডাক-নাম ফেলিক্স। সপ্তাহে একবার করিয়া ফেলিক্সের নখ-মুখ কামাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কামাইবার পর উহাকে বন্য বলিয়া বুঝাই মুস্কিল। ক্ষৌরকার্য্যরত ফেলিক্সের ছবি দেওয়া গেল।

শিম্পাজীর ক্ষৌরকার্য্য

নীলগিরি পার্ব্বত্যাঞ্চলে দৃষ্ট হয়। রাত্রিতেই এরা বেশী চলাফিরা করে। উড়িবার সময়ে উহাদের গাংলা পাখার শব্দ শুনিলে মনে হয়, সুদূরে যেন একটা তুফান প্রবাহ চলিয়াছে। এই জাতীয় পোকার মধ্যে ইহারাই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম।

প্রতীচ্য রমণীর অদ্ভুত পেশা

প্রতীচ্য-রমণীর অদ্ভুত পেশা—

এক হাজার কুমীরের নিত্য তত্ত্ব-তালাসি করা তামাসা নয়। প্যারিসের জারাডিনস্ ডি' একলিমেনটেশনে ম্যাদাম ক্রেবিশ কিন্তু সত্যি সত্যি তাই করিয়া থাকেন। এই আশ্চর্য্য নারীর তত্ত্বাবধানে যতগুলি কুমীর আছে তাদের বয়স এক বৎসর হইতে পঁচাত্তর বৎসর হইবে। ম্যাদাম ক্রেবিশ প্রত্যহ নিজের হাতে তাহাদিগকে খাওয়ান, আদর করেন। দীর্ঘ দিনের মধ্যে একটি বারের তরেও আজ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর কোন পোষ্য কর্ত্তৃক দংশিত হন নাই। উহাদের উপর এই অসামান্যা রমণীর প্রভাব যে কতখানি তা এই ছবি দৃষ্টেই অনুমিত হয়।

বৃহদাকার ভারতীয় পোকা

বৃহদাকার ভারতীয় পোকা—

বৃহদাকার এক জোড়া এটলাস পোকার (Atacus atlas) ছবি দেওয়া গেল। এত বড় পোকা সাধারণতঃ

বিরামহীন গতি-যন্ত্র—

নিউইয়র্ক সহরে নূতন ধরণের এমন এক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহার দ্বারা গতিকে অবিরাম রাখা সম্ভব হইয়াছে। এই সমস্যা লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন হইতেই মাথা ঘামাইয়া আসিতেছিল। যন্ত্রটীর কাঁচের নলের চতুর্দ্দিকে যে আর্দ্র তূলার পলিতা জড়ান আছে, তাহার দ্বারা বাহিরের আব্‌হাওয়া হইতে উহা চলিবার শক্তি সংগ্রহ করে। ইহাতে কাঁচের নলের অভ্যন্তরের উত্তাপের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যাহার ফলে উপরিতন কাঁচপাত্রের মধ্যস্থিত ছোট্ট চাকাটি এমন বেগে ঘুরিতে থাকে, যাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ৬৬০ ফিট সূতা কাটা সম্ভব হয়। বস্ত্রশিল্পে এই কল প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে।

বিরামহীন গতিযন্ত্র

ব্যথার স্মৃতি

শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী

মোদের স্নেহ-লতার বুকে
আদর অনুরাগে—
টুকটুকে তোর সোণার মুখে
কপোল রাঙি' ফাগে,
চাঁদের পারা এই তো ছিলি খুকু;
পূর্ণিমা না পূরণ হ'তে—
ডুব্‌লি একি রাহুর সোঁতে,
বাজ্‌লো না কি মোদের দুখে
বেদনা এইটুকু!

কোথা বা তোর পুতুল-খেলা
কোথা বা তোর সাথী—
বিহনে তোর হায় একেলা
খুঁজ্‌ছে আতিপাতি।
ভাব্‌ছে, একি 'চোর পালানো' তোর;
আল্‌নাতে রঙীন্ শাড়ী—
তারও সাথে আজ কি আড়ি,
হাওয়া-ভরা ঘোর এ-হেলা
সইবো কতো ও'র!

মায়ের কোলের দাবীদাওয়া
ছাড়ি' সোহাগ মান—
কোন্ দেশে আজ তরী বাওয়া
তোর এ অভিযান।
কোন্ তটিনীর তট-না-পাওয়া কূলে?
মোদের স্নেহ-সায়র-তীরে
আস্‌বি না কি তেম্‌নি ফিরে',
উঠ্‌বি না সেই স্মৃতি-নাওয়া
ঢেউয়ে দু'লে দুলে!

*　*　*　*

ফুল না হ'তে কুঁড়িটিতেই পড়্‌লি একি ওরে—
চোখের জলের ফোঁটাতে হায় শিউলি সম ঝ'রে!
তোর এ নিঠুর খেলা নাকি তাঁর এ অভিশাপ,
আঁধারে ঘোর ক্ষীণস্থায়ী আলোর পরিমাপ!
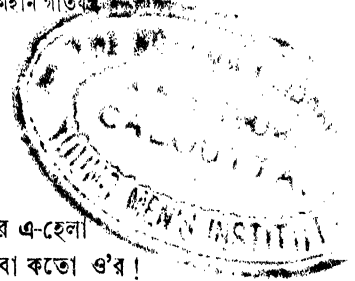
রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান

"রাধানগর"

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বার-এট-ল

কবি গাহিয়াছেন :—

"ধনধান্যপুষ্পভরা,
আমাদের (এই) বসুন্ধরা।
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা।
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

অপূর্ব্ব সেই স্বপ্ন—মধুর তাহার স্মৃতি—পাগল করিয়া দেয় যে গো! সত্যই কি দেয়—কে জানে!

দীর্ঘ শত বৎসর রামমোহন চলিয়া গিয়াছেন, রাখিয়া গিয়াছেন পুণ্য স্মৃতি। তাহার সঙ্গে আরও কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। একদা যাঁহার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া রামমোহন রামমোহন হইয়াছিলেন, রত্ন-প্রসবিনী তাঁহার সেই জননী জন্মভূমিকে সঙ্গে লইয়া তো যান নাই। রাধানগর! পবিত্র রাধানগর। যুগে যুগে কত রত্নই মায়ের কোল আলো করিয়া বসিয়াছে—সে স্মৃতিও মুছিয়া ফেলিবার নহে যে। তাহা যদি হইত—রামমোহনের স্মৃতি-বাসরে এমন করিয়া সে সকল কথা মনে পড়িত কি! বাঙ্গালীর তীর্থ, ভারতের তীর্থ—রাধানগর। সেই তীর্থের পুণ্যকাহিনীশ্রবণেও পুণ্য।

খানাকুল, কৃষ্ণনগর, রাধানগর ও অন্যান্য ৩৩ খানি গ্রাম লইয়া প্রসিদ্ধ খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ। খানাকুল, কৃষ্ণনগর ও রাধানগর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 'জেলা'র সৃষ্টি হইলে, এগুলি বর্দ্ধমান জেলার সীমাভুক্ত হয়। পরে কিছুদিনের জন্য হুগলী ও তৎপরে বর্দ্ধমানের এলেকাধীন হইয়া থাকে। মধ্যে একবার হুগলী ও হাওড়ার অন্তর্গত হইয়াছিল, এখন ইহা হুগলীর অধীন। রাধানগরের প্রান্ত-বাহিনী রত্নাকর নদীর অপর পার্শ্বেই কৃষ্ণনগর গ্রাম।

কৃষ্ণনগর ও রাধানগর এককালে নদীগর্ভে নিহিত ছিল। সে কত দিনের কথা বলা সহজ নহে। নদীগর্ভ হইতে উদ্ভূত গ্রামের স্থানে স্থানে পণ্যবাহী জলযানের অংশ-বিশেষ পাওয়া যাওয়াতে নদী যে নৌ-গম্য ছিল—নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। রামগড় হইতে নির্গত হইয়া এই নদী তখন রূপনারায়ণে মিলিত। নদীর নাম রত্নাকর। 'পাতুল' ও 'ধামলা' বলিয়া খ্যাত দুইটী গ্রাম নদীর দুই পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক প্রণীত খানাকুল, কৃষ্ণনগর ও রাধানগরের ইতিহাসে এইরূপ অনেক কথা পাওয়া যায়। বিস্তৃত জলরাশি নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে স্থলরাশিতে পরিণত কত শত বর্ষে হয়, তাহাও বলা সুকঠিন।

অসাধারণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'ধামাল'—বৌদ্ধদিগের বাসস্থান বা ধর্ম্মঠাকুর ভাঙ্গিয়া—খানাকুল, কৃষ্ণনগর ও রাধানগর গ্রামে সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকের মতে, ধর্ম্মঠাকুরের উৎপত্তি ১১ শতকে। নেপাল হইতে আনীত বৌদ্ধ-সাহিত্যে দেখা যায়—বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন খুব প্রবল, সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুরে পরিণত হয় নাই। এই পরিণতি ঘটে আরও প্রায় ২।৩ শত বৎসর পরে। রাঢ়দেশে তখন উড়িয়াদের প্রভাব খুব বেশী। 'শূন্য পুরাণের' ভূমিকায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এই পুরাণের ভাব ও ভাষা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি' নামে এক প্রাচীন পুস্তকে প্রকাশিত 'দিক্‌ডাক' হইতে বাঙ্গালা ও পারিপার্শ্বিক দেশের তাৎকালীন ভূগোলের অনেক সংবাদ পাঠক পাঠিকা পাইবেন। এই ভূগোলের ব্যাপার ১২০০ হইতে ১৩০০ শতকের মধ্যে

লখিত। ইহাতেও দেখা যায়, ধর্ম্মঠাকুরের উৎপত্তি ১শ শতকে নহে, ১২।১৩শ শতকে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের অস্তিত্ব লোপ পায়। সইরূপ এক ধর্ম্মঠাকুর (ধামাস) ভাঙ্গিয়া খানাকুল, কৃষ্ণনগর ও রাধানগরের উৎপত্তি—উচ্চকণ্ঠে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন। খানাকুল, কৃষ্ণনগর ও রাধানগর সাধারণতঃ 'খানাকুল' বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, পাঠক পাঠিকা স্মরণ রাখিবেন।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযাদবেন্দ্র চৌধুরী। কেহ কেহ বলেন, যাদবেন্দ্র নবাব সরকারে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও সরকারের ইজারাদার ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগের সহিত একমত নহেন। তিনি দেখাইয়াছেন, বক্তিয়ার খিলজী নবদ্বীপ ও গৌড় বিজয় করিলে পর, রাঢ়ের হিন্দু সামন্ত রাজাদের কেহই মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সুচ্যগ্র ভূমি দান করেন নাই। দেশময় অনেক ছোট-ছোট রাজা ছিল। তাঁহাদের দুর্গ, সৈন্য, রাজধানী সকলই ছিল—তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। উড়িষ্যার রাজারা তখন অত্যন্ত প্রবল। মধ্যে মধ্যে তাঁহারাও রাঢ় দখল করিয়া বসিতেন। এক সময়ে রাজা গজপতি পুরুষোত্তম-দেব গঙ্গার পশ্চিম-তীরস্থ প্রায় সকল স্থানই অধিকার করেন। এ সুযোগ-ত্যাগ হিন্দু করে নাই। হিন্দু ও মুসলমান দুই রাজ্যের সীমানায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা 'সমাজ' প্রতিষ্ঠা তাঁহারা করেন। যাদবেন্দ্র তাঁহাদের একজন। 'খানাকুল-সমাজ'-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে—শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"যে চৌধুরী মহাশয়েরা কণাদ তর্কবাগীশ ও বাঁড়ুয্যে ঠাকুরকে ১৫০ বিঘা করিয়া ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেন, না হ'লে তাঁহাদের ভূমিদান সিদ্ধ হইবে কেন? শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মতের পোষকতাই করে—নবাব-তোরণ-ভঙ্গ করিয়া রাধাবল্লভ জীউর সিংহাসন-গঠনে যাদবেন্দ্রের প্রস্তর আনয়ন করার কিংবদন্তী। অভীষ্ট দেবতার প্রত্যাদেশে সিংহাসন নির্ম্মিত হয়, কিন্তু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বেই নবাব-সৈন্য কর্ত্তৃক যাদবেন্দ্র আক্রান্ত ও নিহত হন। কিংবদন্তী—যাদবেন্দ্রের ছিন্নমুণ্ড ভূমিতে পড়িয়াও আক্ষেপ করে:

"বড় সাধ রইল মনে
রাধাকান্ত রাধাবল্লভকে বসাতে পারলুম নি নবরত্নে।"

এ আক্ষেপোক্তি মন্দির-প্রাচীরের গাত্রে এখনও খোদিত। 'কাটামুণ্ডু'র কথা কওয়ার কথা শুনিয়া নবাব বিস্ময়-বিমূঢ় হ'ন এবং শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরামকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। যাদবেন্দ্রই উড়িষ্যা হইতে মাইনগরের প্রসিদ্ধ কুলীন বসুবংশীয় সর্ব্বাধিকারীদিগকে আনাইয়া ১৯ পর্য্যায়ের রত্নেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বরকে স্বীয় কন্যাদান পূর্ব্বক রাধানগরে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা করান। সর্ব্বাধিকারী-দিগের সহিত আগম ব্রাহ্মণ রত্নগর্ভও রাধানগরে আগমন করেন।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে খানাকুলে অভিরাম গোস্বামীর আবির্ভাব নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের বহু পূর্ব্বে। কষ্টিপাথরে খোদিত গোপীনাথের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা অভিরাম ঠাকুর স্বয়ং করেন—কৃষ্ণনগরের এক 'খড়ো ঘরে'। বর্ত্তমান মন্দির ১২১৯ সালের। গোপীনাথ জীউর মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে উপাস্য দেবতার অনুসন্ধানে ঠাকুর পাগলের ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান। মন্দির ও মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি দেখিলেই অভিরাম প্রণাম করেন—অমনি বিগ্রহ চূর্ণ হইয়া যায়। সিদ্ধ অভিরামের প্রণাম জাগ্রত বিগ্রহ ভিন্ন অন্য কেহ গ্রহণ করেন সাধ্য কী! শুনা যায়, প্রণাম সহ্য করিয়াছিলেন, বগড়ীর কৃষ্ণরায়। সহ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঁকা ঠাকুর আরও বাঁকিয়া যান। রাধানগরের সর্ব্বাধিকারী-দিগের শালগ্রাম সহিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকান্তও প্রণাম গ্রহণ করেন; কিন্তু শালগ্রাম ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া শীতল-কায় হইলেন। তদবধি শালগ্রাম শীতলানন্দ নামে খ্যাত।

নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হইলে অভিরাম তাঁহার সহিত মিলিত হ'ন। বৃন্দাবনলীলার শ্রীদাম বলিয়াই তিনি খ্যাত। কবি কর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় ইহার উল্লেখ আছে। অভিরামের জীবনী নানা অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। 'ভক্তি-রত্নাকরে' প্রকাশ:—

"শতাবধি লোক যারে নারে চালাইতে,
হেন কাষ্ঠ বংশী করি' ধরিলেন হাতে।"

—'অভিরাম লীলামৃতে' উল্লেখ আছে যে, এ কাষ্ঠ ব্রজ-বালকবৃন্দের মুরলীসমষ্টি। এই 'কাষ্ঠটা'ই মুরলীরূপে ধারণ অভিরাম করেন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' অভিরাম ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের শাখা বলিয়া উল্লিখিত :—

"অভিরাম মুখ্য শাখা, সখ্য-প্রেমরাশি,
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী।"

রত্নাকর নদীতীরে কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী কাজীপুর গ্রাম, অভিরাম গোস্বামীর আগমনের পরে 'শ্রীপাট খানাকুল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রত্নাকর অভিরাম ঠাকুরের কৌপীন ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায় কৌপীনহারার শাপে 'কাণা' হইয়া যায়। শাপমোচন এখনও হয় নাই। নদী স্বল্পতোয়া—দিন দিন শীর্ণকায়া। যাদবেন্দ্রের সময় হইতেই কৃষ্ণনগরের 'গুপ্ত-বৃন্দাবন' খ্যাতি। সে খ্যাতি বর্দ্ধিত করেন—ভক্তকবি ভারতচন্দ্র।

কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য-বংশের আদিপুরুষ কণাদ তর্কবাগীশ বর্দ্ধমান হইতে কৃষ্ণনগরে আসিয়া বসবাস করেন। প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক হইয়া ইনি 'মহর্ষি কণাদ' আখ্যা পান। নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির পূর্ব্বে ইঁহার প্রসিদ্ধি। কণাদ তান্ত্রিক বা শক্তির উপাসক। সাধনায় সিদ্ধিলাভ তিনি করেন। ন্যায়শাস্ত্রের মূল 'তত্ত্বচিন্তামণি'র টীকা 'মণিব্যাখ্যা'—কণাদের।

খানাকুল-কৃষ্ণনগরের আর একজন প্রধান লোক—'নারাণ ঠাকুর'। ইনি যাদবেন্দ্রের বংশধর বংশীধর রায়ের সমসাময়িক। নারায়ণ ঠাকুর নবদ্বীপের রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী। অদ্যাবধি নারায়ণ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত 'খানাকুল কৃষ্ণনগরের মত' বহু-জন-মান্য। নারায়ণ ঠাকুরের 'স্মৃতি-সর্ব্বস্ব' 'সারাবলী', 'ধাতুরত্নাকর', 'শুদ্ধকারিকা', 'সবচন নির্ব্বচন স্মৃতি-সর্ব্বস্ব' ও 'বেদান্তবাদ' বঙ্গবাসীর অমূল্য সম্পদ্। খানাকুল-কৃষ্ণনগর ও রাধানগরই তাহা দান করে। এই সকল গ্রন্থ পুঁথির আকারে তিনশত বৎসরের অধিক থাকায়—অধিকাংশই কীটদষ্ট। এক হস্ত হইতে অন্য হস্তে পড়িয়া কোনখানি কোথায় আছে—সন্ধান লওয়াও আয়াসসাধ্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, Asiatic Societyতে কিছু রক্ষিত হইয়াছে, এস লিং এর India Office Catalougeএও কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। 'গুপ্ত-বৃন্দাবনের' মণিরত্ন গুপ্তই থাকিবে কি!

এই সকল গ্রন্থের কোন কোন গ্রন্থ হইতে এই সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব-কালের অনুসন্ধান শাস্ত্রী মহাশয় যাহা পাইয়াছেন, তাহাতে ১৫০০ হইতে ১৫৫০এর কাছাকাছিই ইঁহারা আবির্ভূত হন বলিয়াই মনে হয়। ইঁহাদের পরে রাধানগরের সিদ্ধ আগমবাগীশ রত্নেশ্বর। রত্নাকর নদীতটে প্রাচীন ঘণ্টেশ্বর শিবমন্দিরে আগম-বাগীশ আগমন করিয় রাধানগরের প্রান্তরে এক ত্রিকোণা-কার গৃহে তিনি কালিকামূর্ত্তি ও 'পঞ্চমুণ্ডীর' আসন স্থাপন করেন।

১৩১৬ শকে অভিরামের আবির্ভাব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার। তাঁহার পরে মহর্ষি কণাদ ও তাঁহার শিষ্য বাঁড়ুযো ঠাকুর, পরে তান্ত্রিক আগমবাগীশ। সুতরাং একশত বা দেড়শত বৎসরের মধ্যে খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজে বৈষ্ণবশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র সবই প্রচলিত হয়। সমাজগঠনে যাদবেন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণরাম ও পৌত্র বংশীধরকে ইঁহারা সকলেই সবিশেষ সাহায্য করেন। 'সমাজ' সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হইয়া উঠে। চৌধুরীরা অনেক বড় বড় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে বাস করান।

যাদবেন্দ্র নবাবের ক্ষমতা গ্রাহ্য করিতেন না, করও দিতেন না। যাদবেন্দ্রের পরে নবাবের কর্ম্মচারী রূপে কৃষ্ণচন্দ্র রায় খানাকুলে আসেন। তাঁহার চেষ্টায় চৌধুরীরা কর দিতে সম্মত হন। এই কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা রামমোহনের প্রপিতামহ। এই সময় হইতেই রাধানগরে রায়েদের বাস।

রাঢ়ের এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের অনেকেই তখন খানাকুল বা নবদ্বীপে ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্র-শিক্ষার্থে আসিতে হইত। খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের অন্তর্ভুক্ত চতুষ্পাঠী, টোল প্রভৃতি তখন শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির। কণাদ ও নারাণ ঠাকুরের পুত্রগণের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

সমাজের প্রভাবে সর্ব্বতোভাবেই দেশের উন্নতি ধীরে ধীরে সাধিত হয়। কলমের ধুতি, উড়ানি, রাধানগরের সোনাটিকারীর পোটোদিগের শিল্পকলা, কড়ির খেলানা, সোণার খেলানা ও কাঁসা পিতলের বাসনের জন্য বাহিরের অনেক লোকের ঝোঁকও অত্যন্ত ছিল। নবদ্বীপ বা শান্তিপুরের কারিগর শ্রেষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে খানাকুলের কারিগর ছিল শ্রেষ্ঠ। কৃষিকর্ম্ম প্রচুর। সুরম্য বাসস্থান। আদর্শ পল্লী। বিশুদ্ধ পানীয় জল। গ্রামবাসী সদাচারী। রাধানগর ও কৃষ্ণনগরের কৃতী সন্তানদিগের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চরাজকর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্যদক্ষতা হেতু উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হন। ২৩ হইতে ২৫ পর্য্যায় পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিকারীদিগের তিন জন—মহেন্দ্রনারায়ণ, হরিপ্রসাদ ও সীতানাথ নবাব-প্রদত্ত রাজা উপাধি লাভ করেন।

২৩ পর্য্যায়ে মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী সংস্কৃতের সঙ্গে আরবী ও পারসী শিক্ষাদানের জন্য রাধানগরে 'মুন্সীচালা' স্থাপন করেন। রামমোহনের আরবী ও পারসী শিক্ষার হাতে-খড়ি 'মুন্সীচালাতে'। রাম-নারায়ণের সহিত রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল। সর্ব্বাধিকারীদিগের বাটীর নিকটেই তাঁহার বাটী—উভয়ে সর্ব্বদা দেখাশুনা। স্ব-গ্রামস্থ একটী জমিদারী নিলামে বিক্রয় হইবে শুনিয়া সেই জমিদারীটি তিনি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন এবং সে কথা রামনারায়ণকে জানান। নিলামের দিন রামকান্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রামনারায়ণ জমিদারটী 'ডাকিয়া' লন এবং বাটী আসিয়া রামকান্তকে সে কথা জানান। রামকান্ত 'ডাকে'র দাম শুনিয়া বলেন, "এত টাকা কোথায় পাইব, তবে তুমিই লও"। "টাকা পরে দিও যখন তোমার সুবিধা হইবে—তোমার ইহা লইবার ইচ্ছা, আমি লইব না"। জমিদারী বন্ধুকেই রামনারায়ণ দেন। সেই বন্ধুর পুত্র 'মুন্সীচালার' ছাত্রভুক্ত হইলে তিনি যত্নসহকারে স্বয়ং তাহাকে পাঠ শিখাইতেন। পাটনায় যখন রামমোহন গমন করেন, আরবী ও পারসীতে তিনি তখন বহুদূর অগ্রসর। তৎপরে পিতাপুত্রে বিরোধ, রামমোহনের রাধানগর-ত্যাগ, কোম্পানীর চাকুরী-গ্রহণ, নবধর্ম্মপ্রচার, বিলাত-গমন, দিল্লীশ্বরের নিকট রাজোপাধি-প্রাপ্তি ও মৃত্যু পাঠকপাঠিকাদের অবিদিত নাই। আত্মীয়ানাদৃত রামমোহন মাতৃভূমির সুকোমল ক্রোড়ে ফিরিয়া আর আসিলেন না—আসিবার সময় ও সুযোগ পাইলেন না। মহাত্মার জীবনীলেখকদিগের মধ্যে অনেকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, আত্মীয়বর্গের দুর্ব্যবহারেই রামমোহন স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই। মহাত্মার মহত্ত্বের প্রতি এ ঘোর কটাক্ষ। অসূয়াপরবশে জন্মভূমির মায়া তিনি ত্যাগ করিলেন আর যাঁহারা 'দুর্ব্যবহার' করিয়াছিলেন অনায়াসে তাঁহাদের সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন—ইহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে? ইংরাজ কবি স্কট্ (Scott)-এর কথা মনে পড়ে :—

"Breathes there the man with soul so dead
who never to himself hath said :
This is my own, my native land ?"

মহাত্মা রামমোহন কি এই অমানুষ-পর্য্যায়-ভুক্ত। তাঁহার শততম স্মৃতিবাসরে মহাত্মার প্রতি কটাক্ষের প্রায়শ্চিত্ত যেন আমরা করি। রাধানগরের ধুলা-মাটি অঙ্গে না মাখিলে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করা সার্থক হইবে না। রামমোহন শুধু বাংলার নহে, ভারতের নহে—সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব জাতির। সেই রামমোহনের জন্মভূমি রাধানগর!

রামমোহনের জন্মের ৩০ বৎসর পরে, রাধানগরে ভক্ত যদুনাথের আবির্ভাব। ভগবানের পূজা তিনি করিতেন—দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিয়া। স্বগ্রাম ছিল তাঁহার প্রাণ। তাহার উন্নতি-কল্পে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন তাঁ হারই চেষ্টায় হয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে রাধানগরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করান। রাধানগরের Anglo-Sanskrit School অসাধ্য সাধন করে—ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে প্রতিকূল মত ভাঙ্গিয়া দিয়া। যাঁহাদের সাধনায় নূতন বাংলার সৃষ্টি, তাঁহাদের অনেককেই শিক্ষক বা ছাত্ররূপে রাধানগরের এই বিদ্যালয়ে মাথা ঠেকাইতে হইয়াছে। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র গুঁই,

দীননাথ মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, কবি Sturycors। নীরব কর্ম্মী যদুনাথের অধ্যবসায়েই ইহা সংঘটিত হয়। রাধানগরের কৃতীপুত্র রামমোহনই আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক। রাধানগরের সে মর্য্যাদা যদুনাথ অক্ষুণ্ণ রাখেন— 'তীর্থভ্রমণ' ও 'সঙ্গীত লহরী'তে।

বাংলা-সাহিত্য রাধানগরের নিকট নানাপ্রকারে ঋণী। ঘরের ছেলের কথা না ধরিলেও, সাহিত্যিক বলিয়া খ্যাত 'পরের' অনেক ছেলের সাহিত্য-চর্চ্চার 'হাতে খড়ি' হয় রাধানগরে। তাঁহাদের মধ্যে একজন— কবি হেমচন্দ্র। ভারতচন্দ্রও অনেক দিন সাহিত্য চর্চ্চা করেন এই প্রদেশে। এই প্রদেশেই, বঙ্কিমচন্দ্রের গড় মান্দারণ। কপালকুণ্ডলা ও লুৎফ্‌উন্নিসা রাধানগরের অদূরবর্ত্তী রাজবর্ত্ম দিয়া বর্দ্ধমানের দিকে গিয়াছিলেন। বীরসিংহের বিদ্যাসাগর 'তীর্থ করিতে' আসিতেন রাধানগরে। মৃচ্ছকটিক নাটকে (বসন্তসেনা)-র অনুবাদক মধুসূদন বাচস্পতির নিবাস রাধানগরের অতি সন্নিকটে 'পাতুল' গ্রামে। আর যাঁহার ভক্তি-কথায়, জ্ঞানগর্ভ উপদেশে বাংলা সাহিত্য পরিপূর্ণ, সেই পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর—রাধানগরের এক মহাকুমারই অন্তর্ভুক্ত।

বর্ত্তমান যুগেও রাধানগরের কৃতী সন্তানগণ নানাক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তদুপোযোগী সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। রমাপ্রসাদ রায়—হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী জজ। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী— পাটীগণিত ও বীজগণিতের আদি গ্রন্থকার, সংস্কৃত কলেজের প্রথম অব্রাহ্মণ অধ্যক্ষ। সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী —প্রথম বাঙ্গালী সিভিল্ ও মিলিটারী সার্জ্জন (গাজীপুর), সিপাহীযুদ্ধে একমাত্র বাঙ্গালী ব্রিগেড্ সার্জ্জন, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টি অফ্ মেডিসিনের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় সভাপতি। রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী— 'ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী'র গ্রন্থকার। Constitutional Law সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাংলা রচনা। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ভূপেন্দ্রনাথ বসু—সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্-কাউন্সিলের সর্ব্বপ্রথম বে-সরকারী সদস্য। স্যার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বে-সরকারী ভাইস চ্যান্সেলর্। সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী লেফ্‌টেনেণ্ট্ কর্ণেল্। তালিকা অসম্পূর্ণ।

অভিরাম গোস্বামী, 'মহর্ষি কণাদ,' বাঁড়ুয্যে ঠাকুর প্রভৃতির নামের উল্লেখ করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রাধানগরে বসিয়াই বলেন, 'খানাকুলকে নবদ্বীপের * * * বড় (ভাই) বলিতে নিতান্ত না দাও, পিঠাপিঠি বলিব।" নবদ্বীপের পুণ্যস্মৃতি চিরজাগরূক থাকুক; কিন্তু কৃষ্ণনগরও রাধানগরের স্থান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নবদ্বীপের সহিত একবা উচ্চ স্তরে বিশেষ বিবেচনা করিয়া নির্দ্দেশ ঐতিহাসিককে করিতে হইবে। 'পিঠাপিঠি ভায়েদের' পরে নবদ্বীপের আর কাহারও কথা তেমন তো শুনা যায় নাই!

রাধানগরের রজঃ গায়ে মাখিয়া রায় বাহাদুর জলধর সেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন, "বহুদিনের বহু ক্লেশের পথশ্রমের অবসানে তীর্থক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া মন্দির চূড়া দর্শন করিবামাত্র তীর্থযাত্রীগণ যেরূপ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া থাকে, এই স্থানে এই পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইয়া, সেইরূপ উল্লাসে ইহার জয়ধ্বনি করি।"

'এই পবিত্র তীর্থ' ধ্বংস-প্রায়—আর বুঝি থাকে না। রামমোহনের ভিটার চিহ্নমাত্র নাই। দোলমঞ্চ ভগ্ন, গলিত। স্মৃতি-মন্দির অসম্পূর্ণ। রাধানগরের গ্রামপ্রান্তর জঙ্গলাকীর্ণ। অন্ন নাই, পানীয় নাই। টোল, চতুষ্পাঠী গৌরবহীন। যদুনাথের সাধের বিদ্যা-মন্দির নদীগর্ভে। রামমোহনের স্মৃতিবাসরে এই সকল কথা মনে রাখিয়া, প্রতিকারের উপায়-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া যেন আমরা 'স্মৃতি-পূজা' সার্থক করি।

ঢেউয়ের পর ঢেউ

(উপন্যাস)

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

— চৌদ্দ —
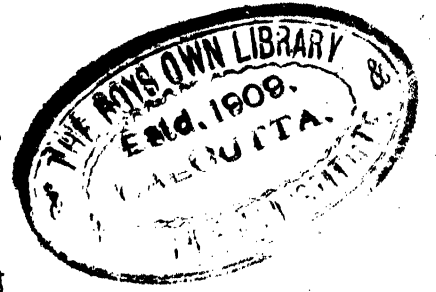
যে পরীক্ষার জন্যে এতো তোড়জোড়, এতো ব্যস্ততা, শেষ পর্য্যন্ত তারই কাছাকাছি এসে ললিতা হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ালো। ছুঁড়ে ফেলে দিলে বইয়ের বোঝা, রাশি-রাশি অক্ষরের অত্যাচার। বিবর্ণ, বিস্বাদ হ'য়ে উঠেছে তার দিন-রাত্রির পৃষ্ঠা, শেকলে বাঁধা এই নিষ্ঠুর পারম্পর্য্য। অবকাশের অরণ্যে সে যে একটি আশ্রয়ের নীড় তৈরি করেছিলো, তাই এখন তার কাছে মনে হ'তে লাগলো আর্ত্ত, অন্ধ, পরিশূন্য একটা গুহার মতো। অক্ষরের আলোতে সেই অন্ধকার সে আর কতোটুকু তরল করবে, দৈত্যকায়, দুর্দ্দান্ত সেই অন্ধকার? মনের বিরাট এই নৈঃশব্দ্যের সামনে কতোক্ষণ জ্বলবে এই অক্ষরের মুখরতা, চপল, ক্ষীণায়ু এই অক্ষর? ললিতা অক্ষরের বিস্তীর্ণ জনহীনতায় কোথাও কোনো পার দেখতে পেলো না,—কতো দূর সে হাঁটবে, কতো আর উলঙ্গ রৌদ্র, কতো আর আতীব্র রাত্রি? অক্ষরের দীপশিখায় কা'র সে আরতি করবে, ছোঁবে সে কোন্ নিশীথ-তারা? কেন এই আয়োজন? বিচ্ছিন্ন কতোগুলি অক্ষরের পাথরে বাঁধতে পারবে কি সে তার এই শূন্যতার সমুদ্র? ছায়া-শীতল করে' তুলতে তার এই মুক্তির মরুভূমি?

ললিতা চলে' এলো পাশের বাড়ী বিকেলের দিকে, কল্যাণী যখন টানা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধা সাঙ্গ করে' চিরুনির উল্টো পিঠ দিয়ে সিঁথির উপর সিঁদুর আঁকছে—কম্পান্বিত, শীর্ণ, তীক্ষ্ণ একটি রেখায় তার শরীরের সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত রক্তিমা। ললিতা একেবারে তার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, খুসিতে উছ্‌লে উঠে বল্‌লে,—তোমার জন্যে খুব একটা শুভসংবাদ এনেছি, কল্যাণী।

কল্যাণী এক ঝলক বসন্তের হাওয়ার মতো ঘুরে দাঁড়ালো। দীর্ঘ, পিচ্ছিল চোখে ললিতার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করতে-করতে বললে,—সত্যি, সত্যি শুভসংবাদ?

—ভীষণ। তুমি তা ভাবতে পারবে না।

—আমি তা খুব সহজেই ভাবতে পারি। কল্যাণী নিমেষে আবার গম্ভীর হ'য়ে গেলো। ললিতাকে আরো কাছে টেনে এনে তার কপালের থেকে চুলের উড়ন্ত ক'টি রুক্ষ গুচ্ছ এদিক-ওদিক সরিয়ে দিয়ে বললে: অথচ অতো সহজে ভাবনার জিনিস যেন তা নয়, সে ভীষণ, অসহ্য সে সুখ। শরীরের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়েও যেন তা আয়ত্ত করা যায় না।

ললিতা তাড়াতাড়ি পিছ্‌লে সরে' এলো। দুই চোখ কপালে তুলে বললে,—তুমি এ-সব কী বলছ?

—কেন, মহীপতিবাবু কি ফিরে আসেন নি?

—সর্ব্বনাশ! ললিতা হেসে কুটি-কুটি হ'য়ে যেতে লাগলো, ছোট-ছোট দাঁতে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যেতে লাগলো ঘরের সেই ঘোলাটে শুদ্ধতা। হাসির হাওয়ায় উড়তে-উড়তে ললিতা বসলো এসে কল্যাণীর বিছানার উপর—সদ্যপাতা, নতুন, নির্ভাঁজ বিছানা। দু'হাত তুলে চুলের খোঁপাটা চূড়া করে' বাঁধতে-বাঁধতে বল্‌লে,—বাবাঃ, তুমি একেক সময় এমন ভয় দেখাও। বলে কিনা কে-না-কে আসবে। আর আমি এসেছি গায়ে পড়ে' তোমাকে সেই খবর দিতে! বলতে-বলতে ললিতা আবার হাসির ঘায়ে ফেটে পড়লো।

—তবে, কল্যাণী অভিভূতের মতো জিগ্‌গেস করলে: তবে তার চেয়ে তোমার আর কী শুভসংবাদ হ'তে পারে?

—কতো, কতো কিছু হ'তে পারে। কথাগুলি ললিতার হাসির জলে ঝিনুকের মতো ঝলমল করে' উঠছে: কারু সঙ্গে প্রেমে পড়ে' যেতে পারি, চলে' যেতে

পারি কোথাও আর-কোনো আকাশের নির্জ্জনতায়, আর-কোনো মৃত্যুর অন্ধকারে। কতো—কতো-কিছু ঘটে' যেতে পারে। আমাদের জীবনে শুভসংবাদ কি শুধু একটা ?

ললিতাকে আজ যেন কেমন অতীন্দ্রিয় দেখাচ্ছে, সায়ন্তন দিগন্তরেখার মতো অস্পষ্ট। তার সমস্তটি শরীর যেন নিরুত্তাপ, নীরেখ একটি শিখা, যেন আর ভার নয়, পরিব্যাপ্ত প্রচ্ছন্ন একটি অনুভূতি। সে কোনোদিন এতো অশরীরী ছিলো না, ছায়ায় এতো শীতল, ভঙ্গীতে এতো অনুচ্চারিত। ছিলো সে এতোদিন শীতের রাতের মতো ধারালো, নির্ঝরের জলের মতো ধাবমান। তাকে দেখায় নি কোনোদিন নিরুত্তর একটি সঙ্কেতের মতো, রহস্যে এমন রঙিন। চুলের গুচ্ছ ক'টির শিথিল খসে'-পড়া থেকে পায়ের নিটোল দু'টি বেঁকে-যাওয়া পর্য্যন্ত কোথাও যেন তার শরীরের উল্লেখ নেই, সে নির্ব্বাপিত একটি গতি, সমর্পিত একটি প্রতীক্ষা। যেন চলে' এসেছে সে আত্মার অনণুভূয়, গভীর একটি আবেশের মধ্যে।

কল্যাণী বিছানায় তার পাশে এসে বসলো। গলা নামিয়ে বললে,—কেন, তেমন-কিছু শুভসংবাদ আছে নাকি সত্যি ?

—পাগল! তেমন শুভসংবাদ আমি পাবো কোথায় ? ললিতা জোরে হেসে উঠতে চাইলো ঠিক নিবে যাওয়ার আগে আলোর নির্লজ্জ উল্লাসের মতো: সমস্ত পৃথিবী ঘুরে কোথায় খুঁজে পাবো সেই নতুনতরো আকাশ, সেই আমার নিজের নির্জ্জনতা ? পাগল! আমার আবার শুভসংবাদ! নিতান্ত ছোট, নিতান্ত কিছু একটা নতুন না করলে আর নয়।

—কী ? কল্যাণীর গলা উৎকণ্ঠায় কেঁপে উঠলো।

--পড়া, লেখা-পড়া, লেখা আর পড়া—সব আমি ছেড়ে দিয়েছি, কল্যাণী। ললিতা হঠাৎ শিশুর মতো হেসে উঠলো: তোমাকে তেমন কিছু গভীর কথা শোনাতে পারলুম না। একেবারে সাধারণ, একেবারে তুচ্ছ—কিন্তু কী করবো বলো, জীবনে আর আমরা তেমন ক'টা শুভসংবাদের নাগাল পাই ?

—কেন ছাড়লে ?

—কেন ছাড়লাম? বা রে, ললিতার সমস্ত মুখ উন্মোচিত, বিশাল একটা ফুলের মতো সহসা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো: তুমিই তো বলেছিলে লেখাপড়া করে' কী আর আমাদের হ'বে ? কেন, কিসের জন্যে আমরা পড়বো ? তুমি কেন তবে আর পড়ো না ? তুমি কেন তবে ছেড়ে দিলে ?

ললিতার আজ কূল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাকে বুঝতে যাওয়া আজ বিড়ম্বনা। কল্যাণী তার একখানি হাত কোলের উপর টেনে এনে বললে,—আর ভালো লাগলো না বুঝি ?

—যা ভালো লাগে তাই আমরা করি, আর যা ভালো লাগে না তাই আমরা করি না—সব সময়ে তাই আমাদের ধর্ম্ম নয়, কল্যাণী। ললিতার মুখ আবার ধীরে ধীরে মুছে গেলো: তা হ'লে আর আমাদের দুঃখ ছিলো না। যা ভালো লাগে না তাই যদি আমরা ছাড়তে পারতুম, তবে যা আমাদের ভালো লাগতো তাই নিতাম দু' হাত ভরে' সঞ্চয় করে,' সমস্ত আকাশ শূন্য করে'—যা আমাদের ভালো লাগতো, যাতে আমরা পূর্ণ, একটি মুহূর্ত্তের জন্য, একটি চিরন্তন মুহূর্ত্তের জন্যেও পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠতাম।

কল্যাণী তার দিকে নিষ্পন্দের মতো চেয়ে রইলো।

—তুমি, তুমি কেন তবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছ ? ললিতা আহতের মতো জিগগেস করলে: কেন, তোমার আর ও ভালো লাগলো না বলে' ? শুধু ভালো লাগলো না বলে' ?

—তা কেন ? কল্যাণী পরিতৃপ্ত, পিচ্ছিল ঠোঁটে একটু হাসলো: আমি তা ছাড়লাম তার চেয়ে আরো বৃহত্তরো ভালোর সন্ধান পেলাম বলে'। বইয়ের শুকনো পাতার চেয়ে একদিন আমার শরীরে বেশি স্বাদ, বেশি রহস্য আবিষ্কার করলাম, তাই।

ললিতা ক্লান্ত, মুহ্যমান চোখে ঘরের চারদিকে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বেড়াতে লাগলো। ঘরময় উৎসারিত হ'য়ে পড়েছে কল্যাণীর চিত্তের পূর্ণতা ভোরবেলাকার প্রথম রোদের মতো। ছড়িয়ে পড়েছে তার শরীরের লাবণ্য ঘরের কোমল পরিচ্ছন্নতায়। তার বৃহত্তরো ভালো। খাটের উপর নিভৃত বিছানা, নিশীথ-রাত্রের গাঢ়

একটি ঘুম দিয়ে তৈরি; শরীরে তার প্রসাধিত কান্তি, বিস্তীর্ণ একটি স্পর্শের ছায়ায় কমনীয়। তাকের উপর গৃহসজ্জার ছোটখাটো অকিঞ্চিৎকর উপকরণ, কবিতার ভাঙা-ভাঙা কয়টি কথা, টেব্‌লের উপর সাজানো ক'খানি বই, ভালো লাগে না বলে' যা আর সে কোনোদিন পৃষ্ঠা উল্‌টেও একবার দেখে না। তার বৃহত্তর ভালো। ওপারের বারান্দায় দাইর কোলে তার ছেলে খাঁচার ময়নাটার সঙ্গে ছোট-ছোট মুঠি ঘুরিয়ে খেলা করছে। তার স্বপ্নের একটি টুকরো, তার রক্তের একটি গান। চারপাশের দেয়ালগুলো সাদা, প্রখর, উচ্চকিত—যেন কা'র নিষ্ঠুর প্রতীক্ষায়, কা'র ফিরে-আসার স্বপ্নে। বাইরে এতো জনতা, এতো কোলাহল, তবু সমস্ত ঘরটি কেমন সঙ্কিপ্ত—উত্তরঙ্গ সমুদ্রের কোলে নিভৃত একটি দ্বীপের মতো—এই নীরব ঘর, এই ঠাণ্ডা বিছানা, এই সাদা দেয়াল। আকাশের বহুদূর নির্জ্জনতা দিয়ে তৈরি, ঘুমের গহন প্রশান্তি দিয়ে।

ললিতা হঠাৎ সমস্ত শরীরে ছট্‌ফট্ করে' উঠলো। যেন কে তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে; তার থেকে সবলে ছাড়া পাবার জন্যে সে এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়ালো। বললে,—তেমনি আমারো জীবনে বৃহত্তরো ভালোর সন্ধান আমি খুঁজে পেয়েছি। যেখানে আর সমস্ত আয়োজন অবান্তর আমার এই একান্ত করে' আমি হওয়া ছাড়া। তেমনি আমারো জীবনে পূর্ণতার একটা দুর্দ্দান্ত পিপাসা আছে। আচ্ছা, তুমি বোসো, আমি চললুম।

—কোথায়? কল্যাণী তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলো: শ্বশুরবাড়ীই ফিরে যাবে ঠিক করেছ বুঝি?

—যমের বাড়ী। দরজার কাছে এসে ললিতা আবার আরেক পশলা হাসি ঝরিয়ে দিলো: পৃথিবীতে জায়গা শুধু আমরা সেই একটাই নিয়ে আসি নি। আরো অনেক—অনেক জায়গা আছে।

ললিতা বাইরে বেরিয়ে এলো। কল্যাণীদের বাড়ি থেকে তাদের বাড়ি আর কতোটুকুনই বা পথ। সেই পথটুকুতে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত পৃথিবীর সে কোনো সীমা খুঁজে পেলো না। যেমন খুঁজে পাচ্ছে না তার এই অনুভূতির কোনো ভাষা। সেই পথটকুই যেন বিশাল পৃথিবীর বিসর্পিল সব পথের প্রতীক হ'য়ে তাকে ভয় দেখাতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো সে তার ঘরের কোটরে, তার দৈনন্দিনতার আচ্ছাদনে।

সৌরাংশুর মুখেও সেই কথা:

—শুনলুম আপনি নাকি এ বছর আর পরীক্ষা দেবেন না?

ললিতা একটা ইজিচেয়ারে পুঞ্জ-পুঞ্জ শিথিলতায় স্তব্ধ হ'য়ে বসে' ছিলো। শরীরে একটুও চমক না এনে আলস্যের তেমনি স্তিমিত আভাময়তায় বললে,—কোনো বছরেই নয়। আমি ও ছেড়ে দিয়েছি।

—বলেন কী? সৌরাংশুকে যেন কে আকস্মিক আঘাত করলে: পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছেন?

—একেবারে। কী হ'বে আমার পড়াশুনো করে'? ললিতা শ্রান্ত, দীর্ঘ চোখে সৌরাংশুর দিকে তাকালো: কার' জন্যে আমি পড়াশুনো করবো?

—বা, মানুষে আবার কা'র জন্যে পড়াশুনো করে? নিজের উন্নতির জন্যে।

—দয়া করে' আর আমার কাছে মাষ্টার-মশাই হ'বেন না। ললিতা বাঁকাচোরা ভঙ্গুর ক'টি রেখায় আধখানা উঠে বসলো: আমি নিজের জন্যে নই, নিজের একাকীত্বের উন্নতিতে আমি আর বিশ্বাস করি না।

সৌরাংশু কেমন ধাঁধিয়ে গেলো। কথাটাকে নিজের মনোমত অর্থে নিয়ে গিয়ে একটু জোর গলায়ই বললে,—নিজের জন্যে কেউ আমরা নইই তো একলার। যেটুকু আপনি শিখবেন, আশেপাশে পরকে তা আবার দান করে' যাবেন।

—অর্থাৎ আপনার মতো আমিও একজন মাষ্টার হ'বো? ললিতা হাসির তরলতায় চেয়ারে আবার ঢলে' পড়লো: ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

—না, আপনি বুঝতে পারছেন না। সৌরাংশু অস্থির হ'য়ে উঠলো। ঘরে নিঃশ্বাসহীন নিঃশব্দতায় অন্ধকার জমে' উঠছে। সেই শব্দহীন অন্ধকারের ভার সবলে সরিয়ে দিয়ে সৌরাংশু বললে,—এই পড়াটাই আপনার দাঁড়াবার ভিত্তি, আপনার আত্মরক্ষার' অস্ত্র।

পড়া কখনো ছাড়তে হয়? বিশেষ, আপনার মতো অবস্থায়, আপনার মতো—

অনর্গল হাসির প্রবলতায় ললিতা সৌরাংশুর মুখের কথা ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। বললে,—কেন, আমার আবার এমন কী অবস্থা দেখলেন? এই তো আমি দিব্যি আছি—কিছু-না-করার, কিছু-না-হওয়ার চমৎকার অন্ধকারে।

—কিন্তু কতোদিন? সৌরাংশু দূরে জানালার পাশে আরেকখানা চেয়ার টেনে বসে' পড়লো: সংসারে একদিন আপনাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'বে, ধরুন মহীপতিবাবু যদি আর একেবারেই ফিরে না আসেন, আপনার সামনে তখন ভয়াবহ, বিশাল ভবিষ্যৎ। সেদিন আপনি একেবারে একা, যেদিন ধরুন, ধরণীবাবুর ওপর আপনি আর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছেন না। তখন, সেই দুর্দ্দিনে, আপনি কী করবেন, কী সম্বল আপনার আছে নিজেকে রক্ষা করবার, নিজের একাকীত্বে, নির্ভয় আত্মসম্মানে?

সেই হাসির ছোট-ছোট ক'টি দাগ ললিতার মুখে তখনো লেগে ছিলো। এক দ্রুত, দীর্ঘ নিশ্বাসে মুখের সমস্ত কোমলতা সে মুছে ফেল্লে। মেরুদণ্ডটা আস্তে-আস্তে টান করতে-করতে বললে,—আমার জন্যে আপনাকে আর ভাবতে হ'বে না, আমার আত্মসম্মানের জন্যে। জীবিকাই যদি আমার জীবনের প্রধান সমস্যা হয়, আমার এই নিরভিভাবক একাকিত্ব, তবে, ললিতার মুখ সহসা পাংশু হ'য়ে গেলো: তবে আমি শ্বশুরবাড়িতেই একদিন ফিরে যাবো, এবং তা যতো শিগগির হয়, ততোই আমার ভালো। আমার শ্বশুরমশাই বাইরে যতোই কঠিন হোন না কেন, ভেতরটা তাঁর স্নেহে গলে' যাচ্ছে। তাঁর সংসারে এতো জায়গা, এতো স্বচ্ছলতা, যে আমি অনায়াসেই হয়তো এক কোণে একটু ঠাঁই করে' নিতে পারবো।

সৌরাংশুর মুখের উপর কে যেন তীক্ষ্ণ একটা চাবুক মারলে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন সাদা হ'য়ে গেলো। ঘরের অনড় দেয়াল যেন কথা কইলো: আপনি শেষকালে শ্বশুরবাড়ীতেই ফিরে যাবেন?

—হ্যাঁ, স্পষ্ট, সতেজ গলায় ললিতা বললে,—আমি একরকম প্রায় ঠিক করে' ফেলেছি। কেন যাবো না, ওখানে ছাড়া হিন্দু-মেয়ের আর গতি কোথায়? জীবিকার সমস্যাটা যদি এতো সহজেই মিটে যায়, তবে মিছিমিছি কেন আর নিজেকে বিব্রত করা বলুন? দু' বেলা দু' থালা ভাত তো কেউ আমার সেখানে কেড়ে রাখছে না। আমি কেন তবে আর ভাবছি?

সৌরাংশু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলো। পরে ঈষৎ তিক্ততার সঙ্গে বললে,—সমস্যার চমৎকার সমাধান বা'র করেছেন এতো দিনে। কিন্তু আপনার এই বিস্তীর্ণ শূন্যতা আপনি কিসের জোরে সমস্ত জীবনভোর বয়ে' বেড়াবেন শুনি? কী করে', কী নিয়ে কাটবে আপনার দিন, রাশি-রাশি দিন, একটানা এই দিনের অক্লান্তি? এই অগণন মুহূর্ত্তের অত্যাচার?

—যেমন করে' আরো অনেকের দিন কাটে। কথায় ললিতা এককণা আর্দ্র আকুলতা আসতে দিলো না: তবু তো আমার একটা আশা আছে, আমি আমার স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষা করতে পারবো।

আশ্চর্য্য, সৌরাংশু হঠাৎ বিস্ময়ে একেবারে বিদীর্ণ হ'য়ে গেলো: আপনি বসে'-বসে' আপনার স্বামীর ফেরবার প্রতীক্ষা করবেন?

—নিশ্চয়। ললিতার শরীরে দৃঢ়তার একটা তীক্ষ্ণ ভঙ্গী সহসা উচ্চারিত হ'য়ে উঠলো: এর অতিরিক্ত আমার আর কোনো কাজ নেই, সম্পদ নেই, আমি সারাদিন, রাশি-রাশি দিন আমার স্বামীর ফিরে-আসার প্রতীক্ষায় ক্ষয় করে' যাবো। বলুন, এর বেশি আমার কী কাজ, কী সম্মান?

—যদি তিনি আর না আসেন কোনোদিন?

—না-ই বা এলেন। আমার মৃত্যু তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমারো সেই মৃত্যু।

—আর যদি ফিরে আসেন একদিন?

রাত্রির মর্ম্মরিত অরণ্যের মতো ললিতা যেন সর্ব্বাঙ্গে ব্যাকুল, বিধুর হ'য়ে উঠলো: সে আমার উৎসবের পরম শুভলগ্ন হ'য়ে দেখা দেবে, সৌরাংশুবাবু। তখন কিসের আমার লেখাপড়া, কিসের আমার সাজসজ্জা! আমি—

আমি রাত্রির মতো গলে' যাবো সেই নিদারুণ সূর্য্যোদয়ে। সে-কথা ভাবতেও আমি আনন্দে মরে' যাচ্ছি।

আহতের মত সৌরাংশু প্রায় একটা চীৎকার করে' উঠলো: ফিরে এলে তাকে আপনি গ্রহণ করবেন?

ললিতা মলিন একটু হাসলো: বা, গ্রহণ করবো না? যার জন্যে দিন গুনছি, প্রতি মুহূর্ত্তে যার শুনছি পায়ের শব্দ, ফিরে এলে গ্রহণ করবো না তাকে? তার বেশি আর কী আপনি আশা করতে পারেন আমার থেকে?

—গ্রহণ করবেন? উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-চূড়া থেকে সৌরাংশু যেন নীচে পড়ে' যাচ্ছিলো, চেয়ারের হাতলটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে' চেপে ধরে' সে নিজেকে রক্ষা করলো: যে আপনাকে একদিন পায়ের ধুলোর মতো অনায়াসে ত্যাগ করে' গেলো? একটিবার ফিরেও চাইলো না, ফিরেও চাইলো না আপনার এই রাশীভূত ব্যর্থতার দিকে। একবার ভেবেও দেখলো না সে চলে' গেলে আপনি কী করবেন, কী করতে পারেন আপনি, কী করবার আপনার আছে। তাকে—তাকে আপনি স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে গ্রহণ করবেন? যার মাঝে নেই এককণা প্রেম, একফোঁটা কর্ত্তব্য! এই আপনার সত্য, আপনার মনুষ্যত্ব—এরি জন্যে আপনি এতোদিন অহঙ্কারে ফেটে পড়ছিলেন?

—নিশ্চয়। কথার প্রবল ঝাপটায় ললিতার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলো: এরি জন্যে। এর চেয়ে স্ত্রীর আর কী আদর্শ আচরণ থাকতে পারে বলুন? এরি জন্যে, এরি দিকে ঠেলে দেবার জন্যে আপনারাই তো একদিন সকলে সদলে আমাকে আক্রমণ করেছিলেন, ভুলে গেছেন এরি মধ্যে?

—পরের কথায় আপনি ছাড়বেন আপনার সত্য, হারাবেন আপনার সম্মান?

—পরের কথায় কেন হ'তে যাবে, আমি নিজে বুঝি না? ললিতা লুকোনো তেজে জ্বলতে লাগলো: সমস্ত সংগ্রামের মাঝে আমি নিজে কি অনুপস্থিত? আমি নিজে বুঝি না কী আমাকে করতে হ'বে, কী না করলে আমার নয়, সমস্ত সংসারে কিসে আর কোথায় আমি সব চেয়ে নিরাপদ—আপনাদের এই সামাজিক দস্যুতার বিরুদ্ধে? হ্যাঁ, পরের কথাই তো আমাকে শুনতে হচ্ছে! আমি নিজে একেবারে খুকী কিনা!

সৌরাংশু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঝাঁজালো গলায় বললে,—এ আপনার কাছ থেকে আমি আশা করি নি কোনোদিন।

—তবে কী আশা করেছিলেন? ললিতাও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে সুইচ্ টেনে দিলো। যেন সৌরাংশুর মুখে ছুঁড়ে মারলো এক ঝলক তীব্র আলো, শাণিত একটা চাবুকের মতো: বললে,—কী আশা করেছিলেন আমার থেকে? আশা করেছিলেন যে আমি বিবাহিত হ'য়ে আমার স্ত্রীত্বকে অস্বীকার করবো? মানবো না আমার সাধব্যের সম্পদ? স্মৃতির এই অপূর্ব্ব সমারোহ? বলুন, কী আশা করেছিলেন? চেয়েছিলেন যে আমি গোপনে আর-কাউকে ভালোবাসবো, সে যতোই হোক নিষ্ঠুর ও নিরুত্তর, তবু তার জন্যে করবো প্রতীক্ষা, তাকে নিয়ে আঁকবো নতুন জীবনের সূচনা? দরকার হ'লে যাবো দেশ ছেড়ে, সমাজের এই পরিবেশ ছেড়ে, এমন-কি এই ধর্ম্ম ছেড়ে? ললিতা দীপ্ত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: মিথ্যা, মিথ্যা, যদি তা ভেবে থাকেন, প্রতিটি অক্ষরে তা মিথ্যা। বলুন, কী আশা করেছিলেন তবে? আমার কাছে কী আশা করেছিলেন?

দরজার দিকে সরে' যেতে-যেতে সৌরাংশু স্তিমিত, স্নিগ্ধ গলায় বললে,—তেমন-কিছু অসংযত বা অন্যায় আপনার কাছে আশা করি নি।

—অন্যায়? ললিতা উত্তেজনায় প্রায় কেঁদে ফেললে।

—যাই হোক, তেমন উদ্ধত বুদ্ধিহীনতা আপনাকে পেয়ে বসুক, এমন আশা কেউ করে নি আপনার কাছে। সৌরাংশু আরো এক পা সরে' গেলো: চেয়েছিলাম আপনি দৃপ্ত, দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠবেন আপনার ব্যক্তিত্বের সাধনায়। ভর দিয়ে দাঁড়াবেন নিজের অটল স্বাতন্ত্র্যে। নিজেকে বিকীর্ণ করে' দেবেন মহত্তরো কাজের উৎসাহে —পৃথিবীতে কতো কাজ—আপনি দু'হাতে তুলবেন তারই গর্ব্বিত পতাকা। আপনি শিখবেন, ভাববেন, বড়ো হ'বেন,—কাজে ভরে' তুলবেন আপনার সমস্ত রিক্ততা। সৌরাংশু নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে ঘুরে

গেলো: জানি না কী চেয়েছিলাম আপনার কাছে। এমন কুৎসিত বশ্যতা কক্‌খনো নয়, নয় বা তেমন কোনো অশোভন অমিতাচার।

ঘরের আলোটা চারিদিকে যেন হাহাকার করে' উঠলো। আলোটা নিবিয়ে দিতে তার হাত উঠলো না। সৌরাংশুর চলে' যাওয়ার শূন্যতা যেন তা অবারিত করে' দিয়েছে। দাঁড়ালো সে আলোর আশ্রয়ে। কিন্তু সেই উদগ্র স্পষ্টতা যেন সে সহ্য করতে পারলো না। দুই হাতে চোখ ঢেকে সে হঠাৎ কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠলো, চোখের অন্তর্লীন সমস্ত অন্ধকারকে সম্বোধন করে' বললে: হায় ব্যক্তিত্ব, হায় বুদ্ধিহীনতা!

— পনেরো —

ধরণীবাবু ব্যাপারটাকে অন্য আলোয় দেখলেন। মনে-মনে একরকম খুসিই হ'লেন বলা যায়। অথচ বারে-বারেই তাঁর মনে হ'তে লাগলো এ-ধাপটা যেন ললিতাকে ঠিক মানাচ্ছে না, যেন কোথায় একটা বাধা পেয়ে তাকে থামতে হচ্ছে। এ ঠিক তার অক্ষমতা থেকে আসছে না, খানিকটা যেন অভিমান থেকে। কিন্তু কেন বা যে এই অভিমান, তা তাঁকে কে বোঝাবে?

তিনি মাঝামাঝি একটা পথ নিলেন। বল্‌লেন,—হ্যাঁ, পরীক্ষা পাশ করে' কীই বা আর হ'তো?

ললিতা বসে'-বসে' ধরণীবাবুর শার্টে ঝিনুকের বোতাম পরাচ্ছিলো। নীচের ঠোঁটে সূঁচ ডুবিয়ে সুতো ছিঁড়তে-ছিঁড়তে সে বল্‌লে,—কিছুতেই কিছু হ'তো না, বাবা।

ধরণীবাবু আপিসে বেরুবার সাজগোজ করছিলেন। মোজার গার্টার বাঁধতে-বাঁধতে বললেন,—পাশের মধ্যে কাণাকড়ি বিদ্যেও নেই। যারা সত্যিকারের শিখতে চায়, তারা পাশ করার অপেক্ষা রাখে না।

ললিতা হেসে বললে,—তবু তারাই যা হোক পাশ করে। শার্টটা সে ধরণীবাবুর দিকে এগিয়ে দিলো: আমি তার জন্যে কিছু ভাবছি না।

—তার জন্যে আবার ভাববি কী? আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে কলারটা জুৎ করে' বসাতে-বসাতে ধরণীবাবু বল্‌লেন,—পড়াশুনোর এমনি একাধটু চর্চা রাখলেই যথেষ্ট। সৌরাংশুকে বলবো না-হয়, সে মাঝে-মাঝে এসে তোকে সাহায্য করবে।

—সৌরাংশুবাবু? ললিতা মুহূর্ত্তে আগুন হ'য়ে উঠলো: সৌরাংশুবাবু কী জানেন?

ধরণীবাবু অপ্রতিভ হ'য়ে গেলেন: সৌরাংশু জানে না? তুই বলিস কী, লিলি? বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কৃতী ছেলে।

—হ'লোই বা না। তাই বলে' আমি কী পড়বো না-পড়বো তার থেকে পরামর্শ নিতে হ'বে? ললিতা ছট্‌ফট্ করে' উঠলো: আমার বিষয়ে তুমি সব সময়ে তার মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে চাও কেন, বাবা? সে আমাদের কে?

—কেউ নয়, কিন্তু বড়ো আপন, লিলি। ধরণীবাবু আবেগে গদ্গদ হ'য়ে উঠলেন: এমন ভালো ছেলে আর হ'তে নেই, তুইও তো তা জানিস। তার কাছে পড়তে পেলে তোর উপকারই হ'তো, মা।

—আমি পড়তে বসবো তার কাছে? তুমি এ বলছ কী, বাবা?

ধরণীবাবু আকাশ থেকে পড়লেন: কেন? কী করলো সে?

ললিতার সহসা ইচ্ছা হ'লো সৌরাংশুর নামটা সে দু' হাতের তীক্ষ্ণ নখে টুকরো-টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেলে, জিহ্বার চাবুকে ক্লেদাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করে' দেয়। অনেক কষ্টে নিজেকে সে শাসন করলে, দাঁড়াবার কঠোর ভঙ্গী করে' বললে,—কিছু সে করুক বা না করুক, আমি কী করবো না-করবো তার মাঝখানে সে আসে কী করে'? তার কাছে আমি সাহায্য নিতে যাবো কেন, আমাকে সাহায্য করে তারই বা কী এমন স্পর্দ্ধা জিগ্‌গেস করি? আমি কী পড়বো না পড়বো সে তার জানে কী? কে সে?

ধরণীবাবু শান্ত গলায় বললেন,—না, ওটা আমিই নিজে সাজেষ্ট্ করছিলাম। বেশ তো, তোর খুসিমতোই তুই পড়বি, যা তোর মন চায়।

—হ্যাঁ, যা আমার মন চায়। আমার খুসিমতো।

র‍্যাকেট থেকে টুপিটা তুলে নিতে-নিতে ধরণীবাবু

বললেন,—শুনলুম তুই নাকি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার কথা ভাবছিস—সত্যি ?

ললিতা আবার জ্বলে' উঠলো: তোমাকে কে বললে ? তোমার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছেলে ?

—হ্যাঁ, তুই নাকি তাকে বলেছিস সে-কথা ?

—বলেছি ? পৃথিবীতে আর আমার জায়গা নেই, সংসারে নেই আর কোনো কাজ, দুঃখে-অপমানে ললিতার চোখে জল এসে গেলো: তাই শ্বশুরবাড়ীর দোর ধরে' আমি বাকি জীবনটা ধুলোয় বসে' কাটিয়ে দেবো—বলেছি তাকে সে-কথা ? সে তোমাকে তাই বললে ?

—কী বলেছে আমার মনে নেই, ধরণীবাবু উপস্থিত মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন: কিন্তু তাই যদি বলে'ও থাকিস্ তা'তে লজ্জার বা রাগের কী আছে, ললিতা ?

—রাগের নেই ? তুমি বলো এতে কোনো মানুষ চুপ করে' থাকতে পারে ? ললিতা তার শাণিত শীর্ণতায় ঝক্‌ঝক্ করে' উঠলো: আমি কোথায় যাই না-যাই, তাতে তার কী মাথাব্যথা ? সে কেন বলে, কোন অধিকারে সে আমাদের ঘরোয়া সমস্যার মাঝে মাথা গলাতে আসবে ? তার কী দাবী আছে সে আমাকে উপদেশ দেয়, আমাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ? তাকে এখানে আর কেন রেখেছ ? তাকে ছাড়া ত্রিভুবনে কি আর নটুর মাষ্টার জোটে না ?

ধরণীবাবু তার পিঠে আলগোছে একটু হাত বুলিয়ে বললেন,—তুই তার ওপর হঠাৎ এতো চটে' গেলি কেন, মা ? সৌরাংশু ভারি ভালো ছেলে, ভারি অমায়িক, একেবারে আমার ছেলের মতন। আমার সব কাজে সে ডান হাত, সে আমার সংসারের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে।

—সে একেবারে তোমার কাঁধে চেপে বসেছে, বাবা। ললিতার কথাগুলি বিরক্তিতে বিষ হ'য়ে উঠলো: তোমার সে যারই মতন হোক্, আমার কে ? কেন আমার কাজে সে হাত বাড়াতে যাবে ? তাকে বলে' দিয়ো বাবা, সে তোমার ডান হাত হ'তে পারে, কিন্তু আমার পায়ের নখের কণাও সে নয়।

ধরণীবাবু হতভম্ব হ'য়ে গেলেন: কিন্তু তোর কাছে কী যে সে অপরাধ করলো কিছুই বুঝতে পারলুম না, ললিতা।

—কী করে' বুঝতে পারবে ? সে যে তোমার ডান-হাত! তাই তো সে সাহস করে' আমাকে এমনি অপমান করতে পারে।

—অপমান ?

—অপমান নয় ? আমাকে তার বেশি মূল্য দিতে যাওয়াই তো আমাকে তার অপমান করা। নইলে, ললিতার চোখের পাতা ভারি, আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো: কী তার সাহস বাবা, আমাকে সে শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গায়ে পড়ে' এগিয়ে আসে, আমার স্ত্রীর কর্ত্তব্য নিয়ে প্রকাণ্ড মহাভারত আওড়ায় ? মানুষের আস্পর্দ্ধার একটা সীমা থাকা উচিত, আর মানুষের সহ্য করার। জলের ভারে ললিতার চোখের পাতা বুজে এলো।

—ভালো, ভালো কথাই তো বলেছে সৌরাংশু। ধরণীবাবু সরল উচ্ছ্বসিত গলায় হেসে উঠলেন। ললিতার পিঠটা সস্নেহে একবার ঠুকে দিয়ে বললেন,—পাগল, তুই একেবারে পাগল হ'য়ে গেছিস, ললিতা।

দু'দিন সৌরাংশুর সঙ্গে ললিতার দেখা হয় নি। দুই তলার মাঝখানের অনড় সিঁড়িটা তাদের পরস্পরকে প্রখর প্রত্যক্ষতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রেখেছে। কিন্তু সেদিন একরকম ইচ্ছে করে'ই ললিতা নীচে নামলো। বাড়ীর পিছনে ছোট সবুজ জমিটুকুতে যে দু'টি ফুলের চারাগাছ নতুন পাতায় ঝিক্‌মিক্ করে' উঠেছে, সে দাঁড়ালো এসে তাদের নিভৃতিতে। কখন যে লাজুক পাতার আড়ালে ছোট-ছোট দু'টি কুঁড়ি ফুটেছে সে খবরও পায় নি। পাছে ব্যথা লাগে, পাছে ভয় পায়, সেই ভয়ে ললিতা আঙুল বাড়িয়ে তাদের ছুঁলো না পর্য্যন্ত। শীতের পাণ্ডুরতার গ্লানি কাটিয়ে নতুন আরম্ভের ঐশ্বর্য্যে কখন ও কী করে' যে তারা লাস্যে ও লাবণ্যে এমন ভরে' উঠলো তারি যেন সে কোনো সন্ধান পেলো না।

পিছনে মানুষের আওয়াজ পেয়ে সে ফুলেরই মতো সূক্ষ্ম অশরীরী ভয়ে কেঁপে উঠলো, দেখলো সৌরাংশু। আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই, ললিতা মনে-মনে জানে, পাছে

সে ভয় পায়, পাছে তার ব্যথা লাগে, সৌরাংশু সামান্য একটি আঙুলও তার দিকে বাড়িয়ে দেবে না। তবু সর্বাঙ্গে নিরবয়ব, ঠাণ্ডা একটা ভয়ে কেঁপে উঠতে তার ভালো লাগলো।

সৌরাংশু হাসিমুখে জিগগেস করলে: কী, গেলেন না সেখানে?

কেটে গেলো সুর। নিরবয়ব ভয়ের কুয়াসা নির্লজ্জ বাস্তবতায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

ঠোঁটের বাঁ কোণটা সামান্য একটু চেপে ধরে' ললিতা বললে,—কোথায় আবার যাবো?

—বা, যেখানে যাবার জন্যে পা আপনি কবে থেকে বাড়িয়ে রেখেছেন। সৌরাংশু হেসে উঠলো: আপনার শ্বশুরবাড়ী। আপনার চিরন্তন প্রতীক্ষার মন্দিরে।

—যাই না-যাই, ললিতা তীব্র কণ্ঠে মুখিয়ে উঠলো: তাতে আপনার কী?

সৌরাংশু থম্‌কে গেলো। আম্‌তা-আম্‌তা করে' বল্‌লে,—না, আমার আবার কী!

—যা আপনার নয়, তা নিয়ে আপনি কেন মাথা ঘামাতে আসেন? কথার তাপে ললিতা যেন দগ্ধ হ'য়ে যেতে লাগলো: আপনি মাষ্টার, আপনাকে প্রতি মাসে মাইনে দেওয়া হয়, আপনি আপনার নিজের কাজ করুন গে, যান। সামান্য মাষ্টার হ'য়ে আপনাকে এ নিয়ে বুদ্ধি খাটাতে হ'বে না।

সৌরাংশু মুহূর্ত্তে একেবারে ছাই হ'য়ে গেলো। কী যে বলবে, কী যে বলা যায়, সমস্ত পৃথিবী হঠাৎ তার কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

—এ নিয়ে সর্দ্দারি করতে কেউ আপনাকে মাইনে দিয়ে পুষছে না, এ-কথাটা মনে রাখবেন দয়া করে'। ললিতা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে' দিতে লাগলো: যার যা কাজ, তাই তার কাজ। আমি এখান থেকে যাই না-যাই, তা আমি বুঝবো। আপনাকে আর রাখা হ'বে কি হ'বে না তা-ও আমাদেরই বুঝতে হ'বে। কী, দাঁড়িয়ে আছেন কি হাঁ করে'?

সৌরাংশু যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে।

—আপনার লজ্জা করে না আমার সামনে এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে? ললিতা সতেজ, নিষ্ঠুর কণ্ঠে গর্জ্জন করে' উঠলো: বাইরের লোক দেখলে আমাকে ভাববে কী? বাড়ীতে আপনাকে থাকবার জন্যে আলাদা ঘর দেওয়া হয় নি, বেঁধে দেওয়া হয় নি আপনার কাজ? আমার মুখের দিকে এমনি হাঁ করে' চেয়ে থাকবার জন্যে আপনাকে নেমন্তন্ন করে' ডাকা হয়েছে নাকি এখানে?

সৌরাংশু প্রেতায়িত, নিঃশব্দ একটা ছায়ার মতো সেখান থেকে ধীরে ধীরে অন্তর্দ্ধান করলে।

উপরে উঠে এসে ললিতা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। যেন সমস্ত শরীরে নিমেষে সে অত্যন্ত হালকা হ'য়ে গেছে, বুকের মাঝে এতোক্ষণে স্তব্ধ হ'য়ে এসেছে হৃদয়ের দোদুল্যমানতা। যেন বন্য জন্তু লোকালয় থেকে শিকার সংগ্রহ করে' এনে ঢুকেছে তার অরণ্যের আশ্রয়ে—ললিতা তার এই দুর্ভেদ্য নীরবতায়। কী যেন সে এতোদিনে জয় করে' এসেছে, প্রতিষ্ঠিত করে' এসেছে তার নিজের নিশান, অভিব্যক্ত করে' দিয়ে এসেছে তার নিজের পরিচয়। যার ভয়ে এতোদিন সে সৌজন্যের জড়িমায় সঙ্কুচিত হ'য়ে ছিলো। সেও তুলতে পারে ফণা, করতে পারে দংশন। অন্ধকারে ললিতা নিজেরই মনে একবার হেসে উঠলো, ঘরময় পাইচারি করে' বেড়াতে লাগলো বন্য জন্তুর মতো তার উগ্র, উজ্জ্বল নিঃসঙ্গতায়।

তারপর একসময় সেই স্তূপীকৃত নিঃসঙ্গতা বিছানার শুভ্রতায় গলে' গিয়েছিলো বটে, মধ্যরাত্রে ললিতার ঘুম গিয়েছিলো ভেঙে। পাশের খোলা জানলা দিয়ে তার চোখ পড়েছিলো বাইরে,—বাইরে, যেখানে জ্বলছে অন্ধকার, তার শরীরের মতো অন্ধকার। তারই বিছানার মতো সাদা তার রঙ। তারই জীবনের মতো তার বিস্তীর্ণ অবিচ্ছিন্নতা। ললিতা নেমে এসেছিলো খাট ছেড়ে, হয়তো দরজাটাও একবার খুলেছিলো। কিন্তু অন্ধকারে ঘরের বাইরে আর সে কোনো পথই দেখতে পায় নি।

পরদিন সন্ধ্যার আগেতেই ললিতা নটুকে বিছানায় দেখতে পেলো। কুঁকড়ে এতোটুকু হ'য়ে পড়ে' আছে।

—এ কী, অসময়ে তুই শুয়ে পড়লি কেন?

—ভীষণ জ্বর এসে গেলো, দিদি। নটুর গলাটা ভারি, আব্ছা।

—জ্বর এসে গেলো? বলিস্ কী? ললিতা তার পাশে বসে' গায়ে হাত রাখলো: জ্বর হয়েছে, তাই বলে' তুই কাঁদছিস কেন?

নটু বালিসে মুখ লুকিয়ে বল্লে,—মাষ্টারমশাই আজ চলে' যাচ্ছেন, দিদি।

—কে চলে' যাচ্ছেন?

—মাষ্টারমশাই। কথাটা বলতে নটুর যেন গলা বুজে আসছে।

—চলে' যাচ্ছেন মানে? ললিতা চম্‌কে উঠলো: তোকে কে বল্লে?

—কে আর বল্‌বে! তিনি জিনিস পত্তর বেঁধে গাড়ির জন্যে বসে' আছেন।

ললিতা খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো: একেবারে আজই? কেন যাচ্ছেন কিছু জানিস? বাবা জানেন?

—জানি না। নটু ক্লান্ত, আচ্ছন্ন গলায় বল্লে,—হঠাৎ চলে' যাচ্ছেন, দিদি। বাবাকে খুঁজতে গেলাম, বাবা বাড়ি নেই।

—গেলে যাবেন, তার জন্যে তুই এতো ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? ললিতা আঁচলটা গায়ের উপর লতিয়ে দিতে-দিতে দরজার দিকে অগ্রসর হ'লো: চেষ্টা করলে আরো কতো ভালো মাষ্টার পাওয়া যাবে।

ললিতা স্খলিত, পিছল পায়ে একেবারে নিচে নেমে এলো। বলা-কওয়া-নেই, একেবারে সৌরাংশুর ঘরে। নটু যা বলেছিলো তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই—সৌরাংশুর বাঁধা-ছাঁদা সব তৈরি।

—এ কী, আপনি কোথায় চলেছেন?

গলার স্বরটা শীতের হাওয়ার মতো সৌরাংশুর মুখে যেন তীক্ষ্ণ, ঠাণ্ডা একটা ঝাপ্‌টা মারলো। ললিতাকে এখানে, এমন চেহারায় দেখবে বলে' সে কখনো আশা করে নি। শরীরময় দ্রুততার দীপ্তিতে মৃদু-মৃদু কাঁপছে, চুলে-আঁচলে ঈষৎ সে উদাসীন, অমনস্ক। ভুরু দু'টি অসহিষ্ণু, দুই চোখ অচঞ্চল শুভ্র, সমস্ত মুখে নিরুত্তাপ বিবর্ণতা।

—এ কী, আপনি চলেছেন নাকি কোথাও।

—হ্যাঁ। সৌরাংশু তার মনিব্যাগের ফোকর দু'টো পরীক্ষা করতে লাগলো।

—কোথায়?

—আপাততো কোনো একটা মেসে। তারপর দেখি কোথায় গিয়ে দাঁড়াই।

ললিতা নিষ্প্রাণ গলায় জিগ্‌গেস করলে: আপনি চিরকালের জন্যে চলে' যাচ্ছেন নাকি?

সৌরাংশু ম্লান একটু হাসলো; বল্লে,—চিরকালে আমি বিশ্বাস করি না। যেতে হচ্ছে, তাই যাচ্ছি। এর বেশি কিছু আর আমার জানবার নেই।

—কিন্তু কেন আপনাকে যেতে হচ্ছে? ললিতার জিজ্ঞাসাটা প্রায় একটা তিরস্কারের মতো শোনালো।

হাসিটি গাঢ়তায় ম্লানতরো করে' সৌরাংশু বল্লে,—তা আমি নিজেও কি কিছু জানি?

ললিতার চোখ যেন শুভ্রতায় আরো নিষ্পলক হ'য়ে এলো; রুক্ষ, পাথুরে গলায় সে বললে,—যেতে হচ্ছে তো আরো আগে কেন গেলেন না? এ-বাড়িতে হাত-পা আপনার কে বেঁধে রেখেছিলো শুনি?

সৌরাংশু চঞ্চল হ'য়ে বললে,—আগেই তো যাচ্ছি, যথেষ্ট আগে। আমাদের আসা-যাওয়ার আমরাই তো মালিক নই।

—নয়-ই তো। কথাটাকে প্রাঞ্জল করে' দেবার চেষ্টায় ললিতা জিগগেস করলে: কিন্তু বাবা জানেন? বলেছেন তাঁকে?

—দরকার নেই। সৌরাংশু শুকনো মুখে আবার একটু হাসির তরলিমা আনলো: এখানে আসবার আগেই তাঁর অনুমতির দরকার হয়েছিলো, এখন যাবার মুখে আমি স্বাধীন, এ-বাড়ির বাইরে আমার পৃথিবীর অসীমতা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

—এই বললেন আমাদের যাওয়া-আসার মালিক আমরা কেউ নই?

—নই-ই তো। ললিতার কথার সুরকে হুবহু নকল করে' সৌরাংশু স্মিতমুখে বল্লে,—ভাগ্যই তো আমাকে

ঠেলছে—যে-ভাগ্য আপনাকে একদিন আকস্মিক নিয়ে এসেছিলো এখানে।

ললিতা এক মুহূর্ত্ত থামলো। কথাটাকে যথাসম্ভব ব্যক্তিবিরহিত, প্রাত্যহিক আলাপের অন্তর্ভুক্ত রেখে সে বললে,—কিন্তু আপনার মাইনে-পত্র সব মিটিয়ে নিয়েছেন? বাবা আসুন, ততোক্ষণ দেরি করলে আপনার পৃথিবীর অসীমতা কিছু ফুরিয়ে যাবে না।

—যাবে না। সৌরাংশু গম্ভীর হ'য়ে গেলো: কিন্তু আমার কী পাওনা ছিলো, কী আমি পেতে পারতাম—ও-সব হিসেব খতিয়ে দেখবার আমার সময় নেই। যেটা আমরা সত্যি পাই না, সেটাও আমাদের জীবনে মস্ত বড়ো একটা পাওয়া হ'য়ে যেতে পারে।

ললিতা হঠাৎ দুর্ব্বিহ ব্যাকুলতায় অবসন্ন হ'য়ে উঠলো। কি বলবে কিছুই সে খুঁজে পেলো না। বল্‌লে,—কিন্তু আজই আপনার যাওয়া হয় কি করে'? নটুর আজ এইমাত্র ভীষণ জর এসে গেছে।

—জর এসে গেছে? সৌরাংশু উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে নিমেষে আবার জড়িয়ে গেলো: তাতে আমার যাওয়া আটকাচ্ছে কী করে'? আপনারাই তো সব আছেন, আমি তার কে, আমি তার কী করতে পারি? আমি তো আর তাকে নার্স করবার জন্যে মাইনে পেতাম না।

ললিতার মুখ নীরক্ত, পাংশু হয়ে গেলো। কাতর, অথচ কঠিন গলায় বললে,—নিষ্ঠুরতারো একটা সীমা আছে। আপনি তার কেউ না হ'তে পারেন, কিন্তু আপনি চলে' যাচ্ছেন শুনে সে অসহায়ের মতো চোখের জল ফেলছে। চোখের সামনে জল না দেখলে তো আপনারা আর কারুর দুঃখ বোঝেন না, তাই দয়া করে' উপরে গিয়ে নটুকে একবার দেখে আসুন। দেখে আসুন আপনাকে সে কতো ভালোবাসে। বলতে-বলতে ললিতারই দু' চোখ অশ্রুর আভাসে অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

সৌরাংশু রইলো স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে।

—জরে সে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে' আছে, আপনি চলে' যাবেন বলে' একেবারে অসহায়। বলুন, সে তো আপনার কাছে কোনো অপরাধ করে নি। অন্তত তার দুঃখ তো আপনার বোঝা উচিত। লোকে কি খালি পাওনারই হিসেব করে, তার থেকে দেবার কিছু কেউ দাবি করে না? নটু—নটুকে স্নেহ করলেও কি আপনার জাত যায়? ললিতার দুই চোখ ঘোলাটে, ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসতে লাগলো: সংসারে সমস্ত ভালোবাসাকে আঘাত করতে পারলেই কি মানুষ বড়ো হ'য়ে ওঠে?

সৌরাংশু নটুর শিয়রে এসে যখন বসলো তখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ললিতা অসুখের যেমন একটা চেহারা দিয়েছিলো, সৌরাংশুর হাতে জরটা তেমন কিছু ভীষণ মনে হ'লো না।

ললিতা বল্‌লে,—বসুন, বসে' থাকুন আরেকটু। জেগে উঠে আপনি সত্যি-সত্যি যান নি শুনলে সে কতো খুসি হ'বে।

কিন্তু, অলক্ষিতে কী যে ললিতা সেদিন গূঢ় ইসারা করেছিলো, দেখতে-দেখতে এক সপ্তাহের মধ্যে নটুর জরটা ঘোরালো হ'তে-হ'তে দাঁড়ালো গিয়ে টাইফয়েডে। বাড়ি ছেড়ে চলে' যাবার কথা সৌরাংশু আর ভাবতেও পারলো না। আর নটুর দিদিকে চাই সব সময়ে হাতের নাগালের মধ্যে। একটু উঠেছে টের পেয়েছে কি, অমনি তার কান্না।

ললিতা বল্‌লে,—বাবাকে তুলে দিয়ে আপনি এবার ঘুমুতে যান। সমানে তিন রাত্তির আপনি জাগছেন।

আর আপনি জাগছেন, রাত দিয়ে সেই অনিদ্রা পরিমাপ করা যাবে না। নটুর মাথার উপর থেকে আইস্‌-ব্যাগ্‌টা কপালের উপর নিয়ে এসে সৌরাংশু বল্‌লে,—বরং আপনিই গিয়ে একটু ঘুমুন। এখন বেশ ঘুমিয়েছে, আপনাকে খোঁজ করবে না।

—দরকার নেই, দু'জনেই জেগে থাকি।

ঘরের কোণে মাটির মিটিমিটি একটি বাতি জ্বলে, সমস্ত নিঃশব্দ শূন্য অন্ধকারে থাকে ব্যথার মতো ভার হ'য়ে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও থাকে জেগে, শব্দে ভেঙে পড়বার জন্যে উচ্চকিত হ'য়ে। কেউ তারা কোনো কথা কয় না, দেখতেও পায় না কেউ কাউকে স্পষ্ট করে', সে-অন্ধকারে প্রাত্যহিকতার সকল সীমা, সকল পরিচয় যেন মুছে হারিয়ে একাকার হ'য়ে যায়। ললিতা যে

সজ্ঞানে বেঁচে আছে এই সামান্য কথাটাও সে আর বিশ্বাস করতে চায় না।

অথচ সেই অপরিচিত, সেই বিশাল চিহ্নহীনতায়, মৃত্যুর নিবিড় সন্নিধানে বসে' ললিতা কী যেন সেদিন দেখতে পেলো, দেখতে পেলো তার হৃদয়ের অলৌকিক অন্ধকারে, সৌরাংশুর অশরীরী অস্তিত্বের ধূসরতায়। তার মনে হ'লো, সব যেন দিন-রাত্রির চলমানতায় একেবারে হারিয়ে যায় নি—কী যেন আছে, কি যেন আছে, নিরাপদ নিভৃত আশ্রয়ের মতো কী যেন আছে স্থির, কী যেন আছে সত্য। তারই সন্ধানে ঘরের মধ্যে বসে' ললিতা হাতড়ে ফিরেছে এই অন্ধকার, তারই সন্ধানে তার স্বামী, মহীপতি একদিন ঘরের বাঁধন কেটে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলো।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু-বিধবা

শ্রীসর্ব্বরঞ্জন বরাট, বি-এ

কোন্ বিধবারা খুলিল বিশ্বে
পুণ্যের লাগি' 'জহর-ব্রত',
ঝাঁপ দিল যাতে কুণ্ঠা-বিহীনা—
অযুত অনাথ ললনা যত ;

ব্রহ্মচর্য্যে, তপশ্চরণে,
দিন-চর্য্যের কঠোর বশে,
রুধিছে কাহারা ইন্দ্রিয়-হয়,
নশ্বর যত বাঞ্ছা রাশে !

দিব্যগরিমা, ভাস্বর জ্যোতি,
মঙ্গলময়ী দৃষ্টি কার ?
সাত্বিক ভোগে পুষ্ট শরীর,
নিখিল আত্ম বন্ধু যার !

আর্ত্তক্লিষ্ট পরিজন হেরি'
নয়নে কাহার বরষে জল,
ঝটিকাক্ষিপ্ত সংসার-ভেলা,
অটল রাখে গো কাহার বল !

ব্যাধি-বিষ-দাহে জরজর তনু,
কার কল্যাণ-পরশ লেগে,
ভুলে যায় গ্লানি তীক্ষ্ণ বেদনা,
নবীন জীবনে ওঠে সে জেগে !

বুক ভরা মধু, মাতৃ-কল্পা,
সে যে গো বিধবা-হিন্দু নারী,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে মূর্ত্ত সহায়,
শ্রান্তি-পিয়াসে তীর্থ-বারি।

পরলোকে স্যার উইলিয়ম প্রেন্টিস—

স্যার উইলিয়ম ডেভিড রাসেল প্রেন্টিস সহসা অন্ত্রপ্রদাহ রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ছাপ্পান্ন বৎসর হইয়াছিল।

ইনি বাংলা গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন। স্বীয় বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতায় তিনি শাসনবিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁর অতীত

মিঃ ডব্লিউ, ডি, আর, প্রেন্টিস

কর্ম্মজীবনে সর্ব্বত্রই একটা প্রতিভা ও দক্ষতার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে আপনার সুদৃঢ় চরিত্রবলে তিনি খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্টই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলা সরকার একজন উপযুক্ত ব্যক্তি হারাইলেন।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত বন্ধু-পরিজনবর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ—

জন্ম যার উত্তেজনায়, মরণ তার সুনিশ্চিত উহার অবসানে।

বিগত মহাসমরাবসানের এক প্রতিহিংসামূলক অশুভ আন্তর্জাতিক সন্ধির সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা পায়। বিজয়ী কর্ত্তৃক বিজিতের উপর ভার্সাই সন্ধি একরূপ জোরপূর্ব্বক চাপান হইয়াছিল। অনিচ্ছায় পরাজিত জাতিসমূহের সে সর্ত্ত সেদিন না মানিয়া লওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহের বীজ সেই মুহূর্ত্তেই উপ্ত হইয়াছিল হতবীর্য্য জাতির অন্তরে। শত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সে বীজ আজ লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে প্রকাশ্যে আত্মোদ্গম করিয়াছে, যা শক্তিহীন সঙ্ঘ আর চাপিয়া রাখিতে সমর্থ নয়, যতদিন না সে আপনার ভারে আপনি ভাঙ্গিয়া না পড়ে।

জেনেভার আন্তর্জাতিক মিলন-মন্দিরে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার জন্য সম্প্রতি যে সকল বৈঠক বসিয়াছে তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। জাতিসমূহের পারস্পরিক সহৃদয়তা ও সাহায্যের উপর উহার সাফল্য একান্তই নির্ভর করে। মাঞ্চুরিয়ার বিষয় লইয়া জাপান-জেনেভার মধ্যে মতদ্বৈধ ও অবশেষে জাপানের জেনেভা পরিত্যাগে লীগের সম্মানে সর্ব্বপ্রথম বড় রকম আঘাত করে। ইহার পর হইতে ঘটনার পর ঘটনায় জেনেভা-সংহতির মর্য্যাদায় একান্তই ভাঁটা পড়িয়াছে। আমেরিকার উদাসীনতা, বিশেষ করিয়া মার্কিণ সোভিয়েট বাণিজ্য-সন্ধির ফলে উহা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরাট্ আওতায় পড়ে। তারপর অস্ত্রসঙ্কোচ সমস্যা লইয়া জার্ম্মানীর রাষ্ট্র-সঙ্ঘ-ত্যাগ জেনেভার শেষ প্রয়োজনীয়তাটুকুরও পরিসমাপ্তি করিয়াছে। রোগশয্যায় শায়িত অসহায় বৃদ্ধের মত আক্ষেপ ও প্রলাপ করা ছাড়া লীগের অন্য উপায় নাই। সিনর মুসোলিনি এক বৎসর পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলেন, "The League is a sick man. It will not be proper for Italy to leave its bedside." এ রোগীর শয্যাপার্শ্ব ইতালী পরিত্যাগ করে নাই, কিন্তু ইহাতে তাহার মনোভাব বুঝিতে বাকী থাকে না। সোজাসুজি জেনেভা লীগ বলিতে এখন ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকেই

বুঝায়। যে আন্তর্জাতিক শান্তি ইহার উদ্দেশ্য তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থই হইয়াছে বলিতে হইবে।

লীগের প্রথম বোধন হয় কতকগুলি আদর্শবাদীর দ্বারা। এঁদের খুব দূরদর্শী বলা চলে না। গোড়ার গলদ নিরাময় করার প্রচেষ্টা এঁরা তখন করেন নাই। লীগের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছানুগত্য ভিন্ন ইহা ভিত্তিহীন। এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির যতদিন রাষ্ট্র-অর্থের স্বার্থ লইয়া মারামারি কাটাকাটি চলিবে, ততদিন এইরূপ আন্তর্জাতিক শান্তি-স্থাপনের প্রচেষ্টা শূন্যেই লাট খাইবে। জেনেভা লীগের যদি এখন কোন সত্যতা বা সত্যকার অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দুনিয়ার বুকে মানব-চৈতন্য এখনও জাগে নাই। সাম্য-মৈত্রী কথার কথা, জাতি-সমূহের হৃদয় এখনও অসূয়া

সিনর মুসোলিনী

বিদ্বেষে কলুষিত। বস্তুতন্ত্র বিশ্বে এখনও জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তির দ্বন্দ্বময় প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। অর্থনৈতিক জাতীয়তা আজিকার দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদিতার গর্ভেই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের বীজ সুপ্ত। পূর্ব্বযুগের ব্যষ্টি-স্বার্থ, যার ব্যাপক প্রতিচ্ছবি জাতীয় স্বার্থ, Laissez faire, ন্যাশনাল সভ্রেনটি, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুদ্ধ-বিগ্রহের মোহ আজও বিশ্ব-মানব-মন হইতে বিদূরতি হয় নাই। এমন বিষপূর্ণ আব্‌হাওয়ার মাঝে বিশ্বশান্তির আন্তরিক সদিচ্ছা লইয়া কোন আন্তর্জাতিক লীগের জন্ম সম্ভব নয়।

জাতি যেদিন ঠেকিয়া শিখিবে, সেইদিন লীগের হইবে সত্যকারের প্রতিষ্ঠা। কোন্ ভাবীকালে সে দিন আসিবে কে জানে?

জেনেভা-লীগের বর্ত্তমানের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করা নেহাৎ অন্ধতা। নিউ ইয়র্কের যুদ্ধ-প্রতিষেধক কংগ্রেস জেনেভা লীগকে শুধু উড়াইয়া দেওয়া নহে, অবাধ শ্লেষও করিয়াছে। চিৎ হইয়া থুথু ফেলিলে নিজের মুখেই আসিয়া পড়ে। সব জাতিকে লইয়াই এই লীগ গঠিত। প্রবাদ আছে, নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। আসলে লীগ একটা সাধারণ মঞ্চ, যেখানে আন্তর্জাতিক মনোভাবের আদান প্রদান, আলাপ আলোচনারও অন্ততঃ সুযোগ আছে। মাঞ্চুরিয়া-বিষয়ক জাপানের হঠকারিতার প্রতিবাদ অন্ততঃ লীগ করিয়াছে। মুখে জাপান যতই বড়াই করুক, অন্তর যে তার অলক্ষ্যে একটুখানি না কাঁপিয়াছিল, তাহা বলা সুকঠিন। ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে যদি আন্তর্জাতিক অবিচারের আলোচনার জন্যও এমনি একটি বিচার-কমিটী থাকিত, তাহা হইলে বিবাদমান জাতির মনের গুমোট কাটিয়া যাইবার অনেকখানি সুযোগ মিলিত। হয়তো আদৌ ইউরোপের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত কি না সন্দেহ।

সমাজ-স্বাস্থ্য-বিষয়ক জগতের কল্যাণ লইয়া এখনও জেনেভা-লীগ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু লীগের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলি যদি আপন কোলে ঝোল মাখাইবার প্রবৃত্তি পরিহার করিয়া না চলিতে পারে, তবে ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য। আবার অদূর ভবিষ্যতেই ধ্বংসের ভস্মস্তূপের মাঝে এইরূপ আন্তর্জাতিক লীগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবে। ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়া মানব-মনের প্রসারতার ক্রম ধরিয়া হয়তো একদিন এই মর্ত্ত্যের বুকে সমগ্র মানবের মিলন-তীর্থ রচিত হইবে।

জেনেভা ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা—

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা লইয়া জার্ম্মানী জেনেভার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেও, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা ও মীমাংসা করিতে অসম্মত নয়। এই সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব হার হিটলার ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে জানাইয়াছেন। হিটলারের প্রস্তাবগুলির মর্ম্মকথা মোটামুটি এই যে, নিরস্ত্রীকরণ-বিষয়ক আন্তর্জাতিক

সমস্ত সর্ত্ত সে মানিয়া লইতে রাজী আছে; কিন্তু তাকে প্রথমে সকলের সমানাধিকার দিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে জার্ম্মানীকে তিন লক্ষ সৈনিক, সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, উপযুক্ত রক্ষাত্মক অস্ত্রসম্ভার ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সমান সমান আক্রমণাত্মক সমরোপকরণের পূরা অধিকার দিতে হইবে।

তৃতীয় পক্ষের চোখে দেখিলে জার্ম্মানীর এ দাবী ন্যায্য। যতদিন জার্ম্মানীর এই দাবী পূরণ করা না হয়, ততদিন চতুঃশক্তির মাঝে সন্ধি সম্ভবও নয়, নিরাপদও নয়। বিজয়ী জাতির যথেচ্ছা ও সুবিধামত সর্ত্ত বরণ করিয়া লইবার মত দিন তার চলিয়া গিয়াছে।

আর্থার হেণ্ডারসন

ইতালী জার্ম্মানীতে ফ্যাসিষ্ট অভ্যুত্থানের স্বপ্নে বিভোর। ইংলণ্ড দূরে দূরে থাকিয়া 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র মতলবে আছে। মুস্কিল বাধিয়াছে প্রতিবাসী ফ্রান্সের। জার্ম্মানীর পুনরুত্থান মানেই ফ্রান্সের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য। আলসাস-লোরেণ জার্ম্মানী কোনদিন ভুলিতে পারিবে না।

জার্ম্মানীর এই প্রস্তাবে ও সৈনিক সংঘটন এবং রণোপকরণ সংগ্রহে ফ্রান্স কোন রকমেই স্বীকৃত হইতে পারিবে না; ইতিমধ্যেই সোজা উত্তর দিয়াছে "না"। ফ্রান্সের বৈদেশিক সচিব ও বেলিজিয়ামের বৈদেশিক সচিব একযোগে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের বাহিরে পৃথক্‌ভাবে চতুঃশক্তির মধ্যে কোন আলোচনা চালাইবারও তারা পক্ষপাতী নয়। জাতি-সঙ্ঘের কোন প্রকারের সংস্কারেও গররাজী নয়। অপর পক্ষে আন্তর্জাতিক সকল প্রকার বৈঠক ও আলোচনা নিছক নিষ্ফল ও প্রতিক্রিয়ামূলক বলিয়া জার্ম্মানীর ধারণা। ১৯৩২ সালে লুসেন-সন্ধির ফলে ইউরোপে যে আশা ও শান্তির আলো দেখা গিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী আন্তর্জাতিক নিষ্ফল বৈঠকে একরূপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ-সমস্যায় একরূপ নিরাশ হইয়াই আরথার হেণ্ডারসন স্বেচ্ছায় সভাপতির পদত্যাগ করিয়াছেন।

জার্ম্মানীর প্রস্তাব সম্পর্কে স্যার সাইমন প্যারিসে আসিয়াছেন। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

জেনেভায় ভারতীয় প্রতিনিধি—

জেনেভা আন্তর্জাতিক সিনেমাটোগ্রাফ্ ইনষ্টিটিউট বৈঠকে ডাঃ গাঙ্গুলী ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগ

ডাঃ গাঙ্গুলী

দিয়াছেন। তিনি ইতালীও পরিভ্রমণ করিতেছেন। ডাঃ গাঙ্গুলি ভারতের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবেন বলিয়াই আশা হয়।

আয়র্লণ্ড ও ইঙ্গ-আইরিশ সম্বন্ধ—

ঘরের শত্রু বিভীষণ যুগে যুগে সর্ব্বত্রই আছে। জেনারেল ও'ডাফি কেমন করিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ শান্তির অন্তরায় হইয়াছে তাহা আমরা গত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবর্ত্তকে" বলিয়াছি। নীল কোর্ত্তার দল ডি'ভেলেরার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বে-আইনী ঘোষিত হইবার পর যুব-সঙ্ঘ নামে আর একটি সংহতি জেনারেল ও'ডাফির নেতৃত্বে গড়িয়া উঠিবার প্রয়াস পায়। ওয়েষ্টপোর্টে এক বক্তৃতার ফলে জেনারেল ও'ডাফি বন্দী হন; এবং আরও কয়েকটি গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল কার্য্যের জন্য তাঁর হাইকোর্টে বিচার হয়। বিচারে জেনারেল ও'ডাফি খালাস পান। ডি'ভেলেরাও ছাড়িবার পাত্র নন। পুনরায় তাঁকে কয়েকটি গুরুতর অপরাধের চার্জ্জে বিচারে সোপর্দ্দ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। ডি'ভেলেরাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ও ঘোষণা উক্ত চার্জ্জের অন্যতম। ডি'ভেলেরার শক্ত মুঠায় জেনারেল ও'ডাফি কতখানি আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন তাহা দেখিবার বিষয়।

জেনারেল ও'ডাফি

* * *

ইঙ্গ-আইরিশ সম্বন্ধও দিনের পর দিন সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডের স্তুতি-মিনতি-ধম্‌কি কোন কিছুতেই আয়র্ল্যাণ্ড গলিবার নয়। ডি' ভ্যালেরা ও ব্রিটিশ মন্ত্রী মিঃ টমাসের শেষ পত্র-বিনিময়ের মধ্যে উভয় দেশের মনোভাব স্পষ্টাস্পষ্টিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডের পুরুষানুক্রমিক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া বাঁচিবার চেষ্টা যে যুগ যুগ ধরিয়া বৃটেনের বাহুবলের দ্বারা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা ডি' ভ্যালেরা গোপন করেন নাই।

স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ড ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন হইতে সকল প্রকার বাণিজ্যগত সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে—ইংলণ্ডের এ ভয় প্রদর্শন এবং প্রেম-মৈত্রী-মধুর সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া নবীন আয়র্ল্যাণ্ড স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বাঁচিবার অধিকারই দাবী করিয়াছে।

ভারতের সামরিক ব্যয়—

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় গোড়পত্তন হইতেই একদল বৃটিশ সৈন্যবাহিনী এদেশে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সমস্যা, এই সৈন্যবাহিনীর বিপুল ব্যয়ভার বহন লইয়া। ভারতই এতদিন যাবৎ এ বোঝা বহিয়া আসিতেছিল, অবশ্য একান্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া। এজন্য ব্রিটিশ দরবারে সে চিরদিন তার দুঃখের কাঁদুনী কাঁদিয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি, এই ভারতরক্ষী সৈনিকদলের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ব্রিটিশ পার্ল্যামেণ্ট কর্ত্তৃক ১৫,০০,০০০, পাউণ্ড মঞ্জুর হইয়াছে। ইহাতে দরিদ্র ভারতের ১৫ লক্ষ পাউণ্ড লাভ হইল, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই টাকাটা দেওয়ার জন্য উক্ত সৈন্যনিয়ন্ত্রণে ভারতের যে একটু কথা বলিবার অবসর ছিল তাহাও আর রহিল না।

সর্ব্বদল সম্মেলন—

শ্রীযুত দেবধর, কেলকার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় বোম্বাইয়ে ও পুণায় একটি সর্ব্বদল-সম্মেলনের বৈঠক বসাইবার জোগাড় চলিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়াছে।

শ্বেতপত্রের অপর্য্যাপ্ত অধিকারের বিস্তৃতি, অনির্দ্দিষ্ট ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কাল নির্দ্দিষ্ট করা ইত্যাদি উক্ত সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতীয় কংগ্রেসের আদর্শের সঙ্গে এই সম্মেলনের আদর্শের মিল হইবে না আশঙ্কায়, বোধ হয় কংগ্রেস ইহাতে অনিমন্ত্রিতই থাকিবে।

সর্ব্বদল-মুসলমান-বৈঠক—

লক্ষ্ণৌয়ে একটি সর্ব্বদল মুসলমান সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মৌলানা সৌকত আলী, মৌলানা হসরৎ মোহানী প্রভৃতি এই দলের উদ্যোগী।

এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য একদিকে বিভিন্ন দলের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা; অন্যদিকে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের প্রয়াস। মৌলানা সাহেবেরা আশা করেন, ইহার দ্বারা প্রধান মন্ত্রীর সম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সংশোধন করা সহজসাধ্য হইবে।

নিখিল ভারত মোসলেম কনফারেন্স, নিখিল ভারত মোসলেম লীগ প্রভৃতি মুসলমান-সংহতির। ইতিমধ্যেই এ সম্মেলনে যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ সাফাদ আহম্মদ, আগা খাঁ, গজনবী প্রভৃতি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রধান পুরোহিতগণ মুখে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সপক্ষে শ্রুতিমধুর বুলি আওড়াইলেও সম্প্রতি তাঁদের বিবৃতির মধ্য দিয়া যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্বন্ধে স্বাভাবিকই সন্দেহ আসে।

দলাই লামা—

বিগত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে তিব্বতের ত্রয়োদশ দলাই লামা ষাট বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হওয়ায় মধ্য এশিয়ায় একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটিল।

দলাই লামা

তিব্বতের আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপ সাধারণতঃ আমাদের নিকটে অজ্ঞাত। ভারতের উত্তর সীমান্তের পার্ব্বত্যজাতি-সমূহের উপর দলাই লামার ব্যক্তিত্বের প্রভাব কম নয়। পরলোকগত দলাই লামার সময়ে তিব্বত রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দলাই লামা একাধারে তিব্বতের ধর্ম্মগুরু ও শাসক।

যুগ-যুগের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার উপেক্ষা করিয়া আজও তিব্বতের রাজসিংহাসন কেন্দ্র করিয়া অতীত যুগের সংস্কার বর্ত্তমান আছে। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে ছোকরগেলস্থিত মিউলিংথিং হ্রদের তীরে পাঠান হয়। সাবালক হইবার পরে তিনি লাসায় ফিরিয়া আসিয়া তিব্বতের রাজা হন। ১৯০১ সালে ব্রিটিশ মিশনের আগমনে তিনি সেখান হইতে পলায়ন করেন এবং ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত মঙ্গোলিয়া ও চীনে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। এই দুঃসময়ে তাঁর ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক দোয়াজিক্ নামধেয় একজন বুরিয়াৎ লামা সর্ব্বদাই তাঁর পাশে পাশে থাকিতেন। ১৯০৯ সালে তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে আবার চীনাদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ব্রিটিশ-রাজের আতিথ্যে দার্জ্জিলিং'এ বসবাস করেন। ১৯১২ সালে চৈনিক বিদ্রোহের কালে তিব্বতে চীনের শক্তি হতবল হইয়া পড়িলে দেশবাসীর সাহায্যে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পান এবং সেই সময় হইতে তিনি অপ্রতিহতভাবে তিব্বতের রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন।

তিব্বতে রাজ-নির্ব্বাচনের অভিনব ধরণ—

রূপকথার সেই শ্বেতহস্তীর দ্বারা ভাবী রাজা-নিরূপণের মতই তিব্বতের রাজা-নির্ব্বাচনের কৌশল কৌতূহলপ্রদ।

তিব্বতবাসীর ধর্ম্মগত বিশ্বাস এই যে, রাজা মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই পুনরায় ঐ দেশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাই কোন দালাই লামার মৃত্যুর পরেই দিকে দিকে দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মসংস্থার নিকট দূত প্রেরণা করা হয়, সুলক্ষণ-সম্পন্ন সকল সদ্যজাত শিশুকে রাজধানীতে হাজির করিবার জন্য। সেখানে গনদেল, সেরা ও ডিপোংয়ের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া স্থির করেন, উহাদের মধ্যে কে ভূতপূর্ব্ব রাজার অবতার এবং তাঁদের নির্ব্বাচিত ভাগ্যবান্ শিশুটিই হয় তিব্বতের ভাবী রাজা।

রোমে ছাত্র-সম্মেলন—

সম্প্রতি রোম নগরীতে এশিয়াবাসী ছাত্রদিগের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্মিলনীতে চীন, জাপান,

ভারত, পারস্য, শ্যাম, মিশর ও আফগানিস্থানের প্রায় ছয়শত ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং মুসোলিনি সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, ইতিহাসের সাক্ষ্য দৃষ্টে বুঝা যায় যে রোম ও প্রাচীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুই বার মানব-সভ্যতা রক্ষা পাইয়াছে। "প্রাচী ও প্রতীচী কখন মিলিতে পারে না"—ইংরাজ কবি কিপলিংয়ের এই গাথার প্রতিবাদ তিনি করেন।

এই সম্মিলনের ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে মনোভাব-বিনিময়ের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

মৃত্যুদণ্ড ও অদৃষ্টের পরিহাস—

কিছুদিন পূর্ব্বে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে জনৈক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর ফাঁসী হইয়া যায়। আসামীর ফাঁসী হইবার চল্লিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিবার জন্য এক হুকুমনামা আসে, কিন্তু উহা যে মোড়কের মধ্যে ছিল তাহা জেল-কর্ত্তৃপক্ষ যথাকালে না পড়ার জন্য এই শোচনীয় ঘটনা ঘটে।

এইজন্য এক তদন্ত হয়। খামের উপর 'জরুরী' নির্দ্দেশ না থাকায় এই অনবধানতা সংঘটিত হয়। এজন্য বড়লাটের দপ্তরখানার দুইজন কর্ম্মচারীকে দায়ী করা হইয়াছে এবং তাহাদের উপযুক্ত শাস্তিরও ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতীয় প্রাচ্য-তত্ত্ব-সম্মেলন—

বরোদার ন্যায়-মন্দিরে ভারতীয় প্রাচ্যতত্ত্বসম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক বৈঠক বসে। বরোদার গাইকোয়ার এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাও উহার অন্যতম কামনা। প্রাদেশিক ভাষায় জ্ঞানদানের এবং ভারতীয় ইতিহাসের সবিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা সম্মিলনে স্বীকৃত হয়। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণের সমন্বয় ও মনীষার মিলনের মধ্য দিয়া এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে, কারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংযোগ পারস্পরিক দেশের মধ্যে আছে।
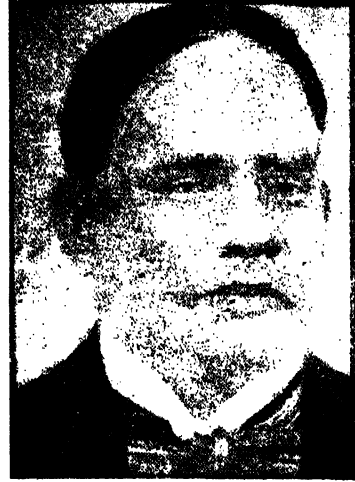
মিঃ কে, পি, যশোয়াল

সম্মেলনের সাধারণ সভাপতি মিঃ কে, পি, যশোয়াল প্রাচীনভারত সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ যশোয়াল পাটনা হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার।

দেশী বনাম বিদেশী ভাষা—

বিদেশী ভাষার প্রভাবে ভারতীয় চিত্ত যে কতখানি অধঃপতিত হইয়াছে, তাহা আইরিশ কবি ইয়টসের মুখ দিয়া সেদিন লণ্ডন পি, ই, এন ক্লাবে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাহির হইয়াছে।

কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "ভারতে ইংরাজী-ভাষায় উচ্চ শিক্ষাদান ও সরকারী কার্য্য পরিচালিত করিতে বাধ্য করিয়া ইংলণ্ড ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিয়াছে। জননীর নিকট হইতে লোকে যে ভাষা শিখিয়াছে, সে ভাষা ব্যতীত চিন্তা করিতে পারে না।"

উক্ত সময়ে উপস্থিত দুইজন ভারতীয় লেখককে ডাঃ ইয়েটস ইংরাজীভাষা-বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে বলেন। ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে ভারতে এক যুব-আন্দোলন হওয়া উচিত বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

নিখিল ভারত সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যালয়—

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল পরিচালিত নিখিল ভারত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড কর্ত্তৃক জাতি-ধর্ম্ম-রাষ্ট্র নির্ব্বিশেষে সংস্কৃত সাহিত্য-ভাষা-দর্শন-তত্ত্ব বিষয়ক উচ্চ গবেষণাকারীদিগকে Ph D. ও D. O. C. (Doctor of Oriental Culture) উপাধি প্রদত্ত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই খেতাব ভারতে এবং বহির্ভারতে সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইবে। অতএব ডিগ্রীধারীদের উহা স্ব স্ব নামের সঙ্গে উল্লেখ করিতে কোন বাধা হইবে না।

দেবভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের গর্ভে যে অমূল্য জ্ঞান-সম্পদ্ অবহেলায় অজ্ঞাত আছে, তাহার প্রতি জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উদ্যোগ করিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই ইঁহারা ধন্যবাদার্হ।

ফিলম্ জগৎ—

সৌন্দর্য্য ও রসানুভূতি সৃষ্টির গোড়ার কথা। ইহার উপরই সারা প্রকাশমান বিশ্বসৃষ্টি লীলায়িত। এ রসাস্বাদনে মানুষের অবসাদ আসে বা ইহা স্বাস্থ্য দিতে অসমর্থ হয়

রঙ্গনেত্রী গ্রেটা গার্ব্বো

তখনই, যখন সে মূলের, গভীর অতলের, অলক্ষ্য অখণ্ড রসবস্তুকে হারাইয়া ফেলে। সকল শিল্প-কলার পিছনে কিন্তু আছে এই পরম রসোৎসের সঙ্গে যুক্তির প্রেরণা। তাই যেখানে বা যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই কলার সুষ্ঠু প্রকাশ হয়, সেখানেই মানবমনের সবিস্ময় অর্ঘ্য অর্পিত হয়।

ম্যাডালিন কেরল
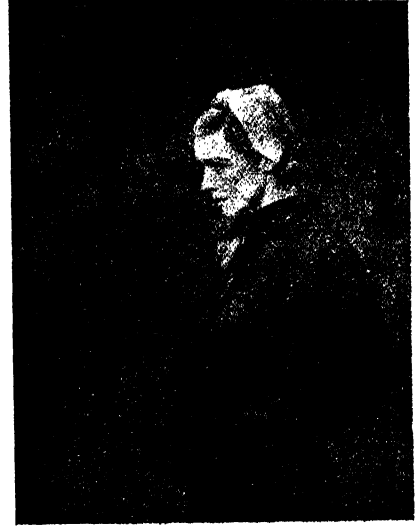
তরুণী রূপসী রঙ্গনেত্রী গ্রেটা গার্ব্বো আজ বিশ্বের বিস্ময়। তার অপূর্ব্ব প্রতিভা আজ বিশ্ববিদিত। পৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমানে সব চেয়ে জনপ্রিয় কে? একখানি সাময়িক ইংরাজী পত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরের এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষকণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠে গ্রেটার নাম।

রহস্যে ঘেরা এই গ্রেটার জীবন। ষ্টকহল্‌মের সামান্য এক নাপিতের দোকানে পরিচারিকা-রূপে তার শৈশব জীবনারম্ভ হয়; কিন্তু আজ সে ফিলম্-জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্য্য গ্রেটার কলঙ্কহীন নিষ্কলুষ চরিত্র—আপনার ভাবে সে নিবিড়ভাবে সমাহিতা, অন্যজ্ঞানশূন্যা। অন্তর-ঢালা অভিনয়ের ভূমিকায় তাই সে এমন সজীব, এমন মর্ম্মস্পর্শী।

এনাষ্টেন—"কণ্টিনেণ্টাল ষ্টার"

এই প্রসঙ্গে ম্যাডালিন কেরল ও এনাষ্টেনের নামও উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তা বর্ত্তমানে "কন্‌টিনেণ্টাল ষ্টার" বলিয়া অভিহিতা।

তুর্কিতে সংস্কৃত-চর্চ্চা—

গোঁড়ামীবর্জ্জিত, তুরস্কের নবজাগরণের একটা সুলক্ষণ এই যে, ইহা বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে নাই। মনের দরজা আজ তার উন্মুক্ত বিশ্বের আলোক গ্রহণের জন্য। তুরস্কের পুনর্গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন ও সংস্কৃত শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। এজন্য চারিজন ইউরোপীয় অধ্যাপকও নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহারা বেদ ও অন্যান্য দর্শন বিষয় পুস্তকগুলি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করিবেন।

দুঃখের কথা এই যে, যে দেশে এই দেবভাষার আদি জন্মস্থান, সেই দেশেই উহা আজও অবহেলিত। হয়তো বিদেশীরাই এ বিষয়ে আমাদের চোখ খুলিবে।

মার্কিণে ধর্ম্ম-বিস্তার—

সর্ব্বসাধারণ বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্ম-ভাব জাগরিত হয়, সে জন্য মার্কিণ মুলুকে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্ম-শিক্ষার ফলে ছেলেদের মনোবৃত্তি যে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সম্প্রতি পুস্তিকার সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। আওয়া, ইলিয়ান প্রভৃতি স্থানে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থার সুফল ফলিয়াছে। আইন করিয়া স্কুলে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রচলিত করিবার প্রতিষ্ঠাও চলিয়াছে। উনচল্লিশ নম্বর পুস্তিকায় এইরূপ বাধ্যতামূলক ধর্ম্মোপদেশের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লিখিত আছে।

অষ্ট্রীয়ায় পোপের প্রভাব—

অষ্ট্রীয়াতে ক্যাথলিক প্রভাব আজও যে অক্ষুণ্ণ, তা সম্প্রতি ক্যাথলিক কংগ্রেসে অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সলার ডলফাসের কথা হইতেই বুঝা যায়। তিনি বলেন, "We wish to establish a Christian-German state in our native country. We only need to follow the last Encychicals of the Holy Father. They are to us a guide in the formation of our state."

মধ্য ইউরোপে ক্যাথলিক জাগরণের সাড়া পুনরায় লক্ষিত হয়। সম্প্রতি রোম হইতে পোপ কর্ত্তৃক যে শ্রমিক সম্বন্ধীয় এক ফতোয়া (latest Encychical of Pope on labour; Qudragesmo Anno) বাহির হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া অষ্ট্রীয়ার জাতীয় জীবন পুনঃসংগঠনের প্রয়াস পাইতেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ডলফাস অষ্ট্রীয়ার জাতীয় ইচ্ছার অভিব্যক্তিই এই সভায় দিয়াছেন।

আমেরিকায় ধর্ম্ম-জাগরণ—

গীতার বাণী—যেখানে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সেখানে ভগবান আত্মমায়ায় অবতীর্ণ হইয়া সে গ্লানি অপনীত করেন। সে দেশ বা জাতীয় চিত্ত তখন বস্তুতঃ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে পরমের জন্য। মার্কিণের অন্তরের অন্তরালে যে এই ভাব জাগিতে সুরু করিয়াছে, তা সেখানকার মনীষিগণের ভাব ও চিন্তাধারা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়।

'Religion is a great force that has lifted man out of his selfishness and savagery." স্প্রিংফিল্ডের বিশপ সম্প্রতি এক ধর্ম্মসভায় এই বাণী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রতীচ্যের অন্যতম ধর্ম্মগুরু। তিনি নিজের জন্য, প্রতিবাসীর জন্য, দেশের জন্য সকলকেই এই ধর্ম্মজাগরণে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপ্রভাবকে অস্বীকার করিয়া মনুষ্যজীবনের রহস্য সমাধান করা বা কোন রাষ্ট্রের সনাতন প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব নয়। যাঁহারা ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা সত্যকারের স্বজাতিদ্রোহী।

তিনি মার্কিণবাসীদিগকে সাবধান করিতে গিয়া বলেন যে, একমাত্র স্বার্থপরতাই বর্ত্তমান দুনিয়ার প্রভু। কেবলমাত্র যুক্তি-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া যখনই কোন জাতি দাঁড়াইতে চাহিয়াছে, তখনই উহার পতন হইয়াছে। গ্রীস এবং রোমের পতনের কারণও তাহাই। যুক্তরাষ্ট্রকেও এই রোগে পাইয়াছে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির চেতনা—

সভাপতি রুজভেল্ট একজন পাকা বৈষয়িক। অর্থ ও রাষ্ট্র লইয়াই তাঁর কারবার। অনেক অভিজ্ঞতার পর

সম্প্রতি স্থাশনাল কনফারেন্স অফ্ ক্যাথলিক চ্যারিটি সভায় তিনি একটা খুব সত্য কথা বলিয়াছেন। তাহা আজিকার একান্ত জড়বাদী বিশ্বের প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন, ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের বস্তু। বর্ত্তমানের সকল কঠিনতা ও বিপদের মধ্যে ঈশ্বরের অলক্ষ্য পরিচালনার উপর অটুট অবস্থাই জাতিকে বিজয়ী করিবে। তিনি জড়ের উপর ধর্ম্মের প্রভাব স্বীকার করিয়া মুক্তকণ্ঠেই বলেন, "spiritual values count in the long run more than material values" আইন বা প্রচার দ্বারা দেশ হইতে ধর্ম্মকে বিতাড়িত করা বা জাতীয় চিত্ত হইতে ধর্ম্ম-সংস্কার নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা তিনি নিরর্থক ও অসম্ভব মনে করেন। কারণ মানুষের স্বভাবের সঙ্গে ধর্ম্মভাব অচ্ছেদ্যভাবে সংমিশ্রিত। মানবতার সুষ্ঠু ক্রমবিকাশের পথে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগে ছিল এবং এখনও আছে।

আমেরিকায় উক্ত ধর্ম্ম-সভায় দেশ-বিদেশের যে সকল ক্যাথলিক ধর্ম্মবীর যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বর্ত্তমান সিনেমা-জগৎ তরুণ চিত্তকে বিশেষভাবে কলুষিত করিতেছে এবং সিনেমাকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্যও উক্ত বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ায় ধর্ম্ম-বিরুদ্ধতার ব্যর্থতা—

ধরিত্রীর বুক হইতে ধর্ম্মের পাট একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রচেষ্টা সোভিয়েট রুশিয়ায় যেমন করিয়া হইয়াছে এমন আর কুত্রাপি কোনদিন হয় নাই। মানব চিত্ত হইতে ধর্ম্মভাব নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সম্ভব কি না তাহা রুশিয়ার দীর্ঘদিনের ধর্ম্মবিমুখিন আন্দোলনের ফলাফল দেখিয়া একটা সন্দেহই জাগে।

সোভিয়েট নাস্তিক-সংহতির এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, রুশিয়ার সর্ব্বসাধারণ যদিও রবিবার বা ছুটীর দিনে কাজ করে কিন্তু কম করে। অবশ্য ইহা যে দায়ে পড়িয়া ভয়ে-ভয়ে করা তাহা সুনিশ্চিত। অধিকাংশ সম্প্রদায়ের কৃষকদিগের শতকরা ৭৭ জনই ধর্ম্মবিষয়ক পবিত্র ছবি ঘরে রাখে, ২৩ জন ধর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্চমত পোষণ করে, ৩০ জন বিশ্বাস করে যে, ধর্ম্ম কোন অনিষ্ট করিতে পারে না এবং মাত্র ১৮ জন নিছক নাস্তিক। সহর হইতে সুদূর মফঃস্বলের বাসীন্দাদের মধ্যে এখনও ধর্ম্মভাব যথেষ্টই লক্ষিত হয়। এদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন কৃষকের ঘরে ঘরে ছবি, মূর্ত্তি প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত ও সম্মানিত হইয়া থাকে এবং বাকী দশজন তাদের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

অনিশ্বরবাদ প্রচারের জন্য মস্কো ও কিভে যে দুইটী মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে মাত্র ১২,৩৬৭ ও ১৩,৬৭৮ জন দর্শক হইয়াছিল। এই উপস্থিতি প্রধানতঃ বাধ্যতামূলক ও সোভিয়েট প্রভাবান্বিত।

ডাঃ টমাস হাণ্ট মরগ্যান—

১৯৩৩ সালের নোবেল মেডিক্যাল প্রাইজ পাইয়াছেন কালিফর্ণিয়া মেডিক্যাল ইনষ্টিটুটের গবেষণাবিদ্ পণ্ডিত
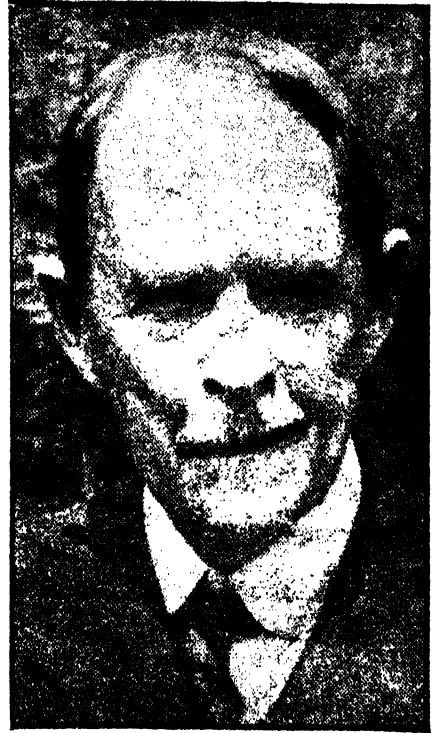
ডাঃ টমাস হাণ্ট মরগ্যান

ডাঃ টমাস হাণ্ট মরগ্যান। দীর্ঘদিনের ক্রমোসমেন্সের ইউজনিক সম্বন্ধীয় গবেষণা কৃতিত্বের জন্যই তাঁর এই পুরস্কার।

গীতার যোগ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য"—এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, প্রাণ এই ঊর্দ্ধক্ষেত্রে উত্তোলিত হইলে, তবেই দিব্য পরমপুরুষকে সন্দর্শন করা যায় এবং ইহা প্রয়াণকালে করিতে হইবে। সারা জীবনের অভ্যাসযোগেই ইহা সম্ভব, মৃত্যুকালে অকস্মাৎ প্রাণকে ভ্রূদ্বয় মধ্যে উত্তোলিত করা যায় না।

অতএব প্রাণকে ভ্রূদ্বয় মধ্যে সংস্থিত করার অভ্যাস রাখিলে, সঙ্কটকালে ইহার প্রয়োজন হইবে। সর্ব্বদাই যদি ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণ তুলিয়া রাখার কথা থাকিত, তাহা হইলে, "প্রয়াণকালে" একথার উল্লেখ হইত না। যে যোগী ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণ সংরক্ষণ করার কৌশল অবগত আছেন, তিনিই উহা পারিবেন, এবং এই যোগী অন্য সময়ে প্রাণকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধা দেন না; প্রাণ বশীভূত হইলে দেহীর ইহাতে বাধা দেওয়ার কারণও নাই।

প্রাণ সম্বন্ধে যোগাদি শাস্ত্রে বিশেষ বিবরণ আছে; আমরা এই প্রাণশিল্প সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিব, তাহাতে এই অলৌকিক যোগরহস্যের দুর্ব্বোধ্য যবনিকাখানি আমাদের সম্মুখ হইতে অপসরিত হইবে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে আছে—"দেহী নিত্যমবধ্যঃ"—সকলের দেহে এই দেহীর বিদ্যমানতা আছে, দেহের সহিত দেহীর সম্বন্ধ প্রাণসূত্রে। "আত্মন্ এব প্রাণজায়তে", আত্মা হইতেই প্রাণ সঞ্জাত হয়। দেহীর সঙ্কল্পাত্মক ভাব হইতেই মন, যদিও প্রাণ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, কিন্তু মনের প্রভাবেই প্রাণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মন স্থির হইলে প্রাণও স্থির হয়। মন আত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ, জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে। জীবধারের সহিত প্রাণের সংযুক্তি অসংখ্য নাড়ীর মধ্য দিয়াই সিদ্ধ হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে হৃদয়-কেন্দ্র হইতে এইরূপ একশত একটী প্রধান নাড়ীর উৎসরিত হওয়ার কথা উল্লিখিত আছে; প্রত্যেক নাড়ীর সহিত একশত শাখা নাড়ী সংযুক্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আবার এই সকল শাখানাড়ীর সহিত তাহাও হাজার সূক্ষ্মনাড়ী প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কার্য্যক্ষম করিয়াছে। প্রাণই এই নাড়ী-রাজ্যের সম্রাট্। তিনি নিজেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া, এই অসংখ্য নাড়ী-গুলিকে যথাক্রমে শাসন করেন। পায়ু ও উপস্থদেশে অপানবায়ু কার্য্য করে, তদূর্দ্ধে সমান, চক্ষু-কর্ণ-মুখ ও নাসিকায় প্রধান প্রাণ বিচরণ করেন। চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে প্রাণায়াম সাধনের সঙ্কেত থাকে—"অপানে জুহ্বতি প্রাণং" অর্থাৎ প্রাণকে দেহ হইতে সংহরণ করিয়া লইতে হইলে, প্রাণের সহিত অপানকে সংযুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া দিতে হইবে।

যে প্রণালীতে ইহা সিদ্ধ হয়, তাহার কথা যোগাদি শাস্ত্রে আছে। যে সকল নাড়ী দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত রহিয়াছে, প্রধান প্রাণ, অপানকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সকল নাড়ী হইতে অন্যান্য প্রাণও মূল প্রাণের সহিত সন্নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণকে স্থির করিলে সর্ব্বাঙ্গ এইজন্য নিশ্চল হয়। অসংখ্য নাড়ীগুলির নাম আছে; ইহাদের মধ্যে প্রাণায়ামপরায়ণদিগের নিকট ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষম্না নাড়ী বিশেষভাবে পরিচিত; কেন না, "প্রাণাপানগতীরুদ্ধা" করিতে হইলে, এই নাড়ীগুলির পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

মনুষ্যদেহের প্রধান কাণ্ড মেরুদণ্ড। লিঙ্গের ঊর্দ্ধে ও নাভির অধঃ প্রদেশে যে গ্রন্থীগুলি, সেইখান হইতে অসংখ্য নাড়ীসমুদয় শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষেত্র হইতেই অতি সূক্ষ্ম সুষুম্না নাড়ী মস্তক প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহার উভয় পার্শ্বে ঈড়া ও পিঙ্গলা অবস্থান করে। বামে ঈড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষম্না। সুষম্নার মধ্যদেশে বজ্রাখ্যা নামে আর এক নাড়ী আছে, ইহার

মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্মতর চিত্রিনী নাড়ী, তাহার মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। প্রাণ স্থির হইলে, এই নাড়ীপ্রণালী ধরিয়া জীবচৈতন্য ঊর্দ্ধে গিয়া উপনীত হয়।

সুষম্নানাড়ীমধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ী সংলগ্ন, মূল স্কন্ধ হইতে মস্তিষ্ককোষ পর্য্যন্ত পর পর সাতটী নাড়ীচক্র আছে। প্রথমটীর নাম মূলাধার, ইহার উপরে স্বাধিষ্ঠান, তাহার উপরে মণিপুর, মণিপুরের উপরে অনাহত, তাহার উপর বিশুদ্ধ, ভ্রূদ্বয়-মধ্যে আজ্ঞাচক্র, মস্তিষ্ককোষে সহস্রদল-চক্র অবস্থিত।

নাড়ীচক্রের নাম হইতেই ক্ষেত্রের গুণ, প্রকৃতি ও কর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়।

মূলাধার চক্র চতুর্দ্দল মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্রাঙ্কিত। এইখানে জীবচৈতন্য স্বয়ম্ভূলিঙ্গবৎ অবস্থিত। প্রতি দল বর্ণাঙ্কিত—বং, শং, ষং ও সং, এই চারিটী বর্ণের ইহা আধার ক্ষেত্র, মধ্যে লং বীজ বর্ত্তমান আছে। সর্পরূপা কুণ্ডলিনী-শক্তি এই চক্রে অবস্থান করেন। তন্ত্র ইহাকে ডাকিনী শক্তি বলা হইয়াছে।

আত্মতত্ত্বের জ্ঞানসাধনায় আত্মবিস্মৃত দেহচেতনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্প স্বতঃই সাধকের নয়নে প্রতিভাসিত হয়, বিজ্ঞানের আলোকে প্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুশীলন হইয়া থাকে; কিন্তু অপ্রত্যক্ষ দেহরচনায় সূক্ষ্মতত্ত্ব যোগদৃষ্টি ব্যতীত প্রতীত হইবার নহে। অস্থি, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, রস, বীর্য্য যে সূক্ষ্মদেহ আবেষ্টন করিয়া বিধৃত, স্থূল শরীর রূপে পরিণত, সেই সূক্ষ্ম রচনার ক্ষেত্র আত্মধ্যাননিরত যোগীর নিকট প্রত্যক্ষ। মেরুদণ্ডের অস্থিখণ্ডগুলি একের পর অন্যটী স্থাপন করিয়া ইহা ঋজু অখণ্ডভাবে গ্রথিত হয় নাই; যে বস্তুর আবরণস্বরূপ ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, উহাই জীবদেহের স্থূল প্রকাশের মূল উপাদান, পর পর ছয়টী চক্র স্থাপন করিয়া, চক্রমধ্যে ব্রহ্মনাড়ী, তাহার উপর চিত্রিনী, তাহার উপর সুষম্না, দুই পার্শ্বে ঈড়া, পিঙ্গলা, তাহার উপর স্থূলের পর স্থূল আবরণের প্রলেপ, অবশেষে কঠিন অস্থির আবরণে ইহা সুরক্ষিত হইয়াছে। অন্তর্নিহিত নাড়ীনিচয়ের সহিত বহিরাবরণের স্থূল নাড়ীগুলির সংযোগ থাকায়, ব্রহ্মনাড়ীর সঙ্কেত সমগ্র জীবদেহটাকে পরিচালিত করে। এই ব্রহ্মনাড়ী মধ্যস্থিত চৈতন্য, একদিকে ঈশ্বর ও অন্যদিকে সৃজনমুখী প্রেরণা, এই উভয় সঙ্কটে আত্মভোলা শিবের ন্যায়, যেন গোলক-ধাঁধায় নাকাল হইয়াছেন; সৃষ্টি, তাহার জন্ম, মরণের ভিতর দিয়া পুনরায় যে জন্ম, তাহা তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, দিব্যজন্ম নহে; এইজন্য জীব-ভাবে, শিবেরই সাধন চলিতে থাকে, জীবাধারে ঈশ্বরই সাধকরূপে আত্মস্বরূপ লাভের তপস্যা করেন—তাই জীবনটাই সাধনা, কঠোর তপস্যা, ভগবানই সাধক, ভগবানই যোগী।

এই দিব্যজন্মের সঙ্কেত গীতায় আছে। আমরা যথা-সময়ে তাহা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। উপস্থিত মূলাধার পথে, জীবচৈতন্যকে স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপে দেখা যায়। শিবের সহিত প্রধানশক্তি সর্পাকারে কুণ্ডলিত, ইহার নাম ডাকিনী। ডাকিনী শিব-কালীরই অংশ; কালী সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদা। ইহাকে ঘিরিয়া জ্যোতির্ম্ময় বর্ণমালা বিরাজিত। বর্ণগুলি পঞ্চদেব, পঞ্চপ্রাণ ও ত্রিগুণাত্মক, সৃষ্টির বীজ ইহাদের মধ্যে নিহিত। ভাগবদিচ্ছার সঙ্কেত মাত্র, মহাশক্তি মুহূর্ত্তে অস্ত্র-সজ্জিতা হইয়া যেন অভিযান করিবেন। আত্মজয়ের এই প্রথম দুর্গে শক্তিপীঠের কোটীসূর্য্যসমপ্রভ শোভা সাধকেরই মনোহরণ করে। সাধনার পথে এই দর্শনই চক্রের পর চক্র ভেদ করিয়া অধিরোহণের শক্তি ও উৎসাহ যোগান দেয়।

ইহার উপরে স্বাধিষ্ঠান চক্র; ইহা ষড়দলে বিভূষিত। প্রতি দল বং, ভং, মং, যং, রং এবং লং বর্ণরঞ্জিত। মধ্যস্থলে বরুণবীজ বং। এই চক্রস্থিত শক্তির নাম রাকিনী। বরুণ ধনেশ্বর ঐশ্বর্য্যের দ্যোতক; তাই রাকিনী-শক্তি অর্থাৎ স্বয়ং লক্ষ্মী "নানায়ুধোদ্যতকরৈর্লসিতাঙ্গ দিব্যাম্বরা-ভরণভূষিতা" হইয়া বিরাজিত।

তৃতীয় চক্র মণিপুর। ইহার স্থান নাভিমূল, দশদল-শোভিত পদ্মের ন্যায় শোভাশালী। মধ্যস্থলে অগ্নিমণ্ডল তেজোবীজ রং মন্ত্র অবস্থান করিতেছে। দশ দলে দশটী বর্ণ—ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং এবং ফং। মণিপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লাকিনী শক্তি। ইনি রুদ্রাণী, সৃষ্টি সংহারকারী মহাশক্তি।

চতুর্থ চক্র অনাহত। ইহা দ্বাদশদলবিশিষ্ট।

মধ্যস্থলে বায়ুমণ্ডল। যং এই পবন বীজ ইহার মধ্যে অবস্থিত। দ্বাদশ দলে দ্বাদশ বর্ণ কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং এবং ঠং বিদ্যমান আছে। এই ক্ষেত্রে কাকিনী শক্তি বিরাজ করেন। ইনি নব-তড়িৎ-নিভা, ত্রিনেত্রা, সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা, সর্ব্বজনহিতকারিণী মহালক্ষ্মী।

পঞ্চম চক্রের নাম বিশুদ্ধ চক্র। কণ্ঠক্ষেত্রে ইহার স্থান। ষোড়শ দলে ইহা পরিশোভিত। মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ সমুজ্জ্বল গগন মধ্যে হং বীজ বিরাজিত। ষোড়শ দলে বারটী স্বরবর্ণ এবং দীর্ঘ ঋ, দীর্ঘ ৯ ও অং, অঃ শোভা পাইতেছে। এইখানে শাকিনী শক্তি বিরাজ করেন। "সুধাসিন্ধো সুধানিবসতে কমলে শাকিনী পীতবস্ত্রা" এই মহাশক্তির সহায়তায় জীবর কণ্ঠে নব নব ঋক্‌ধ্বনি উঠিয়া থাকে। এই বিশুদ্ধ চক্রে জীবচৈতন্য উন্নীত হইলে, মানুষ কবি, বাগ্মী, জ্ঞানী হয়।

ইহার উর্দ্ধে ভ্রূ-মধ্যে আজ্ঞাচক্রের স্থান। এই চক্র দ্বিদল। মধ্যস্থলে শিবসুন্দর বিরাজ করিতেছেন। দুই দলে হং ও ক্ষং এই দুই বর্ণ আছে। শক্তির নাম হাকিনী। "সা শশিসম ধবলা বজ্রষ্টকং দধানা, বিদ্যামুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটী বিভ্রতী" শুদ্ধচিত্তধ্যাননিরতা। কোন বিকৃতি এই ধ্যানধামের শান্তি ভঙ্গ করে না।

দ্বিদল চক্রের উপর চক্রবিন্দু ভেদ করিয়া সর্ব্বোপরি সহস্রদল পদ্মের স্থান। পঞ্চাশ-বর্ণময়ী এই মহাপদ্ম তরুণতপনকলা কিঞ্জল্কপুঞ্জে জ্যোতির্ম্ময়। ইহাই কেবলানন্দ-রূপ পরম ধাম।

এই ক্ষেত্রে উপাসনা-ভেদে কেহ পরমব্রহ্ম, কেহ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মহাশিব, আবার কেহ বা মোক্ষের সন্ধান পায়।

চতুর্থ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে যোগযজ্ঞের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধির দ্বারা এই ষড়চক্র ভেদ করিয়া সাধক সহস্রদলের সন্ধান পায়। এই অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে প্রাণায়ামের সঙ্কেত আছে। প্রাণায়ামের সাহায্যে বায়ুরোধ, মনের একাগ্রতা সিদ্ধ হয়, ইহা দ্বারাও ষটচক্র-ভেদ হইয়া থাকে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"বোধং গতে চক্রিণি নাভি-মধ্যে। প্রাণস্ত সম্ভূয় কলেবরেঽস্মিন্। চরন্তি সর্ব্বে সহ বহ্নিনৈব। তন্তো যথা গতিস্তথৈব। অর্থাৎ নাভির অধোভাগে কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইলে, এই কলেবরস্থিত প্রাণসমূহ বহ্নির সহিত তন্তু সহকারে সূতার ন্যায় গতিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী উর্দ্ধে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-বায়ুও ইহার সহিত উর্দ্ধমুখী হয়।

উর্দ্ধমূল অধোশাখের ন্যায় উপর হইতে সৃষ্টি-তত্ত্ব স্তরে স্তরে নিম্নে অবতরণ করিয়াছে। সৃজনের মূল সন্ধান করিতে হইলে, অবতরণের সূত্র ধরিয়াই অধিরোহণ করিতে হইবে। মূলাধার পৃথ্বীক্ষেত্র পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ-ভূতের ইহা সমষ্টি। ইহার উপরে অপের স্থান। বরুণ ইহার দেবতা। এইরূপ তেজ, বায়ু ও ব্যোমের ক্ষেত্র উদ্ভিন্ন করিয়া, মহাশক্তি আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইলে, সকল বিকৃতির বাহির হইয়া পড়েন। ভ্রূমধ্য ক্ষেত্র পঞ্চজ্ঞান ও পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্পর্শে মলিন হয় না। এই স্থানে শক্তি পুরুষের নির্দ্দেশ প্রত্যক্ষ করেন; কেননা ইন্দ্রিয় ও জড় দেহচৈতন্যের কোলাহল এখানে নাই; ভাগবত প্রকৃতির ইহাই স্বরূপবোধের ক্ষেত্র। তিনি যতই অবতরণ করেন, ততই পুরুষোত্তম হইতে দূরে পড়িয়া যান, মধ্যের ব্যবধান অহঙ্কার রূপে প্রতিভাত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ-বায়ুকে ভ্রূমধ্যে উত্তোলিত করার কথায় সকল ইন্দ্রিয় ও দেহবৃত্তি হইতে মুক্তির সন্ধান দিয়াছেন। কেবল অষ্টাঙ্গ যোগ অথবা প্রাণায়ামের সাহায্যেই যে ইহা হয় তাহা নহে, গীতার যোগেও ইহা সিদ্ধ হয়। নতুবা তিনি অর্জ্জুনকে গীতার যোগে দীক্ষা দিতে বলিতেন না—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ভ্রূ-নিম্নে জীবন-কেন্দ্রে প্রাণ-বায়ু যতদিন ভ্রমণ করে, ততদিন গুণাদিসংযুক্ত অহঙ্কারই থাকিয়া যায়। দিব্য পরম পুরুষকে জানিতে হইলে ইন্দ্রিয়াদির প্রভাবক্ষেত্র মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, এই পঞ্চ চক্র পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাচক্রে জীবচৈতন্যকে তুলিতেই হইবে। এই অভ্যাস-সিদ্ধ ব্যক্তিই যথেচ্ছাক্রমে ভাগবত আদেশে সর্ব্বক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া প্রয়াণকালে ভ্রূমধ্যে উপস্থিত হইতে পারেন।

অষ্টাঙ্গ যোগ, হঠযোগ প্রভৃতি উপায় ও কৌশলে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগৃতি সংঘটন করিয়া প্রাণ-বায়ুকে

ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করার বিধান ব্যতীত গীতায় যে আত্ম-সমর্পণ যোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা সহজ ও প্রত্যেক জীবের পক্ষে সুসাধ্য ইহা সার্ব্বজনীন সাধনা।

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া প্রতিক্ষণে হৃদয় দ্বারা পূজনীয় স্বরূপের চিন্তা করিলে, অন্য বিষয়ে আসঙ্গ দূর হয়, তখন স্বরূপ-বস্তুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে, দেহাদি কামভোগ বিরত হওয়ায়, মূলাধারস্থিত শক্তি স্বতঃই জাগ্রত হন। প্রাণকেন্দ্র এই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নাভিমূলে নীত হয়। চিত্ত একাগ্র রাখিতে পারিলে এই গতি আর রুদ্ধ হয় না, নাভি হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। একে একে সকল চক্র ভেদ করিয়া, আজ্ঞাচক্রে চৈতন্য উপস্থিত হইলে, ঈশ্বরের অভিসন্ধি সম্যক্ উপলব্ধি-গম্য হয়। দার্শনিকতার দ্বন্দ্বে ভগবানের অভিসন্ধি আছে, অথবা নাই—এই তর্ক যুক্ত-যোগীর নিকট নিরর্থক। এই বিশ্ব স্বপ্ন হইলেও, স্বপ্নদ্রষ্টার ইহার মধ্যে অভিসন্ধি আছে। তিনি আনন্দভুক্ যদি হন, এই আনন্দই তাঁহার অভিসন্ধি। গীতায় ভগবান আত্মাভিসন্ধি স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এই ক্ষেত্রে তর্ক-যুক্তির অবকাশ নাই—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

এই আজ্ঞাচক্রে উপনীত হওয়াই জীবচৈতন্যের নবজন্ম। ঈশ্বর ও প্রকৃতি, ভেদ দূর হইয়া বিমল অভিসন্ধি এই ক্ষেত্রেই অবগত হইয়া যায়। বিশিষ্ট বিশিষ্ট আধারে তাঁর বিশেষ অভিসন্ধি অমোঘ রূপে প্রকাশ পায়। এই জন্মলাভের পর ঈশ্বর ও জীব সংযুক্ত হয়। এই জীবন্মুক্ত পুরুষের পাপে, পুণ্যে দ্বন্দ্ব নাই, আদর্শ-বিপ্লবে সে আর বিচলিত হয় না। চাপরাশ পাওয়ার কথাও এই নবজন্মলাভের একটা লক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর" এই কথার উপর সাধকের একান্ত দৃষ্টি রাখিয়া গীতার যোগাবধারণে অগ্রসর হইতে বলি। ইহা যদি দুঃসাধ্য বোধ হয়, বায়ু-সাধনেও যে কুণ্ডলিনী শক্তি সুসাধ্য তাহা নহে; লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সর্ব্বক্ষেত্রেই দুরূহ—"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া", তবে ভগবানে আত্মসমর্পণের পথ জীবের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহার পর তিনি এই কথাই বলিয়াছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

অতঃপর আমরা পরবর্ত্তী শ্লোকের মর্ম্ম অনুধাবন করিব।

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ৮।১১"

বেদবিদঃ (বেদার্থজ্ঞাঃ) যৎ অক্ষরম্ (অবিনাশিনম্) বদন্তি (প্রতিপাদয়ন্তি), বীতরাগাঃ (নিস্পৃহাঃ) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিনঃ) যৎ বিশন্তি (প্রবিশন্তি), যৎ ইচ্ছন্তঃ (জ্ঞানার্থং বাসনাযুক্তা সন্তঃ) ব্রহ্মচর্য্যম্ চরন্তি (অনুষ্ঠানং কুর্ব্বন্তি), তে (তুভ্যম্) তৎ পদম্ (অক্ষরাখ্যং পদনীয়ম) সংগ্রহেণ (উপায়েন) প্রবক্ষ্যে (কথয়িষ্যামি)।

বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে বিনাশহীন বলিয়া কীর্ত্তন করেন, বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসিগণ যাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকেন, যাঁহার তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হয়, সেই পরম পদ সম্বন্ধে উপায়ের কথা বলিতেছি।

শ্রুতি-বাক্যের অনুরূপ শ্লোক এই ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। কঠোপনিষদের শ্লোকের ইহা প্রতিধ্বনি।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বানি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥"

পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে এই পদের কথা এবং ইহার প্রাপ্তির উপায়ের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী 'সংগ্রহেণ' শব্দের অর্থ এইজন্যই 'সংক্ষেপ' না করিয়া 'প্রাপ্তির উপায়' এই অর্থে উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

"সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥৮।১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥৮।১৩"

সর্ব্বদ্বারাণি (সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়দ্বারাণি) সংযম্য (প্রত্যাহৃত্য) মনঃ হৃদি (হৃদয়দেশে) নিরুধ্য চ (নিরোধং কৃত্বা চ) প্রাণম্ (প্রাণ-বায়ুম্) মূর্দ্ধ্নি (ভ্রুবোর্মধ্যে) আধায় (আবেশ্য) আত্মনঃ যোগধারণাং (যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্) ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম

(ব্রহ্মরূপম্ একম্ অক্ষরম্) ব্যাহরন্ (উচ্চারয়ন্) মাম্ (ঈশ্বরম্) অনুস্মরণ (অনুচিন্তয়ন্) দেহম (শরীরম্) ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি (ম্রিয়তে) সঃ পরমাম্ (প্রকৃষ্টাম্) গতিম্ যাতি (প্রাপ্নোতি)।

'সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত করিয়া, মনকে হৃদয় মধ্যে নিরোধ ও প্রাণকে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিয়া আত্মবিষয়ক যোগৈশ্বর্য্যে আশ্রিত হইয়া, ব্রহ্মস্বরূপ ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ এবং আমার চিন্তা করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।'

আধারচক্রগুলির সর্ব্বনিম্নে মূলাধার পদ্ম। ইহা দেহ-চৈতন্যের কেন্দ্র, তাহার উপর মণিপুর ও আরও উপরে স্বাধিষ্ঠান, এই দুই ক্ষেত্রে চিত্ত-প্রাণ লীলায়ত, অনাহত হৃদয় পদ্ম; মণিপুর ও স্বাধিষ্ঠান হইতে মনকে হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিতে না পারিলে প্রাণবায়ুকে উপরে উঠান সম্ভব নয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে প্রাণ স্থির হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে মনস্থির সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সংশয়োক্তির উত্তরে ভগবান অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়, এইরূপ বলিয়াছেন।

বিষয়তৃষ্ণাহীন ব্যক্তিই বৈরাগ্যের অধিকারী। 'ওঁ' এই একাক্ষর ঈশ্বরবাচক শব্দ মাত্র চিন্তায় অভ্যাস দৃঢ় হইলে বৈরাগ্যের উদয় হয়। যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন—ঈশ্বর শব্দের বাচক প্রণব—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" জগদীশ বলিয়া ডাকিলে, যে ব্যক্তির বাচক জগদীশ সেই সাড়া দিবে। প্রণব ঈশ্বরবাচক হইলে, এই মন্ত্রের সাধন ঈশ্বরসিদ্ধিই প্রদান করিবে। কিন্তু কথা হইতেছে, দেহত্যাগের কথায় এই ক্ষেত্রে এতখানি জোর দেওয়া হইল কেন? "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ সমাধিলাভঃ"। ভগবানে সমাধি লাভ মৃত্যুকালেই প্রয়োজন অন্য সময়ে নহে, এমন কথা বিধেয় নহে। তবে কি জীবদ্দশায় এই মন্ত্রের সাধননিষ্ঠা অন্তকালে এই ফল দান করে, তাহার পূর্ব্বে নহে; অথবা এই প্রণবের অনুধ্যান যত দৃঢ় হইবে। ততই জরামরণশীল দেহের অবসান শীঘ্র হইবে! জীবের লক্ষ্যই যদি হয় ভগবানে লয়, তাহা হইলে সমাধির উপায় সম্মুখে দেখিয়া বিষয়-বিরক্ত কোন যোগী আর কাল বিলম্ব করিবে?

"পরমাং গতিম্" এই শব্দের বর্ণনের উপরই এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ প্রকাশ হয়। শ্রীমদ্ শঙ্কর 'গতি' শব্দের কোনই অর্থ প্রদান করেন নাই। আচার্য্য আনন্দগিরি বলিয়াছেন, গতির পূর্ব্বে পরম শব্দ থাকাতে ইহা ক্রম-মুক্তির নির্দ্দেশ দেয়। শ্রীরামানুজ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"পরমাং গতিং প্রকৃতিবিযুক্তং মৎসমানাকারমপুনরাবৃত্তি আত্মানং প্রাপ্নোতি" অর্থাৎ প্রকৃতি বিযুক্ত হইয়া ভাগবদসাযুজ্য-প্রাপ্তিতে আত্মার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—"পরমাং শ্রেষ্ঠং মদ্গতিং প্রাপ্নোতি"। বলদেব বলেন, "পরমাং গতিং"—আমার সালোক্যপ্রাপ্তি।

ইহা হইতে বুঝা যায়—শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরবাচক শব্দের সহিত "মামনুস্মর" অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করিতে হইবে। পতঞ্জলি ঈশ্বরবাচক মাত্র দিয়াছেন, কিন্তু নাম থাকিলে নামীর যে প্রয়োজন হয়, তাহার উল্লেখ করেন নাই। গীতায় বাচকের সহিত বাচ্যের সংযোগ করা হইয়াছে; ভাগবতে দেবকীকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্॥"

এই ভাবেই হউক, আর ব্রহ্ম ভাবেই হউক তোমরা আমাকে সর্ব্বদা চিন্তা ও স্নেহ করিয়া মদ্গতিই প্রাপ্ত হইবে।

জন্ম ও মরণ দুঃখ জীবের নিকট অসহ্য বোধ হওয়ায় ধর্ম্মক্ষেত্রে এই উভয় দুঃখ নিরাকৃত করাই সাধকের লক্ষ্য হইয়া থাকে। শ্রুতিও সান্ত্বনা দিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বা তে মৃত্যুৎমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" অর্থাৎ তাহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় মুক্তির অন্য উপায় আর কিছু নাই।

ঈশ্বরবাচক শব্দ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য থাকিতে ওঁকার মাত্র এখানে উল্লিখিত হইল কেন, এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। বেদান্তের মহাবাক্যগুলি ঈশ্বরবাচক হইলেও, উহার অর্থ তত্ত্বতঃ বুঝিবার অধিকারী সকলে নহে। শ্রুতি বলেন—"এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম" এই ওঁকার সর্ব্ববিধ সাধকের পক্ষেই প্রযুজ্য। বাক্যের আদি বাচক

সর্ব্বজনবিদিত। গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব প্রতিপাদক যে সকল আখ্যা জ্ঞানীজন সুলভ, তাহা উল্লেখ না করায়, এই মন্ত্র দানে গীতার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের গৌরবই রক্ষা হইয়াছে।

'কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্'—পুরুষের বাচক নির্ণয় করিয়া বাচ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতিম্॥" ৮।১৫

অনন্যচেতঃ (নাস্ত্যনাস্মিন্ বিষয়ে চেতো যস্য সঃ) যঃ মাং সততম্ (নিরন্তরম্) নিত্যশঃ (প্রতিদিনম্) স্মরতি (ধ্যানং করোতি) হে পার্থ নিত্যযুক্তস্য (সমাহিতস্য) তস্য যোগিনঃ (যোগপরায়ণস্য) অহং সুলভঃ (সুখেন লভ্যঃ)।

মহাত্মনঃ (শুদ্ধসত্ত্বাঃ যতয়ঃ) মাম উপেত্য (প্রাপ্য) পুনঃ দুঃখালয়ম (দুঃখ স্থানম্) অশাশ্বতম্ (অনিত্যং) জন্ম (দেহসম্বন্ধম্) ন আপ্নুবন্তি (ন প্রাপ্নুবন্তি) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টম্) সংসিদ্ধিম (মুক্তিম্) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ)

'যে ব্যক্তি অনন্যমনা হইয়া সর্ব্বদা, প্রতিদিন আমাকে ভাবনা করে, হে পার্থ সেই সমাহিতমনা যোগীর নিকট আমি অতিশয় সুলভ।

এই মহাত্মারা আমায় লাভ করিয়া দুঃখময় অনিত্য দেহসম্বন্ধ আর রাখে না, পরম মুক্তি লাভ করে।'

'সততং' এবং 'নিত্যশঃ' এই দুই একার্থবাচক শব্দ প্রয়োগ করায় নিত্যশঃ শব্দের অর্থ "সর্ব্বেষু কালেষু" ধরিতে হইবে, অর্থাৎ দুই চারদিন বা ছয়মাস, সম্বৎসর নহে, যাবজ্জীবন অনন্যচিত্তে 'আমায়' স্মরণ রাখা চাই।

পতঞ্জলির কথা স্মরণ হয়, "স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্যে সংকার সেবিতেন দৃঢ়ভূমিঃ"—দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে আশ্রয়-তত্ত্বের অনুস্মরণে ইষ্টে চিত্ত দৃঢ় হয়। "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য" সাধনাদি দ্বারা 'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্" জ্ঞানিজন সাধ্য বাচক লইয়া জপাদি যজ্ঞ। কেবল দুর্লভ নহে, বাচ্যের অভাবে ইহা নিষ্ফল হয়। সপ্তম অধ্যায়ে আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীর ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় বলিতে গিয়া কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। "কবিং পুরাণম্" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া যোগমিশ্রা ভক্তির কথা উল্লেখ করিলেন, এক্ষণে কেবলা-ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন।

ব্রহ্মাদি বাচ্যের বাচক মন্ত্রসাধনে যেমন মানুষের পুনর্জ্জন্ম হয় না, তদ্রূপ 'আমাকে' নিত্য স্মরণে রাখিয়া যে যোগী নিরন্তর, চিরজীবন অতিবাহিত করে, তাহাকেও জরামরণকাতর দেহ সম্বন্ধ হইতে 'আমি' মুক্তি দিই।

আজীবন তদ্গতচিত্ত ব্যক্তির কেবলাভক্তিই মুক্তির কারণ হয়। কিন্তু এই মুক্তি দেহসম্বন্ধ হইতে মুক্তি, দেহ-ধারণ-রূপ কর্ম্ম হইতে মুক্তি নহে। জন্ম ও মরণ, জীবের দুঃখের কারণ; যেহেতু জীব ভাগবত-স্মরণ রক্ষা করে না। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই বাণী ব্যর্থ হইবে না, তদ্রূপ "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং" এ বাণীও ভুলিবার নহে। এই হেতু জীবের ধর্ম্মসাধনে পুনর্জ্জন্ম-রোধের যে প্রচলিত প্রবাদ, তাহা এই ভাবে ঘুরাইয়া নিত্যজীবনের বেদী সৃষ্টি করিলেন। নাম ও নামীর সাধককে দুঃখপূর্ণ অনিত্য নষ্টপ্রায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কর্ম্মক্ষয় বা সংস্কার ভোগের জন্য তাহার দেহ পরিগ্রহ নহে; যুগে যুগে ভগবান যেরূপ স্বেচ্ছাকৃত নিত্যভূত, অপ্রাকৃত জন্মগ্রহণ করেন, অনন্যচিত্ত তৎপরায়ণ ব্যক্তিও এইরূপ পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়া জরামরণ দুঃখ অতিক্রম করে। এই শ্লোকে এইরূপ আত্মসমর্পণ যোগীর শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হইল।

(ক্রমশঃ)

যবনিকা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

দারবাকের একটি জীর্ণ ভগ্ন মেটে বাড়ীর চেহারা এমন বদলাইয়া গিয়াছে যে দেখিলে সহজে বিশ্বাস হয় না।

প্রদ্যোতের ছুটি নাই বলিলেই হয়। সপ্তাহে একদিনের বেশী সে বড় গ্রামে আসিতে পারে না। কিন্তু এই সামান্য সময়েই সে জীর্ণ বাড়িটির সংস্কার অনেক করিয়া ফেলিয়াছে।

তাহার উৎসাহের অন্ত নাই। বিমল কমলও তাহার সহিত বুঝি পাল্লা দিতে পারে না। এই বাড়ি আর পরিবারটুকুই তাহার সৃষ্টির ক্ষেত্র। ইহাকেই সে নূতন করিয়া রচনা করিতে চায়।

শনিবার রাতটা বিশ্রামে কাটিয়া যায়। রবিবার ভোর না হইতেই আরম্ভ হয় প্রদ্যোতের আয়োজন। আজ বাড়ীর চারিধারে ভাঙা দেওয়াল মেরামত করিতে হইবে। রাজমিস্ত্রীর প্রয়োজন নাই। সে নিজেই পারিবে, আর বিমল কমল জোগাড় দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে।

পুকুর ধার হইতে কাদা মাটি বিমল কমল সংগ্রহ করিয়া আনে। প্রদ্যোৎ আগের দিন কলিকাতা হইতে কর্ণিক এবং গজ বুঝি নিজেই কিনিয়া আনিয়াছে। গাঙ্গুলীদের পুরাণ পাঁজার কিছু ইট নাম মাত্র মূল্যে খরিদ করার ব্যবস্থাও সে করিয়াছে। জানুক না জানুক কিছু আসে যায় না, কাদার সাহায্যে বাঁকাচোরা এক প্রকার গাঁথুনি প্রদ্যোৎ খাড়া করিয়া তোলে।

কমল বিমল লাট্টুর আলে একটা সুতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া আনিয়া বলে—"এইটে ঝুলিয়ে দেখ রাঙাদা, দেয়াল সোজা হচ্ছে কিনা?"

প্রদ্যোৎ হাসিয়া বলে—"ও আবার কি?"

কমল বিমল বিজ্ঞের মত বলে—"বাঃ জাননা বুঝি! রাজমিস্ত্রিরা ত এই দিয়ে দেওয়াল সোজা করে! দেখ না একবার ঝুলিয়ে!"

দেয়ালের আকার সম্বন্ধে প্রদ্যোতের নিজের কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা নাই। সে তাড়াতাড়ি বলে—"দূর আমরা কি দেওয়াল সোজা করছি নাকি?"

কমল বিমল একটু অবাক হইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে—"সোজা করবে না!"

প্রদ্যোৎ গম্ভীরভাবে অম্লান বদনে বলে, "বাইরের দেওয়াল যে এবড়ো খেবড়োই করতে হয়। চোর এলে আর তাহলে উঠতে পারবে না! গা হাত ছড়ে যাবে।"

এ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিমল বলে—"ও"।

নির্ম্মলাও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীর সংস্কার দেখিতেছিল, সে হাসিয়া ওঠে।

কমল বিমল অপ্রসন্নভাবে বলে—"হাসছ যে বড়!"

"হাসব না! তুই যেমন বোকা!"

"কেন বোকা কেন?"

"বোকা নয়! তোকে বাজে কথা যা তা বলে দিলে, আর তুই তাই বিশ্বাস করলি ত!"

কমল বিমল সন্দিগ্ধ হইয়া এবার রাঙাদা ও ছোড়দির মুখের দিকে তাকায়।

প্রদ্যোৎ অবিচলিত ভাবে বলে—"তুমি ওসব কথা শুনছ কেন! বেটাছেলে কখন বোকা হয়?"

কমলের বিশ্বাস সেইরূপ। তাহার মুখে আবার হাসি দেখা দেয়।

নির্ম্মলা চলিয়া যাইতে যাইতে রাগের স্বরে বলে—"আহা তা কি আর হয়! দেয়াল গাঁথাতেই সব চালাকী বোঝা গেছে।"

কর্ণিক দিয়া ইট বসাইতে বসাইতে প্রদ্যোৎ উত্তর দেয়—"কে বোকা আর কে নয়, চোর এলেই বোঝা যাবে! কি বল কমল?"

কমল সায় দিয়া বলে—"হুঁ" তাহার পর কৌতুহল ভাবে জিজ্ঞাসা করে—"চোর আসবে ত রাঙাদা?"

প্রদ্যোৎ গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়—"আসবে না আবার! এমন দেওয়ালের লোভ সামলাবে কদিন!"

কমল ইহাতেই নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ সকলের উচ্চহাস্যে সে একটু বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং হঠাৎ ভিতরে কোথায় তাহাকে পরিহাস করিবার ষড়যন্ত্র আছে সন্দেহ করিয়া অত্যন্ত রাগিয়া উঠান ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

শুধু দেওয়াল মেরামতই নয়, প্রদ্যোৎ ইতিমধ্যে আরো অনেক কিছু করিয়াছে।

উঠানে ডালিম গাছটির আশে পাশে অনেক গাছের চারা আজকাল বাড়িতেছে। বাড়ির বাহিরে অনেকখানি জায়গা এতদিন জঙ্গল হইয়া ছিল। প্রদ্যোৎ একদিন উৎসাহভরে তাহা সাফ্ করিতে লাগিয়া গেল।

কমল বিমলের জঙ্গল সাফ্ করিতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই কিন্তু রাঙাদা সমস্ত ব্যাপারটাকে গভীর রহস্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে। এখানে কি যে হইবে বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের অস্বস্তির আর সীমা নাই।

বিমল কমলকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলে—"এখানে কি হবে জানিস্?"

কমল গভীর কৌতূহলে বড় বড় দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"কি?"

বিমল এতক্ষণ কল্পনাকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া মনোমত একটি জিনিষ খুঁজিয়া পাইয়াছে। সে চুপি চুপি বলে—"মন্দির হবে! গোঁসাইদের যেমন মন্দির আছে সেই রকম।"

কমলের বিস্ময়ের ও আনন্দের আর সীমা থাকে না। দাদার কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই তবু সে শুধু সামান্য একটু সন্দেহ প্রকাশ করে।

—"অত বড় মন্দির হবে?"

মন্দির যখন হইবেই তখন আগে হইতে অকারণে তাহাকে ছোট করিয়া লাভ কি! বিমল গম্ভীর ভাবে বলে—"ওর চেয়েও বড়! আর অনেকগুলো চূড়ো থাকবে।"

কমল এবার দাদার মন্দিরের একটু উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টায় বলে—"সব সোণার চূড়ো!"

নিজের মাথা হইতে বাহির হইলে এ সম্বন্ধে বিমল কি বলিত বলা যায় না কিন্তু কমলের প্রস্তাবে সায় সে দেয় না। ধমক দিয়ে বলে—"সোণার চূড়ো! সোণার চূড়ো হবে কি করে শুনি! অত সোণা আমাদের আছে নাকি?"

কমল একটু দমিয়া গেলেও একেবারে নিরুৎসাহ হয় না। সোণার চূড়া থাক বা না থাক একটা মন্দির ত তাহাদের হইবে। এ সময়ে সামান্য চূড়ার উপকরণ লইয়া দাদার সহিত ঝগড়া করিয়া লাভ নাই। দাদার ধমকানি তাই গায়ে না মাখিয়া সে বলে—"আমাদের মন্দিরে কাউকে কিন্তু ঢুকতে দেব না দাদা!"

বিমলের ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ভ্রূকুটি করিয়া সে বলে—"ঈস্ অমনি ঢুকলেই হল আর কি?"

দুই ভাই এ তাহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া বিশেষ মিল দেখা যায়। রাঙাদার সাহায্য করিতে করিতে দুজনে মাঝে মাঝে আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া হাসে। রাঙাদার গোপন অভিসন্ধি যে তাহারা ধরিয়া ফেলিয়াছে ইহাতে আর ভুল নাই।

কিন্তু মা আসিয়া অকালে এ কল্পনা ভাঙিয়া দেন। প্রদ্যোৎ জঙ্গল প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাকী গাছপালার উচ্ছেদ সাধনে সে ব্যস্ত। মা আসিয়া [illegible] করেন। বেলা হইয়া গিয়াছে, খাওয়া দাওয়া করিতে হইবে। কি হইবে মিছামিছি এই জঙ্গল সাফ করিয়া।

আর গোপনতা চলে না। প্রদ্যোৎ হাসিয়া বলে—"মিছামিছি সাফ্ করছি নাকি! তরিতরকারীর বাগান কি রকম করি মা দেখো!"

মা এসব খেয়ালে অভ্যস্ত। তিনি নীরবে একটু হাসিয়া বলেন—"আচ্ছা, এখন তো খেতে চল!"

কিন্তু দুই ভাইএ বাঁকিয়া দাঁড়ায়! কোথায় আকাশ-স্পর্শী মন্দির আর কোথায় তরীতরকারীর বাগান! দুই ভাইএর কল্পনা সত্যিই যে ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে।

কমল রাগ করিয়া বলে—"বাঃ, বাগান কেন? মন্দির করবে না রাঙাদা?"

প্রদ্যোৎ অবাক হইয়া বলে, "মন্দির! মন্দির তুই কোথায় পেলি?"

"বাঃ—ছোড়দা যে বল্লে, গোঁসাইদের চেয়ে বড় মন্দির হবে!"

সকলে হাসিয়া উঠে। প্রদ্যোৎ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলে—"মন্দির চেয়ে বাগান যে অনেক ভাল! তরীতরকারী হবে! কতরকম ফল?"

কমল কিন্তু সান্ত্বনায় ভোলে না। তরীতরকারী তো বাজারে কিনলেই পাওয়া যায়। তাহার জন্য এত কষ্ট করা কেন? মন্দির গড়িয়া দিবার প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যান্ত রাঙাদাকে দিতেই হয়।

প্রদ্যোতের জীবন পরিপূর্ণ। কোনখানে কোন ফাঁক বুঝি তাহার আর নাই। নূতন মাটিতে আশ্রয় পাইয়া তাহার ক্ষুধিত মনের শিকড় যে কতদূর পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়াছে, বাড়াইয়াছে নিজেকে সহস্র শিরা উপশিরার বন্ধনে।

কোনদিন যে সে এ পরিবারের বাহিরের লোক ছিল একথা মনে করিবারই প্রদ্যোতের অবকাশ নাই। এই পরিবারটিও অসঙ্কোচে তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে এত সহজে এত স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করিয়াছে যে, কৃত্রিম ভাবের কোন চিহ্নও আর চোখে পড়ে না।

প্রদ্যোৎ তাহার নূতন মেসে দারবাক হইতে চিঠি পায়। মা নির্ম্মলাকে দিয়া লিখাইয়াছেন যে বিমল অত্যন্ত দুরন্ত অবাধ্য হইয়াছে। প্রদ্যোৎ না থাকিলে তাহাকে শাসন করিয়া রাখা দায়। তারপর বিমলের নূতন অপকীর্ত্তির কথা সবিস্তারে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে পড়াশুনার ধার দিয়াও যায় না। প্রদ্যোৎ যেন তাহাকে কলিকাতায় নিজের কাছে রাখিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করে। নহিলে ছেলেটা একেবারে মূর্খ হইয়া থাকিবে।

নির্ম্মলার হস্তাক্ষর এইখানেই শেষ। পরের কথাগুলি দিদিকেই বাঁকাচোরা অক্ষরে কোন মতে লিখিতে হইয়াছে। বোঝা যায় যে নির্ম্মলাকে কোনমতেই আর সেটুকু লিখিতে রাজী করা যায় নাই। দিদি অবশ্য নির্ম্মলার বিবাহের কথাই লিখিয়াছেন। প্রদ্যোৎ খোঁজ-খবর করিতেছে ত? মেয়ে এদিকে যে রকম মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে আর বেশিদিন বিবাহ না হইলে দেশে অত্যন্ত নিন্দা হইবে।

ইহার পর চিঠিতে নানা ফায়-ফরমাজের কথা। কলিকাতায় ফিরিবার সময় এবার প্রদ্যোৎকে বলিতে যাহা যাহা ভুল হইয়াছে তাহার ফর্দ্দ। পুরান লণ্ঠনটি বিমল সেদিন ফেলিয়া ভাঙিয়াছে, একটা লণ্ঠন হইলে ভাল হয়। আর কমলের এক জোড়া কাপড়ের অত্যন্ত প্রয়োজন। এবারে নির্ম্মলার জন্য ক্রুশকাঠি কিনিয়া আনিতে কোন মতেই যেন ভুল না হয় তাহা হইলে তাহার অভিমানের আর অন্ত থাকিবে না—ইত্যাদি।

এ সমস্ত ফরমাজ অসঙ্কোচেই করা হইয়াছে। করা হইয়াছে সহজ অধিকারের দাবীতে। উভয়পক্ষে কোথাও কোন দ্বিধা নাই। এবং সেইজন্যই প্রদ্যোৎ এমন সহজে নিশ্চিন্তভাবে বিশেষ নূতন জীবনে মিলাইয়া দিতে পারিয়াছে।

প্রদ্যোতের কাজ আজকাল অনেক। নূতন আর একটা টিউশানি সে সংগ্রহ করিয়াছে। পয়সা বাঁচাইবার জন্য পুরাতন বোর্ডিং ছাড়িয়া নূতন এক মেসে উঠিয়াছে। এখানে খরচ কম হয়।

দারবাকের অভাব অনেক। প্রদ্যোতকে উপার্জ্জনের পরিমাণ বাড়াইতেই হইবে। উপায় সে এখনো অবশ্য খুঁজিয়া পায় নাই কিন্তু তাহার চেষ্টারও অন্ত নাই। তাহার মনে যেন দুঃসাধ্য সাধনের নেশা লাগিয়াছে। আকাশ-কুসুমও মাঝে মাঝে সে কল্পনা করে এই পরিবারটিকে কেন্দ্র করিয়া। কোন রকম ব্যবসা করিয়া হঠাৎ বড়লোকও ত সে হইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে কি না সে করিবে। মনে মনে সে দারবাককে পাকা দালানের হিসাবও বুঝি করিয়া ফেলে। স্বপ্ন দেখে আরো অনেক কিছুর! পয়সার অভাবেই নির্ম্মলার জন্য ভালো সম্বন্ধ সে খুঁজিতে পারিতেছে না। যেখানে সেখানে নির্ম্মলার বিবাহ দেওয়া ত চলে না!

প্রদ্যোতের সমস্ত চিন্তা এখন ভবিষ্যতের, অতীতের বিস্মৃতি আর বুঝি তাহাকে পীড়া দেয় না। কিন্তু সত্যই ত তাহা নয়। গভীর রাত্রে এক একদিন সে বিনিদ্র

ভাবে ঘরে পায়চারী করিয়া বেড়ায়। অতীতের বিস্মৃতি এখন নূতন ভাবে তাহার কাছে বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিন অন্ধকার যবনিকা সরাইতে না পারিয়া সে হতাশ হইয়াছে আজ তার ভয় পাছে সে যবনিকা হঠাৎ অপসারিত হইয়া যায়। সমস্ত মন দিয়া সে প্রার্থনা করে যাহাতে এ যবনিকা না উঠিয়া যায়।

এই যবনিকার পারে কি আছে কে জানে! কৌতূহল তাহার না হয় একটু এমন নয় কিন্তু আশঙ্কা হয় অনেক বেশী। সেই পুরাতন জীবন আবার তাহাকে এখনকার সমস্ত মূল উৎপাটন করিয়া টানিয়া লইবে এ কথা ভাবিতেই সে শিহরিয়া ওঠে। ভালো হউক মন্দ হউক ঢ কা যখন পড়িয়াছে তখন সে জীবন আর যেন অনাহূত না হয়—ইহাই তাহার এখন একান্ত কামনা।

পথে কেহ হঠাৎ ডাক দিলে আজকাল সে চমকাইয়া উঠে। কে জানে অতীতের কোন প্রতিনিধি অকস্মাৎ তাহার জীবনে উদয় হইল কিনা! নূতন জীবনের চিন্তাতেই সে নিজেকে মগ্ন করিয়া রাখে, কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে পাছে মনের কোন ছিদ্রপথে হঠাৎ তাহার পুরাতন জীবন দেখা দেয়।

সেদিনও শনিবার। হাওয়ায় শীতের আমেজ লাগিয়াছে। আকাশে আসন্ন শীতের অপরূপ ধূসরতা।

প্রদ্যোৎ দাওয়ার উপর মাদুর পাতিয়া বিমলের সারা হপ্তার পড়াশুনার হিসাব লইতেছিল। এমন সময় মা আসিয়া দাওয়ার একধারে বসিলেন।

মায়ের শরীর কিছুদিন হইতে অত্যন্ত খারাপ। ঘর হইতে বড় একটা বাহির হইতে পারেন না।

প্রদ্যোৎ তাই কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"আপনি আবার বাইরে এলেন কেন মা? আমি এখুনি যাচ্ছিলাম।"

"না, ঘরের ভেতর ত রাতদিনই আছি। এক একবার না বেরুলে হাঁপিয়ে উঠি।"

মায়ের বাহিরে আসিবার কারণ কিন্তু অন্য। খানিক-বাদেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। একথা ওকথার পর মা খানিক বাদেই আসল কথা পাড়িলেন।

—"সরকারদের বাড়ী থেকে আবার লোক এসেছিল বাবা!"

মা এইটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন, তারপর প্রদ্যোতের মুখের দিকে খানিক উৎসুক ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"ওরা বড় পেড়াপীড়ি করছে।"

প্রদ্যোৎ একটু হাসিয়া বলিল—"সেইজন্যেই ত ভয় মা! ছেলের পক্ষ থেকে অত গরজ ভালো নয়!"

এসব কথা অনেকবার হইয়া গিয়াছে। গ্রামেরই একটি বাড়ি হইতে নির্ম্মলার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছিল। টাকা-পয়সা বেশী লইবে না। মেয়ে বরপক্ষের আগে হইতেই পছন্দ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অসুবিধা বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু ছেলেটি নেহাৎ অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রদ্যোৎ কিছুতেই রাজী হয় নাই।

মারও পূর্ব্বে অমত ছিল, কিন্তু দিন যতই যাইতেছে মেয়ের বিবাহের জন্য দুশ্চিন্তাও তাঁহার হইতেছে তত বেশী! অর্থবল নাই, মেয়ের জন্য ভালো পাত্র পাওয়া সম্বন্ধে তিনি ক্রমশঃই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন।

আজ তাই তিনি একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলেন,—"ভালো পাত্রের আশায় আর কতদিন বসে থাকবো বাবা! মেয়ের বয়স যে বেড়েই চলেছে! আর আমাদের মত অবস্থার লোকের এর চেয়ে কত ভালো পাত্র মিলবে!"

প্রদ্যোৎ চুপ করিয়া রহিল। ছেলেটিকে সে নিজের চক্ষে দেখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরও লইয়াছে। জানিয়া শুনিয়া একটা অপদার্থের হাতে নির্ম্মলাকে তুলিয়া দিতে কিছুতেই তাহার মন চাহে না। এ তাহারই পরাজয়। নূতন জীবনের দুরূহ বাধার সামনেই সে কেমন করিয়া হার মানিবে!

মা আবার বলিলেন,—"আমার আর অমত করতে সাহস হয় না বাবা! হয় ত ভাগ্যে শেষে এমনও জুটবে না!"

প্রদ্যোৎ কিছু বলিবার পূর্ব্বে মা বলিলেন—"কাল ওরা আবার আসবে। আমি বলছি এবার কথা দেব!"

খানিক নীরব থাকিয়া প্রদ্যোৎ বলিল—"আচ্ছা তাই দেবেন।"

তারপর অনেকক্ষণ নীরবে সে দাওয়ার উপর বসিয়া রহিল। রাঙাদার কাছ হইতে পড়াশুনা সম্বন্ধে আর কোন অস্বস্তিকর প্রশ্ন না পাইয়া বিমল এক সময়ে চুপি-চুপি, নিশ্চিন্ত হইয়া পলায়ন করিল। সন্ধ্যার ধুসরতা ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া মিশিয়া গেল রাত্রির অন্ধকারে। উঠানের পাশে তুলসীমঞ্চে কখন দিদি বা নির্ম্মলা আসিয়া দীপ জ্বালিয়া গিয়াছে কে জানে। মা-ও অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছেন। শুধু প্রদ্যোতেরই যেন সাড়া নাই। সামান্য এই সম্মতি দেওয়ার ভিতর এত বেদনা ছিল কে জানিত!

রাত্রে অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটিল। প্রদ্যোত অন্ততঃ তাহার সচেতন মনের দূর-দিগন্তেও ইহার আভাষ বুঝি পায় নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া রাত্রে প্রদ্যোত ঘরে ঢুকিতেছিল। নির্ম্মলা তখন বিছানা করিয়া মশারী ফেলিতেছে। প্রদ্যোৎ চৌকাঠে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—"আর অত যত্ন করে মশারী গুঁজে দরকার নেই। ছুদিন বাদে ত নিজেকেই করতে হবে। এখন থেকেই অভ্যেস করে রাখি।"

নির্ম্মলা উত্তর দিল না। কথাটা সে যে শুনিতে পাইয়াছে তাহার আভাষও ব্যবহারে তাহার পাওয়া গেল না। মশারি গুঁজিতে সে তখন তন্ময়।

—"ঈস্, মুখপরটা শুনেই যে পায়াভারী হয়ে গেছে! এখনই মুখে কথা নেই। দুদিন বাদে বোধ হয় চিনতেই পারবে না!"

এবার নির্ম্মলা মুখ ফিরাইল। আসন্ন ঝড়ের সকালের মত সে মুখ থম্‌থম্‌ করিতেছে রুদ্ধ আবেগে।

প্রদ্যোত এমন মুখ দেখিবে বলিয়া আশা করে নাই। প্রথমটা সে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার পর একটু সামলাইয়া আবার পরিহাসের চেষ্টা করিয়া বলিল—"বাখ্‌ড়া দিয়েছিলাম বলে বুঝি আমার ওপর রাগ! আমি···"

কিন্তু কথা আর তাহাকে শেষ করিতে হইল না। নির্ম্মলা অকস্মাৎ বিছানার উপর আহত পাখীর মত লুটাইয়া পড়িয়াছে। প্রচণ্ড কান্নার বেগ রোধ করিবার চেষ্টায় দুলিয়া উঠিতেছে তার দীর্ঘ এলাইত দেহ।

প্রদ্যোত একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। কি করিবে কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না, অনেকক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—"নির্ম্মলা"

নির্ম্মলার তবু সাড়া নাই।

কাতর ভাবে এবার বলিল—"কি হয়েছে আমায় বল নির্ম্মলা।"

নির্ম্মলার নিঃশব্দ কান্না কিন্তু তবু থামিল না। কোন উত্তরও মিলিল না।

প্রদ্যোত ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"ছিঃ কি হচ্ছে নির্ম্মলা! কেউ দেখলে কি বলবে!"

নির্ম্মলা এবার উঠিয়া বসিল। মুখ তাহার নত; কিন্তু তবু দুই গাল বাহিয়া অশ্রুর যে ধারা নামিয়াছে তাহা লুকান রহিল না।

প্রদ্যোত অন্ধ ত নয়। মৃদুকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"এ বিয়েতে তোমার মত নেই নির্ম্মলা? বল লজ্জা কোরো না!"

'জানিনা' বলিয়া হঠাৎ আবার রুদ্ধ কান্নায় ফুঁপাইয়া উঠিয়া সে সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রদ্যোৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বিমূঢ়তা আর তাহার নাই। নির্ম্মলার নিঃশব্দ কান্নার জোয়ারের আঘাতে তাহার অবচেতন মনের অনেক কিছু হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়াছে।

নির্ম্মলার অপ্রত্যাশিত কান্নার হেতু সে জানে, নিজের মনের গোপনতম অনুভূতিও আর তাহার অজ্ঞাত নয়।

(ক্রমশঃ)

বাংলা ও বাঙ্গালী

বড়লাট পরিষদের আইন সদস্য-পদে বাঙ্গালী

স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের কার্য্যকাল শেষ হইবার পর বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন-সচিব রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। এই জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করি। পূর্ব্বে তিনি দুইবার পদগ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই দায়ীত্বপূর্ণ পদের যে তিনি সর্ব্বাংশে উপযুক্ত, সে বিষয়ে কাহারও তিলার্দ্ধ সংশয় নাই।

স্যার এন্, এন্, সরকার

বর্ত্তমান পদ গ্রহণের জন্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। অধিকন্তু তাঁর স্বদেশবাসী অনেকেরই আশা ভঙ্গেরও কারণ হইয়াছে। সম্প্রতি বিলাতে শ্বেতপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাংলার স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ করিয়া পাট-শুল্কের ও পুণা চুক্তির প্রতিবাদে যেরূপ দক্ষতা ও আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে নেতৃহীন শতধা বিচ্ছিন্ন বাংলার বুকে তিনি ঐক্যস্থাপনে সমর্থ হইতে পারিতেন বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে বা যেখানেই তিনি থাকুন না কেন বাংলার প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম দরদ ম্লান হইবার নয়।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথের বর্ত্তমান নিয়োগ ও বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের নয়।

ঠিক একশো বছর পূর্ব্বে (১৮৩৪) লর্ড মেকলের প্রথম এই আইন-সচিবের পদে অভিষিক্ত হইবার পর থেকে বৈদেশিকদিগেরই উহা একচেটিয়া ছিল। ভারত সচিব লর্ড মর্লির আন্তরিক প্রচেষ্টায় বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সময় এই পদে প্রথম ভারতীয় সদস্য লইবার ব্যবস্থা হইলে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী লর্ড সিংহ (১৯০৯-১৯১০) এই সম্মান লাভ করেন। তারপর আজ পর্য্যন্ত স্যার সরকারকে লইয়া মোট বারজন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন বাঙ্গালী, তিনজন সাহেব ও চারজন অন্যান্য প্রদেশের। বাংলার বহুমুখী প্রতিভার ইহা অন্যতম নিদর্শন।

মোটর নির্ম্মাণে বাঙ্গালী

পৃথিবীর বহুদেশেই মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা আছে। অনেক দেশেই যে মোটর গাড়ী তৈরী হয় তাতে নিজের দেশের চাহিদা মিটান তো হয়ই অধিকন্তু বিদেশে চালান হইয়া থাকে। আমেরিকার হেনরী ফোর্ডের মোটর কারখানা জগৎ বিখ্যাত।

বাঙ্গালী মোটর গাড়ী ব্যবহার করে কিন্তু নিজের দেশে উহা প্রস্তুতের প্রচেষ্টা কোনদিনই করে নাই। মটরের যুগ প্রতীচ্যে প্রায় শেষ হইয়া আসিল বলা যায় কিন্তু ভারতে এই নিত্য বাণিজ্য প্রয়োজনীয় শিল্পের নির্ম্মাণ কৌশল অজ্ঞাত।

এ দেশে শিল্প-প্রতিভার অভাব নাই। এর প্রমাণ সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস মহাশয় দিয়াছেন।

খুব বড় নামজাদা বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ারও তিনি নন; সামান্য কারিকর, বালিগঞ্জে আপন কারখানায় অতীত যুগের হাতিয়ার দিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের জন্য একখানি মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্বীয় প্রতিভা ও অনুসন্ধিৎসুতাই ছিল তাঁর একমাত্র বল ও ভরসা।
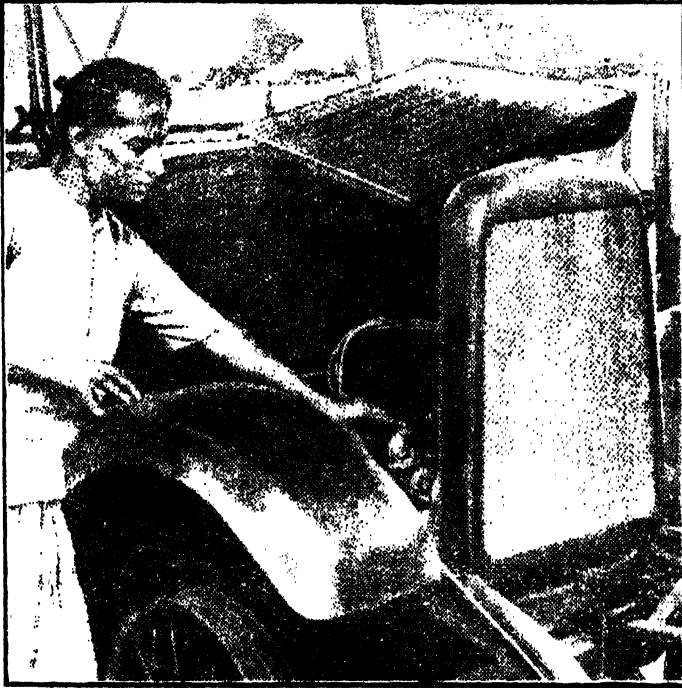
মোটর গাড়ী নির্ম্মাতা বিপিনবিহারী দাস

সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিপিন বাবুর এই প্রাথমিক চেষ্টার ফল গৌরবজনক ও আশাপ্রদ। কোন দিক দিয়া ইহা বিদেশী গাড়ীর অপেক্ষা নিন্দনীয় নয়। উপযুক্ত অর্থ, উৎসাহ ও সাজসরঞ্জাম পাইলে তাঁর এই ক্ষুদ্র কারখানা একদিন বিশালকার ধারণ করিতে পারে।

ভারতে মোটর শিল্পের অগ্রদূতরূপে এই বাঙ্গালী শিল্পীকে আমরা অভিনন্দিত করি। তাঁর চেষ্টা সফল হউক।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

বিগত দশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীগণের এই সাহিত্য সম্মেলন হইয়া আসিতেছে। এবারকার একাদশ অধিবেশন হইয়াছে গোরক্ষপুরে। অধিবেশনের তারিখ ১২ই, ১৩ই, ১৪ই পৌষ ছিল। সুকবি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, বার-এট-ল সভাপতি ও অধ্যাপক ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এস সি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, বৃহত্তর বঙ্গ, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ললিতকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল। এতদ্ব্যতীত সাংবাদিক বিদ্যা (journalism), শিক্ষাবিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, ও পণ্যশিল্প (industries) সম্মেলনের বিষয়ীভূত। সম্মেলনে একটি স্বতন্ত্র মহিলা বিভাগও খোলা হইয়াছিল। প্রবাসী, অ-প্রবাসী অনেকেই এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বাংলার অভ্যন্তরে সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ও অনুষ্ঠান উৎসাহ অভাবে ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া পড়িতেছে। প্রবাসী বাঙ্গালীর এ মহনীয় উদ্যম চির অক্ষুণ্ণ থাকিয়া অখণ্ড বাঙ্গালী হৃদয়ের অকৃত্রিম যোগ-সূত্র ও মিলনক্ষেত্র সৃজন করুক। শতধাবিচ্ছিন্ন বাংলার এ দুর্দ্দিনে সত্যিই—

'আ মরি বাংলা ভাষা!
মোদের গরব! মোদের আশা!'

আচার্য্য রায়ের সম্মান

সম্প্রতি লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির এক সাধারণ বিজ্ঞান সভায় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে উক্ত সমিতির অনারারী ফেলো সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত করিয়া অশেষ সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। আচার্য্য রায় এই সমিতির সাধারণ সভ্য পূর্ব্বেই ছিলেন। অনারারী ফেলো খুব কদাচিৎই নির্ব্বাচিত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে ফ্রান্স,

যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাতটি দেশ হইতে সাতজনকে এই সম্মানে বিভূষিত করা হইয়াছে।

আচার্য্য পি, সি, রায়

এঁদের মধ্যে দুইজন "নোবেল" প্রাইজ পাইয়াছিলেন এবং সকলেরই বিজ্ঞান ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে।

আচার্য্য রায়ের "Life and experience of a Bengali Chemist" এবং "Commemorative Volume" পুস্তকদ্বয় তাঁর বিজ্ঞান জগতের বিশিষ্ট অবদান। ইহা তাঁহাকে সর্ব্বজনবিদিত করিয়াছে। রসায়ন ও রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ও প্রচার কল্পে আচার্য্য রায়ের জীবনব্যাপী সাধনা যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মানলাভে সমর্থ হইয়াছে, সে জন্য দেশবাসী মাত্রই গৌরব অনুভব করিবেন।

দাক্ষিণাত্যে রবীন্দ্রনাথ

নবেম্বর মাসের শেষাশেষি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সদলবলে বোম্বাই পৌঁছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শান্তিনিকেতনের কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রী।

কবীন্দ্রের এই সফরের উদ্দেশ্য তাঁর বিশ্বভারতীর কৃষ্টি ও সামর্থ্যের ভাণ্ডার পরিপুষ্টি করা। ছাত্র-ছাত্রীর সাহায্যে কবিবরের কয়েকখানি নাটকও অভিনীত হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং কবীন্দ্র যোগ দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের দল মহাসমারোহে সেখানে অভিনন্দিত হইয়াছেন। "ঠাকুর সপ্তাহ' প্রতিপালন করিয়া বোম্বাইবাসী 'শান্তির দূতকে' অকৃত্রিম সম্মান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়াছেন। এই উপলক্ষে টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ এক শিল্প-প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন। বোম্বাইয়ের রিগাল থিয়েটারে তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণতি, বস্তুতান্ত্রিকতা ও প্রাচ্যের
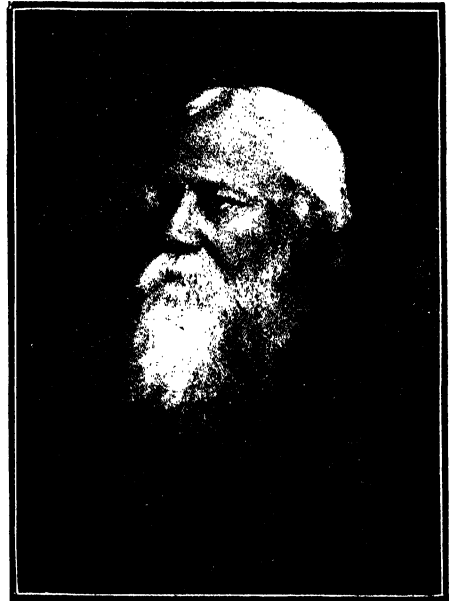
কবি রবীন্দ্রনাথ

বিশিষ্ট অবদান বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করেন। ইহা ছাড়া হাইদ্রাবাদ, অন্ধ্রদেশ প্রভৃতিতে কয়েকটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারার সুষ্ঠু অভিব্যক্তিই দেন।

খেলা-ধূলায় বাঙ্গালী

বৈদেশীক ক্রীড়ার মধ্যে যে সকল খেলা ভারতের জাতীয় জীবনে ব্যাপক বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে

ফুটবল খেলাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট, ব্যাড্‌মিন্টন, টেনিস প্রভৃতি খেলা বোধহয় ব্যয়সাধ্য বলিয়া এখনও সহরে, স্কুল-কলেজে ও বিশেষ করিয়া আভিজাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ। গরীব দেশের মফঃস্বলে এ সকল খেলা কোনদিন প্রাধান্য পাবে কি না সন্দেহ। জাপানের যুযুৎসু খেলা ক্রমশঃ এ দেশের নগরীতে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ব্যায়স্বল্পতা ও প্রয়োজনীয়তার দিক্ দিয়া উহার ব্যাপক প্রসার বাঞ্ছনীয়। ক্যারাম্, ব্রীজ প্রভৃতির প্রতিযোগীতা সহরবাসীর মধ্যে আজকাল প্রায়শই দৃষ্ট হয়। যাহা নির্দ্দোষ, স্বাস্থ্য ও আনন্দপ্রদ তাহা স্বদেশী বিদেশী বলিয়া কোন সংস্কারের সীমানা টানা উচিত নয়। লুপ্তপ্রায় কপাটি, হা-ডু-ডু, নুন্‌ধাপ্‌সী প্রভৃতি স্বদেশী খেলা ইদানীং পুনরায় জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। খেলা-ধূলা প্রভৃতি শক্তি-চর্চ্চার মধ্য দিয়া জাতির প্রাণচঞ্চলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংল্যাণ্ড-ভারত ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙ্গালী

ভারতে ক্রিকেট টেষ্টম্যাচ খেলিতে বিলাত হইতে এম, সি, সি দল সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছেন। বিলাতের বাছাই খেলোয়াড়দের দল লইয়া এই দল গঠিত। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে ইঁহাদের খেলা হইবে। বর্ত্তমানে কলিকাতা ক্রীকেট প্রতিযোগীতা ম্যাচ হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র ও বিশাল নগরীর ক্রীড়ামোদিগণ আগন্তুকদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন। বাঙ্গালী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ এই সুযোগে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। ইংলণ্ড-ভারতের মধ্যে ক্রিকেট-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের পক্ষে যাহারা যোগ দিবেন তাহা নির্ব্বাচন করিবার জন্য বোম্বাইয়ে ভারতীয়দের মধ্যে একটি টেষ্ট-ট্রাইয়েল ম্যাচ হইয়াছিল। বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে এই খেলায় যোগদান করিতে আহূত হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত গণেশ বসু, কার্ত্তিক বসু ও এস্ ব্যানার্জ্জি। বাংলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে ইঁহারা সুপরিচিত। মেজর সি, কে, নাইডু ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করিতেছেন। আশাকরি খেলা-ধূলার মধ্য দিয়া অন্তর্প্রদেশের অন্তর পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিবে।

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন

এই এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ এন, আমেদ। মিঃ আমেদ প্রাচ্য প্রতীচ্যের শক্তিচর্চ্চায় অভিজ্ঞ। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য বাংলা হইতে মল্ল বাছাই করাই এই এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী শক্তির পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

মল্লক্রীড়ায় বাঙ্গালী

বাংলার মল্লবীর বলিতে এখন সবে ধন নীলমণি গোবর বাবু। বিশ্বের মল্লজগতে তিনি তাঁর অসীম শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সম্প্রতি নাট্যনিকেতনে একটি প্রতিযোগীতায় তাঁর কতিপয় শিক্ষিত ও ভদ্রবংশীয় মল্ল-শিষ্য শারীরিক শক্তি ও কৌশল দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। শিক্ষিত সমাজের মন হইতে মল্লক্রীড়া সম্বন্ধীয় সংস্কার দূর করিতে ও শরীর চর্চ্চায় জাতির তরুণকে উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁর আন্তরিক ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সার্থক হউক।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্পর্ক—

এশিয়া ও ইউরোপের চিত্ততলে যে ভাবধারা ফল্গুর মত প্রবাহিত, তারই মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই রিগাল থিয়েটার হলে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন। পাশ্চাত্যের যন্ত্র-সভ্যতার নিছক বস্তুতান্ত্রিকরূপের ও তাহার পরিণতির ছবি তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোতে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ উদ্ধৃত করা গেল :—

প্রভাতের আলো ও প্রদোষের বিলীয়মান অন্ধকারের মধ্যে যেমন একটা সম্বন্ধ ও ব্যবধান বর্ত্তমান, তেমনি পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান ইতিহাসের সহিত ইহার অতীত যুগের ধ্বংসের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে জীবনযাত্রার প্রণালীকেই প্রাচ্যের তরুণ-সম্প্রদায় জীবনের শ্রীবৃদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বলিয়া মনে করে এবং ইহাই এ দেশে আধুনিকতা বলিয়া আখ্যা পাইয়াছে। যুগধর্ম্মের বিশিষ্ট প্রকাশই আধুনিকতা। আধুনিকতার মূলে যদি কোন সত্য না থাকে তবে তার ধ্বংস অনিবার্য্য। পশ্চিমের ক্ষুধার্ত্ত যে জাতি শতাব্দী ধরিয়া প্রাচ্যকে লুণ্ঠন ও অপমানিত করিল, অধিকার-প্রমত্ত সে জাতি অনন্তজীবনের সন্ধান কেমন করিয়া পাইবে? যে আদর্শের জন্য অত্যাচারে, উত্তেজনায়—সত্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া, তা চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

বর্ত্তমান যুগ ইউরোপীয় শক্তিমত্তার যুগ। মানবধর্ম্মের অনাড়ম্বর সারল্য আশা করা যাইতে পারে কেবলমাত্র তাদেরই নিকট, যারা কোন রাষ্ট্র, বাণিজ্য কিম্বা ধর্ম্ম-স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়। ইউরোপের অন্তরের অপরিসীম দম্ভ আজ কুণ্ঠাহীন আত্মপ্রকাশে উদ্যত। উহার অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দুর্ব্বহ ভার আজ আমাদের উপর বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধ অতিমাত্রায় কৃত্রিম, ইহার মধ্যে জীবনের সৃজনী-শক্তির লেশমাত্র নাই। লুণ্ঠনের পথ সুগম ও সহজ করিবার জন্য ইঞ্জিনীয়ারের পাথর বাঁধান রাস্তা নির্ম্মাণের মত, পাশ্চাত্য সভ্যতাও কতকটা সেইভাবে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভাবের অন্তরালে আছে রাশি রাশি পুঞ্জীভূত অকল্যাণ।

আমাদের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইউরোপ আমাদের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে বিরত হয় নাই। পশ্চিমের সকল গর্ব্বিত বাক্যের মধ্যে "তোমরা আমাদের কেহ নও", এই দাম্ভিকতার জন্য তার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলিও আজ আমাদের নিকট দারুণ অপমানজনক বলিয়া মনে হইতেছে। * * * * পাশ্চাত্যের এই ভেদাভেদতন্ত্রের মূলে রহিয়াছে অন্য জাতির প্রতি ইহাদের অপরিসীম ঘৃণা। জন্মগত অধিকারের নামে অপরিসীম গর্ব্বভার অন্য জাতিকে ঘৃণা করাই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যুগ যুগান্ত ধরিয়া এশিয়া স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়াছিল এবং তার মর্য্যাদাও অন্যান্য মহাদেশ অপেক্ষা কম ছিল না। কিন্তু কালক্রমে ইউরোপের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ও অদম্য আত্মবিশ্বাসের নিকট ইহাকে নতি স্বীকার করিতে হয়। এই জয়ের পশ্চাতে যে অপমানকর বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া এশিয়ার হৃদয়কে নির্ম্মমভাবে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। এশিয়া এ অপমান একদিনের তরেও ভুলিতে পারে নাই।

......বর্ত্তমান চাকচিক্যময় পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকিয়া ইউরোপের এখনও বুঝিতে বাকী আছে যে, তাহার সভ্যতা একেবারে পূর্ণাঙ্গ নহে। ......আমরা তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ একাত্ম নই বলিয়াই তাহারা রেললাইন খুলিয়া, টেলিগ্রামের তার বসাইয়া, কয়লার খনি খুঁড়িয়া বা চায়ের আবাদ করিয়া এবং সর্ব্বোপরি আইন ও শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করিয়া কি কি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছে, তাহার লম্বা ফর্দ্দ দিয়া গর্ব্বিত হইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। আমাদের প্রকৃত প্রয়োজনের প্রতি তাহাদের এমনই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য যে, তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য আমাদের দেশে চালান হইয়া থাকে, যাহা আমাদের একান্ত অপ্রয়োজনীয় অথচ সন্তুষ্টচিত্তে তাহা যদি আমরা গ্রহণ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

......আমাদের মনে হয়, সব চেয়ে সর্ব্বনাশের মূল হইতেছে উৎকোচের দ্বারা প্রাচ্যের সকল জাতিকে তাহাদের ভবিষ্যৎ বিকাইয়া দিতে বাধ্য করা। পরোপকারের আবরণে যে উৎকোচ, তাহা দস্যুতার চেয়েও ভয়ঙ্কর।......যাহারা এই লুণ্ঠনকে নৈতিক আবরণে আচ্ছাদিত করিতে পারিত না, ইতিহাসে তাহাদিগকে হিংস্র ও অসভ্যজাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরাকালে এমন জাতি ছিল।

......নৈতিক বিচারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহা বর্জ্জিত হইলে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইব। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়াই পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমাদের সর্ব্বক্ষেত্রে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। সহ-

যোগিতার পথও আজ সেই কারণেই রুদ্ধ। প্রতীচ্যের সকল উপেক্ষা সত্ত্বেও আজ আমরা নির্ভীক হইয়াই এই নৈতিক বিচার করিব, অন্ততঃ নৈতিক ধ্বংসের হাত হইতেও ইহা আমাদিগকে রক্ষা করিবে। কেবলমাত্র অর্থ ও বলের সাহায্যেই যে তুমি শ্রদ্ধা ও সম্মানার্হ হইবে, সে কথা বলিয়া আর আমরা অপমানিত হইতে চাহি না।

উচ্চশিক্ষা ও যৌবনের অপচয়—

মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। সত্যিকার মনুষ্যত্ব যেখানে উন্মেষিত হয় সেখানে তার বাহ্য লক্ষণ-স্বরূপ শ্রী, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ প্রভৃতিও প্রকাশিত হয়। যে শিক্ষার মাঝে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেই শিক্ষা ব্যর্থই বলিতে হইবে। শিক্ষার ফলে যখন দু'মুঠো অন্নের যোগাড় হয় না, শিক্ষিত যখন নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করে, জীবনের গভীর রহস্য যেখানে অনুদ্ঘাটিত রহিয়া যায়, সে শিক্ষায় নিষ্ফল অর্থব্যয় ও যৌবনের অপচয় ছাড়া আর কি!

বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর এই দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি এবং শোচনীয় কুফল ভুক্তভোগী মাত্রেরই ও দেশের বরেণ্য মনীষিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশান-বক্তৃতায় স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, আচার্য্য রায়, পণ্ডিত মালব্যজী প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নিঃসংশয়ে অভিমত দিয়াছেন যে, যদি প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী কারিগরী এবং কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার বহুল প্রচার না করা যায়, তবে যন্ত্র-যুগের জীবন সংগ্রামে দেশবাসী তিষ্ঠিতে পারিবে না।

এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকেশান-বক্তৃতায় স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু বলিয়াছেন—

বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান ছাত্রের সম্মুখে আজ অন্নের সমস্যা। ক্ষুধার সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। বিদ্যালয়ে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা জীবনসংগ্রামের পক্ষে বরং বাধাস্বরূপ।

এই অবস্থার প্রতিকারের ইঙ্গিত দিতে গিয়া স্যার সাপ্রু বলিয়াছেন—

ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও বৃত্তি শিক্ষার এমন সুব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করিয়াই যুবকেরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। সেজন্য চাই বহু বিদ্যালয়। অধিকাংশ ছাত্রই বিদালয়ে সাধারণ কিছু লেখাপড়া শিখিয়া ঐ সকল ব্যবহারিক শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে এবং মাত্র অল্পসংখ্যক প্রতিভাশালী ছাত্রদিগের জন্য উচ্চ শিক্ষা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা স্বল্পের জন্য, অধিকাংশকে শিখাইয়া বেকার সংখ্যা বাড়াইয়া কোন লাভ নাই, বরং দেশ ও সমাজের ক্ষতি।

জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বেনারস হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ-সভায় বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণী সভায় প্রধান ভাবুক শিবস্বামী আয়ারও প্রায় একই কথা বলিয়াছেন।

আচার্য্য রায় উচ্চ-শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যদি কোনও ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য আন্তরিক অনুরাগ না থাকে, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান তাহার পক্ষে উচিত নহে। বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডিত্য, গবেষণা এবং সাধনার কেন্দ্র হইবে। যাঁহারা মানব-জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন, শুধু তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করুন। বর্ত্তমানে ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানবিষয়ে বা পার্থিব বিষয়ে উপকৃত হইতেছে না।

এই সমস্যা সমাধানকল্পে আচার্য্য রায় বলিয়াছেন—

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা করা হউক। দেশীয় ভাষার সাহায্যে অধিকাংশ ছাত্রের জন্য মধ্যমিক পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এইরূপ শিক্ষা ইংলণ্ডের স্কুলের শেষ শিক্ষার মত হইবে।

প্রাচ্য বনাম অর্ব্বাচীন শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ—

এবারকার সেকেন্দ্রাবাদের বক্তৃতায় বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া ভারতীয় শিক্ষা-সাধনার মর্ম্মসত্যের সূক্ষ্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্যত্র মিলে না। তাঁহার এই অপূর্ব্ব বক্তৃতায় আপামর সাধারণ দেশবাসী অধুনা বিস্মৃত স্বধর্ম্মের সন্ধান পাইবেন। ইহার কিয়দংশ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

অতি আধুনিকরা বলেন যে, অতীত দেউলিয়া, আমি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিই যে, এই অতীতই নব নব জাগরণের স্রষ্টা। ভারত তাহার পিতৃপুরুষের সম্পদের আজও অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

শিক্ষার অপর নাম সত্যানুসন্ধান। ভারতের কোনও বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে আজ বিদেশী বা ভারতীয় শিক্ষার্থী ভারতীয় চিত্তের পরিচয় পায় না। এই পরিচয় লইতে আমাদিগকে ফ্রান্সে বা জার্ম্মাণীতে দৌড়াইতে হয়।

কিন্তু

এমন দিন ছিল, যখন ভারতবাসী আপনার মনের মালিক ছিল। তাহার সে মন ছিল জীবন্ত, সে মন কাজ করিত, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিত, আপনাকে অভিব্যক্ত করিতে পারিত।

সেদিন আর নাই! বর্ত্তমান শিক্ষার সাফল্যই বা কোথায়, কতটুকু, কবীন্দ্রের ভাষায়ই বলি,—

আজিকার বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থশালা অগণিত গ্রন্থরাজি ও আনুসঙ্গিক ব্যাপারাদি চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে মাত্র। প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে তরুণ-চিত্ত সত্য ও স্বাধীন চিন্তার খোরাক পাইতেছে না। আজিকার ছাত্রদের নিকট বড় কথা হইল পরীক্ষায় সাফল্যলাভ। বর্ত্তমান ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের জ্ঞান মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কেবল তাহাই নয়—বর্ত্তমান ভারত তাহার শিক্ষা বিধানের ফলে অপমানিত হইতেছে। মহা-সভ্যতার লীলা নিকেতন ভারত আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত। ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের সহিত ভারতীয় কৃষ্টির যোগাযোগ নাই।

অতীত ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

ভারতীয় শিক্ষাদাতারা তাঁহাদের পল্লীকুটিরে বসিয়া জনসাধারণের মধ্যে দেশের ভাবধারা প্রচার করিতেন। তাঁহারা অতীত ইতিহাস-পুরাণ শুনাইতেন। জাতির বীর ও মহাজনের কীর্ত্তিগাথা সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিতেন। এই প্রাচীন শিক্ষাপ্রথার উদ্দেশ্য ছিল দেশের সকলকে মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিতে শিখান। ফলে ভারতের অতি সাধারণ মানুষ লিখাপড়া না শিখিয়াও ধর্ম্ম কি তাহা শিখিত ও ধর্ম্মপথ মানিয়া চলিত।

শিক্ষা ও অর্থনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন—

আমাদের প্রাচীন সমাজেও এই দুইটা দিক বজায় রাখিয়া যদি চলা না হইত, তাহা হইলে ভারতের সভ্যতা কালের আঘাত সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিত না।

পথ প্রদর্শক বাঙ্গালী—

বাংলার এড্‌ভোকেট জেনারেল স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার এবার বড়লাটের আইন সচিবের পদে নিযুক্ত হওয়াতে মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী মুদেলিয়ার ব্যবস্থা পরিষদে টিপ্পনি কাটিয়া বলিয়াছেন যে, বাংলা অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা যোগ্যতা দেখাইতে পারে নাই যতটা সে পারিয়াছে আইন-সচিব প্রসব করিতে।

কথাটা যে নিছক ভিত্তিহীন তাহা আধুনিক ভারতের নিরপেক্ষ ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই বলিবেন। "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় একজন ভারতীয় লেখক চোখে আঙ্গুল দিয়া ইহার প্রমাণ করিয়াছেন।

প্রকাশ্য আইন সভায় মারাঠী গোখেলে বলিয়াছিলেন,

বাঙ্গালী আজ যাহা চিন্তা করে, কাল বাকী ভারতবর্ষ তাহাই চিন্তা করে। বাঙ্গালাকে সন্তুষ্ট করুন, বাকী ভারত তাহা হইলেই সন্তুষ্ট হইবে। কোথায় পাইবেন বাঙ্গালীর মত মনীষী, চিন্তাশীল লেখক, কবি, বক্তা, রাজনীতিক, আইনজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রচারক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সমাজসংস্কারক?

একজন অ-বাঙ্গালীরই অভিমত। শুধু কথায় নহে, উদাহরণ দিয়া তিনি বাংলার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের তফাৎ প্রমাণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাঙ্গালী, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর-রামমোহন, শাস্ত্রজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগন্নাথ-রঘুনন্দন-রামনাথ-তারানাথ, রাজনীতির ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ-চিত্তরঞ্জন, বক্তৃতার ক্ষেত্রে লালমোহন-বিপিনচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন-শিবচন্দ্র, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র-মাইকেল-গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল-রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য্য জগদীশ-প্রফুল্লচন্দ্র, প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে অক্ষয়চন্দ্র-রাখাল-দাস-রমাপ্রসাদ, ইতিহাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র, রাজা রাজেন্দ্রলাল, আইনের ক্ষেত্রে রাসবিহারী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, স্যার রমেশচন্দ্র, চিকিৎসার ক্ষেত্রে দুর্গাচরণ-মহেন্দ্রলাল-জগবন্ধু-গঙ্গাধর-বিজয়রত্ন, শিক্ষাবিদের ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষ, দেশসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর-রাজেন্দ্র মল্লিক-মতিলাল-তারকচন্দ্র-সাগরদত্ত-রাসবিহারী, সার তারকনাথ—কত নাম করা যায়? বাংলায় এঁদের প্রতিভা কেবল নিবদ্ধ নয়, বর্ত্তমান ভারতের প্রথম পথপ্রদর্শক।

* * * *

ইংরেজের আমলে প্রথম ভারতীয় গভর্ণর হইয়াছেন বাঙ্গালী লর্ড সিংহ, প্রথম ভারতীয় বিভাগীয় কমিশনার বাঙ্গালী রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি বাঙ্গালী স্যার রমেশ মৈত্র, প্রথম ভারতীয় এডভোকেট জেনারেল বাঙ্গালী সার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ—এমন ছোট খাট বাঙ্গালীর নাম অনেক করা যায়, যারা অধিকাংশ ভারতীয় আজিকার প্রাণচঞ্চলতার ক্ষেত্রের অগ্রদূত। প্রথম রাজনীতির প্রেরণা এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর প্রাণেই জাগে। মূলতঃ বাঙ্গালী ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জি, সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের

প্রচেষ্টায়ই ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রনৈতিক বেদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা সেদিন হইতে এ যাবৎ যে অসীম ত্যাগ ও দুঃখ-বিবাদ বরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার তুলনা অন্যত্র কতটুকু মিলে? বাঙ্গালী যেখানে ছাড়িয়াছে সেখানে মাদ্রাজ কেন, অনেক প্রদেশ ত হাতে খড়ি দিতে সুরু করিয়াছে।

ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম—

'ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম' সম্বন্ধে বিলাতের এক সাময়িক পত্রে ক্যাপ্টেন ও ডোনোভেন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, Christianity has failed in India, অর্থাৎ খৃষ্টান-ধর্ম্ম ভারতে ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—

ভারতে খৃষ্টানের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ, অথচ পাদরীরা চারশো বছরের ঊর্দ্ধকাল ভারতবাসীর ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বতে আদা-জল খাইয়া লাগিয়াছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম ভারতে প্রবেশ করে। তারা তাদের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে গলা কাটিবার ভয় দেখাইয়াও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে ব্যর্থ হইল। অবশেষে আকবরের সময় ভাল করিয়াই বুঝিল, খৃষ্টধর্ম্মের বীজ ভারতের মাটিতে কোন ফল ফলাইতে পারিবে না। আকবর প্রশ্ন করিল, তোমাদের বিশ্বাস যদি সত্য হয়, ঈশ্বরের নাম করিয়া আগুনের উপর দিয়া চলো অথচ কোন দাহ জ্বালা পাইবে না। পাদরীর দল আঁৎকাইয়া উঠিল, তাও কখন হয়। এই সময়েই আসিল ইহুদী জাতি, জৈনধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব ঘটিল। জৈনধর্ম্মীর সংখ্যা এখন প্রায় সত্তর লক্ষের কাছাকাছি।

• পাদরীরা এ যাবৎ সক্ষম হইয়াছে কয়েকটি বর্ব্বর জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। শিক্ষিতেরা বিনা প্ররোচনায় বা উপদেশে স্বেচ্ছায় দীক্ষা লইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে পাদরীদের কোন কৃতিত্ব নাই।

সমালোচনা

কোজাগরী—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। মূল্য ১৷০ সিকা।

"কো জাগর?—কে জাগে রে?
কে জাগে আজ এই নিশিতে?
কবি জাগে, কবি জাগে,
কে জাগে প্রাণ মিশিয়ে দিতে।"

—স্বপ্নের জ্যোৎস্নায় জীবন জাগিয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি এই কাব্য-মঞ্জরী এঁকে তুলেছেন—ছন্দে, ভাবে, রসে সবখানিই অনবদ্য সৌন্দর্য্যময়। অমৃত-পুত্র ঋষির ন্যায়, কবি প্রথম কবিতায় এই আত্মপরিচয়ই দিয়েছেন—

"......জানি আমি হাসির ছেলে,
সুন্দরেরি ছেলে আমি তার বুকে যাই বক্ষ মেলে।"

—কিন্তু আকাশে পাখা মেলেই কবি তাঁর নিজের পরিচয় শেষ করেন নি, তাঁর টান বহু-জীবন-ধাত্রী ধরণীর সাথেও—

"... জাগিয়াছি আমি,
আমার সর্ব্বস্ব এই ধূলি-অনুগামী।"

—এই ধরা-জননীর সৃষ্টি মূর্ত্তিও তাই তাঁর কণ্ঠে বড় সত্যময় হয়ে ফুটেছে—

"ধ্যানময় প্রাণময় গভীর সঞ্চয়
সৃষ্টির সাগ্নিক শক্তি পোষিছ দুর্জ্জয়।
ঐ ছিন্ন ধূলি-জাল জীবন-চঞ্চল
ঐ মৌন মাটী-স্তূপ সৃজনে উচ্ছল॥"

—সেই সৃষ্টির চরম রহস্য কি? কবি গেয়েছেন—

"রবির জ্যোতি ফুটল দ্বিগুণ, চাঁদের হাসি সুধায় মাখা;
পুরুষ পাশে মিল্‌ল নারী—সৃষ্টি-পটে শ্রেষ্ঠ আঁকা॥"

—সকল কবিতার ভাব-মাধুরী উদ্ধৃত করে' দেখান সম্ভব

নয়—প্যারীমোহনের রচনা বাংলাসাহিত্যে স্বচ্ছ, শুচি, উন্নত রুচি প্রণোদিত সম্ভারে বৈশিষ্ট্যময়—বেশ উপভোগ্য।

বৈশাখী বাংলা—শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। লেখক চিন্তাশীল, সনাতন ভাবের ভাবুক, বাংলার বৈশিষ্ট্যের অনুরাগী। এই সকলই তাঁহার লেখায় থরে থরে ফুটে উঠেছে। বলাইবাবুর সন্দর্ভগুলি পড়্‌লে প্রাতঃস্মরণীয় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকেই মনে পড়ে' যায়—ভাবে, ভাষায় তিনি তাঁহারই অনুগামী বল্‌লে নিন্দা বা অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর অন্তর্জ্জীবন শুচি-পূত-চিত্তে স্পর্শ করার একটা আন্তরিক চেষ্টা বইখানির মধ্যে দেখা যায়। এই চেষ্টাটুকু অভিনন্দনীয়।

রাজা গনেশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। (ঐতিহাসিক নাটক) মূল্য ১৲ টাকা।

বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা উজ্জ্বল অধ্যায় লেখক নাট্যাকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। স্বদেশ-প্রেমের অগ্নিময়ী উদ্দীপনায় নাটকখানি অনুপ্রাণিত। ঐতিহাসিক সত্যকে নাট্যের গৌরবে অভিষিক্ত করে' সাহিত্যের নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ রস-সৃজনে বাংলার দুইজন সাহিত্য মহারথ সফল হয়েছেন—গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল—গ্রন্থকার তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করেছেন। নাটকীয় সুনির্ব্বাচিত পরিকল্পনাটী উপযুক্ত রসৈশ্বর্য্যের অভাবে সমৃদ্ধ না হলেও, ইহার স্থানে স্থানে প্রতিভার চিহ্ন সুস্পষ্ট। কিন্তু কুমার যদুনারায়ণের হৃদয়-বিপ্লবের কাহিনী যেন শেষ কালে জুরিয়ে এসেছে, অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলিও ভাষার আড়ালে ততখানি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠ্‌তে পারে নি। তথাপি যে গভীর আবেগ ও উচ্চরুচি নিয়ে সাহিত্যের সাধনায় তিনি ব্রতী, তজ্জন্য স্নেহভাজন গ্রন্থকারকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি—তাঁহার এই একনিষ্ঠ সাধনা একদিন যেন সার্থক হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্‌-এ প্রণীত। ঢাকা প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী হইতে শ্রীসত্যেন্দ্র চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

আচার্য্য রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী সহজ ভাষায় লিখিত। বাংলায় প্রফুল্লচন্দ্রের নাম না শুনিয়াছেন এমন খুব কমই আছেন কিন্তু তাঁর বিচিত্র কর্ম্মবহুল জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়তো অনেকেরই নাই। বৈদেশিক গুণগ্রাহীর লেখনি মুখে বাংলার এই মনিষীর গভীরতা যেরূপ সুষ্ঠভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা হয়তো তাঁর স্বজাতির নিকটই অজ্ঞাত। বাংলার গৌরব যাঁরা তাঁদের জীবন-পরিচয় কিশোর কিশোরীর মনের দরজায় ধরিবার একটা প্রয়াস অনিলবাবুর মাঝে লক্ষিত হয়। তাঁহার শ্রম সার্থক হউক। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

উষাপূজা যতীন্দ্রনাথ প্রণীত। দাম দশ পয়সা।

শ্রীদাম বৈদ্যনাথের ৺বৈদ্যনাথজীর প্রথম প্রভাত-পূজার নিখুঁত চিত্র।

গুরুগীতা—কলিকাতা আর্য্য মিশন ইন্‌ষ্টিটিউশন্ হইতে শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য চারি আনা।

বিশ্বসারতন্ত্রের শ্রীশ্রীগুরুগীতাস্তোত্র সমূহের আর্য্য-মিশনানুযায়ী মূল ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

রাজর্ষি রামমোহন—শ্রীঅনঙ্গমোহন রায় সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রীকরালীকুমার কুণ্ডু, বাণীভবন, হাওড়া। মূল্য চারি আনা।

রাজার সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর অভিমতের চুম্বক সংগ্রহ।

হিন্দুর অস্পৃশ্যতা সমস্যা—শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু—প্রণেতা ও প্রকাশক। দাম চারি আনা।

পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভিত্তি করা হইয়াছে প্রধানতঃ পুরাণের উপর। শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিলে বা ধর্ম্মজীবন প্রতিপালন করিলে অস্পৃশ্যের মন্দির প্রবেশে বা বিগ্রহ পূজায় কোন বাধা থাকিতে পারে না, ইহাই লেখক প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। ভাল কথা। কিন্তু উহার ব্যবহারিক মাপকাঠি কি? হিন্দুর শাস্ত্র অগাধ, সমস্যাও জটিল। এত ভাসা-ভাসা যুক্তিতে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে হিন্দু মাত্রেরই এ বিষয় বলিবার, পড়িবার ও শুনিবার অধিকার আছে।

উৎসব-চিত্র

(অনুরাগী অতিথি-অঙ্কিত)

তখনও নীরব পাখীর কণ্ঠ। ময়ূর-ময়ূরী সুপ্তিমগ্ন। ওপারের ঐ ভাগিরথী তীরের সারি সারি মিলগুলি সারাদিনের কাজের জন্য সবেমাত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। বুভুক্ষিত যন্ত্রদৈত্যের বিরাট উদরে পাথুরে কয়লায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল মাত্র। অবজ্ঞায় উন্নতশির চিমনীর ধূঁয়া নিশার শিশির ধুয়া নির্ম্মল নীলাকাশের গায়ে নির্ম্মমতায় ফুৎকারে ফুৎকারে কালিমা ক্ষেপণ সুরু করেছিল কেবল। গঙ্গার বাঁক ব্যাপিয়া আধখানা মালার মত মিল-মালিকের প্রাসাদোপম অট্টালিকা রাস্তা-ঘাটের শুভ্র শ্রান্ত বিজলি বাতি হিম-রাত্রি জাগিয়া ভোরের আবছায়া কুয়াশায় রক্তাভ দেখাচ্ছিল যেন যক্ষপুরীর বিনিদ্র উৎসব-রজনীর মোহ-মদিরায় ঢুলুঢুলু অপ্সরার রক্ত-আঁখি।

আর এ পারে আশ্রমী নরনারীর আনন্দোৎসব। ২২শে পৌষ—সঙ্ঘ দেবতার ৫২ জন্মবার্ষিকী-তিথি। শীতের রাত্রির তৃতীয় যাম—জাগরণের চাঞ্চল্যে সঙ্ঘের সর্ব্বত্র মুখরিত। উন্মুক্ত গগনতলে মন্ত্রের উদ্গানে সূচনা সুরু হইল। নির্ফাঁস পেঁজা তুলার মত আকাশের গায়ে শ্বেত-ধবল ছিন্ন-ভিন্ন ভাসমান মেঘের ফাঁকে ফাঁকে গাঢ় নিলীমার সঙ্গে যেন অমরার আশীর্ব্বাদ ঝড়িয়া পড়িল।

প্রাতঃ সাড়ে চারিটায় প্রভাতী নগর-কীর্ত্তন সুপ্তি-মগ্ন পুরজনের কর্ণে দেবতার নাম-গানের অমৃত বর্ষণ করিল। দশাবতার স্তোত্র—যুগে যুগে ধরিত্রীর বুকে মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া দেবতার অবতরণ আর স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবিত মোহমুগ্ধ মানবের তাহা অজ্ঞতায় উপেক্ষা-উপহাস।

সাড়ে পাঁচটায় সঙ্ঘ-মন্দিরে সঙ্ঘের ও সমাগত নর-নারীর সমবেত উপাসনা-ধ্বনি অবরুদ্ধ মন্দির-প্রাঙ্গন কাঁপাইয়া প্রভুর চরণস্পর্শ করিল। মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার পরিচিহ্ন সেদিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল সঙ্ঘের আকাশ-ভুবনে। উৎসর্গীকৃত জীবনের অপূর্ব্ব আনন্দহিল্লোল চঞ্চলিয়া ফিরিল প্রতি প্রাণে প্রাণে। মনের কণক-সিংহাসনে হৃদয়-দেবতার প্রতিষ্ঠা স্পষ্ট অনুভূত হইল।

ছয়টায় সঙ্ঘ-সম্মেলন ও সঙ্ঘদেবতার আশীর্ব্বাণী। চারিদিকে অট্টালিকা-ঘেরা ক্ষুদ্র মাতৃমন্দিরাঙ্গন লাল সামিয়ানায় ঢাকা। প্রবেশ-পথের মুখেই জলপূর্ণ মঙ্গল-ঘট ও কদলী বৃক্ষের শুভচিহ্ন। মন্দিরাভ্যন্তরে মাতৃ-পট ও শালগ্রাম শিলা সমন্বিত বেদী অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত। দেওয়ালের গাত্রে গাত্রে উচ্চ ভাবোদ্দীপক ছবি, পুষ্প-মাল্যের মনোহর রচনা; হেথা-হোথা ঝাউ ও হরকিছিম টবের গাছের সুদৃশ্য শোভা; পার্শ্বের ছোট্ট সুসজ্জিত বারান্দায় সঙ্ঘ-গুরুর বসিবার আসন এবং তার পাশেই সিংহাসনা-রূঢ়া সঙ্ঘ-জননীর প্রমাণ উপবিষ্টা পটমূর্ত্তি, সুদূরের বিচিত্র বৃক্ষলতা পরিশোভিত উদ্যানবাটিকার মনোহারিণী ছবির মতই দেখাইতেছিল। এ সবই সঙ্ঘ-নারীর স্বহস্তের সুনিপুণ-সাজসজ্জা। প্রায় একঘণ্টাকাল গুরুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী, অন্তরঙ্গ সাধনার মর্ম্ম-ইঙ্গিত শিষ্য-শিষ্যার দল মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিল।

বেলা আটটায় ব্রহ্ম-হোম—সঘৃত বিল্বপত্রের ব্রহ্ম-নামের সহিত একশো আট বার আহুতি। সোৎসুক আশ্রমী নারীপুরুষ পরিবেষ্টিত হোমকুণ্ড—সামনেই সঙ্ঘ-গুরুর ধ্যানমগ্ন উজ্জ্বল মূর্ত্তি। প্রধান হোতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর দীপ্ত মুখমণ্ডল, কণ্ঠে তাঁর অনাহত নিশ্চেষ্ট উদাত্ত মন্ত্রধ্বনি—নাভিমূল হইতে সারা অঙ্গ তরঙ্গিয়া স্বতোৎসারিত। হোম-সঙ্কল্প যথা—

"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ। অদ্য পৌষে মাসি কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ ব্রহ্মগোত্রাঃ বয়ম্ নিখিলপ্রবর্ত্তকসঙ্ঘ-প্রতিনিধিরূপেণ সঙ্ঘদেবতাসঙ্কল্পিত ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্মস্য পুনঃপ্রবর্ত্তনপূর্ব্বক ভাগবতচেতনাসমন্বিত ধর্ম্মমূলক-জাতিগঠন সিদ্ধয়ে তথা প্রবর্ত্তকসঙ্ঘদীক্ষিতসন্তানগণেষু

ঐক্যপ্রেম প্রতিষ্ঠয়া নিখিলবঙ্গদেশে ভবিষ্যৎসংহতিবদ্ধ-জীবনগঠনকামনয়া ব্রহ্মণঃ প্রীতিলাভায় যথাজ্ঞানং যথাশক্তি "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" নাম সপ্তাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্রস্য একৈকশঃ মন্ত্রক্রমেণ ওঁ স্বাহা ইতি মন্ত্রকরণক অষ্টোত্তরশতসংখ্যক সাজ্যাবিল্বপত্রসমিদ্ভিঃ ব্রহ্মণঃ হবণকর্ম্ম করিষ্যামহে ওঁ।"

ধর্ম্মমূলক জাতিগঠনই বটে! সঙ্ঘ—একটা অখণ্ড পরিবার—সতত ভাগবৎ চেতনায় উদ্বুদ্ধ নারী-পুরুষের সম্মেলন। উৎসর্গীকৃত পৌরুষত্বের পশ্চাতে থাকিয়া লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে আত্মনিবেদিতা নারীর মঙ্গল হস্তের অমিয় স্পর্শ উৎসব-যজ্ঞের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান পূর্ণ ও মাধুর্য্যময়ী করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রহ্মযজ্ঞের সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠবতা ও চমৎকারিত্ব এখানেই স্পষ্টতর পরিস্ফুট ও আস্বাদের বস্তু ছিল।

এগারটা হইতে পৌনে বারটা ধ্যান—দেবতার চরণে সমষ্টি-গোষ্ঠির আত্মনিবেদন ও যুক্তি।

ঠিক মধ্যাহ্ন বারটায় আবার সমবেত উপাসনা ও পৌনে একটা পর্য্যন্ত নীরবতা। শতাধিক নরনারীর কণ্ঠ নির্ব্বাক—উৎসবের কলরব মুহূর্ত্তে যেন কোন স্বপ্ন-পুরীর সোণার কাঠীর স্পর্শে অন্তরের অন্তস্থলের কোন এক অজানা-অচেনা গভীরতার অতলে তলাইয়া গেল।

বেলা দুইটার মধ্যেই মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন।

অপরাহ্ন চারিটায় স্থানীয় এবং ঢাকা প্রভৃতি বাহিরের সমাগত ভক্তের সম্মেলন। নারী-শিক্ষামন্দিরের সাম্বাৎসরিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা ও নারী-মন্দিরের সম্পাদিকার নারীত্বের আদর্শ বিষয়ক প্রাণময়ী অভিব্যক্তি। তারপর সমবেত ভক্তমণ্ডলীর হৃদয় বিনিময় এবং কাহারও কাহারও অন্তরঙ্গ সাধন-জীবনের ক্রমবিকাশের প্রকাশ্য পরিচয় প্রদান। সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তের উদ্দীপনা-ময়ী ভাষায় আত্মজীবনের অপূর্ব্ব যোগোপলব্ধির ক্রমেতি-হাস এবং সঙ্ঘগুরুর স্বীয় সঙ্ঘ-গোষ্ঠির রহস্যময় জীবনের ক্রমবিকাশধারায় পরিচয় বিশেষ করিয়া উপভোগ্য।

সন্ধ্যা সাতটায় পুনরায় সমবেত উপাসনা। প্রহরে-প্রহরে বাহিরের কর্ম্মে ডুবিয়া-থাকা চিত্তকে অন্তর্ম্মুখী করার অপূর্ব্ব কৌশল। নিত্য স্মরণের এ ব্যবস্থা এমনি সঙ্ঘজীবনেই সম্ভব। এখানকার ধূলিকণা-গুল্মলতা—সবই যে পবিত্র আবহাওয়ায় সঞ্জীবিত, তাই বোধহয় ঊর্দ্ধমুখীন ও উদ্বুদ্ধ। কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণজ্ঞান বলিয়াই বৃন্দাবনের রজও পবিত্র। এমনি সতত স্মরণের মধ্য দিয়াই বাচ্য-বাচক সাধকের কাছে এক হইয়া যায়। সঙ্ঘ সত্যই পবিত্র তীর্থ, আনন্দের হাট—যেখানে একান্ত রোগ-শোক-মৃত্যু-অভাবের তাড়নায় অন্তর ব্যথা-বেদনায় মুষড়াইয়া পড়িতে পারে না। দ্বন্দ্বময় কালিমা-লেপা ধরণীর বুকে যেন একটি শুভ্র চিহ্ন।

তারপর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বাদ্য-সঙ্গীত ইত্যাদি।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় নয়টা বাজিতেই সব চুপচাপ—উচ্চ হাস্যানন্দধ্বনি দূর গগনে প্রতিধ্বনি তুলিতে না তুলিতেই সব মৌন-দণ্ডায়মান। তারপর মাতৃ-স্তুতি গাহিয়া পুনরায় ধমনীতে ধমনীতে শক্তির সঞ্চারণ। সেই প্রাতঃ ছয়টা হইতে যে অনাহত ব্রহ্ম-নামযজ্ঞ সুরু হইয়াছিল রাত্রি নয়টায় তার পরিসমাপ্তি হইল। অবিচ্ছিন্ন অরূপ নাম-যজ্ঞের তরঙ্গ যেন নামীর অবতরণে স্পষ্ট রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাত্রি দশটার মধ্যে লুচি-মিষ্টান্ন সহকারে নৈশভোজন ও তৎপর চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি স্মরণে-ধ্যানে শয়ন।

গীতার সেই যুক্তাহার-বিহারস্য এবং "সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর" যোগটি জীবন দিয়া নিখুঁত পরিপালনের বিধি-ব্যবস্থার জন্যই এই সঙ্ঘ-তীর্থ ভাগবৎ-জীবন গঠনের উপযোগী ক্ষেত্র।

হিন্দু-ভারত

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

প্রণমি তোমায় ভারতবর্ষ, বিধাতার সেরা সৃষ্টি !
প্রগতি পেয়েছে নর-সভ্যতা লভিয়া তোমার কৃষ্টি !
বেদ-সভ্যতা জন্মিল হেথা,—মানবজাতির গর্ব্ব ;
সেদিন হইতে প্রচারিল ক্রমে জ্ঞান বিজ্ঞান সর্ব্ব।
যীশু-জনমের হাজার দশেক পূর্ব্বে ধর্ম্ম দীপ্তি
স্ফুরিল মানবচিত্তে হেথায় দানিতে গভীর তৃপ্তি।
গ্রীস রোম তবে ছিল নিদ্রিত, ফোটে নি তাদের চিত্ত ;
আরব মিশর ইরাণ তখনো তাদের দ্যায় নি বিত্ত।

চৈনিকজাতি মেলিল নয়ন যবে হেথা রাজে বুদ্ধ,
ভারতে তাহারে প্রজ্ঞা প্রদানি' করিয়া নিয়াছে শুদ্ধ।
উদ্ভুত হোলো ইরাণী-ধর্ম্ম আর্য্যহৃদয়-রক্তে,
সংস্কৃতের কত না শব্দ রাজে সে-ভাষার তক্তে !
গ্রীক্ আরবীয় চীনা পাঠার্থী আসিয়া ভারতবর্ষে—
দেখিয়া শিখিয়া ভরিয়া হৃদয় ফিরিয়া গিয়াছে হর্ষে।
বৈদিক-জ্ঞান চিন্তার ধারা সেদিন সারাটা বিশ্বে
ছড়ায়ে পড়িল নব নব রূপে নানা শোভনীয় দৃশ্যে।

বুদ্ধ আছিল চাপা-বেদান্তী, হিন্দুর অবতংস ;
সভ্য করিল শ্রমণেরা তার কত অসুরের বংশ !
ভ্রমিল তাহারা অর্দ্ধপৃথিবী কৃষ্টির আলো হস্তে,
অমৃতের বাণী শুনায়েছে তারা মৃত্যুকাতর ত্রস্তে !
গিয়াছে এশিয়ামাইনরে তারা প্রচারে বৌদ্ধধর্ম্ম ;
লাদকের মঠে খৃষ্ট রহিয়া শিখে নিল সার মর্ম্ম।
উপনিষদের, গীতার বাণীতে জাগিয়া উঠেছে খৃষ্ট ;
আজি "অসভ্য" সম্ভাষে' তোমা' ! হায় একি দুরদৃষ্ট !

বুদ্ধের সেই 'স্বস্তিক' হ'তে এসেছে ক্রুশের দণ্ড ;
'মঠ' অনুকারি' গড়িল গির্জ্জা সাধুরে কহিতে ভণ্ড !
'ধর্ম্ম' 'বুদ্ধ' 'সঙ্ঘে'র থেকে হয়েছে যীশুর ত্রিত্ব ;
তবু মা তোমায় পাদ্রীরা আজো নিন্দিছে করি' নৃত্য !
ভোগী-প্রতীচ্য-সভ্যতা আজি তোমারে করে মা ঘৃণ্য !
ইহকালে সে যে দেখিবে আঁধার তোমার করুণা ভিন্ন।
হিন্দুর কাছে যীশু প্রিয়তম, 'পর' তার ওঁছা শিষ্য,
প্রচারের ছলে গালি পাড়ে হয়ে হৃদয়-ধর্ম্মে নিঃস্ব।

প্রথম লিখিত ভাষা বটে এই সংস্কৃত ও চৈন ;
রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে বিরাজে জৈন।
পৃথ্বী নিয়েছে হিন্দুর ধ্যান ধারণার রীতি ভঙ্গী ;
ব্যাপ্ত হয়েছে সে-যুগে হিন্দু গিরি মরু বন লঙ্ঘি'।

ভাষা-লিখনের প্রচেষ্টা-ফলে হিন্দু সৃজিল বর্ণে ;
তৈরি কালিতে লিখিল কবিতা প্রথম তালের পর্ণে।
ভারতের ঋষি আগে লিখে' নিল রচিত সকল সূত্র ;
সর্ব্বদর্শী মানব তাহারা, ছিল অমৃতের পুত্র।

হেথায় প্রকাশ পেয়েছে প্রথম গীতিসঙ্কেতচিহ্ন,
যদিও ইহার প্রচার তখন ছিল বড় বেশী খিন্ন,
চীনা আরবেরা নিয়ে গেছে দেশে ফুলায়ে তাদের বক্ষ,
তাহাদেরি কাছে গ্রীক্ শেখে ইহা পাতায়ে গভীর সখ্য।
এই বৈদিক যুগে প্রচলিত হোলো জ্যোতিষিক শিক্ষা,
আরবেরা পরে আমাদেরি কাছে পায় জ্যোতিষের দীক্ষা।
গ্রীকজাতি শেষে শিখিয়া ইহারে আরব-চরণোপান্তে
দূরিল ধরার সকল জাতির হৃৎগগনের ধ্বান্তে।

বীজগণিতের চর্চ্চা প্রথমে করিল ব্রহ্ম গুপ্ত,
আরবে ইহারে নিল মোহামদ, মেতে ওঠে দেশ সুপ্ত।
ইউক্লিড্ যবে জন্মে নি ভবে, ছিল ভ্রূণরূপে গর্ভে,
জ্যামিতি শিখায় আর্য্যমনীষী বসিয়া আসন-দর্ভে।
চরক ভারতে প্রচারে' প্রথম তাহার ভেষজ বিদ্যা,
যুগে যুগে গুণ বাড়ালো ইহার কত যোগী ঋষি সিদ্ধা !
এ হেন অস্ত্র নির্ম্মল কেশ চিরিত লম্বালম্বি ;—
আজি সে-ভারতে চলে নিশিদিন ভীষণ হম্বি-তম্বি !

হেথা রসায়ন-শাস্ত্র প্রচার নাগার্জ্জুনের কীর্ত্তি,
সকল রকমে ছিল বটে তার অদ্ভুত মনোবৃত্তি।
এই ভারতেরই কণাদ প্রচারে' তার আণবিক তথ্য ;
আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি ভুলে গেছি সত্য।
ডারউইনের বহু সহস্র বৎসর আগে হিন্দু
বিবর্ত্তবাদ প্রচারিল ভবে মথিয়া জ্ঞানের সিন্ধু।
তৃণ হ'তে নরে ক্রমশঃ প্রকাশ, আত্মার নাহি অংশ,—
যে-জাতি পেয়েছে এসব শিক্ষা কভু নাহি তার ধ্বংস।

নমো নমো নমঃ, ভারতজননী, কেন মাগো আজ ক্ষুণ্ণ !
কিসের অভাব, ভাণ্ডার তব কখনো হবে না শূন্য !
সকল জাতির পালনকর্ত্রী, বিশ্বের তুমি ধাত্রী !
ধাতার কৃপায় নাহি র'বে এই গভীর আঁধার-রাত্রি !
সন্তান তব চিনেছে তোমায়, ঘুচিয়াছে সব ভ্রান্তি ;
ক্ষেপিয়া উঠেছে ধন জন ভুলি'—কিসে পাবে তুমি শান্তি !
সেবিয়া তোমায় হাসি-মুখে কত মরিছে লক্ষে লক্ষে !
জনমে জনমে সেবিতে, জননী, ঠাঁই দিয়ো মোরে বক্ষে !
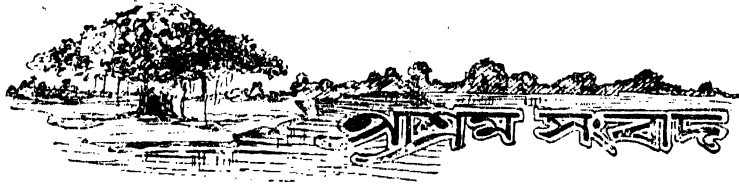
সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান-প্রবাহ

২২শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার শ্রীশ্রী৺রাধারাণী দেবীর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে আশ্রম-মণ্ডপে সপ্তাহব্যাপী যে বিপুল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা একটা আরাধনারই পুণ্য-প্রবাহ। প্রতিদিন সভায় দলে দলে পল্লীবাসী নরনারী যোগদান করিয়া উৎসবের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। শনিবারে আসন্ন হিন্দু-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির একটী অধিবেশন হয়। রবিবারে কলিকাতার উদীয়মান তরুণ গায়ক শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠ-সঙ্গীতে চন্দননগরবাসীকে উল্লসিত করেন। সোমবারে স্থানীয় কীর্ত্তনদল কর্ত্তৃক মধুর রস-কীর্ত্তন হয়। মঙ্গলবারে শ্রীমতী কান্তলতা দেবী ভাগবতসীমন্তিনী "শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি" সম্বন্ধে ব্যাখানচ্ছলে অতি সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী কথকতা করেন। একজন চন্দননগরবাসিনী বাঙ্গালী মহিলা, বিদুষী কুলবধূর এই অপূর্ব্ব সরস অথচ জ্ঞান-গর্ভ কথকতা অতীব মর্ম্মস্পর্শী এবং শুধু চন্দননগরে নয়, অন্যত্রও বুঝি অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বুধবারে, সমগ্র চন্দননগরের যন্ত্রবাদকমণ্ডলীর একটী বিরাট্ মজলিস্ হয়—তাহাতে বিখ্যাত গায়ক ও বাদকগণ উপস্থিত হইয়া যন্ত্রবাদনে প্রভূত আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতিবারে পণ্ডিত কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "শ্রীরাধা"-তত্ত্ব-বিষয়ক সুরসায়ন কথকতা হয়। শুক্রবার হাওড়ার প্রসিদ্ধ সুগায়ক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন তাঁহার ভাবপূর্ণ সাধন-সঙ্গীতে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।

সম্মেলনের বাণী

প্রবর্ত্তক আশ্রমের গত চতুর্থ বার্ষিক হিন্দু সম্মেলনে হিন্দুসাধনার একটা নূতন যুগ-শঙ্খের ধ্বনি শ্রুত হইল। শাস্ত্রবিশ্বাসী ব্রাহ্মণশিরোভূষণস্বরূপ পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ এই নূতন সাধনার বাণী প্রচার করিয়াছেন। জীবনসঙ্কটে বিপন্ন হিন্দুসমাজের মূল ব্যাধি তিনি ঠিকই নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "ধর্ম্ম ও লোকবিরুদ্ধ মনোবৃত্তিই আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রবল প্রতিবন্ধক"। এবং যাহাতে এই গৃহ-বিবাদ, মতানৈক্য ও আত্ম-বিচ্ছেদকারী মনোবৃত্তির মূলোচ্ছেদ হয়, তাহার জন্য হিন্দুসমাজকে শাস্ত্র ও যুগোচিত সাধনার আলোকে জীবনের দিক্ নির্দ্দেশ করিতে তিনি উৎসাহিত করিয়াছেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মতিবাবুর সুচিন্তিত কথাগুলিও গভীরভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনিও হিন্দুর অন্তরচেতনাকে জাগাইয়া সমাজের আত্মরক্ষা ও পুনর্গঠনের সঙ্কেত দিতে ভুলেন নাই। তাঁহার সুনির্দ্দেশিত চতুরঙ্গ অনুষ্ঠানের সাধনায় আশা করি, হিন্দু বাঙ্গালী রাষ্ট্রনীতির বাহিরে দাঁড়াইয়াও, সমাজ ও জাতিকে নূতন অথচ স্থায়ীভাবে গড়িয়া তুলিবার একটা প্রেরণা পাইবে। চিন্তাশীল হিন্দুনেতৃগণ এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত সঙ্কল্পগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার ও করিবার জিনিষ খুঁজিয়া পাইতে পারেন। এই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-হিন্দু-সম্মেলনের অনুষ্ঠান এইভাবে সম্পূর্ণ সময়োচিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে মত ও পথ লইয়া আত্মবিরোধে শক্তি-ক্ষয় করিবার আর সময় নাই। হিন্দুকে অখণ্ড জাতিরূপে বাঁচিতে হইলে, অজ্ঞানমূলক ভেদের প্রাচীরগুলি তুলিয়া দিতে হইবে, আপামর সাধারণে শাস্ত্রশিক্ষার প্রচার ও বিবেকসম্মত সদাচারের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ যদি অহমিকা বর্জ্জন করিয়া জাতিরক্ষার জন্য আত্মত্যাগের মন্ত্র জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সনাতন ব্রহ্মণ্য-সভ্যতাই সেই তপস্যায় জগজ্জয়ী হইবে।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-হিন্দু-সম্মেলন

৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন—১ম দিবস।

১লা পৌষ, শনিবার, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে হিন্দু-সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সুসজ্জিত সভা-মণ্ডপে শত শত দর্শকমণ্ডলী নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতিনিধি-মণ্ডলী আসিয়া সম্মেলনটীকে গৌরবপূর্ণ করিয়াছিলেন। কাশীধাম হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া এই বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

"Dear Babu Matilal

Many thanks for your kind invitation. I heartily wish your efforts to promote unity and harmonious living amongst Hindus and between Hindus and Non-Hindus. The hope for the future lies in promoting such harmony and strengthening Indian Nationalism.

Yours sincerely.
M. M. Malaviya."

প্রিয় মতিবাবু,

আপনার আমন্ত্রণে বারম্বার ধন্যবাদ দিতেছি। হিন্দুজাতির মধ্যে এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার প্রয়াস সফল হউক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। এই মিলন ও ভারতজাতীয়তায় শক্তিবৃদ্ধির উপরই ভবিষ্যতের আশা নিহিত। ইতি—

মঃ মঃ মালব্য।

অপরাহ্নে পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কলিকাতা হইতে উপস্থিত হইলে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় ও অন্যান্য প্রতিনিধিমণ্ডলী তাঁহাকে প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক সভা-ক্ষেত্রে সম্বর্দ্ধনা করেন। সভায় চন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার সেক্রেটারী শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ, হিন্দু মিশনের সভাপতি স্বামী সত্যানন্দ, পণ্ডিত গিরিজাকান্ত কাব্যতীর্থ, বেলুড় মঠের স্বামী কমলেশ্বরানন্দ, পণ্ডিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট জন উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভারম্ভে বৈদিক প্রশস্তি উদ্গীতির পর, প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরের দুইটী বালিকা সুললিত কণ্ঠে "দশাবতার স্তোত্র" গান করেন। অতঃপর, সম্মেলনের সম্পাদক কর্ত্তৃক পত্রাদি পড়িবার পর, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সুলিখিত অভিভাষণে, তিনি বাঙ্গালী হিন্দুর ঘোর নৈরাশ্যপূর্ণ দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ চতুরঙ্গ সাধনার নির্দ্দেশ দেন। তিনি বলেন, এই সকল উপায়ে হিন্দু মুসলমানে ঐক্যসাধনের পূর্ব্বে হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেই সর্ব্ব প্রথমে মিলন ও ঐক্য সুসিদ্ধ করিতে হইবে।

অতঃপর, সুযোগ্য, জ্ঞানবৃদ্ধ, সৌম্যদর্শন সভাপতি মহোদয় তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন। তিনি বলেন, শাস্ত্রে ও সনাতন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা অটুট রাখিয়া, যুগোপ-যোগী জীবন সাধনা গ্রহণ না করিলে, হিন্দুর ঘোরতর সঙ্কটে তাহার পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। হিন্দু যে আলস্য ও জড়তা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-সঙ্গত জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছে, তাহার চিহ্ন দেখা দিয়াছে। এই জাগ্রত জীবনেরই জয়-চিহ্ন-স্বরূপ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ নানাভাবে জাতিকে জাগাইবার প্রয়াস করিতেছেন। সভাপতি এইরূপ গঠনমূলক কর্ম্মে ব্রতী ও জন-সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করিয়া হিন্দু বাঙ্গালীকে আত্মশক্তির পুনরুদ্ধারে আবেগ-কণ্ঠে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিবস

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

(ক) ভারতের আত্মবিশ্বাসের মূর্ত্ত প্রতীক, অহিংসার অবতার ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে ব্রতী মহাত্মা গান্ধীর বঙ্গদেশে আগমন উপলক্ষে এই হিন্দুসম্মেলন তাঁহার উদ্দেশে স্বাগত নিবেদন করিতেছে।

(খ) এই হিন্দুসম্মেলন সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব করিতেছে যে, প্রত্যেক হিন্দুর দেব-মন্দিরে প্রবেশ,

বিগ্রহ-দর্শন ও পূজার্য্যাদি দিবার ধর্ম্মতঃ অধিকার আছে এবং সেই অধিকার পালন করিবার জন্য যথারীতি সদাচার-প্রবর্ত্তন ও শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সর্ব্বশ্রেণীনির্ব্বিশেষে হিন্দুজাতির মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাসের জাগরণ ও পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী কার্য্যকরী মণ্ডলী গঠিত হউক।

(ঘ) হিন্দু মাত্রের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস সজাগ রাখার জন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সমষ্টির মধ্যে নিয়মিত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে হইবে ও ইহার অনুশীলনে সহায়তা করিতে হইবে।

(ঙ) যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলমন্ত্র নিহিত আছে, সেইহেতু সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে ও মাতৃভাষার সাহায্যেও সর্ব্ব সাধারণের নিকট শাস্ত্র-মর্ম্মপ্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) বাঙ্গালীর বেকার-সমস্যা সমাধান কল্পে এই সম্মেলনী বাংলার শ্রমসাধ্য সকল প্রকার কার্য্যে হিন্দু-জাতিকে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

সম্মেলনের আগাগোড়া একটা শান্তি ও প্রীতির রাগিণী সকলের হৃদয়কেই অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছিল। সভা-শেষে সভাপতির আবেগ-পূর্ণ হৃদয়োত্থিত উপদেশ-বাণী উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি-ভবন

ইংরাজী ১৯৩৩ সাল হইতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত।

আজ বার তের বৎসর পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বিদ্যালয় পরিত্যাগের ধূয়া যখন উঠিয়াছিল, তখন হইতেই প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বাংলার নানা জিলা হইতে প্রবর্ত্তক আশ্রমে সমাগত বহু ছাত্রই শিক্ষালাভ করিয়া অনেক কাজের মানুষ হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়টী এতদিন স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন অপেক্ষায় কেবল সঙ্ঘের অনুরাগী বন্ধুবর্গের পুত্রদের লইয়াই গুরুগৃহ-রূপে চলিতেছিল, কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবরে ইহা ফরাসী ভারতের গবর্ণর বাহাদুরের অনুমোদন পত্র পাওয়ায় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র হইয়া উঠে। ইহার পর গত বৎসর ১৯শে এপ্রেল ফরাসী শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা মসিয়ে রামপ্ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির ব্যবস্থা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া এই বিদ্যালয়টীকে উচ্চশিক্ষা দানের অধিকার দিয়াছিলেন। অতঃপর পরমোৎসাহে দেশের তরুণদের সুশিক্ষা দিবার জন্য ইহাকে ছাত্রাবাসের সহিত উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে (H. E. School with Residential Hostel) যথারীতি পরিচালিত করিয়া আসিতেছি।

সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র দত্ত বি, এ, এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ (Director), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, উচ্চ শ্রেণীতে ইংরাজী অধ্যাপনা করেন। ইহা ব্যতীত চন্দননগরের বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এ ; চুঁচুড়া, জয়পুর প্রভৃতি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ কাব্যসাংখ্যতীর্থ, বহুবিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চৌধুরী বি, এ, (প্রধান শিক্ষক) এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন চন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র পাল, যোগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু এই বর্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার উদ্দেশ্যে হাওড়া ডোমজুড় বিদ্যালয়ের বহুদর্শী, প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাস এবং রাণীভবানী হাই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র দে, বি, এ, অনার্শ (ইং),

ও নিম্নশ্রেণীর বালকগণের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত যাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে ফরাসী পড়াইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য জনৈক ফরাসীভাষা অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা হইতেছে।

বিদ্যালয়ের জন্য স্কুলগৃহ, আস্‌বাবপত্র, শিক্ষকদের বেতনাদি প্রভৃতিতে বহু অর্থব্যয় করিয়া, চন্দননগরের ও চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থান সমূহের অধিবাসিগণের সন্তানগণ যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। আমরা আশা করি, আমাদের বিদ্যার্থিভবনে শিক্ষার্থিদের প্রেরণ করিয়া সুহৃদ্ ও বন্ধুবর্গ এই কার্য্যে আমাদের উৎসাহ প্রদান করিবেন।

আশ্রমের দুইটী ছেলেকে এবারই প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াইতেছি। সুযোগ্য শিক্ষকগণের সহায়তায় বিদ্যার্থিভবনকে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্ররূপে পরিণত করার প্রেরণা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে নিষ্ফল হইবে না, এই বিশ্বাসে সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহাদের ঐকান্তিক শুভদৃষ্টি ও সহানুভূতি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি তাঁহারা এবিষয়ে কোনরূপ কার্পণ্য করিবেন না। ইতি—

প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবন　　　বিনীত—
চন্দননগর।　　　শ্রীমতিলাল রায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৯৩৪ খৃঃ অব্দের ২রা জানুয়ারী হইতে প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের নববর্ষের অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাঁহাদিগের পুত্রাদিকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পরে যেকোন দিন ভর্ত্তি করাইতে পারেন। ইহার জন্য বিদ্যার্থিভবনের কার্য্যালয় স্বতন্ত্র-ভাবে খোলা থাকিবে। ভর্ত্তি ফি (admission fee) লাগিবে না।

বন্ধুবর্গের অনুরোধে প্রাতে দুই ঘণ্টাকাল ফ্রি কোচিং-ব্যবস্থাও উত্তমরূপে করা হইল।

সংস্কৃত-শিক্ষা

ইহা ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যার্থিভবনের সংলগ্ন বিশেষজ্ঞ পরিচালিত একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী আছে। স্কুলের পড়াশুনা যথারীতি চালাইয়াও যাহাতে ছাত্রেরা সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ পায় সেইরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। গতবারেও প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবন ও নারীশিক্ষামন্দির হইতে যে কয়টি ছাত্র-ছাত্রী সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দিয়াছিল তাহারা সকলেই প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আগামী বারে পরীক্ষা দিবার জন্যও কয়েকজন প্রস্তুত হইতেছে। উপযুক্ত সংস্কৃত-শিক্ষা ব্যতীত ভারতীয় মস্তিষ্ক গড়িয়া উঠা সম্ভব নয় বলিয়াই আমাদের অভিজ্ঞতা এবং সেইজন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা।

প্রয়োজনীয় কথা

ব্যবহারিক শিক্ষা ভিন্ন কেবলমাত্র গ্রন্থগত বিদ্যায় বর্ত্তমানে যুগের জীবন-সংগ্রামে টেকা দায় মনে করিয়া ছাত্রদিগকে স্বাবলম্বী ও তদনুযায়ী সুস্থ শরীর ও চরিত্র-গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। এজন্য খেলা-ধূলা, ব্যায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম-নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা গোড়াতেই করা হয় এবং এইজন্য একটা রীতিক্রম ধরিয়া প্রথমাবধিই চলা হয়। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কেবলমাত্র স্কুলের পঠন-পাঠনের সম্বন্ধ নয়, যথাসম্ভব ছাত্রদিগের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, অনাবিল হৃদয়ের স্পর্শ ও বাস্তব পবিত্র জীবনাদর্শ সম্মুখে ধরিয়া কিশোর ও তরুণের কাঁচা মনকে এদিকে উদ্বুদ্ধ করাই প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের বৈশিষ্ট্য। সঙ্ঘের অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাত্রদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ দেন ও ছেলেদের অসুখে তত্ত্ব-তালাস করেন।

বেতনের হার

Class IX (২য় শ্রেণী) —৩৲ Class VIII & VII (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)—২॥০ টাকা। Class VI (৫ম শ্রেণী)—২৲ টাকা। Class V (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

—১॥০ । Class IV (৭ম শ্রেণী)—১।০, Class III —১৲ টাকা। Class II—১৲ টাকা।

স্কুল-সংলগ্ন বোর্ডিং হাউসে স্থায়ীভাবে থাকিতে গেলে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য স্কুল-ফি, খাওয়া, দুই বেলা জল খাবার, সিট-রেণ্ট, বিজলি-বাতি ইত্যাদি বাবদ সর্ব্বসমেত পনর টাকা লাগে। ইতি—

শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত
ডিরেক্টর, প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবন।

প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের পরীক্ষার ফল

বিগত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে "প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি-ভবনে"র বাৎসরিক পরীক্ষার ফল জানান হইয়াছে। মোটের উপর ফল ভালই হইয়াছে। গড়ে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের সংখ্যা শতকরা নব্বইয়ের কাছাকাছি।

ঐ দিন সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত সমবেত ছাত্রবৃন্দের ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর এক সভায় ছাত্র-জীবনের পরীক্ষা-সঙ্কট ও শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হৃদয়-গ্রাহী একটি বক্তৃতা দেন।

উক্ত সভায় "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" হইতে সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একখানি রৌপ্য পদক দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। "প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনে"র শিক্ষক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় ঘোষণা করেন যে, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহারা অঙ্কশাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে, তাহাদের তিনি তাঁর পূজনীয় পিতৃদেবের স্মৃতিকল্পে দুইখানি রৌপ্যপদক যথাক্রমে পুরস্কার দিবেন। আমরা ইহাও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, তালডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার কুণ্ডু মহাশয়ও বাংলা ভাষায় ছাত্রবৃন্দকে উৎসাহ দান করিতে দুইখানি রৌপ্যপদক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

প্রবর্ত্তক নারী-শিক্ষা-মন্দির
সাম্বাৎসরিক পরীক্ষার ফল

বিগত ২২শে পৌষ প্রবর্ত্তক নারী-শিক্ষা-মন্দিরের সাম্বাৎসরিক পরীক্ষার ফল ঘোষিত হইয়াছে। পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক। কুমারী পদ্মাদেবী স্কুলের মধ্যে বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ নম্বর ($\frac{৯৬}{১০০}$) পাওয়ায় একটি রৌপ্যপদক পাইয়াছে, এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি পারি-তোষিকও মেয়েদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

ঐ উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহাতে নারীমন্দিরের সম্পাদিকা শ্রীমতী অমিয়প্রসুন দত্ত ব্যাকরণতীর্থা সংক্ষেপে স্কুলের আদর্শ ও গত বছরের বিদ্যালয় পরিচালনার সুবিধা-অসুবিধা, বাধা-বিঘ্ন সম্বন্ধে বলেন—উচ্চ ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত এখন নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত শিক্ষার উপর এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং যাহাতে মেয়েরা ইংরাজি স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দিতে পারে তাহারও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। মেয়েরা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ব্যবহারিক শিক্ষা পাইয়া স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে ও সঙ্গীত-শিল্প-গৃহস্থালী প্রভৃতি কাজেও দক্ষতা লাভ করে সেদিকেও যথাসম্ভব দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রবর্ত্তক নারী-মন্দির এমন নারী গড়িতে চায়, যাদের জীবনের আদর্শ দেশের লাঞ্ছিত অবহেলিত নারী-সমাজ সত্যিকারের জীবনের আলো খুঁজিয়া পায়। দৃঢ় নারীচরিত্র গঠনই মূল কথা। ভগবানে উৎসর্গীকৃত নারীর বিশুদ্ধ অগ্নিময় প্রাণ সমস্ত নারীজাতির কলুষ ও কালিমা পোড়াইয়া ঋতময় করিয়াই তুলিবে। এমন নারী, স্বল্পসংখ্যক হইলেও, গড়াই এই শিক্ষায়তনের অন্তরের কথা। বক্তৃতার শেষে তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুণ এই স্বপ্ন ব্যাপক বাস্তবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইতে বিলম্বিত হইতেছে।

শোক-সংবাদ

আমাদের পরম সুহৃদ্ অনুরাগী ভক্ত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-নাথ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী রাজপুরের ৺প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী প্রমোদিনী দত্ত গত ৫ই অগ্রহায়ণ ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

হাটখোলা দত্তবংশের ৺মন্মথনাথ দত্তের ইনি সহ-ধর্ম্মিণী। পুত্র-কন্যা-পৌত্রাদি বিপুল সংসার শোকসাগরে ভাসাইয়া সজ্ঞানে এই ভাবে দিব্যধামে গমন ভাগ্যবতীর লক্ষণ। আমরা এই পরলোকগত আত্মার পরম শান্তি কামনা করি।

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.
Printed by Krishna Prasad Ghosh at Prakash Press—61 Bowbazar St. Calcutta.

দোল-পূর্ণিমা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেরম্ব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
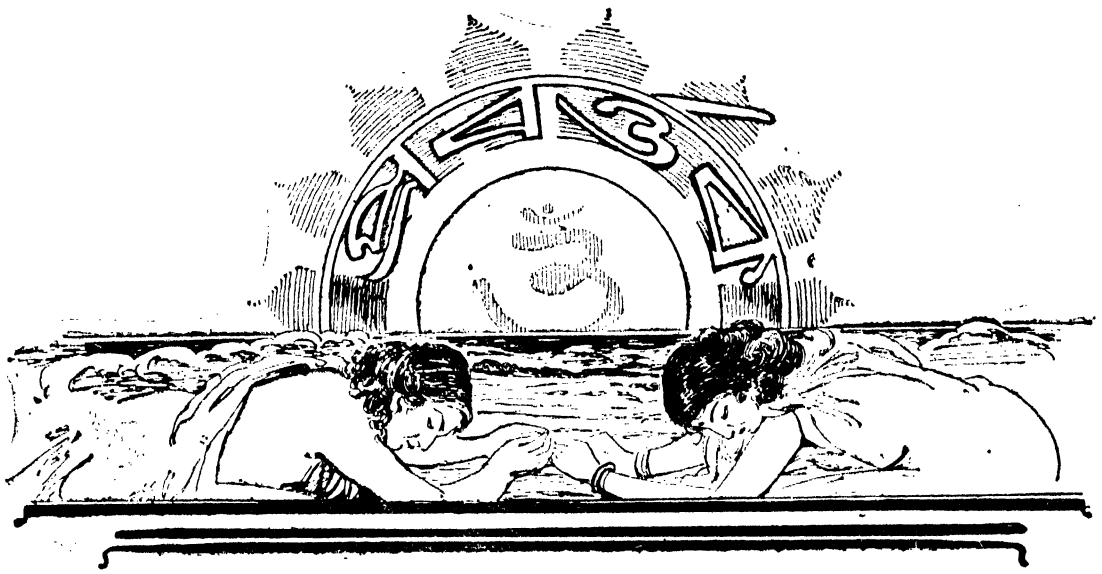
১৮-শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪০ | ১১শ সংখ্যা

শ্রম-ব্রত

আত্ম-রক্ষার অধিকার অন্যে দিতে পারে না, নিজের হাতে সে ভার নিতে হয়। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার দায় যে জাতি চায় না, সে জাতির পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে' যায়। সে জাতির অস্তিত্ব থাকে না।

বাঁচার দায়—মূলতঃ অন্ন-সমস্যা নহে। বাহ্যতঃ এরূপ মনে হ'লেও, একটু তলিয়ে দেখ্‌লে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূর হওয়ার মত এ ধারণা অপসারিত হয়। জাতির অর্থ-সমস্যার সমাধান বড় চাকুরী অথবা বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে না, দেশের অধিকাংশ লোকই বেঁচে থাকে শ্রমের বিনিময়ে যে কড়ি পায় তাই নিয়ে। শ্রমশীল জাতির তাই মরণ নাই। বাংলায় শ্রমেরই অভাব হয়েছে ; শ্রমের ক্ষেত্র নাই, এরূপ নহে—পরন্তু শ্রমকাতরতায় আমাদের জীবন পঙ্গু হচ্ছে। সমস্যা তাই অন্নের নয়—শ্রমের।

বাঙ্গালী মোট বয় না, কিন্তু অসংখ্য অবাঙ্গালী বাঙ্গালার বুকে এই কাজে পেটের খোরাক করে' নেয়। এইরূপ, বাঙ্গালী নৌকা বয় না, ইমারতের কাজে যোগাড় দেয় না, রাস্তা-মেরামতির কাজে তারা খোয়া পেটে না ; দায় যদি অন্ন-সমস্যাই হ'ত, না খেয়ে মরার চেয়ে এইরূপ অসংখ্য প্রকার শ্রমের কাজে বাঙ্গালী যোগ দিত। সহরে যত গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্‌শ, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, সে সকল বাঙ্গালীর অন্ন-সংস্থানের কারণ নয় ; সবই অবাঙ্গালীর হাতে চলে। বাঙ্গালী নাপিত নাই, ফেরিওয়ালা নাই, খেটে খাওয়ার কাজে বাঙ্গালী আর এগোতেই চায় না। এমন যে চাষের কাজ, তাতেও অবাঙ্গালীই অন্ন-সংস্থান করে। বাঙ্গালী চায় কেবল চাকুরী—বসে কাজ আর কথা বেচে কড়ি। সে কয় জনের ভাগ্যে সম্ভব হয় ? সমস্যা তাই অন্নের বলি কেমন করে'! বাঙ্গালী ফাঁকি দিতে গিয়ে হারিয়েছে সকলই, আর শ্রমবিমুখ হয়েছে বলে'ই তার হাড়ে ধরেছে ঘুণ ; পল্লীতে বাঙ্গালীকে শ্রমের কাজে এখনও যেটুকু দেখা যায়, তাহা এক প্রকার অগত্যা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

চায়ের কাজে কয় মাস শ্রম দিয়ে বৎসরের বাকী কয়টী মাস তারা ঘুমিয়ে কাটায়। ধান ও পাটের দর কমে' যাওয়ায় ঘরে ঘরে হাহাকার; তবুও হুঁস নাই। বাঁচার পথ আছে অসংখ্য। অবাঙ্গালী এই পথে দিন গুজরান করে, বাঙ্গালী উদাসীন। অন্ন-সমস্যা যে বাঙ্গালীর, কেমন করে বলা যায়!

পাট বেচে মাঝে মোটা টাকা হাতে পাওয়ায় আর চাউলের মণ ৪৲ টাকায় বিক্রয় হওয়ায়, যেটুকু শ্রমের শক্তি ছিল মেজাজ বদলে তাও হারিয়েছে, খেটে খাওয়ার গরজ আর বাহির হয় না।

খাজনার দায়ে এদিকে শ্রমিকের, কৃষকের, বাংলার নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের ভিটা যায়। জুয়াচুরি করার বুদ্ধিও নাই তারা পোকা মাকড়ের ন্যায় মরে, মনে করে—নিরুপায়। পাশেই অবাঙ্গালী মাটি চষে' মহাজন হয়, শ্রমের কড়ি মুলুকে পাঠায়, এদিকে তাদের দৃষ্টি নাই!

অবাঙ্গালীর হাতে প্রচুর শ্রমের ক্ষেত্র, বাঙ্গালীর যেন সে দিকে পা বাড়াতে নাই। বাংলায় সরিষার তৈল আসে বিহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হ'তে। প্রচুর ঘৃত প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, বাঙ্গালী উদাসীন; কাজেই উত্তর বিহারের আমদানী কলিকাতার বাজার রাখে। বাঙ্গালী লঙ্কা খায়, কিন্তু চাষ করে না; পাটনার লঙ্কায় বাঙ্গালীর রন্ধন হয়। খাটুনীর ভয়ে আখের খেত বাঙ্গালী ছাড়ে, সারা ভারতের লোক বাংলাকে নিংড়ে খায়। বাঙ্গালী বলে, বাঁচার উপায় নাই।

চটের কলে, কাপড়ের কলে, লোহা-লক্কড়ের কারখানায় বাঙ্গালী শ্রমিক এগোয় না। এমন করে' শ্রমের মর্য্যাদা বাঙ্গালী যদি না রাখে, বাংলায় কোটী কোটী নর-নারী কেমন করে' আত্মরক্ষা করবে? পাচক-বৃত্তিতেও বাঙ্গালী পেছিয়ে পড়ে, বাঙ্গালী ভৃত্য ত খুঁজেই পাওয়া যায় না। ধনীর দুয়ারে, কলিকাতায় অফিসে লাঠি কাঁধে বাঙ্গালী পাক্ দরোয়ানের কাজ করে না, ভোজপুরী নেপালী এই কাজে পেটের খোরাক করে। যেদিকে চাই, বাঙ্গালী নাই; কর্পূরের ন্যায় যেন উপে' যাচ্ছে! পথের দু'ধারে অবাঙ্গালীর দোকান বেসাতী নিয়ে বিকিকিনি করে। খিলির দোকান অবাঙ্গালীর, অবাঙ্গালীই ফলের দোকান জমকে তোলে, তারা কাগজ ফেরি করে—বাঙ্গালীর শ্রম গেল কোথা? স্বাবলম্বী হওয়ার আদর্শে বাঙ্গালী নাকি মন দিয়েছে; প্রথমেই তার নমুনা সুগন্ধ তৈল, দন্ত-মঞ্জন আর সাবান প্রভৃতি শিল্প-সৃষ্টিতে, অধ্যবসায়ের বহর দেখলে দুঃখের ভারেই বুক ভেঙ্গে পড়ে। উত্তেজনার চাবুকে যদিও কোথাও গড়ে' ওঠে বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান, শেষে অবাঙ্গালীর হাতে তা তুলে দিতে সাধাসাধির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে' দুঃখের মাত্রা আর বাড়াব না।

বাঙ্গালীর কাজ কেরাণীগিরি, বাবুগিরি আর সখের ভলেন্টিয়ারী। কাজেই ১০৲ টাকায় গ্রাজুয়েটের ছড়াছড়ি। লেখাপড়া শিখলে আর গাড়ীও হাঁকাতে নেই, ট্যাক্সি চালাতে নেই, নিজের জমি চষতে নেই। কামার, কুমার, ছুতার প্রভৃতি বাঙ্গালীর চিরদিনের বৃত্তি লেখা-পড়া শিখলে ছাড়তে হয়। শ্রম-লক্ষ্মী কাজেই বিরূপ—বাঙ্গালী তাই লক্ষ্মীছাড়া, নিরুপায়। এই অবস্থায় বাংলায় অন্নের সমস্যা না শ্রমের সমস্যা, এই প্রশ্ন কি স্বাভাবিক নয়!

কিন্তু কেন মনে হয়, বাঙ্গালী বাঁচবে—আশা কোন দিক দিয়ে সফল হবে, তা জানি না! প্রাণের মোহ উন্মাদ করে' তোলে। বাঙ্গালীর স্বপ্ন উঁচু দরের, তাই সে বাঁচতে চায়। স্বপ্ন দেখে' তার আর তৃপ্তি নাই, সে তার রূপ দিতে পাগল। এত দিন যেন কার হাতে প্রাণ সঁপে' সে নিশ্চিন্ত ছিল; তার সে আত্মসমর্পণ ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু নির্ভরতার সাধনা ব্যর্থ হয় নি। সে যেন আজ নির্ভুল ভাবে বুঝেছে, তাকে রক্ষা করবার গরজ বিধাতারও নাই, মানুষের কা কথা! তাই আজ তার প্রাণ নিংড়ে বাঁচার তাগিদ ফুটছে; বাঁচার প্রেরণায়, বাঙ্গালী পুনর্জন্ম-লাভের আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ—তাই মনে হয়, বাঙ্গালী আজ বাঁচার পথেই এগোতে চায়।

কিন্তু কল্পনার জাল বুনে' দিন আর চলে না, চলাও বাঞ্ছনীয় নয়। বাঁচতে হবে নিজের পায়ে যেটুকু শক্তি আছে তার উপর ভর করে' দাঁড়িয়ে, দু'খানা হাতে যেটুকু শ্রমের শক্তি আছে তাহারই মর্য্যাদা দিয়ে। শুধু রিক্শ টেনে আদর্শ-সৃষ্টি নয়, সেটী নিছক অভিনয়। হাততালি মিলে খালি, ভাগ্যে জুটে অষ্টরম্ভা। অন্তরের অশ্রু রোধ করে' বুকে ব্যথার পাহাড় গড়ে' তুলতে

হবে। আদর্শ নয়, অভাব হবে আমাদের শ্রম অবলম্বন করে' নূতন স্বভাব সৃষ্টি করার দ্যোতনা। লজ্জা করলে চল্‌বে না। হাতুড়ির ঘা যতই বাজুক, বুকে ব্যথার সুর তুল্‌লে হবে না। অধিকার করতে হবে প্রত্যেক অভাবীকে নূতন প্রাণ নিয়ে বাংলার শ্রমের ক্ষেত্রগুলি।

হাওড়ার ষ্টেশনে বুকে নম্বর এঁটে কুলীর কাজে শ্রম-সাধনের বীর সেনানীর মত দাঁড়াতে হবে আজ বাঙ্গালীকে, জাহাজের খালাসী, ট্যাক্সি, বাস্, শকটের চালকরূপে উপজীবিকা অর্জ্জন করতে হবে—মাঠে লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে দাঁড়াবে গ্র্যাজুয়েট শ্রমের মর্য্যাদা-দানের আন্দোলন নিয়ে নয়, শ্রমকে করতে হবে পেশা। যখন কিছু করার নেই, তখন রাস্তার পাশে বসে' হাতুড়ির ঘায়ে পাথর ভাঙ্‌তে লজ্জা কি, ভয় কি !

বাঙ্গালী মরতে পারে ; জাতিকে শ্রী ও শক্তিতে পূর্ণ করতে দারিদ্র্যের বাঁধন ছিঁড়ে শ্রমের ক্ষেত্রে আছাড় দিয়ে পড়্‌তে পারে না ? স্বাস্থ্যনাশের ভয়ে, আভিজাত্যের দায়ে এই পথে বাঙ্গালী এখনও এগোতে ভরসা করে না ; কিন্তু যে সব জাতি বড় হয়েছে, তাদের বাঁচার পথে হিসাব রাখা চলে নি। উড়ো-জাহাজে কত লোক প্রাণ বলি দিয়ে আজ বিমানপোত সচল করেছে। আর রাজপুত্র জাহাজের খালাসী হয়েই রাজ্যশাসনের অধিকার পায়। বাঙ্গালীকে বড় হ'তে হ'লে মাটীকে ধরে'ই উঠে দাঁড়াবার তপস্যা সুরু করতে হবে। অগ্রণী যারা, তারা মরবে, ধিক্কারে লাঞ্ছনায় উপেক্ষিত হবে ; কিন্তু মরণ মন্থন করে, উপেক্ষা অবজ্ঞার গরল বিদীর্ণ করে' যে অমৃত উঠ্‌বে তাতেই পরবর্ত্তী দল মাথা তুলে' দাঁড়াবে।

বাংলার প্রতিভা, বাংলার কবিত্ব, বাংলার সাহিত্য, বাংলার মস্তিষ্ক যেন ম্লান হয়ে গেছে। আমরা বলি—না, বাঙ্গালী তাসের ঘর সাজিয়ে নগরীর শোভা-সম্বর্দ্ধনে প্রস্তুত নয় ; বাঙ্গালী স্তম্ভিত, চাই তার একটী খাঁটি জন্ম—তার এই অসাধারণ জীবন-প্রচেষ্টার পথে আছে যে প্রলয়-কাণ্ড, যে ব্যথা ও অশ্রুর প্রবাহ, তার অস্পষ্ট চিত্র আজ তাকে চিন্তিত ও আচ্ছন্ন করে' রেখেছে।

ভবিষ্যতের চিন্তা, ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের হিসাব, সব কিছুকে সংহরণ করে' আজ যে সকল শিক্ষিত তরুণ চক্ষের জলে করুণ কণ্ঠে চায় কেরাণীগিরি, চায় মাষ্টারী, চায় বাজার-সরকারী, তাদেরই বলি—তিলে তিলে মরণ বরণ করার মোহ পরিত্যাগ কর, স্বপ্নজাল ছিঁড়ে ফেল। গ্রামে নগরে যেখানে পাও শ্রমের ক্ষেত্র, বীরের ন্যায় সেইখানে গিয়ে দাঁড়াও। শ্রমের ভারে দেহ যদি ভাঙ্গে, চূর্ণ হয়, ভয় নাই ; এ নশ্বর দেহ দুর্ভাবনার পীড়নে যক্ষ্মার খোরাক হওয়ার চেয়ে বীরের মত শ্রমযুদ্ধে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ—'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্', এইখানেই আছে জাতির বিজয়-লক্ষ্মী।

বাংলার হাজার হাজার পুত্র কন্যা আজ অনায়াসে নিঃসঙ্কোচে এই বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে আসুক ; সকল ভয় জয় করার শক্তি নিয়ে, মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিক শ্রম-যুদ্ধে। মরণ ও ব্যাধির আতঙ্ক দূর করে' যেদিন এই জীবনসমস্যার সমাধানে আত্মদানে অকপটে উদ্বুদ্ধ হবে জেনো, যে অশরীরিণী মাতৃ-শক্তি তোমাদের পশ্চাতে মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি নিয়ে, তিনিই তোমাদের গর্ভধারিণীর চক্ষে যে দীর্ঘ দিনের দীন অশ্রু ঝরেছিল তা স্নেহশীতল অঞ্চল দিয়ে মুছিয়ে দেবেন, অনশন ক্লিষ্টা বিষণ্ণা পত্নীর গৃহভাণ্ডার অন্নসম্পদে পূর্ণ করে' দেবেন, অপগণ্ড ভাই-ভগ্নীগুলির কণ্ঠে বর্ণমালার অস্ফুট মন্ত্র উচ্চারিত হবে। ঘরে ঘরে সে উৎসবের মহামেলা তোমাদের আত্মদানেরই সিদ্ধ-মূর্ত্তি। এই শ্রমযুদ্ধে সৈনিকের দল অগ্রসর হবে কি ? দুর্জ্জয় সাহসে ভীরুতার আবরণ ভেদ করে' এই দুর্গম পথে যাত্রা করবে কি ?

ভগবানের পাঞ্চজন্যে স্পষ্ট ধ্বনি শুন্‌ছি, 'ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি', "মাভৈঃ"। মনে রেখ, বাঁচার জন্যই এই তপস্যা নয়, এ জীবন-যুদ্ধ নয়। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শ্যামসুন্দরের মুরলীধ্বনি ফুৎকার দিয়ে উঠ্‌বে জীবন-যজ্ঞের মধুময় ঋকে। ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হবে শ্রম-সাধনায়। এই সঙ্কেত জীবনের যজ্ঞ-স্বরূপ দেশের প্রাণকে নূতন রূপ দিবে। তাই চাই এই মহাসংগ্রামে দিব্য সংযম, নিয়ম ও জীবননীতির সনাতন বিধান।

শ্রম দিব যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে। কেরাণীও তাই দেয়। ধাঙ্গড় মাটী কাটে, তার শ্রমেরও নির্দ্দিষ্ট নীতি আছে। রণক্ষেত্রে সৈনিকও যুদ্ধ করে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

দিবারাত্রি আহার, নিদ্রা, শ্রম ব্যতীত যে অবকাশ, তাহাই হবে আত্মানুশীলনের অনুকূল। রাত্রি-প্রভাতের সূচনায় উষাগমের পূর্ব্বেই যে মহিম্নস্তুতি উদ্গীত হ'ত ঋষির কণ্ঠে, তা আমরা ভুল্‌ব না। শ্রমের দায়ে জীবন আরম্ভ কর্‌ব যজ্ঞীয় সঙ্গীত উচ্চারণ করে'। আকাশে সূর্য্য-প্রকাশের সঙ্গে যে আলোর তরঙ্গ তানে ছন্দে লীলায়িত হয়, আমাদের জীবন-যজ্ঞে তদ্রূপ উপাসনার অমৃতে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র তরঙ্গায়িত অভিষিক্ত হবে। অন্ন-সমস্যাই আমাদের সমস্যা নয়, সমস্যা আমাদের জীবন। জীবন যাঁর তাঁকে বিস্মরণই সমস্যার কারণ। তাই মৃত্যু মহা আড়ম্বরে আমাদের ঘিরে ধরে। জীবনের সত্য ঋক্-মন্ত্র যদি সমুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করি, সঙ্কট দূর হবেই হবে।

হে উদীয়মান, তরুণ শ্রমব্রতী, প্রতিদিন শয্যাত্যাগ কর চতুর্থ প্রহরের প্রথম ভাগে; দিবসের সূচনা মুহূর্ত্তেই জীবনযন্ত্র বেঁধে নাও ভাগবত সুরে। তারপর পরমাত্মায় ভোগ নিবেদন রূপে পবিত্র ভোজ্য গ্রহণ কর। অতঃপর যজ্ঞরূপেই শ্রমকে উন্নত কর। আবার মধ্যাহ্নে জ্যোতির্ম্ময় দিবাকর যখন মধ্য গগনে, তখন সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় সারা বাংলায় উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরোপাসনার মহামন্ত্র ঝঙ্কৃত হোক। মধ্যাহ্ণ-ভোজনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রক্ষা কর। সায়াহ্নে ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন বাংলায় আকাশে বাতাসে অবার মধু বর্ষণ করুক। লঘু ভোজন হোক তোমার নিশার নৈবেদ্য। এক প্রহর রাত্রের মধ্যেই শয্যা গ্রহণ কর অশরীরিণী বিশ্বজননীর ক্রোড়ে। এই দিব্য জীবননীতির অনুসরণে উদীয়মান শ্রমসৈনিকের সঙ্কল্প ও আয়ুঃ দিব্য হবে। হে বাঙ্গালী "কাটিয়াছে দ্বাদশ বরষ, আর কত কাল যাবে"—আমি বলি, না দ্বাদশ বর্ষের তপস্যাই তোমাদের জয়যুক্ত করবে। চাই সঙ্কল্প, চাই জাগ্রত চেতনার সহিত নূতন জীবনারম্ভ। দিব্য জীবনই লক্ষ্য। চাই নিরলস জীবনের অমৃত আস্বাদ। তাই বাহির হও কোদাল নিয়ে, খন্তা নিয়ে, কুড়ুল নিয়ে, হাল কাঁধে; ঢাল দেহের শ্রম ধরিত্রীর বুকে সংযত সুনিয়মে দ্বাদশ বর্ষের ব্রতধারী হাজার হাজার সন্তান—শুধু জননী জন্মভূমির গৌরবদান ইহার ফল নয়, ইহাই সৃষ্টিকর্ত্তার অভীষ্টসাধনের সিদ্ধ পথ। দুর্গম ক্ষুরধার, কিন্তু বীর যে সে কি এই পথে যাত্রা কর্‌তে কুণ্ঠিত হবে? বরদাত্রী জয়মাল্য নিয়ে সম্মুখে; হে বাঙ্গালী, দিব্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

— উপাসনা-মন্দিরে —

যোগ তোমার সিদ্ধির জন্য নয়, মানব জাতিকে সিদ্ধ কর্‌বে; তোমার অনুভূতি অন্যের ভিতর সঞ্চারিত কর। পরকে আপন করার রীতি যদি আশ্রয় না কর, ধন, বিদ্যা নিয়ে মানুষের অহঙ্কার যেমন বাড়ে, যোগ সম্পর্কে তেমনি তোমার গর্ব্বই বড় হবে। তোমার জন্য কিছু নয়, সব বিশ্বের জন্য, সর্ব্বজীবের জন্য।

যে অনুভূতি, যে আস্বাদ তোমার অমৃতলোকের আস্বাদ দেয়, তাহা চীৎকার করে' সর্ব্বজনের কাণে পৌঁছে দাও। ঈশ্বরের বাণী প্রতিধ্বনির মতও যদি সর্ব্বজনের শ্রুতিতে স্পর্শ করে, তাতেই চৈতন্য হবে, মানুষ নিষ্কলুষ হবে, ভগবানে তাদের অনুরাগ বাড়্‌বে।

সঙ্কল্প যাহা তাহা ভাগবৎ সঙ্কল্পে পরিণত কর, কর্ম্ম ভাগবৎ কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হোক। জীবন যদি হয় ভাগবৎ, আহার, নিদ্রা, চিন্তা, সবই হবে ভাগবৎ। নির্দ্বন্দ্ব হও, তোমার বলে' যে কলঙ্ক, তা মুছে ফেল। তোমার সঙ্কল্প, তোমার

কর্ম্ম, তোমার ভাব পরিত্যক্ত হোক—সব ভাগবৎরূপে বিকশিত হয়ে উঠুক। উর্দ্ধ হ'তে যে গোমুখীধারাপ্রপাত প্রবাহের পর প্রবাহ হ'য়ে অবতরণ করে, তা মাথা পেতে ধরায় ধূর্জ্জটী কি অক্ষমতা অনুভব করেন? কর্ম্মের পর কর্ম্ম, প্রকাশের পর প্রকাশ, ভাবের পর ভাব উর্দ্ধলোক হ'তে নেমে আসে ঈশ্বরের ইচ্ছায়; অক্ষমতাবশতঃই তোমার দ্বন্দ্ব। আর সে অশক্তি আসক্তি ও অহঙ্কার হ'তে সঞ্জাত। ভগবানে সবখানি চিত্ত তুলে ধর। শক্তিমান্ তুমি—তোমার সমস্তখানি আয়ুঃ দিয়ে ঈশ্বরের মহতী ইচ্ছা চরিতার্থ হবে। তোমার জীবনের সাফল্য এই ভাগবৎ অনুভূতিতে সর্ব্বদা অভিষিক্ত হয়ে থাকা। ভাগবৎ ভাবগঙ্গায় অবগাহিত হও, সকল ক্লেদ বিদূরিত হবে। অভাব বাড়িও না, স্ব-ভাবে, স্বাস্থ্য ও আনন্দের অধিকারী হও। কর্ম্মের প্রেরণা ভাল; কিন্তু সে প্রেরণা আনন্দের রসে যেন শরীরের রসায়ন হয়—পীড়নরূপে তোমায় যেন জর্জ্জরিত না করে; বিষ ও অমৃতের ভেদ দেহ-জ্ঞানী অনুভব করে না। ভাগবৎ ভাবে উদ্বুদ্ধ জীবনই পীড়ন ও রসায়নের অনুভূতি জানে; যদি আচ্ছন্ন হও, অমৃতের আহ্বান তোমার কর্ণগোচর হবে না। হে ভাবোন্মাদ, ঈশ্বরপ্রেরণা মাথা পেতে গ্রহণ কর, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ইহার মধ্যেই সিদ্ধ হবে।

* * * *

কাল সারাদিন কেটেছে মুজাফরপুরে। দেহের ক্লান্তি শয্যাত্যাগ করতে দেয় নি; ভোর ৫টা থেকে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছি, মানুষের সকল প্রচেষ্টা এক নিমিষে বিধাতার ইচ্ছায় কেমন করে' ভেঙ্গে গুঁড়া হয়, পোকার মত মানুষ একটী মুহূর্ত্তে কেমন করে' পিষে মরে।

চক্ষে না দেখ্‌লে চৈতন্য হয় না, কত তুচ্ছ আমাদের আয়ুঃ, এই নশ্বর দেহটুকু; কত তুচ্ছ আমরা এই বিশ্বে! কিন্তু আশ্চর্য্য কথা, এই ক্ষুদ্র দেহটা নিয়ে আমরা কি বৃহত্তের চিন্তাই না করি! কি মহত্তর বিষয় নিয়ে অনুধাবন করি, অনুশীলন করি। দেহ নিয়ে যে চৈতন্য বাস করে, সেই চেতনারই ইহা মহিমা। নশ্বর এই দৃশ্যমান্ জগৎ, নিরুপায় এই পঞ্চভূতের সৃষ্টি; যাদু-মন্ত্রে এই সৃষ্টি ফুৎকারেই শেষ হয়, তার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না।

লক্ষ সৈন্য ভীম কামান নিয়ে কোন নগরী আক্রমণ কর্‌লে এতখানি দুর্দ্দশা হয় না, দিবারাত্রি গোলা-বর্ষণও বুঝি এত বড় নগরকে এমন করে' ধ্বংস কর্‌তে পারে না। দুই তিন মিনিটে এত বড় জনপদ ভেঙ্গে ছারখার হয়েছে। ট্রয়-নগরের ধ্বংসস্তূপ আলোকচিত্রে দেখেছি, সেই কল্পনাদৃশ্য মুজাফরপুরে প্রত্যক্ষ কর্‌লাম। বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিটুকু কাতর হয়ে মুদিত হয়। মানুষের কিন্তু দুঃখ নাই, আবার প্রাণ মাথা তুলে ধীরে ধীরে প্রলয়াবর্ত্ত থেকে টেনে আনে সৃষ্টির দ্যোতনা। কিন্তু যা যায়, তা আর ফিরে না। শত বৎসরের প্রচেষ্টায় মুজাফপুরের লুপ্ত গৌরব আর বোধ হয় গড়ে' উঠ্‌বে না।

জীবের অমরত্ব তার দেহ নিয়ে নয়, প্রাসাদ, ধনগৌরব নিয়ে নয়; তার মধ্যে শক্তিটুকুই অমর সম্বন্ধে সর্ব্বহারাকেও আবার মাথা তুলে' দাঁড় করায়। যেমন এই জড় সৃজন মরণের পথে নিরুপায়, জীবনেও তাই; বেঁচে থাকা বা মরা জড়ের ইচ্ছাধীন নয়। সে সত্যই জড়, অচল, একান্ত শক্তিহীন; বিরাট্ শক্তির সমুদ্রে বুদ্‌বুদের ন্যায় সব ভাস্‌ছে। এই পরম জ্ঞান, এই সত্যদৃষ্টি প্রলয়ের দৃশ্যে ফুটে' উঠ্‌লো। ভাবো, তুমি দেহ নও, ভোগ নও, তোমার আশ্রয় দৈনন্দিন সাধারণ জড়ের, স্বভাবের দাবী নয়। চেতনাকে আশ্রয় করে' তাহার সহিত ঐক্যলাভ কর। তুমি যে অমৃতের পুত্র, তাহা দেহীর স্বভাব, দেহীর সত্য। দেহ একটী লোষ্ট্রের আঘাত সয় না—সে নিত্য জন্ম-মরণের অধীন। অনুভব কর আত্মার অমরত্ব—মানুষের মহিমা ইহাতেই।

সঙ্ঘ-বাণী

(আশ্রমি-সঙ্কলিত)

[গত ২২শে পৌষ সঙ্ঘ-দেবতার জন্মোৎসব-দিবসে তাঁহার নিকট হইতে বাণী প্রার্থনা করিলে তিনি জীবন-সাধনার প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ দান করেন।

জাতির জাগরণ ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই সম্ভব হইবে। কিন্তু সে জাগরণ শুধু ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা ঘটিবে না, একদল মানুষকে ঈশ্বরময় হওয়ার তপস্যাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই একনিষ্ঠ সাধকদের তন্ময় হওয়ার প্রভাবেই জাতির হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাব জাগ্রত হইবে। ভাবপ্রচারের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া সঙ্ঘকে আরও দৃঢ়ভাবে ভাবময় হওয়ার সাধনাতেই তন্ময় হইতে হইবে—এই বাণী হইতে সেই নির্দ্দেশটুকুই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'সাধনা' বলিতেই কঠোর, কৃচ্ছ্রসাধ্য কতকগুলি আচারের কথাই সর্ব্বসাধারণের মনে জাগ্রত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই আনুষ্ঠানিক তপস্যা সাধকের জীবনকে রসাভিষিক্ত করিয়া তুলিতে সমর্থ হয় না, আত্ম-গরিমাই পুষ্টিলাভ করে—জীবনটা হয় শুষ্ক, নীরস। আপনাকে সর্ব্বতো-ভাবে ভগবানে লয় করিয়া তাঁহাতে অভিষিক্ত হওয়ার যে তৃপ্তি ও আনন্দ, তাহা লাভ করার একমাত্র উপায়—তাঁহার শরণ ও স্মরণ। ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া "সর্ব্বেষু কালেষু"—সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, জীবন-ক্ষেত্রেও কি ভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া চলা সম্ভব, তাহার ইঙ্গিত কতকটা এই বাণী হইতে পাওয়া যাইবে মনে করিয়া আমাদের একান্ত অনুরাগী ও ভগবদ্ভক্তজনের জন্য উহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম।]—আশ্রমী

"আমার জন্মদিনে তোমরা আশীর্ব্বাণী প্রার্থনা করেছ। আমার সম্পূর্ণরূপে রিক্ত হবার পথে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে যে সমস্যা ফুটে' উঠেছিল, তাহাই তোমাদের নিকট ব্যক্ত কর্‌ছি; উহার ভিতর থেকেই সমাধানের নির্দ্দেশ খুঁজে পাবে।

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের হিসাব আজও কোন বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতাত্ত্বিক দিতে পারে নি। এই সভ্যতা ২।১ হাজার বৎসরের নয়। পাঁচ হাজার বৎসর ভারতের পতন-যুগ আরম্ভ হয়েছে, বল্‌তে পারা যায়; সুতরাং এই civilisation পাঁচ হাজার বৎসরেরও কত পূর্ব্বে আরম্ভ হয়েছে, তার হিসাব-নিকাশ আজও হয়নি। পাশ্চাত্য জাতি ভারতের এই প্রাচীনত্বকে, সনাতনত্বকে স্বীকার কর্‌তে চায় না। আজকাল তবুও ভূ-গর্ভ উৎখাত করে' যে সকল শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা পরীক্ষা করে' নির্দ্ধারণ করতে বাধ্য হ'তে হচ্ছে যে, ইহা ৪।৫ হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বের সভ্যতার নিদর্শন।

এই যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গমনবৃত্তান্ত, যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদুরের দূর দেশে খুব শীঘ্র সংবাদাদি-প্রেরণের ব্যবস্থা—এ সব কি শুধু রূপক! ইহা দ্বারাও ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে' পাওয়া যায়। মহাভারতে এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে, যা ভারতের অনাদি সভ্যতার কথা জ্ঞাপন করে।

ভারতীয় সভ্যতা বল্‌তে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মকেই পুরোভাগে ধর্‌তে হয় এবং এই ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতা কি, কি তার আদর্শ উদ্দেশ্য, তা উপলব্ধি করার আছে। ব্রাহ্মণ চেয়েছিলেন, ব্রহ্মকে আশ্রয় করে একটা সাম্রাজ্যগঠন কর্‌তে। সে ভাগবত রাজ্যের বিস্তৃতি আসমুদ্রহিমাচলে সার্থক করে' তোলাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্রহ্মণ্য-সভ্যতার আদর্শে কোন ব্যক্তিগত কামনা, ভোগ, আত্মপুষ্টি, অহঙ্কার বিন্দু-মাত্র স্থান পায় নি। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন—আত্মা সৎ, আত্মার অস্তিত্ব নিত্য, দেহের মরণ আত্মার অনন্তত্বকে ধ্বংস কর্‌তে পারে না। উপনিষদের 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ'—এই বাণী তাঁদের অন্তর-বীণায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল; তাঁরা অন্তরে অনুসন্ধান কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—এ জীবনের সার্থকতা কোথায়, কাহার জন্য পৃথিবীতে ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছি? শুধু কি রক্ত-মাংসের ভোগবাসনায় আপনাকে আবদ্ধ রাখাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ! ভগবানের কি বৃহত্তর চাওয়া আছে, যার অভাবে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, যে চাওয়া বা ইচ্ছার সঙ্গে যুক্তি না পেলে জীবনের সাফল্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্তরের এই প্রশ্ন তাঁদের জীবনের সার্থকতা চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়ে ধর্‌লো। তাঁরা উপলব্ধি কর্‌লেন—ভগবানের যে অনাহত বাঁশী হৃদয়-কন্দরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,

সেই বাঁশীর সুরে আপনাকে লয় করে' দিতে হবে। জগতে 'আমার' বলে' কোন সামগ্রী নেই, হ'তে হবে রিক্ত সন্ন্যাসী, জগতের কোন প্রলোভন, ভোগাকাঙ্ক্ষা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুরলী-ধ্বনিকে প্রতিহত করতে সমর্থ হবে না। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে' যখন ভগবানই জীবনের একমাত্র আশ্রয় হ'লেন, তাঁর সঙ্গে একাত্মতা অভিন্নত্বের সুর তাঁদের মধ্যে জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। তাঁরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন, সেই তুরীয় অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত সত্যই এই জগতে প্রকাশমান হয়েছে; সং-চিৎ-আনন্দ —যিনি সং, নিত্যকাল অবস্থিতি করছেন, তিনিই চিদ্-রূপে জগতে সৃষ্ট হয়েছেন, তিনিই আবার আনন্দঘন পুরুষ। এই সচ্চিদানন্দে বিভোর হয়ে, ভগবানের মানুষ সৃজন করে' তাঁরা বৃন্দাবন গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু কি উপায়ে তাঁরা উহা সম্ভব করে' তুলতে চেয়েছিলেন! তাঁরা শুধু দ্বারে দ্বারে গিয়ে ইহার ভাব প্রচার করেন নি, জন্মের মধ্য দিয়েও উহা স্থায়ী করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। অর্থাৎ ইহা তখন তাঁদের নিকট সত্য হয়ে প্রতিভাত হ'ল যে, 'আমরা সৎকে আশ্রয় করেছি; তাঁর সঙ্গে ভিন্নত্ব ঘুচে গেছে, সুতরাং আমাদের রক্তধারার মধ্য দিয়ে যে সৃজনী-শক্তি ফুটে' উঠ্‌বে, যে মহাবীর্য্য প্রক্ষিপ্ত হবে, তাতে কোন ব্যর্থতা আস্‌তে পারে না! সে সৃষ্টি হবে ভাগবত, সে সন্তান সন্ততির স্বাভাবিক আকর্ষণ হবে ভাগবতমুখী। এই নিঃসংশয় প্রত্যয় অবধারণ করে', procreation'এর মধ্য দিয়ে এই ব্রাহ্মণজাতির প্রসারের চেষ্টা দেখা যায়। তাই এখনও পঞ্চাশৎবর্ষীয় ব্রাহ্মণ পত্নীবিয়োগের পরও পুনরায় পত্নী গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না; বহু বিবাহ শাস্ত্র বিহিত বলে' দেশাচার, লোক-নিন্দা উপেক্ষা করে'ই পত্নী গ্রহণ করে। ইহার মূলে আছে, সেই অনাদি যুগের ব্রহ্মণ্য-সভ্যতার ব্যাপকতার স্বপ্ন। মানুষ ভগবানে জন্মগ্রহণ না করলে, ভাগবত জীবন আশ্রয় করে' চলতে সমর্থ হয় না; ধর্ম্মোপদেশ মানুষের রক্তবিন্দুকে শোধিত করে' তুলে না, যতক্ষণ না ভাগবত-বীর্য্যে তার সবখানি অবগাহিত, অভিষিক্ত হয়ে উঠে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েই তাঁরা ব্রহ্মণ্যরক্ত ধারার ভিতর দিয়েই এক সাম্রাজ্যগঠনের প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই যে ইসলাম জাতির মধ্যেও রক্তধারার মধ্য দিয়েই তাদের জাতিকে প্রবৃদ্ধ করে' তোলার প্রচেষ্টা দেখা যায়, এক পুরুষ বহু স্ত্রী গ্রহণ করছে, বিধবাও পুনঃ পতি গ্রহণ করছে, ইহাও ব্রহ্মণ্য-সভ্যতারই পরোক্ষ প্রভাব। আজ বহু জাতি আদর্শ-প্রচার দ্বারা তাহাদের প্রসারতা আনতে চাইছে। যে কোন ভাবে তারা চায় মানুষকে convert করতে। মুসোলিনী, হিট্‌লারের আদর্শ, কামালের সভ্যতা, রুষিয়ার বোলশেভিকবাদ—সকলই চাইছে একজন অপরকে convert করতে। ব্রিটন জাতি কিন্তু তাদের একটা মর্য্যাদা ও আভিজাত্য নিয়ে চলেছে। তারা শিক্ষার ভিতর দিয়া সমস্ত জগৎকে জয় করার স্বপ্ন নিয়ে চলেছে। যতখানি তাদের culture দেশ বিদেশে বিস্তার লাভ করেছে, তাদের সভ্যতাও সে জাতি ততখানি ক্রমশঃ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই ভাবে ব্রিটিশ সভ্যতা শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই বৃহদাকার পরিধি-চক্রে রূপ নিচ্ছে।

আমার এই যুগসন্ধিক্ষণে একটা সমস্যা আমার মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল—যে জাতি ভগবানের ইচ্ছায় তাদের সভ্যতাকে বিস্তার করে' চলেছে, তাদের সভ্যতায় আপনাকে ডুবিয়ে না দিয়ে আবার একটা বিশিষ্ট সভ্যতাকে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠা করার অহমিকাকে প্রশ্রয় দেওয়া কেন? এ সমস্যার সমাধান কি, তাহাই কয়েকদিন যাবৎ ভাব্‌ছিলুম। দুটো দিকে ধর্ম্মবিস্তারের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে—ব্রহ্মণ্য-সভ্যতা procreation-এর ভিতর দিয়েই ব্যাপ্তি সম্ভব করতে চেয়েছিল, আর পাশ্চাত্যজাতি Culture & initiation-এর ভিতর দিয়ে সে প্রচেষ্টা করে' চলেছে। এই উভয় পন্থা পরিত্যাগ করে' তৃতীয় পন্থার আশ্রয় গ্রহণেই ভারতের অভ্যুত্থান সম্ভব হবে। রক্তধারার ভিতর দিয়ে সৃজনের পরিব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষা crude form বলে'ই মনে হয়। একেবারে বহির্ম্মুখী হয়ে পড়্‌তে হয়। আজ আর উহা সম্ভব হবে না। পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ ভারতীয় সভ্যতার পতন আরম্ভ হয়েছে, বর্ত্তমানে উহা চরমে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্রহ্মণ্য-সভ্যতার মধ্যে সে উদার, বিরাট্ ভাব নেই; স্বার্থ, ভোগ পুরোভাগে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এই ধারার সাহায্যে ভাগবত জাতি গড়ে' তোলা, মানুষের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ সঞ্চার করা আজ আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পন্থা আদর্শের প্রচার; ইহাও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ গ্রহণ করবে না—কারণ ইহা দ্বারাও মানুষ বহির্ম্মুখী হয়ে পড়ছে; প্রচারই বড় হয়ে উঠে, ধর্ম্মে-তত্ত্বে আপনাকে অবগাহিত করে' তুলতে সমর্থ হয় না। ব্যক্তিগত অহমিকা যেমন সাধনার পরিপন্থী, সেরূপ জাতির অহংকার, আদর্শের অহমিকাও সাধনা-বিরুদ্ধ। কিছু দেওয়ার প্রবৃত্তি থাক্‌লেই অহংকার রূপ নেয়।

তৃতীয় পথ—ধর্ম্মবস্তুতে, সেই অনির্ব্বচনীয় তৃতীয় বস্তুতে, যিনি সৎ-চিৎ আনন্দ-স্বরূপ, যিনি সকল ইন্দ্রিয়াতীত, আবার সৃষ্টির মধ্যেও রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছেন —যিনি অজ, অমর, শাশ্বত পুরুষ, তাঁতে আপনার সবখানি অভিষিক্ত করে' তোলা, তাতে জন্মপরিগ্রহ করা। আমাদের প্রচারের জন্য কিছু করতে হবে না, শুধু

হওয়ার আছে। এই হওয়ার তপস্যাই তোমাদের আরও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে হবে। এক দল "হওয়া" মানুষের প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে একটা জাগরণ দেখা দেবে। সুতরাং আত্মপ্রচার, সঙ্ঘের ভাব আদর্শের প্রচার নয়। একেবারে সব বন্ধ করতে হবে। এই একমুঠা মানুষ ভগবানে আপনাদের তুলে' ধরার তপস্যা গ্রহণ করুক। শুধু এক দিন, দুই দিন নয়, যুগ যুগ এই তপস্যা ও ধর্ম্মাচার তোমাদের অনুসরণ করে' চল্‌তে হবে। স্তব্ধ, মৌন হয়ে বিধান পালন ভিন্ন অন্য কিছু প্রচার করার আবশ্যকতা নেই। তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-সংযম ধর্ম্মাচারের প্রধান অঙ্গ। তপস্যা অর্থে শারীরিক, মানসিক, সর্ব্ববিধ আরাম ও সুখ থেকে বিরত থাকা। ভোর ৪ ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করে' ভগবানের চরণে প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন জ্ঞাপন করতে হবে। দেহের জড়তা, আলস্য যদি তোমায় এ বিধান-পালনে বাধা দেয়, জেনো, তুমি সঙ্ঘের বিধান ভঙ্গ করে' মহাপাপকে আশ্রয় করেছ। যদি সত্যই তোমরা আমায় ভালবেসে থাক, ইষ্টস্বরূপ আশ্রয় কর, সে ভালবাসা শুধু বাহ্যিক, মৌখিক হবে, যদি এখানকার প্রবর্ত্তিত আচার ও বিধান অন্তঃকরণের সহিত পালনে কুণ্ঠিত হও। ভগবানে নবজন্ম নেওয়ার উপায়—সকল সময়ে তাঁর স্মরণ, অনুধ্যান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ইহার ইঙ্গিত দিয়েছেন—"সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর"—'সকল সময়ে, সকল অবস্থায় আমাকে স্মরণ কর।'

এই যে নিত্যকাল তাঁকে স্মরণ করে' চলার আদেশ, ইহা কি ভাবে জীবনে কার্য্যকরী হয়ে উঠ্‌বে, যদি প্রহরে প্রহরে তাঁকে ডাকার আয়োজন তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে স্থান না পায়। ভোর ৪ ঘটিকায় গাত্রোত্থান করে' একবার তাঁকে স্মরণ, তাঁর কাছে অন্তরের নিবেদন জ্ঞাপন কর—'হে প্রভু, তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরে নিত্য বিরাজিত থাক, এই প্রথম প্রভাতে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ কর, সমস্ত দিবসব্যাপী তোমার চিন্তায়, অনুধ্যানে যেন জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হতে পারি।' আবার দ্বিপ্রহরে উপাসনা-মন্দিরে আপনার দেহখানি পৌঁছে দাও, স্থির হয়ে অন্তরে অন্তরে তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি কর। তৃতীয় বার দিবসাবসানে তাঁর চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর নাম কীর্ত্তন কর। রাত্রি ৯ ঘটিকায় মাতৃদেবীকে স্মরণ করে' তাঁকে নিবেদন জ্ঞাপন কর—'হে দেবমাতা, আমরা তোমাতেই জন্মলাভ করেছি, তোমারই স্তন্যপানে আমাদের দেহ পরিপুষ্টি লাভ করুক, তোমারই আশ্রয়ে, পালনে, রক্ষণে সন্তানের চেতনা ভাগবতমুখী হোক। যে অসুর ও পাপ নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পবিত্র মহাবীর্য্য বিকৃত করে' তোলে, তাহা হ'তে আমাদের পরিত্রাণ কর। হে দেবী, তোমায় স্মরণ করে' তোমারই সুশীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করছি।'

সমস্ত দিনের মধ্যে চার বার তাঁকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্মরণ করার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু ইহা ব্যতীত জীবন-সংগ্রামে যখন কঠোর শ্রম ঢেলে যাচ্ছ, সে সময়েও এক মুহূর্ত্তও তাঁকে বিস্মৃত হয়ো না, সকল সময়ে তাঁকে স্মরণ রাখাই তাঁতে অভিষিক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়। এই নিত্য-স্মরণ অভ্যাসে পরিণত হোক, ইহারও একটা নৈরন্তর্য্য রক্ষা করা চাই। নিয়মিত ভাবে অভ্যাস-যোগকে অনুসরণ না করলে "সর্ব্বেষু কালেষু" স্মরণ রাখা আদৌ সম্ভব নয়। আমি তাই চাইছি—প্রচার নয়, শুধু আচার পালন একদল মানুষ করে' চলুক। যদি একনিষ্ঠ হয়ে এক বৎসর এই ব্রত পালন কর, তা'হলে এই জাগা-মানুষদের প্রভাবে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখা দেবে। কোন crude formকে basis করে' ধর্ম্মপ্রচার নয়, আপনি আপনাতে তন্ময় হয়ে যাও, নিত্যকাল তাঁকে স্মরণ করে' চল; কি করে' তোমাদের আদর্শ প্রচারিত হবে সে চিন্তা থেকে বিরত হও—দেখ্‌বে, তোমাদের অজ্ঞাতসারে মানুষের মধ্যে তোমাদের ভাব সংক্রামিত হচ্ছে।

আজ আমার জন্মতিথিতে তোমাদের উৎসাহ-উত্তেজনার বাণী হয়ত কিছু দিতে পারি নি; যে সমস্যার কথা আমি ভাব্‌ছিলুম, তারই একটা ইঙ্গিত তোমাদের দিচ্ছি। ১৯৩৪ খৃঃ তোমরা মূক হয়ে আমার আদেশ পালন কর, হওয়ার সাধনাই তোমাদের দিচ্ছি। হ'তে গেলে যে তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দরকার, তা অনুসরণ করে' চল্‌বে। গৃহী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, যে যে অবস্থায়ই থাক না কেন, এই বিধানপালনে যদি যত্নবান্ হও, তোমরা শুধু ধন্য হবে না, একটা জাতির ভবিষ্যৎ আশা ও আলোর কেন্দ্র হবে—আমার দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বৎসরের দানকে তোমরা সার্থক করতে পারবে।"

খেলার রাজা ক্রিকেট

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে!"

—স্বাধীনতার কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল পূর্ব্বে এই গান গাহিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতেন, স্বাধীনতার প্রয়াসী জাতির কিশোর জীবনে খেলার স্থান কত উচ্চে; তাই তিনি গাহিয়াছিলেন "মাটীতে রচিত মল্ল, মল্লসহ খেলে"---স্বাধীন ও স্বাধীনতাপ্রয়াসী রাজপুতের ইহাই খেলার আদর্শ। বাঙ্গালীর ছবি আঁকিতে গিয়া কবির হাস্য-রসের মধ্যে করুণ কাহিনী—

'ছড়ি হাতে স্থূলোদর বাবুতে প্রকাশ'

প্লীহা, যকৃৎ অথবা আলস্যের ব্যঞ্জক স্থূলোদরের পরিধি বাঙ্গলায় কমে নাই; তবে "ছড়ির" পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও আভরণ বিশেষ—যথা কোথাও বা দারুণ অযথা ভাবে স্থান পাইয়াছে।

রঙ্গলাল সমসাময়িকদিগের প্রতি অযথা ব্যঙ্গ ও ক্রূরোক্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিণত বয়সের সময়ে আমি বালক। আমাদের ৫৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট বাটীতে পিতৃপিতৃব্যের বৈঠকখানায় তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহারই শ্রীমুখে "স্বাধীনতা-হীনতায়" কবিতা শুনিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়াছি দেশব্যাপী অদ্ভুত ব্যায়াম-কৌশল ও অপূর্ব্ব মল্লক্রীড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের "রামচরণ" তখনও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বা "ঠগীর" কর্ত্তা ওয়াকোক সাহেবের প্রতাপে মরে নাই; সে সব বিবরণ আমার "স্মৃতিরেখায়" বিবৃত করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ করিব না।

হা-ডু-ডু খেলার শ্রেষ্ঠতা ও মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া সে খেলা সম্বন্ধে পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছি। "গুলিডাণ্ডার" প্রসার দেখিয়াছি ও দেখাইয়াছি। "কুস্তিকাঠ" চলন হইতে জিতেন বাড়ুয্যের আখড়ার ও নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলার ব্যায়াম প্রদর্শনীর কৃতিত্বের কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সে কথারও পুনরুল্লেখ করিব না।

তবে জীবনের খেলার শেষেও খেলার কথার প্রসঙ্গ বিশেষভাবে করিবার বিশেষ হেতু হইয়াছে। বিলাতী খেলার রাজা ও রাজার খেলা ক্রিকেট লইয়া সম্প্রতি বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনা চলিয়াছে, ভারতের কোন প্রান্ত সে আলোচনা হইতে অব্যাহতি পায় নাই ও পাইতেছে না—শিশু, পোগণ্ড, কিশোর, তরুণ, বালক, যুবক, প্রৌঢ়, প্রাচীন, কেহ অব্যাহতি পাইতেছে না। জাতীয় জীবনগঠনে যাহার কিছুমাত্র আস্থা বা আয়াস আছে, তিনি এই আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই।

সম্প্রতি M. C. C. অর্থাৎ (Marleybone Cricket Club) নামক বিলাতের পারদর্শী ও প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়গণ ভারতের নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-খেলোয়াড়দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আসাতে বিস্তৃতভাবে এই আলোচনা ও আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া এবং বিলাত হইতে অনেক প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ভারতবর্ষে আসিয়া খেলিয়া গিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার ষ্টেনলী জেকসন্ অন্যতম।

এম. সি, সি ক্লাবের সভ্যগণও ব্যক্তিগতভাবে পূর্ব্বে ভারতবর্ষে খেলিয়া গিয়াছেন। "রঞ্জী", দিলীপ সিং প্রভৃতির ক্রিকেট-কীর্ত্তি ভারতবিশ্রুত; বিলাতেও তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি—কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই, লাহোর, দিল্লী, কলিকাতা, কাশী, ইন্দোর, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে জনসাধারণের মধ্যে ক্রিকেট লইয়া এত বিরাট্ আলোচনা বা আন্দোলন হয় নাই। সহস্র সহস্র খেলোয়াড়, অ-খেলোয়াড় এত মাতিয়া উঠে নাই। এই মাতামাতির মধ্যে একটা বিরাট্ রহস্যের অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া জীবন-খেলার শেষে লোকের "মরা গাঙ্গেও বান" ছুটিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুরাতন কথার স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে।

সে অনেক দিনের কথা—তখন শিক্ষালয়ের বা গৃহের কর্ত্তৃপক্ষগণ খেলা ধূলায় প্রশ্রয় দেওয়া দূরে যাউক, এ গুণ্ডামিকে অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য ও ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। "গোঁয়াড়-গোবিন্দরা" ও "কাঠ-খোট্টারা" পড়াশুনা এবং সদ্ব্যবহারের ত্রুটি না করিলে খেলাধূলায় বিশেষ আপত্তি হইত না; বরং বুথ সাহেবের ন্যায় মহামনা কোন কোন অধ্যাপক খেলায় যোগ দিতেন। খেলার ময়দান পার হইবার সময়ে অধ্যক্ষ টনি সাহেব তির্য্যক্ দৃষ্টিতে ঘাড় হেঁট করিয়া খেলা দেখিয়া যাইতেন; অপ্রসন্নতার চিহ্নও লক্ষ্য হইত না। জিম্‌নাষ্টিক, হা-ডু-ডু ও ডাণ্ডা-গুলির পর্য্যায়ের পর সামান্য ব্যয়ে আলেকজাণ্ডার ব্যাট ও কম্পোজিশান বল সাহায্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের খেলার মাঠে আধুনিক যুগের প্রথম বাঙ্গালী ক্রিকেট ক্লাবের ভিত্তি ১৮৭৮ সালে স্থাপিত হইল। আমার সহক্রীড়কদের মধ্যে ছিলেন আমাপেক্ষা পরিণতবয়স্ক সেনহাটীর সাধু-চরিত্র শ্রীযুক্ত ত্রিগুণাচরণ সেন এবং প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এস, কে, সেন মহাশয়ের প্রসিদ্ধতর পিতা ডাঃ হরিচরণ সেন; তারপর ক্রমশঃ উদ্ভব হইল শ্রেষ্ঠতর খেলোয়াড় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত ও অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় এবং বিপিনবিহারী লাহা প্রভৃতির দল। আমাদের ক্রিকেট খেলায় স্মরণযোগ্য ঘটনা—নব-প্রচলিত ডিউক বলের আবির্ভাবের সঙ্গে আমার নাক-ভাঙ্গা এবং আট দিন শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকা। শেষ জীবনেও ভগবৎকৃপায় কর্ম্মশক্তির যে কিছু ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা এই ভাঙ্গা নাকের ভিত্তির উপর স্থাপিত। ক্রিকেট খেলা ও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়-টানা কব্জী প্রাচীন বয়সে দেখিয়াও মেজর নাইডু ও তাঁহার সহ-ক্রীড়কগণ স্তম্ভিত হইয়াছেন। জানি না, কতদিন এই কব্জীতে ক্ষীণ নাড়ী বহিবে। যতদিন বহিবে, আশাকরি, তাহা "ক্রিকেট-সেবাতে" নিযুক্ত থাকিবে।

এই ক্রিকেট-সেবা কথাটার মূলে একটা রহস্য ও ইঙ্গিত আছে, তাহারই কথঞ্চিৎ বিবৃতির জন্য জীবন-খেলার শেষেও এই খেলার প্রবন্ধের অবতারণা। সে কথা বিশেষ ভাবে বলিবার পূর্ব্বে দুই একটা আনুষঙ্গিক কথা বলা প্রয়োজন। ১৮৭৮ সালের ক্রিকেট এবং ১৯৩৪ সালের ক্রিকেটে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তখন ফুটবল, টেনিস ও হকি এখনকার ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। এই সকল অপেক্ষাকৃত অল্প-ব্যয়সাধ্য খেলা ক্রমশঃ প্রতিপত্তি লাভ করে। ক্রমে ওয়েলিংটন ক্লাব, শোভা-বাজার ক্লাব, মোহনবাগান ক্লাব, আর্য্য ক্লাব, বেঙ্গল জিম্‌খানা, বেঙ্গল অলিম্পিক গেম্‌স্‌, বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন, প্রভৃতি বহুতর ক্লাবের আবির্ভাব হয় এবং তাহাদের সভ্যশ্রেণীর মধ্যে নূতন খেলোয়াড়ের আবির্ভাব হয়। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট, আনন্দ-বাজার পত্রিকা ও হিতবাদী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তৎ-সম্বন্ধে বিবৃতি স্থান পাইয়াছে। কোন মাসিক পত্রে এখনও এসকল "ক্রীড়নক"-প্রসাদ স্থান পায় নাই।

ফুটবল, টেনিস ও হকির প্রতিপত্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের প্রসার কমিয়া আসিল। অপেক্ষাকৃত ব্যয়-বাহুল্য তাহার অন্যতম কারণ। ধনপ্রাধান্য বশতঃ বোম্বে প্রদেশে ক্রিকেটের প্রতিপত্তি বহুদিন অক্ষুণ্ণ। সে প্রদেশের ক্রিকেট-খেলোয়াড়েরা বিলাতে যাইয়াও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অনেক ভাল ইংরাজ ও অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ও এদেশে আসিয়াছেন। মেজর নাইডু প্রমুখ ভারতীয় খেলোয়াড়গণও পূর্ব্ব বৎসর বিলাতে যাইয়া এম, সি, সি, খেলোয়াড়গণের সহিত খেলায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই আদানপ্রদানের ফলে বিলাতে এম, সি, সি ক্লাবের নির্ব্বাচিত সভ্যগণ এদেশের নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণের সঙ্গে টেষ্ট ম্যাচ (Test match) অর্থাৎ কৃতিত্ব-পরীক্ষায় প্রাধান্য স্থির করিবার জন্য প্রতিযোগী খেলা খেলিতে আসিয়াছেন; এটা ক্রিকেট-জগতে মস্ত বড় ব্যাপার। যদি খেলায় ভারতের কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়, আমাদের নির্ব্বাচিত দল বিলাতে পুনরায় খেলিতে যাইবেন এবং হয়ত অষ্ট্রেলিয়ার নির্ব্বাচিত দল ভারতে খেলিতে আসিবেন। ইংরাজকে তাঁহাদের খেলায় এবং ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পরাজয় করিতে পারিলে, ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে অন্যান্য আদানপ্রদান সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধার সম্ভাবনা। ভারতের দিক্ হইতে ইহা সামান্য লাভ নয়। ইংরাজের সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে তাঁহারা ভারতের নিকট পরাজিত না

হইলেও, উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীকে তাঁহারা প্রায় সমকক্ষ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন খেলার পালা। 'রঞ্জী', 'দিলীপ সিং', 'পটৌরী' প্রভৃতি ধনকুবের ও জননায়কগণ বিশ্রাম-ও-অবসর-বহুল জীবনে বিলাতে যে ক্রিকেট-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা ভারতেও মহারাজকুমার পাতিয়ালা, মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম প্রভৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলনে বৈশিষ্ট্য এবং বৈলক্ষণ্য এই যে, জনসাধারণ-শ্রেণীভুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম-ও-সম্পদ্‌বিহীন ক্রীড়ানায়কগণ সমান কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। এতদুপলক্ষে ক্রীড়কবিশেষের নাম বিশিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া অপরের মর্য্যাদা ও কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বোম্বে, কলিকাতা, বেনারস, ইন্দোর, নাগপুর, সেকেন্দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে সপ্তাহের পর সপ্তাহব্যাপী যে খেলা এম, সি, সি দলের সহিত চলিয়াছে, তাহার বর্ণনা হইতেই এই কথা প্রমাণ হইবে। এম, সি, সি যেমন সকল ক্রীড়া-স্থানে একই দল জমাট বাঁধিয়া খেলিতেছেন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা বাড়িয়া যাইতেছে, ভারতীয় খেলোয়াড়গণের সে সৌভাগ্য ও সুবিধা ঘটে নাই। ব্যয়সাধ্য দীর্ঘভ্রমণান্তে দলের একত্র মিলন অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন খেলোয়ার লইয়া খেলিতে হইতেছে, পরস্পরের সহিত একত্র খেলার সুবিধা অনেকের ঘটে নাই, কাহারও কাহারও বা ক্রীড়া-স্থলেই প্রথম পরিচয় হইয়াছে। এত অসুবিধা সত্ত্বেও, কাশী এবং অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতীয় দল নির্ব্বাচিত এম, সি, সি'র খেলোয়াড়দিগকে তাহাদের নিজস্ব খেলায় পরাজিত করিয়াছেন। ইহা সামান্য শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় নহে। কাশীক্ষেত্রে ভারতে এম, সি, সি দলের প্রথম পরাজয়; চূড়ান্ত খেলায় শেষ জয় পরাজয় স্থির হইবে। ভারতের রাজন্যবর্গ পোলো, টেনিস ও হকির দল লইয়া বিলাতে ও আমেরিকায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের (Olympic games) অলিম্পিক গেমস্ খেলায় আংশিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমস্ খেলাতে ভারতবর্ষীয় প্রতিদ্বন্দ্বি-প্রেরণের এখনও কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। ইহা পরম পরিতাপের বিষয়। বঙ্গীয় সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ জগতের সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া একচ্ছত্র উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে যে ফুটবল-দল শীঘ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতেছেন, শ্বেতাঙ্গ-দল তাহাদের সহিত না খেলিলেও, তাহাদেরও কৃতিত্ব-প্রদর্শনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ইহা আনন্দ ও শ্লাঘার কথা, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ক্রিকেটে ভারতীয় দলের নিকট এম, সি, সি দলের ক্ষণিক ও আংশিক পরাজয়ও অধিকতর শ্লাঘা, গৌরব ও আনন্দের কথা। সে কথা এবং সে কথা সম্পর্কীয় রহস্যের উদ্ঘাটন জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমি সকল ইংরাজী খেলার তত্ত্ব বিশেষরূপে জানি না। মোটামুটি যাহা জানি ও বুঝিয়াছি, তাহাতে ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য ও বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিয়াছি; নিত্য জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে সে খেলা বিশেষভাবে তুলনীয়; বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলে এ কথা যথার্থ প্রতীয়মান হইবে, বুঝি সেই জন্যই ইংরাজের ক্রীড়া-জগতে ক্রিকেট এত প্রিয়, এত আদরণীয় এবং তাহার স্থান এত উর্দ্ধে!

দুই একটা খেলার কথা একটু আলোচনা করা যাউক। ফুটবল খেলায় উভয়দলের সকল খেলোয়াড় নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া, একত্র একই উদ্দেশ্যে, একই সময়ে খেলে। সে উদ্দেশ্য এই—কোনমতে দলের সমবেত চেষ্টায় অপর দলের গণ্ডীর মধ্যে বলটীকে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। এখানে টীম-প্লে (Team play) বা সমবায় চেষ্টার যথেষ্ট স্থান আছে—জীবনেও তাই।

টেনিস, পিং পিং এবং ব্যাড্‌মিণ্টনে খেলার উদ্দেশ্য বা গোল (goal) সহজবোধগম্য নহে। এই মাত্র জানি, যে এইগুলি বিশেষ সৌখীন খেলা। হকিতেও ফুটবলের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, গল্‌ফ (golf) খেলাকে "একোলসেঁড়ে" খেলা বলা যাইতে পারে। দূর মাঠে-জঙ্গলে নিজমনে খোলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত খেলিয়া নিজ উদ্দেশ্যসাধন করিয়া যাইতেছেন।

পোলো বড় মানুষের খেলা; বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার বিচার প্রয়োজন নাই।

বিলাতী কথায় "He is a public school boy" কথাটা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক এবং বিশিষ্ট-মর্য্যাদাসূচক। সেইরূপ—"He has played Cricket all his life" কথাটা প্রায় "The King can do no wrong" কথার তুল্যমূল্য অর্থাৎ যম-নিয়মানুসারে যিনি আজীবন ক্রিকেট-ধর্ম্ম-নিরত তাঁহার পক্ষে অশোভন, অন্যায় ও অনিয়ত কর্ম্ম অসম্ভব বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। "To play the game" অর্থাৎ নিয়মানুসারে খেলা খেলিয়া যাওয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গণ্য। "He is a sportsman"—sportsman বলিলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় ও এই সকল কারণে খেলা নিতান্ত খেলার সামগ্রী নয়, জীবনে, চরিত্রে এবং আদর্শে খেলার স্থান অতি উচ্চে। ডিউক অফ ওয়েলিংটন যথার্থ ই বলিয়াছিলেন যে, ইটন্ (Eton) স্কুলের ক্রীড়াক্ষেত্রেই তাঁহার ওয়াটারলু সমরবিজয় সিদ্ধ হইয়াছিল। জাতিগঠনে ইহার মূল্য এত অধিক বলিয়া ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে এবং কর্ম্মজীবন-গঠনে ইহার বিশিষ্ট স্থান আছে বলিয়া এত কথা বলিতেছি।

ইংরাজ ক্রিকেট খেলাকে কি চক্ষে দেখে, তাহা ১৯১২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান-কালে বুঝিয়াছিলাম। তখন ট্রিনিটি কলেজে আমি সম্মানিত অতিথি; কুইন ভিক্টোরিয়া যে ঘরে আসিয়া থাকিতেন, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সেই ঘর আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট। কি করিয়া আমার সুখ সাচ্ছন্দ্য সম্পাদিত হইবে, তাহার জন্য অশীতি-বর্ষীয় অধ্যক্ষ ডাঃ বাট্‌লার ও তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণী সদা ব্যস্ত ছিলেন। যে বাট্‌লার এলাহাবাদ ও রেঙ্গুনে গভর্ণর ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা নাগপুরের গভর্ণর, উভয়েই ডাঃ বাট্‌লারের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে ইটন-হেরো (Eaton Harrow) বিদ্যালয়ের মধ্যে বাৎসরিক ক্রিকেট খেলা চলিয়াছে; তখন টেলিফোনের বাড়াবাড়ির বালাই হয় নাই, ঘণ্টায় চারি বার খেলার "প্রগতি" সম্বন্ধে লম্বা টেলিগ্রাফ আসিতেছে; অশীতিপর ডাঃ বাট্‌লার এবং তাঁহার ভার্য্যা যে উদ্বেগ, উৎসাহ ও উত্তেজনার সহিত টেলিগ্রাম দৌড়িয়া আনিতেছেন, পড়িতেছেন, বুঝিতেছেন ও বুঝাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে "হা হুতাশ" করিতেছেন, না হয় উল্লাসসূচক জয়ধ্বনি করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তখন বুঝিয়াছিলাম, ক্রিকেট ইংরাজের মর্ম্মে মর্ম্মে কত দূর পৌঁছিয়াছে; তখন বুঝিয়াছিলাম যে, জগতের যেখানে ইংরাজ সেইখানেই ক্রিকেট; বুঝিয়াছিলাম—প্লে দি গেম (play the game) কথার অর্থের সার্থকতা; বুঝিয়াছিলাম, যথার্থ "স্পোর্টসম্যান" (sportsman)-এর পথবিচ্যুতি প্রায় অসম্ভব।

এই অনুভূতি লইয়া দেশে ফিরিবার সময়ে জাহাজে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার জীবনের ভাব ও কাজ অনুপ্রাণিত। জাহাজে নানাবিধ ডেক-খেলার আয়োজন হয়, সে আয়োজন ব্যতীত দীর্ঘ দিন প্রায় কাটে না। একাই খেলিতেছিলাম ডেক-গলফ্ (Deck-golf), আলস্য বা অকর্ম্মণ্যতা বশতঃ এক কোণের অতি অসুবিধাকর স্থান হইতে বিধিনিয়মানুসারে বলটী স্থানচ্যুত করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছিল। খেলাও শেষ করিতে হইবে, খেলার ফলে ক্ষুধাও যথেষ্ট হইয়াছে; মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টাও পড়িয়াছে, অসহিষ্ণু হইয়া অনিয়মে বল স্থানচ্যুত করিবার প্রবৃত্তির ক্ষীণরেখা মনে উদয় হইল। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে দারুণ ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, 'Is this playing the game.'—এর নাম কি খেলা? ফিরিয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। নিজের কাছে নিজে এতটুকু হইয়া পড়িলাম, ক্ষুধা ভুলিলাম, খাইতে যাইতে পারিলাম না। এ ব্যাপার জীবনে কখনও ভুলি নাই, ভুলিব না; তাই জীবনে, জীবনের সংগ্রামে, জীবনের কাজকর্ম্মে, জীবনের ভাবের ও চিন্তার খেলায় যথার্থ খেলার স্থান এত উচ্চ বুঝিয়াছি এবং বুঝাইতে চাই।

কেহ অবিচার করিয়া বুঝিবেন না যে, আমি ইংরাজী খেলায় গোঁড়ামি করিয়া এসব কথা বলিতেছি অথবা দেশীয় খেলার মর্য্যাদা বুঝি না, বা প্রয়োজনীয়তা মানি না—তাহা খুব বুঝি এবং মানি। যথাসম্ভব তাহার চর্চ্চাও করিয়াছি, কিন্তু যুগধর্ম্ম-স্রোতে তাহা ভাসিয়া যাইতেছে। হা-ডু-ডু খেলার পুস্তকের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যথাযথ আপত্তি করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ ফল হইতেছে না। তিন

বৎসর পূর্ব্বে কটক রেভেনসা (Ravenshaw) কলেজের পুরাতন ছাত্রদিগের (Old boys) বাৎসরিক সভায় সভাপতিত্বের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। বিলাতী নানাবিধ খেলা ও কৌশলে উড়িয়া ছাত্রদিগের ব্যায়ামের কৃতিত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। চিরপ্রচলিত নানা পুরাতন খেলা ও ব্যায়ামচর্চ্চার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। দেশীয় খেলার শ্রীবৃদ্ধি ও উৎসাহের জন্য বাৎসরিক পুরস্কার বা ট্রোফি (বিজয়-কীর্ত্তি-চিহ্ন) দিতে আমার স্ত্রী ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুই বৎসর তাগাদা করিয়াও সেই ট্রোফি সম্বন্ধে নিয়মাবলীর খসরা আদায় হইল না; শোনা গেল যে, দেশীয় খেলা খেলিবার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদিগের মধ্যে সন্ধান পাওয়া গেল না। কাজেই সে ট্রোফি বিলাতী খেলার গণ্ডীভুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইতে হইল। আমি দেশীয় খেলার বিশেষ পক্ষপাতী—বোধ হয় কিছু গুণজ্ঞ। এখনও বাহিরে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণকে লাঠিখেলা দেখাইয়া চমৎকৃত করিয়া থাকি।

ইংরাজী খেলার মধ্যে ক্রিকেট অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য বলিয়া বাঙ্গালী ছাত্রের নিকট বিশেষ সমাদর পায় নাই। তাহার ফলে এম, সি, সি, দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যে দল গঠন হয়, তাহাতে বাঙ্গালীর স্থান হয় নাই। ইহা বিশেষ ক্ষোভের কারণ। বাঙ্গালীর মধ্যে ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড়ের অভাব নাই। তাহাদের অভ্যাস ও পারদর্শিতার অভাবে এই ক্ষোভের কারণ ঘটিয়াছে। University Occassional (ইউনিভারসিটী অকেশনাল) নামক শ্রেষ্ঠ ক্লাবের সভাপতিরূপে আমায় এ-বিষয় লক্ষ্য করিতে হইয়াছে, এ ক্রটি সংশোধনের চেষ্টাও হইতেছে। যে সকল বাঙ্গালী ভাল খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বী দলে স্থান পাইলেও পাইতে পারিতেন, তাঁহারা যথার্থ খেলোয়াড়ের মত—in the right sporting spirit—এ ক্ষোভ বিস্মৃত হইয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত ও প্রদেশ হইতে সমাগত নানা জাতীয় খেলোয়াড়দিগকে উৎসাহ দিয়াছেন, প্রভূত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃতিত্বে অনাবিল আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষাধিক কাল ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অধিনায়ক মেজর সি, কে, নাইডু, তাঁহার ভ্রাতা সি, এস, নাইডু এবং মাস্তাগ আলী আমার গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করিয়া আমাদের গৌরব ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বহু বাঙ্গালী অবাঙ্গালী ক্রিকেট-খেলোয়াড়ে গৃহ নিত্য মুখরিত হইয়াছিল। ঘরে বাহিরে নিত্য, সতত একই কথা—নাইডুদলের জয় হউক। এক সময়ে ভয় হইয়াছিল যে, বাঙ্গালী খেলোয়াড় দলে স্থান না পাওয়াতে বুঝি বাঙ্গালী দর্শকগণ ও অনুরাগিগণ ধর্ম্মঘট করিয়া ভারতীয়দলের বিরোধী হন বা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। সে ভয়ের তিলার্দ্ধ কারণও হয় নাই। রঙ্গভূমি নিত্য ২৫।৩০ হাজার দর্শকে পরিপূর্ণ, গগনভেদী জয়ধ্বনি নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে অভিনন্দিত করিয়াছে। বাঙ্গালী খেলোয়াড় ও সহস্র সহস্র খেলার অনুরাগিগণ যথার্থ sporting spirit-এর পরিচয় দিয়াছেন। অতএব ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন শীঘ্র অবশ্যম্ভাবী এবং সেইজন্য ক্রিকেট-রহস্য একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টার প্রয়োজন। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, অন্যান্য খেলার তুলনায় ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য ও বৈলক্ষণ্য কোথায়। প্রতি দলে ১১ জন খেলোয়াড়, বিপদাপদের জন্য একজন বাড়তি খেলোয়াড় "জিয়াইয়া" রাখা হয়। প্রয়োজন হইলে তিনি বিপন্ন একাদশ খেলোয়াড়ের স্থান গ্রহণ করেন। ১১ জনের মধ্যে মাত্র দুইজন এক সময়ে ব্যাট লইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। তাহাদের পশ্চাতে যে stump (ষ্টাম্প) থাকে, যথাবিধানে তাহা রক্ষা করাই তাহাদের কাজ এবং জিম্মা। দুই জনকেই তুল্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি, স্থিরদৃষ্টি, দৃঢ়মুষ্টি এবং দ্রুতপদ হইতে হইবে। পরস্পরকে বিশেষভাবে বুঝিয়া যথাসময়ে "দৌড়" দিতে হইবে। পরস্পরকে বুঝিবার ভুল হইলেই বিপদ্—যাহারা যে কার্য্যে সমবায়সূত্রে আবদ্ধ, তাহাদের পরস্পর বোঝাপড়ার বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটিলেই সমূহ বিপদ্। spirit of co-ordinationই sporting spiritএর যথার্থ ভিত্তি। যখন তখন ইচ্ছামত বল চালাইয়া দিয়া

"দৌড়" দিলেই খেলার জিত হয় না। প্রতি পদক্ষেপে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। বাহাদুরী করিয়া উচ্চে বল মারিলে ধরা পড়িবার—কট্-আউট্ হইবার সম্ভব। অতএব বাহাদুরী ছাড়িয়া brillance-এর লোভ ছাড়িয়া ধীর সংযম সহকারে steady blockingই খেলার জয়ের মূলমন্ত্র। একদিন, দুইদিন, তিনদিন, চারিদিন ধরিয়াও খেলা খেলিতে হয়। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার এই নিত্য steady blocking মূল মন্ত্র, শ্রেষ্ঠ সূত্র। প্রতিপদ-বিক্ষেপে যেখানে বিপদ্ আসিতেছে, ধৈর্য্য না হারাইয়া স্থির সংযমের সহিত বিপদ্-বরণও করিতে হইবে। লোভে পড়িয়া brillance-এর মরীচিকায় ভুলিলে চলিবে না, দিনগত পাপক্ষয় করিয়া পরস্পরের প্রতি বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া পরস্পরকে যথাযথভাবে বুঝিয়া এবং বুঝাইয়া ক্রিকেটের এবং সংসারের খেলা খেলিতে হইবে। প্রবীণ খেলোয়াড়ের নিভৃত-পরামর্শে এই মহাবাক্য গুরুবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া মেজর নাইডু কলিকাতার খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। তিনি লোভ পরিহার করিয়া ধৈর্য্য সহকারে ১৬২ মিনিট খেলিয়া, মাত্র ৩৯ "দৌড়" অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এরূপ সময়ক্ষেপ করিয়া—দিনগত পাপক্ষয় করিয়া প্রতিপক্ষের পূর্ব্বদিনের "দেনাশোধ" করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রদর্শিত পথানুগামী খোলোয়াড় "দিলোয়ার" brillant play বা উজ্জ্বল এবং চাকচিক্যময় খেলার অবকাশ লাভ করিয়াছিলেন, ধন্ত ধন্য হইয়াছিলেন। সংসারের ও কর্ম্মক্ষেত্রের খেলায় এই লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে। গৃহস্থের একজন ধীর সংযমের সহিত ধৈর্য্য-সহকারে কষ্টে-সৃষ্টে, যশ এবং কীর্ত্তির লোভ পরিহার করিয়া নিভৃতে যে ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান, উত্তরাধিকারী সেই ভিত্তির উপর যশ ও কীর্ত্তির বিপুল সৌধ স্থাপন করেন।

ক্রিকেট "পিচের" দুইদিকে "stump" রক্ষা করিয়া যে দুইজন একেশ্বর ব্যাট হাতে দাঁড়াইয়া আততায়ীর নির্ম্মম "বলের" বা আঘাতের বিরুদ্ধে নিত্য "stump" (গৃহস্থালী কিম্বা কর্ম্মকেন্দ্র) রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা তখন নিতান্ত একা; মহাপ্রস্থানের পথে একের পতন হইলেই বাকী ৯ জন খেলোয়াড়ের একজন আসিয়া সেই স্থান গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার অকৃতকার্য্যের হয়ত পূরণ করিবে। এই মাত্র এক আশায় তিনি প্রাণমন সহকারে খেলিতেছেন (বা গৃহস্থালী করিতেছেন কিম্বা কাজ করিয়া যাইতেছেন), উজ্জ্বল খেলার চাকচিক্যের মোহ তাঁহার দানকে বা গৃহস্থকে বা কর্ম্মক্ষেত্রের অংশীদারকে বা সহযোগী বা সহকর্ম্মী-বন্ধুকে বিপন্ন করিবার তাঁহার অধিকার নাই। "উঁচু খেলা" খেলিলেই তাঁহার আততায়ী লম্ফ দিয়া বল ধরিবে এবং তিনি কট্-আউট হইবেন। তাঁহার বিপরীত দিকে যে Stump আছে সেখানকার খেলোয়াড় না বুঝিয়া যদি দৌড় দেন এবং যথাসময়ে অপর stumpএ পৌঁছিতে যদি না পারেন, তাহা হইলেও বিপদ্। না বুঝিয়া ভ্রমপ্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পায়ের আঙ্গুল যদি নির্দ্দিষ্ট লাইনের "সূচ্যগ্র পরিমাণ" বাহিরেও আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেও বিপদ্। মেজর নাইডুর ন্যায় কৃতী ও পারদর্শী খেলোয়াড়ও এই ভ্রমে পতিত হইয়া leg before wicket বিপদে বিপন্ন হন। অতএব ভাবিয়া দেখিতে হইবে, কত দিক্ বুঝিয়া, কত লক্ষ্য করিয়া এই আপাতদৃশ্যে সহজ খেলা খেলিতে হয় এবং খেলিয়া আততায়ীকে বিমুখ করিতে হয়।

মেজর নাইডু ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু এ খেলায় ভুলিলে চলিবে না মহাকবির নির্দ্দেশ ও নিষেধ-বাক্য

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোঃ বর্ত্মনঃ পরং,
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ।"

অভিমন্যু মাত্র সপ্তরথী দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যিনি ক্রিকেট-ক্ষেত্রে "stump" রক্ষা করিতেছেন, তাহার আততায়ীর সংখ্যা একাদশ—তাঁহার আগে পাছে, ডাইনে বায়ে, দূরে নিকটে, নির্দ্দিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্রীড়া-ক্ষেত্র বা (জীবনক্ষেত্র) ছাইয়া আছে, পথ আগলাইয়া আছে। আততায়ী সতর্ক, অধিনায়ক তোমার অতর্কিত গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিজের খেলা চালাইতেছেন, প্রয়োজন-মত বদলাইতেছেন। কিসে তোমার মেজাজ খারাপ হয়, কিসে তোমার বিরক্তি বা লোভ হয়, কোথায় তুমি দুর্ব্বল, কোথায় তুমি শক্তিমান্, ঝটিতি তাহা বুঝিয়া লইয়া

তিনি নিজ দলবলকে ইঙ্গিত করিতেছেন এবং "খেলার চাল" বদলাইতেছেন।

পূর্ব্বে এক নিকট আত্মীয়ের গৃহভিত্তি-গাত্রে দেখিতাম, এখন দেখিতে পাই না—এক অপূর্ব্ব চিত্র, হাতে পায়ে শিকল-বাঁধা, ভগবৎগ্রস্ত-মানস, উর্দ্ধনেত্র, নিরাশ্রয় যুক্তকর গৃহস্থ আকাশে দৃষ্টি বদ্ধ, হাতে পায়ে সকল অঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া টানিতেছে—শত্রু, মিত্র, আত্মীয়, অনাত্মীয়, কুটুম্ব অকুটুম্ব, স্তাবক ও নিন্দুক।

খেলার ও জীবন-সংগ্রামে খেলোয়াড়ের চিত্রও ঠিক এইরূপ। গুণাগুণ, উচিতানুচিত এবং জয় পরাজয়ের বিচার-ভার নিজ হাতে লইয়া শত শত, সহস্র সহস্র দর্শক স্তুতি নিন্দা করিতেছে, "cheer" করিতেছে, "barrack" করিতেছে। স্তুতি-নিন্দার অতীত হইয়া ক্রিকেট-ক্ষেত্রে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে হইবে।

ক্রিকেট খেলার এই রহস্য, তাৎপর্য্য, বৈশিষ্ট্য, বৈলক্ষণ্য ও মাহাত্ম্য এবং জীবন-খেলার সহিত তাহা তুলনীয়। তাই আমার কাছে ক্রিকেটের আদর ও মর্য্যাদা এবং সে মর্য্যাদায় মর্য্যাদা দেখিতে চাই। হীন, সঙ্কীর্ণ, প্রাদেশিক ভাব যেন এ মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার অবসর না পায়।

ক্রিকেট যদিও বিদেশে প্রসারপ্রাপ্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা প্রকারান্তরে নিতান্ত অপরিচিত নয়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দেখিতে পাই—ছদ্মবেশী সুদরিদ্র দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-কৌরব রাজপুত্রগণের নষ্ট "বীটা" শুষ্ক কূপের মধ্য হইতে অপূর্ব্ব শরকৌশলে উদ্ধার করিয়া কুরুরাজকুলের খ্যাতি অর্জ্জন করেন। "বীটা" কথার অর্থ টীকাকার নীলকণ্ঠ করিয়াছেন—কাষ্ঠগোলক বা ক্রীড়াদণ্ড বিশেষ। আধুনিক প্রসিদ্ধ টীকাকার এবং অধ্যবসায়ী প্রকাশক মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ইহার অর্থ করিয়াছেন, খেলার বল। ইহা ক্রিকেট না হইলেও ক্রিকেটের "পূর্ব্ব গোষ্ঠী" বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু এখানেও গোলক উদ্ধার করিবার জন্য ধীর সংযম সহকারে একের পশ্চাতে আর এক শর-ক্ষেপের কথার উল্লেখ আছে। ইচ্ছা করিলে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় কুশলী অস্ত্রবিদ্ কোন উজ্জ্বলতর চাকচিক্যময় বীরোচিত এবং ক্ষিপ্রগতি অস্ত্রের ব্যবহার করিয়া চমক লাগাইতে পারিতেন। তাহা না করিয়া এক মুষ্টি "শর" মন্ত্রপূত করিয়া একের পশ্চাতে আর এক "শর" প্রেরণ করিয়া তিনি কার্য্য উদ্ধার করেন। এইখানে মহাভারতের কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

"...এই ভাবে দ্রোণ কৃপাচার্য্যের গৃহে কিছু কাল প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করিলেন। তাহার পর একদিন কুমারগণ সম্মিলিত অবস্থায় হস্তিনানগর হইতে নির্গত হইয়া, একটা মাঠে গুটি (বল) দিয়া খেলা করিতে থাকিয়া আনন্দে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাদের সেই গুটিটা এক কূপের ভিতরে যাইয়া পড়িল। তাহার পর, তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ সহকারে সেই গুটিটা তুলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা পাইবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। তদনন্তর, তাঁহারা লজ্জায় অবনতমুখ হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন এবং তাহা তুলিবার কোন উপায় না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন—শ্যামবর্ণ, শুক্লকেশ এবং কৃশশরীর এক ব্রাহ্মণ অদূরে বসিয়া, অগ্নিহোত্রের অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া হোম করিতেছেন। ভগ্নোৎসাহ অথচ আগ্রহান্বিত সেই কুমারগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ যাইয়া, তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর, বালকগণের তখনও খেলা সমাপ্ত হয় নাই দেখিয়া দ্রোণ মন্দ হাস্য করিয়া, নিজের অস্ত্রনৈপুণ্য আছে বলিয়া বালকগণকে বলিলেন—'ওহে! তোমাদের ক্ষত্রিয়বলেও ধিক্ এবং তোমাদের এই অস্ত্র-শিক্ষাতেও ধিক্, যে তোমরা ভরতের বংশে জন্মিয়া এই গুটিটা তুলিতে পার নাই। আমি এই গুটি এবং আংটী এই দুইটাকেই ঈষিকা (নলখাগড়া) দিয়া তুলিব; কিন্তু আমাকে এক সন্ধ্যার খাদ্য দিবে, বল। দ্রোণ কুমারগণকে এই কথা বলিয়া, সেই জলশূন্য কূপের ভিতরে নিজের আংটীটাকে ফেলিয়া দিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মহাশয়! কৃপাচার্য্যের অনুমতি হইলে, আপনি প্রত্যহই খাদ্য লাভ করিবেন'। যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, দ্রোণ হাস্য করিয়া বালকদিগকে বলিলেন—'আমি অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা এই এক মুট ঈষিকাকে (নল-

খাগড়াকে) অভিমন্ত্রিত করিলাম। তোমরা ইহার ক্ষমতা দেখ, যে ক্ষমতা অন্যের নাই। প্রথমে একটা ঈষিকা দিয়া ঐ গুটিটাকে বিদ্ধ করিব, তার পর আর একটা দিয়া সেটাকে, তৎপরে আর একটা দিয়া সেটাকে ; এই ভাবে ঈষিকা আসিয়া উপর পর্য্যন্ত উঠিলে, আমি তাহা ধরিয়া গুটিটাকে তুলিয়া আনিব।' তাহার পর দ্রোণ যেমন বলিলেন, তেমনই সত্বর সে সমস্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই ঘটনা দেখিয়া বিস্ময়ে বালকগণের নয়ন উৎফুল্ল হইল ; তাহার পর তাহারা সকলেই 'এই ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য' ইহা মনে করিয়া বলিল—'বিপ্রষি ! ঐ আংটীটাকেও সত্বর তুলুন'। তৎপরে, শক্তিশালী ও যশস্বী দ্রোণ ধনুর্ব্বাণধারণপূর্ব্বক বাণ দ্বারা সেই আংটীটাকে বিদ্ধ করিয়া উপরে তুলিলেন এবং বাণবিদ্ধ আংটীটাকে কূপ হইতে আনিয়া বালকদিগের নিকট দিলেন ; তাহাতে বালকগণ বিস্মিত হইল, তিনি নিজে কিন্তু বিস্মিত হইলেন না।..."*

* মহাভারতের আদিপর্ব্ব সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। —১৬—৩৩ শ্লোক। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ।

গুণগ্রাহী অধিনায়ক মেজর সি, কে, নাইডু কলিকাতায় টাউন হলে মেয়র মহোদয়ের অভিনন্দনের উত্তরে মহাভারতের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

একের পর এক "one step at a time" জীবনের ক্রীড়ায়, কর্ম্মজগতে, ধর্ম্ম-জগতে ইহাই মূল-মন্ত্র।

এই কথা স্মরণ করিয়া ভারতের জটিল জীবন-সমস্যার সুমীমাংসার জন্য যুক্তকরে অথচ দৃঢ়স্বরে বলি—

"Lead kindly light,
Amongst the earthly gloom
Lead thou me on.
The night is dark
And I am far from home
Lead thou me on.
Lead thou my feet, I do not ask to see
That distant scene, one step enough for me."

শিবরাত্রি

শ্রীপিণাকীলাল রায়

আবার শিব-চতুর্দ্দশী আসিল এবং গেল। এই বসন্তে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে শিবের পূজা করিতে হয়। দিনের বেলায় পূজা নহে, পুরা রকমের নৈশ পূজা। রাত্রি-কালের চারি প্রহরে চারিটি শিব গড়াইয়া পূজা করিতে হয়; সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত পূজা করিতে হয়। পূজার প্রধান অঙ্গ নিরম্বু উপবাস এবং রাত্রি-জাগরণ। যখন নৈশপূজা এবং কৃষ্ণপক্ষের পূজা তখন বলিতেই হইবে ইহা তান্ত্রিকী পূজা। যখন সর্ব্বজাতির নরনারী নির্ব্বিশেষে পূজার ব্যবস্থা আছে, তখন ইহা যে তান্ত্রিকী পূজা তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শিবপূজায় অনধিকারী নাই; আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সর্ব্বজাতির এবং সর্ব্ববর্ণের এই পূজায় সমান অধিকার আছে। শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পাশাপাশি বসিয়া শিবপূজা করিতে পারেন; ধনী দরিদ্র, সম্রাট্ এবং পথের ভিখারী পাশাপাশি বসিয়া শিবপূজা করিবে। শিবমন্দিরে লজ্জা করিতে নাই; অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া কুললক্ষ্মী শিবপূজা করিবেন। সাধারণতঃ শিবপূজায় মন্ত্র নাই, পদ্ধতি নাই; ব্যোম ব্যোম, ববম্ ববম্ মহাদেব বলিয়া শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালিলেই, সচন্দন বিল্বপত্র অর্পণ করিলেই শিবের পূজা করা হইবে। অর্থাৎ শিবের পূজায় কোন একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে নিজের তৃপ্তির জন্য একটা পদ্ধতিক্রমে শিবপূজা করিতে পারেন, ভূতশুদ্ধি, আসন-শুদ্ধি করিয়া মন্ত্রের সাহায্যে শিবপূজা করিতে পারেন; আর মূর্খ অন্ত্যজ জাতির কেহ বিনামন্ত্রে কেবল 'বম্ মহাদেব' বলিয়া সেই শিবের মাথায় জল ঢালিলে তাহার পূজার ফল ঠিক তেমনিই হইবে। শিবপূজায় পুরোহিত নাই, গুরু নাই, মন্ত্র নাই, মন্ত্রজপ নাই; আছে কেবল পূজকের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। এমন উদার সার্ব্বজনীন পূজা কোন দেশের কোন ধর্ম্মে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কেন এমন হইল? শিবপূজায় এত উদারতা শাস্ত্র দেখাইলেন কেন? উত্তরে বলিতে হইবে যে, শিব যে আমি—আমিই যে শিব। যত জীব তত শিব। আমি পণ্ডিত হই, মূর্খ হই, ব্রাহ্মণ হই, চণ্ডাল হই, হিন্দু হই, মুসলমান হই—আমি যাহাই এবং যেমনই হই না কেন, আমার তিনি আমারই মতন হইবেন। শিবপূজায় শিবের ধ্যান করিবার সময়ে নিজের মাথায় ফুল দিয়া নিজেকে নিজে দেখিতে হয়। আরও একটা কথা আছে। শিব প্রধানতঃ সংহার-মূর্ত্তি; তাঁহাতে বিশ্ব-সৃষ্টি সংহৃত হয়, তাঁহাতে সর্ব্বস্ব সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বস্বের পরিণাম। পরিণতির স্থান সকলের পক্ষে সমান। শ্মশানে বা গোরস্থানে রাজাপ্রজা, পণ্ডিতমূর্খ, ব্রাহ্মণশূদ্র সবাই সমান। কেন না, দেহী মাত্রেরই পক্ষে একই রকমের পরিণতি। পরিণাম সম্বন্ধে দেহের বাছ-বিচার নাই; রাজার দেহের যেমন পরিণাম হইবে, প্রজার দেহের তেমনই পরিণাম হইবে। সুতরাং পরিণতির দেবতা, শ্মশানের ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবই সমান। তাঁহার কাছে জাতি-বিচার নাই, উচ্চনীচ নাই, ধনী-দরিদ্র নাই। যেমন শ্মশানে সব এক, তেমনিই শ্মশানের ঈশ্বরের কাছেও সব এক। পক্ষান্তরে, নারায়ণ পালনকর্ত্তা—রক্ষাকর্ত্তা; তাঁহাকে সমাজ-রক্ষা করিতে হইবে, বর্ণবিভাগ বজায় রাখিতে হইবে, অধিকার অনুসারে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহাই দিতে হইবে; তাই নারায়ণের—বিষ্ণুর পূজায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার আছে, সে পূজায় একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে; নারায়ণের বিগ্রহ স্পর্শ করিবার অধিকার সকল জাতির নাই। তারও একটা মজার কথা আছে। শিবের পূজায় শিবের প্রসাদ খাইবার ব্যবস্থা নাই; শিবকে

ভোগ দিতে নাই; পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনসহ অন্নভোগ দিতে নাই, দিলেও তাহা কাহাকেও খাইতে নাই। যিনি শ্মশানের দেবতা, তাঁহার ত ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকিবার নহে, কেন না তাঁহাতে যে সর্ব্বস্ব যাইয়া সংহৃত হইতেছে,—তাঁহা ছাড়া কিছু নাই, তাঁহার অতীত কিছু থাকিতে পারে না। যিনি সংহারের দেবতা, তাঁহার আবার প্রসাদ কি! যিনি রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, তাঁহারই ভোগরাগ-প্রসাদ সম্ভবপর; কারণ তিনি যে সকলকে, বাঁচাইয়া রাখিবেন—আর শিব সকলকে আত্মসাৎ করিবেন। "শিবোঽহম্" বলিতে পারিলেই শিবপূজা সার্থক হইল।

আমাদের কোন দেবতারই—কোন ধ্যানগম্য ইষ্টদেবতারই একটা স্বতন্ত্র রূপ নাই। যে দেবতা যে গুণোপেত, যাঁহা হইতে যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিতে চাই, তাঁহার রূপও সেই গুণ বা ঐশ্বর্য্যের অনুকূল হইবে। শিব যখন 'আমি আছি' এই জ্ঞানের দ্যোতক, অখণ্ড দণ্ডায়মান কালস্বরূপ, তখন তাঁহার প্রতীক শিবলিঙ্গ। রূপ নাই, দেহ নাই, নেত্রবক্ত্র নাই, ভাবভঙ্গী নাই, প্রবৃত্তি প্রকৃতি নাই—আছে কেবল অস্তিত্বের জ্ঞাপক একটা প্রতীক—একটা চিহ্ন। সে চিহ্ন কিসের? সৃষ্টির গূঢ় রহস্যের; এই গূঢ় রহস্য যাঁহাতে সম্পুটিত তিনিই অনাদি-লিঙ্গ মহাদেব। শিব যখন সংহারমূর্ত্তি রুদ্র, তখন তাঁহাতে কেবল সংহৃতিরই বিকাশ দেখান হইয়া থাকে। আমাদের মূর্ত্তিপূজা ভাবের মানচিত্রের পূজা মাত্র। শিবের ধ্যান আর কিছুই নহে, হৃদয়পটে শিবভাবের মানচিত্র লেখা মাত্র। সেই মানচিত্র যাহার হৃদয়ে যতক্ষণ অঙ্কিত থাকে, তাহার জীবন ততক্ষণ ধন্য হয়। প্রথমে স্তবস্তুতি, অর্থাৎ word-painting। শব্দের সাহায্যে ভাবের আলেখ্য নিরূপণ চেষ্টা; তাহার পরে ধ্যান, অর্থাৎ শব্দালেখ্য অনুসারে মানসপটে ভাগবত-রূপের নিরূপণ। সেই রূপ স্থির হইলে, মনে গাঁথিয়া গেলে, তাহারই প্রতিমা গড়িয়া বাহিরের দশ জনকে দেখাইতে হয়। সাধারণ লোকে সেই রূপ দেখিয়া উহাকে মনে মনে গাঁথিবার চেষ্টা করে। বাহিরের পট মনে গাঁথিয়া বসিলে, তখন স্তবস্তুতির নিকষে সেই ধ্যানগম্য মূর্ত্তিকে কষিয়া লইতে হয়। এই চেষ্টার ফলে, সাধারণ সাধকের মনে ভাবোদয় হইতে পারে—হইয়াও থাকে। এই ভাবোদয়ের সহায়তা করিবার জন্যই প্রতিমা-পূজা প্রবর্ত্তিত।

বসন্তকালে শিবচতুর্দ্দশী কেন? সৃষ্টির স্ফুরণকালে যখন দ্বৈত ভাবের প্রবল প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, তখন অদ্বৈত তত্ত্বামৃত বুঝাইবার জন্য, ঘোর নিশায় চৌকী হাঁকার মতন, গৃহস্থকে সজাগ রাখিবার উদ্দেশ্যেই শিব-চতুর্দ্দশী ব্রতের ব্যবস্থা। বসন্তে জীব আত্মহারা হয়, নিজেকে বিলাইয়া দিতে চাহে। নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য সৃষ্টির সর্ব্বস্বে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। যেখানে যেটি মধুর, সুন্দর, মনোহর, সেইখানেই নিজের মধুময় সুখময় আমাকে 'হরির লুট' করিয়া ছড়াইয়া দিতে চাহে। এই আত্ম-বিসর্পণের সংরোধ ঘটাইবার জন্য শিবরাত্রির উপবাস। ঘোর নিশাকালে, যখন আমি ছাড়া আর কিছুরই অনুভূতি হয় না, যখন 'আমি আছি' এই জ্ঞানটাই প্রবল থাকে, যখন আমার অস্তিত্বে আমার সৃষ্ট-সংসার যেন সংক্ষুব্ধ থাকে, তখন আমার অস্তিত্বকে শিবরূপ জ্ঞান করিয়া, আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাতেই অর্পণ করিতে হয়। আমার জৈব আসক্তি ব্যাধরূপে আমার মেরুদণ্ডরূপী বিল্ববৃক্ষের প্রবৃত্তির ডালে বসিয়া আছে; সেই ব্যাধ সারাদিন হিংসা করিয়া, শিকার করিয়া, নিজ পুষ্টির জন্য মাংস সঞ্চয় করিয়া, তাহা প্রবৃত্তির ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। মেরুদণ্ডরূপ বিল্বমূলে 'অহমস্মি' এই জ্ঞানরূপী অনাদিলিঙ্গ শিব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে বেষ্টিত হইয়া বিল্ববৃক্ষের উপর জড়াইয়া উঠিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মক ত্রিপদ বিল্ববৃক্ষকে শোভিত করিয়া আছে। বাহিরে ভীষণ ঝড়—ষড় রিপুর তুফান তরঙ্গে সৃষ্টি যেন বিক্ষুব্ধ, সঞ্চালিত, সমান্দোলিত। সে ঝড় দেখিয়া আসক্তি-রূপী ব্যাধ-ভয়ে সঙ্কুচিত, এতটাই ভীত যে সে আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত। আমি না থাকিলে, আমার ত কিছুই থাকে না,—আমার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, আমার দয়ামায়া, স্নেহমমতা, আমার সুখ দুঃখ, আমার ষড় রিপু, আমার মানবতা—আমার সব যায় যে! ভয়ে আসক্তি এতটাই সঙ্কুচিত যে

প্রায় আত্মস্থ। তখন ত্রিগুণাত্মক বিল্বপত্রের সঙ্গে হিংসার মিশ্রণ, সেই সঞ্চিত মাংসের রস ভিতরে—নীচে—মূলে আত্মারাম শিবের মাথায় পড়িল। অমনি আত্মস্বরূপ শিবের প্রকাশ। সে শিব বলিয়া উঠিলেন—"তুমি নাশ-ভয়ে ভীত হইয়াছ, এই যে আমিই নাশের দেবতা, আমাতে তুমি সম্মিলিত হও, তোমার নাশ-ভয় থাকিবে না। আমিই শেষ, আমি ছাড়া আর কিছু নাই, কিছু থাকিতে পারে না। তাই শেষ নাগ সকল আমার সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত। সংসারের বিপরিণামের ফলে যাহা বাকী থাকে, যাহার আর অন্য পরিণতি নাই, তাহাকেই শেষ বা Essence বলে। এই শেষ নাগ—যাহার অন্যত্র যাইবার উপায় নাই,—এমন সামগ্রী হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ সৃষ্টির পর্ব্বে পর্ব্বে, মর্ম্মে মর্ম্মে, মজ্জায় মজ্জায়, এই শেষ নাগ বিরাজিত। সংহারের একমাত্র উপাদান বিষ, দেহ বিষাক্ত না হইলে দেহপাত হয় না। সেই বিষ, সেই নাগের আধার আমার কণ্ঠে নিত্য বর্ত্তমান; তাই আমি নীলকণ্ঠ। হিংসাই তোমার জীবনের অবলম্বন, সেই হিংসা হইতে উৎপন্ন সিংহ শার্দ্দূল আমার কাছে মৃত—শব; আমি তাহাদের চর্ম্ম লইয়া আসন পাতিয়া বসিয়া আছি। আমি সর্ব্ববর্ণের সমন্বয়ে রজতগিরিবৎ, কিন্তু যেখানে অজ্ঞেয়তার আধার সেইখানেই আমি নীললোহিত। ব্যোমমার্গ আমার কেশ, সে কেশের জটাভারে ত্রিপথগা গঙ্গা—সৃষ্টির অনুরাগরূপিনী তরল তরঙ্গিনী কুলু-কুলু-ধ্বনিতে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; ব্যোম পথের সীমা নাই, আমার জটাভারেরও সীমা নাই। সৃষ্টিশক্তি-বিলাসিনী মহামায়া বামা রূপে আমার বামাঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। আমাতেই সব, আমিই সকলের সমাপ্তি; তাই আমার শ্মশান-বাস। আমি সেই শ্মশানে শবরূপে ছিলাম;—তোমার ভয়ভীত আত্মার কাতর আহ্বানে, তোমার অনুরাগের প্রবল সঞ্চালনে, আমি শক্তিময় হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। এস, এস, ক্রোড়ে এস—আমাতে আসিয়া সম্মিলিত হও।"

ইহাই শিব-চতুর্দ্দশী। ভয়ের সাহায্যে আত্মার অন্বেষণ;—আর্ত্তের চেষ্টায় সহসা আত্মদর্শন। ভয় কিসের?—প্রবল বসন্তে সৃষ্টির ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখিয়া, সেই আবর্ত্তবেগে সৃষ্টির সাগরে ফেনোর্ম্মির বিকট বিকাশ দেখিয়া আত্মার সংক্ষোভ। এই সংক্ষোভ হইতেই আত্ম-বিকাশ—শিবত্বের উন্মেষ। কথায় আছে, 'জীবনে মরণ—'মরণে জীবন।' জন্মিলেই মৃত্যু, মরিলেই নব জীবন। বসন্ত জনমের ঋতু, তাই সঙ্গে সঙ্গে মরণের ইঙ্গিতও করিতে হয়। শিব-চতুর্দ্দশী সেই মরণের—সৃষ্টির বিপরিণামের ইঙ্গিত মাত্র। এক দিকে নারায়ণ দ্বিভুজ-মুরলীধর মূর্ত্তিতে বসন্তের অনুরাগরক্তিম হইয়া মদনোৎসব করিতেছেন—এক হইতে দুই, দুই হইতে বহুতে পরিণত হইতেছেন—হ্লাদিনীর বিমল বিকাশে রাধা-সতী অনুরাগ-ভরে সৃষ্টির হিন্দোলে দুলিতেছেন;—মদনপূজার ধুম লাগিয়া গিয়াছে! অন্য দিকে মদনান্তক মহাদেব সংহার-মূর্ত্তির বিকাশ করিয়া, সর্ব্বস্বে আত্মবিস্তার করিয়া, সর্ব্বস্বকে আত্মস্থ করিতেছেন। এক দিকে বিকাশ, অন্য দিকে সঙ্কোচ। এক দিকে দ্যুতি-রতি-বিস্তৃতি, অন্যদিকে তমিস্রা, সংহৃতি, স্তুতি। সৃষ্টির ও বিনাশের এই প্রহেলিকা বুঝাইবার জন্যই শিব-চতুর্দ্দশীর ব্রত। ইহা অনন্ত সাগর—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, ইহার মহিমা কতটুকুই বা জানি, আর কতটুকুই বা জানাইতে পারি,—যত ডুব দিবে, ততই ইহার মহিমা বুঝিতে পারিবে।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
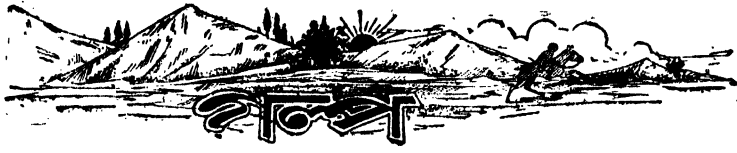
ভুলের ব্যথা

শ্রীপাপিয়া বসু

মৈত্রেয়ী যখন থার্ড ইয়ারে পড়ে, তখনই তার বিয়ে হোল বি-এ পাশ ভবতোষের সাথে। একেই ত বি-এ ক্লাসের ছাত্রী সে, তার উপর তার রূপ-গুণ, গান-বাজনা, এমন কি নাচের কথা পর্য্যন্ত :চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটী এমনি চ্যারিটীতে গান এবং নাচ দেখিয়ে চমৎকৃত করে' দিয়েছিল সবাইকে। সে হতেই নামটা তার রটেছে বেশী এবং এজন্যে তার উমেদারও জুটেছে কম নয়।

এ হেন যে মৈত্রেয়ী, মনে প্রাণে সবদিক্ দিয়ে সুখী, সে কিন্তু বিয়ে করে' সুখী হতে পারলে না। শুধু মাত্র বি-এ পাশ, চাকুরীজীবী, অরসিক ভবতোষকে তার পছন্দ হোল না এতটুকু। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর বনিবনার ঘরও সেখানেই সীমাবদ্ধ হোল।

মনের মিল না হবার আরেকটা কারণও ছিল। সেটাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় এবং প্রধান কারণ, যার জন্যে মিলনের পথে বেড়ে উঠল এক তীক্ষ্ণ কণ্টক। এত গুণের বহর দেখে বিয়ে করবার জন্যে যতগুলো উমেদার তার জুটেছিল, তার ভেতর সবাইকে আমল না দিলেও অমিতাভকে ভালবেসেছিল সত্যি সত্যি। একদিন খুলেও তাকে বলেছিল সে কথা। শুনে প্রাণের একান্ত গূঢ় কথার উত্তর পেয়ে অমিতাভ সেদিন দিশেহারা হয়েছিল আনন্দে! দিনের পর দিন প্রশ্ন করে' সে উত্তর পায় নি, মৈত্রেয়ীর মুখে সেদিন তাই শুনে সে কৃতার্থ হয়েছিল।

তার পর থেকেই চলেছিল তাদের জল্পনা-কল্পনা। কি করে' নূতন সংসার গড়ে তুলবে, সে চিন্তায়ই হয়েছিল বিভোর। ঠিক করেছিল, মৈত্রেয়ী তার মা-বাপের কাছে সমস্ত কথা খুলে বলবে, ওদিকে অমিতাভ ঠিক করবে তার নিজের দিক্।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ভেঙ্গে দিয়ে তার বিয়ের বাজনা বেজে উঠল। মা-বাপের মতের বিরুদ্ধে পারলে না সে অমত করতে। অমিতাভ যেখানে হৃদয়-দেবতা হয়ে দাঁড়াত, সেখানে এসে দাঁড়াল ভবতোষ। এম-এ পাশের ছবির পাশে বি-এ পাশ। আর যা তার মতের সাথে একেবারেই খাপ খায় না, ঠিক তাই এসে দাঁড়াল— একেবারে অ-রসিক!

কাজেই মনের মিল হোল সুদূরপরাহত। সারাক্ষণ যে রসের যোগান দিয়ে বেড়ায়, তারই সাথে এমনি লোকের মনের মিল হবেই বা কেমন করে! তবু হয়ত হতে পারত, যদি স্ত্রী স্বামীকে মেনে নিত বড় বলে'! কিন্তু মৈত্রেয়ীর মত শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে তা অসম্ভব; কারণ একেই ত নাম হিসেবে স্বামীর চেয়ে সে অনেক বড়, তারপর শিক্ষা হিসেবেও স্বামীর চেয়ে নিজেকে এতটুকু হীন মনে করতে পারে না। কাজেই মিলনের ঘরে তাদের প্রথম থেকেই তালা বন্ধ হোল।

এমনি করেই কেটে চল্‌ল দিনের পর দিন।

মাঝের ভাব তাদের যাই হোক, মনে মনে যাই না থাক তাদের, তাই বলে সম্পর্কটা কিন্তু তারা ভুলতে পারলে না; অস্বীকার করতে পারলে না বিয়ের সে মন্ত্রের প্রাধান্যকে। তাই যদি পারত, তাহলে ছাড়াছাড়ি হয় ত হয়ে যেত তাদের অনেকদিন আগেই। মৈত্রেয়ী যেমন চায় না স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করতে, ভবতোষও তেমনি স্ত্রীর উপর প্রাধান্য খাটাতে উন্মুখ নয়। তাই জোড়া-তালী দিয়ে সংসার এক রকম এগিয়ে চল্‌ল।

কিন্তু বিঘ্ন ঘটল হঠাৎ, অমিতাভের অতর্কিত আবির্ভাবে। বিয়ের পর সেইদিন তার সাথে মৈত্রেয়ীর প্রথম সাক্ষাৎ হোল। ভবতোষ ছিল না বাসায়, তাই অনেক কথাই হোল তাদের ঘণ্টা দুই পর্য্যন্ত। অতীতের

অনেক কিছু সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার। তাতে করে' যা এক সর্ব্বনাশের সূচনা হোল এ সংসারের উপর, যার কথা ভবতোষ হয় ত কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি। ঠিক হোল, মৈত্রেয়ী অমিতাভের এ সাদর আহ্বান উপেক্ষা করবে না, অর্থাৎ যাবে তার সাথে, স্বামীর অখণ্ড সম্পর্ক ছিন্ন করে'। এ একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগছে না, তাই অতীতের সেই সুখ-স্বপ্নকেই সার্থক করে' তুলতে বেরুবে অমিতাভের সাথে অভিযানে। কিন্তু তার ভেতর শেষ পর্য্যন্ত একটা কিন্তু রয়ে গেল।

এ পর্য্যন্ত স্বামীর কাছ থেকে এতটুকু খারাপ ব্যবহারও পায় নি সে! মনে মনে যত অশান্তিই থাক, কিন্তু প্রকাশ্যে স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা পায় নি কোনদিন! কিন্তু এতটুকু খারাপ ব্যবহার যেদিন প্রকাশ পাবে, সেইদিন কেটে যাবে তার সমস্ত মায়া এ সংসারের এবং সেইদিনই আনবে তাকে, অর্থাৎ অমিতাভকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে'। তার পূর্ব্বে বিনা অপরাধে একজনের বুকে আঘাত করা ঠিক সঙ্গত নয়!

অমিতাভ তাতেই রাজি হয়ে বিদায় নিল। এবং বলে গেল' যাবার সময়ে সে সমস্ত ঠিক রাখবে, মৈত্রেয়ী যেন চেষ্টার ত্রুটি না করে!

তারপর থেকেই আরম্ভ হোল সংসারে যত অশান্তি। এতদিন মনের মিল উভয়ের না থাকলেও বাইরে কোন অশান্তি ছিল না; শুধু ভেতরে ভেতরেই গুমরে উঠছিল। তাতে মনে মনে যত অশান্তিই সৃষ্টি হোক না কেন, সংসার চলেছিল একরকম মন্দ নয়। কিন্তু এবার তার প্রাধান্য বাইরেও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করলে।

কথায় বার্ত্তায়, মৈত্রেয়ীর প্রতিটি চালচলনে প্রকাশ পেতে লাগল এক তীব্র বেহায়াপনা। স্বামীর প্রতি অবজ্ঞার মাত্রা এতদিন সে আকারে ইঙ্গিতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল, কিন্তু এবার একেবারে তীক্ষ্ণ কথায় রূঢ় ব্যবহারে, সে তার সীমা ছাড়িয়ে গেল।

আগে মাঝে মাঝে বন্ধুদের বাড়ী যেত গান-বাজনা করতে; কিম্বা নিজের ঘরেও কোনদিন বসাত আসর; অথবা কোথাও সঙ্গত ইত্যাদিতে নিমন্ত্রণ হলে, সে তা উপেক্ষা করত না! করত না নয়, করতে পারত না। কিন্তু সে সময়ে প্রতিটি কাজের পূর্ব্বে এতটুকু হলেও স্বামীর মত নিত; অন্ততঃ জানিয়ে যেত তাকে! তাতে করে' ভবতোষের মনেও সান্ত্বনা ছিল, এই ভেবে যে স্ত্রী তার এমনি যাই হোক তার অবাধ্য নয়। কিন্তু...

ইদানীং মৈত্রেয়ী স্বামীর মতামতের বড় একটা ধার ধারে না। যেখানে খুসী ইচ্ছামত যায়, ইচ্ছামত ফেরে! তাতেও বাধা না পেয়ে শেষটা সে বলগা-ছাড়া ঘোড়ার মতই স্বাধীন হয়ে দাঁড়াল। অমিতাভ আজকাল প্রায়ই আসে, কিন্তু অতি সাবধানে ভবতোষের দৃষ্টি এড়িয়ে; যখন সে আফিসে থাকে, তখন কাণে কাণে কি তার মন্ত্র আওড়ায়ে যায়, মৈত্রেয়ী তাতে নেচে ওঠে আরো বেশী! ..

কিন্তু ভবতোষের এখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। মৈত্রেয়ীর এমনি ব্যবহার বিসদৃশ ঠেকছে তার চোখে। যত শান্ত, যত ভাল মানুষই হোক সে, তবু সহ্যের তারও একটা সীমা আছে। তবু কদিন পর্য্যন্ত সে তীক্ষ্ণ ভাবে সব লক্ষ্য করলে। বুকের ভেতর বিবেকের তীব্র প্রেরণা সত্ত্বেও, বল্লে না কিছু। দেখতে লাগ্‌ল, মৈত্রেয়ী কতটা পর্য্যন্ত বাড়তে পারে।

বিকেলে সে বেড়িয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে হয় ন'টা-দশটা; কোনদিন বা এগারটাও বেজে যায়! অথবা বের হয় কোনদিন তার আফিস ফিরিবার পূর্ব্বে, গোটা তিনেকের সময়ে, ফিরে আসে কোনদিন আটটায়, কোনদিন বা ন'টায়! কিন্তু এর জন্যে এতটুকু কৈফিয়ৎ সে দেয় না, যেন এ তার বাঁধা-ধরা রুটিন; এ তাকে করতেই হবে।

শেষে একদিন ভবতোষের সত্যি সত্যি অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। মৌন-ব্রত ভাঙতে হোল তাকে। এ কি রকম বিশ্রী ব্যাপার! যত আধুনিক, যত শিক্ষিতাই না কেন হোক সে, তবু ঘরের বউ ত, ভদ্রঘরের স্ত্রী! এমনি করে' চলা ফেরা কি তার পক্ষে শোভা পায়!

সেইদিনই দশটা বাজতে মৈত্রেয়ী যখন ফিরে এল, ভবতোষ সামনে এসে দাঁড়াল ধীরে, ধীরে। এক মুহূর্ত্ত মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লে, আচ্ছা মৈত্রেয়ী, একি তোমার উচিত?

মৈত্রেয়ী বিস্মিত হয়ে তাকাল: কি?

—এই যে এমনি করে' তোমার চলা-ফেরা?

—ওঃ! অবজ্ঞামিশ্রিত একটা বিশ্রী ভাব করে' সে মুখ ফেরালেঃ কেন অনুচিতের কি দেখলে এর ভেতর?

—না, উচিত কিনা তাই আমি জিজ্ঞেস করছি!

—সে ত তুমি নিজেই বুঝতে পার!

রাগে ভবতোষের সর্ব্বাঙ্গ রি রি করে' জ্বলে উঠল। ইচ্ছে হোল একটা চাপড় দিয়ে ওর দাঁতগুলো একসঙ্গে সব ফেলে দিতে। অসভ্য, লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! কিন্তু সামলিয়ে গিয়ে সাধারণ ভাবে বল্‌লে,—এই যে তুমি এমনি করে বেড়িয়ে যাও, ফের রাত এগারটা, বারটায়, এতে লোকে কি বলে বল ত? এতে কি সম্মান বাড়ে না কমে!

—অত চিন্তা করবার আমার সময় নেই, মৈত্রেয়ী অবজ্ঞার স্বরেই বললে, লোকের মতামত অত ভেবে চললে আর সংসার চলে না। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

—সংসারে থাক্‌তে হলে লোকের মতামতের কি কোনই প্রয়োজন নেই? কপাল কুঁচকিয়ে ভবতোষ বিরক্তির স্বরে কথাটা বল্‌লে।

—তা জানিনে, হয়ত থাকতেও পারে, কিন্তু সে আমার জন্যে নয়!

—তুমি কি সংসারের বাইরে নাকি?

—তাই! সংসারে থাকতে হলে যদি অত মেনে চলতে হয়, অমন সংসারে আমার প্রয়োজন নেই! ওসব বাঁধা-বাঁধির ধার আমি ধারি না!

—কিন্তু যদি আমি জিজ্ঞেস করি? ভবতোষ গম্ভীর ভাবে বল্‌লে,—আমি তোমার স্বামী। মন্ত্র পড়ে' দেবতা সাক্ষী করে, সমস্ত দায়িত্ব তোমার নিজের হাতে তুলে নিয়েছি! এমনি যথেচ্ছাচারের কারণ যদি আমি জিজ্ঞেস করি?

এক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মৈত্রেয়ী বললে,—তা তুমি করতে পার। কিন্তু উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই! বিয়ে হয়েছে বলেই, তুমি রাজা হয়ে গেছ। আর আমি পড়ে' গেছি একেবারে! এমন কোন মন্ত্র বিয়ের ভেতর নেই! আমি কি করি না করি, তার উত্তর আমি দেব না!

—তাই বলে তুমি যা খুসী তাই করবে?

—সে আমার ইচ্ছে! তুমি কর না, তাতে আমি বাঁধা দিতে যাই?

ভবতোষের দাঁতগুলো কির-কিরিয়ে এল। ইচ্ছে হোল এখনই দু'ঘা লাগিয়ে দিতে। কিন্তু দমিয়ে নিলে। কারণ সেটা তার কাছে জঘন্য ইতরতাই মনে হোল!

মৈত্রেয়ী বল্‌লে, কারুর স্বাধীন ইচ্ছায় কখন হাত দিতে এস না। ওটা ঠিক সুন্দরও নয়, শোভনও নয়। আর তাতে করে' সব সময়ে নিজের সম্মানও বজায় থাকে না! একটা ব্যঙ্গ কটাক্ষ হেসে সে বেরিয়ে গেল। ভবতোষ চেয়ে রইল ব্যর্থ আক্রোশে সেই পথের পানে।

তার পর দিন তিনেক কেটে গেছে। কিন্তু মৈত্রেয়ীর সে ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি! সেই তার বিকেলে বেরিয়ে যাওয়া। ফেরা রাত্রি দশটা এগারটায়, চলেছে সমানেই। ভবতোষ যদিও সেদিনের পরে, আর তাকে একটি কথাও বলেনি, কিন্তু মনে মনে সে এমন ভাবে ফুলছে, যে এক সময়ে বারুদের মত হঠাৎ ফেটে পড়া তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

আর মৈত্রেয়ীর সেদিনের সেই রূঢ় আচরণও তাকে কম বেঁধে নি! ছিঃ ছিঃ, কতটা বেহায়া হলে স্বামীর সাথে স্ত্রী এমনি করে' কথা বলতে পারে! সেই এতটুকু স্নিগ্ধতা, নেই বা ভদ্রতা এতটুকু নীচ তার এক উগ্র

তবু সে ধৈর্য্য ধরে'ই ছিল। কিন্তু সে বাঁধ তার আবার ভাঙ্‌ল, যেদিন মৈত্রেয়ী বাড়ী ফির্‌ল সারা রাত্রি বাইরে কাটিয়ে। বিকেল পাঁচটায় বেরিয়ে ফিরে এল ভোর সাতটায়!

সামনে দাঁড়িয়ে রুক্ষস্বরে বললে,—কাল তুমি কোথায় ছিলে?

মৈত্রেয়ীও সমানে উত্তর দিল। কেন, তাতে তোমার প্রয়োজন?

—প্রয়োজন যাই হোক, আমার শুনতে হবে।

—না আমি বলব না। প্রতি কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই!

—বাধ্য তুমি! ভবতোষ খপ্ করে মৈত্রেয়ীর একখানা হাত চেপে ধরলে। চোখ দু'টো জ্বলছে তার ধক্‌ধক্ করে': তোমাকে বলতেই হবে। বিয়ে যখন করেছি তোমায়, তখন ভালমন্দ সব কিছুই দেখতে হবে আমাকে। তুমি যা খুসী তাই কর, আর ভাব সেই তোমার গৌরব; কিন্তু লোকে আমাকেই কুৎসায় ছেয়ে ফেলেছে! এর একটা সমাধান, আজ আমায় করতেই হবে!

—ইস্, তুমি যে প্রভুত্ব খাটাচ্ছ দেখছি!

—প্রভুত্ব নয়! ভবতোষের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। একটা ঢোক গিলে বল্‌লে,—আর তা হলেও ক্ষতি নেই। প্রভুত্ব না হলেও, তোমার সমস্ত দায়িত্ব আমারই উপর। তাই সব কিছু দেখতে আমি বাধ্য!

—কিন্তু আমি যদি না বলি! কপাল কুঁচকিয়ে মৈত্রেয়ী বল্‌লে।

—না বলি, বল্‌লে আজ চলবে না, সব খানে তোমার নিজের ইচ্ছে নয়! বলতে তোমাকে হবেই!

—কেন জোর নাকি?

—হ্যাঁ, জোর! কঠিন কণ্ঠে ভবতোষ বললে,—না বল্‌লে আজ তোমার মুক্তি নেই! আজ এর একটা হেস্ত নেস্ত না করে' ছাড়ব না। দিনের পর দিন তোমার এমনি

—কেন মারবে নাকি তুমি? ছেড়ে দাও আমার হাত! অসভ্য!

হাতে একটা সজোরে ঝাঁকা দিয়ে ভবতোষ বললে,—হ্যাঁ মারব! প্রয়োজন হলে কুণ্ঠিত হোব না তাতে। যেমন তুমি, আমাকেও ঠিক তেমনি হতে হবে! ভাল চাও ত এখনো বল, নইলে আজ ছাড়া পাবে না কিছুতেই।

—তুমি এতটা ইতর?

—বলবে না তুমি? ভবতোষ চীৎকার করে' উঠল। শান্ত মানুষ রাগলে বড় ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। তারও আজ ঠিক তাই হয়েছে, চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে যেন!

মৈত্রেয়ী এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল। চোখের এমনি তেজ সে দেখেনি কখন। বল্‌লে,—আমি কোথায় যাব যে তুমি এমনি করে' চোখ রাঙাচ্ছ? তুমি কি আমায় খারাপ ভাব?

—তা ভাবি কি না ভাবি সে আমার কাছে। তুমি বল; আমি শুধু জানতে চাই, কাল সারা রাত্রি ধরে' তুমি কোথায় ছিলে?

—কোথায় আবার থাকব? কাল অনিতা নিমন্ত্রণ করেছিল, খেতে খেতে একটা বেজে গেল বলেইত ওরা আর আসতে দিলে না।

এক মুহূর্ত্ত চুপ থেকে ভবতোষ বললে,—কিন্তু তার জন্যে বাসায় একটা খবর দিতে নেই?

মৈত্রেয়ী মুখ নামাল। ভবতোষ এবার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে,—আচ্ছা যাও! কিন্তু এর জন্যে এতক্ষণ ঘাঁটাঘাটি করবার কি প্রয়োজন ছিল? এক কথায়ই কি সব ফুরিয়ে যেত না?

মৈত্রেয়ী উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। ভবতোষ বল্‌লে,—হ্যাঁ শোন, প্রতিদিন এমনি করে' বেরিয়ে যাওয়া আর তোমার চলবে না! ভদ্র ঘরের মেয়ে, ভদ্র ঘরের বউ তুমি! এমনি করে' ছুটোছুটি করা তোমার উচিতও নয়, শোভনও নয়! এতে লোকে ভাল বলে না এতটুকু!

—তাহলে কি গান বাজনা করতে তুমি আমায় নিষেধ কর?

—না, তা করিনে! গম্ভীরভাবে সে বল্‌লে।—কিন্তু তাও করতে হবে সীমা রেখে। সীমার বাইরে যেও না। এই শুধু বলে' রাখছি! আর এখন থেকে যখনই বেরুবে, বলে' যাবে প্রতিদিন আমার কাছে।

মৈত্রেয়ী স্বামীর প্রতি একটা রুক্ষ দৃষ্টি হেনে কোঠা থেকে বেরিয়ে গেল।

সে দিনটা গেল নির্ব্বিঘ্নেই। মৈত্রেয়ী সত্যি সত্যি বেরুল না। ভবতোষও ভাবলে, যাক্ এবার সে বেঁচেছে। অল্পেতেই সমস্ত কাজ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হোল। যে কাজ শত শাসনেও হবে না ভেবেছিল, তা হোল একদিনেই! এতে করে' মনে মনে শান্তি তাদের না হোক, বাইরে, অর্থাৎ সংসারে অন্ততঃ শান্তি ফিরে আসবে আগের

মতই। সেই একঘেয়ে জীবন চললেও, নিত্য নূতন ঝঞ্ঝাট আর থাকবে না।

কিন্তু মৈত্রেয়ী গড়ে' তুলছিল ঠিক তার উল্টোটা। মনে মনে পাকিয়ে তুলছিল, এ সংসার ভাঙবার অভিসন্ধি! আজ সে বেরুল না সত্য, কিন্তু সারাদিন রইল গুমোট ধরে'! ঠিক ঝড় নেমে আসবার পূর্ব্বক্ষণটির মত। কেবল সে ভাবছে, শত সহস্র ভাবনা জুড়ে বসেছে তার মনের ভেতর!...হ্যাঁ, এ সুযোগই সে খুঁজছিল এতদিন ধরে! ঠিক এমনি সুযোগ! স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ, এতটুকু বাধা! স্বামীর উপর মন আজ তার একেবারে বিষিয়ে গেছে। যেটুকু মমতাও এতদিন ছিল, তা গেছে আজ নিঃশেষে মুছে! এমনি করে' চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন, জীবনে আজ এই প্রথম তার। এ সে বরদাস্ত করবে না কিছুতেই!

পরদিন বন্ধ জেনেই অমিতাভ আবার এল দুপুর বেলা। কি, কাল গেলে না যে গানে!

এতক্ষণ মৈত্রেয়ী এ সময়টুকুর জন্যেই আকুলভাবে অপেক্ষা করছিল। গম্ভীরভাবে বল্‌লে,—শরীরটা ভাল ছিল না, তাই!

—কিন্তু সবাই তোমার জন্যে বসেছিল। হিমাংশু, অসিত, লীলা, কমলা সবাই গাইলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমার দেখা আর মিল্‌ল না। লীলা আর অসিতের ড্যান্সও হয়েছিল কাল চার্মিং!

মৈত্রেয়ী পূর্ব্ববৎ গম্ভীর। অমিতাভ বল্‌লে,—কালকে আবার একটা চ্যারিটীর আয়োজন করেছি। সবাই নাচবে গাইবে সম্মত হয়েছে। তোমাকেও কিন্তু তাতে যোগ দিতে হবে। বিশেষ করে' তোমার নাচটাই এড্‌ভারটাইজ করা হয়েছে বেশী করে'। কেমন তুমি রাজি ত? আমি কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে আগে হতেই তাদের কথা দিয়ে এসেছি!

মৈত্রেয়ী তেমনি গম্ভীরভাবে ডাকলে,—অমিতাভ!

—একি, তুমি আজ হঠাৎ এতটা গম্ভীর যে? চকিত হয়ে অমিতাভ বল্‌লে।

—নাচ এখন থাক, তুমি আগে সব ঠিক কর!

—কিসের? আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে সে।

—আমি যাব, সংসার আমার পক্ষে এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে!

—সে কি? আনন্দে চোখ দু'টো তার জল-জল করে' উঠল।

—তুমি সব প্রস্তুত কর, আমায় নিয়ে যাও এখান থেকে!

—যাবে তুমি তাহলে? সানন্দে অমিতাভ বললে,—কিন্তু যে কথা বলেছিলে, তার কি হয়েছে কিছু?

—হ্যাঁ, কালই সব বোঝাপড়া হয়ে গেছে!

—কি বল্‌লে সে?

—সে যাই হোক, পরে সব শুনতে পাবে! আগে তুমি সব ঠিক কর।

একটু ভেবে অমিতাভ বল্‌লে,—কিন্তু দু'টো দিন তোমায় সবুর করতে হবে লক্ষ্মীটি; আমি এদিকে চট করে' সবটা সেরে নি!

—আবার দু'দিন! অধৈর্য্য হয়ে মৈত্রেয়ী বল্‌লে।

অমিতাভ বল্‌লে,—হ্যাঁ দুদিন, লক্ষ্মীটি অধৈর্য্য হয়ো না! শুধু দু'দিন লাগবে! আর নাচটাও যখন তোমার এড্‌ভারটাইজ করা হয়েছে, কথা দিয়েছি, তখন সেটাও এ ফাঁকে সেরে নেওয়া যাক্! তারপর একদিন...

—কিন্তু নাচের কথা কি এখন ফেরান যায় না? আমার মন আর এখানে এক মুহূর্ত্ত টিকছে না!

—না, ছিঃ, কথা দিয়ে কি আর কথা ফেরান যায়? নাচতে তোমাকে হবেই! লক্ষ্মীটি কষ্ট করে আর দু'টো দিন সবুর কর। তারপরই দেখবে, একদিন সংসার হয়ে উঠবে সুখের!

শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়েই মৈত্রেয়ীকে অমিতাভের কথা মেনে নিতে হোল। কিন্তু মনের গুমরো ভাব আর কাটল না এতটুকু। আর এক মুহূর্ত্তও এ-সংসারে তার মন টিকছে না; কেবল করছে পালাই-পালাই! তবু...কথা যখন দেওয়া হয়েছে সবাইকে, তখন থাকতেই হবে। মনকে অনেক করে' সে বেঁধে রাখলে!

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে ভবতোষ সরাসরি মৈত্রেয়ীর কাছে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা

রঙীন কাগজ বের করে' সামনে খুলে ধরে' বল্‌লে,—পড়ে দেখ ত ?

মৈত্রেয়ী মুহূর্ত্তে একবার চোখ বুলিয়ে পরক্ষণেই নামিয়ে নিল। ভবতোষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে,—এ কি তোমার মত নিয়ে করা হয়েছে ? এ বিষয় তুমি জানতে আগে ?

মৈত্রেয়ী নীরব ভবতোষ বল্‌লে—কি চুপ করে' রইলে যে ?

হ্যাঁ, আমি শুনেছি !

—শুনেছ ? ভবতোষের কপালটা কুঁচকিয়ে এল : অথচ বারণ কর নি ?

মৈত্রেয়ী আবার নীরব। ভবতোষ বল্‌লে,—এমনি সহস্র চক্ষুর মাঝখানে তুমি অবাধে নাচবে ?

—এমনি আরো আমি অনেক নেচেছি !

—নেচেছ কি নাচ নি তা আমি শুনতে চাই না ! ঝাঁজালো স্বরে সে বল্‌লে—আমি শুধু জানতে চাই কালও তুমি নাচবে নাকি, নিছক বেহায়ার মত ?

—সেখানে শুধু আমি একাই নাচব না, আরো মেয়েরাও নাচবে !

—নাচুক ! ভবতোষ বল্‌লে,—কিন্তু তুমি নাচতে পাবে না ! বেহায়ার মত সহস্র চোখের মাঝখানে তোমায় নাচতে আমি দেব না।

রাগে মৈত্রেয়ীর সর্ব্বাঙ্গ এখন ফেটে যাচ্ছে ! তবু সে নীরবেই বসে' রইল। দু'দিন পরেই যার সাথে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হবে, তার সাথে অনর্থক বিতণ্ডা করে' আর লাভ কি ? এটুকু প্রাধান্য যদি সে খাটাতে চায়, খাটাক না ! তাতে ত তার ক্ষতি নেই কিছু !

ভবতোষ বল্‌লে,—সত্যি এতটা নির্লজ্জ তুমি, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এতগুলো লোকের সামনে কেমন করে' তুমি নাচতে রাজি হলে, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই ! লজ্জার মাথা কি তুমি একেবারেই খেয়েছ ?...তারপর যেতে যেতে বল্‌লে,—সাবধান তোমায় বলে' যাচ্ছি, এ যদি তুমি অমান্য কর, যদি নাচতে যাও, তাহলে শেষ পর্য্যন্ত ফল ভাল হবে না !

মৈত্রেয়ী একবার চোখ উঠিয়ে তাকাল। কিন্তু ভয়ের পরিবর্ত্তে মুখে ফুটে উঠল তার ব্যঙ্গের হাসি।

পরদিন অফিসে যাবার সময়েও ভবতোষ আবার একবার তাকে সাবধান করে' গেল। যেন সে কিছুতেই না যায় ! যদি যায় তাহলে তার সাথে একেবারে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হবে, এর আভাষও তার ভেতর প্রকাশ পেল খানিকটা ! কিন্তু মৈত্রেয়ী তাতে টুঁ শব্দটীও করলে না। কারণ, যাবে যে সে ত তার ঠিকই ! না যেয়ে কি তার উপায় আছে ! এতগুলো লোককে কথা দিয়েছে যখন···তার উপর, অমিতাভের কথা !

দুপুরে তখন একটা হবে ! অমিতাভ ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে এল। আজ যে মৈত্রেয়ী কলেজে যাবে না, এ তার জানা ছিল আগে থেকেই ! কারণ, কোন একটা পারফরমেন্স হলে সাধারণতঃ যায় না সে ! বল্‌লে,—সব কিন্তু প্রস্তুত ! বহুলোক নিমন্ত্রিত হয়েছে ! তোমার ওকেও একটা কার্ড আমি পাঠিয়ে দিয়েছি অফিসে।

মৈত্রেয়ী মৃদু হেসে বল্‌লে,—ভালই করেছ, কিন্তু ও যাবে না !

—কেন ? অমিতাভও হাসলে একটু !

—এ নাচের উপর ওর ভীষণ রাগ। আমি যে নাচব আজ এটাও বরদাস্ত করতে পারে নি। যাবার সময়ে বার বার করে শাসিয়ে গেছে, যেন আমি না যাই।

—তা হলে...অমিতাভের মুখ শুকিয়ে এল।

—সে কি, ভয় পেয়ে গেলে যে ? মৈত্রেয়ী হাসলে একটু ! ওর এ একটা সামান্য কথাই আমি মানব নাকি ? তেমনি মেয়ে আমি নই ! একটা কথায়ই ভড়কে যাব, অতটা অবনতি এখনো আমার হয় নি।

—তাহলে ঠিক সময়ে যাবে ত ? দেখো, শেষে কিন্তু—অর্থাৎ বহুলোক নিমন্ত্রিত হয়েছে, তাদের কাছে যেন শেষটা অপদস্থ না হতে হয়।

—তুমি কি আমায় তাই ভাব ? চোখ বেঁকিয়ে একটা ভঙ্গী করে' মৈত্রেয়ী বল্‌লে।

—না, না তা ভাব কেন ? ব্যস্ত হয়ে অমিতাভ বললে,—তোমাকে ভাল করে জানি বলেই, তোমার মত না নিয়েও নির্ভয়ে সবাইকে আমি নিমন্ত্রণ করতে

পেরেছি।...একটু থেমে বল্লে,—তা তোমার স্বামী যদি না যায়, নাই বা গেল! তাতে আমাদের কি এমন এসে যাবে! কি বল?

—তাই ত! মৈত্রেয়ী হাসলে: ও না গেলে কি হবে আমাদের? আর ওর সাথে সম্বন্ধই বা কদিন! আজ আছে ত কাল নেই! দু'দিন পরেই যাবে সব ফাঁস হয়ে!

মুচকে হেসে অমিতাভ বল্লে,—হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা প্রায় আমি করে' এনেছি। কাল একবার বাড়ী যাব, পরশু, তরশু ফিরলেই তারপর একদিন···

—হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি হয়। মৈত্রেয়ী বল্লে,—সেটার দিকেই এখন তুমি মন দাও বেশী! এখানে আর এতটুকু ভাল লাগছে না, বেরুতে পারলে যেন আমার গঙ্গাস্নানের ফল হয়।

—বল্লুম ত আর দু'দিন মোটে, দু'টো দিন আর কষ্ট করে' ধৈর্য্য ধরতে তোমায় হবেই।

—আচ্ছা, আচ্ছা সে আমি পারব। মৈত্রেয়ী হাসলে। কিন্তু দেখো তার বেশী যেন দেরী না হয়!

—আচ্ছা। অমিতাভ যেতে যেতে হেসে বল্লে,—এ বিষয় গরজ তোমার চেয়ে আমার এতটুকু কম নয়, তোমার জন্যে যে আমি পাগল হয়ে গেছি! দেখবে, ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হবো। কথার নড়চড় হবে না এতটুকু। কিন্তু দেখ, ঠিক সময়েই যেও যেন, সন্ধ্যার আগে।

মৈত্রেয়ী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

তিনটে বাজতে তাই সে ঠিক হয়ে নিচ্ছিল। স্বামী ফিরে আসবার পূর্ব্বেই বেরিয়ে পড়তে হবে। এসে পড়লে আবার কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসবে, কে বলতে পারে। কিন্তু...

ড্রেস করা প্রায় তার শেষ হয়ে এসেছে, এখনি বেরিয়ে পড়বে, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। কিন্তু হঠাৎ সামনের প্রকাণ্ড আয়নায় ভেসে উঠ্ল ভবতোষের প্রতিবিম্ব। চমকে ফিরে তাকাতেই মুখ হয়ে গেল তার ফ্যাকাশে। সর্ব্বনাশ! যার জন্যে এত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলে, তাই তার নষ্ট হয়ে গেল সমস্ত!

কিন্তু সে দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তের জন্যে; পরক্ষণেই নিজেকে সে ঠিক করে' নিলে। আসন্ন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলে। না, পরাজয় সে কিছুতেই মেনে নেবে না।

কপাল কুঁচকিয়ে গম্ভীরভাবে ভবতোষ বল্লে,—কি, তা হলে তুমি যাবেই নাকি?

—হ্যা, যেতে হবে।

—আমার কথা, আমার নিষেধ তাহলে কিছুই নয়?

—কিছু নয় বলি নে, কিন্তু সে আহ্বানও আমি উপেক্ষা করতে পারি নে। সমানে উত্তর যোগাচ্ছে মৈত্রেয়ী। তীরের উত্তরে তীর তাকে নিক্ষেপ করতে হবে সামনে।

ভবতোষ বল্লে, তাহলে যাবেই?

—হুঁঃ, যেতে হবে।

—তুমি এতটা বেড়েছ?

মৈত্রেয়ী নীরব। ভবতোষের বুক তখন স্ফীত হয়ে উঠেছে। এত করে' নিষেধ করা সত্ত্বেও তোমার সাহস দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি! বেহায়া-পনারও কি একটা সীমা নেই?

—নিষেধ বাধারও একটা সীমা আছে। মৈত্রেয়ী সটান হয়ে দাঁড়াল। তুমি কি তাহলে বলতে চাও, কথা দিয়ে এতগুলো লোককে আমি অপমান করব?

—তা আমি জানতে চাইনে! মান অপমান যাই হোক্, আমি শুধু তোমায় বলে' রাখছি, তুমি আজ যেতে পারবে না।

—আমাকে আজ যেতেই হবে।

—তোমার ইচ্ছে মত?

—যার যার কাজে ইচ্ছে তার নিজেরই থাকে।

—মৈত্রেয়ী, বড় বাড়াবাড়ি করছ তুমি!

—বাড়াবাড়ি আমি করি নি, বাড়াবাড়ি করছ তুমি!

—মৈত্রেয়ী! ঝাজাল স্বরে ভবতোষ বলে' উঠল। মাথা দিয়ে তার আগুন ছুটেছে!

—ছাড়, পথ ছাড় তুমি! মৈত্রেয়ী এগিয়ে এল। তোমার সাথে তর্ক করবার এখন আমার সময় নেই!

—তা থাকবে কেন? ভবতোষ পথ না ছেড়ে আরো জুড়ে দাঁড়াল। সময় হবে হাজার হাজার লোকের সামনে নিজের রূপের ছটা দেখাবার।

—তুমি পথ ছাড়বে না?

—না, দেব না যেতে। এমনি করে' অসভ্যের মত ছুটোছুটি আজ বন্ধ করব। সম্মান বলে তোমার কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। বেশী বাড়াবাড়ি কর না, তাতে ফল ভাল হবে না শেষ পর্য্যন্ত।

—কেন মারবে নাকি তুমি! চোখে মুখে মৈত্রেয়ীর ব্যঙ্গের রেখা ফুটে উঠ্‌ল।

হ্যাঁ, মারব! ভবতোষ প্রায় চীৎকার করে' উঠল। আরো বাড়াবাড়ি করলে তাতে আমি কুণ্ঠিত হবো না। ইতরতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাব আজ!

—তুমি সরে' দাঁড়াও, অসভ্য, জানোয়ার! সহসাই গায়ের সমস্ত শক্তিতে মৈত্রেয়ী ভবতোষকে এক ধাক্কা দিয়ে নিজে বেরিয়ে গেল। ভবতোষ প্রস্তুত ছিল না, মৈত্রেয়ীর এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে। তাই হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে একেবারে পড়ে' গেল।

মৈত্রেয়ী যেতে যেতে বল্‌লে—যার যার সম্মানবোধ সে তার :নিজের কাছেই থাকে, অন্যের কাছে কেউ তা ধার নিতে যায় না। একথা সকলেরই বুঝে চলা উচিত।

ভবতোষ মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু বল্‌লে না কিছু। প্রবৃত্তি হোল না তার। ঘৃণায় রাগে সারা মন তার বিষিয়ে গেছে। ছিঃ ছিঃ; কুলটার মত...মৈত্রেয়ীকে একটা বারাঙ্গনার সাথে তুলনা করতেও সে দ্বিধা করলে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, মৈত্রেয়ীর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করবে, জীবনেও বলবে না আর কথা। যেন মর্ম্মে মর্ম্মে সে তার কৃতকর্ম্মের শাস্তি অনুভব করতে পারে।

কিন্তু ভগবানের মনের ইচ্ছা বুঝে উঠা মানুষের সাধ্যাতীত। কখন কি হয় বলা যায় না। কোন কারণ নেই, অথচ সেই দিন রাত্রিতেই সে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হোল। উঠে বসবার সামর্থ্য রইল না। পরদিন প্রাতে মাথার যন্ত্রণা হয়ে উঠ্‌ল অসহ্য। কিন্তু উপায় কি! শুধু চাকর দাসী ছাড়া অন্য লোক আর নেই সংসারে। মৈত্রেয়ী কাল রাত্রিতে আর ফেরে নি, কোথায় গেছে তা সেই জানে। আর থাকলেই বা তাতে লাভ কি! তার কাছ থেকে কিছু একটা আশা করাও যে বাতুলের কল্পনা। আর করলেও সে তা নেবে কেন! কালকের সেই মর্ম্মান্তিক ব্যবহার, তার পর সেই প্রতিজ্ঞার কথা ত সে ভুলে যেতে পারে নি, তাই শুধু চাকর দাসীর উপরেই নিজের সমস্ত ভার ন্যস্ত করে' ক্ষান্ত হোল।

বিকেল পর্য্যন্তও যখন মৈত্রেয়ী ফিরল না, অথচ ভবতোষের যন্ত্রণা গেল সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে, তখন বাড়ীর পুরান চাকর আর স্থির থাকতে পারলে না। সে জান্‌ত, কোথায় কোথায় মৈত্রেয়ী সাধারণতঃ যায়, তার সাথে অনেক দিন সে গেছে। তাই বাবুর সমস্ত ভার দাসীর উপর ন্যস্ত করে' ছুট্‌ল সে তারই খোঁজে। কিন্তু চার পাঁচটা বাসা খুঁজেও সে তার সন্ধান পেলে না। নিরাশ হয়ে ফিরেই আস্‌ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে হোল মৈত্রেয়ীর নূতন এক বন্ধু কনকের কথা। অমনি আবার ছুট্‌ল সেখানে, কিন্তু সেখানেও পেলে না! এদিকে বাবুর অবস্থা ভেবে চোখে তার জল এসে গেল।

কনক এগিয়ে এসে বল্‌লে, হঠাৎ যে তোমাদের ঠাকুরাণীর এত জরুরী তলব পড়্‌ল?

—বাবুর যে বড় অসুখ, মা! বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। চাকর প্রায় কেঁদে ফেল্‌লে। মা যদি এখানে আসেন, আপনি অনুগ্রহ করে বলবেন তাকে!

—আচ্ছা বলব'খন, যা!

—আসা মাত্রই যেন পাঠিয়ে দেন!

অলক্ষে হেসে কনক বললে,—আচ্ছা, আচ্ছা, বললুম ত!

—বড় অসুখ মা! চাকর বললে,—মাথার যন্ত্রণা...

—অসুখ! কি অসুখ রে তারণ? শঙ্কিত মুখে সামনে এসে দাঁড়াল মৈত্রেয়ী! কনকের মুখ মুহূর্ত্তে হয়ে গেল এতটুকু!

—এই যে মা আপনি। তারণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, চলুন মা, বাবু বোধ হয় আর বাঁচবেন না।

—কেন, কি অসুখ হয়েছে তার? মৈত্রেয়ী বিহ্বলের মত হয়ে গেছে।

—জ্বর!

—ওঃ জ্বর! কনক হেসে উঠল হাল্‌কা হাসি: যা বলগে, এখন ও যেতে পারবে না।

—কিন্তু মা জ্বর যে বড্ড বেশী দাঁড়িয়েছে, পাঁচ'ডিগ্রী

উঠেছিল! মাথা উঠাতে পারছেন না, চীৎকার করছেন যন্ত্রণায়!

—চীৎকার করছেন, তার ও গিয়ে কি করবে? ও ত আর কমিয়ে দিতে পারবে না!

—তবু সামনে থাকলে বাবু একটু শান্তি পাবেন!

মৈত্রেয়ী তখনো বিহ্বল, স্তব্ধের মত। কনক বল্‌লে, না যা তুই, ওর এখন যাওয়া হবে না।

—কিন্তু মা...তারণ করুণ করে' তাকাল মৈত্রেয়ীর মুখের পানে: মাথার যন্ত্রণা বাবুর একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। আপনি কাছে থাকলে...

রুক্ষস্বরে কনক বললে, তুই শুনতে পাসনে তারণ, বার বার যে প্যান প্যান সুরু করেছিস্? মৈত্রেয়ীর ব্যবহারে যেটুকু সে অপমানিত হয়েছে, তা এখন উসুল করে' নিতে চায়!

—চলুন মা, আর দেরী করবেন না! তারণ কনকের কথা গ্রাহ্য না করে' বল্‌লে।

মৈত্রেয়ী কনকের মুখের পানে একবার তাকাল। তারপর সেই বিহ্বলের মতই বল্‌লে, না তারণ এখন যাওয়া আমার সম্ভব নয়।

—হ্যাঁ, কোথায় যাবি তুই? কনক মৈত্রেয়ীর একখানা হাত চেপে ধরলে: যা বল্‌গে তোর বাবুকে, যে মৈত্রেয়ী তার সেবাদাসী নয় যে যখন খুসী তখনই···

—ছিঃ, কণক! মৈত্রেয়ী ধমকের স্বরে বলে' উঠল: কার কাছে কি বলিস্ তুই? এতটুকু বুদ্ধিও তোর নেই? পাত্র অপাত্র বুঝিস্ না?

কনক বোকার মত দাঁড়িয়ে গেল। হাত ছাড়িয়ে মৈত্রেয়ী ত্রস্তে এগিয়ে এল। নে তারণ তাড়াতাড়ি চল, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করিস নে! রাস্তায় নেমে বল্‌লে, বাবুর অসুখ কি সত্যি সত্যি খুব বেড়েছে?

—হ্যাঁ মা, রাত্রে হঠাৎ জরটা এসে গেল। পাঁচ ডিগ্রী উঠেছিল।

—তাহলে প্রাতে কেন আমায় ডাকতে এলি নে? সত্যি তুই একটা আস্ত গাধা! অসুখ হয়েছে আর সারাদিন বসে রয়েছিস চুপ করে!

—আমি ভাবলুম বুঝি আপনি এসে পড়বেন! কাচুমাচু করে তারণ বল্‌লে।

—হ্যাঁ, এসে পড়্‌ব! ভেংচিয়ে মৈত্রেয়ী বল্‌লে, কেমন করে জানব আমি?

ন্যায্য পাওনা ভেবে তারণ এবার মাথা নত করলে। মৈত্রেয়ী বল্‌লে,—বাবু এখন খুবই ছটফট করছে, নারে?

—হ্যাঁ মা, চোখ একেবারে লাল হয়ে গেছে!

—মাথা ধুইয়ে দিয়েছিলি?

হ্যাঁ, দু'বার দিয়েছি।

—ডাক্তার এনেছিস কাকে?

তারণ আবার কাচুমাচু করছে। সে বলেছিল কয়েকবার, কিন্তু ভবতোষই দেয় নি আনতে।

মৈত্রেয়ী প্রায় আর্ত্তনাদ করে' উঠল। ডাক্তার আনিস্ নি? হতভাগা কোথাকার! পাঁচ ডিগ্রী জর ডাক্তার আনে নি! শেষ দিয়ে গলাটা তার ভয়ানক ভাবে কেঁপে গেল। নে, শিগ্‌গীর ডাক ঐ গাড়ীটাকে দামাদামী করিসনে, যা চায় তাদিয়েই নিয়ে আয়! মাথা এখন তার ঝিম্ ঝিম্ করছে।

বাসায় এসে যখন পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা গেছে উত্তীর্ণ হয়ে। ভবতোষের ছটফটানি তখনো একেবারে কমে যায়নি। মৈত্রেয়ী ত্রস্তে জরের উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে,—যা শিগ্‌গীর ডেকে নিয়ে আয় অবিনাশ ডাক্তারকে, বল্‌গে এখনি যেতে হবে।

—না, ডাক্তার লাগবে না আমার। ভবতোষ চোখ খুলে বললে।

—যা তারণ, অনর্থক দেরী করিস নে। এখনি সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বি!

—লাগবে না যে বললুম! তোমার ইচ্ছে মত ডাক্তার আসবে নাকি?

তারণ ততক্ষণে চলে গেছে। মৈত্রেয়ী ধীর স্বরে বল্‌লে,—তুমি এখন চুপ কর। ডাক্তার তোমার জন্যে আসবে না, আসবে আমার জন্যে।

ভবতোষ একবার তাকাল ছলছল করে; কিন্তু আর বল্‌লে না কিছু, পাশ ফিরে শুল।

সে রাত্রি গেল, তার পরের দিনটাও, মৈত্রেয়ী সমানে

স্বামীর সেবা করে' যাচ্ছে। এতটুকু ক্লান্তি নেই বা এতটুকু আলস্য নেই। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে স্বামীর পানে একেবারে ফিরেও চায় নি, তারই পাশ ছেড়ে এখন সে নড়তে চায় না। খাওয়া দাওয়ার পাট একরকম উঠেই গেছে। নিদ্রাও যেন বিদায় নিয়েছে তার থেকে। এখন এমন একটা শ্রী হয়েছে, যা দেখলে লোকে তাকে পাগল ছাড়া কিছু মনে করে না। তার সে উগ্রতেজ কিসের আঘাতে যেন মিশে গেছে একেবারে।

কিন্তু দু'টো দিন যায়...নীরব...একটি কথাও তাদের হয়নি। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞেস করেছে প্রথম প্রথম দু'একটি কথা, কিন্তু উত্তর না পেয়ে সেও গেছে চুপ করে'। একটা বিশ্রী কঠোর নীরবতা বিরাজ করছে উভয়ের মাঝখানে। মৈত্রেয়ী যাচ্ছে নীরবে স্বামীর সেবা করে', ভবতোষও নীরবেই গ্রহণ করছে না! তার কথা যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, বাক্যালাপ আর কিছুতেই করবে না।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ কেটে গেছে, বাইরে উঠেছে জ্যোৎস্না। মৈত্রেয়ী তখনো বসে আছে স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে থাম ধরে'। বাইরে জ্যোৎস্নার বান ডাকলেও, তার সারা বুক গেছে অন্ধকারে কালিয়ে। কত কথা যে ভাবছে তার অন্ত নেই। দুইদিকে তার দুইজন। একদিকে স্বামী, অন্যদিকে অমিতাভ। কে বড়! একদিকে দুর্ব্বলতা...অবৈধ প্রেম...একদিন তা পবিত্র থাকলেও আজ অবৈধ বই কি! অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রীর স্নিগ্ধ সুদৃঢ় বন্ধন! প্রেমের অটুট শিকল, মধুর রসে সিক্ত!

দাসী খাবার রেখে বেরিয়ে গেল। মৈত্রেয়ী উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—এই যে খাবার, নাও!

ভবতোষ ফিরে শুল কিন্তু একটি শব্দও করলে না। মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে খাইয়ে টেবিলের উপর কাপটা রেখে দিল। তারপর খাবার এনে বস্‌ল স্বামীর পাশে।

ঘণ্টা দুই কেটে গেল কিন্তু উভয়েই নীরব; একেবারে মূক! ভবতোষ ফিরে শুয়ে আছে, মৈত্রেয়ীর বুকের ভেতরটা উঠছে ফুলে' ফুলে'। অন্যান্য দিনের চেয়ে সেই নাচের দিনের কথাটাই তার মনে পড়ছে বেশী করে। যতই ভাবছে, ততই শির্ শির্ করে' উঠছে বুকটা।

পরদিন আহার সেরে' মৈত্রেয়ী আবার যখন এসে বসলে, তখন বেলা একটার মত হবে। হয়ত মিনিট দশেক, তারপর হঠাৎ ভবতোষ ফিরে শুল এদিকে। একটু চুপ থেকে বল্‌লে,—একটা কথা আজ তোমায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই মৈত্রেয়ী!

সহসা মৈত্রেয়ী চমকে উঠল একেবারে; কেঁপে উঠ্‌ল বুকটা। ভবতোষ বল্‌লে,—অনর্থক এ ছিনি-মিনি খেলে আর প্রয়োজন নেই। আমি অনেক ভেবে দেখলেম, কিন্তু যা আর কিছুতেই সম্ভব নয়, তা দিয়ে তোমাকেও আর আমি আটকিয়ে রাখতে চাই নে, নিজেকেও ভুলাতে চাইনে দিনের পর দিন।

মৈত্রেয়ী নীরব, কিন্তু বুকের কম্পন এবার যেন একটু বেশী করেই অনুভূত হোল। ভবতোষ বললে, বিয়ে আমাদের হয়েছে সত্য, কিন্তু আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি, এ মিলন হয়নি তোমার মনের মত। আমি এতদিন বুঝতে পারি নি, তাই বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙেছে; তোমাকে আমি আর আটকিয়ে রাখব না। ইচ্ছে করলে কালই তুমি বাপের বাড়ী চলে যেতে পার, কিম্বা যেখানে খুসী যাও, আমি আপত্তি করব না। তোমার নাচগানেও বাধা দিব না এতটুকু।

মৈত্রেয়ী তথাপি নীরব। ভবতোষ আবার বল্‌লে, মিলন যেখানে সুখের নয়, তার জের টেনে অনর্থক লাভ নেই কিছু। এখানে যে তুমি হাঁপিয়ে গেছ, তাহা বেশ বুঝেছি। আমিও যে তোমার ব্যবহারে সুস্থ রয়েছি, তা নয়। তাই এ সম্বন্ধ ছিন্ন করতে না পারলেও, এখন ছাড়াছাড়ি আমাদের নেহাৎই প্রয়োজন: এই দুদিন অসুখে তুমি আমার খুবই করেছ, তা আমি অস্বীকার করিনে! কিন্তু এও যে তোমার সাময়িক খেয়াল, তাও আমি ভাল করে'ই জানি। সুস্থ হয়ে উঠলেই আবার ধরবে তোমার পূর্ব্ব মূর্ত্তি। তাই অনর্থক দুদিনের জন্যে এ মিথ্যায় আমি নিজেকে ভুলাতে চাইনে।

হঠাৎ একফোটা উষ্ণ জল টপ্ করে' পড়্ল ভবতোষের গণ্ডে। চমকে উঠে বল্লে সে,—একি কাঁদছ তুমি?

—না কাঁদি নি। মৈত্রেয়ী ভাঙ্গা কণ্ঠে বললে: তুমি যত খুসী বল আমি প্রতিবাদ করব না।

ভবতোষ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। মৈত্রেয়ী বললে, কি, চুপ করলে কেন?

—মৈত্রেয়ী! ভবতোষের কঠোর কণ্ঠ মুহূর্ত্তে করুণায় ভরে' এল: তুমি কি সত্যি সত্যি...

—না তুমি বলে' যাও, যত খুসী আঘাত কর, আমি বল্‌ব না কিছু! যতটা আমি করেছি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে না দিলে তোমার চলবে কেন? কান্নায় মুখ তার বেঁকে এল।

—মৈত্রেয়ী, আমি ভুল বুঝেছিলাম! ভবতোষ একখানা হাত চেপে ধরলে: তুমি কেঁদ না, লক্ষ্মীটি।

কিন্তু মৈত্রেয়ীর কান্না এতে থেমে গেল না, উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল!

তারপর হয়ত মিনিট পাঁচেকের ব্যবধান। দু'জনেই চুপ। একটা অসহ্য গুমোট যেন জম-জম করছে। এমন সময়ে হঠাৎ দ্বারের সামনে এসে দাঁড়াল অমিতাভ। কিন্তু ভূত দেখলে যেমন লোক চমকে উঠে, সেও ঠিক তেমনি চমকে উঠে ছুটে পালাচ্ছিল, কিন্তু চকিতে মৈত্রেয়ী দ্বারের সামনে ছুটে এসে চীৎকার করে' ডেকে উঠ্‌ল,—অমিতাভ, যেওনা শোন!

অমিতাভ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকাল। মৈত্রেয়ী বল্লে,—এখানে এস, কোঠার ভিতর!

অমিতাভের চোখ লজ্জায় ভরে' গেছে, মুখ হয়ে গেছে এতটুকু। মৈত্রেয়ী জোর দিয়ে বল্লে,—এস!

—কিন্তু,···কিন্তু...তোমার স্বামী যে ওখানে! অমিতাভ জোর দিয়ে বল্লে।

—তা থাক, তুমি এস, ভয় নেই কিছু!

অমিতাভ তবু ইতস্তত: করছে: তুমি কি শেষটা আমায় বিপদে···

—এত ভীরু তুমি, আমাকে বিশ্বাস কর না? বলছি ভয় নেই, তবু তোমার দ্বিধা কিসের?

অমিতাভ এবার কোঠার ভিতরে এগিয়ে এল। ভবতোষ আশ্চর্য্য হয়ে গেছে, বিহ্বল! ইনি কে মৈত্রেয়ী?

মৈত্রেয়ী সেকথার উত্তর না দিয়ে বল্লে,—এখানে ওর কাছে তুমি ক্ষমা চাও, আমাকেও চাইতে হবে। সকলের অজ্ঞাতে যে পাপ আমরা করতে চলেছিলাম, তারই প্রায়শ্চিত্ত আজ করব।

অমিতাভ কপাল কুঁচকিয়ে তাকাল। মৈত্রেয়ী বল্লে যদি তোমার আপত্তি থাকে, আমি তোমায় অনুরোধ করব না। কিন্তু এটুকু জানিয়ে দিচ্ছি, ক্ষমা চাওয়া তোমার উচিত। পাপ আমি যথেষ্ট করেছি; তুমি করেছ অস্বীকার করতে পার না। তুমি ভুলিয়েছ পরস্ত্রীকে, আমি কামনা করেছি পর-পুরুষ তোমাকে। উভয়ের পাপই সমান, তাই ক্ষমা চাইতে হবে দুজনকেই।

ভবতোষ এতক্ষণে সমস্ত বুঝে গেছে। মৈত্রেয়ীর এতদিন এমনি ভাবের অর্থও তার কাছে আর অজ্ঞাত রইল না। কিন্তু আশ্চর্য্য, যেখানে তার রাগে ফেটে যাবার কথা, সেখানে আজ সে এতটুকু রাগতে পারলে না। মৈত্রেয়ীর এ পরিবর্ত্তন তাকে কেমনই যেন হাল্কা করে' দিয়েছে।

অমিতাভ দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধের মত। মৈত্রেয়ী বল্লে,—ভুল মানুষ মাত্রেই আছে। তুমিও করেছ, আমিও করেছি। তাই ক্ষমা চাইতে আমাদের লজ্জা নেই। আমি মেয়ে মানুষ, এতে অপরাধ যে আমারই অনেক বেশী, তা জানি; কিন্তু তুমিও নির্দ্দোষ নও। ক্ষমা আমি পাব কিনা জানি না; কিন্তু তুমি চাইলেই পাবে। এমনি না পাও, আমি তোমায় নিয়ে দেব।

অমিতাভ তখনো স্তব্ধ। ভবতোষ বল্লে—ছিঃ, মৈত্রেয়ী ভদ্রলোককে এমনি করে' অপমান কর না, ওকে যেতে দাও।

—আমি ত আটকিয়ে রাখি নি পথ, ইচ্ছে করলে তুমি যেতেও পার। কিন্তু পাপ যে তুমিও করেছ, তাই শুধু আমি জানিয়ে দিলুম। ক্ষমা চাওয়া না চাওয়া সে তোমার ইচ্ছে।

ভবতোষ বললে—ছিঃ, মৈত্রেয়ী তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!

হঠাৎ অমিতাভ চকিত হয়ে উঠল। সজোরে নিজেকে সে ঠিক করে' নিলে। না, ভবতোষবাবু বাড়াবাড়ি ওর হয় নি। সত্যি আমি অন্যায় করেছি। এতদিনেও যা আমি বুঝতে পারি নি, ও আজ আমায় তাই বুঝিয়ে দিলে। আপনি আমায় ক্ষমা করুন, সত্যি আমি ভুল করেছিলাম। মৈত্রেয়ী, তুমিও আমায় ক্ষমা কর।

—ছিঃ! লাফিয়ে উঠে মৈত্রেয়ী অমিতাভের হাত চেপে ধরলে। এ তোমার ভারী অন্যায়! আমার কাছে ক্ষমা চাও তুমি কোন হিসেবে! আমি কি তোমায় ক্ষমা করতে পারি? আর দোষী হিসেবেও যে আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। একটু থেমে বল্লে—তুমি আমার বড় ভাই, সর্ব্ব বিষয়ে আমার প্রণম্য, অতীতের সমস্ত স্মৃতি তুমি ভুলে যাও, আমিও ভুলেছি। আজ থেকে তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ছোট বোন, এই আমাদের সম্বন্ধ। আর যে পথ ছিল তোমার লুকিয়ে আস্‌বার, আজ থেকে তাই হোল উন্মুক্ত।

—অমিতবাবু আপনি বসুন! ভবতোষ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—সত্যি আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু হলেন। যদিও পূর্ব্বে এ সব আমি কিছুই জানতুম না, কিন্তু আজ শুনেও রাগতে পারি নি এতটুকু। আপনাদের হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন আমায় উচ্ছ্বসিত করে' দিয়েছে। আর মৈত্রেয়ী তোমাকেও...

সহসা মৈত্রেয়ী স্বামীর মুখ চেপে ধরলে। না আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পাবে না, কোনদিন না। ক্ষমা পাবার আমি উপযুক্ত নই। এতদিন মুখ বুজে ছিলে বলে'ই আমি এতটা বাড়তে পেরেছিলাম, কিন্তু শেষ দিকে যে শাসন সুরু করেছিলে তেমনি করেই চিরদিন আমায় বাধ্য রেখ।

তাণ্ডব

শ্রীকান্তীন্দু ভূষণ রায় চৌধুরী বি-এ

রুদ্র নাচে প্রলয় নাচন
　　তাণ্ডবেরই তালে তালে
কেন্দ্র দোলে সৃষ্টি মাঝে
　　দুল্‌ছে বুঝি মরণ দোলে।

রুদ্র তোমার নৃত্য মাঝে
　　মরণ দোলা দাও দুলিয়ে
রঙ্গে ভরা জগৎ মাঝে
　　কালোর তুলি দাও বুলিয়ে।

সাজাও কেন ধ্বংস কর
　　কেন তোমার এমন লীলা
জীবন দোলায় মরণ দোলা
　　রুদ্র তোমার একি খেলা।

কাঁপছে ধরা কাঁপছে সাথে
　　কেন্দ্র তাহার মৃত্যু টানে
ফণার ব্যথায় বাসুকি বা
　　নাড়ছে মাথা প্রলয় গানে॥

রুদ্র তেজে জ্বলছে রে আজ
　　দ্বাদশ রবি আকাশ মাঝে
ছুটছে আগুন ইরম্মদে
　　রুদ্র প্রলয় বিষাণ বাজে।

আসবে ছুটে আসবে ত্বরা
　　প্রলয়েরই কলোচ্ছ্বাসে
মৃত্যুরূপে প্রাণেশ আমার
　　লোপ ক'রে সব প্রলয় হাসে॥

উনবিংশ শতাব্দীর ডাচ্ শিল্প ও শিল্পী

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ

দেশের প্রকৃতি ও আব্‌হাওয়া দেশবাসীর চরিত্র ও মনের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। মানব-অন্তরের কোমলতা ও কাঠিন্যের বাহ্য আবেষ্টনী ও জীবন-যাপনের ভঙ্গীর দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইউরোপ-খণ্ডের মাঝে হল্যাণ্ড দেশটি নানাকারণে অন্যান্য দেশের চেয়ে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যময়।

হল্যাণ্ডের অবস্থিতিই এমনি যে কেবলমাত্র বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নয়, পরন্তু প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সর্ব্বদা লড়াই করিয়া এই দুনিয়ার বুকে তার ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখিতে হয়।

আধুনিক হল্যাণ্ড ও বেলিজিয়ামকে নেদারল্যাণ্ডস অর্থাৎ নিম্নভূমি বলা হয়। ঐদেশের অনেকটা অংশই সমুদ্রের সমতলাপেক্ষাও নীচু। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে অপার জলধিকে হটাইয়া খানিকটা স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছে। বিরাট্ প্রাচীর উঠাইয়া নেদারল্যাণ্ডবাসীরা শতাব্দী ধরিয়া এই ক্ষুব্ধ-ক্ষুধার্ত্ত বিপুল জলরাশির অন্তহীন আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এদের বিপদের শেষ এখানেই নয়। রাইন মিউজ প্রভৃতি নদী ও সমুদ্রের অসংখ্য খালের জলপ্লাবনের সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য এদের যে কাণ্ড করিতে হইয়াছে, তাহাও কম বিস্ময়কর নয়। এই বিপুল জলরাশিকে সারা দেশব্যাপী ছড়াইয়া নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য দেশময় খালের জাল বুনিতে হইয়াছে। যদিও ইহার প্রাথমিক কারণ ছিল ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য, কিন্তু পরে ইহা আশীর্ব্বাদের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল খনন কার্য্য কৃষি-বাণিজ্য যাতায়াতের সুগম তো করিয়াছেই, উপরন্তু ইউরোপের মাঝে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উর্ব্বর ভূমি ও অপূর্ব্ব সবুজ শোভা ও সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন সৃজন করিয়াছে। জীবনধারণের এই অশেষ প্রয়াস জাতিকে যেমন কর্ম্মপটু করিয়া তুলিয়াছে তেমনি জাগাইয়াছে একটা অনবদ্য জাতীয়তা বোধ, দিয়াছে একটা নিখুঁত অবিমিশ্র সহৃদয় পরিচয় তার ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনীর মধ্যেকার প্রত্যেকটি তৃণ-গুল্ম-লতা-ময়দান উদ্যান ও অরণ্যানীর। দেশের সঙ্গে এই নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিচয় রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে কবির ভাষায়, শিল্পীর তুলিকায়।

মার্কেন গৃহ-চিত্র (শিল্পী—ভ্যান ডার ভেলডেন)

একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ডাচ্ শিল্পীর শিল্পোপাদান দেশের বুকে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে—একদিকে অসীম বিস্তার নীলাম্বু বারিধির রুদ্র-তাণ্ডব নৃত্য; অপরদিকে ধ্যানমগ্ন

পর্ব্বতশ্রেণী, বিশাল বনানী, দীর্ঘ খালের সুতোয় গাঁথা সুবিস্তৃত সবুজ সমতল ভূমির মালার সারি, চিকুচক্রবাল চুমিয়া সংখ্যাহীন বায়ুর গতি-নিরূপণ-পতাকার পৎপতানি, মনোহর সাগরসৈকত, আবার সমুদ্রতটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৎস্যজীবির পরিচ্ছন্ন কুটীর-রচনা, এখানে সেখানে বিচিত্র বাগান, জেভার দ্বীপের অপূর্ব্ব নয়নমনোহর শোভা, শীতের বরফ-জমাট সাগরসৈকত, এ সবই শিল্পীর অন্তরে

উত্তর হল্যাণ্ডের অশ্বযান (শিল্পী—অটো এরেলম্যান)

খোরাক ও শিল্পদ্যোতনা জাগায়। এই প্রাকৃতিক কঠিন-কোমল সৌন্দর্য্য-সম্পদের পটভূমির উপর ডাচ্‌শিল্পীর প্রাণময়, নিবিড়, সম্পূর্ণ, সন্তর্পিত ও সজ্ঞান শ্রম ঢালার ফলেই হল্যাণ্ড আজ শিল্প হিসাবে ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশাপেক্ষা একটা বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ডাচ্ শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্যও জাতির গৌরবের বিষয়।

স্পেনিশ শিল্পী শিল্পশিক্ষার্থ ইতালীতে যায়। অবাস্তব শ্রেণীর ফরাসী শিল্প প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া নিরাশ করে। হলাণ্ডের প্রতিবাসী বেলিজিয়ামও যেখানেই আধুনিক ফরাসী শিক্ষারীতি অনুকরণ করিয়াছে, সেইখানেই সে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইতালীর সে জীবন্ত শিল্প-প্রেরণা আজকাল মৃতপ্রায়। জার্ম্মাণীর আধুনিক শুকনো শিল্পের হাড়ে প্রকৃত শিল্পের সাবলীল ভঙ্গিমার পরিচয় খুব কমই মেলে। কিন্তু ডাচ্ শিল্পের ক্রমোন্নতি ও বিকাশ কোথাও স্তব্ধ হয় নাই। প্রকৃতি কোন দিনই পুরাণো হয় না, শিল্পীর গভীর অন্তরুদ্দীপনায় নিত্য নূতন বেশে দেখা দেয়। স্বভাব-সন্তান সৌন্দর্য্যের চিরোপাসক ডাচ্-শিল্পীর শিল্প-নবীনতা তাই চির অম্লান। গভীর স্বজাতি-প্রীতি, দেশের প্রত্যেকটি জিনিষের—সমুদ্র-সরিৎ-পথ-ঘাট-মাঠ-বাট-পল্লী-সহর-মেঘের দল—এমন কি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ নিজস্বতার প্রতি নিবিড় অনাবিল অনুরাগ তার সমস্ত শিল্পের উপর একটা সহৃদয় আন্তরিকতার ছাপ ফেলিয়া যায় বলিয়াই তার সকল চিত্রাঙ্কনের বাহ্য রূপের অন্তরালে একটা সূক্ষ্ম রসস্পর্শ, একটা পরমের, সুন্দরের প্রাণময় অনুভূতি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠা লক্ষিত হয়। ইহাই শিল্পের প্রাণ, যাহা শিল্পকে কালের সকল বিরুদ্ধ অত্যাচারের মাঝেও চির অমর করিয়া রাখে। বাস্তবিকতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, হুবহু অনুকরণ, বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস অথবা রং বা অঙ্কনের পারিপাট্য কেবলমাত্র ছবির সবখানি নয়; স্বভাবশিল্পী বস্তুর অন্তরের সত্তাকে ছবির রূপ-রেখার প্রলেপের মাঝে এমনি করিয়া জীবন্ত করিয়া ফুটাইয়া ধরে, যে শিল্পের সকল সৌন্দর্য্য, বিলাসবিভ্রমের বাহ্য আবহাওয়া ভেদ করিয়া সহজভাবেই তাহা মানব-মনের সনাতন আনন্দকে উদ্রেক করিতে সমর্থ হয়।

ডাচ্ শিল্পী মভি, মেথু, মেস্‌দাগ, আর্টজ্ প্রভৃতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবিতে শিল্প-কলার এই পরিপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায়। বিষয়নির্ব্বাচনেও তাঁহাদের একটা সহজ নিপুণতা পরিদৃষ্ট হয়। নির্ব্বাচিত বিষয়-বস্তুর প্রাণকে কেন্দ্র করিয়া সময়োপযোগী পারিপার্শ্বিকতার সুকৌশল আরোপও অদ্ভুত। হল্যাণ্ডের দৈনন্দিন তুচ্ছ জীবন-প্রণালীর ভঙ্গীটী দক্ষ শিল্পীর তুলিকায় এমনিভাবে সহজ মুক্তি পাইয়াছে, যে

নিত্যকালের জন্য ইতিহাসের মতই উহা জীবন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। ভূমধ্যসাগরে ভাসমান মৎস্য-শীকার-ডিঙ্গির প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষমান পর্ব্বতোপরি উদ্‌গ্রীব নেপল্‌স্‌-বালকদের অপূর্ব্ব ছবিও আর্টজের অঙ্কিত গৃহাভিমুখী ব্যাকুল মেষবালকের চিত্রের সঙ্গে তুলনীয় হয় না; আবার এষ্ট্রেমেডুরার সমতলভূমির উপর গৃহ-প্রত্যাগামী মেষদলের পশ্চাতে আর্টজ-চিত্রিত মেষচালক এণ্টন মভির মেষচালক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ পার্থক্য কেবলমাত্র পোষাকে-পরিচ্ছদের নয়, তার চেয়েও নিবিড়তর, সূক্ষ্মতম—যাহা অধরা থাকিয়া যায় তাদের কাছে যারা শুধু চিত্রের বাহ্য রূপটা ফুটানই ছবির সবখানি মনে করে। আধুনিক ডাচ্‌-শিল্পী বা যাঁদের ছবি এখানে দেওয়া হইল, তাঁদের অধিকাংশেরই দেশের আকৃতি-প্রকৃতি ও আব্‌হাওয়ার সঙ্গে একটা নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, বছরের সর্ব্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যহীন দিনেও তাঁরা পাইতেন একটা সৌন্দর্য্যের অনুভূতি; হেমন্তের কুয়াসা-ঘেরা জল-স্থলের করুণ দৃশ্য—যেন ক্রন্দনরতা প্রকৃতি—শিল্পীর অন্তরে যেমনি জোগাইত একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্যপ্রেরণা, তেমনি করিয়াই শিল্পীর মনকে প্রবোধিত করিয়া তুলিত সঙ্গীতময়ী বাসন্তী-রাত্রির হারলেমের বনানীর নৈসর্গিক স্বপ্ন-ছবি। অর্ব্বাচীন ডাচ্‌-শিল্পীর জল-স্থলের চিত্রাঙ্কন-পটুতা অসাধারণ। সমুদ্র-তীরের বসবাস-প্রণালী ও দেশের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের পটভূমি শিল্পোপাদানের অফুরন্ত আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপন দেশের অফুরন্ত-সম্পদ্‌ময়ী প্রকৃতির কোলে বসিয়া ডাচ্‌ শিল্পী তার শিল্প রচনা করে বলিয়াই হল্যাণ্ডের মত অবিমিশ্র অকৃত্রিম পবিত্র জাতীয় শিল্প অন্যত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

সীবন বিদ্যালয় (শিল্পী—জি, হেঙ্কস)

যে সকল ডাচ্‌-শিল্পীর শিল্প-পরিচয় এখানে দেওয়া হইল তাঁদের অনেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এণ্টন মভির নিবাস ছিল জানদামে। বিশেষ, গো-মেষের ছবি অঙ্কনে তাঁর তুলনা মেলে না। স্বদেশের বাহিরে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মভির ছবি সবিশেষ আদৃত। রেখা ও বর্ণ-বিন্যাসে তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ। হল্যাণ্ডের ভাবের সঙ্গে যে মভির কতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা তাঁর ছবিতেই বুঝা যায়—যেন হল্যাণ্ডের অন্তর-বাহির জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মভির ছবিগুলি একান্ত স্বাভাবিক—চিত্তাবেগ-রঞ্জনার লেশমাত্র নাই। প্রেক্ষা-গৃহের চিত্রের মত রংয়ের অতি-প্রাচুর্য্য নাই অথচ ছবির স্বাভাবিক বাহ্য ব্যঞ্জনা ঐশ্বর্য্য-ময়ী। অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ, রসিক অরসিক নির্ব্বিশেষে উহা একটা আনন্দের শিহরণ তুলে। হারলেমে—যেখানে হল্যাণ্ডের সত্যিকারের সহজ জীবনাভিব্যক্তি এখনও অবিমিশ্র আছে বা জাতীয় ভাবসংস্পর্শে কোন কৃত্রিমতা পায় নাই—তিনি যৌবনে বিখ্যাত চিত্রকর পি, এফ্‌, ভন

ত্যসের নিকট শিল্পবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এণ্টন মভি মারা যান। তাঁর শূন্যস্থান আজও কেহ পূরণ করিতে পারে নাই।

ডেভিড আর্টজ্ ১৮৩৭ সালে হেগে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রখ্যাতনামা ডাচ্-চিত্রকর জোসেফ্ ইজরেলের অধীনে অঙ্কন বিদ্যা অধ্যায়ন করেন। শিল্প-চর্চ্চার জন্য ১৮৬৬-৭১ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্যারিসেও বাস করেন। ডাচ্-দৃশ্য ও মৎস্যজীবীর সহজ জীবনাঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমেরিকায় তাঁর অঙ্কিত ছবির কদর অত্যন্ত বেশী, প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এইগুলি নিঃশেষে বিক্রীত হইয়া যাইত। এখনও আর্টজের অনেক ছবি সেখানে দৃষ্ট হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি উনিও মারা যান।

শীতকাল (শিল্পী—লুই এপোল)

শিল্পী ভারভীয়ার আর্টজের মৃত্যুর দুই বছর আগেই লোকান্তরিত হন। তিনি তাঁর ভ্রাতার ছাত্র ছিলেন। ভারভীয়ারের 'বৃদ্ধ তাতার' (old Tars) নামক একখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি সযত্নে হেগ মিউনিসিপাল ছবির গ্যালারীতে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁর সমসাময়িক শিল্পী মেসদানের সমুদ্রে 'সূর্য্যোদয়' ও 'তুফান' এবং মভির

ডি, এ, আর্টজ্, এলচ্যালন ভারভীয়ার, বি, জে, ব্লমারস্, ফিলিপ স্যাডি প্রমুখ বহু ডাচ্ চিত্রকরেরা অধিকাংশ সময়েই স্কেভেনিন্‌জেনে থাকিয়া শিল্প-চর্চ্চা করিয়াছেন। স্কেভেনিন্‌জেন সাগর-সৈকতের উপর স্বপ্ন-মাধুর্য্য-ঘেরা ছোট্ট একটি নগরী। নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-সম্পদের জন্য ইহাকে ডাচ্ অচ্‌টেণ্ড ও কেহ কেহ সাগর-প্রিয় শিল্পীর মক্কাও বলিয়া থাকে। এখানে গ্রীষ্ম-কালে সহস্র সহস্র যাত্রীর ভীড় হয়। মনোরম বিশাল বিস্তৃত সমুদ্র-তট, সুদৃশ্য প্রশস্ত বাঁধ, একদিকে চিরশ্যাম বিচিত্র-কূজন-মুখরিত মনোমুগ্ধকারী কানন-শোভা, অপর দিকে নীলাম্বুর কোলে কোলে দিকচক্রবাল আলিঙ্গন করিয়া সবুজ প্রান্তর—স্কেভেনিনজেন স্বমাধুর্য্যে মহীয়ান্, শিল্পী কবির অন্তরের চির-চাওয়া প্রিয় সম্পদ্।

বাঞ্ছিত বিশ্রাম (শিল্পী—ডবলিউ, কে, হ্যাক্কেন)

'সবুজ প্রান্তর' নামক ছবিও ভারভীয়ারের ছবির পাশেই মিউনিসিপালিটির গ্যালারীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বি, জে, ব্লমার্স উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সেভেনিনজেনে শিল্প-চর্চ্চায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শিল্পামোদীদের নিকট তাঁর ছবি বিশেষ প্রিয়। পল্লী-চিত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ব্লমার্সের অপূর্ব্ব বর্ণবিন্যাস-নিপুণতা শিল্প-জগতে সুপ্রসিদ্ধ। বিস্‌চপ তাঁর শিল্পগুরু ছিলেন।

শিল্পী ভেলডেন পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন এবং শেষ জীবন সেখানেই কাটান। তিনি ছিলেন জন্মশিল্পী, কাহারও নিকট ধারাবাহিক কোন শিল্প শিক্ষা করেন নাই। মার্কেন দ্বীপের গৃহ ও গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্রাঙ্কনে ভেলডেন বহুদিন ব্যাপৃত ছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার কৃতিত্বও যথেষ্ট।

উইলিয়ম ক্যারেল ন্যাকেন জীবজন্তুর, বিশেষ করিয়া অশ্বের ছবি অঙ্কন করিতে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ১৮৩৫ সালে ইনি হেগে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ডোনোইয়ের নিকট শিল্পশিক্ষা করেন। নরমাণ্ডিতেই ন্যাকেন অধিক সময়ে বাস করেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর অধিকাংশ ছবি আঁকেন। তাঁর শিল্প-কলায় ফরাসী প্রভাবের ছাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি হল্যাণ্ডে বা হল্যাণ্ডের বাহিরে বিশেষ জনপ্রিয়।

লুই এপোল উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের শিল্পী-দিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়সে ছোট ছিলেন। শীত ঋতুর দৃশ্যাঙ্কনে তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তাঁর অতি উৎকৃষ্ট দুইখানি ছবি আমষ্টার্ডাম গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। দুইখানিই বরফ দৃশ্য। হেগের মিউনিসিপাল গ্যালারীতে রক্ষিত তাঁর ছবিখানি উহার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তুহিনাবৃত হল্যাণ্ডের অপূর্ব্ব দৃশ্য অন্যত্র অদৃষ্টপূর্ব্ব। ডাচ্‌-শিল্পী বিচিত্র বরফপাতের দৃশ্যে স্বাভাবিক শিল্প দ্যোতনা পায়। রেস্‌ডেল, বার্কেম, ভন ডার নিয়ার প্রভৃতি প্রবীণ শিল্পিগণ শীতঋতুর হল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ পল্লী ও গার্হস্থ্যজীবনের নিখুঁত চিত্রটি তুলির আঁচড়ে ছবিতে প্রস্ফুট করিয়া ধরিবার জন্য সুবিদিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক ইউরোপীয় অনেক শিল্পীই শীতের বরফ-পাতের দৃশ্য বিষয়ক চিত্রাঙ্কনে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ফ্রান্সের পিসারো ও সিম্‌লের এই বিভাগে দক্ষতা ও প্রতিভা সর্ব্বজনপ্রশংসনীয়; এমন কি ডাচ্‌-শিল্পী ইয়ং-কিংয়ের চিত্রিত বরফ দৃশ্য এপোলোর চেয়েও উৎকৃষ্টতর।

সাথী (শিল্পী—অটো এরেলম্যান)

ফিলিপ স্যাডে ও ভেলডেনের জন্ম একই সালে এবং উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও প্রচুর। ভেলডেনের মত স্যাডেরও স্কেভেনিনজেন সাগর-সৈকত ছাড়া বিশিষ্ট কোন শিল্প-গুরু ছিল না। স্বীয় প্রতিভায় স্বভাবসৌন্দর্য্যের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াই সুসমঞ্জস চিত্রবিদ্যায় তিনি পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে স্যাডের ছবির আদর যথেষ্ট।

হেগের অনতিদূরে ডুরবার্গে জি হেংকসের বাস। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডেলক্‌সেভেন নামক এক নিরালা পল্লীতে তাঁর জন্ম। স্পীস তাঁর শিল্পের দীক্ষাগুরু।

শিল্পী অটো এরেলম্যান অশ্ব ও সারমেয়ের ছবির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রোপিনজেন

পল্লীতে তাঁর জন্ম হয়, কিন্তু হেগে থাকিয়া তিনি শিল্প-চর্চ্চা করিতেন। সাধারণ শ্রেণীর লোকে তাঁর অঙ্কিত ছবি খুব পছন্দ করিতেন। ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে তাঁর চিত্রামোদী বন্ধুর অভাব ছিল না। জনপ্রিয় বিষয়-

তিন পুরুষ (শিল্পী—ডি, এ, সি, আর্টজ)

নির্ব্বাচনে এঁর বাহাদুরী ছিল, কিন্তু তাঁর শিল্পের টেক্‌নিক খুব উচ্চ ধরণের ছিল না।

এখানে যত জন ডাচ্-শিল্পীর পরিচয় প্রদত্ত হইল, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন দেওয়া যাইতে পারে প্রবীণ শিল্পী হেনাড্রিক উইলেম মেস-দাগকে। তাঁহাকে উনবিংশ শতাব্দীর ডাচ্ শিল্পি-রাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বপ্নপুরী গ্রোনিনজেনে তিনি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেন; তারপর হইতে তাঁর সুদীর্ঘ সত্তর বৎসরকাল জীবনব্যাপী স্বভাব-প্রকৃতির ধ্যান করিয়াই কাটান। তিনি ছিলেন সত্যাই সত্যাই প্রকৃতির বরপুত্র, স্বভাবের একনিষ্ঠ সেবক, নৈসর্গিক শিল্পি। শিল্পী-নিবাস হেগে থাকিয়া তিনি কলাদেবীর আরাধনা করিতেন এবং সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী আলমা টেডেমার ছাত্র ছিলেন। অসীম সমুদ্র ছিল তাঁর বিশেষ শিল্পোপকরণ ও ধ্যেয় বস্তু। বিচিত্র সাগর-দৃশ্যাঙ্কনে তিনি লাভ করিয়াছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। হেগ-গ্যালারীতে মেসদাগের 'সাগর-দৃশ্য' সযত্নে রক্ষিত ও শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রাপ্ত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার খ্যাতিনামা চিত্র-সংগ্রাহকদের গ্যালা-রীতে ও মেসদাগের ছবি উচ্চাসন পাইয়াছে। অনন্তের ধ্যান তাঁর ব্যর্থ হয় নাই। তাঁর চিত্র-পটে অসীম অনন্তের আভাস সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে—যাহা সহজভাবেই সীমার মাঝে বন্দী মানব চিত্তের সঙ্গে একটা অনন্তের সম্পর্ক আনিয়া দেয়—উদ্রেক করে একটা পরম অপার আনন্দানু-

ডাচ্ ধীবর-বধূগণ (শিল্পী—পি, সাডে)

ভূতি। মেস্‌দাগের মূক সাগর-দৃশ্যে কবির ভাষা যেন মূর্ত্ত। মৌলিক রসানুভূতির অমল-অমিয়স্পর্শ দর্শকের

নগণ্য সীমার মাঝে এমনি করিয়া অসীম সুদক্ষ শিল্পীর তুলীর সুকৌশলে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যে অনন্তত্বের হানি কোথাও এতটুকু লক্ষিত হয় না।

বহুরূপী বিচিত্র-ভঙ্গিম সাগরের এমন জীবন্ত চিত্রাঙ্কণে আজ পর্য্যন্ত কোন আধুনিক শিল্পীও মেসদাগকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিদায়-মুহূর্ত্তে স্বভাব-শিল্পী মেস্‌দাগেরও চিরাবসান হয়।
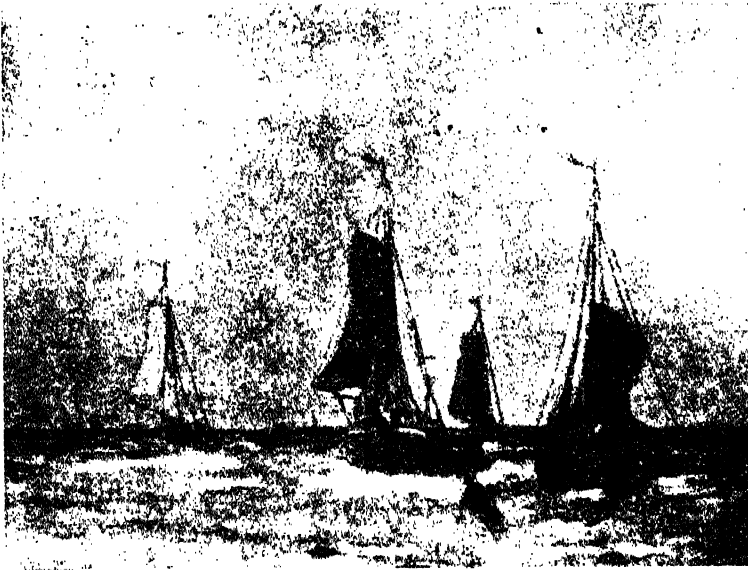
ডাচ্ মাছধরা তরী (শিল্পী—এইচ্‌, ডবলিউ মেসড্যাগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর ডাচ্‌-শিল্পিগণকে আধুনিক ডাচ্ শিল্প-কলার জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। উপরি-বর্ণিত শিল্পী ছাড়াও আরও অনেক খ্যাতনামা কলাবিৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ডাচ্‌-শিল্প সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—যাঁহাদের পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। জোসেফ ইজরেল ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। 'বৃদ্ধ ইয়ুদি' ও 'সলের সম্মুখে ক্রীড়ারত ডেভিড'—এই দুইখানি ছবির জন্য ইজরেল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমষ্টার্ডাম, হেগ, হারলেম প্রভৃতি স্থানে তাঁর ছবি সাদরে গৃহীত ও রক্ষিত আছে। ইজরেলের যোগ্য পুত্রও ছিলেন একজন উদীয়মান শিল্পী, ইয়ংকিং, টেন কেটি, কোষ্টার, মরিস ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি শিল্পীর ছবিও হল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত। এক কথায় ঊনবিংশ শতাব্দীকে হলাণ্ডের শিল্প-যুগ বলা চলে।

ডাচ্‌-শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত বৈশিষ্ট্য এই, যে শিল্প-কলার নিজস্ব আনন্দের জন্যই সেখানে উহা অনুশীলিত হইয়া থাকে। ডাচ্‌-শিল্পীদিগের মধ্যে বাজারে ছবি বিক্রয় করিয়া পয়সা উপার্জ্জন বা ব্যবসার খাতিরে দশজনের প্রীতিমত চিত্রাঙ্কিত করিবার প্রয়াসের একান্ত অভাব। তাই কলা-মাধুর্য্যের ক্ষুণ্নতা সেখানেই কোন অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় না। ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিগত ভাবের ছাপ ডাচ্ শিল্প-কলাকে কৃত্রিম বা ম্লান করে নাই। ডাচ্‌-শিল্প উহার নিজস্ব মহিমায় মহীয়ান্ ও চির অম্লান। শিল্পী সেখানে নিজেকে অব্যক্ত রাখিয়া হল্যাণ্ডের অন্তর-বাহিরকেই অবিকৃতভাবে অভিব্যক্তি দিবার সার্থক প্রয়াস করিয়াছে। সকল সাধনায় এই অহমিকাশূন্য আত্মলয়ের মাঝেই চরম সার্থকতা ও পরম শ্রেয়ঃ। হল্যাণ্ডের নিত্য নূতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, চত্বার, প্রমোদোদ্যান, ধূসর-সবুজ বর্ণ কৃষি ক্ষেত্র, নদী-নালা, সমুদ্র-ডাইক, রক্ত-শ্বেত গৃহ, বীচিমালা-পরিশোভিত ধীর-অশান্ত সমুদ্র—সব কিছুই শিল্পি-মনের নব নব উপকরণ ও উদ্দীপনা জোগান দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পিগণের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শূন্য স্থান আবার নবীনের দ্বারা পূর্ণ হইয়া তাঁহাদের উঠিতেছে। এমন ছবির রাজ্যে, রেমব্রান্‌ডট্‌ বা ফ্রেন্‌জ্‌ হালসের মত কবি-শিল্পী না জন্মিলেও, ডাচ্ শিল্পধারা অক্ষুন্ন রাখিবার মত মানুষের অভাব হইবে না।

চিত্রে মূর্ত্তি-বৈশিষ্ট্য

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রধান মূর্ত্তি ও পার্শ্ব মূর্ত্তি

পুঞ্জচিত্রে (Group-picture) একটি প্রধান মূর্ত্তি হইবে, কতকগুলি পার্শ্বমূর্ত্তি হইবে এবং কখনও কখনও বিপরীত ভাব দেখাইবার জন্য অপর একটী মূর্ত্তি হইয়া থাকে। প্রধান মূর্ত্তিতে যে সকল ভাবের প্রকাশ, বিপরীত মূর্ত্তিতে তাহার বিপর্য্যস্ত ভাব প্রকাশিত হইবে। এই বিপরীত ভাব থাকিলে প্রধান মূর্ত্তির উৎকর্ষ বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়। এক বা তদধিক পার্শ্ব-মূর্ত্তির সংযোগ করিতে হয়। নাটকে যেরূপ একটী প্রধান নায়ক রাখিতে হয় এবং তদনুযায়ী নায়িকার প্রণয়ন করিতে হয়, এই নায়ক নায়িকায় মধ্যে লেখক একটিকে মুখ্য আর একটীকে গৌণ করিয়া থাকেন; কোন স্থানে নায়কের প্রাধান্য প্রকাশ আর কোন স্থানে নায়িকার প্রাধান্য প্রকাশ করা হয় এবং নায়ক-নায়িকার কিরূপ ভাব ও সম্বন্ধ হইল তাহাকে অপর একটী বিপরীত চরিত্র দিয়া বাধা বা বিঘ্ন প্রকাশ করিতে হয়। এই বিঘ্নোৎপাদক চরিত্র নায়ক-নায়িকার ভাবের ঠিক বিপরীত ভাবাপন্ন। নায়ক-নায়িকাকে এই বিপরীত ভাবের চিত্রটী বিনাশ বা বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করে এবং অবশেষে নিজে পরাস্ত হইয়া নায়ক-নায়িকার প্রাধান্য ঘোষণা করে এবং পার্শ্বস্থিত কয়েকটী চরিত্র ভাবের নানা প্রকার প্রক্রিয়াকে পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও পর্য্যবসিত করে। এই হইল নাটকের লক্ষণ। পুঞ্জ-চিত্রে ঠিক তদ্রূপই প্রথা অনুসরণ করা হয়। একটী প্রধান চিত্র অঙ্কিত করিতে হয় এবং অনেক স্থলে বিপরীত ভাবের একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার বিপরীত ভাব দর্শাইতে হয়। এবং পার্শ্বস্থিত কয়েকটী চিত্র আনিয়া প্রধান চিত্রের কি ভাব ও উদ্দেশ্য তাহা সেই পার্শ্ব-চিত্র দ্বারা ধীরে ধীরে প্রকাশ করিয়া, নানা স্তর ও নানা অবস্থার ভিতর দিয়া এবং বিপরীত ভাবের চিত্রের মধ্য দিয়া প্রধান চিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়।

অনেকস্থলে এরূপ দেখা যায়, যে বিপরীত ভাবের চিত্রটী সন্নিবেশিত হয় না। তবে তাহাতে ভাব যদিও প্রকাশিত হয়, কিন্তু তেমন দৃঢ় ও তীব্র ভাবে সেই ভাবটী প্রকাশিত হয় না। সেজন্য একটী বিপরীত ভাবের চিত্র দেওয়া অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়।

প্রধান চিত্রের সহিত পার্শ্ব-চিত্রের একেবারেই বহু দূর সম্পর্ক হইবে না; কারণ, তাহা হইলে দর্শকের মনে সহসা একটী ছেদ বা ব্যবধানের ভাব আসিবে। উদাহরণ স্বরূপ, কোন চিত্রে এক দিক্ হইতে পার্শ্ব-চিত্র সন্নিবেশিত হইল। প্রধান চিত্র যে ভাব প্রকাশ করিবে, প্রথম পার্শ্ব-চিত্রে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন ভাব, কিঞ্চিৎ পৃথক্ ভাব থাকিবে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বহুল পার্থক্যের ভাব থাকিবে না। এইরূপ অল্প অল্প পার্থক্য রাখিয়া, ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের চিত্রে আঁকিতে হইবে। এবং এই বিপরীত-ভাবের চিত্র হইতে অল্পে অল্পে নানা-বিধ পার্শ্ব-চিত্র দিয়া প্রধান চিত্রে আঁকিতে হইবে। ইহাতে শিল্প-নৈপুণ্যের বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ পায় এবং ভাব রাখিবার ভিন্ন ভিন্ন স্তর পরিদর্শিত হয়। সহসা বহুদূর-বিচ্ছিন্ন পার্শ্ব-চিত্র সংযোগ করা নিষিদ্ধ। তাহা হইলে ভাবের সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্যের ভঙ্গ হয়।

নাটকেও ঠিক এইরূপ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। এস্থলে শিল্পী ও নাটকপ্রণেতা, উভয়ের মনোবৃত্তি একই প্রকার। নাটক প্রণেতা শব্দ দিয়া নানা ভাব তরঙ্গ দেখাইতেছেন এবং শিল্পী রেখা ও বর্ণ দিয়া সেই সকল ভাব দেখাইতেছেন। কোন স্থলে এরূপ লক্ষিত হয়, যে পুঞ্জ-চিত্রে প্রধান মূর্ত্তি ও পার্শ্ব-মূর্ত্তি এবং পার্শ্ব-মূর্ত্তি-সমূহের পরস্পরের ভিতর বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলের এক প্রকার মুখ ও ভাব প্রকাশ পাইতেছে; কেবল মাত্র অঙ্গের নানা স্থান দেখাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানে চিত্রগুলিকে বিশেষভাবে দেখান হইতেছে অর্থাৎ সম্মুখ ভাগ, পৃষ্ঠভাগ ইত্যাদি। কিন্তু এই পুঞ্জ-চিত্রে ভাবের

উত্তাল তরঙ্গ না থাকায় উহা নিতান্ত মৃদু বা নিস্তেজ চিত্র হইয়া যায়। এইরূপ নিস্তেজ চিত্র বাজারে বহু প্রদর্শিত হয়, কিন্তু প্রকৃত শিল্পী প্রত্যেক চিত্রে স্পষ্ট করিয়া বিশিষ্ট ভাব দেখাইবেন এবং সমস্ত চিত্রে পরস্পরের সামঞ্জস্য দেখাইবেন। নিস্তেজ রস-বিহীন চিত্র অনাবশ্যক।

চিত্রে নারী ও পুরুষের বিশেষত্ব

অধিষ্ঠান কালে পুরুষ ও স্ত্রী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইলে, অনেক বিষয়ে তারতম্য রাখিতে হয়। পুরুষ-মূর্ত্তিতে বক্ষস্থল ও প্রকাণ্ড মেরুদণ্ড উন্নত এবং সর্ব্ব-বিষয়ে একটী দৃঢ়তার ভাব দেখাইতে হয়। স্ত্রী-মূর্ত্তিতে মেরুদণ্ড উন্নত না হইয়া সম্মুখ দিকে কিঞ্চিৎ বক্র হয়। এমন কি বাম পার্শ্বেও একটু বক্র হইয়া থাকে। যাঁহারা স্ত্রী বা পুরুষদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একটু উত্তেজিত হইলে স্ত্রী ও পুরুষ নিজেই স্বাভাবিক ভাব-প্রকাশের জন্য দেহের ভঙ্গী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের গ্রীবা কিঞ্চিৎ লম্বমান ও সম্মুখের দিকে হেলিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতগতিতে তাহারা ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ লম্বমান করা এবং সম্মুখ দিকে হেলাইয়া দেওয়াটীই হইল বিশেষ দ্রষ্টব্য। কারণ, স্ত্রীলোকের গ্রীবা পুরুষের গ্রীবা হইতে স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর। কিঞ্চিৎ লম্বা গলা স্ত্রীলোকদিগের সৌন্দর্য্যের বিষয়। ইহাকে ইংরাজীতে Swan-like neck অর্থাৎ মরালগ্রীবা বলা হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইলে নারী কণ্ঠ অধিকতর লম্বমান করে এবং গলাটী সম্মুখ দিকে প্রসারণ করিয়া দেয়; ইহাকে crane-like neck বক-গ্রীবা বলা যাইতে পারে। পুরুষের গ্রীবা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব ও স্ফীত হইয়া থাকে। আবার স্ত্রীলোকের গ্রীবা পুরুষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শীর্ণ বা সরু। পুরুষ উত্তেজিত হইলে গ্রীবা উন্নত না করিয়া ডান বা বাঁ ধারে মুখ ফিরাইয়া থাকে, কিন্তু কদাচিৎ গ্রীবা লম্বমান করে না। পুরুষ যদি গ্রীবা লম্বমান করিয়া কথা কহিতে যায়, তাহা হইলে, সকলে তাহাকে স্ত্রী-ভাবাপন্ন পুরুষ বলে, এবং উহা হাস্যোদ্দীপক হইয়া পড়ে। পুরুষ উত্তেজিত হইলে, বাম হস্ত সঞ্চালন করিয়া থাকে; স্ত্রীলোক উত্তেজিত হইলে দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালন করে। কিন্তু পদ-বিক্ষেপ-কালে পুরুষ দক্ষিণ পদ অগ্রে প্রসারণ করিয়া থাকে এবং স্ত্রীলোক বাম পদ প্রসারণ করে। কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া উত্তোলন-কালে, স্ত্রীলোক বাম জঙ্ঘায় স্থাপন করে, পুরুষ দক্ষিণ জঙ্ঘায় স্থাপন করে। সন্তান-গ্রহণ কালে পুরুষ ডান দিকে এবং স্ত্রীলোক বাঁ দিকে গ্রহণ করে। উত্তেজিত ভাব প্রকাশ করিতে হইলে স্ত্রীলোক দ্বিধা আনিয়া সম্মুখের দিকে অবনত বক্র হয়; পুরুষ অধিক স্থলে শির-সঞ্চালন করিয়া ভাবপ্রকাশ করিয়া থাকে বা অল্প পরিমাণে সম্মুখে বক্র হয়, কিন্তু অনবরত কটিদেশ হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত সঞ্চালন করে না। এই সকল হইল স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তিতে পার্থক্য। এই সকল লক্ষণ কেবল মাত্র ভারতীয়দের পক্ষে প্রযুজ্য নহে, কিন্তু আমি পৃথিবীর নানা দেশভ্রমণকালে এ সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। স্ত্রীলোকের ও পুরুষের মধ্যে এ সকল বিষয়ে সর্ব্বত্রই পার্থক্য আছে।

পুরুষদিগের মুখ তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণী হইতেছে গোল, দ্বিতীয় শ্রেণী গোলাকৃতি ও চেপ্টা; তৃতীয় কিঞ্চিৎ লম্বমান। কিন্তু মুখের চোয়ালের অস্থি পুরুষের মোটা ও কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি; স্ত্রীলোকের মুখের অস্থি পুরুষ হইতে কিঞ্চিৎ সরু ও কিঞ্চিৎ হ্রস্ব। স্ত্রী-মুখের বিশেষত্ব হইতেছে, উহা লম্বমান ও অস্থূল অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় তত পুরুষ্ট হয় না। স্ত্রীলোকের মুখ কখনও কখনও গোলাকৃতি ও চেপ্টা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে স্ত্রী-সুলভ সৌন্দর্য্য তত প্রকাশ পায় না। সরু ও লম্বা মুখ হইলে স্ত্রীলোকের শোভা বর্দ্ধন করে। কিন্তু গোল বা চেপ্টা হইলেও, বিশেষ লক্ষ্য করিলে তাহা যে পুরুষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বমান, ইহা পরিস্ফুট হয়। পুরুষের যে পরিমাণে মুখ স্থূল ও নিটোল হইবে, স্ত্রীলোকের তাহা অপেক্ষা কম হইবে। ইহার বিশেষ কারণ এই, যে পুরুষের ভিতরে গাম্ভীর্য্য ও তেজঃপূর্ণ ভাব থাকে; স্ত্রীলোকের ভিতর ভক্তি, সেবা বা লোকরঞ্জিনী হইবার

চেষ্টা, এই সকল ভাব থাকে। লম্বা মুখ হইলে ভক্তি বা সেবার ভাব প্রকাশ করে। পুরুষের নাসিকা কিঞ্চিৎ মোটা, স্থুল; স্ত্রীলোকের নাসিকা অপেক্ষাকৃত সরু ও পাৎলা। শেষোক্তকে ইংরাজীতে sharp nose বা তীক্ষ্ন নাসিকা বলে। স্ত্রীলোকের মোটা বড়ির মত নাসিকা কম হয়; কিন্তু টিকালো নাক, এইটীই বিশেস সরু, পাৎলা ও লম্বা। পুরুষের নাক মোটা, থ্যাবড়া বড়ির মত। পুরুষদিগের নাসিকা সরু, পাৎলা ও তীক্ষ্ন হইলে, তাহাদিগকে স্ত্রীভাবাপন্ন বলে। কিন্তু স্ত্রীলোকের মোটা, থ্যাব্ড়া নাক অতি বিরল। সরু, পাৎলা নাসিকা ও সূক্ষ্ম ঠোঁট হইলে, সেই ব্যক্তি উপস্থিত কোন বিষয়ে জবাব দিতে পারে, যাহাকে ইংরাজীতে pointed retorter বলে। পুরুষদিগের ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ স্ফীত ও দীর্ঘ হয় এবং স্ত্রীলোকের ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ সরু বা পাৎলা হইয়া থাকে। পুরুষদিগের মুখের হাঁ বা মুখ-বিবর দীর্ঘ, স্ত্রীলোকের হাঁ বা ব্যাদান স্থুল, অল্প-পরিসর। পুরুষেরা আহারকালে গ্রাসটা বড় করিয়া ভোজন করে এবং অনেক সময়ে অসৌষ্ঠব প্রকাশ পূর্ব্বক অঙ্গুলী কয়েকটী মুখ বিবরে প্রবেশ করায়; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা গ্রাস অল্প লয় এবং অল্প করিয়া আহার করে।

নেত্র-ঘূর্ণন-কালে পুরুষদের দৃষ্টি তীক্ষ্ন ও এক দিকে হইয়া থাকে এবং চক্ষুর উপরের পত্র বিস্ফারিত হয়; স্ত্রীলোকের দৃষ্টি অল্পক্ষণ পর্য্যন্ত দৃঢ় ও তীক্ষ্ন হইতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই নেত্র-পত্র পড়িয়া যায় এবং উপর্য্যুপরি পড়িতে থাকে। নেত্র-ঘূর্ণয়ণ-কালে স্ত্রীলোক বাঁ দিক হইতে ডান দিক্, বাম দিকে উপর দিয়া ঘূর্ণয়ণ করে। ইহাকে ইংরাজীতে redolent eyes বলে। কিন্তু পুরুষ ঐরূপ করিলে দোষাবহ হয়। তির্য্যক্ দৃষ্টি (ogling) অর্থাৎ দিকের কোণ দিয়া দৃষ্টি করা, ইহা স্ত্রীলোক ও পুরুষ করিয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ অনেকক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে পারে, স্ত্রীলোক ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টি করে। Lecring অর্থাৎ নাসিকার দিক্ দিয়া তির্য্যক দৃষ্টি পুরুষ করিতে পারে; কিন্তু স্ত্রীলোক তদ্রূপ করে না বা করিতে তেমন পারে না। এসকল হইল গুপ্ত দৃষ্টি বা মদন-ভাবের পরিচায়ক দৃষ্টি; দেবমূর্ত্তিতে ইহা কখনও প্রয়োগ করিবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দেব-নেত্র তিন প্রকার:—নাসিকাগ্রে, মূলে বা ভ্রূ-মধ্যে হয়। মদন-দৃষ্টি (amorous glance) ও দেব-দৃষ্টি বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি এবং বিভিন্ন ভাব-পরিচায়ক।

অঙ্গুলীর বিষয়ে বলিতে হইলে ইহা জানা আবশ্যক, যে পুরুষের অঙ্গুলী মোটা ও কিঞ্চিৎ লম্বা; স্ত্রীলোকের অঙ্গুলী সরু ও পুরুষ হইতে কিঞ্চিৎ হ্রস্ব। ইহাও জানা আবশ্যক, যে পুরুষের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চেপ্টা; কিন্তু স্ত্রীলোকের অঙ্গুলী কিঞ্চিৎ সরু, ইংরাজীতে ইহাকে tapering finger বলে। পুরুষের অঙ্গুলীর যে তিন পর্ব্ব বা অংশ আছে, তাহা সাধারণতঃ চেপ্টা, কিন্তু স্ত্রীলোকের ঐ তিন অংশ মধ্য-স্থলে স্ফীত। স্ত্রীলোক কৃশ হইলেও, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায়। স্ত্রীলোকের অঙ্গুলী সরু হওয়ায় সে ভারী জিনিষ উত্তলন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু সূক্ষ্ম জিনিষ স্পর্শ ও গ্রহণ করিতে স্ত্রীলোক অতিশয় নিপুণ। সূচিকা-কার্য্য বা এরূপ সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্যে স্ত্রীলোকের সরু অঙ্গুলী বিশেষ পারদর্শী। এইজন্য নারীজাতি এই সকল অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কারুকলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। পুরুষের অঙ্গুলী স্থুল হওয়াতে তাহারা এসকল কার্য্য করিতে নিপুণ নহে। যেমন আলিপনাদি সূক্ষ্মশিল্পে স্ত্রীজাতি বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি তাহাদিগকে যদি চিত্র বা আলেখ্য রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা উৎকৃষ্ট চিত্রও অঙ্কণ করিতে পারিবে। কারণ, চিত্রাঙ্কনকালে অতি সূক্ষ্ম রেখার আবশ্যক হয়; পুরুষ অনেক সময়ে রেখা দৃঢ় করিয়া ফেলে, কিন্তু স্ত্রীলোক হইলে সেই সকল রেখা অতি সূক্ষ্ম ও কমনীয় হইবে। এবং বর্ণ-নিরাকরণ অর্থাৎ কোন বর্ণের সাহত কোন বর্ণের কিভাবে সমন্বয় করিতে হইবে তাহার নিরূপণ এবং বর্ণ-পার্থক্যের উপলব্ধি পুরুষের দৃষ্টি অধিকাংশ স্থলে স্পষ্টভাবে করিতে পারে না। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক শক্তি বর্ণন-নির্ণয় করা। বস্ত্র-ক্রয়-কালে অনেক স্থলে দেখা যায়, যে স্ত্রীলোক যে বর্ণ নির্দ্ধারিত করে, তাহাই ঠিক বর্ণ। তবে পুরুষরা গভীর ও গাঢ় বর্ণের প্রশংসা করে; আর স্ত্রীলোকেরা ফিকে ও

তরল-ভাব-পূর্ণ বর্ণ পছন্দ করে। অর্থাৎ পুরুষরা deep colour গাঢ় রং বা sage colour বা গভীর বর্ণ ইচ্ছা করে; স্ত্রীলোকেরা light colour বা jolly colour লঘু প্রমোদ-সূচক বর্ণ ইচ্ছা করে। কিন্তু বর্ণ-নিরাকরণ বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগেরই বিশেষ দক্ষতা আছে। এই জন্য স্ত্রীলোকদিগকে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক; কারণ, ইহা তাহাদিগের স্বভাব-দত্ত প্রতিভার বস্তু। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক, যে পুরুষ যেমন ধীর ভাবাপন্ন চিত্র অঙ্কন করিতে পারে, স্ত্রীলোকেরা সেরূপ ধীর ভাবাপন্ন চিত্র অঙ্কন করিতে পারে না। কিন্তু মধুর ভাবের, বীর ভাবের বা মাতৃ-ভাবের চিত্র বোধ হয় পুরুষের চেয়ে রমণীই ভাল আঁকিতে পারে। পুরুষদিগের ভ্রূ মোটা ও অধিক কেশযুক্ত; স্ত্রীলোকের ভ্রূ ক্ষীণ ও অল্প-কেশ-সংযুক্ত, অর্থাৎ তাহাদের চক্ষের উপর ঈষৎ কৃষ্ণ-বর্ণ রেখা আছে, এই মাত্র। পুরুষের ভ্রূ ও স্ত্রীলোকের ভ্রূর মধ্যে আর একটি পার্থক্য আছে এই, যে পুরুষের ভ্রূ সরল ও সিধা হয়, স্ত্রীলোকের ভ্রূ ধনুকের ন্যায় কিঞ্চিৎ বক্র হয়। ভ্রূ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলাম। চক্ষুর বিষয়ে আর একটু বলা যায়, যে পুরুষের চক্ষু কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়, স্ত্রীলোকের হ্রস্ব হয়। নখের বিষয়ে এইমাত্র বলিতেছি, যে পুরুষের নখ মোটা ও শুভ্র বর্ণ; স্ত্রীলোকের নখ সরু, গোলাকৃতি এবং ঈষৎ রক্তিম। পুরুষের নখের উপরিভাগ খসখসে বলা যায়; স্ত্রীলোকের নখের উপরিভাগ মসৃণ ও একটা চিক্কণ (Glossy nails) আভা-সংযুক্ত। অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই নিবন্ধ দীর্ঘ হইবে, এইজন্য ইহাতে উপস্থিত ক্ষান্ত হইলাম।

অনুতপ্ত

শ্রীমানসকুমার হালদার

কল্প-লোকের মহাকাশ হ'তে নামি
প্রথম যেদিন এসেছিলে প্রিয় মোর,
রূপের প্রভায় উজলি' আঁধার-যামী
গেহখানি মম ক'রে দিয়েছিলে ভোর,

তৃষিত এ হৃদি ও-তনু পরশ-কামী
ধ'রেছিলে হৃদে বেড়িয়া দু-বাহু ডোর
অধরে দেছিলে অধর পরশখানি,
কত না সোহাগে মুছেছিলে আঁখি লোর

তখন বুঝি নি কত তুমি মহীয়ান্
কত না অপার সাধনার মহাধন
কত ছোট হ'য়ে এসেছিলে ভ'রে প্রাণ,
দিয়েছিলে দেখা, দিয়েছিলে পরশন!

সে-দিন গরবে ঠেলেছিনু তোমা দূরে
তারি অনুতাপে আজি শুধু হৃদি পুড়ে!

—বৈচিত্র্য—

সকল বাহিরের বিচিত্রতা সত্ত্বেও মানুষের গভীর অন্তরপ্রদেশে আছে একটা ঐক্য-সূত্র, মানবীয় প্রকৃতির সামঞ্জস্য, যা দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে উপলব্ধি করা কঠিন নয়—একটু নিবিড় দৃষ্টি দিলেই। বিশেষ করিয়া ইহা শিশুগণের পক্ষে আরও স্পষ্টতর। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্ব-শ্রেণীর মানব-শিশুর মধ্যে কোন না কোন পুতুল খেলার খেয়াল সরল সমষ্টি-মনের একটা সহজ একত্বই বিজ্ঞাপিত করে।

সেই আদিম যুগ হইতে ভারতের ছোট্টদের মাঝেও রকমারী পুতুলখেলার প্রচলন আছে। বাংলার ছেলেমেয়েদের মধ্যে পূর্ব্বে পুতুলখেলার প্রচলন খুবই ছিল; নাগরিক সমাজে এই সনাতন রীতির কিছু রকমফের হইলেও পল্লীতে শিশু-মনের উপর পুতুলের প্রভাব এখনও কম নহে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আগেকার কাপড়, কাঠ বা মাটির পুতুলের স্থান বর্ত্তমানে অধিকৃত হইয়াছে চীনামাটির বা অন্যান্য চকচকে বৈদেশিক পুতুলের দ্বারা। পুতুলের রীতিমত ঘরকন্না ছিল, বিয়ে-থাওয়া-অন্নপ্রাশন হইত, নানা উপলক্ষে উৎসব হইত, পূজা-পার্ব্বণে নূতন কাপড়-চোপড়েরও আমদানী হইত। মেয়েদের ইহাতে ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্য-জীবনের শিক্ষা তো হইতই, তাছাড়াও শিশুদের মধ্যে পরস্পর অন্তর-বিনিময় ও সৌহৃদ্য-স্থাপনেরও একটা সুযোগ ঘটিত।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য সর্ব্বদেশেই ছোট্টদের মধ্যে পুতুল খেলার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। চীন, জাপান, জার্ম্মানী, মার্কিণ প্রভৃতি দেশে খেলনা-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমান বাণিজ্য-দুনিয়ায় ইহার স্থান কম নয়।

ওসাকার পুতুল-সম্মেলনে আমেরিকার অতিথি

জাপানী মেয়েদের পুতুল খেলার পরিচয় সত্যই কৌতূহলজনক। সেখানে মেয়েদের মধ্যে প্রতি বৎসর ৩রা মার্চ্চ হইতে তিন দিন জাতীয়ভাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জাপানে এই উৎসবকে বলে 'হিনামাটস্থরী' বা 'হিনা-নো-সেক্কু'। সে কি ধুম! গৃহে গৃহে উৎসবের চাঞ্চল্য। স্কুলের ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি, বিপুল ব্যস্ততা। বাড়ীতে বাড়ীতে পুতুলের প্রদর্শনী, বিচিত্র সাজসজ্জা। হরেক রঙে ছোপান কাপড়ে ঢাকা থাকে থাকে গ্যালারী, তার উপর হরকিছিম পুতুলের সজ্জা—কোথাও আদর্শ ঘর-কন্নার ছবি, কোথাও বা রাজপরিবার অথবা ইতিহাসে কোন বিশিষ্ট ঘটনা; আবার কোথাও নাচ-গান-বাজনার

মজলিস, খেলনার পশু-পক্ষী-নানারকম জন্তু, খেলনারই চায়ের সরঞ্জাম, সব কিছু। কোন কিছুরই এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই—আস্ত জাতীয় জীবনটার বিভিন্ন দিক্ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হয়। নবদ্বীপের রাস বা ঝুলন যাঁরা দেখিয়াছেন তাঁরা অনেকটা অনুমান করিতে পারিবেন। ছেলে-মেয়েদের রঙ-বেরঙয়ের পোষাক পরিয়া ভীড় পাকাইয়া গৃহে গৃহে দেখিয়া বেড়ায়—পরস্পরের মধ্যে হৃদয় বিনিময় করে। জাপানে এই জন্য প্রতি গৃহেই প্রথম কন্যা জন্মাবার পরই বাপ মা পুতুল-সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। উৎসব শেষে প্রদর্শিত পুতুলগুলি আবার প্যাক্ করিয়া সযত্নে রক্ষিত হয়।

পুতুল খেলার মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক শিশু-মনের পরস্পর বন্ধুত্ব ও অন্তরপরিচয়ের বেশ সুযোগ ঘটে। এখানে যে ছবি দেওয়া গেল তাহাতেই দৃষ্ট হইবে,

কোরিয়ান গায়িকা-বালা— তেই-কিও-কু-চো প্রেসিডেণ্ট মুরায়ামার নিকট পুরস্কার গ্রহণ করিতেছে

মার্কিণ ও জাপ বালিকারা পরস্পর করকম্পন করিতেছে

আমেরিকার ছোট ছেলেমেয়েরা জাপানের এই সাম্বাৎসরিক পুতুল উৎসবে তাহাদের প্রতি-নিধি-স্বরূপ সহস্র সহস্র 'ডোল' পাঠাইয়াছে। ওসাকা আসাহি অডি-টেরিয়ামে জাপানী মেয়েরা তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ছোট্ট একটি কোরিয়ার মেয়ে এই উপলক্ষে সঙ্গীত রচনা করিয়া একটি পুরস্কারও পাইয়াছিল। এই সকল মার্কিণ পুতুল-প্রতিনিধি-দের মধ্যে-সত্যকার সব

আমেরিকা প্রেরিত পুতুল সন্দেশবহ

ভালই ছিল—নিউইয়র্ক-স্থিত জাপানী কনসাল জেনারেলের পাসপোর্ট, জাহাজের নকল টিকিট, মার্কিণ মেয়েদের সহিশুদ্ধ দেড়শো দুশো কথার ছোট ছোট সহানুভূতি-সূচক সংবাদ। এর জন্য কমিটি গঠন, এক কথায় সত্যকার সম্মেলনের কোন কিছুরই অভাব ছিল না। বড়রাও শিশুদের এই উৎসবে যোগ দিয়া উৎসাহিত করে। এই উৎসব উপলক্ষে জাপানের মার্কিণ-রাজদূত প্রশান্ত মহাসাগর পারের আমেরিকার ছোট্টদের পক্ষে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি জানান।

গীতার যোগ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তত্রাচ অনাবৃত্তির দুর্ভাবনা তিনি দূর করিতেছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" ৮।১৬

হে অর্জ্জুন, আ-ব্রহ্ম-ভুবনাৎ (ব্রহ্ম-ভুবনেন সহ) লোকাঃ (সর্ব্বলোকান্তর্বর্ত্তিনো জীবাঃ) পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ), তু (কিন্তু) কৌন্তেয়, মাম্ (ভগবন্তম্) উপেত্য (প্রাপ্য) পুনর্জন্ম (পুনরাবৃত্তিঃ) ন বিদ্যতে (নাস্তি)।

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সকল লোকবাসীরই পুনরাবর্ত্তন হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তিত হইতে হয় না।

"দুঃখালয়মশাশ্বতম্"—জীবন হইতে ভাগবত-গতি-প্রাপ্ত জীবই মুক্তি পায়, তাহার জন্ম-মরণ-দুঃখের কারণ নাই; এই জন্য ভাগবতচৈতন্যযুক্ত জীবেরই পুনর্জন্ম নাই বলা চলে। অন্যথা কেবলা ভক্তির অভাবে ক্রম-মুক্তির যে সাধনা, তাহা দ্বারা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি ঘটে; এই ব্রহ্মাও জন্মমরণ-রূপ পরিবর্ত্তন হইতে মুক্ত নহেন, এই হেতু ব্রহ্মার সহিত জীবেরও জন্ম-মরণ-দুঃখ অনিবার্য্য। কেন না—

"সহস্রযুগপর্য্যন্ত মহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥" ৮।১৭

সহস্র যুগ পর্য্যন্তম্ ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ (দিনম্) (তথা) যুগসহস্রান্তাং রাত্রিঞ্চ (যে) বিদুঃ (জানান্তি) তে জনাঃ অহোরাত্র-বিদঃ (কালসংখ্যাজ্ঞা)। চতুর্যুগ-সহস্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে দিন এবং চতুর্যুগ সহস্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে রাত্রি—ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই অহোরাত্র-বিৎ।

যুগ শব্দে চতুর্যুগ—"চতুর্যুগ-সহস্রন্ত ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে", পুরাণাদিতে এইরূপ উক্তি প্রসিদ্ধ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিযুগ। সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বর্ষ, ত্রেতা যুগের ১২৯৬০০০, দ্বাপর যুগের

৮৬৪০০০ বর্ষ, এবং কলিযুগের ৪৩২০০০ বর্ষ। এই প্রকার চারি যুগ সহস্র বার অতীত হইলে ব্রহ্মার এক দিন হয়; রাত্রির পরিমাণও এই প্রকার। অতএব ব্রহ্মার শত বর্ষ আয়ুষ্কাল মনুষ্যগণের ৮৬৪ কোটী বৎসর। তপস্যা, দান, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধনার দ্বারা অক্ষয় স্বর্গলাভ অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল স্থায়ী সুখভোগ হয়।

পৃথিবীই সৃষ্টির সবখানি নহে। চন্দ্র-দিবাকর-কিরণে ইহার যতখানি উদ্ভাসিত হয়, ততখানিকেই মহর্লোক বলা যায়। সপ্তগ্রহ একত্র হওয়ায়, মর্ত্ত্যে যে প্রলয়াশঙ্কা এবং ইহা একেবারে অলীক যে নহে তাহা ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায়, ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের মনীষার পরিচয় মিলে। তাঁহারা যে সপ্তলোকের স্থিতি নিরূপণ করিয়াছেন এবং সৌরজগতের এই গ্রহের গতি ও পরিমাণ নিরূপণ করিয়াছেন তাহাও যে অভ্রান্ত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

পৃথিবী হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল। এই সূর্য্যমণ্ডল হইতে জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্র ধ্রুব-নক্ষত্রের মণ্ডল মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল, নক্ষত্র-মণ্ডল, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও সপ্তর্ষিমণ্ডল সংস্থিত। মর্ত্ত্য হইতে ধ্রুব-মণ্ডল পর্য্যন্ত ক্ষেত্র ত্রৈলোক্য নামে আখ্যাত। ইহার উপর মহর্লোক। ইহাই ভৃগু প্রভৃতির বাসস্থান। ব্রহ্মার সনকাদি মানসপুত্রগণ ইহার উপর জনলোকবাসী। ধ্রুবলোক হইতে ইহা দ্বিলক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত। জনলোকের উর্দ্ধে তপোলোক; সর্ব্বসন্তাপবর্জ্জিত দেবগণ এইখানে বিরাজ করেন। তপোলোকের দ্বাদশ কোটী যোজন উর্দ্ধে সত্যলোক।

মর্ত্ত্যের পরিদৃশ্যমাণ স্থান ব্যতীত যাহা তাহাই ভুবর্লোক। সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত ক্ষেত্র স্বর্গলোক।

ভূ-র্ভুব-স্বঃ, এই তিন লোকের উপরে মহলোক। মহর্লোক মধ্যভূমি; ইহার উপরে জন, তপঃ, সত্য লোক বিরাজিত। প্রলয়কালে ভূর্ভুব-স্বর্লোক মহর্লোকে লীন হইয়া যায়, উর্দ্ধের ত্রৈলোক্য অলীন অবস্থায় থাকে। এই জন্য ইহার নাম হইয়াছে—কৃতক। নিম্নের ত্রিলোক অকৃতক। মহর্লোককে কৃতাকৃতক কহে। এইখানে কল্পশেষে সবই নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকে। কল্পারম্ভে আবার দিবাকর-প্রভাবে আকাশে প্রলীন নক্ষত্র রাত্রিসমাগমে ফুলের ন্যায় যেমন ফুটিয়া উঠে—ভূঃ, ভুর্বঃ ও স্বর্লোকও তদ্রূপ পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই জন্য ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পুনরাবৃত্তি রোধ করে না। কথাটী আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে—

> "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
> রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥" ৮।১৮

অহরাগমে (ব্রহ্মণো দিনস্য উপক্রমে) অব্যক্তাৎ (কারণরূপাৎ) সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (ভূতানি) প্রভবন্তি (অভিব্যজ্যন্তে), রাত্র্যাগমে তত্র (তস্মিন্নেব) অব্যক্তসংজ্ঞকে (কারণরূপে) এব প্রলীয়ন্তে (তিরোভবন্তি)।

ব্রহ্মার দিন উপস্থিত হইলে অব্যক্ত হইতে এই সমস্ত চরাচর পদার্থ সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্ত পদার্থ অব্যক্তে লয়প্রাপ্ত হয়।

এই ক্ষেত্রে 'ব্যক্ত' শব্দ লইয়া অর্থের একটু গোলযোগ আছে। হনুমান, শ্রীধর প্রভৃতি পূজনীয় আচার্য্যগণ 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ 'প্রকৃতি' করিয়াছেন। সাংখ্যের অব্যক্ত যে প্রধান, তাহাই তাঁহাদের মতে এখানে প্রযুজ্য হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্কর বলিয়াছেন—"অব্যক্তাদব্যক্তং প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা তস্মাৎ অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ো ব্যজ্যন্ত" মধুসূদন প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহারই সমর্থন করিয়াছেন। এই যে রাত্রি সমাগমে প্রলয়-সংঘটন, ইহাতে আকাশাদির সত্তা থাকে; এই জন্য 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ এই স্থানে অব্যাকৃত অবস্থা বা প্রধান নহে।

প্রকৃতি লোকাতীতা, গুণময়ী; এই গুণ সতের ইচ্ছাশক্তি। প্রকৃতির লয় কল্পনাতীত। পুরুষের ন্যায় প্রকৃতি আদ্যন্তহীন; প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত যে সৃষ্টি, তাহাও পরিবর্ত্তনশীল। প্রজাপতির স্বাপাবস্থাই এই ক্ষেত্রে "অব্যক্ত" অর্থে কথিত হইতেছে। ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়; আবার রাত্র্যাগমে অব্যক্তে সব বিলীন হইয়া থাকে। ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

> "যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
> যদা স্বপিতি সান্তরাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি॥"

এই কথাই পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্ট হইয়াছে ঃ—

"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ! প্রভবত্যহরাগমে॥" ৮।১৯

হে পার্থ, সঃ (ব্যক্তঃ) এব অয়ম্ ভূতগ্রামঃ (প্রাণি-সমূহঃ) ভূত্বা রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে) প্রলীয়তে, (পুনঃ) অহরাগমে অবশঃ (নিয়মাধীনঃ) (সন্) প্রভবতি (জায়তে)।

হে পার্থ, এই জীব সকল ব্রহ্মার দিবাগমে সঞ্জাত হইয়া নিশাগমে বিলীন হইয়া যায়।

যাহা একবার কৃত তাহার বিনাশ এবং যাহা অকৃত তাহার উদ্ভব হয়, এই আশঙ্কা এই শ্লোকে নিবারিত হইয়াছে। ব্রহ্মার দৃষ্টিকালে যাহার উদ্ভব, স্বাপকালে তাহার তিরোধান, পুনরায় নূতন সৃষ্টি হয়—এইরূপ নহে। ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তিও সীমাবদ্ধ। ভাগবতে ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবালকদিগকে লইয়া গোচারণ-লীলাকালে, প্রজাপতি রাখাল-বালকদিগের সহিত গোধন অপহরণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুরূপ গো ও রাখালগণ সৃজন করিয়া পূর্ব্ববৎ যথারীতি গোষ্ঠ-বিহার করিতে লাগিলেন। বৎসরান্তে দেখিলেন, তাহার মধ্যে সৃষ্ট গো ও ব্রজবালকেরা বিলীন অবস্থায় থাকিলেও, তদনুরূপ নূতন সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে; তখন মনুষ্যদেহধারী শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বশক্তিমান্ জানিয়া তিনি নতি স্বীকার করিলেন।

ইহা রূপক হইলেও, ভাগবতকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন, যে প্রজাপতি শ্রীভগবানের প্রদত্ত শক্তিমাত্র প্রকাশ করেন; কিন্তু ভগবানের অনন্ত শক্তি। এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মার অসীম সৃষ্টিশক্তির কল্প লইয়াই তাঁহার আয়ুঃ। শতবর্ষ ধরিয়া তিনি সৃষ্টি-বীজ দিবাভাগে প্রকাশ করেন, রাত্রিতে সংহরণ করেন। জীবও জাগ্রতে যে কর্ম্ম ও চিন্তার অভিব্যক্তি দেয়, নিদ্রায় তাহা সুপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং জীব-জগতের পশ্চাতে যে বৃহত্তর কারণ-জগৎ, তাহার সৃজন ও লয়ের ছন্দও এই ধারায় অবধারণ করা দুঃসাধ্য নহে।

প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করেন। 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ 'কর্ম্ম'। কর্ম্ম এই হেতু নিত্য। কর্ম্মের বন্ধন আছে; এই হেতু সৃষ্টবস্তু নিরতিশয় অধীনভাবেই নিরন্তর গমনাগমন করিতেছে। "অবশঃ" এই শব্দটী এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ভগবানও জন্মগ্রহণ করেন; কর্ম্মবন্ধন-জনিত এই জন্ম নহে। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন—"আত্মমায়য়া সৃজাম্যহম্।" প্রজাপতির সৃষ্টি মায়িক। শরীর, বাক্য ও মনের যে ছন্দ, যে স্পন্দন, তাহা মায়াপরিচ্ছিন্ন। ইহা যে সরিষায় ভূত প্রবেশ করিয়াছে, সেই সরিষা দিয়া ভূত তাড়াইবার প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় অনায়াসে বলা যায়। জীবের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভোগ, মোক্ষ সবই মায়িক; মূলে তিরোভাব ও আবির্ভাবের নাগর-দোলায় প্রত্যেকেই একান্ত অবশ হইয়াই ঘুরিয়া মরিতেছে। ইহা হইতে মুক্তির পথ অতঃপর কৃষ্ণ প্রদর্শন করিতেছেন ঃ—

"পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ৮।২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" ৮।২১

তস্মাৎ (পূর্ব্ব কথিতাৎ) তু (কিন্তু) অব্যক্তাৎ (কারণ-রূপাৎ) পরঃ (বিলক্ষণঃ) অন্যঃ (স্বতন্ত্র) অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ কারণঃ) সনাতনঃ (অনাদিঃ) চঃ ভাবঃ (অস্তি) সঃ (তদ্ভাবঃ) সর্ব্বেষু (কার্য্যকারণেষু) ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমেষু) নশ্যৎসু (গচ্ছৎসু অপি) ন বিনশ্যতি (ন প্রলয়ং যাতি) (যঃ) অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ) অক্ষরঃ (জন্মরহিতঃ) ইতি উক্তঃ (কথিতঃ) তম্ পরমাম্ (শ্রেষ্ঠাম্) গতিং (গম্যম্) আহুঃ (বদন্তি), যম্ (ভাবম্) প্রাপ্য (লব্ধা) ন নিবর্ত্তন্তে (ন জায়ন্তে) তৎ মম পরমম্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্) ধাম (স্থানম্)।

পরন্তু কারণরূপ এই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য যে অতীন্দ্রিয় সনাতন স্বভাব, তাহা কার্য্যকারণ-রূপ স্থাবর-জঙ্গমাদি বিনষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না।

যাহা অব্যক্ত অক্ষর নামে অভিহিত, তাহাই পরম গতি বলিয়া আখ্যাত। যাহাকে পাইয়া আর ফিরিতে হয় না, তাহাই আমার সর্ব্বোত্তম ধাম।

সৃষ্টি-রূপ কর্ম্ম সদ্-বস্তুর প্রকাশ। সৎই ইহার উপাদান। কিন্তু যুক্তিতে ইহা টিকে না। যাহা সৎ, তাহার পরিণাম কেন—ইহা মনুষ্য-বুদ্ধির অসার যুক্তি। পরিণাম

আপাত-দৃষ্টির ভ্রান্তি, মূলতঃ নশ্বর বলিয়া কিছু নাই। মূল কারণ হইতে যে কার্য্য তাহা কারণের বিকার; বিকার পরবর্ত্তী বিকারের কারণ স্বরূপ হয়, এইরূপে সৃষ্টি ব্যবহারিক লক্ষণ-স্বরূপ হওয়ায় পরিণামবৎ পরিদৃষ্ট হয়। বিকারের পরিবর্ত্তন হয়, মূল কারণ নিত্য—এই জন্যই যে সকল ভূত কৃত, তাহা কোন কারণে অকৃত হয় না। "ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে"—সৃষ্টি হয় যাহাদের তাহাদেরই লয় হয়; আবার কল্পান্তরে তাহাদেরই আবির্ভাব হইয়াছে; এই জগদ্-ব্যাপারে নূতন সৃষ্টি অথবা নূতন নাশ কিছুরই হইতেছে না; কৃত বস্তুর নাশে ও অকৃত বস্তুর আগম রূপ অসঙ্গত অর্থ তাই ইহা দ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে। আচার্য্যেরা এই সুযোগ লইয়া বলেন, অশেষ ক্লেশের আকর এই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে যখন মুক্তি নাই, নিরন্তর গমনাগমন যখন অনিবার্য্য, তখন জীবের নিরুপায় ভাব শ্রেয়ঃ নহে; মোক্ষ বিষয়ে পুরুষকারকেই জাগাইতে হইবে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, এই বৈরাগ্য যোগাইবার কর্ত্তা কে? জীব না জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা? নিরুপায় অবস্থার অবগতিই জ্ঞানোদয়ের সূচনা করে। একান্ত নিরুপায় না হইলে, আত্মসমর্পণের উৎসাহ জাগে না। বস্তুর ক্রম-বিকাশ আছে; কেন না, সকলই সৎ হইতে সৃষ্ট। অবিদ্যা হইতে মুক্তি স্বাভাবিক; কিন্তু গমনাগমন-রূপ গতির মুক্তি নাই। এই তত্ত্ব যাঁহারা অবগত তাঁহারাই বুঝেন, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথিত শ্লোকের অর্থ—"ন জায়তে ম্রিয়তে" ইত্যাদি তৃতীয় অধ্যায়ের "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" এবং চতুর্থ অধ্যায়ের জন্মমরণ-সমস্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাধান-বাণী "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"। অজ্ঞান জীব অবশ হইয়া কল্পনির্দ্দিষ্ট গতির অনুসরণ করে; ভাগবত পুরুষেরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া কল্পস্বপ্ন সিদ্ধ করেন।

প্রশ্ন উঠিবে, যদি কল্প-বিধৃত সত্যই ভূতগ্রামের নিয়ামক, তাহা হইলে জীবের পুরুষকারের মূল্য কি? সৃষ্টির কারণ স্বয়ং ভগবান। কার্য্য কারণ লইয়া দ্বন্দ্বের কথা এই ক্ষেত্রে উত্থাপন করিব না; ইহা লইয়া দর্শনাদি শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। গীতার মতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ। নিত্য পুরুষই স্বকীয় শরীর হইতে ভূতগ্রামের সৃষ্টি করেন—"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।" সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছু ছিল না, এইরূপ মনে করিবার কোন যুক্তি নাই। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬ শ্লোকের কথা—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—যে বস্তু অসৎ তাহার বিদ্যমানতা নাই, যাহা সৎ তাহার অভাব কোন কালে নাই। সৎ হইতে সৃষ্টি, এই জন্য ইহা নিত্য এবং ভগবান সর্ব্বভূতের কেবল জনয়িতা নহেন, পালয়িতাও।

"আদিত্যবর্ণোভুবনস্য গোপ্তা"—যোগ-নিষ্ঠ ব্যক্তি ইহা দেখেন এবং এই জন্যই তাঁহারা জন্মমৃত্যুর ক্লেশ অতিক্রম করেন—"অমৃতত্বং ব্রজন্তি।"

কথাগুলি ভাগবত গ্রন্থে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। একাদশ স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"অনু, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল, যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে, সকলই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় দ্বারা সংযুক্ত। যে পদার্থ যাহার কারণ ও লয়-স্থান, সেই তাহার মধ্যাবস্থা; অতএব উহাই সৎ, বিকার কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত। বলয় প্রভৃতি তৈজস পদার্থ এবং ঘট-শরবাদি পার্থিব পদার্থ উহার দৃষ্টান্ত।"

উপাদান কারণের অন্য উপাদান কারণ অপ্রসিদ্ধ, কারণ উহা নাই। ব্রহ্ম ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, এই ত্রিলোকের উপাদান-কারণ, ত্রৈলোক্যের লয়স্থান ইহাতেই। কিন্তু পরম লয়ক্ষেত্র ইহা নহে; কেন না, এই উপাদান-কারণেরও উপাদান কারণ আছে; তাহাই পরমধাম। ব্রহ্মের লয় হয়, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে যে পরম অব্যক্ত তাহা শাশ্বত, সনাতন। এই অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, কিন্তু অলীক নহে। এই ক্ষেত্রের চেতনা যতদিন স্থায়ী, ততদিন সৃষ্টির স্থিতি। জীবের স্বাপাবস্থায়, জাগ্রত জীবনের সুপ্তি; কিন্তু তাহা জীবত্বের লয় নহে। ব্রহ্মার স্বাপাবস্থায় তদ্রূপ সৃষ্টির সাময়িক লয় হয়। আদি-কারণের আনন্দ-স্পন্দনে আবার সব মূর্ত্ত চৈতন্যময় হইয়া উঠে। এই জন্যই মায়াবাদীর যে মোক্ষ ও লয়, তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ, বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ তত্ত্ব। কর্ম্মমাত্র গুণসংযুক্ত। গুণ বন্ধন-স্বরূপ। গুণাতীত কর্ম্মের সন্ধান ভারত এখনও পায় নাই। ভাগবতে আছে, 'যাহারা নির্গুণ, তাহারা আমাকে লাভ

করে।" গীতার ছত্রে ছত্রে এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনা যায়; এবং এই "আমি" জন্মমরণরহিত, নিত্য। ইনি কেবল তুরীয়ও নহেন, একান্ত প্রকৃতির অবশ হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করেন না, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বেচ্ছায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ঈশ্বরের আদ্যন্তহীন মহিমা স্বয়ং পার্থও অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। গীতার যোগ বিশ্বরূপ-দর্শন-কালেই গৃহীত হইয়াছিল; তারপর কৃষ্ণচন্দ্রের আনুগত্য ছাড়িয়া তিনি কুলগৌরব-স্বরূপ জ্যেষ্ঠ সহোদর যুধিষ্ঠিরেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। যদি পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনেরই ইহা হইয়া থাকে, তবে 'অন্যে পরে কা কথা'। ভাগবত-তত্ত্ব আজও পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই। জীবের অমর চেতনালাভের স্বপ্ন স্বপ্ন হইয়াই আছে। এই জন্যই ভারতের ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও, ভারতের ন্যায় অবনতি কোন দেশের, কোন জাতিরই হয় নাই।

যাহা প্রাপ্ত হইলে নিবর্ত্তিত হইতে হয় না, তাহা 'আমার পরম ধাম'। এই 'ধাম' শব্দের অর্থ, পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনেকেই 'মুক্ত-স্বরূপ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচার্য্য নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"উপাধ্যস্পৃষ্টং ধামম্"। আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন—"মত্তেজোরূপম্"। অক্ষর অব্যক্তের 'ধাম' মনুষ্য-ধারণার অতীত। শ্রীমৎ শঙ্কর বলেন—'তদ্বাসস্থানং'। শব্দ লইয়া অর্থের বিপত্তি পদে পদে। অক্ষর, অব্যক্ত, কার্য্যকারণ রহিত পরমেশ্বর-তত্ত্বের ধাম লইয়া তাই এইরূপ অনর্থ বাধিয়াছে। আচার্য্য শ্রীধর উপচারে ষষ্ঠী, রাহুর শিরের ন্যায় এই ধাম, এইরূপ বলিয়াছেন। অর্থাৎ রাহুর শির ছাড়া অন্য যখন কিছু নাই, তখন রাহুর শিরের ন্যায় তাঁহার ধামও কথার কথা; ধামের বাচ্য তিনি স্বয়ং।

আমরা বিষয়টাকে এই ভাবে উড়াইয়া দিতে পারি না। রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনেই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত পদ-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করার চেষ্টা ভীম বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। মানুষের সাধ্য এই ক্ষেত্রে কি অসাধারণ রূপে প্রকাশিত হইলে রাষ্ট্র-বিপ্লব সিদ্ধ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সকলই মনুষ্য-চেষ্টার অন্তর্গত ব্যাপার। আর ভাগবত-প্রতিষ্ঠিত পদ-ক্রম অস্বীকার করিয়া জীবের লয়-সাধন প্রকাণ্ড কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কল্পারম্ভে সৎ হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি; সুতরাং সতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জীবনই মুক্ত। লিঙ্গ-শরীর ও অন্তঃকরণ-সম্ভূত গুণ হইতে মুক্ত জীব এই অবস্থায় বিষয়ভোগ বা বিষয়-চিন্তা করে না—দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্ম্মের অধিকারী হয়। গীতায় এই পরম ধাম, পরমগতির প্রাপ্তি-কথাই উক্ত হইয়াছে।

ইহা জীবের চেষ্টায় সিদ্ধ হয় না। দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সবই অভিমান-সঞ্জাত; তাহার সীমা স্বর্গাদি-প্রাপ্তি, ব্রহ্মলোকে স্থিতি। কিন্তু যে পরম ধাম আকাঙ্খা করে, তাহার পক্ষে সাধননীতির কথা বলা হইতেছে—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥" ৮।২২

হে পার্থ, ভূতানি (সর্ব্বানি কার্য্যাণি) যস্য (পুরুষস্য) অন্তঃস্থানি (অন্তর্ভূক্তানি) যেন (পুরুষেণ) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্তম) সঃ পরঃ পুরুষঃ (পরমেশ্বরঃ) তু (নিশ্চিতম্) অনন্যয়া (একান্তিক-লক্ষণয়া) ভক্ত্যা লভ্যঃ (প্রাপ্যঃ)।

হে পার্থ, সর্ব্বভূতই যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, যিনি সমগ্র ভুবন ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারা পাওয়া যায়।

এই শ্লোকে মোক্ষ অথবা লয়ের যে কাল্পনিক ব্যাখ্যা, তাহার মূলচ্ছেদ হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলিয়াছেন "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি…", তাহার পর বিভিন্ন শাস্ত্রবিদ্‌গণের প্রসিদ্ধ মতবাদের উপর দাঁড়াইয়া সেই কথাই অধিকতর বিশদ রূপে বলিলেন—ব্রহ্মাদি স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় ভূতগ্রামই আমারই অন্তর্ভুক্ত। আকাশ দ্বারা ঘটাদি যেমন পরিব্যাপ্ত, এই জগৎ সেইরূপ আমার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। এই "আমি" শেষ হই না। ইহা অজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, ইহার উপর আর কিছু নাই; কাজেই ইহা সকলের আদি কারণ। শ্রুতিও বলেন, "যস্মাৎ পরম্ নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং…" ইত্যাদি। যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, যাঁহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র

ও নীতি মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছে সেই আলোকেই। রাত্রির আকাশের সহিত সম্বন্ধ তাহার জীবনের নাই। প্রদ্যোতের গভীরতম উপলব্ধি তাই এই জগতে অর্থহীন। দিনের আলোকে রাত্রির সম্বন্ধ তাহার নিজের কাছেই কেমন অশোভন, কেমন কুৎসিত মনে হয়। মনের সমস্ত অভ্যাস আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়।

রাত্রে ছিল তাহার অগ্নিশিখার মত নগ্ন, প্রদীপ্ত উপলব্ধি। দিনের আলোয় তাহা একেবারে শ্লথ হইয়া যায়। কত কথাই ত ভাবিবার আছে। রাত্রির আকাশের তলায় নির্ম্মলা ছিল নিখিল নারীর প্রতীক, তাহার অস্তিত্বের রহস্যমুকুর—যে মুকুরে নিজেকে সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিবার অভিযান করিতে চায়। দিনের আলোয় মনে পড়ে নির্ম্মলা একটি পোনের বছরের এই পরিবারের অনূঢ়া মেয়ে মাত্র। তার সংসার আছে, সে সংসারের অনেক সংস্কার অনেক রীতি নীতি আছে, সব জড়াইয়া সমাজের অনুশাসন আছে।

নির্ম্মলাকে সে কেমন করিয়া কামনা করিতে পারে? সামাজিক মানুষ হিসাবে তাহার কোথায় স্থান, সে ত কিছুই জানে না। মিথ্যার আশ্রয় লওয়া ছাড়া সামাজিক রীতিকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় ত নাই। কেমন করিয়া সে তাহা করিবে?

তা ছাড়া, স্বাভাবিক সঙ্কোচও আছে। কেমন করিয়া সে নিজে হইতে আজ একথা পাড়িতে পারে! সমস্ত সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া কোন রকমে কথা তুলিলেও সে কথা থাকিবে কৈন?

সকাল বেলা কেহ উঠিবার আগেই প্রদ্যোৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। গ্রামের উপর ঘন হইয়া কুয়াসা জমা হইয়া আছে। সেই কুয়াসার আবরণে সমস্ত গ্রামকে কেমন পরিত্যক্ত মৃত বলিয়া মনে হয়—সেখানে মানুষ আর নাই, অশরীরী ছায়ারা তাহাদের প্রাচীন বিচরণ-ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছে মাত্র।

নিজেকেও তাহার কেমন অশরীরী বলিয়া মনে হয়। কুয়াসায় সমস্ত গ্রামের মত তাহারও বাস্তব সত্তা যেন গলিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু ছায়া। সে ছায়া জীবনের বিকৃত অনুকরণ করিয়া চলিতেছে মাত্র। সত্যকার জীবনকে আশ্রয় করিবার জন্য তাহার আকুলতার অন্ত নাই, কিন্তু তবু সে নিরুপায়।

গ্রামের ভিতর নানা পথ ধরিয়া প্রদ্যোৎ অনেক ক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। কুয়াসা সরিয়া গেল বেলা পড়িবার সঙ্গে, কিন্তু প্রদ্যোতের অস্থিরতা গেল না।

আজ রবিবার। এতক্ষণ ঘুম হইতে উঠিয়া কমল বিমল রাঙ্গাদাকে খুঁজিয়া হায়রাণ হইতেছে, তাহা প্রদ্যোৎ জানে। আজ তাহাদের অনেক কিছু করিবার কথা। বাহিরের উঠানে পরিষ্কৃত একটুখানি জমিতে প্রদ্যোৎ কপির চারা লাগাইয়াছিল। সে কপি ভালো রকম বাড়িতেছে না। জমিটার ভালো করিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাড়ীর ভিতর লাউ'এর লতা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। একটা মাচা তৈরী করাও প্রয়োজন।

কিন্তু প্রদ্যোৎ কিছুতেই উৎসাহ পায় না। মনের সে প্রশান্তি তাহার কোথায়? নিজের সহিত একটা বোঝাপড়া না করিলে আর নূতন জীবনে শান্তি তাহার মিলিবে না, সে বুঝিতে পারিয়াছে। জীবনে তাহার যে সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে, তাহার নিষ্পত্তি তাহাকে করিতেই হইবে অবিলম্বে। এড়াইয়া গিয়া কোন লাভ নাই। গত কাল ও বর্ত্তমান দিনটির মধ্যে বিরাট্ যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিলেই তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে না। আগের দিনের সে নিশ্চিন্ত শান্তি সত্যই আর তাহার নাই। বিগত রাত্রিকে ভুলিয়া একান্ত প্রশান্ত মনে শুধু এই পরিবারটির সাহায্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া সে তৃপ্ত আর হইবে না। মহানুভবতার মোহে নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়াও নয়। আর অত বড় ফাঁকি নিজেকে সে দিতেও চাহে না।

অনেক বেলায় সে বাড়ী ফিরিয়া গেল। কমল বিমল রাঙ্গা-দার রহস্যজনক অন্তর্ধানে প্রথমতঃ অবাক্ হইয়াছিল, তাহার পর অভিমান করিয়াছে।

বিমল সে অভিমান বজায় রাখিল, কিন্তু কমলের রাঙ্গাদাকে অভিমানের কথাটা না জানিতে দেওয়া

সমীচিন মনে হইল না। সবে সে স্নান সারিয়াছে। ভিজা অবাধ্য চুলের ভিতর বৃথাই টেরী কাটিবার চেষ্টা করিতে করিতে সে রাঙ্গাদাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল,—"বড়দি, আজ আমি আলাদা ভাত খাব! কার সঙ্গে আমাকে দিও না যেন!"

বড়দি রান্না-ঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিতেছিলেন, ব্যাপারটা না বুঝিয়াই বলিলেন—"কেন রে! তোর ছোড়দার সঙ্গে আবার কি হল; তার পাত আবার কোথায় করবো তাহলে?"

বড়দিদির বুদ্ধির অভাবে একটু বিরক্ত হইয়া কমল বলিল,—"ছোড়দার পাত করতে বুঝি আমি বারণ করেছি, বলছি আমি কারুর সঙ্গে খাব না!"

এবার উঠানে প্রদ্যোৎকে দেখিতে পাইয়া বড়দি ব্যাপারটা বুঝিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ এই ব্যাপার! সত্যি তোমার ত ভারী অন্যায় বাপু প্রদ্যোত, সকাল থেকে তোমার মালি মজুর দুজনে হা পিত্যেশ করে' বসে', তুমি না বলে' কয়ে' কোথায় গিয়েছিলে! যেমন গিয়েছিলে তেমনি শাস্তি ভোগ কর। কমল আজ তোমার সঙ্গে খাবেই না। দেখি, আজ কেমন করে' তোমার পেট ভরে!"

তাহাদের গুরুতর অভিযোগের ব্যাপারটা এমন করিয়া পরিহাসে হালকা হইতে দিতে বিমল রাজী নয়। তাছাড়া 'হা পিত্যেশ' করিয়া বসিয়া থাকার কথাটা অপমানজনক বলিয়াই তাহার মনে হয়। এতক্ষণ সে চুপ করিয়াছিল, এইবার হঠাৎ শূন্য আকাশকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আমরা নিজেরা একটা বাগান করছি।" তাহার পর কমলকেও দলে টানা প্রয়োজন বোধ করিয়া বলিল,—"খুব ভালো একটা জায়গা দেখে এসেছি না রে, কমল?"

কমল দাদার কথার মারপ্যাচ অত না বুঝিয়া বলিয়া ফেলিল—"কোথায়?"

বিমল চটিয়া উঠিয়া ভেংচাইয়া বলিল—"কোথায়? হাবা কোথাকার!" বড়দি হাসিয়া উঠিলেন। প্রদ্যোতও সে হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যেন আড়ষ্ট ভাবে। এই পরিবারটির সহিত সম্বন্ধে কিছুতেই আজ সে যেন আর সহজ হইতে পারিতেছে না। সাধারণ প্রাত্যহিক ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবে যোগ দিবার ক্ষমতা তাহার যেন নাই। অথচ এমনি হাস্য-পরিহাস আনন্দ লইয়াই এতদিন সে সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত ছিল। কেমন করিয়া সে নিজেই নিজেকে দূর করিয়া ফেলিয়াছে একদিনে—ভাবিয়া তাহার বিস্ময় লাগিল।

বিকাল বেলা হঠাৎ একটা জরুরী কাজের অছিলায় প্রদ্যোৎ কলিকাতা রওনা হইয়া গেল। বাড়ী হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিবার সময়ে সমস্ত চিন্তা সে যেন জোর করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু ট্রেণে উঠিয়া বসিবার পর আর নিজের কাছে সত্যটাকে গোপন করা গেল না। সে পলাইয়া আসিতেছে। সত্যই ভীরুর মত জীবনের নবোদ্ঘাটিত সত্যের সম্মুখীন হইবার, জীবনে তাহার মূল্য স্বীকার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে তাই পাশ কাটাইয়াছে।

কলিকাতাগামী রবিবারের বিকাল বেলার ট্রেণ। লোকজন নাই বলিলেই হয়। একটি কামরায় সে একাই ছিল যাত্রী। ট্রেণ ছাড়িয়া দিবার পর জানালা হইতে দ্রুত অপস্রিয়মান ধূসর প্রান্তর ও গ্রামের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মন গভীর হতাশায় ভরিয়া গেল। শুধু মাঠ ও গ্রাম নয়, তাহার মনে হইল—নূতন জীবনের সব কিছু সঞ্চয়, সব আশ্রয় তাহার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে। সরিয়া যাইতেছে হয়ত তাহার দুর্ব্বলতায়, সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই বলিয়া, ধরিয়া রাখিবার সাহস নাই বলিয়া। যাইহোক, আবার সুরু হইল যে তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কোথায় সে যাইবে! অন্ধকার দিগন্তে কোন পথই ত সে দেখিতে পায় না। কোন নিষ্ঠুর দেবতা তাহার জীবনের সূত্র বুনিতেছেন, কে জানে! কে বুঝিবে, কি গভীর তাঁহার অভিসন্ধি! সাধারণ কোন পথ তাহার জন্য নয়। সহজ ভাবে শান্তি উপভোগ করিবার অধিকার তাহার নাই। প্রত্যেক মানুষের দেবতাও বুঝি বিভিন্ন। অন্ততঃ যে দেবতা তাহার জীবনের

ভার লইয়াছেন, মূলে তাঁহার বরাভয় প্রসন্নজ্যোতি বুঝি নাই। যে অন্ধকার অসীম আকাশে নক্ষত্রলোকের মাঝে ব্যবধান রচনা করিয়াছে সেই অন্ধকারে বুঝি তাঁহার আসন। দুর্বোধ তাঁহার অভিপ্রায়, দুজ্ঞেয় তাঁর পথ। তিনি তাঁহার জীবনে অন্ধকার-যবনিকা টানিয়াছেন আপন খেয়ালে। সে যবনিকা সে তুলিতে চাহিয়াছিল, সে অন্ধকার ঢাকিতেছিল নূতন জীবনের রূপালি জাল বুনিয়া; কিন্তু আবার নিষ্ঠুর হাতে সে নক্সা তিনি ছিঁড়িয়াছেন, জট পাকাইয়া সমস্ত ব্যর্থ করিয়াছেন।

বাহিরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। কামরার ভিতরের আলো ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই নির্জ্জন কামরা যেন ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন এক জগৎ হইয়া উঠিতেছে তাহারই মনের মত। পরিচিত পৃথিবী নিমগ্ন হইয়া গেল অন্ধকারে। এখন শুধু ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা।

গত দিনটার সমস্ত ব্যাপার আর একবার সে মনে মনে এখন পর্য্যালোচনা করে। সে ভীরুর মত পলাইয়া আসিয়াছে সত্য, দিন ও রাত্রির গভীর উপলব্ধির সম্মান সে যে রাখিতে পারে নাই, একথাও সে জানে; কিন্তু তাহার উপায় কি ছিল?

আপনার মনের এ পরিচয় পাইবার পর আর নিজের সহিত ভণ্ডামি করিয়া ওই পরিবারের সহিত সহজ সম্বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করিলে শুধু নিজেকেই সে পীড়িত করিত না, আর একটি মেয়ের জীবনেও অনর্থক বেদনার বোঝা বাড়াইয়া তুলিত

তাহার চেয়ে নির্ম্মলা ভুলিয়া যাক্। সেই সুযোগই সে দিতে চাহে নিজেকে অপসারিত করিয়া। যেখানে ইহার সার্থক হইবার উপায় নাই, সেখানে বিস্মৃতিই ভাল। তাহার মন অবশ্য বিদ্রোহ করিয়া বলিয়াছে, সার্থক হইবার উপায় নাই কেন? কিন্তু সত্যই অন্তরের গভীর প্রদেশে সে অনুভব করিয়াছে, মিথ্যার সাহায্যে কোন সত্যকার সার্থকতা মিলিতে পারে না। এ মিথ্যা কখনও প্রকাশ হোক বা না হোক, তাহার মনে গোপন থাকিয়াই সমস্ত জীবন যে বিষাক্ত করিয়া দিবে।

না তার চেয়ে এই ভাল! নিজেকেই সে নির্ব্বাসিত করিবে। এ নির্ব্বাসনের বেদনা যে কত গভীর তাহা এখনও অবশ্য সে নিজেই ভাল করিয়া উপলব্ধি করে নাই। জীবনের প্রচণ্ড পিপাসা লইয়া সে যাহা কিছু গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহা কিছু আশ্রয় করিয়াছে, সমস্তই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চারিধারে তাহার অসীম শূন্যতা। প্রথম যেদিন এমনি একটি ট্রেণের কামরায় সে নিজেকে অসহায় ভাবে আবিষ্কার করিয়াছিল, সেদিনও তাহার জগৎ ছিল শূন্য। কিন্তু এ শূন্যতা তাহার চেয়েও ভয়াবহ, তাহার চেয়েও দুঃসহ। সেদিন সুদূর দিগন্তে কোথাও কোন তটরেখা ছিল না। আজ নিজে হইতে প্রিয় ও পরিচিত আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অকূলে আপনাকে সে ভাসাইয়াছে। পিছনের আকর্ষণ প্রচণ্ড, তবু সে ফিরিবে না। তাহার জন্য আছে শুধু অকূল সাগর ও অন্তহীন অন্ধকার! তবু তাই ভাল। সমস্ত বেদনা সে একাই বহন করুক। আর কাহারও জীবনে কোন ক্ষতচিহ্ন যেন না থাকে!

কলিকাতায় আসিয়া প্রদ্যোৎ পরের দিনই মার কাছে একটা চিঠি লিখিয়া দিয়াছে। লিখিয়াছে যে, এখন তাহাকে দিনকতক কলিকাতাতেই থাকিতে হইবে। দারবাকে আর কিছুদিন সে যাইতে পারিবে না। তাই বলিয়া তাঁহাদের চিন্তার কোন কারণ নাই, সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত সে এখান হইতেই করিবে।

প্রদ্যোতের হঠাৎ রবিবারেই চলিয়া যাওয়ায়, মা একটু অবাক্ হইয়াছিলেন। দারবাক হইতে এমন করিয়া হঠাৎ প্রদ্যোৎ কখনও যায় নাই। অন্যান্য বারে তাহার ধরণ দেখিয়া বোঝা যায় যে, সোমবার নেহাৎ না যাইলে নয় বলিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে সে যাইতেছে। অথচ এবার হঠাৎ তাহার এত তাড়া কেন?

যাইবার সময়ে প্রদ্যোতের ধরণও কেমন তাঁহার অস্বাভাবিক মনে হইয়াছিল। প্রদ্যোৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক, কেমন যেন একটু শঙ্কিত তাহার ভাব। বৃদ্ধার ক্ষীণ দৃষ্টিতেও প্রদ্যোতের অস্থিরতা সেদিন ধরা পড়িয়াছিল।

তিনি সেদিন বিস্মিত হইয়াছিলেন মাত্র। প্রদ্যোতের

চিঠি পাইয়া তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। প্রদ্যোতের অমন ভাবে চলিয়া যাওয়ার পর এরকম চিঠি কেমন যেন অত্যন্ত সন্দেহজনক। কি যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হয়।

চিঠি আনিয়াছিল বিমল। রাঙ্গাদাকে রবিবারের ত্রুটির জন্য সে এখনও ক্ষমা করে নাই, সত্য। সহসা অমন করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য রাগও সে ভয়ানক করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া রাঙাদার চিঠি হাতে পাইয়া একটু উল্লাস প্রকাশ না করিয়া কেমন করিয়া থাকা যায়!

পিয়নের হাত হইতে চিঠিটা এক রকম কাড়িয়াই লইয়া সারা বাড়ী খানিক সে চীৎকার করিতে করিতে অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইল। চিঠির পাঠোদ্ধার তাহার নিজেরই করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা আর হইল না। নির্ম্মলা কোথায় ওৎ পাতিয়া ছিল। থপ্ করিয়া এক সময়ে সে চিঠিটা ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল!

এমন অসময়ে অকারণে প্রদ্যোতের চিঠির কথা শুনিয়া মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রদ্যোৎ চিঠি দিয়েছে নাকি?"

নির্ম্মলা চিঠির খানিকটা ইতিমধ্যে বুঝি পড়িয়াছে। মায়ের কোলের কাছে চিঠিটা ফেলিয়া দিয়া বলিল—"হ্যাঁ এই যে—"

মা বলিলেন—"আমায় দিয়ে কি হবে! পড় না কি লিখেছে!"

কিন্তু নির্ম্মলার দেখা আর পাওয়া গেল না। অগত্যা বড় মেয়েকে ডাকাইয়াই মাকে চিঠিটি শুনিতে হইল। চিঠির মর্ম্ম জানিয়া কিন্তু আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না।

অনাত্মীয় এই ছেলেটির উপর তাঁহার গভীর স্নেহ পড়িয়াছিল সত্য। না পড়িয়া উপায় কি? ছেলেটি তাঁহার মৃত পুত্রের স্থান যে সত্যই অধিকার করিয়াছে। শুধু অধিকার নয়, তাহার বেশী কিছু করিয়াছে। এত গভীর ভাবে, এত সহজে সে নিজেকে এ সংসারের সহিত জড়াইয়াছে যে, আজ তাহার অসাধারণ আত্মত্যাগের কথা সব সময়ে মনেও থাকে না।

কিন্তু প্রদ্যোতের সম্বন্ধে স্নেহের অধিক তাঁহার কিছু ছিল, তাহা হয়ত খানিকটা কৃতজ্ঞতা, খানিকটা দীনতা। প্রদ্যোৎ এ পরিবারে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত আসিয়াছে। ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা কেমন করিয়া করিবেন ভাবিয়া যখন তিনি কুল পাইতেছিলেন না, তখন কোথা হইতে আসিয়া প্রদ্যোৎ তাঁহার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে। যে সংসারে ভিত্তি পর্য্যন্ত টলিতেছিল, তাহা সে অসাধারণ অমানুষিক আত্মত্যাগের দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। এতখানি সৌভাগ্য আশারও অতীত। এক এক সময়ে অমল বাবুর মার সমস্ত ব্যাপারটা কেমন বিশ্বাস হয় না। কেমন আশঙ্কা হয় যে, ইহা স্থায়ী হইতে পারে না। প্রদ্যোতের উপর নির্ভর করিবার অভ্যাসের দরুণই তিনি যেন আরো দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সারা জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিয়া ও পরাজিত হইয়া তাঁহার নিজস্ব শক্তিও আর নাই। এখন প্রদ্যোতের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় চিন্তাই তাঁহার পক্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এবং এইখানেই তাঁর দীনতা।

সেই দীনতাই আজ বুঝি একটু প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রদ্যোতের চিঠি পাইয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া ওঠেন, কিছু বুঝিতে না পারিলেও মনে হয় কোথায় যেন তাঁহাদেরই কোন অপরাধ বুঝি হইয়া গিয়াছে। জনে জনে সকলকে ডাকিয়া তিনি প্রদ্যোৎ কিছু বলিয়া গিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করেন।

বড় মেয়েকে ডাকিয়া বলেন—"হ্যাঁ রে রাগ করে যায়নি ত প্রদ্যোৎ!"

বড়দি হাসিয়া বলেন—"তোমার যেমন কথা মা! রাগ করে' যাবে কেন? সে কি তেমন ছেলে!"

মার মনের সন্দেহ তবু যায় না, জিজ্ঞাসা করেন, "তোরা কেউ কিছু বলিস্‌নি ত!"

এবার একটু বিরক্ত স্বরেই বড়দি বলেন,—"তোমার কি হয়েছে বলত? কি যা তা ভাব্‌ছ! দরকার হয়েছে, তাই কলকেতা গেছে। তার ভেতরও বলাবলি, রাগ কোথায় পাচ্ছ?"

মা একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন, বলেন—"না এমনি

ভাব্‌ছি! হঠাৎ ছুটির দিনেই চলে' গেল। আবার এখন আসতে পারবে না লিখেছে!"

বড়দি'র মন প্রদ্যোৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। এসব আলোচনা তাই তাঁহার কাছে নিতান্ত অর্থহীন মনে হয়!

"লিখেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই কাজ আছে।" বলিয়াই বড়দি এবার নিজের কাজে চলিয়া যান।

মার মনে কিন্তু সন্দেহের একটু কাঁটা বিঁধিয়াই থাকে। নিজের মনে অনেক কিছু পর্য্যালোচনা করিবার পর সহসা তিনি যেন প্রদ্যোতের অপ্রসন্নতার কারণ আবিষ্কার করেন। পাড়ায় নির্ম্মলার যে সম্বন্ধ হইতেছে, তাহাতে প্রদ্যোতের আপত্তি ছিল তিনি জানেন। তাঁহার মনে হয়, সেই সম্বন্ধের জন্য সেদিন জেদ করিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। সব কিছুর ভার যখন সেই লইয়াছে তখন তাহার মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করা ত উচিত নয়। হয়ত প্রদ্যোৎ তাহাতেই অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

এ কথা মনে হইবা মাত্র প্রদ্যোৎকে চিঠি লিখাইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন। নির্ম্মলার বিবাহের কথা, প্রদ্যোতের সম্মতি অনুমান করিয়া তিনি এক রকম দিয়াই ফেলিয়াছেন, এই যা বিপদ্‌। কিন্তু তাহা হইলেও, কথা ফিরাইয়া লইয়া পাত্রপক্ষের বিদ্বেষ-ভাজন হইতেও এখন তিনি প্রস্তুত। প্রদ্যোৎকে অপ্রসন্ন করা কোন মতেই চলে না।

চিঠিপত্র সাধারণতঃ নির্ম্মলাই লিখিয়া থাকে। কিন্তু আজ ডাকাডাকি করিয়াও তাহাকে কোন মতে বিছানা হইতে তুলিয়া আনা যায় না। অসুখের নাম করিয়া সেই যে সে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে, আর তাহার উঠিবার নাম নাই। অগত্যা মা বিমলেরই শরণাপন্ন হইলেন এবং তাহার দ্বারা কোন রকমে অবান্তর আরো অন্যান্য কথার ভিতর এই কথাটাই জানাইতে চেষ্টা করিলেন যে, প্রদ্যোতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ তিনি করিবেন, একথা সে যেন না মনে করে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ চিঠির পরও এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল; তবু প্রদ্যোতের কোন উত্তর পাওয়া গেল না। রবিবারের ছুটিতে সে না হয় আসিতে পারে নাই, কিন্তু একটা চিঠি দিয়া খবর দিতে ও খোঁজ লইতে সে কি পারিত না! তাহার হইল কি?

(ক্রমশঃ)

প্রগতির পথে জাপানী বস্ত্র-শিল্প—

জাপানের সকল প্রকার বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বস্ত্র-শিল্পের স্থানই বোধহয় ব্যবসা হিসাবে সব চেয়ে উঁচু। জাপানে বস্ত্র-শিল্পের প্রথম বোধন হয় ১৮৬৭ সালে এবং সেই হইতে মাত্র অনধিক সত্তর বৎসরের মধ্যে যাদুর মত ইহার যে ক্রমোন্নতি হইয়াছে তাহা একান্তই বিস্ময়কর। এই বিপুল বাণিজ্য-শিল্পের সুনিয়ন্ত্রণের জন্য জাপান কটন স্পিনারস্ এসোসিয়েসন গঠিত হয়। ১৯২৭ সালে এই কটন-সঙ্ঘের অধীনে প্রায় পঞ্চাশটি কোম্পানী ছিল যাহাদের মূলধন সে সময়ে ছিল মোট ৪৯৭,০৮৭,৫০০ ইয়েন ও নানা প্রকারের রিজার্ভ ছিল ২২৯,৩২৬,-৪৮৪ ইয়েন, এবং চরকা ও তাঁতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫,৪১০,৭৫২ ও ৭১,৭১৯। এখনও দশ বৎসর হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই জাপানের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি এমনিভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, যে অনেক সময় বিশ্বাস করাই কঠিন হইয়া উঠে। বছর সাতেক পূর্ব্বেও জাপানের সমুদয় কারখানার উৎপন্ন সূতার পরিমাণ ছিল মোট ২,৬০৭,৭৪৬ গাঁট (৪০০ পাউণ্ডের গাঁট) এবং এই জন্য মোট ২,৮০৩,০২৭ গাঁট কাঁচা তূলা ব্যবহৃত হইত। জগতে কাঁচা তূলার বাজারে মার্কিণের নীচেই ছিল জাপানের স্থান। জাপানের সর্ব্বমোট আমদানী-রপ্তানীর মধ্যে যথাক্রমে তূলা ও তুলাজাত প্রস্তুত-দ্রব্যের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩১ ও ২৪ ভাগ। স্বাভাবিকই জাপানের জাতীয় ধনাগম ও নির্গমের অনেকখানিই নির্ভর করে এই প্রধান শিল্পের উপর। তাই এত বড় স্বার্থ যেখানে, সেখানে জাপান-সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে থাকিবে তাহা নিশ্চয় করিতে কল্পনার আবশ্যক হয় না।

জাপানের বস্ত্র ও সূতার বাজার হইতেছে সাধারণতঃ চীন, ভারত ও দক্ষিণ সাগরস্থ দ্বীপসমূহ। চিনে সূতা-শিল্পের ক্রমোন্নতির জন্য, এবং ভারতে স্বদেশী আন্দোলন-জনিত বস্ত্রশিল্পের প্রসার হেতু ও অন্যান্য বহিঃ-প্রতিযোগিতার দরুণ জাপানী সূতার চাহিদা দুনিয়ার হাটে ক্রমশঃ কমিতে সুরু করায়, ১৯২৬।২৭ সাল হইতে জাপানী বস্ত্র-শিল্পী বস্ত্রবয়নের উপর অধিকতর জোর দেয়। সূতার ঘাটতি জাপান বস্ত্র-রপ্তানীর দ্বারা পোষাইয়া লয়। এই সময়ে ভারতে সর্ব্বমোট ব্যবহৃত সূতা ও বস্ত্রের মধ্যে জাপানের অংশ শতকরা দুই-তিন ভাগের অধিক ছিল না।
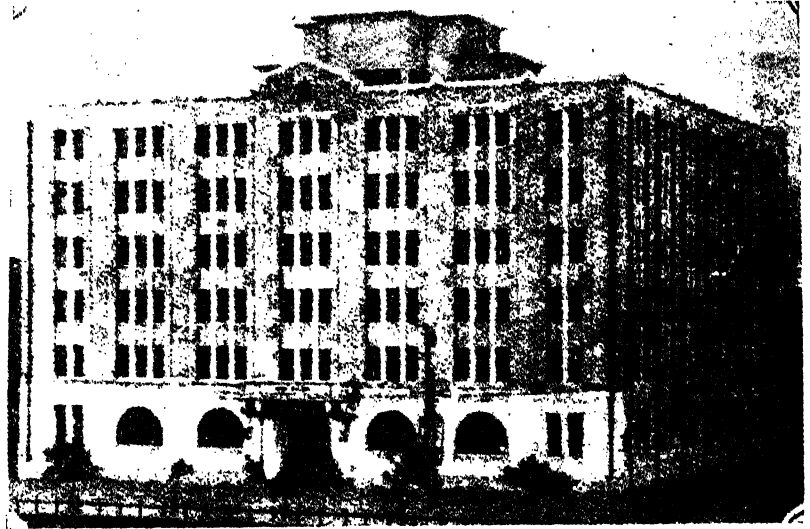
গোসো বিল্ডিং, কাটুনী-সঙ্ঘের হেড্ অফিস

জাপানের আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়াই জাপানের সমৃদ্ধি ও সাধারণ জীবনধারণ সমস্যা নির্ভর করে প্রধানতঃ শিল্প-বাণিজ্যের উপর। এই প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদেই বোধ হয় জাপানীদের শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিভাও অদ্ভুত। পঞ্চাশ বৎসর কেন, এমন কি বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ইংলণ্ডের প্রভাব বহির্বাণিজ্য-জগতে একচেটিয়া ছিল। যুদ্ধের পরে বিধ্বস্ত জাতি-সমূহের মধ্যে পুনঃসংগঠনের যে প্ররোচনা জাগে, তাতেই ইংলণ্ডের বাণিজ্যপ্রাধান্য ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। জাপানী প্রভৃতি জাতি প্রথম প্রথম ইংলণ্ডের নিকট হইতে শিল্প-কারখানার জন্য যে সকল কল-কব্জার আমদানী করিত, তাহাও স্বদেশে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করায় ইংলণ্ডের সে আয়ের পথেও বাধা পড়িল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যজগতে এই সময় হইতেই ভীষণ প্রতিযোগিতা ও সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতি ক্রমশঃ পরিহৃত হইয়া সংরক্ষণ শুল্কের প্রচার একে একে প্রতি জাতিকে ঘিরিয়াই মাথা তুলিতে সুরু করিল। এ ক্ষেত্রে জাপান একরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াই দাঁড়াইল।

আপোষের পূর্ব্বকথা—

জাপানীর সস্তা মাল দুনিয়ার বাজারে সর্ব্বত্রই বিশেষ করিয়া ভারতে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। ভারতের নিজের ক্ষেতের তুলা দিয়া তৈরী মালও জাপানী মালের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। ল্যাঙ্কাশায়ারের তো কথাই নাই। ১৯৩১-এর ১২ই ডিসেম্বর জাপান স্বর্ণ-সম্বন্ধ ছিন্ন করায় ও টাকার বিনিময়ে ইয়েনের মূল্য ক্রমশঃ কমিতে থাকায়, জাপানী শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের পরিমাণ যা দাঁড়াইল তাতে ভারতীয় বা ব্রিটিশ টেক্সটাইল জিনিষের মূল্যের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ হইয়া পড়িল। জাপানী মালের এই অবিশ্বাস্য একসচেঞ্জ ডাম্পিংয়ের জন্য ম্যানচেষ্টার ও পশ্চিম ভারতীয় অনেকগুলি কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। এই সর্ব্বনাশের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ব্রিটিশ ও ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফলে ভারত গভর্ণমেণ্ট ল্যাঙ্কাসায়ার ব্যতীত সকল রকম বহিরামদানী শিল্পদ্রব্যের উপর প্রথম শতকরা ৫০, পরে বৃদ্ধি করিয়া ৭৫ মুদ্রা রক্ষণ শুল্ক বসাইল। ইঙ্গ-জাপ বাণিজ্য সর্ত্তানুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট ছয় মাস পূর্ব্বে জাপ সরকারকে এই শুল্ক বিষয়ে জানাইলে, জাপ গবর্ণমেণ্ট উহার প্রতিশোধ লইল ভারতের কাঁচা তুলা বয়কট করিয়া। জাপান ভারতীয় তুলার

আমদানী তুলার গুদাম, টোকিও

প্রায় এক তৃতীয়াংশের খরিদদার। বাকী তুলা সে মার্কিণ ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে খরিদ করে। জাপানের বাণিজ্য-বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ও অসামান্য। সে নবাধিকৃত মাঞ্চুরিয়ায় তুলার চাষ করিবে ও উৎপন্ন মালের বাজার সৃজন করিবে বলিয়া হুমকী দেখাইল। প্রথমটা ব্রিটেন বা অন্যান্য জাতি ভাবিয়াছিল বুঝিবা জাপান এত সস্তায় মাল বেচিয়া অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিবে না। কিন্তু সমস্যা তো ভাবী কালের জন্য। ততদিনই বা ব্রিটেন প্রভৃতি বাণিজ্য নির্ভরশীল জাতি বাঁচে কি করিয়া! বিশেষ জাপান তুলা খরিদ বন্ধ করায়, তুলার উৎপাদন-কারী ভারতের চাষীর দুরবস্থা চরমে উঠিতে লাগিল। বাংলার ধনাগমের সর্ব্বাপেক্ষা বড় পন্থা পাটের অবস্থাও

তথৈবচ। কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় জমিদার, মহাজন, সরকার সকলেরই 'পরিত্রাহি' ডাক ছুটিল। তাই সবুর সইল না,—জাপানের সঙ্গে আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইতে হইল।

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি—

অনেক কথা-কাটাকাটির পর জাপানের ভারতীয় তুলা ক্রয় এবং ভারতে জাপানী বস্ত্রের আমদানী সম্পর্কে সম্প্রতি ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তিনামার মর্ম্মকথা মোটামুটি এই যে, জাপান ভারতীয় ১৫ লক্ষ গাঁইট তুলা ক্রয়ের বিনিময়ে ভারতবর্ষে ৪০ কোটি গজ পর্য্যন্ত বস্ত্র রপ্তানী করিতে পারিবে। এই সর্ত্তের বাহিরেও উপযুক্ত শুল্ক দিয়া জাপান সাড়ে বার কোটি গজ বস্ত্রের কারবার স্বাধীনভাবেও করিবার পক্ষেও কোন বাধা থাকিবে না। উহা ছাড়াও শুল্ক ও বস্ত্রের হার বিষয়ক কতকগুলি সর্ত্ত পরিষ্কাররূপে বিবেচিত ও লিখিত হইয়াছে। এই চুক্তি কার্য্যকরী হইবার সময় হইতে শুল্কের হার ৭৫ মুদ্রা হইতে কমিয়া ৫০ মুদ্রায় দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান জাপ-ভারত চুক্তি ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। বস্ত্র আমদানী করার জন্য ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ্চ ও তুলা ক্রয়ের জন্য ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর বছর গণ্য করা হইবে।

চুক্তির অন্তরালে—

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে বোম্বাইয়ের তুলা চাষী ও ব্যবসায়ীর কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বাংলার লাভের অংশ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সমগ্র ভারতের তুলনায় বাংলার তুলার উৎপাদন নগণ্য; উপরন্তু বাংলার উদীয়মান বস্ত্রশিল্পের প্রভূত ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সর্ত্তানুযায়ী জাপানের পক্ষে ভারতীয় তুলার ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে বড় বাধা হইবে না। অপর পক্ষে এই সর্ত্তের সূত্র ধরিয়া জাপ-সরকার বা জাপানের কাটুনি-সমিতি (রাঙ্গেকাই) মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়িগণের বিনা সাহায্যেও সোজাসুজি ভারতের বস্ত্র-বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। ভারতবর্ষ বছরে সর্ব্বসমেত প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি গজ মাত্র বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। কিঞ্চিদধিক তিনশো কোটি গজ মত বস্ত্র ভারতীয় কাপড় কলগুলি হইতে উৎপন্ন হয় বা চেষ্টা করিলে আরও বেশী হইতে পারে। এমতাবস্থায় লঙ্কাসায়ার বা জাপানের ৪০ কোটি গজ বস্ত্রের বাজার কোথায়? ম্যানচেষ্টার কাটুনী সমিতিরও এ বিষয়ে ভাবা উচিত। রান্সিম্যান প্রভৃতির টনক পড়া দেখিয়াই বুঝিতে বাকী থাকে না, যে বিলাতের বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগেরও এ বিষয়ে চৈতন্য উদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অটোয়া চুক্তি অনুযায়ী ম্যানচেষ্টার যদি ভারতীয় তুলা খরিদ করিত, তাহা হইলে বিষয়টা এত দূর গড়াইতে পারিত না। সর্ব্বোপরি, জাপানীদের বস্ত্রের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইলেও, মূল্য-সমস্যার মীমাংসা যেমন তেমনিই রহিয়া গেল। একটা নৈতিক দায়িত্বের কথা উঠিয়াছিল; কিন্তু জাপান আকারে-ইঙ্গিতে জানাইয়া
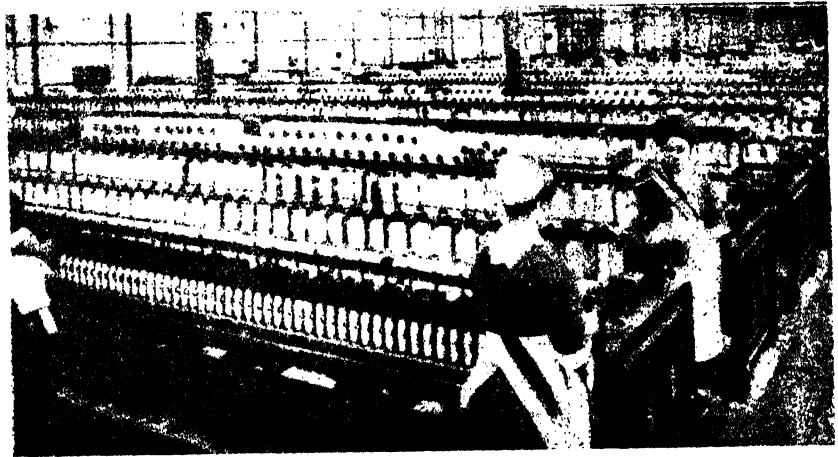
বস্ত্র শিল্প কারখানার অভ্যন্তর

দিয়াছে, যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমদানী-রপ্তানীর সাধারণ নীতির উপর নির্ভর করাই বিজ্ঞের পন্থা। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুনিয়ায় জাপান চালবাজীতে পাকা ওস্তাদ। হইয়া একটা কারণ জাপ-সরকারের ও জাপ-জনগণের স্বার্থ অচ্ছেদ্য। জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য ব্যষ্টির বা বিশেষ সমষ্টির স্বার্থ-সঙ্কোচনে কোন প্রতিবাদ সেখানে উঠে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই জাপানীই কিন্তু ভারতীয় 'পিগ্ আইরণে'র উপর শতকরা আড়াইশো মুদ্রা পর্য্যন্ত শুল্ক বসাইতে দ্বিধা করে নাই; সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বেও জাপানে ভারতীয় চাউল আমদানী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধই হইয়াছিল। ভারতের এত দূর আগাইবার মত দিন এখনও স্বপ্ন। তবে ইহাও ঠিক যে, ভারতীয় তুলার উন্নতি ও ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে না যতদিন ভারতের কলে হয়, ততদিন এ সমস্যার মীমাংসাও সুদূরপরাহত।

চলচ্চিত্রের প্রভাব—

মানুষের রুচি নিত্যকালের জন্য একরূপ থাকে না। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে রুচির রূপও বদলাইয়া যায়। এমন দিন ছিল এই বাংলাতেই, যখন ভাসান-কবি-কথকতার আসরে দলে দলে লোকের ভীড় হইত। বহির্জগতের সম্পর্কহীন চিত্তে ইহার প্রভাব ছিল প্রচুর। মুগ্ধ হইয়া সহজ প্রাণের মানুষ শুনিত তার নিজস্ব অতীতের গৌরব-কাহিনী। সমাজজীবনের কেন্দ্র ছিল তখন পল্লী। তারপর আসিল যাত্রা—অপেরার যুগ। গ্রামে গ্রামে পাল-পর্ব্ব-উৎসবের ইহা ছিল একটা একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রাণ-মনের মাঝে দ্বন্দ্বময় সমাজ-জীবন সুরু করিয়াছে উঠা-নামা। পল্লীর সমাজ-সংস্থার ভাঙন ও সহরে-সভ্যতার গঠন চলিয়াছে দ্রুত। স্বদেশের সত্যিকারের সমাজ-ইতিহাস-পুরাণের অবিমিশ্র চিত্রই প্রস্ফুটিয়া উঠিত এই সকল অভিনয়ের বিষয় বস্তুর মধ্য দিয়া। তারপর পশ্চিমে হাওয়ার সঙ্গে আসিল চিত্ত-চমৎকারী দীপালোকিত মঞ্চ-শিল্পের সকল সৌকুমার্য্যের সমাবেশ। সে রকমারী সাজ-সজ্জা ও দীপালী-উৎসবের নীচের অন্ধকারে অলক্ষিত ও অবহেলিত হইয়া পড়িল যাত্রা-অপেরা প্রভৃতি। মানুষের গভীরের ভাবের তারে মূর্চ্ছনা না তুলিয়া উহার নিতান্ত বাস্তবিকতার অনুকরণ-প্রতিচ্ছবি নড়াচড়া সুরু করিল মানুষের মনটার বহির্ভাগ লইয়া। প্রতি নগরীর বুক জুড়িয়া আলোর আদরার অন্তরালে পসরা বিছাইয়া বসিল রঙ্গমঞ্চ। বারবণিতার অবাধ প্রবেশে নাট্যশিল্প হারাইল তার পবিত্রতা ও আভিজাত্য—সমাজ-জীবনের কৌতুহল সৃজন করিলেও, প্রবঞ্চিত হইল হৃদয়ের সংশয়হীন সহানুভূতি হইতে। পূর্ণ পরিণতি না পাইতেই থিয়েটার ম্লান হইয়া পড়িল চলচ্চিত্রের চকিত আলোর চঞ্চল অঞ্চল-তলে। সিনেমা শিল্প—সবাক্ ও নির্ব্বাক্—

মাষ্টার মোদক বা ভারতীয় 'জ্যাকি কুগান'

বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিক মানুষের অপূর্ব্ব উৎকর্ষ, বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতার বিস্ময়কর বাহন। ভারতে ইহার অনুপ্রবেশ খুব বেশী দিনের কথা নয়। কিঞ্চিদধিক এক যুগ পূর্ব্বে ভারতীয় তথা বাংলার নিজস্ব কোন অধিকার এই গতিচিত্র-ক্ষেত্রে ছিল না। সুদূর পল্লী অঞ্চল এখনও ইহার প্রভাবমুক্ত। বুদ্ধির কোটায় বসিয়া মনটাকে টানিয়া সুদূরপ্রসারী কল্পনার অধরাপ্রান্তে পৌছাইয়া দিবার প্রচেষ্টার মাঝেই মায়ালোকের রহস্যঘেরা বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় চিত্রাভিনয় এখনও শিল্প-পর্য্যায়ে উঠিতে পারে নাই। রঙ্গমঞ্চ হইতে সদ্যাগত চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীর চলচ্চিত্রে যে পারিপার্শ্বিকতার সৃজন, অন্তর-

বাহিরের ভাব ও চিন্তার ব্যঞ্জনা, চলা-ফিরা-ওঠা-বসা-আসা-যাওয়া-হাসি-কান্না-প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী, তাহা থিয়েটারী অস্বাভাবিক আব্‌হাওয়া হইতে এখনও পায় নাই মুক্তি। এই পূর্ব্ব-সংস্কারের সম্পূর্ণ সংস্কৃতিও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ভারতীয়, বিশেষ করিয়া বাংলা ছবির পর্দ্দায় নাট্যমঞ্চেরই পুনরাভিনয় প্রায়শঃ হইয়া থাকে। এ দেশে ফিল্ম বা মঞ্চ-শিল্পের দীনতার একটা বিশেষ কারণ এই যে, অভিজাত, শিক্ষিত বা ধনী সম্প্রদায়ের অন্তর-খোলা অনুমোদন ও সহযোগ উহা এখনও পায় নাই, যোগদানে সঙ্কোচাবনতিই প্রধানতঃ লক্ষিত হইত বা এখনও, অনেকটা কাটিয়া গেলেও, হয়। এ কথা বিশেষ করিয়া ভদ্র নারীর পক্ষে প্রযুজ্য। ইহার দ্রুত প্রগতির পথে দেশের এই মনোভাব খুব বড় অন্তরায়। অতীতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব ভারত-মন এখনও আচ্ছন্ন করিয়া আছে। সুনিপুণ নটনটী বা মূলধনের দৈন্যের ইহাও একটা কারণ। সিনেমা শিল্পের সহজ স্বাভাবিকতা বা উৎকর্ষ লাভ করা অচিরে সম্ভব নয়, যদি না নবীন সদ্য প্রতিভা কাতারে কাতারে আসিয়া যোগ দেয়। এই প্রসঙ্গে মাষ্টার মোদকের নাম করা যাইতে পারে, যিনি ভারতীয় রঙ্গ-জগতে "জ্যাকি কুগান" বলিয়া খ্যাত। এখনও বালক, অনুকরণ করার মত বয়স বা অভিজ্ঞতা হয় নাই। রূপে, গুণে, সঙ্গীত দক্ষতায় তাঁর জন্মগত অধিকার—যেন ফিল্ম-শিল্পরাণীর মানসপুত্র! মহালক্ষ্মী সিনটোনে 'নন্দ-কি-লালা' ছবির কিশোর কৃষ্ণের ভূমিকায় মাষ্টার মোদকের অভিনয় সর্ব্বাংশে স্বাভাবিক ও প্রশংসার্হ।

চলচ্চিত্র এ দেশে বর্ত্তমানেও শিল্পহিসাবে আদৃত না হইয়া বরং বিলাসের উপকরণরূপে সাধারণতঃ পরিগণিত হইয়া থাকে। সমাজের কল্যাণকর বই ও ফিল্মের উপযোগী করিয়া রচিত হইবার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। অপর পক্ষে সিনেমার প্রভাব সমাজ-মনের উপর প্রচুরের চেয়েও অধিক। দেশবাসীর ধর্ম্মপ্রাণতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছবির পর্দ্দায় ধর্ম্মমূলক গ্রন্থের অভিনীত হইতে দেখা যায়, কিন্তু দৃশ্যবিহীন কথকথা, ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তনের আসরে হৃদয়-মন-প্রাণে যে পবিত্র উদ্দীপনা ও আস্বাদ জাগে, তার একান্তই অভাব সান্ধ্য বায়স্কোপে। রঙ্গালয় বা সিনেমায় দর্শক ও দর্শনীয় বিষয়-বস্তুর নিতান্ত কৃত্রিম কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অকিঞ্চিৎকর আব্‌হাওয়া এবং আবেষ্টনী এই পরম শ্রদ্ধা ও দিব্যভাব সৃজনের আদৌ অনুকূল নহে। সীমাবদ্ধ রঙ্গমঞ্চের অপেক্ষা টকীর সৃষ্টির ক্ষমতা অবশ্য অনেকখানি পরিচ্ছন্ন ও পরিব্যাপ্ত। অশরীরী সবাক্ চিত্র দর্শকের চিত্ত-মনের উপর একটা বিস্ময়কর স্বপ্ন-প্রলেপ আঁকিয়া দেয় সত্য, কিন্তু অ-ভাব মূলক প্রত্যক্ষ ও বাস্তবিকী দৃশ্য-বস্তু ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়া মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়াই একটা রোমাঞ্চের তরঙ্গ তুলিয়া উড়িয়া যায়। সত্যকার রসবস্তুর কষ্টিই হইতেছে যে, তাহা মানুষের মেরুদণ্ডে করিবে বল বীর্য্যের সঞ্চার, তাকে দিবে স্বাস্থ্য, অনাবিল অখণ্ড আনন্দানুভূতি। ইহার পরিবর্ত্তে যদি আসে প্রতিক্রিয়ার অবসাদ, অস্বাস্থ্য, উত্তেজনা, ও জ্বালাময় ব্যথা-বেদনা, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, রসসৃষ্টির নামে সেখানে হইয়াছে ব্যভিচার ও অনাচার। পশুত্বের উপর মনুষ্যত্বের, দেবত্বের উদ্বোধনা ও প্রতিষ্ঠাই সকল শিল্প-কলা ও পুলকসৃষ্টির নিগূঢ় মৌলিক প্রেরণা এবং পরম ও চরম সার্থকতা। বুদ্ধিজীবী ও মন-বিহারী প্রতীচ্যের এই বিপুল সিনেমা শিল্পকে এমনি করিয়াই ভারতের মাটি-জল-হাওয়ার উপযোগী ও নিজস্ব করিয়া তুলিতে না পারিলে বিপরীত ফলই ফলিবে। নচেৎ চোখ ধাঁধাইয়া আনিবে ক্লান্তি, অন্তরাত্মার উপরকার পর্দ্দা আরও হইয়া উঠিবে জমাট ও অন্ধকার।

ইহার ভাল দিক্‌টাও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে; যুগ-প্রবাহে তা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। বিশিষ্ট পরিবেষ্টনীর মাঝে বন্দী ব্যষ্টি মানুষের মন, বিশ্ব-মানবের সমষ্টি মনের অবকাশে পায় মুক্তি। দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান অপসারিত করিয়া দূরকে দেয় নিকট করিয়া। কত অজানা-অচেনাকে দেয় জানাইয়া চিনাইয়া, অসীম-অনন্তকে সসীম-সান্ত করিয়া আনে আলোক চিত্রের সীমার মাঝে; ফটো-লেন্সের আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশে রহস্যপুরীর দ্বার করে উদ্‌ঘাটন; অপরের ব্যথা-বেদনার সুখ-দুঃখের অনুভূতি আরও নিবিড় করিয়া তোলে হৃদয়ের কোমল পর্দ্দায়। বিশ্বমানবতাকে একই পারিবারিক সূত্রে গ্রথিত করিয়া তুলিতে বিজ্ঞানের এ এক মহীয়ান্ অবদান।

আধুনিক শিক্ষাসংস্কার—

শিক্ষা, বিশেষ করিয়া শিশুশিক্ষার সংস্কার ও নব পদ্ধতির উদ্ভাবন-সমস্যা দেশের সম্মুখে সব চেয়ে বড় সমস্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ পর্য্যন্ত এ দেশে যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা শিশু ও কিশোর মস্তিষ্কের উপর দুঃসহ বোঝা চাপাইয়া তার মন ও অঙ্গে আনিয়াছে পঙ্গুত্ব এবং দেশের তারুণ্যের হইয়াছে অযথা অপচয়। জাতির ভাবী ভবিষ্যৎ ও জীবন যাদের উপর নির্ভর করে, তাদের ক্ষয়ে জাতির মেরুদণ্ডেই ঘুণ ধরিয়াছে, সারা দেশের বুক জুড়িয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে নৈরাশ্যের অন্ধকার, অসমর্থের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস। তাই শিক্ষা-সংস্কারের প্রতি দেশের ঔদাসীন্য ও ঘনীভূত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে ক্ষণবিলম্ব হওয়াও দ্রুত মরণের পথেই জাতিকে আগাইয়া লইয়া চলিবে।

বিগত মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পরে যখন পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের মধ্যে পুনর্জাগরণ ও জাতীয় সংগঠনের ধূম পড়িল, তখন শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষাকে পুরোভাগেই রাখাই পরিদৃষ্ট হয়। জীবন্ত জাতির গতিমান আদর্শের সঙ্গে শিক্ষাকে জুড়িয়া স্ব-স্ব দেশকে ভরাইয়া তুলিবার ইতালী, জার্ম্মানী, রুশিয়া, মার্কিণ প্রভৃতির সে কি বিপুল প্রচেষ্টা! পশ্চিমের অন্যান্য জনহিতকরী বৈজ্ঞানিক দানের মত অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি-প্রচলনের সাফল্যময় অবদানও অকিঞ্চিৎকর নয়। এই প্রসঙ্গে নব্য ইতালীর শিশুশিক্ষাবিষয়ক অভিনব পদ্ধতির প্রবর্ত্তন বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। ইতালীর শিক্ষার ক্ষেত্রে অধ্যাপক জিওভান্নি জেন্টিলে ও মাদাম মন্তেসরির নাম চির দেদীপ্যমান থাকিবে। প্রাথমিক ও আধুনিক শিক্ষার আমূলে সংস্কারক হইতেছেন অধ্যাপক জেন্টিলে। তাঁর নব্য শিক্ষানীতি 'জেনটাইল কোড' (Gentile code) দুনিয়ার শিক্ষা-সংস্কার ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই আজ সুবিদিত।

মাদাম মন্তেসরি প্রবর্ত্তিত অভিনব শিশুশিক্ষাবিধিও শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছে। মন্তেসরির শিক্ষাবিধি আজ বিশ্ব-বিশ্রুত। শিশুর সহজ জীবনাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া শিশুমনকে শিক্ষোপযোগী করিয়া তোলা হয়। বিশেষ ব্যবস্থার ছাঁচে বন্দী না

মিসেস যোধ, (বামে) মাদাম মন্তেসরি, (মধ্যস্থলে) মিসেস ব্যাস (দক্ষিণে)

করিয়া হাঁটা-ফেরা, খাওয়া-শোওয়া, উঠা-বসার মধ্য দিয়া, সহজ আনন্দভঙ্গীর উপর ভর করিয়া শিশুকে শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়। সর্ব্বতোভাবে এ শিক্ষাপদ্ধতি অনুকরণীয়।

বোম্বের দুই জন মেয়ে মিসেস্ যোধ ও মিসেস্ ব্যাস বর্ত্তমানে বার্মিলোন সহরে মন্তেসরির প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির আয়ত্ত করিয়া শীঘ্রই দেশে ফিরিতেছেন। মাদাম মন্তেসরিও একবার ভারতে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

অন্তর-বিনিময়

(শ্রীরাধারমণ চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রুতিলিখিত)

শীতের বেলার শেষাশেষি। কবীন্দ্রের যোগ্যপুত্র রথীন্দ্রনাথের শুভাগমন। সঙ্গে ছিলেন শ্রীনিকেতনের একনিষ্ঠ সেবক গৌরবাবু ও আর একজন তরুণ। বিলীয়মান অপরাহ্ন শেষের উপভোগ্য রৌদ্র-কিরণ তখনও অবারিত ব্রহ্মবিদ্যামন্দিরের প্রশস্ত আঙ্গিনা হইতে বিদায় লয় নাই। মাননীয় অতিথিবৃন্দের সেদিনের সেই মধু-স্বচ্ছ মৌন-নীরব চিরদিন সঙ্ঘ-স্মৃতিতে জাগরূক থাকিবে।

আভিজাত্যের গৌরব-গর্ব্ব-বর্জ্জিত পোষাক পরিচ্ছদের মধ্য দিয়া বাধাহীন হৃদয়-দরজার ফাঁকে ফাঁকে অন্তরের অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ পরিচয়-টুকুর সুযোগ সেদিন সত্যি সত্যি মিলিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্কুল-প্রাঙ্গন, গ্রন্থাগার প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া অভ্যাগতের দল আসি-লেন আশ্রমে—আস্তানা লইলেন কোনও ঘরে নয়, পরন্তু উন্মুক্ত গগনতলে অনাচ্ছাদিত শ্যামদূর্ব্বাদলের সবুজ আস্তরণের উপর। সম্মুখেই মাতৃ-মন্দির ও ভাগীরথী।

আশ্রম-নারীর স্বহস্তে প্রস্তুত খাবার ও চা দেওয়া হইল। তাঁহারা পরম পরিতোষ প্রকাশ করিলেন।

অবাধ প্রকৃতির মাঝে সুরু হইল আলাপন—বাঙ্গালীর দুইটি গৌরবময় আদর্শ প্রতিষ্ঠানের মর্ম্ম-পরিচয়। আশ্রমীরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
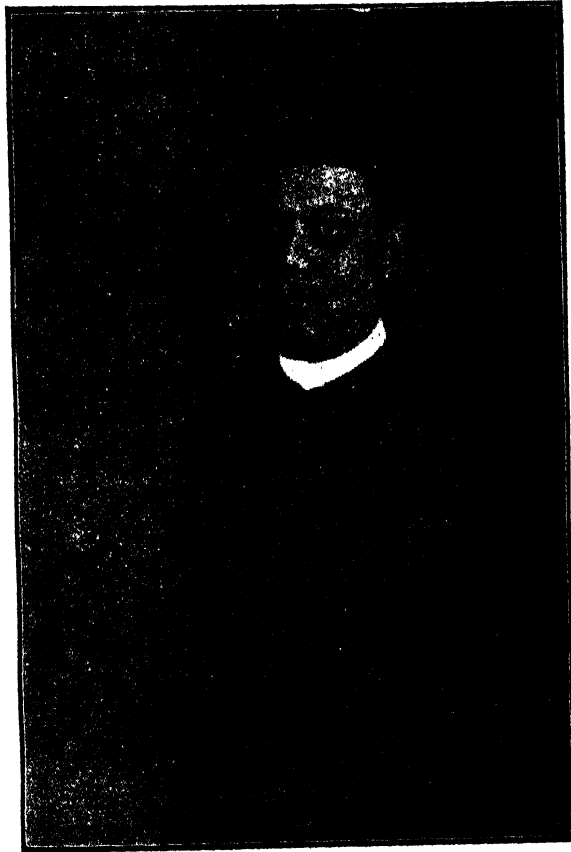
অনেক কথা, বহুমুখীন বিচিত্র আলাপ। সঙ্ঘগুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া রথীন্দ্র-বাবু সহাস্যে বলিলেন, 'আমি শান্তিনিকেতনেই থাকি। মাঝে মাঝে কল্‌কাতায় আসি, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে। নিজেকেই অনেক কিছু করতে হয়। এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাবার পক্ষে অর্থসমস্যাই সব চেয়ে বড় কথা। অভাবের জন্যই অনেক কিছু স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। শান্তিনিকে-তনের বিভাগগুলো পরস্পর এমনি inter-dependent যে একটিতে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হ'লে, সবগুলোর স্বচ্ছন্দতা-ভঙ্গ হ'য়ে পড়ে। এত বড় প্রতিষ্ঠানকে প্রগতিশীল রাখা যে কি প্রয়াসসাধ্য, তা ভাল করেই বুঝ্‌ছি। আপনার কি অভিজ্ঞতা?'

মতিবাবু বলিলেন—'আমার পক্ষে এই তিক্ত-সত্য বিশেষ করেই প্রযুজ্য। আমি সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যক্রমে

প্রাচুর্য্যের মাঝে জন্মাইনি বা আমার সেই আভিজাত্যও নেই, যার জন্য দেশের সুনজর আকৃষ্ট হ'তে পারে। নিঃস্ব-কাঙাল এই প্রভু-পথের যাত্রীকে কেন্দ্র করে'ই সর্ব্বত্যাগী একমুষ্টি শিক্ষিত তরুণের দলই এই সঙ্ঘের প্রাণ। নিছক তপস্যার উপর ভিত্তি করে'ই এতটুকু সৃষ্টি গড়ে' উঠেছে, তপস্যাই উহার মূলধন। সংগ্রামময় আমার জীবন। বিশ্বাস কোনদিন ভঙ্গ করি নি। লক্ষ টাকা কর্জ্জ করেছি, বছর না ঘুরিতেই তহবিল শূন্য। যে চেয়েছে, বিশ্বাস করে' দিয়েছি। আমাকে কিন্তু কেউ এক কপর্দ্দকও ফিরিয়ে দেয় নি। প্রতিশোধ কোনদিন লই নি। বিশ্বাসই ছিল আমার জীবনের মূল বস্তু। বিশ্বাসের বীর্য্যকেই আজীবন পরীক্ষা করেছি। লক্ষ্য ছিল না আমার টাকা, পরন্তু লক্ষ্য ছিল একমাত্র বিশ্বাসের উদ্বোধন। সেই লক্ষ টাকা ঋণ কেউ আমাকে মাপ দেয় নি। শতকরা ৯৲ টাকা কি তার চেয়েও উচ্চহার সুদে সে ঋণ শুধেছি। কিন্তু বিশ্বাস আমার ব্যর্থ হয় নি। সেই আমার বিশ্বাসেরই বস্তুতন্ত্র প্রকাশ আমার আজিকার পারিপার্শ্বিকতা, এই স্ব-প্রতিষ্ঠ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ।

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে রথীন্দ্র বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"প্রতিষ্ঠান পরিচালন সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?"

মতিবাবু প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—আমার বিশ্বাস, নিত্যকালের জন্য কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে' উঠ্‌তে পারে না, যদি না থাকে উহার পশ্চাতে ত্যাগ-তপস্যার বীর্য্য। মাহিনা-করা ভাড়াটে লোকের শ্রম ও আন্তরিকতা দিয়ে কোন মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়—সে বিকৃত আদর্শ জাতির জীবনে বিকারই এনে দেয়। সঙ্ঘের লক্ষ্যের সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়া চাই। তুচ্ছতার প্রতি দৃষ্টি রেখে চল্‌লে, জীবন-মিশনের প্রতি পিছন ফিরেই এগিয়ে চলা হয়। তাতে একদিন গতি থম্‌কে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আপনি আচরিয়া লোককে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তা না হ'লে হয় ভণ্ডামী, যা মানুষের গভীরে শিকড় গাড়্‌তে পারে না। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বিরাট্ সৃষ্টি, কিন্তু দুই একজন ভিন্ন জলন্ত জীবনাদর্শের অভাব। মালব্যজী সে বার এ নিয়ে অনেক আক্ষেপ করলেন। চরিত্র যদি গড়ে' উঠে, আর কিছুর জন্য ভাবনা থাকে না।

মস্তক-সঞ্চালনে স্বীকৃতি জানাইয়া রথীন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানকার কর্ম্মের, জীবন-সাধনার কি বিজ্ঞান? আপনার অভাবে এ সঙ্ঘ গতিমান যে থাকবে তার নিশ্চয়তা কি?"

মতিবাবু,—"সে অনেক কথা। সময়ও সংক্ষেপ। যদি কোনদিন সুযোগ মেলে তো সবিস্তার এ আলাপ হবে।

গোড়ায় একটা বিষয় না জেনে রাখ্‌লে, কিন্তু সব গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিশিষ্ট কোন আদর্শ বা লক্ষ্য ধরে' আমাদের এ অনন্ত-যাত্রার উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই প্রথম ভাগবৎ যুক্তি। নির্ব্বাণ, মোক্ষ নয়—জীবনটাকেই রূপান্তরিত করা। এই দিব্য জীবনের বাহ্যলক্ষণস্বরূপ জাতি-সমাজ-রাষ্ট্র যা গড়ে ওঠে, তাই হবে সত্য কাম্য। কর্ম্মও তাঁরই জন্য, আত্মপরিতৃপ্তির জন্য নয়। বিরাটের, অনন্তের সঙ্গে যুক্তি আছে ব'লে সকল কর্ম্মের অন্তর-ভঙ্গিমাও বিপুল বিরাট্। তাই নিষ্কাম। তুচ্ছ কামনারও যেমন আছে একটা আবেগ-উত্তেজনা, নিষ্কামতারও তেমনি আছে একটা পরমোৎস, দিব্য প্রেরণা। প্রবর্ত্তকের সন্ন্যাসীও তাই সাধারণের মতই কর্ম্মব্যাপৃত। জীবন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তার ধারণের প্রয়োজন আছে। এর জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়া অযাজ্ঞার চিহ্ন নহে। ভারতের তপোবীর্য্য ম্লান হ'তে সুরু করেছে সেই দিন, যেদিন এই অপ্রতিগ্রাহী বৃত্তির ভাঁটা ধরেছে। একটা দিব্য ছন্দ ধরে একমুঠা মানুষ দিনের পর দিন নীরবে এই সাধনায় প্রাণ ঢেলে চলেছে। হয়তো এর পরম প্রকাশ মর্ত্ত্যের বুকে প্রতিষ্ঠা পেতে বিলম্বিত হবে, কারণ দেশের কাছে সহৃদয়তার পরিবর্ত্তে প্রতি পদে পদে পেয়েছি বাধাই—"

রথীন্দ্রবাবু,—"আপনাকে বাধা দিলুম, মনে কিছু করবেন না। একটা ছন্দের কথা বল্‌লেন, বৈচিত্র্যহীন নিরেট সৃষ্টির মাঝে আনন্দের স্থান কোথায়—জীবন-বিকাশে রসহীনতার সম্ভাবনা এসে যায় না কি? শান্তি-নিকেতনে পিতৃদেবের কিন্তু এই দিক্‌টায় খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ওখানে যারা আছে তাদের বৈশিষ্ট্যের বিকাশের দিক্‌টা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়ে আমরা প্রযত্নপর।"

মতিবাবু—"ব্যক্তির ভাবের যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, জাতিগত ভাবেরও তেমনি একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বিচিত্র ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি ও সমগ্র অভিব্যক্তির উপরেও, আছে একটা সাধারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও বাহ্য আচরণ, যার আনুগত্যে জাতীয় জীবন যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তা হ'লে জাতিগতভাবে একটা বিশৃঙ্খলা ও স্বৈরচারিতা এসে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আশ্রয়হীন সে জাতির ধ্বংসও অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে। ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয়। গ্রীস, রোম আজ আর নেই। শক-হুণ এমন কত জাতি পরের সভ্যতার কুক্ষিগত হ'তে দেখা যায়। এমনি আচরণের মধ্য দিয়াই রাজ্যহারা ইহুদী বিচ্ছিন্ন হয়েও বেঁচে আছে। অগ্ন্যুপাসক পারসী ও হিন্দু কালের অত্যাচার সহ্য করে আজও ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। মানবতার সভ্যতার ভাণ্ডারে ব্যষ্টি-জাতির যে অবদান তা শূন্যেই লাট খেয়ে ফিরবে, যদি তা না আসে নেমে বস্তুতন্ত্র জীবনাভিব্যক্তির মাঝে। কাল-বশে হয়তো এ জাতীয় আচরণ অর্থহারা প্রাণহীন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে বৈদেশিক ও বিজাতীয় আঘাতের মুখে। জাতি যদি অনস্তিত্বে না তলিয়ে যায়, তবে জীবন্ত মনুষের তা একদিন না একদিন যুগোপযোগী রূপান্তরিত করে' নেওয়ার সম্ভবনাও থাকে।

সঙ্ঘ একটা সমষ্টিসাধনা। ব্যষ্টিকে নিয়েই সমষ্টি। সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যষ্টি পূর্ণতা পায় না। সমষ্টি-সত্তার নিকট উৎসর্গ করেই ব্যষ্টি পায় ব্যষ্টির সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ ও affinity. সেখানেই তার সমগ্র পরিপূর্ণতা। শুধু দেহের বা পেটের তাড়নায় মানুষে মানুষে একত্র হওয়া নয়। বিপুল সৃষ্টির সঙ্গে যোগ রেখে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। বিভিন্ন ব্যষ্টি যন্ত্র যেমন একটা সুরে বাঁধে চলায় ঐক্যতান-সৃষ্টি হয়, তেমনি একটা দিব্য ছন্দ-সুরের অটুট আনুগত্যে ব্যষ্টির সম্ভাবনীয়তার প্রকাশ সম্ভব হয়। এ সম্ভাবনীয়তা যে কি, তা সাধারণ মানুষের বা পরের পক্ষে ধরা সুকঠিন। এই দুর্ভেদ্য আবরণ অন্তরের দিক থেকেই অপসারণ করা প্রয়োজন। এর একটা সাধনা আছে, process আছে। এ অন্তঃস্বরাজ্য-লাভেরও আছে একটা অপার্থিব কৌশল।

বিশিষ্ট আদর্শকে বরণ করে' চল্‌লে, জীবনটাকে পরস্বারোপিত সীমার মাঝেই পুনঃ পুনঃ কলুর বলদের মত ঘুরা-ফিরা করতে হয়। ক্ষুদ্রতার চাপে জীবন মুষ্‌ড়িয়েই পড়ে, বাড়্‌বার সুযোগ পায় না। প্রত্যেকটি বৃক্ষ-লতার নিজস্ব বীজ ও তাহার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া যেমন বিপুল অরণ্যানীর বিরাট্ শোভা, তেমনি ব্যষ্টির সহজ ও পরম প্রকাশের ভিতর দিয়াই ভূমার, সমগ্র মানবতার শ্রী ও সমৃদ্ধি। বৈচিত্র্যের মাঝে একত্বের ও একত্বের মধ্যে বহুর প্রকাশের উপরই বিশ্বসৃষ্টির দিব্য সম্বন্ধ ও যোগ প্রতিষ্ঠিত। বাহ্য দৃষ্টিতে হঠাৎ মনে হয়, যেন একটা ছাঁচের মধ্যে সঙ্ঘজীবনকে ঢালাই করা হচ্ছে, কিন্তু আসলে ব্যষ্টি-সত্তার সহজ অভিব্যক্তির ক্ষেত্র যে কতখানি প্রসারিত তা এখানকার প্রত্যেকটি সভ্যকে জিজ্ঞেসা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন।"

তাহা শুনিয়া রথীন্দ্রবাবু বলিলেন,—"আমার ভয় ও অভিজ্ঞতা এই যে, কোন প্রতিষ্ঠানের যে স্রষ্টা তাঁর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রতিষ্ঠানের সাধনা ও বীর্য্য ম্লান হয়ে পড়ে। যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে' শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পিত হয়, সেখানে এর পুনরাবৃত্তি অনিবার্য্য নয় কি?"

মতিবাবু—"বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে' তৌষ্টিকের নতি-নিবেদন যেখানে তার ব্যষ্টি অহঙ্কারকে পুষ্টি করে, সেখানে সেই আসুরিক সৃষ্টির মাঝেই ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত থাকে। Devotion সেখানে slave-mentalityরই নামান্তর। নিঃসঙ্কোচ ভক্তি-অর্ঘ্যের রস থেকে অজ্ঞানতার কঠিন আবরণের অপসারণে হয় যে জ্ঞানালোকের প্রকাশ, তাতেই ব্যষ্টি-সত্তা পায় রূপের মাঝে আনন্দের স্বরূপেরই সন্ধান। আনন্দ সর্ব্বদাই creative. এমন বিশুদ্ধ সত্তা নিজেকে প্রবৃদ্ধ করে'ই চলে। সঙ্কোচনের ভয় সেখানে থাকে না।"

রথীন্দ্রবাবু,—"সঙ্ঘ সম্বন্ধে সাপক্ষে-বিপক্ষে কথাই শুনে এসেছি, আজ সাক্ষাৎ অন্তর-বিনিময়ে মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। দেরীও হয়ে যাচ্ছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করে' আজকের মত উঠ্‌বো। কোন আদব-কায়দার পীড়ন নেই, তাই নিঃসঙ্কোচেই জান্‌তে চাইছি, সঙ্ঘ

বল্‌তে আপনি কি বুঝেন? আপনাদের সঙ্ঘ-সাধনার ভিত্তি কোথায়?"

মতিবাবু,—"সঙ্ঘ-সাধনা কি, তা বিশদভাবে এখানে বল্‌বার সময় নেই। সূত্রাকারে তাই একটু ব্যক্ত কর্‌বার চেষ্টা করবো।

সঙ্ঘ প্রতীচ্যের কোন 'ইজম' (ism) নয়। এই তত্ত্ব সত্যই অমৃত ও অমৃতায়মান। সঙ্ঘ-তত্ত্বের বস্তুতন্ত্র স্বরূপপ্রকাশে ব্যষ্টি-সমষ্টি যুগপৎ সমৃদ্ধ হয়। মানবতার সত্যকারের কল্যাণ-বীজ একমাত্র এই তত্ত্বের মাঝেই নিহিত।

অন্তরাশ্রিত (subjective) প্রজ্ঞার উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। এই সঙ্ঘ-সাধনারও আছে একটা অনাহত রীতি, ক্রম। মর্ত্ত্যের বুকে এই 'দেবায় জন্মনে'র সিদ্ধ সংহতি-সৃজনের স্বপ্ন বৈদিক ভারতের অনুভূতিতে জেগেছিল, কিন্তু সাফল্যের বস্তুতন্ত্র রূপ আজও কোথাও ফুটে' উঠে নি। জড়ের পিছনে যে চিদালোকের উৎস, তাহাতে অবগাহিত হয়ে বিশ্বসমস্যা-সমাধানের আকাঙ্ক্ষায় ভারত-সত্তা বরাবর অভিযান করেছে। ভারতীয় সভ্যতার ইহাই অন্তরের কথা।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ এমনি একটা সাধনারই বস্তুতন্ত্র ক্ষেত্র। বিশ্ব আমাকে অস্বীকার করিতে পারে কিন্তু আমি আমাকে, আমার সত্যকে তো অস্বীকার কর্‌তে পারি না। এ যে আমার আজীবন তপস্যার উপলব্ধি।

মস্তিষ্ক (কপাল দেখাইয়া) মানুষের সমস্ত জ্ঞানের, কর্ম্মের, অনুভূতির কেন্দ্র-বিন্দু। ইহা বিজ্ঞানসম্মত। তেমনি আমাদের যোগী-ঋষিরা বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্যদ্বারোদ্‌ঘাটন কর্‌তে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন—কতকগুলি চেতনার ক্ষেত্র, যাহা পরা-অপরার সংযোগস্থল। ষট্‌চক্র প্রভৃতি শাস্ত্রিক বিচিত্র পরিভাষায় উহার নামাকরণ করা হয়েছে। আজ্ঞাচক্র (ভ্রূ-মধ্য দেখাইয়া) এমনি একটা কেন্দ্র—যেখান হ'তে সিসৃক্ষু ভাগবতী ইচ্ছার অবিকৃত অবধারণ সম্ভব হয়। বহির্মুখী মানুষ মনের এপারে বসে' সেই উপরের নেমে-আসা আলোর উত্তাপে আত্মহারা হয়ে উহা নিজের মনে ক'রে অহঙ্কারের গণ্ডীর মাঝে বন্দী হয়ে পড়ে। উপরের এই আজ্ঞা (Command) ধারণ করা সহজ নয়। নিজের সমস্ত দেহচেতনাকে গুটিয়ে ধর্‌তে হবে এই আজ্ঞাচক্রে। মন-প্রাণ-দেহের উত্তেজনা-অবসাদ থাক্‌বে না—নিস্তব্ধ, শান্ত, স্থির, আজ্ঞাবাহী যন্ত্র মাত্র—উপরের শান্তি-আনন্দের নির্ঝরিণীতে অভিষিক্ত হয়ে আধারের প্রতি অনু-পরমাণু পাবে অভ্রান্ত বিশুদ্ধতার অপার্থিব পুলক ও প্রসন্নতা। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এই অনন্তের স্পর্শ মানুষকে সীমার গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে অসীমের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে' তুল্‌ছে। বহিঃপ্রকাশোন্মুখী এই অপার্থিব অলক্ষ্য ভাগবতী শক্তির করুণা-সিঞ্চনে মানুষের মধ্যে প্রণোদনা জাগ্‌ছে কবিত্বের, শিল্পের, দার্শনিকতা প্রভৃতির। ইহা যে আত্মারই প্রবোধনা! সেই পরম ইচ্ছার বহুরূপী প্রকাশ-ভঙ্গিমায় বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টি রূপায়িত হয়ে উঠ্‌ছে। ব্যষ্টির স্বরূপাভিব্যক্তির তত্ত্ব-কথা এইখানেই। ইহা জাগে না, যেখানে ভক্তগোষ্ঠী দাস্যবৃত্তিই করে। পরন্তু জাগ্রত স্বরূপ-সমষ্টিই সঙ্ঘ। এইরূপ সঙ্ঘ সৃষ্টিকে মাধুর্য্যমণ্ডিত ও মহিমাময়ীই করে' তোলে।

স্বরূপোলব্ধিরও আছে একটা শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনা। এক মুঠা তরুণের জীবনালম্বনে আমি দীর্ঘদিন ধরে' ইহার একটা বাস্তব সাফল্য-মূর্ত্তি গড়ারই চেষ্টা করেছি। আমার এই প্রয়াস কতটুকু কৃতকার্য্য হয়েছে, তার ব্যাপক পরিচয় দেবার সময় হয় তো এখনও আসে নি। তবে এজন্য আমাকে যে পার্থিব ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার কর্‌তে হয়েছে, তা শুন্‌লে আপনি বিস্মিত হবেন। হাজার হাজর টাকা নিজের দায়িত্বে কর্জ্জ করে', যে বিশ্বাসের ভরসা দিয়ে চেয়েছে, তাকেই দিয়েছি। কেউ আদৌ ফিরে আসে নি, কেউ অন্যভাবে প্রবঞ্চিত করেছে। যে সব নষ্ট করে' আবার এসে হাত পেতেছে, যেমন করে'ই হোক পুনরায় তাকে দিয়েছি। আসলে আমি মানুষ বা টাকার উপর লক্ষ্য করে' কিছু করি নি। আমি আমার অন্তরের বিশ্বাসকেই অগ্নি-পরীক্ষা করেছিলাম। I loved my love, not anything else. প্রেম-প্রত্যয়কে এ ছাড়া আর কেমন করে' নিঃসংশয় করা যায়!

সঙ্ঘের বাস্তব বিজ্ঞানটুকু এই যে, একটা সমষ্টি-গোষ্ঠীর এমন জায়গায় উন্নীত হওয়া, যেখানে মানুষে-

মানুষে সত্য সম্বন্ধ ও মূল ঐক্য নির্ণীত হয়। দুইটী ধারায় ইহার প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয়েছে। এক শিষ্যের অসঙ্কোচ শ্রদ্ধা-ভক্তিতে গুরুগত হবার ফলে, গুরুর ভাব্য-ভাবনা যথার্থ শিষ্যের মাঝে প্রসারিত হয়। গুরুর চাওয়া ভক্তের মাঝে রূপ নেয়। এতে সৃষ্টি সার্থক হয় না। ইহা লয় ও নির্ব্বাণের পথ। গুরুর ব্যক্তিত্বের আওতায় শিষ্যের সহজ সত্যাভিব্যক্তি সম্মোহিত থাকে। ভাবের নেশা কেটে গিয়ে শুষ্কতা ও রসহীনতা আসার সম্ভাবনা থাকে। একই পুনরারোপিত হয় বহুর আশ্রয়ে, তাই বিচিত্র রূপ-সৃষ্টির মাঝে নিত্য সম্বন্ধ ও আনন্দ-জগতের দ্বার সেখানে থাকে রুদ্ধ। আর দ্বিতীয়, আনুগত্যের আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়া আত্মোন্মেষ ও স্বরূপাভিব্যক্তির সাধন। লয় এখানে অহমিকার, অজ্ঞানের—যা তার সত্তার সত্যপ্রকাশকে বিকৃত আবরণ দিয়ে রেখেছে। এমন একটা চেতনার কোঠায় গুরু-শিষ্যের সাক্ষাৎ, যেখানে পরস্পরের আঁখির বিনিময়ে সম্বন্ধ স্থির হয়ে যায়। মূলগত ঐক্যের উপর ভিত্তি করে' ব্যষ্টির বিচিত্র প্রকাশ। চাওয়ার ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়াই এই স্বগোষ্ঠী-স্বজনের অন্তরঙ্গ প্রেম ও পরিচয়—যা প্রকাশ-বৈচিত্র্যে ক্ষুণ্ন হবার নয়, পরন্তু সৃষ্টিকে মাধুর্য্যময়ীই করে' তোলে। সত্যিকার সজ্ঘ স্বরাটের লীলাভূমি, আধ্যাত্মিকতার দাম্ভাভিনয় নহে। সময় সংক্ষেপ, অবসর-মত একদিন এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলাপ করা যাবে। অল্প কথায় ধারণাটা ঠিক দিতে পারলুম কি না, সন্দেহ।"

রথীন্দ্রবাবু—"বুঝেছি। খুব সুখী হলুম। শান্তি-নিকেতনে জ্ঞান ও কর্ম্মের একটা সমন্বয় চলেছে। জ্ঞানের পরিপূর্ণতা কর্ম্মে। শ্রীনিকেতন সৃজনের উদ্দেশ্যও তাই। এর একটা বস্তুতন্ত্র রূপ আপনাদের এখানেও দেখে সত্যই আজ আমি আনন্দ পেলুম। এখানেই আমাদের সত্যকার মিলন। আপনাকে একদিন শান্তিনিকেতনে আমাদের মধ্যে পাবার জন্য কিন্তু নিমন্ত্রণ জানিয়ে যাচ্ছি। আগামী উৎসবের সময়ে বড় কোলাহল, নিরালায় পেলেই ভাল হয়।"

মতিবাবু,—"সুদীর্ঘ দিন আবদ্ধ থাকার পর যখন মুক্তি পেলায়, তখন প্রথমই আমি শান্তিনিকেতনে যাই। সে আজ অনেক দিনের কথা। আর একবার যাবার ইচ্ছা আমারও আছে। আপনার পূজনীয় পিতৃদেব এসে ঐ ঘরটায় ছিলেন। সে সময়ে তাঁকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে পারি নি, সে জন্য ব্যথিত। আর একবার তাঁকে আনার ইচ্ছা আছে। বাংলায় ঠাকুর পরিবারের একটা আভিজাত্য আছে, ইহার রক্তধারার উপর আমি চিরদিন শ্রদ্ধান্বিত।"

রথীন্দ্রবাবুর সদাহাস্য বিনয়-নম্রতা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। মাননীয় অতিথিবৃন্দ যখন বিদায় লইলেন তখন প্রদোষের আঁধার প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

বিশ্ব-সভ্যতায় এশিয়ার স্থান—

পশ্চিমের মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে-করিতে আমরা এমনই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, যে স্ব-মহিমা, আত্মগৌরব, নিজের অতীত ও বর্ত্তমানের শৌর্য্য-বীর্য্য-ঐশ্বর্য্যের কথা ও কাহিনী আমরা এক রূপ বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছি। নিজস্বতার উপরে এই আস্থাহীনতাই সব চেয়ে বড় পাপ! ইহাই আজিকার পঙ্গুত্বের বৃহত্তম কারণ। এই অসারত্বের হীনতা, অবিশ্বাসের দীনতা ও আত্ম-প্রত্যয়হীনতার গ্লানির ভারে প্রাচ্যবাসীর বিশেষ করিয়া চীন ও ভারতের উদার মনোভাব এমনিভাবে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা যেন ভাবিতেই পারে না তাদের একদা উজ্জ্বল অতীতের কথা ও বর্ত্তমানের আলোর দিক্‌টা। আপনার অতীতকে উপেক্ষা করার মধ্য দিয়া নিজেকেই করা হয় অপমান। মনের পশ্চিম দুয়ারী খোলা জানালার মধ্য দিয়া-আসা আলো দেখিয়া যদি ভাবা যায়, যে রুদ্ধ পূবদুয়ারী গবাক্ষ দিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারে না, তো তার চেয়ে হঠকারিতা বা বোকামী আর কি হইতে পারে! বিচারজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধির সকল দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া নিজস্বতারও যথাযোগ্য প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে হইবে।

প্রতীচ্যের অনেক নিরপেক্ষ মনীষীই প্রাচ্যের গৌরবময় সভ্যতা ও কৃষ্টির যথোপযুক্ত সম্মান এবং মর্য্যাদা দান করিয়া আমাদের নিজের ঘরের অমূল্য সম্পদের প্রতি পূর্ব্ব-পশ্চিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনীষী স্যার জন উড্রফের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ভারত কি সভ্য?' এবং অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্র ও সভ্যতা বিষয়ক অনেক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থে অতীত হিন্দু সভ্যতার মহীয়সী অবদানের সুষ্ঠু পরিচয় দিয়া হিন্দু জগতের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি মনীষী উড্রফ সাহেবের বিস্ময়বিমুগ্ধ অকৃত্রিম দরদ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন তিনি হিন্দুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—'আপনারা আত্মস্থ হউন, আপনাদের সম্মুখে ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হউন, সর্ব্বতোভাবে আত্মনির্ভর করিয়া জগদ্বাসীকে আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষিত করুন।'

কি পরম গৌরবের ভাব! এমন দিন ছিল, যখন মানুষের বাহিরের দিক্‌টায় লইয়াই বাধিত দ্বন্দ্ব; কিন্তু বর্ত্তমানে চলিয়াছে একটা 'কাল্‌চারের' সংঘর্ষ-যুগ—দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে। হিটলার-মুসোলিনীর মাঝেও এ মনোভাব সংগোপিত নয়।

এমনি একটা সঙ্কটযুগে একজন প্রতীচ্য মনীষী মার্কিণবাসী জে, টি, স্যাণ্ডারল্যাণ্ড এশিয়ার প্রাচীনত্ব ও সভ্যতা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা সময়োপযোগী বলিয়া উহার মর্ম্মাংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিলাম:—

বিশ্ব-সভ্যতার জননী এশিয়া—

আয়তনে এশিয়া উত্তর আমেরিকার দ্বিগুণ ও ইউরোপের পাঁচ গুণ। কেবলমাত্র আয়তনই ইহার বড় কথা নহে, পরন্তু বিশ্বেতিহাসে এশিয়ার স্থান সর্ব্বোচ্চে। সকল মহাদেশের জননী আখ্যা ঠিকই দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির অন্ততঃ নামকরা জাতি মাত্রেরই এশিয়া আদি মাতা। ধরিত্রীর সকল সুবিদিত ভাষা ও ধর্ম্মের উহা আদি জন্মদাত্রী। আফ্রিকার ইস্‌লামিজম, ইউরোপ-আমেরিকার জুডেইজম এবং ক্রিশ্চিয়ানিটির জন্মভূমিও এসিয়াই। বর্ত্তমান বিশ্বের প্রায় সকল শিল্প-কলা-ব্যবসা-বাণিজ্য-বিজ্ঞানেরও ইহা ধাত্রী। সভ্যতার ক্রমবিকাশ হিসাবে এশিয়ার কন্যা ইউরোপ ও নাত্‌নী আমেরিকা।

বর্ণমালা ও সংখ্যার স্রষ্টা এশিয়া—

বিশ্ব-মানবের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম যে আবিষ্কার বর্ণমালা, তাহাও সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয় এশিয়া হইতে। সভ্যতার ইতিহাসের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় যে সংখ্যা-সৃষ্টি ও দশমিক পদ্ধতি, তাহাও পশ্চিম পায় আরব হইতে এবং আরব এ জন্য ঋণী ভারতের নিকট। সুতরাং এই সব ভিন্ন আফ্রিকার ইউরোপের গণিত ও জড়বিজ্ঞানের বর্ত্তমান উন্নতি অসম্ভব হইত।

সভ্যতার বিচিত্র সম্পদ্—

এশিয়াবাসীরাই সর্ব্বপ্রথম জ্যোতিষ বিদ্যা প্রচার করে। অকূল সমুদ্রের দিক্-নির্ণয়কারী নাবিকের কম্পাস যন্ত্র প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনে।

ছাপাখানা আধুনিক সভ্যতার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মাণীর গুটেনবার্গ আবিষ্কৃত চলমান (movable) হরপের কথাই এতদিন প্রতীচ্যে প্রসিদ্ধি ছিল, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে, যে ইহার সাড়ে তিনশো বছর আগেও চীনে ছাপার কার্য্য হইত এবং ব্যাবিলোনিয়ায় তারও পূর্ব্বে। বর্ত্তমান বিশ্ব এক পাও কাগজ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারে না, কিন্তু এই জন্য পৃথিবী চীনের নিকট ঋণী।

রেশম ও চীনামাটীর অবদান চীনেরই সর্ব্বপ্রথম।

সমস্ত ক্রিশ্চিয়ান জগতের জনপ্রিয় কথা কাহিনী, শিশুদের সান্ধ্য ও শয়নের সময়কার ঠাকুরদাদার গল্পের বহুল আমদানী হইয়াছিল পূর্ব্ব হইতে, বিশেষ আরব, পারস্য ও ভারত হইতে। আমোদ-প্রমোদ-জনিত সময় কাটাইবার যে ক্রীড়া-কৌতুক তাস-পাসা-দাবা—তাহাও এশিয়ার মুসলমান জগতের বিশিষ্ট দান।

সপ্তাহের দিন, পবিত্র স্যাবাতের দিন রবিবার এবং দিনের সঙ্গে ধর্ম্ম ও পবিত্রতা সূচক যা কিছু বিজড়িত—সবই আমাদের নীতিমূলক বিধি-ব্যবস্থা, দশ আজ্ঞা (Ten Commandments) প্যালেষ্টাইন হইতে আসিয়াছে। যীশু খৃষ্টের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি ধর্ম্ম ও জীবননীতি; এমন কি খৃষ্টের বহু পূর্ব্বেও এশিয়ার বহু ধর্ম্মপ্রচারক আমাদের জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন। মোহান্ধ হইয়া এশিয়াকে আজকাল আমরা তুচ্ছ করি, কিন্তু তাদেরই মজেস, ইসা, ডেভিড, সোলোমান, পল, যীশু এবং অন্যান্য অনেক মহান্ ব্যক্তির নামে আমরা গর্ব্বানুভব করি।

এশিয়ার জ্ঞানালোকেই বাইবেল লিখিত। ইউরোপ এবং আমেরিকায় আজ পর্য্যন্ত এমন কোন ধর্ম্ম, ধর্ম্মপুস্তক বা ধর্ম্ম-বীরের অভ্যুদয় হয় নি, যাহা স্থায়ীভাবে একটা প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্য, জ্ঞানভাণ্ডারের আকর তুলেছিল এশিয়া। চীনের সাহিত্য সম্পদের তুলনা মেলে না; পারস্য ও আরবের সাহিত্যসমৃদ্ধিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতের ক্রম-বর্দ্ধমান বর্ত্তমান ও অতীতের জ্ঞান-ভাণ্ডার তুচ্ছ করিবার নহে। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের সমান গ্রীস-রোমের সাহিত্য একত্র করিলেও হয় না। ভারতের দার্শনিক ভাবধারা প্রাচীন গ্রীস বা আধুনিক জার্ম্মানী অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে; সেখানকার মহাকাব্য সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঁচ ছয়টীর অন্যতম।

সেক্সপীয়ারের নাট্যও ভারতকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, ভারতের গাথা-কাব্যের মত কাব্য আজ পর্য্যন্ত অন্যত্র মানুষ রচনা করিতে পারিয়াছে কি না, সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আজকাল কে বড় কবি?

চীনকে প্রাচ্যকে আমরা ঘৃণা করি; কিন্তু শিক্ষা, জ্ঞান, সভ্যতা, ভব্যতা, আদবকায়দা ও নৈতিকগুণে, কোন অংশেই তারা আমাদের চেয়ে কম নয়, বরং কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠই। চীন, জাপান, ভারত হইতে যে সকল ছাত্র আমাদের দেশে শিক্ষার্থী হইয়া আসে তাদের দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

পৃথিবীর সব চেয়ে সুবিদিত মানুষ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—

সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক এক ভোজ-সভায় প্রশ্ন উঠে; বর্ত্তমান বিশ্বে এমন দুইজন কে যাঁরা সবচেয়ে সুবিদিত ও সম্মানিত। সভাপতি, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, সভায় প্রশ্ন করেন: তাঁরা কি আমেরিকাবাসী?—খুব কমই এর উত্তরে 'হাঁ' বলেছিল। তাঁরা কি ইংরাজ?—বেশীর ভাগই সন্দেহ করেছিল। তাঁরা কি ফ্রান্স, জার্ম্মানী অথবা অন্য কোন ইউরোপের দেশবাসী?—না। সভাপতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন:—তবে তাঁরা কি ভারতের বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ অথবা সাধু, মহাত্মা গান্ধী?—সভাস্থ সকলেই একবাক্যে স্বীকৃতি জানাইল।

ইউরোপ বা আমেরিকার বর্ত্তমান কোন রাষ্ট্রবীর অথবা রাজনীতিজ্ঞের চেয়ে চীন-রিপাবলিকের প্রবর্ত্তক সান-ইয়েট-সেন কম নহেন। কিছুকাল পূর্ব্বে চীন-সাম্রাজ্যের সন্ধ্যা-যুগের রাষ্ট্র-নেতা লি-হুং-চাংয়ের কৃতিত্ব গৌরব ও রাজনীতিজ্ঞতা ইংলণ্ডের গ্লাডষ্টোন অথবা জার্ম্মাণীর বিসমার্কের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। আরও কিছুদিন পূর্ব্বের চীন দেশীয় মার্কিণ রাজদূত সম্মানিত এনসন বার্লিসগেমের কথা মনে পড়ে। তিনি চীন দেশের অভ্যন্তরের সঙ্গে বিশেষ সুপরিচিত হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, যে আমরা একজন এমারসনের কথা স্মরণ করিয়া গৌরব করি, কিন্তু চীন দেশে এমন হাজার খানেক আছে।

চীনে সৈনিকদিগের চেয়ে প্রাজ্ঞ ও বিচারক ব্যক্তিদিগকে অধিকতর সম্মানের আসন দেওয়া হয়; কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টা করা হয়। সভ্য কাহারা, চীন অথবা মার্কিণ?

চীনের কথা ছাড়িয়া ভারতের বিষয় একটু বলি। বোম্বাইয়ে প্রথম পদার্পণ করিয়াই আমি অনতিদূরের এলিফ্যান্ট গুহার ভাস্কর্য্য শিল্প দেখিতে যাই। গিয়া দেখিলাম, পাহাড়-খোদা সুঠাম মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্যের চরম নিদর্শন, কিন্তু বিকৃতাঙ্গ। অনুসন্ধানে জানিলাম, পোর্টুগীজেরা প্রথম যখন এদেশ অধিকার করেন, তখন পৌত্তলিকতার উপর বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া কামান দ্বারা উহা ধ্বংস করার প্রচেষ্টা পায়। সভ্য কাহারা—ধর্ম্মান্ধ পোর্টুগীজগণ অথবা ভারতের সুরুচিসম্পন্ন শিল্পিগণ, যাঁরা ছিলেন এই ভাস্কর্য্যের নির্ম্মাতা?

ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন তাঁর স্বদেশবাসীকে বলিতেন, যে ভারত প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির লীলাভূমি, ভারতকে অসভ্য ভাবার মত বোকামী ও অজ্ঞতা আর নাই। তিনি ব্রিটেনবাসীকে আরও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, সে কত যুগ পূর্ব্বে যখন ব্রিটেনবাসীরা

বর্ব্বর ও অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় জঙ্গলীর মত বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন ভারতবাসী বিশ্বকে ধন্য সার্থক করিয়াছে তার গভীর দর্শন, উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পের অবদান দিয়া।

ভারতীয় শিল্পকলা ও ইতিহাসের অনুধাবন—

যে কোন বস্তুর সহিত একটা নিবিড়তম পরিচয় লাভ করিতে হইলে আদৌ শ্রদ্ধার প্রয়োজন, নচেৎ সত্যকারের সম্বন্ধ বা সেই বস্তুর অন্তরপরিচয়-লাভ সম্ভব নয়। ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হইলেও নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও দরদ দিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর সারগর্ভ বাণীতে একটা কর্ত্তব্যের দিগ্‌দর্শন মেলে। সহযোগী 'বঙ্গশ্রী' হইতে তাঁর কথার কিয়দংশ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

"পুরাতনকে ছাড়িয়া আধুনিক বা নূতনকে মানিয়া চলা, ইহাই আজিকার দিনে ভারতের বৃহত্তম সমস্যা। নূতন যুগ বিশ্বব্যাপী জাগরণ-যুগ। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সমাজ—সমগ্র মানবজাতি তো বটেই, ব্যক্তিগত মানুষের মনও পৃথিবীর ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে একটা সমগ্র দৃষ্টি লাভ করিতেছে।

আধুনিক যুগকে পরস্বাপহরণের (exploitation) যুগ বলা চলে—সৃষ্টির যুগ নয়। মধ্যযুগের সূচিশিল্প, চিত্রশিল্প, ড্রইং প্রভৃতির সাহায্য নিতে হচ্ছে। * * আধুনিক যুগ সংগঠনের যুগ (organisation)—কল কারখানা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, যান্ত্রিক করিয়া তুলিতেছে। * * বর্ত্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগও বটে। * *

ভারত এখনও মধ্য যুগেই (medieaval) আছে। মধ্য যুগ সৃষ্টি। যুগ—অপহরণের যুগ নয়। ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত জীবন এখনকার চেয়ে অনেক অন্তর্মুখী ছিল। বহু যুগ ধরিয়া বংশে বংশে কাজ করিতে করিতে যে শিল্পী জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা এখন ক্রমশঃ মৃতকল্প ও অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে সেইদিন হইতে, যেদিন ভারত-রাষ্ট্রীয় পরাধীন হইয়াছে। * *

ভারতসন্তানেরা যদি ভারতবর্ষের চিন্তাধারাকে ভারতবর্ষীয়ের মত করিয়া ধারণা করিতে না পারে, ভারতের অন্তর্নিহিত ভাবসাধনাকে মূর্ত্ত করিবার জন্য সাধনা না করে, তাহা হইলে দেশের মূল্যবান্ যাহা কিছু সবই ধীরে ধীরে লুপ্ত হইবে। * * জাতীয় চরিত্র জাতির ইতিহাসচর্চ্চার ফলেই গঠিত হয়। আমরা কি এবং কোন পথে চলিতে চাই, জানিতে হইলে আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম তাহাও জানিতে হইবে। * * ইতিহাসের টানার উপর জাতীয়তার পোড়েন বলা হয়। (History is the warp upon which is to be woven the woof of nationality) নিজের অতীত দর্পণেই ভারতবর্ষ নিজের আত্মার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে এবং সেই ছায়া-দর্শনের দ্বারাই সে নিজেকে চিনিতে পারিবে। একমাত্র অনুশীলনের ফলেই জাতিগঠনের পক্ষে কোন কোন উপাদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা সে জানিতে পারিবে। এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণ পরিণতি ঘটিবে। শৌর্য্যে বীর্য্যে সে আবার মহৎ হইবে।

বিচিত্র সভ্যতা—

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রীতিনীতি। একদেশের আদবকায়দা অন্য দেশের চোখে বিসদৃশ লাগে। প্রিয় অপ্রিয়ের মাপকাঠী নাই। যা যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাই সংস্কারে দাঁড়ায়, মানুষও তাহা নিঃসংশয়ে মানিয়া লয়। শুনা গিয়াছে:—

ইষ্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত আইযুৎ-লোৎ নামক দেশে এক অদ্ভুত আইন আছে। সেখানে পুরুষের সামনে নারীকে এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে হয়; কদাচ দুই চোখ খুলিয়া রাখিতে পারে না।

ইংরাজের দেশ খুব সভ্য, সমাজবন্ধনও মার্কিণের মত এত আল্‌গা নয়। রক্ষণশীলতা দেশবাসীর মর্য্যাগত। এমন সভ্য দেশেও নারী পুরুষের সম্বন্ধ যে কত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ, তা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের রিপোর্ট হইতেই বুঝা যায়:—

১৯০৮ সাল হইতে বিবাহবিচ্ছেদের তালিকা লওয়া হয়। আজ পর্য্যন্ত বৎসরে গড় পড়তায় প্রতি বৎসর ১০২৭টি বিবাহ-সংক্রান্ত মামলা হইয়াছে। ১৯৩১ সালে মোট ৪৬০৩টি এবং ১৯৩২ সালে ৪৬৩৮টি মামলা হইয়াছে; ১৯৩২ সালে গ্রেট ব্রিটেনে ডিক্রীই হইয়াছে মোট ৩৮২৫ মামলার। উহাতে বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর হইয়াছিল। তন্মধ্যে স্বামীর ব্যাভিচার হেতু পত্নী ডিক্রী পাইয়াছে ২২৩১, আর পত্নীর ব্যাভিচারের জন্য স্বামী ডিক্রী পাইয়াছে ১৬৫৪, পত্নীর ব্যাভিচার সকল সময়ে চোখে পড়ে না। এই বৎসরই না কি রেকর্ড।

অথচ—

যুক্ত-রাজ্য (ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্) আয়তনে ভারতের একটি প্রদেশ বোম্বাইয়ের সমান, আর লোকসংখ্যায় বাংলার সমান; কিন্তু রেল লাইনের বিস্তার সারা ভারতের চেয়েও অধিক।

তবে কি সভ্যতার পরিমাপ সামাজিক পবিত্রতায় নহে, পরন্তু রেল ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারে?

ঢেউয়ের পর ঢেউ

(উপন্যাস)

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

— ষোলো —

একদিন অভাবনীয় রূপে মহীপতি এসে দেখা দিলো। শরীরে নয়, চিঠিতে।

চিঠিটা ধরণীবাবুকেই লেখা। মোড়কটা খুলে ফেলবার সময়ও তিনি স্বপ্নাক্ষরে ভাবতে পারেন নি অক্ষরে-অক্ষরে কী আনন্দ সেখানে সঞ্চিত হ'য়ে আছে, কী আলোড়ন! চিঠিটা এক নিশ্বাসে তিনি পড়ে' ফেললেন, পরে প্রত্যেকটি শব্দ ধরে'-ধরে' তীক্ষ্ণ চোখে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করে' প্রকাশ্যে যেটুকু লিখিত তার অন্তরালে নিহিত অনেক নিঃশব্দতার ঢেউ মেপে,—কিন্তু প্রথমটা তিনি কোনো তার ধারাবাহিক অর্থ করতে পারলেন না। মহীপতি চিঠি লিখেছে! এ কখনো সত্যি হ'তে পারে, আছে এর মধ্যে কোনো পারম্পরিক সম্ভাবনা? অনেক সন্দেহ, অনেক জিজ্ঞাসা—ধরণীবাবু আনন্দে, অবিশ্বাস্য, অসহ্য আনন্দে দগ্ধ হ'য়ে যেতে লাগলেন। সামান্য ক'টি লাইন, নির্ভুল, নিঃসংশয়: প্রচ্ছন্ন উচ্চারণে প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট, নিরাবরণ, প্রখর সারল্যে প্রত্যেকটি অর্থ তরোয়ালের ফলার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। তিনি তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। মহীপতি চিঠি লিখেছে, মহীপতি—তার দেশের বাড়ি থেকে, টিকিটের উপর ডাকঘরের সেই মোহর, দু'দিন আগেকার সেই তারিখ, এই তার হাতের লেখা—স্বয়ং ললিতাও যা কোনদিন দেখে নি। এর মাঝে কোথায় যেন একটা ছন্দোহীন আকস্মিকতা ছিলো। তবু এ তারই চিঠি, সমস্ত সংবাদে সে-ই রয়েছে জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে, তার অনস্বীকার্য্য আশরীর বিদ্যমানতা। লিখেছে—এ ছাড়া কী-ই বা আর সে লিখতে পারতো—সামান্য সঙ্ক্ষিপ্ত ক'টি লাইন, লিখেছে: সম্প্রতি সে দেশে ফিরেছে, কল্‌কাতায় আসছে পনেরোই, মানে কাল সকালে। তার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন, প্রধানতো চিকিৎসার জন্যেই তার আসা। শ্বশুরবাড়িতেই সে এসে উঠবে অবিশ্যি—এ-কথাটা বিশেষ করে' তার লেখবার কিছু দরকার ছিলো না। আশা করি বাড়ির সবাই বেশ ভালো আছেন। একা ধরণীবাবুর গৌরবেই যে বহুবচনটা ব্যবহার করা হয়েছে, তা না-ও হ'তে পারে—দুর্নিরীক্ষ্য একটি সংকেতে ধরণীবাবু রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলেন।

খবরটা তিনি অনেকক্ষণ কারু কাছে ভাঙলেন না। যতোই সময় যেতে লাগলো, সময় এখন তরল জলের উপর দিয়ে চলে' যাচ্ছে—ততোই তিনি খবরটা বিশ্বাস করতে লাগলেন, যেন প্রত্যাশিত প্রাত্যহিক একটা ঘটনার টুকরো, যেমন আজকে আবার সূর্য্য উঠেছিলো, যেমন রোদের দিকে গাছ তার পাতাগুলি মেলে ধরেছে, যেমন আকাশে ছড়িয়ে আছে নীল নীরবতা। বাস্তবিক, এতে এমন চমকে ওঠবার কী ছিলো কে বলবে? এ তো ঘটতোই, এ ঘটবে বলে'ই তো মরা, লালচে পাতার মতো ঝরিয়ে দিতে হয়েছিলো এতোগুলি দিন-রাত্রির দীর্ঘশ্বাস, এ ঘটবে বলে'ই তো আকাশে সূর্য্য এতোদিন অপেক্ষা করেছে. এতো অন্ধকারেও রাত্রিগুলি ক্ষয় হ'য়ে যায় নি। যতোই সময় যেত লাগলো, ধরণীবাবু এর মাঝে আর এক বিন্দু অভাবনীয়তা খুঁজে পেলেন না, এ যেন তিনি অনেক আগে থেকেই জানতেন: শীতের ধূমলতার পর বসন্তের এই বিদারিত নীলিমা। এতোদিন তিনি যেন কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটছিলেন; আজ, এতোদিনে, মাটিতে ফেললেন না, তাঁর সাংসারিক পরিমিতিতে—এর মাঝে অলৌকিক কিছু নেই, মহীপতির ফিরে আসাটা সময়ের সমুদ্রে ঋতুর পুনরাবর্ত্তনের মতো কবিতায় এক শব্দ থেকে অন্য শব্দের সহজ সংক্রমণের মতো নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধারিত.—জাহাজের যেমন বন্দর, স্রোতের যেমন তীর—খবরটা এমন কিছু আর আকাশ থেকে পড়ছে না!

নিচে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, আবছা চোখে পড়লো ললিতা তার ঘরে পাইচারি করতে-করতে শিথিল স্তিমিত ক'টি আঙুলে চুলের বেণী খুলছে। ধরণীবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। ললিতার চেহারায় কেমন একটি নিরাভ ঔদাসীন্য, যেন নিস্তেজ বিশীর্ণতার একটি ধারা, কোথাও তার শরীর নয় শিহরিত। দহমান, উজ্জ্বল একটা শিখাকে নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে যদি তাকে আঁকা যেতো তবে তা প্রাণময় হ'য়ে উঠতো ললিতার এই শীতল বিষণ্ণতায়। দেখে ধরণীবাবুর ভারি মায়া করতে লাগলো, খবরটা এখুনি তাকে না জানালেই নয়।

তাঁর ইচ্ছা ছিলো কাল সকালেই যখন মহীপতি আসবে, তখন, একেবারে সেই সময়ই ললিতা জানবে, খবরটা তার উপর ভেঙে পড়বে উচ্ছল, ফেনিল, প্রবল একটা ঢেউয়ের মতো। তাকে এতোটুকু কোথাও প্রস্তুত হ'তে দেবে না, রাখবে না এতোটুকু পালাবার কোনো অন্তরাল। অপ্রতিবোধ্য, অনাবৃত একটা উপস্থিতি। যেন মহীপতি একান্ত করে' ললিতার কাছেই ফিরে আসছে, নেই এর মাঝে আর কোনো সাংসারিক ষড়যন্ত্র। খবরটা যেন সে-ই প্রথম জানতে পারলো, আবিষ্কার করলো সে-ই তার জীবনের নতুন মহাদেশ। কিন্তু ললিতার এই মলিন ম্রিয়মাণতা দেখে তিনি আর দেরি করতে পারলেন না, চুলগুলিতে সেই উজ্জ্বল ঘনতা নেই, কপালটা রুক্ষ, চোখের কোল ঘেঁসে নমিত পল্লবের গভীর ছায়া পড়েছে, কাঁধ দু'টি কেমন শিথিল, দুই হাতে যেন এতো রিক্ততা সে আর বইতে পারছে না, পরনের সাড়িটাতে পর্য্যস্ত ছড়িয়ে পড়েছে তার শরীরের ধূসরতা—ধরণীবাবু পারলেন না আর খবরটা চাপা দিয়ে রাখতে; সত্যিকারের যে আর্ত্ত তার জন্যে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত না রেখে উচিত তার উপস্থিত উপশম করা। ধরণীবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

গলা তাঁর কথা বলতে গিয়ে সাদা থাকলো না অবিশ্যি। ঈষৎ উত্তপ্ত, গাঢ় গলায় বললেন, খুব একটা ভালো খবর আছে, ললিতা।

ললিতার লতানো আঙুলগুলির মধ্যে ছিন্ন বেণীটা কেঁপে উঠলো। চারদিকে যেন সে রাশি-রাশি জল দেখছে এমনি চিহ্নহীন, অপার চোখে সে চেয়ে রইলো।

ধরণীবাবু বললেন,—মহীপতির হঠাৎ আজ একটা চিঠি পেলাম।

খবরটা শুনে তাঁর চোখের সামনে ললিতার শরীর রাতের নদীর মতো আনন্দের অন্ধকারে ঝলমল্ করে' উঠবে বা সূর্য্যালোকে নিষ্কাশিত অসির শাণিত শীর্ণতার মতো, তেমন কিছু স্পষ্ট আশা করেন নি। কিন্তু খবরটার মধ্যে এমন একটা বিহ্বল মাদকতা ছিলো, এটুকু তিনি অন্তত ভেবে রেখেছিলেন, দেখতে-দেখতে ললিতা সর্ব্বাঙ্গীণ সুরভিত হ'য়ে উঠবে, তিনি তা তার প্রথম নিশ্বাস নেওয়ার মুহূর্ত্তে বাতাসে অনুভব করতে পারবেন। দেখতে-দেখতে তার কপালে একটি স্নিগ্ধ প্রশান্তি ফুটে উঠবে, চোখের প্রখর শুভ্রতা উঠবে কালিমায় কোমল হ'য়ে, তার পাণ্ডুর মুখের উপর ফুটবে একটি সদ্যোজাত কিশলয়ের শ্যামলতা, তাকে তিনি আর খানিকক্ষণ চিনতে পারবেন না।

কিন্তু ললিতার মুখ দেখে তিনি শুকিয়ে গেলেন। যেন ডুবন্ত জাহাজে সে পা রেখেছে এমন ভীত, সর্ব্বস্বহারা মূর্ত্তিতে ললিতা চেঁচিয়ে উঠলো: কা'র?

—মহীপতির। সে এখানে আসছে, কাল,কাল সকালে। আমি যেন এখনো তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না।

—এখানে, এখানে আসছে মানে? ললিতা দুই হাতে শক্ত করে' তার চুলের স্খলিত গুচ্ছটা টেনে ধরলো: আমাদের বাড়িতে?

—হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতেই বৈ কি। ধরণীবাবু পাংশু মুখে হেসে উঠলেন: নইলে কলকাতায় এসে সে আর কোন বাড়িতে উঠবে? আমরা ছাড়া এখানে তার কে আত্মীয় আছে?

যেন কোন পরাক্রান্ত আততায়ীর সম্মুখীন হচ্ছে, নিরস্ত্র অথচ নিষ্ঠুর, ললিতা কণ্ঠস্বরে তেমনি প্রতিবাদ করে' উঠলো: কিন্তু কেন সে আসছে শুনি?

কেন যে সে আসছে কারণটা ধরণীবাবুও এতোক্ষণ ভুলে' ছিলেন। এখানে সে আসছে, এর আবার একটা স্পর্শসহ কারণ দিতে হ'বে নাকি—এখানে সে আসছে,

শুধু এইটেই কি তার ফিরে আসার যথেষ্ট কারণ নয়? ধরণীবাবু তবু একটা ঢোঁক গিললেন, বল্লেন,—লিখেছেন তার নাকি কী অসুখ করেছে, চিকিৎসার দরকার—

ললিতা কথার মধ্যখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো: চিকিৎসার দরকার তো এখানে কেন? আমরা কি এখানে রুগীর জন্যে হাসপাতাল খুলে বসেছি নাকি?

—তুই এ কী বলছিস্ ললিতা? ধরণীবাবু তার মুখের দিকে মূঢ়ের মতো চেয়ে রইলেন: মহীপতি আসছে, আর কেউ নয়, স্বয়ং মহীপতি, যার জন্যে এতোদিন ধরে' আমরা পথ চেয়ে বসে' আছি—যার জন্যে—কথাটাকে সর্ব্বাঙ্গীণ আয়ত্ত করতে গিয়ে ধরণীবাবু একেবারে ছেলেমানুষের মতো উথ্‌লে উঠলেন: ঈশ্বর তা হ'লে এতোদিনে মুখ তুলে চাইলেন, ললিতা! এ কি কখনো মিথ্যে হ'তে পারে, এতো নিষ্ঠা, এতো দুঃখ? তুই তো কোনো অপরাধ করিস নি।

– কিন্তু তাই বলে, এখানে সে আসবে কেন? ললিতা যেন চারদিকে অন্ধকার দেখলে।

—বা, এখানে আসবে না? এখানে আসবার জন্যেই তো সে আসছে এতোদিনে। ধরণীবাবু দার্শনিকের মতো নির্লিপ্ত, নিটোল গলায় বল্লেন,—আসতে যে তাকে হ'তোই। জলে যতোদিন জোয়ার-ভাটা আছে, আকাশে আছে যতোদিন দিন-রাত্রি, সে যাবে কোথায়, যাবে কোথায় সে এ চক্রান্ত এড়িয়ে? পৃথিবী তো আর মিছিমিছি ঘুরছে না।

আনন্দের আকস্মিক আতিশয্যে ধরণীবাবুর কথাবার্ত্তা প্রায় ভাবাতুর কাব্যের পর্য্যায়ে এসে যাচ্ছিলো, কিন্তু ললিতা এক নিমেষে তাকে নামিয়ে নিয়ে এলো কঠিন, অচল বাস্তবতায়। ললিতার নির্ব্বাপিত, শীতল, মুখ শুকিয়ে শীর্ণ, ধারালো হ'য়ে এলো, তার সমস্ত ঘৃণা ও রুক্ষতা এসে দাঁড়ালো তার দুই চোখে; সে স্পষ্ট, কঙ্কালের মতো দৃঢ় কণ্ঠে বল্লে,—না। পৃথিবী ঘুরুক্ বা না-ঘুরুক্, এখানে, এ-বাড়িতে ঢোকবার তার আর অধিকার নেই।

—অধিকার নেই? ধরণীবাবু গর্জ্জে' উঠলেন: তুই তার স্ত্রী নোস্?

—সেই কথা এতোদিন পরে তার মনে পড়লো বুঝি? ললিতা ঘুরে দাঁড়ালো: যখন সে আমাকে একদিন পুরোনো, বাসি খবরের কাগজের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো, তখন আমি তার কী ছিলাম?

—কিন্তু সে তো ফিরে আসছে শেষ পর্য্যন্ত। অসুখই হোক বা যাই হোক্, আসছে তোরই কাছে, একান্ত করে' তার স্ত্রীর কাছে। ধরণীবাবু গলার স্বর স্নেহে আবার নরম করে' আনলেন: তোরই প্রতীক্ষা, তোরই তপস্যা শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হ'লো, ললিতা।

ধরণীবাবু চলে' যাবার উদ্যোগ করছিলেন, ললিতা তাঁর মুখের উপর কথার কতোগুলি তীক্ষ্ণ, আগ্নেয়-উজ্জ্বল বাণ ছুঁড়ে মারলো: আর আমি? আমি যদি একদিন এমনি অনায়াসে, এমনি বিবেকহীন নির্ম্মমতায় বেরিয়ে পড়তাম ও আসতাম পরাজিত হ'য়ে ফিরে, আমার মহামান্য স্বামীর আশ্রয়ে, সে আমাকে সেদিন হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতো হাসিমুখে? থাকতো সে আমার প্রতীক্ষা করে', সেদিন আমার অভ্যর্থনায় খুলে দিতো সে তার ঘরের দুয়ার?

—কিন্তু সে তো আর শুধু-শুধু বেরিয়ে যায় নি। ধরণীবাবু ফিরে এলেন: তার জীবনে বৃহত্তর এক সত্যের সন্ধান এসেছিলো। হয়তো সে-সন্ধান এসে এতোদিনে পরিণতি পেয়েছে তার স্ত্রী-তে, তার গৃহানুরাগে।

—তার সৌভাগ্য। ঘৃণায় ললিতার দুই ঠোঁট লালায়িত হ'য়ে উঠলো: কিন্তু আমার সেদিনের সত্য নিশ্চয়ই কখনো এতো বড়ো অর্থ নিয়ে দাঁড়াতো না। আমি সেদিনো সেই বাসি, পুরোনো খবরের কাগজের মতোই প্রত্যাখ্যাত হ'তাম।

—কিন্তু সেই দিক থেকে তোর তো কিছুই অভিযোগ করবার থাকতে পারে না। সে ছিলো সন্ন্যাসী, সাধু, চরিত্রগৌরবে বহ্নিমান।

—মিথ্যা কথা। ললিতা সমস্ত স্নায়ু-শিরায় ধিক্কার দিয়ে উঠলো: তার চেয়ে, তার চেয়ে মুক্ত, স্পষ্ট, প্রাণবান অসচ্চরিত্রতায়ো ঢের বেশি মহত্ত্ব আছে।

—কিন্তু মানুষের ভুল তো একদিন ভেঙে যেতে পারে, ললিতা। ধরণীবাবু প্রশান্ত গলায় বল্লেন,—সেই স্বাধীনতা তো জোর করে' কারুর কাড়বার ক্ষমতা নেই।

—নেই, কিন্তু ভুল কারুর সংসারে একলাই ভাঙে না, বাবা। ললিতার সর্ব্বাঙ্গ হঠাৎ বেদনায় অবসন্ন হ'য়ে এলো, নিস্তেজ হ'য়ে এলো তার দাঁড়াবার সেই প্রখর ঋজুতা, তার কঠিন মুখের শাণিত রেখাগুলি ধীরে-ধীরে এলো ধূসর, স্তিমিত হ'য়ে, সে আর্দ্র, প্রায় রুদ্ধ গলায় বললে,—তেমনি আমারো স্বাধীনতা আছে, ভুল ভাঙবার, ভুল করবার, অখণ্ড অজস্র স্বাধীনতা। আমার সে-স্বাধীনতাও কেউ কাড়তে পাবে না।

—তুই, তুই কী করবি? ধরণীবাবু যেন হাঁপিয়ে উঠলেন: তুই কী করতে পারিস বোকা মেয়ে?

—আমি কিছুই করতে পারি না, না? ললিতা দুই হাতে মুখ ঢাকলো যেন তার অনপনেয় কলঙ্কের ইতিহাস, উঠলো সে কান্নায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে: আমি একটা পথের আবর্জ্জনা, আমি মানুষ নই, আমার জীবনে কোন উপলব্ধি, কোনো অন্বেষণ থাকতে পারে না, ইচ্ছেমতো যে খুসি আমাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে' দিতে পারে। আমার নিজের কোনো মেরুদণ্ড নেই, আমি খামখেয়ালি পরের হাতে খেলার একটা পুতুল হ'য়ে আছি মাত্র, দড়িতে টান দিলে আমি দাঁড়াই, দড়িতে ঢিল দিলে আমি বসে' পড়ি।

খবরটা শুনে দীপ্তিতে ললিতা সর্ব্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত হ'য়ে পড়বে তা ধরণীবাবু আশা করেন নি বটে, কিন্তু এমন একটা বিয়োগান্ত অভিনয়ের পরিকল্পনাও তাঁর দুঃস্বপ্নের অগোচর ছিলো। অভিনয় ছাড়া আর কী হ'তে পারে! নিতান্ত একটা তরল নাটুকেপনা! নইলে, সংসারে কোথায় তার স্থান, কিসে তার সমারোহ, এ-কথা কোন পতিবত্নী মেয়ে না উপলব্ধি করতে পেরেছে সশরীরে! অগত্যা ধরণীবাবু ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হেসে উঠলেন। বললেন,—তোকে আবার এ কী পাগলামি ধরলো, লিলি। এমন একটা সুখবরে খুসিতে কোথায় উছ্‌লে পড়বি, না, তুই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছিস?

—না, কই আর কাঁদছি। আজ আমার কাঁদবার দিন নাকি? ললিতা মুখটা মুছে বিবর্ণ, সাদা করে' তুললো।

—সে এখনো বেঁচে আছে, আমাদের সে আজো ভোলে নি, তার জীবনে এসেছে নতুন পরিবর্ত্তন, ধরণীবাবু আহ্লাদে গদ্গদ হ'য়ে উঠলেন: এমন দিনে ঈশ্বরকেই প্রথম মনে পড়ে, ললিতা।

—আমারো মনে পড়ে ঈশ্বরকেই। ললিতা পাংশু, মুখে প্রেতায়িত হেসে উঠলো: আমিও এখনো বেঁচে আছি, বাবা, আমিও কিছু ভুলি নি। পৃথিবী অনেক পথ ঘুরে এসেছে, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও আর এক-জায়গায় থেমে নেই।

নেই তো নেই। চান করতে যাচ্ছিস তো যা চট্ করে'। ধরণীবাবু নিজেই অগ্রসর হ'লেন: সেই দিনের এক ফোঁটা মেয়ে, লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতে শিখেছে দেখ। ওঁর আবার পরিবর্ত্তন হয়েছে! এতোদিন পরে স্বামী ঘরে ফিরে আসছে, আর ওঁর হয়েছে পরিবর্ত্তন! পাগলামি করার আর তুই সময় খুঁজে পেলি না? বলেই আবার তিনি হাসিতে উৎসারিত হ'য়ে পড়লেন।

—ঠিকই তো, ললিতা নিরুদ্বেগ, নিম্ন কণ্ঠে বললে, যেন নেপথ্য থেকে: আমরা বদলাবো কেন, আমরা যে পাথর! যার খুসি পাথরকে পুজো করে, যার খুসি ছুঁড়ে দেয় পথের ধূলায়। আমরা বদলাবো কেন, বেশ, চিরকাল আমরা এই পাথর হ'য়েই থাকবো।

ধরণীবাবু তার কথা আর কানে তুললেন না। গম্ভীর বিজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন হাসি হেসে স্বচ্ছন্দে নিচে নেমে গেলেন।

বিশাল, নিরবয়ব, নিশ্চল স্তব্ধতা ললিতাকে অণুতে-পরমাণুতে গ্রাস করে' ধরলো। সত্যি, পৃথিবী যেন আর চলছে না, সময় রয়েছে গতিরোধ করে', তার নিজের এই অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন তার নিশ্বাসে রয়েছে রুদ্ধ, স্তম্ভিত। এ-মুহূর্ত্তে তার জন্যে আর কোনো আশ্রয় নেই, আবরণ নেই, সে যেন চলে' এসেছে তার অনস্তিত্বের শুভ্রতায় বস্তুহীন, শূন্যায়িত আকাশে। যেন তার বুকের থেকে উত্তপ্ত হৃৎপিণ্ডটা খসে' পায়ের তলায় পড়ে' গেছে—সমস্ত শরীর ভরে' সে এতো অসহায়, এতো দুর্ব্বহ। শৃঙ্খলিত যে পশু, তার মাঝেও এর চেয়ে বেশি দীপ্তি থাকে, তার দুর্দমনীয় বিদ্রোহের দীপ্তি: তার পরাভাবে থাকে এর চেয়ে অনেক বেশি মহিমা। শিকারীর মুঠোর মধ্যেও পাখী তার পাখা ঝাপ্‌টায়। তরল যে জল, সে-ও বাধার বিরুদ্ধে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। শুধু সে-ই নিতান্ত নিরীহ,

একতাল কাদার চেয়েও নমনীয়, প্রাণিজগতে সে-ই শুধু সেই স্তরে নেমে এসেছে যাদের দেহে আর রক্ত নেই, যারা আত্মরক্ষার জন্যে দংশন পর্য্যন্ত করতে জানে না।

আঁচলের স্তূপে মুখ লুকিয়ে ললিতা আবার কেঁদে উঠলো। কেন, কেন সে ফিরে আসবে, কোন নিয়মে, কোন অধিকারে? চলে'ই যদি সে যেতে পারলো, পিছনের সমস্ত পথ তার পায়ে-চলার উড়ন্ত ধূলিতে কেন মুছে দিয়ে গেলো না? সে যখন যেতে পেরেছিলো, তখন ললিতাই শুধু পৃথিবীতে একা থেমে ছিলো নাকি? তার জন্যে আর কোনো ছিলো না পথ, ছিলো না কোনো পান্থশালা? সে-ই যেন শুধু তার স্মৃতির ছায়ায় বসে' রাত্রিদিন ধরে' সুখ-স্বপ্নের রঙিন আলো জেলে বসে' আছে! আজ একযুগ পরে সেই প্রতীক্ষমান পরিচিত আলোয় পথ চিনে-চিনে, নির্ভুল অশঙ্কমান নিশ্চিন্ততায় ফিরে আসছে! ললিতাকে সে ভোলে নি, ললিতার জন্যেই সে এতোদিন বেঁচে ছিলো! ললিতা আজো তার জন্যে রচনা করে' রেখেছে আরাম-রমণীয় নিবিড় সুখ-শয্যা, সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে দহমান যৌবনের আরতি! তার সমস্ত সন্ধান, সমস্ত জিজ্ঞাসা আজ এসে শেষ হ'লো ললিতার সমৃদ্ধ শারীরতায়, আজো যা তার স্পর্শের স্বপ্নে শিহরায়মান, আজো যা তার সান্নিধ্যের তৃষ্ণায় প্রতি রোমকূপে হাহাকার করছে! ললিতার সমস্ত শরীর পিচ্ছল ঘৃণায় ক্লেদাক্ত একটা সরীসৃপের মতো কিল্‌বিল্‌ করে' উঠলো। ললিতাকে আজ তার দরকার পড়েছে, তার শরীরে আজ চাই তার নমনীয় সুষমা, স্নেহের গলিত নির্ঝরিনী, দুই হাতে চাই তার অজস্র দিৎসা, অকৃপণ সেবমানতা: তার ঈশ্বর আজ বাসা নিয়েছে এসে ললিতার মৃণ্ময় সীমাবদ্ধতায়, সে-ও অমনি এসে তার নিভৃত ছায়ায় দাঁড়ালো। হায়, কেবল ললিতারই কোনো ঈশ্বর নেই। সে শুধু তার পূজার একটা অকিঞ্চিৎকর উপকরণ, তার সার্থকতা শুধু সেই প্রাণহীন উৎসর্গে, মলিন আশরীর মৃত্যুতে। বিষাক্ত ঘৃণায় ললিতা আপাদ-মস্তক জর্জ্জর হ'য়ে উঠলো, তার এই পাতিব্রত্যের সাধনা ক্লান্তিকর অশুচি একটা দৈহিক গ্লানির মতো তাকে অন্তরে-বাহিরে অপরিচ্ছন্ন করে' তুলেছে।

বরং, মহীপতিকে সে কতো শ্রদ্ধা করতো মনে-মনে, তার সেই কঠিন নিষ্ঠুরতা, সেই দুর্জ্জয় প্রত্যাখ্যান! সেই নিষ্ঠুরতা, ও ত্যাগে সে ছিলো দুস্পৃশ পুরুষ, বলোজ্জ্বল, স্পর্দ্ধা-উদ্ধত, তার সেদিনকার তিরোধানে ছিলো সে অনেক জ্যোতির্ম্ময়। ললিতার চোখের সামনে পূজার ঘরে মহীপতির সেই ধ্যানাসীন, প্রশান্ত মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তার সেদিনকার বসবার তন্ময় ভঙ্গিতে ছিলো অবিচল ঋজুতা, নিঃস্পৃহ নিরাকুল চোখে ছিলো উপলব্ধির গাম্ভীর্য্য, সমস্ত শরীরে সে যেন ছিলো এক দেহাতীত বিস্ময়, অলৌকিক আবির্ভাব। কতোদিন কতো ফাঁকে ললিতা তাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখেছে। সে ছিলো সেদিন এক শীত তুষারহীন আগ্নেয় পর্ব্বত, স্নেহে একদিনো সে গলে' না এলেও তার সেই মহান নির্ম্মমতায় অনেক বেশি আস্বাদ ছিলো, অনেক বেশি ঐশ্বর্য্য। আজ তাকে নিতান্ত লোভী, ভিক্ষুকের মতো মনে হচ্ছে। সে, সে-ও কিনা অবশেষে তার সেই দৃপ্তঃ পরুষতা মিনতিতে নরম করে' আনলো ললিতার দেহের দুয়ারে, তার হাতের দু'টি আর্দ্র সেবা পাবার জন্যে, পেতে তার দু'টি ভীরু উত্তাপ, শরীরময় গাঢ় একটি বনচ্ছায়া! আর ললিতা কিনা আজো তার অস্ফুট ইঙ্গিতের প্রত্যাশায় প্রতি-ধ্বনিমান, সেই নববধূর নিমীলিত সৌরভ নিয়ে আজো কিনা সে শয্যার সঙ্কীর্ণ প্রান্ত ঘেঁসে শুয়ে আছে, অস্তমান চাঁদের মতো নিরাভ। যতো তার আলো সব যেন তার স্বামীর থেকেই উৎসারিত হচ্ছে, যতো তার পিপাসা সব যেন তারই পিপাসা থেকে। ললিতা আপনমনে বিশীর্ণ মুখে হেসে উঠলো। এরই নাম প্রেম, এরই নাম পাতিব্রত্য!

ধরণীবাবু উপরে যখন উঠে এলেন, ললিতা তখনো দেয়ালের ধারে রেখায়িত একটা কঙ্কালের মতো বসে' আছে। তিনি তার এই নিষ্প্রভ ঔদাস্য আর সইতে পারলেন না। বিরক্ত মুখে ধম্‌কে উঠলেন: কী তুই এখনো বসে' আছিস চুপ করে'? এমন মুখ করে' আছিস যেন কী তোর ভয়ানক রাজ্যপতন হ'য়ে গেছে! কোথায় তুই স্ফূর্ত্তিতে উছ্‌লে পড়বি, তা নয়, আছিস মন-মরা হ'য়ে বসে'? এই শুভসংবাদের জন্যেই কি তুই এতোদিন

এইখানে বসে' প্রতীক্ষা করছিলি না? নে ওঠ্, চান করে' খেয়ে-দেয়ে নে, এই সব বিশ্রী সাজগোজ ছেড়ে দিব্যি লক্ষ্মীমন্ত হ'য়ে ওঠ্।

—এই উঠছি। ললিতা সারা শরীরে দুর্ব্বল, ভঙ্গুর ভঙ্গি করে' উঠে দাঁড়ালো।

ধরণীবাবু তার দিকে মহীপতির চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলেন: এই দ্যাখ্ তার চিঠি, চিঠি খুলবার সময়ো ভাবিনি আমি এ পড়বার জন্যে বেঁচে থাকবো, স্বচক্ষে দেখবো আবার এই মহীপতির হাতের লেখা। নে, পড়ে' দ্যাখ্ চিঠিখানা।

ললিতা নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—পড়ে' দেখবার কী আছে? শুনলামই তো সমস্ত।

—শুনলি তো অমন একখানা উপোসীর মতো চেহারা করে' আছিস কেন?

—আগে চান করে' খেয়ে-দেয়ে নি, তবে তো সাজবো। ললিতা বিশীর্ণ একটু হাসলো: সে তো আসছে কাল ভোরে।

—সাজবি না তো বিবাগীর মতো এমনি হতচ্ছাড়া বেশবাস করে' থাকবি নাকি? সংসারে তোর মা নেই বলে' আমার ওপর এমনি তুই শোধ তুলবি নাকি, লিলি? তুই নিজে কিছু বুঝিস না, বুঝিস না, কোথায় মেয়েদের ঐশ্বর্য্য, কিসে তাদের সার্থকতা?

—সংসারে মা নেই বলে' সত্যি করে' তুমিই তো তা বোঝাতে পারো বাবা, তোমার এই নিষ্ঠায়, তোমার এই ত্যাগে। ললিতার গলা ভারি, আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

—তেমনি তুইও বোঝাবি। ধরণীবাবু ললিতার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন।

সন্ধের দিকে আপিস থেকে ফিরে এসে ললিতার চেহারা দেখে ধরণীবাবুর আর পলক পড়তে চাইলো না। উদগ্র প্রসন্নতায় ললিতা আপাদমস্তক বন্য, ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছে। সর্ব্বাঙ্গে বিস্তীর্ণ করে' জড়িয়েছে এলোমেলো সবুজ একটা সাড়ি, বৃষ্টিসিঞ্চিত মাঠের প্রগল্‌ভ শ্যামলতা। একটি-একটি করে' গায়ে দিয়েছে তার সমস্ত গয়না, জলন্ত সোণায় সমস্ত গা তার দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, পিঠময় ছড়িয়ে দিয়েছে কালো চুলের ফেনিলতা, সমস্ত দেহ তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠেছে গুচ্ছ-গুচ্ছ উচ্ছ্বাসে। বর্দ্ধমান তরল জলধারার মতো তার শরীরের রেখাগুলি তার চটুল, মুখর হ'য়ে উঠেছে আনন্দের দ্যুতিতে, ছিটিয়ে পড়ছে সে বাড়ির এখানে-সেখানে, উপরে-নিচে, কাজে-অকাজে, সংসারের নানা প্রকার তুচ্ছতায়। আর নেই তার একবিন্দু ধূসরতা, শীতস্পৃষ্ট বনের বৈরাগ্য: মৃতপত্র অরণ্যে বসন্ত-বিদারণের মতো সে সর্ব্বাঙ্গে উঠেছে রোমাঞ্চিত হ'য়ে। নিজের মাঝে নিজে যেন সে আর আঁটছে না, উথলে পড়ছে তার বিলাসের নির্লজ্জতায়, তার বহু-আবৃত শরীরের সম্ভারে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে সে বিন্দুতম সিঁদূর পরছিলো সূক্ষ্ম চোখে—তার প্রসাধনের শেষ মুদ্রা, পিছনে ধরণীবাবুর পা শুনে সে ঘুরে দাঁড়ালো বিলোল গ্রীবা হেলিয়ে; বললে,—চমৎকার সাজি নি বাবা?

বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের অস্পষ্ট একটু আভা এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, সেই ঘোলাটে অপরিচিত আলোয় ধরণীবাবু চমকে উঠলেন, তাঁর সামনে শ্লথ দেহ, দীর্ঘ সবুজ একটা সাপ যেন প্রসারিত আলস্যে হঠাৎ ঝল্‌মল্ করে' উঠেছে। ললিতা আবার বললে,—চমৎকার সাজি নি, বাবা? ও কী, আমাকে তুমি চিনতে পারছো না? ললিতা উৎস-উত্থিত প্রবল নির্ঝরকল্লোলের মতো হেসে উঠলো। সেই হাসিও যেন ধরণীবাবু চিনতে পারছেন না।

বলতে কি, এতোটা তিনি কখনো আশা করেন নি। চমৎকারই বটে, অসহনীয় চমৎকার! সুখে ও সম্পদে ললিতা যেন মাতাল হ'য়ে উঠেছে, চেপে রাখতে পারছে না তার উচ্ছৃঙ্খল মেয়েলিপনা। তবু কী জানি কেন, তিনি এখন, এ-মুহূর্ত্তে আর বিজ্ঞের মতো হাসতে পারলেন না, তাঁর ভয় করতে লাগলো। এতো প্রাচুর্য্য যেন চোখ ভরে' দেখা যায় না, বিশেষ করে' আনন্দের প্রাচুর্য্য,—এর মাঝে কোথায় যেন আছে মুমূর্ষু শিখার অন্তিম বিস্ফারণের ইসারা।

তবু তিনি স্মিতমুখে এগিয়ে গেলেন; ললিতার সলজ্জ-উচ্ছল চিবুকটি তুলে ধরে স্নিগ্ধ গলায় বললেন,—চমৎকার! কিন্তু এখন থেকেই এতো সাজগোজ কেন, মা? সে তো আসছে কাল ভোরে।

—কাল ভোরে নাকি ? ললিতা কুটিল একটা কটাক্ষ করলো : তা হ'লোই বা কাল ভোর, মাঝখানে আজকের রাতটা তো আছে, কালকের ভোরের জন্যে আজকের রাতটা তো আর পালিয়ে যায় নি।

চান্দ্রমসী, নিশীথরাত্রির মতো ললিতা উঠলো বিহ্বল হ'য়ে।

আজকের রাতেই যেন তার সে মৃত অতীতের সুন্দর চিতারচনা করেছে। কিন্তু তবু ধরণীবাবুর যেন ভয় করতে লাগলো, ললিতার চারপাশে তিনি পরিমিত সংসার-পরিবেশের স্নিগ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেলেন না। আনন্দে সে কেমন হিংস্র হ'য়ে উঠেছে, তার সৌন্দর্য্যটা কেমন পাশবিক, অরণ্যলালিত: এখন তাকে প্রায় একটা বিচিত্রিতা বাঘিনীর মতো দেখাচ্ছে—সর্ব্বাঙ্গে তেমনি তার মহিমার ব্যঞ্জনা, তেমনি দ্যুতিমান ক্ষিপ্রতা, তেমনি দুঃসহ দুঃসাহস।

কাল ভোরের জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

— সতেরো —

খবরটা সৌরাংশুর কানে পৌচেছিলো, মহীপতির আকস্মিক ফিরে আসার খবর—আর তারই হাওয়ায় ললিতা কেমন সমস্ত দেহে হাজার প্রজাপতির রঙচঙে পাখা মেলে দিয়েছে তারই দু' একটা অস্ফুট গুনগুনানি। সাজলে যে মেয়েদের কতো কুৎসিত দেখায়, সৌরাংশু জীবনে এই প্রথম দেখলো। ললিতাকে যে মোটেই মানায় না এই উচ্চণ্ড সমারোহে, দীর্ঘ দীপ্ত তরবারির মতো এই প্রখর উদগ্র উন্মোচনে—সে-কথা তাকে কে বোঝাবে ? এতো আচ্ছাদিত হ'য়েও সে কেমন নিরাবরণ; এতো প্রকাশমান সৌন্দর্য্যের উপকরণেও তাকে কেমন দরিদ্র, নিঃস্ব দেখাচ্ছে। আর কেনই বা তার এতো আস্ফালন, এই উদ্দাম পাখা মেলে দেয়া ? কারণটা ভাবতেও কেমন সৌরাংশুর গা গুলিয়ে উঠতে থাকে, মনের অপরিচ্ছন্ন একটা আবহাওয়ায় এসে সে আর নিশ্বাস নিতে পারে না—অথচ তারো বা যে কী কারণ দেবতারাও বলতে পারে না। বহুবিলম্বিত বিরহের পর দূর অজ্ঞাতবাস থেকে স্বামী ফিরে আসছে, তার স্ত্রীর নিবিড় নিভৃতিতে, এতে কোন স্ত্রী না বহুবিসর্পিনী নদীর মতো মোহানার কাছে এসে উন্মুখর হ'য়ে উঠবে ! এতে আশ্চর্য্য হ'বার আছে কী ! এই তো স্বাভাবিক। আষাঢ়ে নতুন মেঘ দেখলে ময়ূরের পেখম মেলে ধরা, চাঁদ দেখলে সমুদ্রের সমস্ত শরীরে নীল-ফেনিল হ'য়ে ওঠা। তবু, হোক্ স্বাভাবিক, তবু ললিতাকে যেন এ মানায় না, মানায় না তার এই আবৃত উদ্ঘাটন ! অপরাহ্নের ক্ষণকালিক ধূসরতার মুহূর্তে ঘরে বসে' জ্বালাই না আমরা কেউ বিদ্যুতের আলো, ঘরে প্রথম রোদ এসে পড়লে গত রাতের বাসি বাতির মুমূর্ষুতাটা আমাদের চোখে বীভৎস লাগে। তাকে মানায় না এতো সুখ, এতো তার মদির কলঙ্কনিমানতা, এতো তার উচ্ছলিত চাপল্য —সংসারে কাউকে-কাউকে মানায় না, কী করা যাবে, সৌরাংশুর চোখে ললিতা তাদেরই বিরল একজন।

বরং, ঘরের দরজা ভেজিয়ে মধ্য রাতের সতেজ অন্ধকারে বসে' সৌরাংশু ভাবছিলো, বরং নটুর সেই রুগ্ন, মলিন শয্যার কিনারে বিষণ্ণ নিস্তব্ধতায় তাকে কতো বেশি সুন্দর দেখাতো, কতো বেশি সম্পূর্ণ। ঘরে আলো প্রায়ই জ্বলতো না, জ্বললেও মোমবাতির নরম, হলদে একটি শিখা, তরলায়িত অন্ধকারে ললিতা সৌরাংশুর চোখের অদূরে চুপ করে' বসে' থাকতো নিষ্কম্প, নিঃশব্দ, রাত্রির নিস্তব্ধ আত্মার মতো, পৃথিবীর বিস্মৃতি দিয়ে তৈরি, কবির ধ্যানে মৃত্যুর অকায়িক কল্পনার মতো। স্পর্শের অতীত যেন কোনো স্পর্শ, স্বাদের অতীত যেন কোনো স্বাদ। কতো ভালো লাগতো তাকে সেই বিধুর অস্পষ্টতার মধ্যে, সেই অতীন্দ্রিয়তাই ছিলো তার আপন নিষ্মিতি, দীর্ঘায়মান একটি গোধূলির ঔদাস্য। তাকে সে সব দিন কতো আত্মীয় মনে হ'তো তার সেই বেদনার লাবণ্যে, তার সেই পরিব্যাপ্ত নির্জ্জনতায়। আজ সুখী সাজতে গিয়ে সে কতো দরিদ্র হ'য়ে পড়েছে, সার্থক হ'তে গিয়ে কতো বঞ্চিত। শূন্যপথে স্খলিত তারার মতো চকিত দীপ্তি ছড়িয়ে সে নেমে যাচ্ছে কোন অন্ধকারে। তার চেয়ে পৃথিবীর বাতায়নের বাইরে তার দূর দুর্নিরীক্ষ্য আভাটুকু কতো ভালো ছিলো। কতো ভালো ছিলো তার অন্তর্লীন নির্লিপ্ততা। তার চারপাশে সেই ধূসর

পরিমণ্ডল। কিন্তু পৃথিবীতে সুখই সবাই চায়, সৌন্দর্য্য কেউ নয়—সৌন্দর্য্য এখানে একটা অবান্তর উপসর্গ।

ভাবতে-ভাবতে সৌরাংশু চিন্তার কোন অননুভূয় গভীরতায় গিয়েছিলো ডুবে, হঠাৎ প্রবল হাওয়ায় ঘরের দরজা দু'টো খুলে গেলো। বাইরে থেকে জোয়ারের জলের মতো শব্দ করে' ঢুকলো কতোগুলি অন্ধকার, যেন বা ঝড়ে কোথায় বন উঠেছে মর্ম্মরিত হ'য়ে। চমক ভেঙে সৌরাংশু যাচ্ছিলো দরজা বন্ধ করতে, হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঝল্‌সে উঠলো আলো, তীক্ষ্ণ দীর্য্যমান একটা আর্ত্তনাদের মতো।

আলোয় চাইতে গিয়ে সৌরাংশু ঘরের দেয়ালের মতো সাদা, স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। দেখলো ঘরের সেই অজস্র আলোয় ললিতা এসে দাঁড়িয়েছে। আলোকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে তার সাহস হ'লো না। ললিতা এসে দাঁড়িয়েছে, উগ্র, উদ্ঘাটিত, তার বিকেলের সেই সাজে, স্খলিত তারার মতো, নির্ভুল, তীক্ষ্ণ—কোথাও নেই জড়িমা, কোথাও নেই কুজ্ঝটিকা। রৌদ্রফলিত অসির প্রান্তের মতো সর্ব্বাঙ্গ তার শাণিত, দৈর্ঘ্যে ও দৃপ্তিতে, গয়নাগুলি আলোয় উঠেছে বিলোল অট্টহাস্য করে'। সৌরাংশু একবার চোখ বুজে আবার চেয়ে দেখলো। ললিতা। নিষ্ঠুর নির্ভীকতায় স্থির, রূঢ়, প্রত্যক্ষ। কিম্বা হয়তো বা ললিতা নয়, তার একটা প্রেতায়িত বিভীষিকা, রাত্রির শীতল মৃত অন্ধকার থেকে উঠে এসেছে।

—এ কী, আপনি? বহু কষ্টে অনেকক্ষণ পর সৌরাংশু তার গলায় ভাষা পেলো।

—হ্যাঁ, আমি। একতাল পাথর যেন কথা কয়ে' উঠলো: কেন, চিনতে পাচ্ছেন না?

—কী করে' বা চিনবো? চেয়ারটা ছেড়ে সৌরাংশুর ওঠবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই: এতো সাজলে লোকে কী করে' চিনতে পারে বলুন?

—খুব সেজেছি, না? ললিতা তৃপ্ত চোখে নিজেই নিজের সর্ব্বাঙ্গ একবার লেহন করলো; বল্‌লে,—আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে?

সৌরাংশু তার মুখের উপর সবলে যেন একটা আঘাত করলো: ভীষণ কুৎসিত। সৌভাগ্য একটা বর্ব্বরতা, যদি তা জানাবার জন্যে মানুষকে এমন বীভৎস সাজতে হয়, যদি হারাতে হয় তার পরিমিত ছন্দবোধ।

ললিতা অস্ফুট একটি শব্দ করে' হেসে উঠলো যা শোনালো একটা নিরুচ্চার, গভীর কান্নার মতো। বল্‌লে, ঘটা করে' সৌভাগ্য জানাবার জন্যে আমি সাজি নি, সেজেছি আজ আমি মরবো বলে'।

বিবর্ণ মুখে সৌরাংশু একটা কাতর শব্দ করে' উঠলো।

—হ্যাঁ, মরবো বলে'। ভয় নেই তেমন কোনো বিশদ, বাস্তব মরণ নয়। ললিতা আবার নিম্নকণ্ঠে হেসে উঠলো: প্রতি মুহূর্ত্তেই তো আমরা মরছি, দিন থেকে রাত্রিতে, প্রতিটি নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে। তেমনি আজ আমি মরবো আমার বিশাল সেই অতীতের স্তূপ থেকে নতুনতরো ভবিষ্যতে নতুনতরো মুক্তিতে। ললিতা যেন কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো, মন্থর এক পা এগিয়ে এসে বল্‌লে,—আমাকে আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, সৌরাংশুবাবু?

—না। ঘরের দেয়াল আবার কথা কইলে।

ললিতা দেয়ালে-টাঙানো অনড় একটা ফটোর ফ্রেম-এর মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

সৌরাংশু উঠলো আপাদমস্তক ছটফট করে'। চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু গলায় হঠাৎ জিগ্‌গেস করলে: আমার কাছে আপনার কোনো দরকার আছে?

—নেই? নইলে এতো রাত করে' আপনার ঘরে নেমে এসেছি? ললিতা সৌরাংশুর কথার নাগাল পেয়ে যেন সহজে নিশ্বাস ছাড়তে পারলো: অনেক, অনেক দরকার। দরজাটা মিছিমিছি আর খোলা থাকছে কেন? আস্তে সে দরজা দুটো ঠেলে ভেজিয়ে দিলো, বসলো এসে একটা চেয়ারে, বিস্তৃত, শিথিল আলস্যে: ঘরে আর এখন আমি ও আপনি ছাড়া কেউ নেই। ললিতা যেন তার উপস্থিতির বহু দূর থেকে কথা কইলো।

—কিন্তু, সৌরাংশুর গলা শোনা গেলো রূঢ় একটা তিরস্কারের মতো: কিন্তু এতো রাত করে' আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার থাকতে পারে?

—রাতকে মিছিমিছি এতো ভয় পাচ্ছেন কেন?

সে নিতান্ত অন্ধকার বলে' তাকে কেন এতো লজ্জা? আমাদের জীবনেরই তো সে ও-পিঠ, আমাদের রঙ্গমঞ্চের নিকট নেপথ্য। বলছি, দাঁড়ান। ললিতা আলোয় যেন আশ্রয় খুঁজলো; স্তিমিত, কাতর গলায় বললে,—কিন্তু কী বলে' যে কী বলবো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

—বলে' ফেলুন চট্ করে'। সৌরাংশু বসলো গিয়ে তার চেয়ারে, ভঙ্গিটা যথাসম্ভব দিনের করে' তুললে: আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুম, ঘুম আমারো পাচ্ছে বৈ কি। চেয়ারে পিঠটা নামিয়ে এনে ললিতা গভীরতরো আলস্যে গেলো ডুবে।

ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো রাত্রির স্তব্ধতা, গূঢ়, নিরবয়ব ভয়। সেই স্তব্ধতায় ললিতাকে মনে হ'লো যেন পর্ব্বতের গুহার মধ্যে হিংস্র কোন পশু রুদ্ধ প্রতীক্ষায় বসে' আছে। এতো প্রখর সাজসজ্জায় তাকে দেখাচ্ছে আগুনের মতো ভয়ঙ্কর, তার খোলা চুলে যেন কালো মেঘের একটা ঝড় উঠেছে। দুই চোখ মেলে সৌরাংশু আর তাকাতে পারলো না, সহ্য হচ্ছে না তার এতো আলো, এতো আলোকিত নীরবতা। যেন সেই স্তব্ধতার মর্ম্মমূল থেকে ধীরে একটা নিঃশ্বাস উঠলো, ললিতার করুণ কান্নার মতো। সৌরাংশু উঠলো চম্‌কে, এতোটা সে আশা করে নি। ললিতাকে দেখাচ্ছে যেন এখন জ্যোৎস্নারাতে নির্জ্জন একটা সমাধির মতো, এতো আড়ম্বরের মাঝে এতো রিক্ততা যেন কল্পনা করা যায় না। খানিক আগে যে-শরীরে তার একটা দ্যুতিমান দুঃসহ তীক্ষ্ণতা ছিলো, ক্ষুরের প্রান্তের মতো মসৃণ, ধারালো সব আঁকাবাঁকা রেখা, এখন একটি মাত্র আর্দ্র দীর্ঘশ্বাসে সব যেন মুছে গেলো জলের আল্‌পনার মতো। যেন আঙুরের লতা নিকটতম কোনো সূর্য্যের জন্যে আঙুল বাড়িয়েছিলো, নাগাল না পেয়ে শেষকালে মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছে।

সৌরাংশু অস্থির হ'য়ে বললে,—কী দরকার ছিলো বলুন।

ললিতা অলস, দীর্ঘ একটি দৃষ্টিরেখায় সৌরাংশুর মর্ম্মান্তমূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করলো, গাঢ়, শান্ত গলায় বললে,—আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

সৌরাংশু আকাশ থেকে পড়লো: আমার সঙ্গে যাবেন কোথায়?

—জানি না, জানি না কোথায় যাবো। ললিতা দুই হাতে মুখ ঢাকলো, যেন মুছে দিতে চাইলো এই উদ্ঘাটনের লজ্জা, রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে,—শুধু জানি আমি যাবো, আর আপনার সঙ্গে।

সৌরাংশু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো: বা রে, আমি কোথায় নিয়ে যাবো আপনাকে?

ললিতা মুখ তুললে, শিশিরে প্রস্ফুটিত বিলোল ফুলের মতো: তার আমি কী জানি? আপনি জানেন, যেখানে আমাকে নিয়ে যাবেন। এ ঘরের বাইরে, এ পরিচয়ের বাইরে,-আর কোনো নতুন আকাশের নিচে। সৌরাংশুর বিস্মিত, বিমূঢ় মুখের উপর ললিতা যেন আরেক মুঠো ছাই ছুঁড়ে মারলো: একদিন আমাকে গায়ে পড়ে' নিয়ে যেতে চাইছিলেন না, আজ আমি আপনার কাছ থেকে সেই করুণাটুকুই ফিরে চাইছি, সৌরবাবু।

সৌরাংশু মৃত দেয়ালের মতো শুষ্ক হ'য়ে দাঁড়ালো, দেয়ালে লেখা যেন কোন মৃত কথা সে উচ্চারণ করলে: কিন্তু সেদিন যার কাছে আপনাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলুম সে তো কাল সশরীরেই ফিরে আসছে।

—আসুক, আসুক সে। ললিতা হঠাৎ কান্নার একটা ঠাণ্ডা ঝাপ্‌টা হানলো: ততোক্ষণ, তার আগে আমি মরে' যেতে চাই, আমার সেই অতীতের অত্যাচার থেকে। দেখছেন না আমি কেমন সেজেছি। ললিতা আবার পিছল ঠোঁটে হেসে উঠলো: কেউ আসবে বলে' নয়, আমিই যাবো বলে'।

—কিন্তু আপনি কেন যাবেন? সৌরাংশু যেন তখনো পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাচ্ছে না: কাল সকালে মহীপতিবাবু আসছেন না?

—আসুন, ললিতার মুখ আবার গম্ভীর হ'য়ে গেলো: তাঁর জন্যে কল্‌কাতায় চিকিৎসকের অভাব হ'বে না। কে আসবে না আসবে তার জন্যে আমরা বসে' থাকতে পারি না, সৌরবাবু। ললিতা তার গা থেকে বিশ্রান্ত ভঙ্গিটা সবলে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো: চলুন আর দেরি নয়, আমরা বেড়িয়ে পড়ি।

এতো আলোয় সৌরাংশু যেন চারদিকে অন্ধকার দেখলে। সে ঠিক নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা সেই মুহূর্ত্তে তা বোঝা গেল না। খানিকক্ষণ পাথরের মতো সে স্তূপীভূত হ'য়ে রইলো, ললিতা এলো আরো এক পা সামনে এগিয়ে। যেন গুহাচারী সেই পশু হঠাৎ তাকে আক্রমণ করতে আসছে, সৌরাংশু যেন ভয়ে হিম, শীর্ণ হ'য়ে গেলো। অস্পষ্ট, অর্দ্ধচেতন গলায় সে বললে,—কিন্তু আমি, আমি যাবো কেন ?

—হ্যাঁ, আপনিও যাবেন বৈ কি। ললিতার স্বর জমানো বরফের মতো কঠিন: আপনি তো একদিন যাবার জন্যেই চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়ে ছিলেন, আমিই তো আপনাকে সেদিন ধরে' রেখেছিলাম। ধরে' রেখেছিলাম, কখন আমাদের জীবনে এই যাবার লগ্ন এসে পৌঁছুবে। কেনই বা আপনি যাবেন না ? ললিতার কথাগুলি বাণের মতো বিকীর্ণ হ'তে লাগলো: আপনার এখানে আর কী কাজ ? নটুর অসুখের জন্যেই তো দয়া করে' আর ক'টা দিন আপনি ছিলেন, সেই নটু তো ভাল হয়ে' উঠলো। আর আপনি তবে বসে' থাকবেন কেন ? বাকি এই রাতটুকুও এই বাড়ির ছাদের নিচে কাটাবার আপনার কথা নয়।

—তা হয়তো আমি যাবো, প্রতি শব্দে সৌরাংশু হোঁচট খেতে লাগলো: কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমি যাবো কোথায় ?

—আমি সঙ্গে যাবো বলে'ই তো যাবেন, ললিতা কান্নার চেয়েও করুণ করে' হেসে উঠলো: কোথায় যাবেন সে-কথা বাড়ির বাইরে গিয়ে বিচার করা যাবে। কিছুই আপনার ভয় নেই, সৌরবাবু, পুরুষের আবার কী ভয় !

মুহূর্ত্তে সৌরাংশুর মেরুদণ্ড উদ্ধত হ'য়ে দাঁড়ালো, সবল, দৃঢ় কণ্ঠে সে বল্‌লে,—আপনি লোক ভুল চিনেছেন, ললিতা দেবী।

—মোটেই ভুল চিনি নি। আমি দেখেছি, দেখেছি আপনার অন্তরের নির্ম্মলতা, ললিতার অনিমেষ দুই চোখ বেয়ে জলের দীর্ঘ, বিচ্ছিন্ন দু'টি ধারা নেমে এলো গালের উপর: আপনার নিষ্ঠুর মহত্ত্ব। কিন্তু আমি আপনাকে চাই না, চাই একজন পুরুষ, আমার নিরুদ্দেশ যাত্রীর সঙ্গী। চলুন, আমি পারছি না আর থেমে থাকতে। ললিতা যেন মেঝের উপর এখুনি ভেঙে পড়বে।

তবুও সৌরাংশুর মুখে কোনো কথা নেই। সে যেন কোন স্বপ্নে দেখা অস্পষ্ট মানুষ, মেঘলোকের। সমস্ত শরীরে যে ঘুমন্ত, তার ইচ্ছাশক্তিতে, তার বলীয়ান পৌরুষে। সে নয়, যেন তার একটা কঠিন কঙ্কাল আছে দাঁড়িয়ে, নীরক্ত, নিশ্চল কতোগুলি হাড়, হাড়ের মত সাদা, হাড়ের মতো শুকনো।

ললিতা হঠাৎ মেঝের উপর সৌরাংশুর পায়ের কাছে বসে' পড়লো; বললে,—ঈশ্বর দেখতে পাচ্ছেন এ কতোখানি লজ্জা কোন নারীর এমনি করে' কোনো পুরুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়া, প্রায় একটা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মতো। আপনার ভয় নেই, আপনার কাছে আমি ভালোবাসা চাই না, চাই উজ্জ্বল একটা দুর্ণাম, আশ্রয় চাই না, চাই বিস্তীর্ণ একটা মুক্তি। আমাকে নিয়ে চলুন, সৌরবাবু। আমাকে বাঁচতে দিন, বাঁচতে দিন আমাকে আমার নিজের পরিচয়ে।

সৌরাংশু দূরে সরে' গিয়ে বল্‌লে,—তবে আপনি একলাই চলে' যান, আমাকে কেন ডাকছেন ?

বিশীর্ণ, ভঙ্গুর ক'টি রেখায় ললিতা উঠে দাঁড়ালো। বিষাদে সিক্ত, শীতল সেই মূর্ত্তি এখন যেন পূজার প্রতিমার মতো দেখাচ্ছে। মিনতিতে ম্লান মুখে সে বল্‌লে,—সে আমার শুধু একটা পলায়নই হয়, সৌরবাবু, মুক্তি নয়। আমি পালাতে চাই না, আমি চাই বাঁচতে। আপনার কিসের ভয়, কোনো ভার আপনাকে নিতে হ'বে না, এই রাত্রির বাইরে আমাকে না হয় আপনি ফেলে দেবেন, তবু পৃথিবীকে আমি একবার জানাবো, কান্না লুকোতে ললিতা দুই হাতে আবার মুখ ঢাকলো: জানাবো যে আমারো কাউকে ভালোবাসার অধিকার ছিলো, ইচ্ছা করলে আমি তার সঙ্গে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারতাম।

কী বলবে সৌরাংশু কিছু ভেবে পেলো না।

ললিতা আবার বললে,—পৃথিবীকে আমি সে-কথা জানাতে চাই, যে আমিও এসেছিলাম বাঁচতে, আমারো

ছিলো সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠবার দায়িত্ব। আমি এমনি কারু পায়ের তলায় পথের খানিকটা ধুলো হ'তে আসি নি। চলুন, আমাকে দিন একবার সেই বাঁচবার সুযোগ— পৃথিবীতে আছে এখনও অনেক জায়গা।

—সুযোগ কেউ কোনোদিন জোর করে' তৈরি করতে পারে না, এলে তা আপনা থেকেই আসে। সৌরাংশু ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র, প্রখর হয়ে দাঁড়ালো: জায়গা যদি থাকে তো আপনার এই ঘরের মধ্যেই আছে। জায়গা যদি খুঁজতে হয় তো বা একদিন আপনার নিজের মধ্যেই খুঁজে পাবেন। তার জন্যে পায়ের কাছে এসে কৃত্রিম ভিক্ষা চাইতে হবে না। যা সত্য তা দাঁড়াবে নিজের পায়ে ভর করে', যা সত্য নয়, শত ছলনা দিয়েও তাকে আপনি সত্য করে' তুলতে পারবেন না, আপনার হার হ'বে।

ললিতা যেন তার সমস্ত শরীর থেকে মুছে গেলো।

সাড়িতে-গয়নায় তাকে তখন দেখাচ্ছে যেন শুভ্রায়িত একটা কবর। সমস্ত লজ্জা যেন শরীরে একটা শৃঙ্খলের মতো: ভার হ'য়ে উঠেছে। এতো ব্যর্থ, এতো কুৎসিত কোনো মেয়েকে যেন কোনোদিন দেখায় নি।

সৌরাংশু তাকে নির্জলা তিরস্কার করে' উঠলো: এখানে আর বসে' আছেন কী করতে? আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি এবার দরজা বন্ধ করবো।

ললিতা তবু এক পা নড়লো না।

—যান, আমাকে একলা থাকতে দিন। এখানে এতো রাতে কেউ আপনাকে দেখে ফেলবে—

—তাই তো আমি চেয়েছিলাম আপনার কাছে সৌরাংশুবাবু, ললিতা মৃতের মুখের অন্তিম আভার মতো বিবর্ণ হেসে উঠলো: যাতে সংসারে একটা কীর্ত্তি অর্জ্জন করে যেতে পারি—আমার এই কলঙ্ক, আমার এই কাব্য সৃষ্টি দিয়ে। যাতে সমস্ত সংসারে আমি অস্পৃশ্য হ'য়ে যেতে পারি, একেবারে একলা, একেবারে আলাদা। সে-সুযোগ সত্যি আর আমার এলো না, স্বয়ং ঈশ্বর পর্য্যন্ত রইলেন চোখ বুজে। ললিতার চোখ আবার অশ্রুতে আকুল হ'য়ে উঠলো: আমি তবে মরতেই চল্‌লাম,—কিন্তু আপনি, আপনি কেন আর তবে এখানে বসে' আছেন, কিসের প্রত্যাশায়? ললিতা আলোর থেকে ধীরে ধীরে চলে' এলো অন্ধকারে, তার আত্মার বিলুপ্তিতে।

আর তক্ষুনি সৌরাংশু ঘরের দরজা বন্ধ করে' দিলো। ঘরের স্তব্ধতায় বাইরের অন্ধকার উঠলো হাহাকার করে'।

তবু, ললিতার এখনকার বেদনাবিদ্ধ, ধূসর মুখ-চ্ছায়ার কথা ভেবে সৌরাংশু গভীর সান্ত্বনা পেলো। সে সুখী না হোক্, সে আবার সুন্দর হয়ে উঠবে। দুঃখে পাবে সে আবার পরম সম্পূর্ণতা।

সৌরাংশু জানলার বাইরে রাত্রির দিকে একবার চেয়ে দেখলো। হ্যাঁ, সত্যি, সে-ও তবে এখানে আর কেন বসে' আছে? এই শূন্যতায়, এই অন্ধকারে!

(ক্রমশঃ)

— সাময়িক প্রসঙ্গ —

ভারতে খণ্ড প্রলয়—

পুরাণের ভাষায় বলিতে হইলে, উত্তর ভারতে একটা খণ্ড প্রলয় হইয়া গেল। এই নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের কারণ যাহাই হউক, পরিণাম অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ, দুর্ব্বিসহ। এ দুর্ভাগ্য দেশ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবনাদি নানা আধিদৈবিক উৎপাতে বার বার পীড়িত ও সংক্ষোভিত হইয়াছে, কিন্তু একটী মুহূর্ত্তের মধ্যে এক কালে অসংখ্য মানুষের সহিত এমন ভাবে একটা ধনজনসমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আলোড়িত, উৎখাত ও প্রায় চিনিবার অযোগ্য হইয়া উঠিবে, ইহা কল্পনার মধ্যে আনাও সহজ ছিল না। ভারতে স্মরণীয় কালের মধ্যে এমন দুর্দ্দৈব-সংঘটন ইতিহাসে বুঝি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা শুধু ভৌগলিক দুর্ঘটনা নহে, সহস্র বৎসরের ভারতেতিহাসের একটা অতি করুণ, লোমহর্ষণ অধ্যায়—হয়ত নূতন ভাগ্য-বিপর্য্যায়েরই সূচনা!

সংক্ষুব্ধ ভূখণ্ডের পরিমাণ—

এই রুদ্র ভৈরবের তাণ্ডব প্রলয়-নর্ত্তনে কম্পিত ভূখণ্ডের পরিমাণ শুধু ভারতের নয়, বোধ হয় জগতের জ্ঞাত ইতিহাসে অনন্যসাধারণ। হিমালয়ের সানুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া একদিকে লাহোর ও দিল্লী, অন্যদিকে আসামের পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত সমতল-ভূমির প্রায় সর্ব্বত্র এই ভূকম্পের শিহরণ অল্পাধিক অনুভূত হইয়াছিল; কিন্তু নেপাল ও উত্তরবিহারেই বোধ হয় ইহার মূলকেন্দ্র নিরূপিত হইয়াছিল। শুনা যাইতেছে, তিব্বত, এমন কি দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ভূমিকম্পে অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু এই সংবাদ এত অস্পষ্ট, যে তাহার সবিশেষ তথ্য না পাওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যাইতেছে না; তবে ইহা যে একান্ত অসম্ভব তাহাও নহে, এমন কি উত্তর বিহারের সঠিক সংবাদই আমরা দুর্ঘটনার অনেক পরে, এখনও ক্রমে ক্রমেই পাইতেছি; কাজেই এই ভূকম্পের প্রলয়-লীলা যে কত দূরব্যাপী তাহার সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। ৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রে মুদ্রিত সরকারী বিবরণ-পত্রে প্রকাশ, যে উত্তর বিহারেই বিধ্বস্ত ভূমিখণ্ডের দৈর্ঘ্য ১৪০ মাইলের কম নহে, প্রস্থে ৯০ মাইল—পাটনা হইতে মুঙ্গের পর্য্যন্ত এই ১২,৬০০ বর্গ মাইল-ব্যাপী স্থান তুলনায় যুক্ত ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের চেয়ে ন্যূন নহে। উত্তর বিহারেই এক একটী ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চল পরিমাণে বেলজিয়ম, হলণ্ড বা ডেনমার্কের ন্যায় এক একটী স্বাধীন দেশের প্রায় সমতুল্য এবং ভারতের সমগ্র শিহরিত স্থান অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখিলে রুশিয়া-বর্জ্জিত বিরাট্ ইউরোপেরই প্রায় সমান হয়। এরূপ সুবিস্তৃত মহাদেশব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় খণ্ড প্রলয় ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

লোক-ক্ষয়ের সংখ্যা-নির্ণয়—

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, মুঙ্গের, মজঃফরপুর প্রভৃতি সমস্ত বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে মোট মৃত্যুসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার; যথা, পাটনায় ১৩৯, গয়ায় ৩৪, সাহাবাদে ১৬, মজঃফরপুরে ১৯২৯, চম্পারণ ৪৩৬, সারণ ১৭০, দ্বারভঙ্গ ১৮৮৭, ভাগলপুর ১১১, মুঙ্গের ১৩১৮, পুর্ণিয়া ২ জন মাত্র। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রথম অনুভবে মহাত্মা গান্ধীর নিকট যে তার প্রেরণ করেন, তাহাতে হতাহত-সংখ্যা ১০ হইতে ২০ হাজারের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন। এত বড় অপ্রত্যাশিত দুর্য্যোগের পর, কোনও পক্ষেরই নির্ণীত সংখ্যা সহসা নির্ভরযোগ্য না হইতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যাহাদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষে পাওয়া গিয়াছে তাহারই গণনার উপর সংগঠিত বলিয়া ন্যূনপক্ষেই সঠিক হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ ৬ হাজারের কম কখনই নহে, কিন্তু বাস্তব প্রাণহানি ইহার চেয়ে অধিকও হইতে পারে, সম্ভবতঃ হইয়াছে; তবে তাহা এখনও স্বরূপতঃ বলা যায় না। ধ্বংসস্তূপের নীচে যাহা এখনও পড়িয়া আছে, বহু অন্বেষণেও কাহারও কাহারও আত্মীয় পরিজনের যে কোনই সন্ধান এখনও পাওয়া যাইতেছে না, গঙ্গা-স্রোতে যে সব মৃতদেহ ভাসিয়া গিয়াছে, এই সব নিশ্চয়ই সরকারী গণনার মধ্যে পড়ে নাই; কাজেই দেশীয় পক্ষের অনুমিত গণনা একেবারে নির্ভুল যদি নাও হয়, তাহা উড়াইয়া দিবার নয়। উত্তর বিহার ও নেপালে সমগ্র লোক-ক্ষয়ের হিসাব ধরিলে, উভয় গভর্ণমেণ্টের সরকারী হিসাব অনুসারেই ইতিমধ্যে মৃত্যুর অঙ্কপাত ১০ হাজার উত্তীর্ণ হইয়া যায়। বস্তুতঃ পুনরায় সেন্সাস না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সেন্সাসের সহিত তুলনায় সঠিক হিসাবনিকাশ পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। মুঙ্গেরের ৫০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৪৮ হাজার লোক বাঁচিয়া রহিল ও সহর ছাড়িয়া তাহাদের অধিকাংশ প্রস্থান করিল, ইহাও যে সহজে প্রত্যয়যোগ্য কথা নহে। মনে রাখিতে হইবে, স্যার সুলতান আহ্মেদের মত লোকও পূর্ব্বোক্ত সরকারী সংখ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ধ্বংসলীলার ভীষণতা—

একমাত্র প্রত্যক্ষ দর্শন ছাড়া, অনুমান ও কল্পনার বলে এই অভাবনীয় প্রাকৃতিক দুর্ব্বিপাকের ভীষণতা দূর হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ-চিত্র হৃদয়-ভেদী, রোমাঞ্চকর, স্বপ্নানধিগম্য। আমরা প্রথম চাক্ষুষদর্শীরই মুখে এই লোমহর্ষণ সংবাদ পাইয়াছিলাম—"মজঃফরপুর সহরে মাত্র ২৫ খানি ইটের বাড়ী বিদীর্ণ বিকৃত আকারে দাঁড়াইয়া আছে। আমার ১টী আত্মীয় পরিবারেই ৭জন মারা গেছেন। অবশিষ্ট ১জন মুমূর্ষু, হাসপাতালে—অপর একটী শিশু, সেও আহত।... মুঙ্গেরের দৃশ্য অধিকতর শোচনীয়।" পক্ষান্তরে, সরকারী বিবৃতি-পত্রে দেখা যাইতেছে—

"The total population, including 500,000 town-dwellers is about twelve millions, and although the casualties among them, considering the magnitude of the convulsion are slight, it would be true to say, that the life of every one of these people has been deranged by the earthquake, and it will be months before existence for them can be restored to normal."

৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই রেঃ এণ্ড্রুজের তারের উত্তরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ তারযোগে যে জলন্ত বিবৃতি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা আরও অধিকতর প্রস্ফুটরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"যে সকল অঞ্চল ভূমিকম্পের ফলে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, উহার পরিমাপ ৩০ হাজার বর্গ মাইল হইবে। তন্মধ্যে উত্তরবিহার, বিশেষতঃ দ্বারভঙ্গ, মজঃফরপুর, চম্পারণ ও সারণ জেলা এবং ভাগলপুরের উত্তরাংশ গুরুতর ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই সকল বিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকসংখ্যা ১ কোটী ২০ লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে সহরগুলির অধিবাসীর সংখ্যা ৫ লক্ষ হইবে। মুঙ্গের, মজঃফরপুর, দ্বারভঙ্গ ও মতিহারী প্রভৃতি সমৃদ্ধ সহরগুলি লইয়া মোট ১২টী সহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। খুব অল্প করিয়া ধরিলেও, দেখা যায়, ৩০০০০ বর্গ মাইল কৃষি জমি বিদীর্ণ ভূপৃষ্ঠ দিয়া ভূগর্ভোত্থিত জল ও বালুযোগে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত কূপই বালুকায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে এবং পানীয় জলের একান্ত অভাব উপস্থিত হইয়াছে। পল্লীবাসীরা সেই ভূতলোত্থিত অপরিষ্কার জলই পান করিতেছে। সংক্রামক রোগের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ক্ষেতের শস্যগুলির গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে। ভূকম্প-প্রপীড়িত অঞ্চল-মধ্যস্থ ১৫টী চিনির কলের মধ্যে ১০টী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট ৫টী কাজের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ইক্ষু কাজে না লাগিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়াই আশঙ্কা জাগিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের সমতা বিশেষ ভাবে বিপর্য্যস্ত হওয়ায়, নদনদীসমূহের গতিপথ-পরিবর্ত্তন ও আগামী

বর্ষায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ৬ হাজার লোক মরিয়াছে বলিয়া সরকার যে অনুমান করিয়াছেন, বস্তুতঃ মৃত্যুসংখ্যা উহার অনেক বেশী। অন্ততঃ ২০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। একমাত্র মুঙ্গেরেই ১০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই; এখনও ধ্বংস-স্তূপের নীচে হাজার হাজার মৃতদেহ রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিপন্ন লোকেরা বাঁশের কুঁড়ে ও কাপড়ের ছাউনীর মধ্যে নিদারুণ শীতে—অবশেষে বৃষ্টির বারিধারার মধ্যে অশেষ কষ্টভোগ করিয়া কাল কাটাইয়াছে ও কাটাইতেছে। বৃষ্টিতে উহাদের দুঃখ কষ্ট সহস্রগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।"

ভূমিকম্প বৈকালের দিকে হইয়াছিল এবং অধিকাংশ পুরুষ কার্য্যোপলক্ষে বাড়ীর বাহিরেই ছিল, এইজন্য নারী ও শিশুদের মধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

ইহার সহিত ঐ তারিখেই "Statesman"এর উক্তি—"The news from Bihar grows worse and worse. We fear that the imagination of the rest of India is not yet stirred to realisation of the terrible change in the face of nature that has been wrought by these few catastrophic minutes of earthquake and the volume of misfortune that is ensuing."—ইহা সংযুক্ত করিয়া আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, সরকারী, আধা-সরকারী ও বে-সরকারী সকল পক্ষ হইতেই এই ভয়াবহ দুর্দ্দৈবের গুরুত্ব ও সর্ব্বনাশের পরিমাণ বিভিন্ন দিক্ দিয়া অবধারণ করার প্রয়াস হইয়াছে ও হইতেছে। এতখানি সর্ব্বনাশ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে জাপানেও হয় নাই, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কালিফোর্ণিয়ার ভূমিকম্পেও সম্ভবতঃ ইহার চেয়ে অল্প ক্ষতি হইয়াছিল; কেন না, কালিফোর্ণিয়ার ভূকম্প-বিধ্বস্ত স্থানের পরিমাপ বর্ত্তমান উত্তরবিহারের বিপর্য্যস্ত ভূমির চেয়ে অর্দ্ধেকের কম—বিহার আজ শ্মশান, প্রাচীন পম্পেই সহরের মতই মুঙ্গের সহর আজ লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দুর্দ্দৈবের নিষ্ঠুরতা ভাষায় বর্ণিত হইবার নয়।

গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য—

এত বড় বিরাট্ জাতীয় বিপদে গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়েরই কর্ত্তব্য গুরুতর। সে কর্ত্তব্য-সাধনে কেহই উদাসীন হইবেন না, ইহাই আমরা আশা করিতে পারি। অপ্রত্যাশিত বিপদের প্রথম ধাক্কা সামলাইতে কিছু সময় লাগে, ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। কিন্তু এই সময়ও অতিরিক্ত হওয়া কখনও উচিত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য স্বাধীন দেশে কিরূপ ব্যবস্থার তৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিহার ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা ১৫ই জানুয়ারী সংঘটিত হয়, ইহার বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ ঘটনা-স্থলের বাহিরে রীতিমত প্রচারিত হইতে প্রায় ৩।৪ দিন লাগিয়াছিল। এই বিলম্বের কারণ, সংবাদ-প্রেরণের সকল প্রকার ব্যবস্থাই অচল হইয়া গিয়াছিল। ক্যাপ্টেন ড্যালটন ও মিঃ পামার প্রথম উড়ো-যানে বিধ্বস্ত স্থল পরিদর্শন করিয়া ১৭ই জানুয়ারী নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রেরণ করেন এবং বিহার গভর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় উড়োযান কলিকাতা হইতে চাহিয়া পাঠান, ঐ তারিখেই, উহা সেইদিনই রওনা হয়। এইরূপে দেখা যাইতেছে, প্রাথমিক বার্ত্তাসংযোগের ব্যবস্থা করিতেই ৩।৪ দিনের কম লাগে নাই। তুলনায় জাপান-গভর্ণমেণ্টের কার্য্যপদ্ধতি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের "Asahi English Supplement" হইতে এস্থলে একটু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...But in view of the urgency of such reconstruction, the Tokyo Government in consultation with the prefectural government of Kyoto on March 12th, five days after the quake, had worked out the best part of a reconstruction plan. It provides for the construction of barrack-like houses and of hospitals, the repairing of roads, the installation of electric equipment and the repair of transportation facilities and means of communication."

বলা বাহুল্য, টাঙ্গো প্রদেশের এই শেষ ভূমিকম্প হয় ৭ই মার্চ্চের প্রাতঃ ৬-২৯ মিনিটের সময়ে এবং এই দুর্য্যোগের ফলে সমস্ত প্রদেশটীর যে অবস্থা হয় তাহাও অনুল্লেখনীয় নহে—কেন না, "আশাহি" পত্রেই এই

বর্ণনাও আছে—"When the first and after-shocks shook Tango province, the electric lights went out and people rushed into the streets yelling and screaming in the darkness. At many places, the roads were cracked. Traffic was completely suspended on the steam-lines, and even motor-car service was made impossible. The damage to telephone wires was also serious, *causing a total suspension of communication.*" —ইহা হইতে বুঝা যায়, জাপ-গভর্ণমেণ্ট দুর্ঘটনার ৫ দিন পরেই শুধু বিচ্ছিন্ন ও স্তম্ভিত যোগাযোগের সুব্যবস্থাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন নাই, পরন্তু সমগ্র বিধ্বস্ত রাজ্যের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা পর্য্যন্ত মোটের উপর ছকিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্য-তৎপরতা আমাদের রাজশক্তির নিকট আমরাও অবশ্যই প্রত্যাশা করিতে পারি।

জাপ-গভর্ণমেণ্টের এরূপ তৎপরতার একটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে, যে তাঁহারা সঙ্কটক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পুলিশ ও সামরিক শক্তি আনিয়া বিনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। পুলিশ ও সামরিক শক্তির এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহার অসঙ্গত নয়, ধ্বংসস্তূপ-পরিষ্কারণাদি কার্য্যে তাহাদের নিয়োগ করিলে সুশৃঙ্খল ও কর্ম্মদক্ষ লোক-বলের গভর্ণমেণ্টের অভাব হইতে পারে না। দুর্ঘটনার পক্ষাধিক কাল পরেও, যে স্থানে স্থানে পচা দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহ বাহির হইতেছে, তাহা শুনিয়া মনে হয়, যথেষ্ট লোকবলের অভাবেই গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এই সকল ভগ্নস্তূপ সরাইতে ও পরিষ্কার করিতে পারা যাইতেছে না। স্যাপার্স ও মাইনার্স সৈন্যদল, ইঞ্জিনীয়র, মোটর লরী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামগুলি আরও অধিক সংখ্যক ও অধিক পরিমাণে প্রেরণের আবশ্যকতা এখনও নিঃশেষ হয় নাই—এই ধ্বংসস্তূপ-পরিমার্জ্জন কার্য্যে যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই শুধু মৃত্যুর আসল নির্ঘণ্ট-নির্ণয় নয়, সমগ্র দুর্ঘটনা-প্রপীড়িত অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল দূষিত হইয়া সংক্রামক রোগের বীজাণুরাশি উদ্ভূত হইতেছে—ফলে, যত মরণ ঘটিয়াছে, তাহার উপর যাহা এখনও মরিতে পারে তাহারই আশঙ্কায় আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

এদিক্ দিয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের ন্যায় মহাকর্ম্মী সদল-বলে মুক্তি পাইয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা রক্ষাপূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ দিতে সমর্থ হওয়ায় আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। বিহারের সমস্ত তরুণ কর্ম্মীই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়া কর্ম্মীর অভাব বহুল পরিমাণে দূর করিতে পারিবেন, ইহা বিচিত্র নয়। দেশের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে কোনরূপ সম্ভবপর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সার্ব্বজনীন সেবার পথে না রাখিয়া, গভর্ণমেণ্ট ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মহাত্মার রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে জনৈক এংলো-ইণ্ডিয়ান সহযোগী অসময়োচিত কটাক্ষপাতের সুযোগ গ্রহণ করায় আমরা ব্যথিত হইয়াছি।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, এই উত্তরবিহারের দুর্ঘটনা জাতীয় দুর্ভাগ্য বলিয়াই একযোগে প্রতিকারে উদ্যত হইতে হইবে। জাপানের ভূসঙ্কট সমস্ত জাপজাতি একত্র হইয়া প্রতিবিধান করিয়াছিল। ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি সকল স্বাধীন জাতিই সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহা করে। আমাদের রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাহাই হউক, দেশ ও সমাজ-জীবনের এই প্রকার গুরুতর বিপদের দিনে, একই সমব্যথার আগুনে আমাদের মানবত্বকে একবার ঝালাইয়া লইতে পারি। শুধু এদেশেরই রাজা, প্রজা, সর্ব্ব সম্প্রদায় মাত্র নহে, আজ ভারতের বিপদের ডাকে আন্তর্জাতিক সাড়া দিবার দিন আসিয়াছে।

বিহারের সাহায্যার্থে এই ক্ষেত্রে চারিটি সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—(১) বড়লাটের সাহায্য-ভাণ্ডার (২) কলিকাতা মেয়রের সাহায্যভাণ্ডার (৩) বিহার-কেন্দ্রীয় সাহায্যভাণ্ডার ও (৪) বঙ্গীয়-সঙ্কটত্রাণ সমিতি। গভর্ণমেণ্ট, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মেয়রের ফণ্ডে এ পর্য্যন্ত (১৩ই ফেব্রুয়ারী) যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯৭৬ টাকা, ১০০ ডলার ও ১৮৬৫ পাউণ্ড; ৪ লক্ষ ৩৭৮৲ টাকা; ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ২০০ ১৫ আনা ৩ পাই; ৬৩৫৮৩।৶৭ পাই সংগৃহীত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, সকল শ্রেণীর ধন-ভাণ্ডার ত্বরান্বিত হইয়াই আর্ত্ত ও বিপন্নের জন্য মুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী, বিবেকানন্দ মিশন, হিন্দু মিশন প্রভৃতি

প্রতিষ্ঠানও সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। কিন্তু এই কয়েক লক্ষ টাকাও অবধিহীন বিপদের তুলনায় সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য মাত্র। বিপন্ন বিহারবাসীর জন্য বাঙ্গালীর চির-করুণ সেবা-দীক্ষিত প্রাণ যে আন্তরিক সমবেদনা ও যথাসাধ্য সহায়তা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, ইহা বাংলার যোগ্যই হইয়াছে।

বৈদেশিক সাহায্য—

জগৎ-মান্য মহাত্মাজী ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মানবতার নামে বিশ্বজাতির দুয়ারে উপযুক্তক্ষণেই আবেদন জানাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে সাহায্য বলিতে আসিয়াছে—প্যারীর কমিটীর দান ১০০০ পাউণ্ড, হাই কমিশনরের সংগৃহীত ৬০০ পাউণ্ড, বৃটিশ রেডক্রশ সোসাইটীর দান ৫০০ পাউণ্ড এবং সম্রাট্-দম্পতীর দান ১৫ পাউণ্ড মাত্র। সহযোগী "অমৃত বাজার পত্রিকা" এই প্রসঙ্গে জাপানের দৃষ্টান্ত তুলিয়া লিখিয়াছেন—"One may say in this connection that in the great earth-quake of 1923, in Japan, the Emperor of Japan gave out of his private purse 10,000,000 yen and the Japan Government 30,780,000 yen from the State Treasury."

জাপান তাহার জাতীয় দুর্দ্দিনে বহির্জাতির নিকট যে প্রচুর সহানুভূতি ও অর্থ পাইয়াছিল, তাহার কারণ, বোধ হয়, জাপান স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতি বলিয়া দানলাভের যোগ্যতর পাত্র দীন দরিদ্র ভারতের চেয়ে। কেন না, একা ইংলণ্ডই সেদিন জাপানকে সাহায্য করিয়াছিল এক লক্ষ পাউণ্ড। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপান পাইয়াছিল নগদ অর্থ মোট ২২,১২,৩৪৯২ ইয়েন এবং বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী, যাহার মোট মূল্য অনুমানে ১৮,৬১,৩০০০ ইয়েনের কম নয়। হিসাবে দেখা যায়, জাপান স্বদেশে যে টাকা তুলিয়াছিল পরিমাণে তাহার শত করা ৪০ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য লাভ তাহারা বিদেশ হইতে করিয়াছিল, এবং প্রাপ্ত দ্রব্য-সামগ্রীর মোট মূল্যও তাহার নিজ দেশে সংগৃহীত-দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের প্রায় সমতুল্য। ইহা ছাড়া ইংরাজ, ফরাসী, চীন সকলেই নৌবল, হাসপাতাল, রেড-ক্রশ-সমিতি প্রভৃতি দিয়া সকল প্রকারে বিপন্ন জাপানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিতে কৃপণতা করে নাই। আজ ভারতের ভাগ্যে সুসভ্য বৈদেশিক শক্তিনিচয়ের এই দান-কার্পণ্যের নিগূঢ় কারণ সারা জগতের অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা ছাড়া অন্য কি কি থাকিতে পারে তাহা বুঝা শক্ত নয়। সহযোগী "অমৃত-বাজার পত্রিকার" কথাই (২।২।৩৪) আর একবার এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতে পারি :—

"The Viceroy's fund has not yet reached ten lakhs of rupees. In about the same time, Japan got a much more substantial assistance from foreign countries. Is it because Japan is a powerful country and therefore, commands greater respect? Or is it because the disaster in Japan was presented without any attempt at under-estimate to the world? We do not know. But it has grieved us that the local Government has been publishing figures of death which are, on the testimony of every witness, a gross under-estimate. It is true that these official figures are only of deaths recorded officially. We know here what this means, but how can the world beyond India know that these figures are mounting as dead bodies are being discovered and that many of the dead bodies are still under the debris? How can the world know that with the very inefficient system of registration of deaths in this country, even in normal times many deaths, not to speak of births are not recorded at all? And when a large part of the province, as Mr Fairweather says, has been wiped out of the map, is it possible for the Government to have anything like a reliable record of deaths? By publishing the figures, the Government, we are afraid, is not helping the province to attract the measure of sympathy that should go to it."

সহযোগীর স্পষ্টবাদিতা প্রশংসার যোগ্য—তাঁহার প্রশ্ন দায়িত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, আশা করি, চিন্তার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সম্প্রতি জানা গেল, লণ্ডনের লর্ড মেয়র ভারতীয় ভূকম্প-সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্য রেডিও-যোগে এক

মর্ম্মস্পর্শী আবেদন প্রচার করিয়া ইংলণ্ডবাসীকে প্রচুর অর্থদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ-ধনকুবেরগণ মুক্তহস্ত হইলে, তাঁহাদের হাত ঝাড়িয়াও পর্ব্বত হইতে পারে। আশা করি, লর্ড মেয়রের কথা-মত এই দান "বৃটনের পক্ষে দানের ও ভারতের পক্ষে গ্রহণের যোগ্য" অবশ্যই হইবে।

আরও সাহায্য চাই—

নবীন দ্বারভঙ্গাধিপতি স্বয়ং প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও সাহায্য ভাণ্ডারে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন ও পুনর্গঠনের জন্য 'ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট' গঠিত হইলে, তাহার হস্তে ২৫ লক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন। দ্বারভঙ্গাধিপতির সময়োচিত বদান্যতা প্রশংসার যোগ্য এবং সকলের অনুকরণীয়। ভারতের অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ দ্বারভঙ্গেশ্বরের ন্যায় নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হইলেও, দেশের এই দুঃসময়ে তাঁহাদের মুক্তহস্তে সাহায্যে অগ্রবর্ত্তী হওয়া উচিত। স্বদেশীয় ধনকুবেরগণও এবার যথোচিত সাড়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

প্রয়োজনের সহিত হৃদয়ের তাগিদ সমানতালে সংযুক্ত হইলে, প্রকৃতির দুর্ব্বিসহ সংহারলীলা ব্যর্থ করিয়া অন্যান্য দেশের ন্যায় মানবতার জয় দেওয়া এ ক্ষেত্রেও অসম্ভব হইবে না।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের সতর্ক-বাণী—

যে আঘাত বিহারবাসী পাইয়াছে, তাহাতে স্বজাতি ও বিশ্বমানবের সহানুভূতি ও সকলপ্রকার সাহায্য-প্রার্থনার দাবী তাহাদের আছে। তথাপি, এই দুর্য্যোগেও স্ব-প্রদেশবাসীর মনে স্বাবলম্বনের প্রেরণা জাগুরূক রাখিবার জন্য রাজেন্দ্র প্রসাদের মত মহাপ্রাণ নেতা সুস্পষ্ট সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিতে বিস্মৃত হন নাই—ইহাতে তাঁহার নেতৃত্বের যোগ্যতাই সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ২৯শে জানুয়ারীর ইস্তাহারে, তিনি বিহারের জনসাধারণকে জানাইয়াছেন—

"আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসিগণ আমাদের জন্য যাহা কিছু করুন না কেন, আমরা যদি নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিব না। আমাদিগকে এখন বিগত মহাদুর্দ্দৈবের বিষম অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে।"

কি কি ভাবে বিহারবাসী আত্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারেন, তাহার বস্তুতন্ত্র নির্দ্দেশও তাঁহার আবেদনে আছে। সেই সকল কথা পুনর্গঠন প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করিব। এই নির্দ্দেশ তাঁহার স্বদেশবাসী শুনিয়াছেন ও কার্য্যে পরিণত করিবেন, ইহা আশা করা যায়। তাঁহার শেষ কথাগুলি বাস্তবিকই মনুষ্যত্বের উদ্দীপক—তাহা উদ্ধরণ-যোগ্য :—

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়

"বিগত বিপৎপাতে আমাদের পক্ষে হতবুদ্ধি হইয়া পড়া অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু আঘাত সামলাইয়া গঠন-মূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাই পুরুষের লক্ষণ।... আমাদের বাড়ী আমরা না গড়িয়া তুলিলে, কে তুলিবে? অপরে কতক পরিমাণে আমাদিগকে সাহায্য করিতে

পারে মাত্র। এই সাহায্যলাভের সৌভাগ্য যে আমাদের হইতেছে, এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু বিপন্নকেই আজ নিজের পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই, যে স্বাবলম্বী পুরুষই ভগবানের সহায়তা লাভ করিয়া থাকেন।"

বিহারের প্রধান বিচারপতি স্যার কেটিলি টেরেল সেবার্থী যুবকদের সম্বন্ধে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"যুবকদের নিকট বর্ত্তমানে আমরা শুধু চাঁদাসংগ্রহ রূপ সাহায্য চাহি না। বর্ত্তমানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী: ফাউণ্টেন পেন ও চাঁদার খাতা অপেক্ষা ঝুড়ি ও কোদালীর সাহায্যেই এখন অনেক কিছু করা যাইতে পারে। এই ধরণের কার্য্যে যুবকদের আত্মনিয়োগে অনিচ্ছা দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি।"

বিহারের মহাকর্ম্মী রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বাধীনে তরুণ প্রাণে যে সেবার অগ্নি-প্রেরণা জাগিয়াছে, তাহা যোগ্য পথে পরিচালিত হইয়া যাহাতে এইরূপ অভিযোগের কোন হেতুর অবশেষ না থাকে, তদ্বিষয়ে অবহিত ও যত্নপর হউক, ইহাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

সেবাক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধি ও অস্পষ্টতা—

সেবা নির্ব্বিশেষ হৃদয়-বৃত্তি—ইহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ-পূত মানব-হৃদয়ে অতি শুভ্র, নির্ম্মল, দিব্য অবদান। এখানে স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার কলুষ লেশ মাত্র রাখিতে নাই। প্রকৃতির নির্ম্মম নিষ্ঠুর আঘাত সম্প্রদায় বা শ্রেণী ভেদ করে নাই—তাই বিপন্ন নরনারীর সেবায় সেই সকল ভেদের গণ্ডী টানিয়া আনিলে সেবার সার্থকতা এবং মানবহৃদয়ের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য যুগপৎ কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। বৃটিশ রেড ক্রশ সোসাইটী দুর্গতদের সেবার্থে ১৫০ পাউণ্ড দান করিবার সময়ে যে সর্ত্ত করিয়াছেন, তাহাতে এইপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ দেখিয়া অনেকেই ব্যথিত হইয়াছেন। অবশ্য এই দান শুধু মুসলমানদের জন্যই ব্যয়িত হউক, ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই; কিন্তু যখন মহাকালের ডাকে ধর্ম্ম ও রাজনীতিক ক্ষেত্রের সকল ভেদ বিসম্বাদ ভুলিয়া অখণ্ড মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করাই সব চেয়ে কল্যাণকর নীতি বলিয়া সকলে বুঝিতেছিলেন, সেই সময়ে এই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও রাজনৈতিকতার অনুপ্রেরণা-সম্ভূত সর্ত্তটুকু উপস্থাপিত করা অনেককেই ব্যথার কারণ দিতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বৃটিশ রেডক্রশ সোসাইটী এই সম্বন্ধে কোনও হেতু প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। তবে কারণ যাহাই হউক, মনুষ্যত্বেরই আদর যেখানে, এমন কোনও ক্ষেত্রেই সোসাইটীর এই দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হইবে না, এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

বিপদে সকল স্বার্থ সংযুক্ত হয়, রাজা প্রজা সম্মিলিত হইবার অবকাশ লাভ করে। এখানে শুধু রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি নয়, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, বাঙ্গালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ একত্র সম্মিলিত হইয়া, একযোগে সঙ্কটের প্রতিকারে সমুদ্যত না হইলে রক্ষা নাই, কল্যাণ নাই। এই সার্ব্বভৌম সেবা-ব্রতের সুযোগ লাভ করিয়া, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি যেমন দূরে পরিহার করা উচিত, তেমনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাও বর্জ্জনীয়। ইহা সত্য, যে উদ্যত প্রাণ ও হৃদয় লইয়া অনেকগুলি সেবা-ব্রতী মিশন ও কর্ম্মি-সঙ্ঘ সেবা-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন, অর্থসংগ্রহের বড় বড় ৪।৫টী কেন্দ্র সৃষ্ট হইয়াছে—এই কর্ম্মী ও অর্থভাণ্ডার একই নিয়ন্তৃ-শক্তির সঞ্চালনায় পরিচালিত হইলে যত সহজে ও সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, স্বতন্ত্র ভাবে তাহা হয় না। সুখের বিষয়, এইরূপ কেন্দ্রাভিমুখী প্রেরণা এবার গোড়া হইতেই কিছু কিছু সর্ব্বত্রই দেখা দিয়াছিল। কলিকাতায় "মেয়রের ফণ্ড"কে বাংলা হইতে কেন্দ্র সাহায্য-ভাণ্ডারে পরিণত করার প্রচেষ্টা এই প্রেরণারই অন্যতম নিদর্শন বলা যাইতে পারে, যদিও তাহা সম্পূর্ণরূপে হয়ত সফল হইতে পারে নাই। মফঃস্বলে, যথা ক্ষুদ্র চন্দননগরেও, এই আদর্শেই অনুরূপ উদ্যমের লক্ষণ আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। বিহার গভর্ণমেণ্ট রাজেন্দ্র-প্রসাদের ন্যায় লোকনেতা ও দেশীয় পক্ষের সহযোগিতা অস্বীকার করেন নাই। মহাপ্রাণ প্রফুল্লচন্দ্রের বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতিও সংগৃহীত অর্থ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট পাঠাইতেছেন। "মেয়র ফণ্ডের" সাহায্য-প্রেরণ সম্বন্ধে

যেটুকু গণ্ডগোলের সম্ভাবনা 'আরম্ভকালে' দেখা গিয়াছিল, তাহা অঙ্কুরেই উৎখাত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

ইহার পর, গোল উঠে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর সাহায্য লইয়া। বিহারে বিপন্ন বাঙ্গালীরা যথোচিত সাহায্য লাভ করিতেছেন না, এই মর্ম্মে কিছু কিছু অভিযোগ ব্যক্তিগত পত্রযোগে বাংলায় আসিয়া পৌছে। অভিযোগের কথা ক্রমে সংবাদপত্রেও আলোচিত হয় ও ইহা লইয়া বাঙ্গালী জনসাধারণের মনে স্বভাবতঃই একটা ক্ষুণ্ণতার সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ প্রস্তাব করেন, নেতৃস্থানীয় বাঙ্গালীদের লইয়া স্বতন্ত্র সাহায্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হউক এবং তথা হইতে বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে বাঙ্গালীদিগকে আবশ্যকীয় সাহায্য প্রদান করা হউক। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ কেন বাংলা হইতে টাকা ও ঔষধপথ্যাদি পাঠাইতে বলিতেছেন, কিন্তু বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক ও বাঙ্গালী ডাক্তার পাঠাইবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন না, ইহা লইয়াও কথা উঠিয়াছে। এ সকল কথা যে নিছক বিদ্বেষ-প্রসূত, এমন কথা মনে করিতে অবশ্যই পারি নাই। আচার্য্য রায় এই সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া সংবাদপত্র মারফৎ পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পত্রোত্তরে সেই কথাই লিখিয়াছেন। ঘটনার সত্যাসত্য ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য "প্রবর্ত্তক"-সম্পাদকের উপর রাজেন্দ্রবাবু ভারার্পণ করেন। সেই অনুসন্ধানের ফলও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে এইরূপ অভিযোগের আবহাওয়া সৃষ্ট হইবার কারণ ও প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করার আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। পরাধীন জাতির জীবনে ঐক্যবদ্ধ কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস অনর্থক বা অবান্তর কারণে না বাধাপ্রাপ্ত হয়, এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের চলিতে হইবে, তাহা হইলেই কর্ম্মক্ষেত্রের অস্পষ্টতা দূর হইতে পারিবে। বিবৃতিটুকুর মর্ম্ম এই :—

"বিহারের বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শনিবার পাটনা পৌছি। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাহায্য-সমিতি বিপন্নগণের সাহায্যার্থে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, সেই সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার খোলাখুলি আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত তখন উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্র এবং পাটনার কতিপয় বাঙ্গালী যে বলিয়াছেন, যে শৃঙ্খলার সহিত সাহায্য-বিতরণের ব্যবস্থা হইতেছে না এবং সাহায্য-বিতরণে প্রাদেশিকতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—আমি স্পষ্টভাবেই তাহা রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তও আমার উক্তি সমর্থন করিয়া বলেন, সাহায্য-বিতরণে প্রাদেশিক মনোবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া কলিকাতায় বেশ জনরব প্রচারিত হইয়াছে। বিশেষ ক্ষুব্ধ চিত্তে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমার উক্তির প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, যে এইরূপ অমূলক জনরব-প্রচারের ফলে সাহায্যদান কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে।

অতঃপর তিনি আমাকে অনুরোধ করেন, যে আমি যেন বিধ্বস্ত অঞ্চলে তদন্ত করিয়া এই বিষয়ে একটা বিবৃতি প্রকাশ করি।

গত কল্য আমি মজঃফরপুর যাত্রা করি। আমি তত্রত্য সমস্ত সাহায্য-কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছি। আমি বিপন্ন বাঙ্গালীদের এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি এবং স্থানীয় (একটী সাহায্যসমিতির সম্পাদিকা ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখিকা) শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রভৃতি বিশিষ্ট বাঙ্গালী অধিবাসিবৃন্দের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য-সমিতির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ শুনিতে পাই নাই। সুতরাং প্রচারিত জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেন্দ্রীয় সাহায্য-সমিতির কেন্দ্রে আমি নগরের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর সহিত আলোচনা করিয়াছি, তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিয়াছেন, অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমি দেখিলাম, সাময়িক আবাসের ব্যবস্থা ও খাদ্য-দানের প্রয়োজন প্রায় মিটিয়াছে। এখন স্থায়ী সাহায্য-দানের সময় আসিয়াছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা অতীব সন্তোষজনক। জাতি, ধর্ম্ম ও প্রদেশ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণ বিপন্নেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আমার মনে হয়, অপেক্ষাকৃত বিলম্বে সাহায্যদানের ব্যবস্থা হওয়াতেই এই অভিযোগের উৎপত্তি। ভূমিকম্পের

পর প্রায় চারিদিন পর্য্যন্ত কোনও সাহায্য দেওয়া যায় নাই; সুতরাং ঐ চারিদিন সকলেই অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অবিচার ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ স্বাভাবিক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান ঘোর বিপত্তির দিনে, সমস্ত বাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া, প্রত্যেককেই ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

যে পরিমাণ সাহায্যদান করা আবশ্যক, কেন্দ্রীয় সমিতি অবশ্য এখনও সেই পরিমাণ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু সমিতির কার্য্য বেশ শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে এবং বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলকেই নিরপেক্ষ ভাবে সাহায্য করা হইতেছে। গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি স্থায়ী সাহায্যদান কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই। জানিতে পারিলাম, কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি বিধ্বস্ত অঞ্চলের অর্থ-নৈতিক জীবনের পুনর্গঠন-কল্পে স্থায়ী প্রচেষ্টা করিতে যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছেন।

সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার অনুরোধ, তাঁহারা ক্ষুদ্রত্তা ও সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া আর্ত্ত মানবের সেবার কথাই স্মরণ রাখিবেন এবং বিহারের সঙ্কট-সময়ে বিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন কল্পে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিবেন।"

অবশ্য ইহার উপর, কেন্দ্রীয় সাহায্য-সমিতির কার্য্য-কারিতা শক্তি যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য বিভিন্ন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি-গ্রহণে কেন্দ্র সমিতিকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলার ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে এবং তাহার ফলে সমিতিকে ঘিরিয়া যেটুকু অস্পষ্টতার আবহাওয়া তাহাও সম্পূর্ণ দূরীকৃত হইবে বলিয়াই আমরা প্রত্যয় করিতে পারি। অধিকন্তু "অমৃতবাজার পত্রিকা"র কার্য্যালয়ে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সভাপতিত্বে যে সংবাদপত্র-মণ্ডলীর সভাধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে এই মর্ম্মে এক সঙ্কল্প পরিগৃহীত হওয়ায় অখণ্ড বিশ্বাস ও সহানুভূতির উপর সেবাকার্য্য অতঃপর অপ্রতিহত বেগে অগ্রসর হইতে পারিবে।

পুনর্গঠনের ধারা—

যে ধ্বংসলীলা "One of the greatest natural calamities in human history" তাহার প্রভাব হইতে বিধ্বস্ত জনপদকে মুক্ত করিয়া আবার ধনজন-শস্যমণ্ডিতা ভূখণ্ডে পরিণত করা যে কত বড় অসাধ্য সাধন তাহা বুঝিতে আজ কাহারও বাকী নাই। অনুমান ও কল্পনার সীমাও আজ ছাড়াইয়া গিয়াছে—একটা বিরাট্ পুনর্গঠনের তপস্যা বস্তুতন্ত্র করিয়াই বরণ করিতে হইবে।

প্রয়োজন—অর্থের সমুদ্র। দুই কোটী, পাঁচ কোটী টাকাও কিছু নয়; বিহার-গভর্ণরের সিদ্ধান্ত, অন্যূন ত্রিশ কোটী টাকার প্রয়োজন হইবে, বিহারকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য। এত টাকা আসিতে পারে কোথা হইতে? জনসাধারণের মুষ্টিমেয় সামর্থ্য নিঙড়াইয়া যে টাকা তোলা সম্ভব, বাংলা হইতে তাহা কতক পরিমাণে হইয়াছে; আরও কিছু না হয় এখনও হইতে পারে। সারা ভারতের জনসমষ্টির নিকটও সেই অনুপাতে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা তুলিবার জন্য ধারাবাহিক সংগ্রহ-ব্যবস্থাও চাই। কিন্তু ইহাও প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য এবং ভারাক্রান্ত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে শেষ তৃণখণ্ডের মতই দুর্ব্বহ। বলিয়াছি, ভারতের ধনকুবের ও রাজন্য-বৃন্দকে আজ মুক্তহস্ত হইতে হইবে। আহ্মেদাবাদ ছাড়া বোম্বাই প্রদেশ হইতে এ পর্য্যন্ত যোগ্য সাড়া পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না; বিহারের বিপদে বোম্বাই'এর সহানুভূতি বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক। গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য এখানে সমধিক গুরুতর। বিহারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব জানাইয়াছেন, বিহার গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একা এই গুরু-ভার বহন করা দুঃসাধ্য—অতএব লোকের দানবৃত্তির উপর অনেক-খানিই নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। আমরা বলি, এই ক্ষেত্রে ভারত-গভর্ণমেণ্টকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে—কেন না, ভারত-গভর্ণমেণ্টের হাতে ঢের বেশী অর্থাগমের উপায় সংন্যস্ত আছে। বিহারবাসী স্বভাবতঃ চিরদরিদ্র, তাহার উপর কোটী সংখ্যক অধিবাসীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সীমা কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিবে তাহারও স্থিরতা নাই। কাজেই, ইহাকে দীর্ঘকালব্যাপী

দুর্ভিক্ষের অবস্থা গণ্য করিয়া, ভারত-গভর্ণমেণ্টই বিহারের জন্য "দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড"গুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। ভারত-গভর্ণমেণ্টকে উদ্যত হইয়া বৈদেশিক অর্থসাহায্যও আকর্ষণ করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে, ইংলণ্ড হইতেই দানের মাত্রা সত্যই দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিতে হইবে। এ সকল কার্য্যের জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টকে জাপান-গভর্ণমেণ্টের মতই আন্তরিকতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইবে। পক্ষান্তরে, বিহারের দুর্ঘটনার ছায়ালোকে, সমস্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাবনাটাকেই আর একবার ঝালাই করিয়া লওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

বর্ত্তমানে যে সাহায্য-সমিতি আশু প্রতিকারের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, স্থায়ী পুনর্গঠন কার্য্য তাহা হইতে ভিন্নতর বলিয়া, উহার জন্য নূতন কার্য্যকরী কমিটী গঠন করাও আবশ্যক হইতে পারে। এই কমিটীতে সরকারী ও বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা যোগ্য পরিমাণেই লওয়া আবশ্যক—বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞগণের সহায়তাও গ্রহণীয়। ইহাও সত্য, বর্ত্তমান সাহায্যসমিতির সহিত নিবিড় ভাবে যোগ রাখিয়াই স্থায়ী পুনর্গঠন-সমিতিকে কার্য্য করিতে হইবে—এইজন্য বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদের মত অভিজ্ঞ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে বর্ত্তমানেরই মত সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া পুনর্গঠনের সহিত সংলিপ্ত থাকিতে হইবে। বিহার আজ চায় পুনর্গঠন—এ কাজ দেশ ও গভর্ণমেণ্ট সংযুক্ত ভাবে যাহাতে গ্রহণ ও সম্পন্ন করিতে পারে, তজ্জন্য অনুকূল নীতি ও আবহাওয়া উভয় পক্ষকেই আন্তরিকতার সহিত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

পুনর্গঠনের যে সুচিন্তিত ছকটী বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মোটামুটি সমস্যাটীকে সকল দিক্ দিয়া দেখাইবার তিনি প্রচেষ্টা করিয়াছেন। পুনর্গঠন-সমিতি এই ৯ ধারা সূত্র করিয়া, এখন হইতেই বিশেষজ্ঞ-গণের কার্য্যকরী পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

(১) ধ্বংস-স্তূপের অপসারণ ও ভূ-প্রোথিত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার—

(২) কূপগুলির সংস্কার—

(৩) গৃহ-নির্ম্মাণ—

(৪) বালু বা জলে প্লাবিত জমিগুলির সুব্যবস্থা—

(৫) কৃষিক্ষেত্র ও ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় খাদ্য-সমস্যার সমাধান—

(৬) ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য জীবিকা-সমস্যার সমাধানে নূতন ভাবে আর্থিক জীবন আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা—

(৭) নষ্ট জমির পুনর্ব্যবহারের সম্ভাবনা না থাকিলে, বিপন্ন অধিবাসীর দেশান্তরে গমনের ব্যবস্থা।

(৮) বাড়ী ও জমীর খাজনা, জল-কর, রাস্তাকর প্রভৃতি, এবং চৌকীদারী ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সগুলি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—

(৯) ইক্ষু-পণ্যের সুবন্দোবস্ত—

এই অত্যাবশ্যক কাজগুলির যে কয়টি বিষয়ে দেশের অধিবাসীরা গায়ে-গতরে খাটিয়া সংগঠনের সহায়তা করিতে পারেন, তাহা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইতিপূর্ব্বেই দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। স্বাবলম্বনপ্রিয় প্রত্যেক মানুষের এই দিকে প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে কাজ শারীরিক শ্রম দিয়া সম্ভব হয়, তাহা নিজেরাই স্বেচ্ছা-সেবক হইয়া করা উচিত। নিজেদের সামর্থ্য থাকিতে কূপ, তড়াগাদি পরিষ্কার করা সাহায্যলব্ধ অর্থ দিয়া করাইবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে স্বকীয় মনুষ্যত্ব শুধু অবমানিত করা হয় না, দেশের অর্থেরও তাহা অপচয় বলিয়া গণ্য হইবে। মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর সাহায্য-স্বরূপ অর্থ-গ্রহণে যেমন কুণ্ঠা স্বাভাবিক, তেমনি নিজ শারীরিক শ্রম-নিয়োগে শ্রম-সাধ্য কর্ম্মগুলি করিয়া লওয়ার জন্য তাঁরা সর্ব্বদা উদ্যত থাকিবেন, ইহাও স্বভাবতঃই আশা করা যায়; কিন্তু আর্থিক অবস্থা পুনঃ গুছাইয়া লইবার জন্য তাঁহাদের সম্মানজনক ঋণ-লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে—পুনর্গঠন-সমিতিকেই। সংগঠনের কাজে মজুরের অভাব হইবে না, ফলতঃ নিম্নশ্রেণীর বেকার-সমস্যা সাময়িক ভাবে কতকটা নিরসিত হইবে—মধ্যবিত্ত ও উচ্চ ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে যাহারা সর্ব্বস্বান্ত তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইহার চেয়ে দুঃসাধ্য ব্যাপার। এদিকে পুনর্গঠন-সমিতিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টকে সরকারী

অফিষ, আদালতগৃহ প্রভৃতি অবশ্যই গড়িয়া লইতে হইবে—এইদিকে ঝোঁক দেওয়ার সঙ্গে সহরগুলির পুনর্গঠনে যত অধিক মনোযোগ পড়িবার সম্ভাবনা, কিন্তু বিধ্বস্ত পল্লীগুলির দিকে তেমনি কিছু মনোযোগ ঢিলা হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক বলিয়াই সে আশঙ্কা দূর করিতে কমিটীতে জনসমাজের প্রতিনিধিবর্গকে যথেষ্ট সংখ্যায় স্থান দিতে হইবে। জাপানের ন্যায় ভূকম্প-সহ গৃহনির্ম্মাণে যেমন বৈজ্ঞানিকগণের পরামর্শ লইতে হইবে, তেমনি সহরের ন্যায় পল্লীগুলির প্রয়োজন মত নূতন করিয়া সংস্থান সন্নিবেশেও অবহেলা করিলে চলিবে না। যে শস্য এত দুর্য্যোগেও রক্ষা পাইয়াছে, তাহার উপযোগের সঙ্গে খাদ্যসামগ্রীর মূল্য-নির্দ্ধারণ ও জনসাধারণের ক্রয়-সামর্থ্যের সমান তালে দীর্ঘ দিন নিয়মিত করিবার আইনতঃ ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় হইবে। সুখের কথা, ইক্ষু হইতে গুড় তৈয়ারী করিবার জন্য ছোট ছোট আখ-মাড়াই কলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সুপরামর্শ গভর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন ও তাহার জন্য দুই লক্ষ টাকা অনুমোদিত হইয়াছে—অতএব এতদনুসারে কার্য্য হইয়া বিহারবাসী কৃষক সম্প্রদায়কে কতক পরিমাণে বাঁচিবার সংস্থান হাতে দিবে, ইহা দুরাশা নহে। অন্যান্য কৃষিজাত ফসলের কি ব্যবস্থা করা যায়, সে বিষয়েও অভিজ্ঞ নেতৃগণকে কার্য্যকরী চিন্তা ও অনুষ্ঠানে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না।

পুনর্গঠনের সমস্যা আজ বিহারের দুর্ঘটনায় তীক্ষ্ণ হইয়াই দেখা দিয়াছে মাত্র; কিন্তু ইহাই ভারতের আসল সমস্যা। এই জীবন-সমস্যার সমাধানে উদ্বুদ্ধ বিহারের সঙ্গে আজ সকল প্রদেশবাসী ভারতবাসী ও গভর্ণমেণ্টকে সংগঠনকেই জাতীয় সাধ্যরূপে সম্মুখে রাখিয়া, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সকল প্রশ্নের মীমাংসায় নূতন ভঙ্গীতে গঠনকরী নীতির সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। বিধাতার বিধান বড় নির্ম্মম আঘাত দিয়াই এই রুদ্ধ প্রেরণা মোচন করিতে চাহিয়াছে—গঠনের সঙ্কেতে শাসক ও শাসিত কোনও পক্ষেরই আর উদাসীন থাকা উচিত নহে, হয়ত সম্ভবপরও হইবে না।

দেবতার রোষ?

বিহারের দুর্দ্দিনে, ব্যথার পীড়নে মর্ম্মাহত হইয়া মহাত্মার কণ্ঠে এই উক্তি বাহির হয়—

"You may call me superstitious if you like; but a man like me cannot but believe that this earth-quake is a divine chastisement sent by God for our sins. Even to avowed scoffers, it must be clear that nothing but divine will can explain such a calamity. It is my unmistakable belief that not a blade of grass moves but by the divine will."

—ইহা ভাগবত বিশ্বাসের কথা। হিন্দুমাত্রেই এই প্রকার দৈব দুর্ঘটনা আধিদৈবিক উৎপাত বলিয়া স্বীকার করেন। মহাত্মাও তাই বলেন—"When that conviction comes from the heart, people pray, repent and purify themselves."

কিন্তু তাঁর পরের কথা লইয়া একটা আলোচনা ও আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে:—

"But guessing has its definite place in man's life. It is an ennobling thing for me to guess that the Bihar disturbance is due to the sin of untouchability. It makes me humble, it spurs me to greater effort towards its removal, it encourages me to purify myself, it brings me nearer to my Maker."

ইহাই অবশ্য তাঁর সবখানি কথা নয়। তিনি শুধু অস্পৃশ্যতা-পাপেরই ইহা একমাত্র শাস্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে এমন কথাও বলিতে হইয়াছে—"I do not interpret this chastisement as an exclusive punishment for the sin of untouchability. It is open to others to read in it divine wrath against many other sins."

মহাত্মার এই সকল কথা তাঁহার আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; যাঁহারা তাঁহার মত অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ

হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে এ বিষয়ে এক মত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ একজন মহাত্মাজীর শ্রেষ্ঠ গুণানুরাগী ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। তিনিও মহাত্মার বিশ্বাসোক্তি সর্ব্বসাধারণের কুসংস্কার-বৃত্তির পরিপোষণ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় যুক্তিবাদের আলোকে সে সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে কুণ্ঠা করেন নাই। পক্ষান্তরে সনাতন-পন্থী দল মহাত্মার আন্দোলনকেই সকল দুর্গতির মূল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। আমাদের মনে হয়, যে সকল ভাব আন্তরিক প্রত্যয়রূপে কাহারও অন্তরে স্থান পায়, তাহা যুক্তি-বিচার দিয়া খণ্ডিত বা নিরসিত সব সময়ে করা যায় না। বিবেকের বাণী শাস্ত্র বা তর্ক-বুদ্ধির যুক্তির উপর হইতেও আসে, তাহা লইয়া আলোচনা আন্দোলন করিয়া বিশেষ ফল নাই। প্রকৃতি বা ঈশ্বর—মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অনুকূলে বা প্রতিকূলে যে ঘটনা ঘটাইয়াছেন, তাহার মধ্যে বৈষম্য বা পক্ষপাতিতার নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই না, এইটুকুই প্রত্যক্ষ সত্য। মহাত্মার কণ্ঠে মানবাত্মারই প্রশ্ন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে—"Nature has been impartial in her destruction. Shall we retain our pratiality—caste against caste, Hindu, Muslim, Parsee, Jew, against one another in reconstruction, or shall we learn from her the lesson that there is no such thing as untouchability as we practise it today?" —শুধু বিহারের নয়, আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন-যুগে, এই প্রশ্নের সদুত্তর যাহা আমরা দিতে পারি, সেই দিকে লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

সমালোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সঙ্কলিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

রাজেন্দ্রবাবুর এই বিরাট্ গ্রন্থখানি অভিনব, অপূর্ব্ব বস্তু, ইহা সকল দিক্ দিয়াই নূতন ও উপাদেয়। নবীন ব্যাখ্যাকার আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্করের মতানুসরণ করিয়া গীতার মর্ম্ম মাতৃ-ভাষায় সঙ্কলন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে সমগ্র অদ্বৈত-শাস্ত্রের নিবিড় রসাস্বাদে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছি। ভারতীয় চিন্তাধারা অদ্বৈত-মুখে প্রবাহিত হইবার পথে যে একটা সুগভীর ও অপরূপ বৈশিষ্ট্য পাইয়াছে, তাহার সহিত পরিচয় না থাকিলে শুধু গীতা কেন, কোনও ভারতীয় শাস্ত্রের অমৃতাস্বাদন সম্ভব হয় না। রাজেন্দ্রবাবু এই চিন্তাধারা নিবিড়ভাবেই আয়ত্ত করিয়াছেন, তাই তাঁহার সম্পাদনায় গীতার মর্ম্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কটীও যেন জাতীয় ভাব-বৈশিষ্ট্যে অভিষিক্ত ও পুনর্গঠিত হইয়া উঠে। ইহাই তাঁহার লেখার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদু-প্রভাব বলিয়া আমার উপলব্ধি হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত বিষয়-বস্তু লইয়া শ্রদ্ধেয় লেখকের সহিত আমার যেটুকু মত-ভেদ আছে, তাহা ক্ষুদ্র সমালোচনা-স্তম্ভে প্রস্ফুট করা সম্ভব নহে, তাই তাহার প্রদর্শনে এখানে ক্ষান্ত হইলাম। প্রাচীন ভাষ্যকারশ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্করের মৌলিক ভাষ্যেও যে জীবন-যোগ অপরিস্ফুট রহিয়া গিয়াছে, "প্রবর্ত্তকে" "গীতার যোগে" তাহা লইয়া ধারাবাহিক আলোচনা করিতেছি। রাজেন্দ্রবাবুর গীতা বঙ্গভাষায় সেই অদ্বৈত-ভাষ্যের বিজয়-স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত উত্তম-রহস্য ও নিগূঢ় যোগ-বিজ্ঞান অধিকার করিতে হইলে, কিন্তু শাঙ্করভাষ্য যে কতখানি সহায়তা করিতে পারে, তাহা রাজেন্দ্রবাবুর গীতাখানি না পড়িলে আমি হয়ত সম্যক্ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতাম না। এইজন্য এই গীতাখানির জন্য আমি শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

যাঁহারা গীতা-পাঠের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী ও চিরাগত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সকল অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সকলকেই এই বইখানি সযত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিশেষ, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ জাতির পক্ষে এই গ্রন্থ অমৃততুল্য রসায়ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অধিকন্তু, সম্পাদকের সম্পাদন-পরিপাট্যেও বিমুগ্ধ না হইয়া

থাকিতে পারা যায় না। অন্বয়, আশয়, বিচার, চিত্র, শব্দ সূচি ও বিষয় নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়-সন্নিবেশে বইখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে। পদ্যও বেশ সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

প্যারিসে দশমাস—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ, ৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দাম দুই টাকা। পৃষ্ঠাঙ্ক ২৯০।

আলোচ্য গ্রন্থ শ্রীযুত সরকারের প্রণীত বিখ্যাত 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ষষ্ঠ খণ্ড। প্যারিসে তাঁর প্রথম-বারকার অভিজ্ঞতা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীযুত সরকার সমাজবিজ্ঞানবিৎ। গ্রন্থে কবি-হৃদয়ের আবেগ-উত্তেজনা না থাকিলেও, আছে তাঁর স্বাভাবিকী বস্তুনিষ্ঠার একটা সহজ ছবি—অনুসন্ধিৎসামূলক প্রত্যক্ষ পরিচয় আরও নিখুঁত ও বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। নব্য বাংলার প্রতীক সরকারের স্বদেশের প্রতি নিবিড় প্রীতি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মত বক্ষ্যমান পুস্তকেরও প্রতি পাতায় পাতায় পরিস্ফুট। স্বদেশের সত্যিকারের শ্রী-সমৃদ্ধি বাঞ্ছা করিলে বহির্দুনিয়ার সঙ্গে যোগ ও তার খবরাখবর রাখার একান্ত প্রয়োজন। এই হিসাবে সরকারের নিকট বাংলা ও বাংলা সাহিত্য সবিশেষ ঋণী। ইহাতে একটা জাতির রাষ্ট্র-সমাজ-সাহিত্য-ইতিহাস-শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি জীবনের প্রায় সকল দিকেরই তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের বিষয়-বস্তু আন্তর্জাতিক তুলনামূলক হওয়ায় অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

গ্রন্থ-শেষে দেখান হইয়াছে, যে সকল দেশেই আপন কোলে ঝোল টানিবার প্রবৃত্তি বলবতী। এমতাবস্থায় অতি দরদের সহিত গ্রন্থকার পথ দেখাইয়াছেন,—"ভারত সন্তান সর্ব্বত্র একমাত্র ভারতবর্ষের স্বার্থই পুষ্ট করিবেন, 'কিবা হাড়ী', 'কিবা ডোম'!"

শ্রীযুত সরকার জাতীয় উন্নতি অবনতি আধুনিক কল-কারখানা-যন্ত্রপাতির মাপকাঠিতে পরিমাপ করার পক্ষপাতী। আর্থিক উন্নতি তিনি প্রতীচ্যের অর্থনৈতিক আলোকে যাচাই করেন। সাংসারিক সুখ, জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তিনি মার্কিণকে আদর্শ খাড়া করিয়াছেন,—"সমস্ত পৃথিবীকেই অন্ততঃ সাংসারিকতার হিসাবে আমেরিকার আদর্শে গড়িয়া তোলা বর্ত্তমান মানবের এক প্রধান ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই।" প্রত্যেকের বা ব্যষ্টি জাতির নাও ধর্ম্ম লাভ হইতে পারে,—এ ক্ষেত্রে মতানৈক্য স্বাভাবিক।

বিনয়বাবুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আটপৌরে ভাষা বেশ উপভোগ্য। তাঁর ভাষা ও কথার মধ্যেও একটা নবীন যৌবনোচিত ছাপ আছে। বলিবার ভঙ্গীও চমৎকার। তাই 'প্যারিসে দশমাস' একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। বাঁধা-ছাপা উৎকৃষ্ট। কাগজও ভাল।

সরল পোল্ট্রি পালন—

মূল্য এক টাকা মাত্র।

বাংলার সব্জী—

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীঅমরনাথ রায় প্রণীত। ২৫নং রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা। দি গ্লোব নার্শারী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাংলা ভাষায় পোল্ট্রি ও উদ্যান-কৃষি সম্বন্ধীয় এমন সবিস্তার ও খুঁটিনাটি সংবাদপূর্ণ পুস্তক বোধহয় আর প্রকাশিত হয় নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি প্রতীচ্য জগতে এ সম্বন্ধে, বিশেষ পোল্ট্রি বিষয়ক গ্রন্থ পত্রিকা প্রভৃতির অবধি নাই। পোল্ট্রি মার্কিণের জাতীয় আয়। কৃষির এবং অনেক আয়কর বিভাগের চেয়ে সেখানে পোল্ট্রির আয় অধিক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাশ্চাত্যদেশে পোল্ট্রি পালন হইয়া থাকে। মার্কিণের এক একটা বিরাট্ কারখানায় একই সময়ে লক্ষাধিক ডিম ফুটাইবার ব্যবস্থা আছে—যা এখন এদেশে কল্পনা করাও কঠিন। অমরবাবুর দুইখানা বই-ই খুব সময়োপযোগী হইয়াছে।

সরল পোল্ট্রি পালন পুস্তকে পাতিহাঁস, রাজহাঁস, মুরগী, পেরু, পারাবত, ছাগলের পালন, পরিচর্য্যা, চিকিৎসা, জাতিবিভাগ প্রভৃতি ইতিকথা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতন্ত্র ব্যবসায়ের দিক্‌টা উপেক্ষিত হওয়ায় পোল্ট্রি ফারমিং আরম্ভ করিবার সহজ আকর্ষণ সৃজন করে না। বইখানা পড়িয়া পোল্ট্রি সম্বন্ধে বেশ একটা সাধারণ জ্ঞান হয়, পরন্তু কৌতুহল চরিতার্থ করিতে বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার যেন কোন পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অমরবাবুর 'বাংলার সব্জী' সব দিক্ দিয়াই একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বইখানিতে গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রত্যেকটি বিষয়ে সুপরিস্ফুট। গ্রন্থখানি মোটামুটি তিনটি ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে 'কিচেন গার্ডেন' সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল তথ্যই আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে উদ্যান-কৃষি বিষয়ক গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তের দরকারী সাতাশীটি সব্জীর সবিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টাংশে মাসিক কৃষি, সব্জী চাষের মোটামুটি হিসাব ও শাক-সব্জীর খাদ্য মূল্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কৃষি-প্রধান বাংলায় গৃহপঞ্জীর মতই এই বইখানি প্রতি ঘরে ঘরে রক্ষণীয়।

জাতির এই অর্থসঙ্কট-যুগে অমরবাবুর এই উদ্যম প্রশংসনীয়। ছাপা-কাগজ ভাল। বিষয়-বস্তু ও পুস্তকের কলেবর বিবেচনায় মূল্যও সুলভ।

জাতি কথা—

শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত, প্রকাশক ও সম্পাদক সদ্‌গ্রন্থ প্রচার সমিতি পোঃ বহরপুর, জেলা ফরিদপুর হইতে শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাহায্য—পাঁচ আনা মাত্র।

জাতির চিত্তশুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্মের দিক্ দিয়া অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-প্রয়াসই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকারের আন্তরিকতা ও ব্যথার আভাস গ্রন্থমধ্যে পরিস্ফুট। পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। গ্রন্থের ভুল-চুক পীড়াদায়ক।

মহাপুরুষ-চরিত—

শ্রীবঙ্কুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন, বজ্‌বজ্, ২৪ পরগণা। মূল্য চারি আনা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তিকায় পরমহংসদেব, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ, কাঠিয়া বাবাজী ও শ্রীতৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দর্শন—(প্রথম ভাগ)

স্বামী নিত্যানন্দ প্রণীত ও প্রকাশিত। ১০৭, ১৬৭এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের আত্মজীবনী ও সাধনকালীন দেবদেবী দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু প্রকাশভঙ্গী ও সাজাইবার দোষে সুখপাঠ্য হয় নাই।

সন্ত-বাণী—

শ্রীশিশিরকুমার রাহা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। নিম্বার্ক আশ্রম, হাওড়া, মূল্য ছয় পয়সা মাত্র।

শ্রীশ্রী ১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের কয়েকটি বাছা বাছা উপদেশ। বড় অল্প।

— প্রাপ্তিস্বীকার —

বিশ্বকোষ ১ম ভাগ—১ম সংখ্যা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত।

আশ্রম-সংবাদ

[আশ্রমি-লিখিত]

সঙ্ঘে শ্রীপঞ্চমী

বিগত ৬ই মাঘ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে যথারীতি ৺শ্রীপঞ্চমী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এবারকার উৎসবের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতি বৎসর যার স্নেহ-ঘন মূর্ত্ত সুশীতল ছায়ার নীচে থাকিয়া এবং অমৃত-বাণীর ঝরণায় অভিষিক্ত ও সঞ্জীবিত হইয়া এই উৎসব সর্ব্বোতোভাবে আনন্দময় হইত, তিনিই ছিলেন সুদূর সুন্দরবনে অনুপস্থিত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জন ষোল সঙ্ঘের ভাই-বোন, যারা উদ্যোগী হইয়া মাথা পাতিয়া সঙ্ঘের সকল বিধি-ব্যাপারের বাহিরের হাঙ্গামা বহন করিতেন। একাই একশো যে আমাদের…দা, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও সেই সময়ে ধনিডুব খাইয়া রইলেন কোন মগের মুল্লুকে। পিছনে রইলো যে কয়জন একান্ত সংসারানভিজ্ঞ নারী ও পুরুষ, তাঁদের ভাবনার অন্ত রহিল না, যতই উৎসবের দিন আসিতে লাগিল ঘনাইয়া। শ্রীপঞ্চমীর দু'দিন পূর্ব্বেই যখন সুন্দর-বনের শত-প্রত্যাশিত তার জানাইয়া দিল, যে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নৌকায় উঠিয়া রওনা হইবার মুখে তাদের ফিরিতে বাধ্য হইতে হইল প্রতিকূল আব্‌হাওয়ার জন্য, তখন দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসাদে হৃদয়-মন মুষ্‌ড়িয়া পড়িল। দীর্ঘ পথ—বিপৎসঙ্কুল যাত্রা। তবু বাঞ্ছিতের পথ চাহিয়া অন্তরের গোপন একটি কোণ যেন উদ্‌গ্রীব হইয়াই রহিল। সঙ্ঘ-মনের উপর সাগরযাত্রীদের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় যে শেষ মুমূর্ষু আনন্দ-আভাসটুকুও প্রতীক্ষমান ছিল, তাহা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এক অভিনব অলক্ষ্য

শক্তির অমৃতস্পর্শে, যখন সংক্ষিপ্ত 'তারে'র এতটুকু বুকের মাঝে বহিয়া আনিল সঙ্ঘ-দেবতার বিরাট্ হিয়ার নিগূঢ় মর্ম্মকথা ও মৃতসঞ্জীবনী আশীর্ব্বাণী—

"অমূর্ত্ত উপস্থিতি, অনির্ব্বচনীয় আশীর্ব্বাদ, ভাগবৎ নির্দ্দেশ ও আলোতে উৎসব অনুষ্ঠিত হোক।"

অলক্ষ্যশক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সেদিন সঙ্ঘ-চেতনায় রূপায়িত হইয়া ধরা দিল।

যথারীতি উপাসনা, উৎসবায়োজন নির্ব্বিঘ্নে ও নিখুঁত ভাবেই প্রতিপালিত হইল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা-জালের অন্তরালে যে মহতী ইচ্ছার অদেখা অজানা ইঙ্গিত, তাহা ভাষার সামর্থ্যে যতটুকু ভাবকে রূপ দেওয়া সম্ভব সুস্পষ্ট বেশ স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল নাগ দেবীর আবাহন প্রসঙ্গে স্বামী চিদানন্দজীর মর্ম্মনিংড়ান মাধুর্য্য-ময়ী কথাগুলির মধ্য দিয়া। শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে বৈকালে ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরে সারস্বত সম্মেলন হয় ও প্রবর্ত্তক পল্লী-সংস্কার সমিতির প্রেরণা ও পরিচালনায় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্বোধন হয়:—

শিশুপাঠাগার, শ্রমিক নৈশ-বিদ্যালয়, বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব। উপলক্ষে ছাত্রদের আবৃত্তি বেশ উপভোগ্য হয় এবং বক্তাদের যথোপচিত বক্তৃতাও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রমিকদিগের উপস্থিতি ও আন্তরিকতায় সভার কার্য্য বেশ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। সভাপতির প্রাণময়ী বক্তৃতা শ্রোতার অনুভূতির তারে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনে ফরাসী ভারতের গভর্ণর

বিগত ২২শে জানুয়ারী বেলা ১১॥টায় ফরাসী ভারতের গভর্ণর মঃ জর্জ্জ বুরে প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবন পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চন্দননগরের এডমিনিষ্ট্রেটর, মেয়র ও তাঁর সেক্রেটারী মরিঞ্চ। সঙ্ঘ-সভ্যগণ কর্ত্তৃক মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরকে একখণ্ড সিল্কের রুমালে মুদ্রিত অভিনন্দন প্রদত্ত হয়।

সঙ্ঘপরিদর্শনে মনীষিবৃন্দ

ফ্রান্স হইতে সদ্যাগতা ভারতপর্য্যটনকারিণী মাদাম এল মোরিণ, কেকিলামুখ মঠের অধ্যক্ষ ও আর্য্যদর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মচারী সত্যচৈতন্যজী এবং বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক ও ইন্দোর হোলকার সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র-মোহন তর্কতীর্থ মহোদয়গণ সঙ্ঘে শুভাগমন করেন।

সুন্দরবনে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ

সুন্দরবন, ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চলে, লক্ষ্মীপুরে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত একটি কৃষি-ক্ষেত্র এবং কর্ম্মকেন্দ্র আছে। সম্প্রতি এই কেন্দ্র-পরিদর্শনার্থে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় তথায় উপস্থিত হইলে, স্থানীয় প্রায় এক সহস্র অধিবাসী তাঁহাকে অভিনন্দন করেন এবং শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এক বিরাট্ সভা আহ্বান করিয়া দরিদ্র পল্লী-বাসীর গুরু করভার ও দুঃখদুর্দ্দশার কহিনী তাঁহার নিকট নিবেদন করেন। শ্রীযুক্ত মতিবাবু স্থানীয় ভূম্যধীকারী কাশিমবাজার রাজ-ষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া ইহার প্রতিকার যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের দিক্ হইতে কৃষকদের সাহায্যকল্পে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের একটী শাখা-স্থাপনের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। এই অঞ্চলের প্রায় ১৫০০ বালক বালিকার জন্য দুইটী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেও তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.
Printed by Krishna Prasad Ghosh, at Prakash Press—61, Bowbazar St. Calcutta.

কাঙ্গালিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।
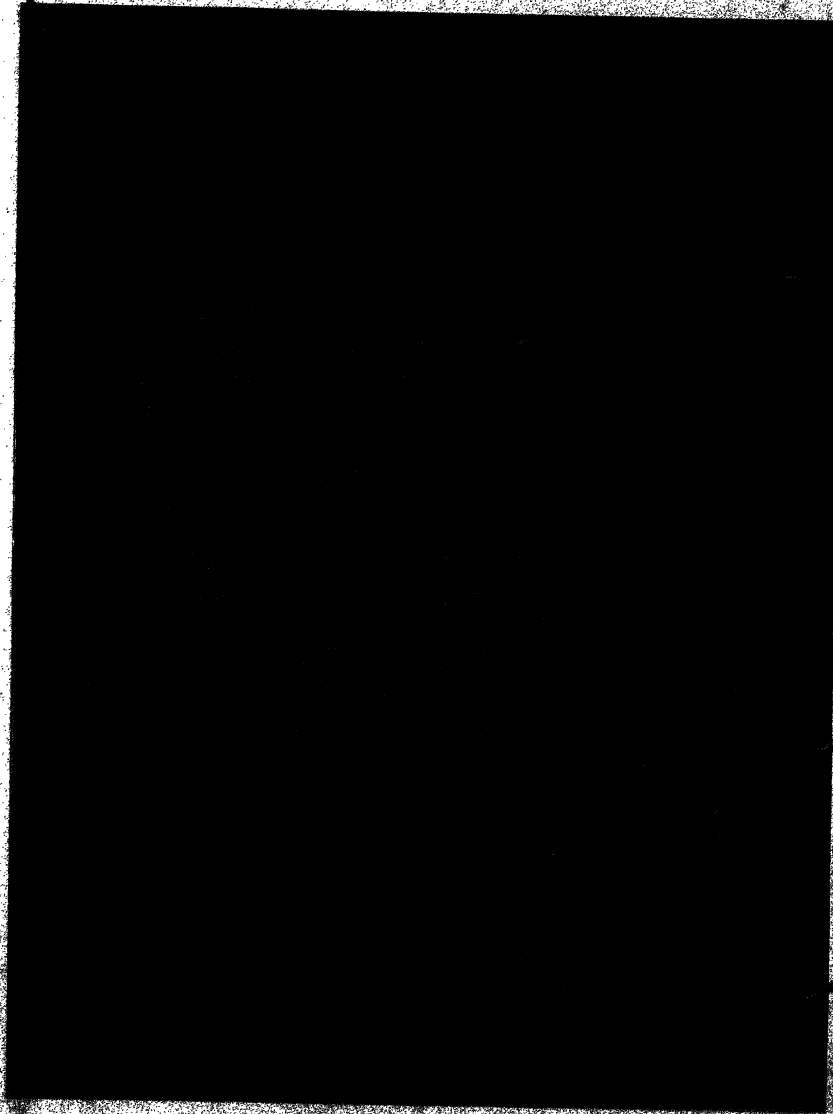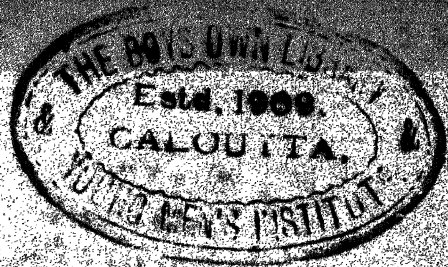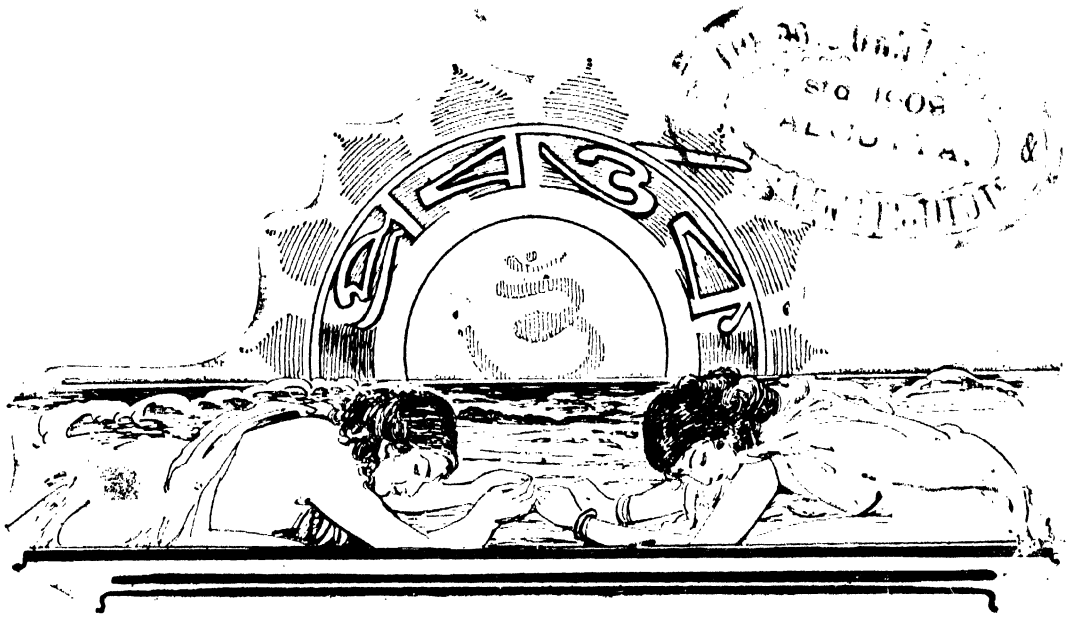
১৮-শ বর্ষ	চৈত্র, ১৩৪০	১২শ সংখ্যা

বর্ষ-শেষে

১৩৪০ সালের শেষ মাস। ব্যবসায়ী হিসাব-নিকাশে মন দিয়াছে; জীবনের খতিয়ান যারা রাখে, তাদেরও সারা বছরের লাভ ক্ষতি র‍্যাজা মিলিয়ে দেখা উচিত। হিসাব-জ্ঞান যাদের নাই, তারা শুধু নিজেরাই দুঃখ পায় না, সমাজের পাপ-স্বরূপ বহুলোককে ক্ষতিগ্রস্ত করে, জ্ঞানে অজ্ঞানে অন্যের চক্ষে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

হিসাব কেবল টাকা পয়সার অঙ্কপাত নয়; আত্ম-শক্তির আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ করে' চলা। কোথায় বেহুঁস হয়ে লাভের চেয়ে ক্ষতি করে' ফেলেছি, তা যদি বছরের শেষে ধরা না পড়ে, জীবনের নূতন খাতা আরম্ভ করা যায় না। বেদ, উপনিষদ্, গীতার আলোচনার চেয়ে এই কাজটা ছোট নয়। জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা জীবনের যেমন একটা দিক্, ব্যবহারিকতার দিক্‌টাও তেমনি জীবনেরই অপরিত্যজ্য অংশ। এই জন্য জীবন-নীতির সবখানি যারা দেখে' না চলে, তারা মুমূর্ষু জাতির শনৈঃ শনৈঃ গলাটাই চেপে ধরে।

যারা বেঁচে আছে, তারা কেবল ধর্ম্মের আলোচনা নিয়েই বেঁচে নেই; একটা বড় সত্য এই যে, তারা সবাই খায়—কিন্তু খাওয়ার জন্য যে উদ্যম, যে প্রয়াস, তা ধর্ম্মপ্রাণ যারা তারা সবাই করে না। ভিক্ষুক খায় দশজনের দুয়ারে যাজ্ঞা করে'; যারা ধার্ম্মিক, সন্ন্যাসী, তাদের জীবন-রক্ষার দায়টা চাপিয়ে দেয় সমাজের ঘাড়ে এবং সমাজকে এই বিষয়ে সচেতন রাখে একপ্রকার ধর্ম্মের দালালী করে'—এই অবস্থায় যারা খাওয়ায় তাদের শ্রম তাদের জন্যই ব্যয়িত হয় না, এই অসংখ্য নাবালক-রূপী দরিদ্রনারায়ণ ও মহাপুরুষদের জন্যও দিতে হয়।

একশত জনের জীবনধারণের যে পরিশ্রম তার পরিমাণ যতখানি, যদি একশত জনই তা বহন করে,

তা'হলে ইহাদের কাহারও অতিরিক্ত শ্রমের বোঝা বয়ে স্বাস্থ্য ও শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় না—বরং বিহিত ও পরিমিত শ্রমে দেহের কান্তি, শক্তি ও শ্রী বাড়ে বৈ কমে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, এই হিসাব-জ্ঞানটা আমাদের দেশের লোকের আদৌ খেয়ালে নাই।

একশত জন যে শ্রম দেয়, সেই শ্রমের কড়ি একশত জনের অধিক লোককে আহার্য্য দেয়; কেন না জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, ব্যাধিপীড়িত, অপরিণত-বয়স্ক শিশু এবং নারীকে প্রতিপালন করার ভার সমাজের আছে। ইহারা ব্যতীত কুড়ের বাদশা বলে' এক জাতীয় নারী পুরুষের সংখ্যা যদি ধর্ম্মের নামে অথবা বেকার বলে' বেড়ে চলে, কেবল সংসারই তাতে দরিদ্রই হ'বে না, বড় সংস্থা, কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান, মঠ, মন্দির, আশ্রম, সর্ব্বত্র দৈন্যই বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে মাথা তুলবে। মুখ বুজে' খাটে যারা তারা আগে মরবে, বসে' খাওয়ার জীবগুলি সবাইকে খেয়ে শেষে পিলে উল্‌টাবেই। এইজন্য অক্টোপাসের মত যে জানোয়ারটা এইরূপ সমাজের রক্তশোষণ করছে, বাঁচ্‌তে হলে আমাদের তাকে নিঃসারিত করতেই হবে।

কিছু করার নেই বলে' আমরা যে বেকার তা নয়, ইহা পূর্ব্বে এর প্রবন্ধে বলেছি। ধর্ম্ম করলেই যে তাকে সংসার ও সমাজ এবং জাতির হিতকামনায় কিছু করতে হবে না, ইহা নহে। হাড়ে-ঘুণ-ধরা রূপ ব্যাধি ধীরে ধীরে বেকারের সংখ্যা যেমন বাড়ায়, অন্য দিকে মাজ্জিত-বুদ্ধি যে সে ধর্ম্মের ভান করে। শক্তি যদি জাগে, তবে জাতির দুঃখ কেন?

কিছু করার যার নাই, সে চরকাও কাট্‌তে পারে; একখানা জাঁতা নিয়ে সংসারের অথবা সংস্থার পরিজন-বর্গের বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করার তপস্যাও করতে পারে। বাড়ী বা আশ্রমের চারি পাশে যে সব পতিত জমি, সেগুলিতে লাউ, কুমড়া, বেগুন, টোমাটো ফলাতে পারে। শ্রমের বিনিময়টা তেমন পাওয়া যায় না বলে' একান্ত বসে থাকার চেয়ে এই ভাবে শ্রমের অনুশীলন সুরু করলে স্বতঃই ইহার শক্তি-প্রকাশ হবে এবং তাহা শ্রী ও ঐশ্বর্য্য রূপে সকল ক্ষেত্রকেই সুষমা-মণ্ডিত করে' তুলবে।

আজ বিশেষ করে' যারা সমাজ ও সংসারের বন্ধন ছিঁড়ে ভগবানের আস্বাদ পেতে অথবা দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনায় ঘরের বাহির হয়েছে এবং একত্র হয়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধনা গ্রহণ করছে, তাদের কথাই উল্লেখ-যোগ্য। সমাজের সঞ্চিত ধন টেনে আনা ইহাদের একটা কাজ; এই হিসাবে দাতার কাছে হাত পাতায় সমাজের কল্যাণ-বিধানই হয়। কিন্তু কোনও সংস্থার পক্ষেই ইহাই একমাত্র ধনাহরণের অবলম্বন হ'লে, আত্মপোষণের দায়-ভারটা এইরূপ অর্থ-সঞ্চয়ের হেতু হয়ে উঠে। এইজন্য সংসার, সমাজের দায় ছেড়ে যারা বাহিরে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা প্রত্যেকেই যদি স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনা না গ্রহণ করে, তার ধর্ম্ম-সাধনা, সমাজহিতৈষিণা, জাতি ও দেশের হিতকামনা একটা আত্মপোষণের কপট ঘোষণা বলেই ধরে' নিতে হয়। বরং এই সকল অসাধারণ কর্ম্ম বা সাধনক্ষেত্রগুলিতেই জীবন-সংগ্রামের সিদ্ধনীতি আদর্শ-স্বরূপ ফুটে' উঠা উচিত।

কোন মানুষই জীবন-ধারণ করে না একান্ত নিজের জন্য; অন্যকে ভরণ করার মৌলিক প্রবৃত্তি কর্ম্মৈষণা জাগ্রত করে। ইহা মানবের স্বভাব-ধর্ম্ম। যাহার কেহ নাই, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে' যে বৈরাগ্যের ধ্বজা ধরার অধিকার পেয়েছে, তার কর্ম্ম-প্রেরণা যদি রুদ্ধ হয়, তা'হলে ইহা মানবের স্বভাব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ভাবই জাগিয়ে তোলে। ইহা যে কত বড় অন্ধতা ও স্বার্থপরতা তাহা সহজেই অনুমেয়। নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ, পরার্থে জীবনের আনন্দ এই ক্ষেত্রে রূপ যদি না নেয়, আদর্শের অভাবে সংসার ও সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়বে। যে হেতু "মহাজনঃ যেন গত সঃ পন্থাঃ!" যে খাঁটী বিরাগী, সে খাঁটী আত্মদর্শী। অন্যের মাঝে যে আপনাকে অনুভব করে, তার এই অনুভূতিই অন্যের হিতকামনায় আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি দেয়। তারই জীবন-প্রবৃত্তি সমুদ্রের ন্যায় গভীর, আকাশের ন্যায় উদার। আর এইরূপ মহাপুরুষের অভ্যুত্থানেই ভারতের মরা প্রাণ বার বার জীবন পেয়েছে। আজ তারই অভাব অনুভব করি! ভারতের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের তুলনা নাই যে সকল প্রাচীন ঋষির তপস্যায় ও আত্মানুশীলনে, তাঁহারা জীবন-

ধারণের প্রচেষ্টাও নগণ্য বোধ করেন নাই বলে'ই আজও ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য প্রভৃতির নিদর্শন যাহা পাওয়া যায়, তাহা অর্ব্বাচীন যুগের চিন্তা-রাজ্যেরও এখনও বাহিরে। বর্ত্তমান যুগের মানুষ ভেবে উঠ্‌তে পারে না—যে জাতির জীবন-ব্যাপার এত বড় ছিল, সে জাতির অন্তর্দৃষ্টি কতখানি ছিল। অনেকে প্রশ্ন তুলেন, ভারতের উন্নতি-যুগ যদি সত্যই এত বৃহৎ ও গৌরবময় ছিল, তবে তাহার অধঃপতন হ'ল কেন? তার কারণ প্রদর্শন করা শক্ত কথা নহে; তবে সে প্রসঙ্গ এই ক্ষেত্রে উত্থাপন করব না।

জীবন-ব্যাপারকে ছোট করে' না দেখার নিদর্শন পাই ভারতের প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থ উপনিষদে। স্বয়ং ভগবানই যখন নর-বিগ্রহ ধারণ করলেন, তখন তাঁহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি করার প্রয়াস দেখা দিল। অশ্ব ও গো সম্মুখে স্থাপিত হ'লেও তিনি তাহা ক্ষুন্নিবৃত্তির হেতু বলে' গ্রহণ করলেন না; এগুলি গতি ও জ্যোতির উপমা মাত্র। ইহা দ্বারা আত্মার সংবিৎ-রক্ষা হয়; আশ্রয়-তত্ত্ব যে দেহ তার পোষণ হয় না। অনেক গবেষণায় ও তপস্যার অনুশীলনে অন্নের উৎপত্তি হ'ল। অন্ন মনুষ্য-বিগ্রহ দেখে পলায়নতৎপর হ'লে, কোন যন্ত্র দিয়ে তাকে গ্রহণ করা যায় তারও চেষ্টার কথা উপনিষদের ঋষি সুন্দর করে' এঁকে দেখিয়েছেন। চক্ষের দৃষ্টি অন্নকে গ্রহণ করতে পারল না; উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, তাতেও সে ফিরল না। সকল ইন্দ্রিয়-প্রয়োগে যখন উদ্দেশ্য-সিদ্ধি সম্ভব হ'ল না, তখন মুখ ব্যাদান করে' তিনি তাহা গ্রাস করলেন। এইদিন হ'তেই মানুষ লাভ করল ভোজন-সিদ্ধি। আজ ইহা হাসির কথা, কিন্তু মানুষ যেদিন দশটা ইন্দ্রিয় নিয়ে জন্মেছিল, সেদিন কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে কোন কর্ম্ম করতে হবে তাহা সত্যই সমস্যাই সৃষ্টি করেছিল। ঋষি অন্ন গৃহীত হ'লে এই কথা বলে'ই গ্রন্থ সমাপ্ত করলেন, যে দৃষ্টি দিয়ে যদি অন্ন গ্রহণ করা সম্ভব হ'ত তবে অন্নের দর্শনেই মানুষের উদর-পূর্ত্তি হ'ত, বাক্যের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হ'লে অন্নের নামোচ্চারণেই আমাদের উদরপূর্ত্তি হ'ত; এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যদি ইহা গৃহীত হ'ত, তবে অন্নের নাম-শ্রবণেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ত, কিন্তু ইহা হয় নাই—তাহাকে মুখব্যাদান করে'ই গ্রহণ করতে হয়েছে এবং ইহা একটা প্রকাণ্ড জীবন-সাধন ব্যাপারে সিদ্ধরূপেই মানুষকে ভোজন করার স্বভাব দান করেছে।

এই আদিম কর্ম্ম-সিদ্ধি করার তপস্যা হ'তে নিজের মধ্যে ভূমার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার তপস্যা পর্য্যন্ত যে জাতি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে' গেছে, সে জাতির ভবিষ্য সন্তান আমরা যদি জীবনের সবখানিকে বরণ করে' নিতে না পারি, তা'হলে তাঁদের আদর্শস্বরূপ যে পরিপূর্ণ জীবন-বেদ তা আমরা কোন দিন উপলব্ধি করতে পারব না। যে জাতি ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টির মহিমা-কীর্ত্তনে বিশ্বনিয়ন্তার জয় দিতে চায়, তারা হচ্ছে জীবনবাদী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী; নতুবা হাজার হাজার বৎসরের উপধর্ম্মের আবর্জ্জনা-স্তূপ সরিয়ে বিশ্বের আদিম অথচ সনাতন সভ্যতার আবিষ্কার করার সাধ্য আর কার হবে! তবেই কথা এসে পড়ল আমাদের দেখতে হবে—জীবনকে শাশ্বত ধর্ম্মের বিগ্রহ রূপে এবং তার অভিব্যক্তি কর্ম্মকে যজ্ঞ-রূপে।

ধর্ম্ম হচ্ছে, এই পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান-রূপ পরমচৈতন্য; আর কর্ম্ম হচ্ছে এই চৈতন্যের স্বচ্ছ সুবিমল প্রকাশ। আপনাকে এই ভাবে দেখার তত্ত্ব সমাযোগে পরিপূর্ণ নিয়ন্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব লুপ্ত হয়েছে। যাঁরা আত্মানুশীলনে ভারতের এই সনাতন সভ্যতাকে সবখানি দিয়ে লাভ করেছেন, তাঁদেরই আমরা মুক্ত পুরুষ বলে' আখ্যা দিই। তাঁরা জীবনের আদর্শ নিয়ে সহজভাবেই মানব-সমাজে বিচরণ করবেন; কেবল মানুষের কর্ম্মপ্রচেষ্টা যে কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পরিদৃষ্ট হয়, ইঁহাদের কর্ম্ম-প্রেরণা তাহার উল্টা দিক্ থেকেই নেমে আসে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানহীন মানুষ কর্ম্ম করে তার সীমাবদ্ধ জীবনের কেন্দ্র থেকে, আর এই সকল মুক্ত পুরুষ কার্য্য করেন বিরাট্ চৈতন্যের মহাকেন্দ্র থেকে। এই অসাধারণত্বই মানুষের গতানুগতিক স্বভাবের দিক্ থেকে তাকে উল্টে' ভূমার সহিত যুক্তি দেবে এবং সেইখানেই হবে তার একটা নূতন জন্ম এবং তখনই তার কর্ম্ম দিব্যরূপে প্রকাশিত হবে, গীতায় যাহা যজ্ঞরূপে আখ্যাত হয়েছে।

কেবল অর্থাভাব দূর করার জন্য যে সমস্যা আজ আমাদের কর্ম্মপ্রেরণার কারণ হয়, তাহা সাময়িকভাবে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে তুল্‌বে বটে; কিন্তু যে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর আমাদের দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে হবে, আমরা ইহাতে তা থেকে দূরেই অপসারিত হ'ব। কামনা যদি জীবন-নিয়ন্ত্রণের কারণ হয়, ভারতের দিব্যজন্ম তাতে সিদ্ধ হবে না এবং এই কল্পসিদ্ধির বিপরীত পথে আমাদের অধিকতরভাবেই লাভের মোহে দুরতিক্রম্য ক্ষতিকেই বরণ করে' নিতে হবে। ভাব ও আদর্শ যতক্ষণ কথামাত্র, ততক্ষণ ইহা লোকের কাছে শুধুই হেঁয়ালী এবং এই জীবন-সঙ্কটের দিনে কুহেলিকা বলেই পরিত্যাজ্য হয়। মানুষের দুর্দ্দিন যখন আসে, আর সে বাঁচার জন্য যখন ব্যগ্র হয়, পথ বলে' যেটার দিকে সে এগোয়, সেইখানেই যে সমাধান মিলে তাহা নহে; বরং এই সময়ে তাহাকে অতিশয় সতর্ক হ'তে হয়—পথের বিচার যদি স্থিরভাবে করে' না নেয়, পথ বলে' বিপথেই সে এগিয়ে পড়ে। আমাদের সাম্‌নে আসন্ন সমাধান-রূপে যে সকল পন্থা অতীতে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি আজ বিপত্তি বলে'ই পরিহার কর্‌তে হচ্ছে; আজ আবার যাহা আবিষ্কৃত হয়, তাহা যে সমধিক অন্তরায়ের কারণ হবে না, সে কথা কে বল্‌তে পারে? আমরা তাই বাঁচার যে অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ কর্‌ছি, সে মন্ত্র অনাদি যুগের এবং অমৃতলাভের একমাত্র পথ। দুর্গম, ক্ষুরধার; কিন্তু যখন 'নান্যপন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়,' তখন এই পথেই আমাদের যাত্রা সুরু কর্‌তে হবে।

সে পথ কি? আমি গোড়ায় হিসাবনিকাশের কথা বলেছি। আয় এবং ব্যয়, দুই দিক্ দেখে ইহা নির্ণয় করা হয়। আমাদের সঞ্চয় ও আমাদের ব্যয় কোন দিক্ থেকে হচ্ছে, সেই কথাটা তলিয়ে বুঝ্‌লেই আমরা ব্যয়ের পথ অবধারিত বন্ধ কর্‌তে পারব এবং আপূর্য্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ান তখন অসম্ভব হবে না।

ধন, সম্পদ্, শস্য, যান-বাহনাদি জীবনের খতিয়ানে বস্তু-রূপে গৃহীত হয় না। জীবনের সম্পদ্ আয়ুঃ। এই আয়ুঃ কালের সহিত পরিব্যাপ্ত; তাই কালকে যে সংযত করে, সে আয়ুর ঘনীভূত-মূর্ত্তি দর্শনের অধিকারী হয়। যে কাল জয় করে, সে আয়ুর মর্ম্মও অবধারণ করে' কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী হয়। আসলে এই মৃত্যুকেই বারণ কর্‌তে হবে, আমাদের আয়ুর মধ্যে সে যেন ছেদের দাঁড়ি না টেনে দেয়। ভারতের নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ-ধারা কালেরই যবনিকাপাতে ছন্দোহীন, বিচ্ছিন্ন। আয়ুর স্থিরত্ব দেহ-পতনেও ক্ষুণ্ণ হয় না; এই হেতু ইহার সাধনের উপরেই আমাদের সর্ব্ব-বিধ জীবন সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

বিশ্বের সমগ্রজাতি আজ জীবন-সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্ত, আত্মরক্ষার দায়ে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত, অসংখ্য প্রকার পথের সন্ধান দিতে ব্যগ্র; কিন্তু ভারতের বিধাতা তর্জ্জনী-সঙ্কেতে যে সিদ্ধ পথের নির্দ্দেশ অনাদি যুগ ধরে' দিচ্ছেন, সে পথে চলার মানুষ আজ ভারতের মনীষী, তপস্বী, সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্যের পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। উহাদের উৎসাহে, পুরুষকারে ও অধ্যবসায়ে যদি এই অদৃশ্য পথকে জীবনের সম্মুখে মূর্ত্ত করে' কোন দিন ধরা যায়, সেইদিনই বিশ্বের সম্মুখে ভারতের দান অমৃত বলে'ই প্রতিভাত হবে।

আজ এইজন্য অসাধারণ-জীবন-লাভের প্রয়াসী যারা, যাদের ভোগ ও ত্যাগ কাম্যরূপে পরিদৃষ্ট হয় না, নির্ঘাৎ জীবন-যন্ত্রকে ভগবানের হাতে তুলে দিয়ে যারা নিশ্চেষ্ট, নিথর, তাদেরই জীবন-রন্ধ্রে শ্যামসুন্দরের যে বাঁশরী-ঝঙ্কার, তার সুর কোন রন্ধ্রে উদাত্ত স্বরে কেন বাহির হয় না, তাহারই সন্ধান কর্‌তে বলি। সেই রন্ধ্র-পথের আবর্জ্জনা-রাশি দূর করার আর কোন উপায় নাই; কেবল ভগবানের পদসঞ্চার-প্রতীক্ষায় সেই পথের চেতনাকে উদ্‌গ্রীব ও সচেতন করে' রাখা।

এই জাগ্রত জীবনের আচার—দিব্যাচার। এই হিসাবী মানুষের নবজীবন প্রতিদিন তার পরিচয় দিয়ে বর্ষশেষে উপসংহার করে। যারা আজ আচার নিয়ে সতর্ক, সন্ত্রস্ত, তাদের বলি, শাস্ত্র-কথিত যে আচার তাহা স্মৃতিকেই জাগিয়ে তোলে, অতীতের ইতিহাস প্রাণে উৎসাহ দেয়; কিন্তু বর্ত্তমান জীবন-ধর্ম্মের উহা আনুকূল্য করে না। জীবন-নীতি বা আচার, তাহাতো শাস্ত্রের বাঁধা-ধরা পথ নয়, ভগবানের প্রতীক্ষায় ব'সে থাকারই ভঙ্গী। যে আজ উৎসর্গ-মন্ত্রে দীক্ষিত, তার আচার

ভগবানের আগমন-প্রতীক্ষার যে স্বভাব, তাহারই অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার কালটুকুর মধ্যেই স্রোতের মত বয়ে চলেছে দিব্যাচারের তরঙ্গ-ভঙ্গী, হৃদয়দেবতার দিকে চেয়ে থাকা; আবার তার দিকেই চেয়ে চেয়ে সুপ্তির মাঝে ডুবে যাওয়া—ইহার মাঝে যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাহা সবখানিই ধর্ম্মাচার। এই আচারের রেখাঙ্কন করে' অভ্যুদীয়মান জাতিকে একটা নির্দ্দেশ দিই—যারা আত্মসমর্পণের পথে, তাদের ভুলে যেতে হবে অতীতের, বর্ত্তমানের সব কিছু—দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে ভবিষ্যতের দিকে। সেই দিক্ থেকেই আমার নিয়ন্তার পদ-চিহ্ন অরুণ-রাগ-রঞ্জিত হয়ে ফুটে' উঠ্‌বে। তাই আমি নিশার তৃতীয় যামের পর আর সুপ্তি-ঘোরে থাকৃতে পারি না; আমায় উদীয়মান সূর্য্যের দিকে চেয়ে উদ্গানে উদ্গানে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলতে হয়। সূর্য্যালোকে যখন বিশ্ব প্লাবিত হয়, তখন আমারও প্রাণে শক্তি ও উৎসাহের প্লাবন নেমে' আসে; আমি অসুরের ন্যায় শক্তি প্রয়োগ করি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে, অধ্যাপনায়-প্রচারে-সেবায়—যেখানে ডাক আসে সেখানে। সায়াহ্নের সূর্য্য দেখে' আমিও স্থির হ'য়ে দাঁড়াই, অন্তরের মাঝে প্রভুর নূপুর-নিক্বণের সুমধুর ধ্বনি শুন্‌তে। আহারে পাই তৃপ্তি, সে যে নিবেদিত অন্ন, ভগবানেরই প্রসাদ। আবার মাথা তুলে দাঁড়াই বিশ্বের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে শ্রমের অনুশীলনে; ডুবে যায় দিবসের আলো, দিগন্তের কোলে জেগে উঠে গুচ্ছে গুচ্ছে অন্ধকার, স্থির হ'য়ে বসি নদীর তীরে চক্ষু মুদিত করে'—স্মরণ করি সারাদিনের শ্রম, সাধনা তপস্যা যিনি জীবন-যন্ত্র নিয়ে করলেন তাঁকেই। তারপর, সেবারতির ঘণ্টাধ্বনিতে, পঞ্চপ্রদীপের সমুজ্জ্বল আলোক-শিখায় সবখানি রসাপ্লুত হ'য়ে পড়ে বিরাট্ পুরুষোত্তমের চরণ-তলে লুটিয়ে পড়ি স্বপ্নের মাঝে তাকেই খুঁজে নিয়ে। এই জীবনাচারের মাঝে যদি আর কোন বাণী জাগে, দুই কানে আঙুল দিয়েই তাকে নিরস্ত করি। অপচয়ের পথ রুদ্ধ করার এই যে নিত্য জীবন ধারা, তার হিসাব-নিকাশ এক দিনেই শেষ হয়; তারপর অপক্ষয়হীন অখণ্ড জীবন-প্রবাহ ছুটে চলে উন্মাদের ন্যায় সীমাহীন পারাপারের দিকে। এই জীবনের সন্ধান দিই বাংলার তরুণ তরুণীকে; বলি—জাগো, অমৃত অভিষেক কর, তোমার এই নবজন্মের মধ্যেই বিশ্বের [illegible] সমাধান হবে।
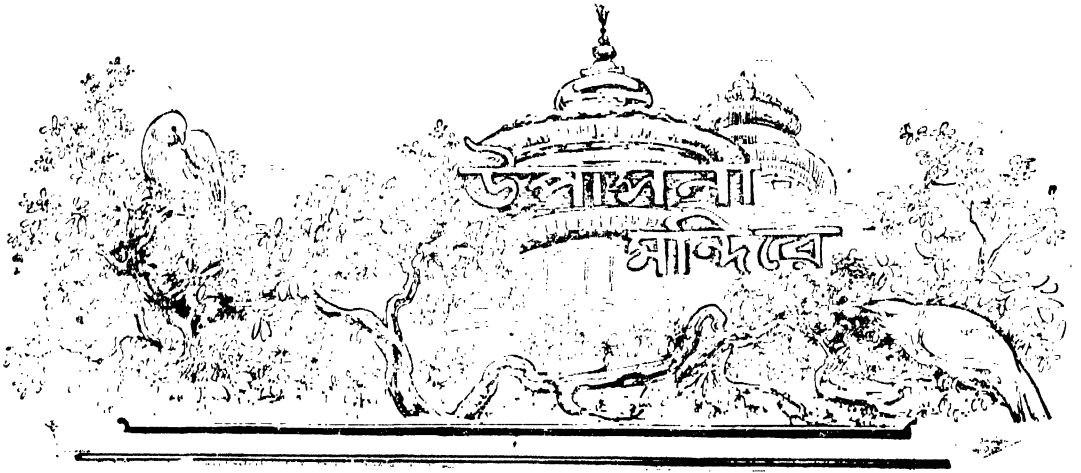
শিব-রাত্রি

শিব সত্য এবং সুন্দর। শিব লয়-কর্ত্তা; তাই সত্যস্বরূপ, তাই চির সুন্দর। লয় মিথ্যার; সত্য শাশ্বত। সত্যের উপর যে মলিনতা, শিবশক্তিই তাহা অপসারিত করতে পারে। পরম বিশুদ্ধি যাহা, তাহা সৌন্দর্য্যের উৎসস্বরূপ। তোমরা শিবত্ব লাভ কর, সত্য ও সুন্দর হও।

যেখানে সত্য, সেখানে শ্রদ্ধার উদয়। শ্রদ্ধা বীর্য্যস্বরূপ। বীর্য্যই সত্য দৃষ্টি, ঋতময় জীবনের ভিত্তি। শ্রদ্ধাহীন হয়ো না। আত্মশ্রদ্ধাই ভাগবত শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়। শ্রদ্ধার মূর্ত্তি ভগবানে একনিষ্ঠ প্রত্যয় ও অনুরাগ। ভগবান বিরাট্‌, তাঁর বিগ্রহ বিশ্ব রূপ। বিশ্বের প্রতি যে মায়া, তাহাই দিব্য মায়া। এই মায়াই ভাগবত শক্তি।

...গবত দীক্ষা মহাশক্তি। নিরবচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় অমৃত-নির্ঝর—ইহাতে তোমরা আজ অভিষিক্ত হও। পরভুক্‌... নির্জীব জীবন-ভার যোগীর নয়। সিদ্ধি শুধু গ্রাম্য গৌরব নয়, উপেক্ষা ও লাঞ্ছনাও হয়। গৌরব আপনার মাঝে; ভক্তের মহিমা ঈশ্বর-প্রাণ জন উপলব্ধি করতে পারে। অনীশ যাহা, সেখানে অন্ধকার; ভক্তের প্রতি সেখানে চির উপেক্ষাই থাকে।

শক্তিকে উৎসৃত হইতে দাও। আপনার কর্ত্তৃত্ব-বোধ রুদ্র ধ্বংস করুক। গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় নিয়ত গতিশীল দেহের লীলায়িত মাধুরী বিশ্বকে শোভায় ও পবিত্রতায় পুলকিত করুক। জীবনের প্রকাশ সাময়িক উত্তেজনা নয়, অনির্ব্বাণ আগুনের ন্যায় নিত্য উৎসাহপূর্ণ। যে মুহূর্ত্তে তুমি অবসন্ন, আত্মগর্ব্ব বা আত্মগ্লানিতে সমাচ্ছন্ন, সেই মুহূর্ত্তে তুমি অনীশকে আশ্রয় দাও। তুমি সদানন্দ, চিরসুন্দর। তোমার অঙ্গ বিভূতিময়। প্রকাশ তাই স্বভাব। জন্ম ও মৃত্যু অনাহত ঋক-সঙ্গীতের তাল ও ছন্দঃ। তুমি অমৃতের সন্তান।

আজ বসন্তের প্রথম প্রভাত-মলয়-স্পর্শে নূতন যৌবনকে বরণ কর। বসন্তোৎসব সম্মুখে; প্রেম যদি সৌরভ হয়, আজ শিবের মঙ্গলময় অনুধ্যানে মঙ্গলময় হও। সঙ্ঘের মঙ্গল-মূর্ত্তি তোমার সাধনার সিদ্ধি-লক্ষণ হোক। ক্ষয় ক'র না, ক্ষয় হ'তে দিও না। সতত পূর্ণ হও, সব কিছুকে পরিপূর্ণ কর। ওঁ শান্তিঃ।

*   *   *   *

"শিবোঽহম্‌, শিবোঽহম্‌"—দেহটা নশ্বর, দেহী অবিনশ্বর। আমি ইচ্ছা করে'ই দেহ ধারণ করেছি। জন্মের পর ইহার বৃদ্ধি; তারপর ক্ষয়—দেহের ইহাই বিধান। দেহ-স্থিতি আমার মর্ত্ত্য-গতির জন্য। যতদিন ইহা আছে, ততদিন বিরামহীন যাত্রা পৃথিবীর বুকে। আমার ক্ষিপ্রতা এই হেতু—যত শীঘ্র অগ্রসর হওয়া যায় লক্ষ্যের পথে।

লক্ষ্য কি? জগতে ঈশ্বর-চৈতন্য শনৈঃ শনৈঃ জাগ্রত করা, মর্ত্ত্যবাসীকে বুঝিয়ে দেওয়া তারা অমৃতের পুত্র, তারা দেহ নয়, আত্মা। এই অবগতির উপর জীবের যে স্থিতি, তাহা অসাধারণ জীবনের অবস্থিতি। ইহা কিরূপ, তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না। এই জীবনের রূপ নূতন জন্ম-পরিগ্রহে মূর্ত্ত হবে।

এই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্য, সর্ব্বপ্রথমে দিয়েছি শিক্ষা; তখন ছিলাম আচার্য্য। তারপর দীক্ষার যুগ; গুরুর আসন নিয়েছিলাম। সাধনার যুগে আমিই হয়েছি দেবতা, সিদ্ধিকালে ভগবান। তোমাদের উপনীত হতে হবে—আমাতে; "মামেতি" মন্ত্রের সিদ্ধি এইখানে।

সঙ্ঘের প্রথম স্তরে কর্ম্ম-সাধনা। অন্যান্য ক্রম—অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর পর আসছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে অর্থ। ধর্ম্ম ও অর্থের সঙ্গতির উপর কাম। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধ বেদীর উপর মোক্ষের প্রতিষ্ঠা। তবেই পরিপূর্ণ যোগের লক্ষণ-প্রকাশ হবে; তবেই ভগবানকে উপলব্ধি হবে—তিনি কেবল ভাব নয়, বীর্য্য; তুরীয় নয় মূর্ত্ত, নতুবা মর্ত্ত্যধাম স্বপ্ন ও কল্পনা মাত্র।

সাধনা নিশ্চেষ্টতা নয়, অদৃষ্ট-বাদ নয়—পরম উৎসাহ ও পুরুষকার। সঙ্ঘের কোনও ক্ষেত্রে আর অন্ধকার বাঞ্ছনীয় নয়। জীবন যদি কোথাও অস্পষ্ট ও অপ্রকাশ হয়, তাহা অন্তরের অশুদ্ধিবশতঃ ঘটে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, উভয়ের মূর্ত্তি নিয়েই এই অস্পষ্টতা আসতে পারে। তন্ত্র গতি ও জ্যোতিঃস্বরূপ। বেদে 'অশ্ব' ও 'গো' ইহারই প্রতীক, রূপক। মানুষের তন্ত্র তাহার অবধারক। সত্যকে অস্বীকার ক'র না। জীবন উদ্যত কর। অমৃতময় হও।

*　　*　　*　　*

জ্ঞান আছে, হৃদয় আছে, নাই প্রাণ। এই যে সঙ্ঘের একটা নিত্য অনুষ্ঠান—উপাসনা, উদ্গান প্রভৃতি—ইহাও শুষ্ক হতে পারে প্রাণের অভাবে; যেমন হিন্দুর মন্দিরগুলি আজ উৎসবহীন, পূত মন্ত্রের সেখানে ঝঙ্কার উঠে না—প্রাণ নেই বলে'ই নয় কি?

ধর্ম্মজ্ঞান থাকলেই প্রাণ জাগে না: প্রাণের অনুশীলন দরকার। সুসংস্কৃত প্রাণ দীর্ঘ দিনের শিক্ষায় ও অভ্যাসে লাভ করা যায়। সংযত ও নিয়মিত প্রাণই নিত্য প্রাণ বলে' অনুভূতি-গম্য হয়। আজ ধর্ম্ম হয়েছে অনায়াস-লভ্য; কিন্তু প্রাণ-বস্তু যেন তপস্যার বিষয়। তার কারণ—প্রথমটী সিদ্ধ; অন্যটী এখনও অসিদ্ধ, অপ্রাপ্ত বস্তুরূপে আছে।

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের" এই নূতন অভিযান দিব্য প্রাণেরই সন্ধানে। বেদ, উপনিষদ্, যোগ, এ সব দিবার নাই; ভারতীর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ অতীতের দানে। যদি জাগাতে পার প্রাণ, তোমাদের নূতন দান ভারতের মহোৎসবে গৃহীত হবে, চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি উঠবে।

জাগ, জাগ বল্লেই কি প্রাণ জাগে? তার সন্ধান কি? বিজ্ঞান কি? এই সব ভুয়া পাণ্ডিত্যের তর্ক, বিচার, শাস্ত্রজ্ঞান সমস্যা আরও জটিল করে। ঘুমন্ত মানুষকে জাগাবার বেদ, পুরাণ, বিজ্ঞান অন্য কিছু নয়, কেবল কাণের কাছে চীৎকার করা, তার টুঁটি ধরে' টান দেওয়া—"উত্তিষ্ঠ! জাগ্রত"—এই কাজটুকুও যে করে, তারও প্রাণ-শক্তি অসাধারণ জানবে।

সকলে এই কাজই করেছে, তবু প্রাণ জাগে নি। কি করা যাবে? চিরযুগ তবুও এই কাজই করতে হবে। বার বার দুয়ারে ধাক্কা দিয়েই বলতে হবে—"ওঠ, জাগ"—ইহাতে বিরক্তি, ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা। তাই চিরদিন, চিরযুগ বলে' যাই—"ওঠ, জাগ।"

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীগুরুদাস রায়

পরলোকগত ঐতিহাসিক ৺যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার একথা লিখিয়াছেন, যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে বিশেষ গৌরবময় স্থান প্রদান করা হইত। গীতা সত্যই বলিয়াছেন, জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। এইজন্যই মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মপুস্তক ও বেদে জ্ঞানই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় (বন ৩১২।১০০)। তাই মনুর মতে, রাজা ও স্নাতকে সাক্ষাৎ হইলে, রাজা স্নাতককে সম্মান করিবেন (মনু, ২, ১৩৯)। এইজন্যই রাজা স্বদেশেই পূজা পাইয়া থাকেন, বিদ্বান্ সর্ব্বত্রই পূজিত হইয়া থাকেন, এইরূপ প্রচলিত প্রবাদ। এই হেতুই প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থীকে সাক্ষ্য দিতে হইত না (মনু ৮।৬৫); কারণ, তাহা হইলে তাহার পাঠের ব্যাঘাত জন্মিত (নারদ)।

মনুর মতে (৩।১) শিক্ষার্থীকে ছত্রিশ বৎসর আচার্য্যের নিকট বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইত, অভাবে, অষ্টাদশ বা নয় বৎসরকাল অতিবাহিত করিতে হইত। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, বেদে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে আট চল্লিশ বৎসর শিক্ষকের নিকট বাস করাই সমীচীন ছিল (বৌধায়ন, ১।২।৩)। বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে দশ বৎসর আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভই প্রশস্ত ছিল (মহাকাতা ৩২।১)।

শিক্ষককে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা হইত। সম্পূর্ণ বেদশিক্ষাদাতাকে আচার্য্য বলা হইত। যিনি কেবল জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বেদের অংশ বিশেষ শিক্ষা দিতেন, তিনি উপাধ্যায় নামে অভিহিত হইতেন (মনু ২।১৪০।১৪১)। তন্নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিকে গুরু-আখ্যা প্রদান করা হইত। আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণ অধিক পূজিত হইতেন ; মধ্যে মধ্যে আচার্য্য প্রধান প্রধান বিদ্যার্থীকে ছাত্র-শিক্ষায় নিয়োজিত করিতেন (মহাধর্ম্মপাল জাতক, ৪।৪৪৭)।

আচার্য্যের সহিত বাসকালে বিদ্যার্থীকে মধু, মাংস, সুগন্ধি, মাল্য, স্ত্রীলোক, ক্রোধ, লোভ, নৃত্যগীতবাদ্য হইতে বিরত থাকিতে হইত (মনু, ২।১৭৭)। দ্যূতক্রীড়া, বিবাদ, পরনিন্দা, মিথ্যাকথন এবং কাহাকেও আঘাত করা হইতে তাঁহাকে বিরত থাকিতে হইত। তাঁহাকে একাকী শয়ন করিতে হইত (মনু ২।১৮০)।

আচার্য্যের জন্য তাঁহাকে পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া জল আনিতে হইত। পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা, কুশ—শিক্ষকের প্রয়োজনীয় পরিমাণে আহরণ করিতে হইত (মনু ২।১৮১, ১৮২)। শিক্ষককে সকল প্রকারে সম্মান-প্রদর্শন ও তাঁহার সকল আদেশ প্রতিপালন করিতে হইত (আপস্তম্ব ১।১।২)। দিবাভাগে বিদ্যার্থীকে নিদ্রা হইতে বিরত থাকিতে হইত (১।১।৩)। বিদ্যার্থী শিক্ষাকালে পাদুকা পরিধান করিতে পারিতেন না (বৌধায়ন, ১।২।৩)। আবশ্যক-মত আচার্য্য বিদ্যার্থীকে বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করিতেন (মনু ৪।১৬৪; জাতক ২।২৫২; গৌতম, ২।৪২—৪৪)।

জাতকে (৪।৪৭৪) দেখিতে পাই যে, উচ্চবংশ-সম্ভূত ছাত্র শিক্ষকের জন্য জল আনিতেছেন, কাষ্ঠ আহরণ করিতেছেন, রন্ধন করিতেছেন। আবশ্যকানুযায়ী সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া শিক্ষকের পদ-সেবা করিতেছেন এবং গুরু-পত্নীর সন্তান প্রসবান্তে প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য সমাধান করিতেছেন।

আচার্য্য ও বিদ্যার্থীর মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রাচীনকালে জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা আচার্য্য সমধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন—(মনু ২।১৪৬)। শিক্ষকও পিতৃ সম্বোধনে সম্বোধিত হইতেন, কারণ তিনি বিদ্যার্থীকে বেদ শিক্ষা দিতেন (মনু ২।১৭১)।

বিদ্যার্থীকে আচার্য্যের ছেলের ন্যায় স্নেহ করিতে হইত, সকল বিদ্যায়ই বিদ্যার্থীকে শিক্ষিত করিতে হইত (আপঃ ১।২।৮)। বিদ্যার্থীর পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইয়া আচার্য্য তাঁহাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই যাহাতে বিদ্যার্থীর মঙ্গল হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে

চিন্তিত হইতে হইত, বিদ্যার্থীর শিক্ষা, আহার ও নিদ্রার দিকে লক্ষ্য করিতে হইত।

আচার্য্য বিদ্যার্থীর নিকট হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। বিদ্যা শিক্ষা সাঙ্গ না হইলে আচার্য্য এই দান গ্রহণ করিতেন না।

ভূমি, সুবর্ণ, গাভী, অশ্ব, ছত্র, পাদুকা, আসন, শস্যদান করা হইত (মনু ২২৪৫, ২৪৬)। মনুর সময়ে নির্দ্ধারিত কোন পারিশ্রমিক ছিল না। অপিচ, কোন আচার্য্য কোনরূপ পারিশ্রমিক দাবী করিলে, অথবা নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে নিন্দনীয় হইতেন (মনু ৩, ১৫৬)।

জাতকে দেখিতে পাই (১৷৬১ ; ২৷২৫২) যে, সকল বিদ্যার্থী পারিশ্রমিক প্রদান করিতেন।

তক্ষশিলায় এক এক আচার্য্যের নিকট পঞ্চশত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন (জাতক ২৷২৮৭, ৪৷৪৪৭ ; ৬৷৫৩৯, ৬৷৩৭৭)। বারাণসীতেও কোন কোন আচার্য্যের নিকট পাঁচ শত ছাত্র থাকিতেন (১৷৪১)। ইৎসিং নামক পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত হইতে দশ সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন (সমসাময়িক ভারত একাদশ খণ্ড)।

নারদ (৭৷১৷২) পাঠে আমরা অবগত হই যে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব চতুর্ব্বেদ ব্যতীত ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, দৈববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা অধ্যাপনা করা হইত। হিউয়েন-সিয়াং নামক জনৈক পর্য্যটক লিখিয়া গিয়াছেন যে, বালক বালিকাগণ সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেই তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে পঞ্চবিজ্ঞান (ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ ন্যায়, ধর্ম্ম) অধ্যাপনা করান হয়।

তক্ষশিলায় ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত (জাতক ১৷৫০, ১৷৮০, ১৷১৩০)। এতদ্ব্যতীত ধনুর্বিদ্যারও শিক্ষা হইত, (২৷২৪১) বারাণসীতে ধর্ম্ম-পুস্তক সংক্রান্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের উপায় ছিল (জাতক ৬৷৩৭৭)।

পাঠ সমাপ্ত করিয়া দেশের আচার ও নীতি শিক্ষার জন্য ছাত্র প্রদেশে গমন করিতেন।

যে সময়েও নির্দ্ধারিত পাঠ্য পুস্তক ছিল (জাতক ৬৷৩৮৮) শূদ্রের বেদে অধিকার ছিল না। ছাত্র নির্ব্বাচনের ও প্রথা দৃষ্ট হয়, গুরু-পুত্র, আজ্ঞানুবর্ত্তী যুবক, ধার্ম্মিক, সাধু, বিশ্বাসযোগ্য, দক্ষ, ধনী, আত্মীয় প্রভৃতিকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত মনু (২৷১০৯)।

বঙ্গ-সাহিত্যে কবি হেমচন্দ্রের দান*

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

হেমচন্দ্র গতযুগের সাহিত্যিক। বাংলাসাহিত্য সে যুগে কতখানি উন্নতি করেছিল এবং সে উন্নতিতে কবি হেমচন্দ্রের দান কতখানি, তা নিরূপণ করতে যাওয়া আমার মত অসাহিত্যিকের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। যদিও এই দুশ্চেষ্টা আমায় করতে হল বন্ধুজনের আদেশ উপেক্ষা করতে না পেরে।

সাহিত্যিক ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা। তাই যুগে যুগে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লব প্রথমে প্রকাশ পায় সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। তারপর বর্ষার জলের মত নদী ছাপিয়ে দুকূল ভাসিয়ে দেয়। যার থেকে আসে দেশে নতুন সম্পত্তি, নবীন জীবন। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ কথা বলা চলে, সাহিত্যই মানবজাতির উন্নতির প্রথম সোপান। এবং জগৎ এই জন্যই সাহিত্যিকগণের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। জগতের এতখানি মঙ্গল যারা করে' থাকেন, তাঁদের মধ্যে কে কত বড়, কে কত ছোট, কে কতখানি বেশী মঙ্গল সৃষ্টি করেছেন, কে কতটুকু কম, তার বিচার করতে যাওয়া এক রকম অসঙ্গতই মনে হ'ত, যদি না

* কবিতীর্থে "বাণী-বন্দনা" সভায় পঠিত।

আমরা দেখতে পেতাম, সাহিত্যিকের ছদ্মবেশে অনেকে মানব সমাজকে সুমুখের দিকে এগিয়ে না দিয়ে পিছনের দিকেই ঠেলে দিচ্ছেন, যদি না আমরা দেখতে পেতাম তাঁদেরই বিষয়বস্তুর ওপর ভাগ বসিয়ে অসাহিত্যিক অনেকে নিজেদের বড় বলে' জাহির করছেন।

সকল দেশের সাহিত্যক্ষেত্রেই এ ব্যাপার ঘটে। এবং এরূপ ঘটবার একটা কারণও আছে। এর কারণ সাহিত্যিক যাদুকর বিশেষ। তাঁর সৃষ্টি মানুষকে মুগ্ধ করে। অরসিককে সাহিত্যিক এনে দেয় রসের সন্ধান এবং পাঠকসাধারণের মনে জাগিয়ে তোলে লেখক হবার প্রেরণা। স্থান-স্থলে দেশে জন্মে বহুসংখ্যক সাহিত্যিক। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি আধটি ছাড়া আর সকলেরই লেখা ঐ দিক্‌পাল সাহিত্যিকেরই লেখার ছায়া মাত্র। সেজন্য তারা গালিও খায় বিস্তর। সবাই বলে, এ বস্তু তোমাদের নয়। এটা হয়েছে পরের ধনে পোদ্দারী। কিন্তু যত গালি তারা খায়, তাঁর দশগুণ দাম বেড়ে ওঠে ঐ মহাকবির অপূর্ব্ব সৃষ্টির। যে জিনিষ যত ভাল, যার দাম যত বেশী, তার ওপর লোভও তত বেশী। ফুল-বাগানে প্রবেশ করে' গোলাপ ফুলটি তুলবার লোভ সবচেয়ে বেশী হয়। তাই বঙ্কিমযুগের কথা সাহিত্যে আলোচনা করলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, ভাব ও ভঙ্গী অনুকরণ করবার কি আপ্রাণ চেষ্টা। বর্ত্তমান সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছায়া প্রায় সর্ব্বত্র।

এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, হেমচন্দ্রের সে সৃষ্টিশক্তি ছিল কিনা। লোকে তাঁর লেখা পড়ে' মুগ্ধ হ'ত কিনা। সাহিত্যিক হবার প্রেরণা তাঁর লেখা থেকে আস্‌ত কিনা। এবং আসল ও মেকি সাহিত্যিক দেশে জন্মেছিল কিনা। আসল সাহিত্যিক যে জন্মেছিল, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত বাংলার শ্রেষ্ঠা মহিলা-কবি স্বর্গীয়া কামিনী রায়। হেমচন্দ্রের লেখা পড়ে'ই তাঁর সাহিত্যিক হবার আগ্রহ জন্মে এবং তিনি সাহিত্যিক হন। কবির জীবনচরিতপ্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়কে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন "আমি বাল্যকালে কল্পনাজগতে, আমার দিবাস্বপ্নে, তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া কল্পনা করিতাম। সত্যসত্যই তিনি আমার মানস-পিতা।" মহিলা-কবির এই কয়ছত্র লেখা পড়ে'ই আমরা বুঝতে পারি, হেমচন্দ্রের লেখা তাঁকে কি রকম মুগ্ধ করেছিল। আর মেকি সাহিত্যিকের ত কথাই নেই। কত যে জন্মেছিল তা বলা যায় না। সমালোচক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন "হেমচন্দ্রের যখন 'হতাশের আক্ষেপ' কবিতা বাহির হইল :—

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে
কাঁদাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে
গগণ মাঝারে শশী আসি দেখা দিল রে।

কবিতায় বাঙ্গালীকে বিমোহিত করিয়া ফেলিল তখন অমনিই :—

আবার আকাশে কেন চন্দ্রিমা উদিলরে ?
গগনেতে কেন চাঁদ তুই উঠিলি ?
আকাশে আবার কেন হাঁসিল চন্দ্রমা ?

প্রভৃতি কত এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক আক্ষেপ—অতি দীর্ঘ, নাতি-দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আসিয়া দেখা দিল।"

হেমচন্দ্রের লেখায় প্রেরণা পেয়ে আসল ও নকল সাহিত্যিকে যে দেশে কত হয়েছিল, তা এর থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়।

বঙ্গ সাহিত্যে হেমচন্দ্রের দান কতখানি তা নির্ণয় করতে গিয়ে আরও দেখতে হবে, তাঁর লেখায় চিন্তার গভীরতা কতখানি, শিক্ষিত মনের খোরাক কি পরিমাণ। তাঁর সমকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা ভাষার ওপর বিরূপ ছিলেন। তাঁদের অভিযোগ বাংলা ভাষায় পড়বার কিছু নেই। ওটা স্কুলপাঠ্য সাহিত্য, নিম্ন-শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদরের জিনিষ। দুটো পয়ার, পাঁচটা পাঁচালী পড়ে' পাড়াগাঁয়ের একজন সাধারণ মুদী হয়ত আনন্দ লাভ করতে পারে, উচ্চ শিক্ষিতের ভোগ্যবস্তু এতে কিছু নেই। কথাটাও সত্য। এবং বাংলা কাব্য সাহিত্যের এই দৈন্য ঘুচিয়ে দেন হেমচন্দ্র। তাঁর চেষ্টায় এ সাহিত্য উন্নতির অতি উচ্চ স্তরে গিয়ে ওঠে। "চিন্তাতরঙ্গিনী", বিশেষ করে তাঁর "দশমহাবিদ্যা" অনেক শিক্ষিত পাঠকের পক্ষেও দুর্ব্বোধ্য। এই কাব্যে কবির চিন্তাশক্তি ও প্রতিভা চরম বিকাশ লাভ করেছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "হেমচন্দ্র

শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি।" স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন "যাঁহারা 'দশ-মহাবিদ্যা' পড়িয়াছেন ও বুঝিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মজিয়াছেন; কিন্তু পড়িয়া বুঝা একটু বিশেষ শিক্ষা-সাপেক্ষ।" এবং অনেকে সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "দশমহাবিদ্যা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।" মানুষের যেমন ও রুচির সঙ্গে সাহিত্যের অতি নিকট সম্বন্ধ তাহাই যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন কোন সাহিত্য চির অমরত্ব লাভ করবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও "দশমহাবিদ্যায়" তিনি যে জীবনসমস্যার বিষয় আলোচনা করেছেন তাতে এ কাব্য যে খুবই দীর্ঘায়ু, এ কথা নিশ্চয় করে'ই বলা যায়।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এখানে একটা কথার উল্লেখ করছি। বিলাতের একজন মনীষী জগতের সকল সাহিত্য ঘেঁটে একশ খানা পুস্তক নির্ব্বাচিত করে বলেছিলেন শিক্ষিত লোকমাত্রেরই এই একশখানা বই পড়া উচিত। আমাদের বর্ত্তমান * সভাপতি মহাশয় সেই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখে বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্য থেকে পঁচিশ কিম্বা পঞ্চাশখানা উৎকৃষ্টতম বই বেছে দেওয়া উচিত। প্রস্তাবটি খুবই ভাল। এতে শুধু পাঠকদের ভাল হয় তাই নয়, এতে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মর্য্যাদাও বৃদ্ধি পায়। কারণ অনেক সময়ে পাঠকদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বই বেছে নেওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়-এবং অনেক ভাল বইয়ের নাম অনেকের অজানাই থেকে যায়। "দশমহাবিদ্যার" দু একটি বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। তারই ফলে বইখানা না পড়ে'ই দু একজন মনে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে' থাকেন। বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির মধ্যে "দশমহাবিদ্যা" যে অন্যতম, এটা খোঁজ নেবার দরকারই মনে করলেন না। উক্ত প্রস্তাবমত কাজ করলে এমনটা আর হতে পারে না।

হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও ছন্দের গতি পরস্পর বিভিন্ন হলেও, স্থানে স্থানে যেন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। তাই যখন "ছায়াময়ী" কাব্যের ভূমিকায় আমরা পড়ি:—

তোমরই চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারই পথে।
তোমারই ভাবেতে বুঝিব তোমারে ধরি এই মনোরথে॥

তখন যেন বুঝতেই পারি না, আমরা হেমচন্দ্রের লেখা পড়ছি কি রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ছি। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হতেই বাংলা ছন্দ পুরাতন মামুলী পথ ছেড়ে দিয়ে নূতন পথে চলতে সুরু করে।

সাহিত্যের মূল্য যাচাই করবার আর একটা দিক এর লোকপ্রিয়তা। শুধু শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধদের নিকট নয়, অশিক্ষিত বালক বালিকাদের নিকট পর্য্যন্ত। আজকাল রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের গান বালক বৃদ্ধ সকলেরই সমান প্রিয়। সে সময় হেমচন্দ্রের কবিতাও সকল শ্রেণীর নিকট এই রকম আদর লাভ করেছিল, খেলতে, বেড়াতে, সময়ে, অসময়ে, ছেলেরা হেমচন্দ্রের কবিতার ছড়া আবৃত্তি করত, এমন কি নিরক্ষর রাখালগণ পর্য্যন্ত মাঠে মাঠে গেয়ে বেড়াত:—

কে তুমি রে বল পাখী
সোণার বরণ মাখি,
আকাশে উধাও হয়ে
মেঘেতে লুকায়ে রয়ে,
এত সুখে মধুমাখা সঙ্গীত শুনাও।

এবং আজও পল্লীগ্রামের অনেক ঠাকুরদাদা রুগ্না-শীর্ণা নাতনীদের তামাসা করে' বলে থাকেন:—

জলোচ্ছ্বাসে পুষ্টদেহ তেলে জলে মেয়ে
হায় হায় ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

এই হেমচন্দ্র লাইব্রেরীরই এক সাধারণ অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করতে এসে শ্রদ্ধেয়া লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মহোদয়া বলেছিলেন "আমরা যখন ছোট ছিলাম রবিবাবুর কবিতার তখনও তত প্রচলন হয় নি। উঠ্‌তে বস্‌তে আমরা তাই হেমচন্দ্রের কবিতার আবৃত্তি করতাম। সকালে কারও ঘুম থেকে উঠ্‌তে দেরী হলে আমরা তাঁর কবিতার ছড়া বলে ঘুম ভাঙাতাম—

উঠ উঠ, প্রভাত হইল বিভাবরী।

মাকে ডাকতাম—

উঠ মা জননী　　আঁধার রজনী
এবার ঘুচিয়া গেল!

হেম-সাহিত্য বাঙ্গালীর হৃদয়কে কতখানি দখল করেছিল তা এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি এবং একটু অনুমান করতে পারি, বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের দান কতখানি।

* ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পরিচয় ও আহ্বান

আমাদের বাঁচ্‌তে হ'লে দশজনের ভাল মন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্য অর্থই সম্বল নয়, ধর্ম্মের আশ্রয় নিতে হবে। আমরা তাই মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনা জাগিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেককে স্বাবলম্বনের সাধনায় মাথা তুল্‌তে বলি।
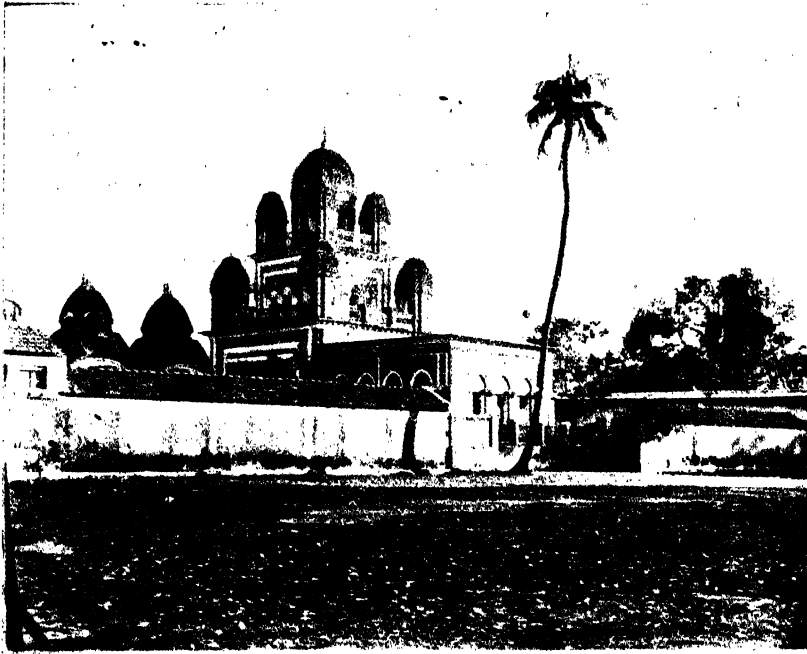
প্রবর্ত্তক যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির—চন্দননগর

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে দীর্ঘ দিন চলে আস্‌ছে। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজ-সংস্কারক নয়, একটী ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান। ধর্ম্ম ব'লতে যে সমস্যা, সঙ্ঘের তাহা নাই; কেন না, ভাগবত ধর্ম্মেই তাদের দীক্ষা, আনুষ্ঠানিক আচার ও লৌকিক রীতি নীতির দিকে নজর দেওয়া, ভগবানে আত্মসমর্পণ যে করে উহা তাহার অধর্ম্ম। কেন না, জীবন-যন্ত্রের নিয়ন্তার হাতে সকল যন্ত্র তুলে দেওয়ার পর, তার নিজের আর করার কিছু থাকে না, সবই করেন শ্রীভগবান।

ভগবান অন্যায় ও অহিতও তো কিছু করাতে পারেন, এই সংশয় আত্মসমর্পণ-যোগ-দীক্ষিতের নয়। ভগবানকে তারা দেখেছে সর্ব্বভূত-মহেশ্বর রূপে; কাজেই সর্ব্বভূতহিতরত জীবনই যোগীর সত্য অভিব্যক্তি।

ধর্ম্মই এখানে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে দুই প্রকারে। আমরা সেই প্রকাশের দিক্‌টাই সর্ব্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করছি।

ভগবানের লয় নাই, নির্ব্বাণ, মোক্ষ নাই। তিনি সৎ-এর বিগ্রহ, নিত্য, শাশ্বত। সকল সম্ভাবনা তাঁতেই বিদ্যমান। অতএব নর-দেহধারণও মনুষ্য-যুক্তির অন্তর্গত না হ'লেও, আত্ম-সমর্পণ-যোগী ভগবদ্‌-বাণী বিশ্বাস করে—"সম্ভবামি যুগে যুগে" তিনি যদি নর-দেহ ধারণ করেন, জীবের লয় হওয়া সম্ভব নয়। তবে এই সনাতন ভাবে জীবের বাসনা ও অহঙ্কারের লয় বা নির্ব্বাণ যুক্ত-যোগী স্বীকার করে। এই সাধনার পথে "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" চল্‌তে সুরু করেছে, ১৯১০খৃঃ থেকে। আজ এই ভাগবত-ধর্ম্ম-রূপেই যাহা অনুভূত হয়, তাহাই নিবেদন কর্‌ছি।

জীবন আমার জন্য নয়, সমগ্র মনুষ্য-জাতির জন্য; আর আমার লক্ষ্য সেই অমৃতময় তত্ত্বে আমার সবখানিকে সংযুক্ত করে দেওয়া। সে পথও তাঁরই নির্দ্দেশে দেখি, চলার ভঙ্গী তিনিই প্রতিদিন দেখান—তাই আত্মসমর্পণ-যোগী নির্ভীক।

উপস্থিত, ভাগবত চেতনা মানুষের মধ্যে জাগ্রত ক'রে সর্ব্ববিধ দুঃখের প্রতিকার অতীতের ন্যায় কেবল শাস্ত্র অথবা ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা তিনি চাহেন না। তিনি চাহেন—প্রত্যেকের মুখে ভাষা দিতে, পুরুষ নারীকে বর্ণজ্ঞানে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দিতে; তাই তাঁর এক হাতে শিক্ষা—আর কেহই দারিদ্র্যের কষাঘাত না সহ্য করে, অন্নপূর্ণার রাজ্যে বুভুক্ষু নরনারীর চিহ্ন না থাকে, তাই অন্য হাতে তিনি নিয়েছেন স্বাবলম্বনের সিদ্ধ যন্ত্র। শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার উপরই ঐশ্বর্য্য-সম্পদের প্রতিষ্ঠা মঙ্গল ও কল্যাণের কারণ হয়—তাহাই ভাগবৎ প্রকাশ; অন্যথা আসুরিক সম্পদ্ মানবের দুঃখ ও ব্যথা সৃষ্টি করে। এই জন্যই আমরা যে সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছি, তাহা মানুষের অধ্যাত্ম-সাধনার ভিত্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। এই স্বপ্ন সিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য নয়, তবে কালসাপেক্ষ। ইহাই শাশ্বত; এই জন্য অসাধারণ ধৈর্য্য ও সাহস যাদের, তারাই এই পথের যাত্রী।

প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থী-ভবন—চন্দননগর

নিঃস্ব হ'য়েই ভগবানের পথে নামতে হয়। সঙ্ঘের সে ইতিহাস এখানে উল্লেখ-যোগ্য নয়। তবে একটা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য সর্ব্বত্যাগী পুরুষ নারীকে সাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত দেখে, ইহার সত্য রূপটী অনেকের চক্ষে এড়িয়ে যায়। আমরা বলি—শ্রীশঙ্করের বেদান্ত-প্রচার যেমন তাঁর ধর্ম্মাঙ্গ, শ্রীচৈতন্যের নামকীর্ত্তন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমৃতশীতল কণ্ঠের উপদেশ যেমন ধর্ম্মকেই মূর্ত্তি দিতে চেয়েছে, সঙ্ঘের অর্থপ্রচেষ্টাও তদ্রূপ ধর্ম্ম। অন্ন-সংস্থানের আশ্রয়েই এ যুগে নরনারীকে ধর্ম্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রতে হবে। সঙ্ঘের নারী পুরুষ এই জন্যই

প্রবর্ত্তক আশ্রম—চন্দননগর

সর্ব্বত্যাগী হ'য়েও অর্থ-নীতিক ক্ষেত্রে মৃত্যু-পণে দাঁড়িয়েছে। যে একদল লোক আজ উদ্যত, তাদের সেবার অধিকার দেশবাসীকে দিতে হবে।

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কন ক'রে এই আনুকুল্য প্রার্থনা করছে না। তার প্রতিষ্ঠানগুলি সত্যই বাংলার অনেক কর্ম্মীর আদর্শ স্বরূপ। উপস্থিত শিক্ষা-ক্ষেত্রে সঙ্ঘের প্রচেষ্টা যাহাতে সংসিদ্ধ হয়, তাহার জন্যই আমরা সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রবর্ত্তক নারী-মন্দির—চন্দননগর

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দেশের বেকার-সমস্যা দূর করতে অগ্রসর হয়েছে; শিক্ষা-কেন্দ্রেও জাতি, ধর্ম্মের গণ্ডী রাখে নাই। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সম্মুখে অস্পৃশ্য
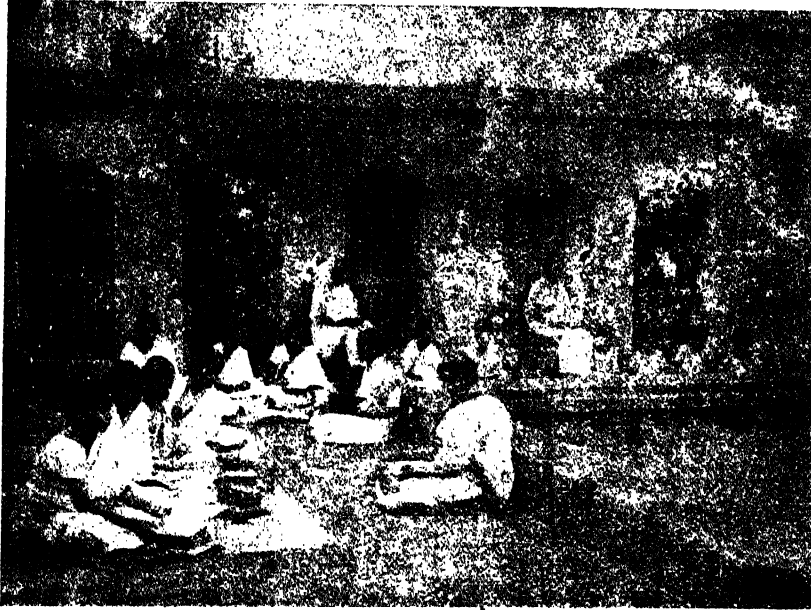
আমরা দীর্ঘ দিনের তপস্যায় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানটীকেই স্বাবলম্বী ক'রে তুল্‌তে পেরেছি, আর পেরেছি, আমাদের যেটুকু সামর্থ্য আছে, তা দিয়ে, পাটের গুদামে ও চাষে, সুন্দরবন, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কেন্দ্রের কৃষিক্ষেত্রে অসংখ্য শ্রমজীবীকে অন্ন দিতে। কাঠের কাজ, ছাপাখানা প্রভৃতি বহু প্রকার ব্যবসার ক্ষেত্রে আজ অসংখ্য লোক অন্ন-সংস্থান করছে। কিন্তু সঙ্ঘের প্রাণ-শক্তি ইহাতেই নিঃশেষ হয় নি। অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানে যাঁরা আছেন, তাঁদের উপার্জ্জন-শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যমত বেকার-সমস্যার সমাধান হবে। শিক্ষা, সাধনার ক্ষেত্রেও

প্রবর্ত্তক ভবন কলিকাতা

ব'লে কোন বস্তু নাই। শ্রম-প্রতিষ্ঠানে কেবল কলিকাতায় ১১ জন তন্তুবায়, ৩৫ জন বাগ্দী, ক্যাওড়া ২৪ জন, রজক ১ জন, কৈবর্ত্ত ১ জন, গোপ ১১ জন, মুচি ১ জন, সদ্গোপ ২ জন, মুসলমান ১৮ জন ও ডোম ১ জন কাজ করে। চন্দননগরের কারখানায় ৭৩ জন জল অচল জাতি অন্নের সংস্থান করে। সুন্দরবনের কৃষি বিভাগে পোদ ১২ জন, ক্যাওড়া ২৭ জন কাজ করে। আমাদের কণ্ট্রাক্টরী কাজে কৈবর্ত্ত ৬ জন, ক্যাওড়া ২০ জন, সাঁওতাল ১৫ জন জীবিকা-নির্ব্বাহের সুযোগ পেয়েছে। ইহা ব্যতীত, ময়মনসিংহে, চট্টগ্রামে, পাটের

নামে একখানি গ্রামে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটী বিদ্যালয় ও আর একটী কেবল বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় করা হয়েছে। প্রথমটীর ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা ৬০, দ্বিতীয়টীর ছাত্রী-সংখ্যা ৪০।

কুতুবদিয়া অক্ষরজ্ঞানহীন ক্ষেত্র ছিল। উপস্থিত ঐ স্থানে তিনটী বিদ্যালয় সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে। জোলাদের জন্য একটী, উহার ছাত্র-সংখ্যা ৪০, ডোমেদের জন্য একটী, উহার ছাত্র-সংখ্যা ৩০, কৈবর্ত্তদের জন্য একটী, উহার ছাত্র-সংখ্যা ৩০।

সাতবেড়িয়া স্কুলে কেবল জোলাদের ছেলে মেয়ে

প্রবর্ত্তক আশ্রম—খাদি বিভাগ, চট্টগ্রাম

কাজে, খাদিতে শত শত অস্পৃশ্য ও মুসলমান জীবিকার্জ্জন করে। প্রেসে ও অফিসে ভদ্রবংশীয় সন্তানগণ একান্ত নিজের ব্যবসা ব'লেই সসম্মানে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত আছেন। এইগুলি উপস্থিত সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের তপস্যায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। কয়েকটী প্রয়োজনের তাগিদে আজ আমাদের মর্ম্ম-নিবেদন জ্ঞাপন করছি।

চট্টগ্রামে কয়েকটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়েছে, শাখপুরায় তিনটী বালক বালিকার জন্য, উহাদের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা একশত পনের জন। আর একটী কেবল বালিকাদের জন্য, উহার ছাত্রী-সংখ্যা ৬১ জন। গোমদণ্ডী

৭০ জন শিক্ষা লাভ করছে। বাঁশখালিতে কৃষক ও শ্রমিক বিদ্যালয়ে ৫০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে।

সুন্দরবনে এ পর্য্যন্ত কোন শ্রমিক বা কৃষকের ছেলে মেয়ে বর্ণমালার নাম জানতো না; সেখানে দুটী বিদ্যালয় আছে, প্রায় দেড়শত ছাত্র ছাত্রী তাহাতে পড়ে। ময়মনসিংহের মেলেন্দাহ গ্রামে ও বর্দ্ধমান জেলার রায়না গ্রামে স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

এই সকল ব্যতীত চন্দননগরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও চট্টগ্রামের আশ্রমেও একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চন্দননগরে দুইটী পাঠশালাতে অন্যূন ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা পায়।

প্রবর্ত্তক আশ্রম, কুতুবদিয়া চট্টগ্রাম

সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য চন্দননগরে চতুষ্পাঠী স্থাপনা হয়েছে। উপস্থিত দুই জন অধ্যাপক আছেন। প্রতি বৎসর ছাত্র ও ছাত্রী যথারীতি পরীক্ষা দিচ্ছে। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শীঘ্রই স্থাপিত হবে।

অবৈতনিক গ্রন্থাগার সর্ব্বত্রই আছে। চন্দননগরের গ্রন্থাগারে ৪৪৬ গ্রাহক সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে। পাঠাগারে নানা দেশের শত খানি দৈনিক, মাসিক-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ পাঠের সুবিধা পায়।

প্রবর্ত্তক আশ্রম, মেলান্দহ, মৈমনসিং

এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা নাই। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র অর্থপ্রতিষ্ঠান হ'তে ইহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু দেশের শিক্ষা ব্যাপারে আমাদের পরিপূর্ণ শক্তি নিয়োগ ক'রতে পারলে আশাতীত ফল পাওয়া যাবে। মুমূর্ষু দেশের এই শিক্ষাদানের উৎসাহটুকু যদি সাধারণের যথাসময়ে সহানুভূতির অভাবে নিভে যায়, ইহা শত চেষ্টায় ফুৎকারে ফুৎকারে জ্বল্‌বে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

বিশেষ ব্যবস্থা চাই, দেশের মেয়েদের শিক্ষায়। এমন মর্ম্মন্তুদ্ পত্রাদি আসে, যাহা সত্যই হৃদয় দ্রব করে। বাংলার মেয়েরাও যদি শিক্ষার অভাবে উন্মার্গগামিনী হয়, দুঃখের কথা আর কি আছে! আমাদের সঙ্ঘে এখন

প্রবর্ত্তক-আশ্রম-সুন্দরবন

৩২ জন ছাত্রী ও সঙ্ঘ-সেবিকা বাস করে। তাদের স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা চাই। কয়েকটী উচ্চ-হৃদয়া নারী এই প্রতিষ্ঠানে আত্মদান করেছে; তাদেরও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের প্রসারতা চাই। ইহা ব্যতীত সঙ্ঘে একটী ব্রতী বিভাগ আছে। এই ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর পাঁচটী ম্যাট্রিক পাশ ছাত্র গ্রহণ করা হয়। দুই বৎসর কাল শিক্ষান্তে তাহারা যাতে ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হ'য়ে স্বাবলম্বী হ'তে পারে, তারই জন্য ইহার ব্যবস্থা। এই বিভাগটী বর্ত্তমান দুরবস্থার দিনে অনেক তরুণের আশার কেন্দ্র হয়েছে।

এই সকল কর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত করে' তোলার জন্য, আমরা দেশের বরণীয় হৃদয়বান্ ভদ্র মহোদয়দিগকে আহ্বান করি। দেশের সহৃদয়া মহিলাবৃন্দও আমাদের কাজে হস্ত প্রসারিত ক'রলে অধিকতর সুখী হ'ব।

আমাদের এই বৃহৎ কর্ম্ম-সাধনের জন্য কেবল দাতাকেই ডাক দিচ্ছি না, সঙ্ঘের এই সমস্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠাতা ও পরামর্শদাতা রূপে আমরা দেশের বরণীয় সন্তানদের আহ্বান দিচ্ছি। তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অধ্যাত্ম-জাগৃতির সঙ্গে শিক্ষাবিস্তার-কার্য্য সুসিদ্ধ করতে হবে।

আমরা চাহি কয়েকজন সঙ্ঘের অনুরাগী বন্ধু, যাঁরা সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত হ'য়ে ধারাবাহিক ভাবে এই কার্য্যে সহায়তা করবেন। সঙ্ঘের পোষণ-ভার কাহাকেও নিতে হবে না; ব্যাপক ভাবে কার্য্য করার সুবিধা যদি হয়, রাজা প্রজা সকলেরই চাওয়া আমরা সাধ্যমত সিদ্ধ ক'রতে পারবো। আর সঙ্ঘের কর্ম্মী যাঁরা তাঁরা দীর্ঘদিন শিক্ষায়, সাধনায় যথা-সম্ভব নিষ্কাম-চিত্ত।

প্রবর্ত্তক-আশ্রম—রায়না (বর্দ্ধমান)

ইঁহাদের জন্য বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র-নির্মাণের সহায়তায় আমাদের অনুরাগী বন্ধুগণ কি কুণ্ঠা করবেন?

ইতি—

শ্রীমতিলাল রায়

অপরাধিনী

শ্রীসন্তোষকুমার দে এম-এ

যারা সবল, সুস্থ ও সক্ষম তারাই জীবনযুদ্ধে টি'কে যাবে। শক্তিহীনের ঠাঁই নাকি কোনখানেই নেই, ভগবানের রাজ্যেও আছে কিনা তাও বোধহয় কেও ঠিক করে' ব'লতে পারে না। যোগ্যতমের অধিষ্ঠান সব যায়গায় নাকি দেখা যায়—তা সে পশুপক্ষীর মধ্যেই হোক আর গাছ-পালার মধ্যেই হোক। এই তত্ত্ব সব চেয়ে বেশী সত্য হ'য়ে ফুটে উঠেচে মেয়ে মানুষের বেলায়। মেয়েদের স্বভাবে যে এত মাধুর্য্য, কণ্ঠে যে এত অমৃত, হাসিতে যে এত শোভা, গঠনে যে এত লালিত্য, সেও নাকি তাদের দৌর্ব্বল্যের জন্য। সেই আদিম অখ্যাত দিবসেও নাকি পুরুষ তার পরুষস্বভাব নিয়ে নারীর কাছে উপস্থিত হ'য়েছিল; তার কঠোর ব্যবহারে ভীত হ'য়ে অবলা নারী তাকে নানা উপায়ে তুষ্ট করতে চেষ্টা ক'রত। সেই যুগ-যুগব্যাপী মনোরঞ্জনের ফলে নারীর নাকি এত কোমলতা, এত দুর্ব্বলতা! নারীর দুর্ব্বলতার এই হ'ল যখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, নারীর তখন চিরদিন পুরুষের অধীন হ'য়ে থাকা, নীরবে সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? তাই অভাগিনী মলিনা অকারণে স্বামী-পরিত্যক্তা হ'য়ে কেঁদে বুক-ভাসান ছাড়া আর কি করবে, ভেবে উঠ্‌তে পারে না।

সে আজ কতদিনের কথা, যেদিন সে তের বছর বয়সে মাথার সিঁদুরের সঙ্গে এক মাথা ঘোমটা টেনে একটা অচেনা অজানা পুরুষের সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধে প্রথম শ্বশুর বাড়ী এল। শ্বশুর-বাড়ী প্রথম প্রথম সকলে আদর যত্ন পায়, এই তার ছিল ধারণা; বা'র-বাড়ীতে পা দিয়েই মনে হ'তে লাগ্‌ল, সেটা একটা মস্ত-বড় মিথ্যে কথা। অনেকক্ষণ পাল্কীর ভেতর ব'সে আছে, কেও এল না দেখে সুবোধ নিজেই আস্তে আস্তে গাঁট-ছড়াটা খুলে ভেতরে চলে' গেল। সুবোধের মা'র মুখে আজ প্রলয়ের মেঘ দেখা দিয়েছে।...

ছেলে হ'য়ে যে মা'র সঙ্গে এমনি আড়াআড়ি কর্‌তে পারে, এমন কথা কখনও মনে ভাবি নি। কত না বারণ করেছিলাম যে সে ঘরে বিয়ে না কর্‌তে, তবু ছোঁড়া সেই কাজ কর্‌ল, একটা গরীবের মেয়ে বিয়ে করে' নিয়ে এল। তাও কি একটা খবর আগে থেকে দিলে, তাও নয়; কেন খবর দিলে, আমি ত আর আটক করতে যেতাম না; একথা সে জান্‌ত, তবু খবর না দিয়ে একেবারে বউ নিয়ে এসে হাজির! কেন, সে ছেলে হ'য়ে মাকে ত্যাগ করতে পারে, আর আমি মা হ'য়েছি ব'লেই কি এত অপরাধ কর্‌লাম? সম্বন্ধ রাখ্‌লেই সম্বন্ধ, সুবোধ যখন সম্বন্ধ কেটে ফেলেছে তখন আমি আর তা মাঝ থেকে জোড়া দিতে যাই কেন? কত আশা করেছিলাম, ছেলের বিয়েতে একটা গাদা টাকা পাব, সে সব মাটি কর্‌ল হতভাগা; কেন, ভাল সম্বন্ধ ত এসেছিল, মেয়ে না হয় একটু কাল, তা কাল' আর কি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যেতে পারে! কাল বউ কি আর বউ নয়, না কাল মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে না! টাকাটা ত তারা কিছু কম দিচ্ছিল না, এক গাদা টাকা। ওখানে বিয়ে কর্‌লে ছোঁড়ার একটা হিল্লে হ'য়ে যেত, তা কর্‌বে কেন? ক'লকাতা থেকে একটা হা-ঘরের মেয়ে ধ'রে এনেছে, এখন আমাকে গিয়ে বরণ করে' ঘরে তুল্‌তে হ'বে। আমি বাপু প্রাণ গেলেও তা পার্‌ব না; ছেলের মুখ দেখ্‌ব না, বউ'রও না। আমি বিধবা মানুষ, আমার ভাবনা কি, দুটি দুটি খেয়ে এক কোণে পড়ে' থাক্‌ব, আর হরিনাম কর্‌ব।...

ঘরে খিল দিয়ে বরদাসুন্দরী এমনি ধারা কত কথা

ভাব্ছিলেন। আর মনে মনে গর্গর ক'রছিলেন। এমন সময়ে দুয়ারে ঘন ঘন ঘা পড়্তে লাগ্ল, ঘায়ের ওপর ঘা! প্রতিজ্ঞা করে' বসে' আছেন, খিল আজ কিছুতেই খুল্বেন না। দুয়ার ঠেলায় বিরাম নেই! শেষে বিরক্ত হ'য়ে, মুখভার করে' ঘর, থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন, কেন বাপু, আমাকে আর ডাকা কেন, আমি ত এ বাড়ীর কেও নই, দাসী বাঁদী একটা পড়ে' আছি, আমাকে আবার ডাক্তে আসা কেন? তুই থেকে তোর দাদার বিয়ে দিয়েছিস্, তুই বউ নিয়ে ঘরে তুল্গে। লক্ষ্মী বল্ল —মা, আমার ওপর অনর্থক রাগ কর্ছ কেন? এ বিষয়ে তুমি যেমন জান, আমিও তেমনি জানি; দাদা ত বিয়ে কর্বার সময় আমার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে' যায় নি। যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, এখন রাগ করে ঘরে ব'সে থাক্লে লোকে কি ব'লবে বল ত? বল্তে বল্তে লক্ষ্মী একরকম জোর করে' মাকে টেনে নিয়ে গেল। পাল্কীর কাছে গিয়ে বউয়ের সুন্দর কচি মুখখানা দেখে বরদাসুন্দরীর রাগটা যেন অনেকটা পড়ে' গেল; পাছে একেবারে রাগটা ঝেড়ে ফেল্লে গাম্ভীর্য্যটুকু নষ্ট হ'য়ে যায়, তাই মুখটা একটু ভারী করে, যেন দায়ে পড়ে' বউকে বরণ করে' তুলে নিয়ে এলেন। মলিনার মুখে কি একটা ম্লান সৌন্দর্য্য ছিল, যাতে করে' অমনধারা দুর্জ্জয় শাশুড়ীকেও সে একটি পলকে জয় করে' ফেল্লে। কেমন করে' যে এটা সম্ভব হ'ল, তা মলিনাও একবার ভাবে নি, মলিনার শাশুড়ীও একবার তলিয়ে বুঝ্বার চেষ্টা করেন নি।...

সুবোধ লোকটা ছিল নিতান্ত মন্দ নয়। যদিও ছেলেবেলা চিরকালটা 'স্কুলে যাই বলে' বাড়ী থেকে বেরিয়ে, সারাদিন ডাণ্ডাগুলি খেলে, পরের বাগানে আম-জাম চুরি করে' খেয়ে আবার চারটের সময়ে আর পাঁচটা ছেলের মতন রোজ বাড়ী ফির্ত; তারপর আর একটু বড় হ'লে মা'র আঁচল থেকে টাকাটা, সিকেটা চুরি করে' বিড়ি সিগারেট টান্তে শিখেছিল; শেষে বারবার ক্লাসের পরীক্ষায় ফেল্ হ'চ্ছে দেখে বাপ স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এনে নিজের কাছে বসিয়ে মুগ্ধবোধ পড়াবার অনেক চেষ্টা করে'ও বিফল হ'য়েছিলেন; তবু বল্তে হ'বে, সে নিতান্ত মন্দ লোক ছিল না। বাপ মারা গেলে হঠাৎ সংসারের কর্ত্তা হ'য়ে পড়ায় দিনকতক কাপ্তেনী করে' যা ছিল ফুঁকে দিলেও, ব'ল্তে হ'বে তার মনটা খুব সরল ছিল, পেটে এক আর মুখে আর কাকে বলে সে জান্ত না। কিন্তু তার দোষ ছিল একটা মস্ত-বড়। সে ছিল মহা একগুঁয়ে; একবার যাকে হাঁ বলেচে, পৃথিবী উল্টে গেলেও তার কাছে তা না হবার যো নেই। গোঁয়ারও ছিল কিছু কম নয়; আর ভয়টা কাকে বলে, মোটেই জান্ত না। তাই অনেক টাকা ওড়াবার পর মা'র কাছে এসে বল্লে, দোকান কর্বে, তাকে গহনা বেচে পাঁচশ' টাকা দিতেই হবে, না দিলে যুদ্ধে চলে' যাবে, আর দেশে ফির্বে না; আর সেই কথা শুনে তার মা যখন মুখের ওপর তাকে যুদ্ধে চলে' যেতে বল্লেন, তখন তার সমস্ত মনটা এককালে মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্ল। আর এক মিনিট দেরী না করে' সে নাম লিখিয়ে দিয়ে এল। যাবার দিন মা'র সঙ্গে দেখাও কর্লে না।...

সেখানে গিয়ে দেখ্লে, কাজটা বড় সুখের নয়; তাই চেষ্টায় ফির্তে লাগ্ল, কি করে' পালান যায়। মাস কতক পরে, অনেক কষ্টে, চোক খারাপ বলে' ডাক্তারের এক সার্টিফিকেট দিয়ে, যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে সে বাড়ী ফিরে এল। বাড়ী পালিয়ে এল বটে, কিন্তু সরকারের একটা কাজ সে করেছিল—অনেকগুলো লোক যুদ্ধের জন্য সংগ্রহ করে' দিয়েছিল। তাই যুদ্ধ যখন থেমে গেল, সরকার তার কাজে সন্তুষ্ট হ'য়ে তার একটা উপকার কর্তে চাইলেন। চাকরী করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু লেখাপড়ার সঙ্গে ছেলে বেলা থেকেই বনি-বনাত না হওয়ায় ওদিকে সুবিধে হ'ল না; শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে কিছু টাকা যোগাড় করে' সে আব্গারী দোকান একখানা ডাক নিল, দিনকতক পরে আরও খান দুই মদের দোকান নিল। বেশ লাভ হ'তে লাগ্ল, সংসারে আর কষ্ট নেই। মাসে হাজার বারশ' টাকা সুবোধের আয়। মা'র কাছে সুবোধ আবার সুবোধ ছেলে হ'ল। তার গুণগান আর মায়ের মুখে ধরে না। এমন ধারা ছেলে নাকি আর কারও হয় না, তাঁরই যা একটা ভুলে হ'য়ে গিয়েছে; সুবোধ নাকি লাট-বেলাটের সঙ্গে আড্ডা দেয়, এই রকম

নানান সম্ভব অসম্ভব কথা পাড়ায় সবিস্তারে বলে' বেড়ান। সুবোধও বুক ফুলিয়ে বলে' বেড়ায়, বাবা দিনরাত টোলে ছেলে ঠেঙ্গিয়ে, আর চাটুর্য্যে হ'য়ে ভশ্চায্যির কাজ করে'ও মাসে একশ'টা টাকা ঘরে আন্‌তে পার্‌তেন না, আর আমি তস্য-পুত্র সুবোধচন্দ্র বিদ্যা-বুদ্ধিতে 'দ্বিপাদোঽপি চতুষ্পদঃ' হ'য়েও পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে' থেকে মাসে এতগুলো করে' টাকা আন্‌চি: লেখাপড়া শিখে আজকাল কিছু হবার যো নেই, সেটা আগে থেকে জান্‌তে পেরেছিলাম বলে'ই ওদিক্ দিয়ে আর হাঁটিনি; বাবা অতবড় পণ্ডিত হ'য়েও এই সামান্য কথাটুকু বুঝ্‌তে পারেন নি, তাই অতকষ্ট করে' "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং" আমার মুখ দিয়ে আওড়াবার চেষ্টায় ছিলেন।...

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলখানা ড্রয়িংরুমে পরিণত হ'ল। দিনরাত আমোদ আহ্লাদ, নাচ গান চল্‌তে লাগ্‌ল। পাড়ার লোক মনে কর্‌তে লাগ্‌ল, হবেও বা সুবোধ লাট সাহেবের এয়ার, নইলে এত টাকা রোজকার ক'রবে কি করে। অবস্থা ফিরেছে; কাজেই, বিয়ের সম্বন্ধ দু'চারটে করে' আস্‌তে লাগ্‌ল। একদিন ক'লকাতায় ফূর্ত্তি কর্‌তে গিয়ে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল—পাড়ায় এক গরীবের কন্যাদায়ের কথা পেড়ে বস্‌লেন, বল্‌লেন তুমি না বিয়ে কর্‌লে ভদ্রলোকের জাত-রক্ষে হয় না। মলিনাকে দেখে সুবোধের পছন্দ হ'ল। মাকে খবর না দিয়ে একেবারে বিয়ে করে' ফেল্‌লে। গরীব শ্বশুর মেয়েকে কিছু দিতে পারে নি, সুবোধ সেটা ঢাক্‌বার জন্য নিজেই দু-চারখানা গহনা দিয়ে বউ নিয়ে বাড়ী হাজির হ'ল। মলিনার বাবা যখন টাকা দিতে পার্‌বেন না, ছেলে দেখ্‌বার তাঁর কোন দরকার নেই, কাণা হোক, খোঁড়া হোক, যার তার কাছে দুটো ফুল দিয়ে বিক্রী করে' তার আইবুড়ো নামটা ঘুচিয়ে নিজের জাত রক্ষা করাই হ'ল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই যখন এই অভাবনীয় ঘটনা ঘট্‌ল, তিনি আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠ্‌লেন। এক পয়সাও না দিয়ে রোজগারে জামাই কর্‌তে পেয়েছেন, এটা কি তাঁর পক্ষে কম বাহাদুরীর কথা!...

মলিনা শ্বশুরবাড়ী এল। গরীবের মেয়ে বড় সঙ্কোচে থাক্‌তে হয়, পাছে কোন দোষ ত্রুটি হ'য়ে যায়। একে ত তার বাপ কিছু দিতে পারেন নি, তার খোঁটা ত লেগেই আছে; তার ওপর যদি কোন কাজ-কর্ম্মের খুঁৎ হয় তা হ'লে কি আর রক্ষে আছে? তাই সে প্রাণপণে সকলের সেবা করে', সকলকে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে সর্ব্বদা ব্যস্ত। স্বামীকে যে সে শুধু ভালবাসে তা নয়—স্বামীকে আর কোন হিন্দুর মেয়ে না ভালবেসে থাকে, তাতে তার কিছু বিশেষত্ব ছিল না। স্বামীর ওপর তার মস্তবড় কৃতজ্ঞতা এসে পড়েছিল। বিয়ে হবার ত তার কথা নয়, আর হ'লেও একটা কাণা খোঁড়া ছাড়া তার দাবী কর্‌বার আর কি ছিল? রূপ ছিল বটে, তা রূপের চেয়ে রূপচাঁদের দাম বাজারে যে বেশী; বয়স অল্প হ'লেও সেটা বিলক্ষণ সে টের পেয়েছিল। সুবোধ তার বাপ মায়ের জাত রেখেছে, একথা ভাব্‌লেও গৌরবে তার বুক ফুলে' উঠ্‌ত। তাই সম্ভ্রম, কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, আবেগ, এই সবগুলো এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে গিয়ে বেচারাকে মাঝে মাঝে বড় বিব্রত করে' ফেল্‌ত। এতটা জড়সড় ভাব সুবোধের বড় ভাল লাগ্‌ত না। দিন তার একরকমে কেটে যেতে লাগ্‌ল, কখন শাশুড়ীর হাজার সেবা করে'ও মুখঝাড়া, গাল খেয়ে, কখনও বা আদর পেয়ে। আদর সে যেটুকু পেত, সেটা যে তার প্রাপ্য, এমন ভাব্‌বার ধৃষ্টতা তার ছিল না: তবে, যেটুকু পেত, সেটুকু উপরি পাওনা ব'লেই মনে ক'রত; কাজেই আদর-সোহাগে বড় তাকে একটা গলাতে পারত না, আর গালাগালিও তাকে বড় বিচলিত ক'র্‌তে পার্‌ত না। ধারণা তার গোড়া থেকেই হ'য়ে গিয়েছিল, এ সংসারে আস্‌বার তার কথা নয়; তবে যে এসে পড়েছে, সেটুকু তার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের ফলে। যে কষ্টের সংসারে সে মানুষ হ'য়েছে, তাতে কষ্ট যে আর নতুন করে' তাকে বেদনা দেবে, এ ভয় তার মোটেই ছিল না; এখানে কষ্ট বলে' যদি কিছু থাকে, আগের তুলনায় সেটা সুখ, এবিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। এই ভাবে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ভেতর দিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিবাহিত জীবনের প্রথম বছর কেটে গেল। দ্বিতীয় বছরও যায়-যায়। এতদিনে যেন

মলিনার মনে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। এখন কৃতজ্ঞতাকে ছোট বোধে, ভালবাসাকে সে বড় করে' দেখ্‌তে শিখেছে। যে হৃদয়ে এতদিন কৃতজ্ঞতা সবখানটা জুড়ে, আসন পেতে ব'সেছিল, আজ সেখানে শুধু ভালবাসাই দেবতা হ'য়ে জেগে উঠেছে। মেয়েমানুষ হ'লেও সেবার মতন ভালবাসায় যে তার অধিকার আছে, এমন ধারণা অল্পে অল্পে তার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে' বস্‌ল। এতদিন দাসীভাবে, শুধু সেবার অধিকারী ব'লে সে নিজেকে জান্‌ত; এখন আর তা পারে না, সেবার সঙ্গে তার নারীত্বের দাবী যেন তাকে জাগিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল। এখন যেন সে মুখ ফুটে' সকলকে ব'ল্‌তে চায়, তাকে যে ছোট্ট অধিকারটুকু অসঙ্কোচে, অযাচিতভাবে দেওয়া হ'য়েছে, সেটা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে চল্‌বে না; সেটা সে নিজের অধিকারে রখে্‌তে চায়, জীবন থাক্‌তে সেই ছোট অধিকারটুকু কাওকে ছেড়ে দিতে পার্‌বে না, প্রাণের চেয়ে প্রিয় ঐ দাবীটুকু। তাই আগে যাকে উপেক্ষার চোখে দেখ্‌ত, এখন আর তা পারে না।...

বিয়ে হবার মাসকতক পরেই মলিনা জান্‌তে পার্‌ল, তার স্বামী চরিত্রহীন। এতদিন মনে করে' এসেছিল, পুরুষমানুষের অনেক খেয়াল আছে, এটাও সেইরকম একটা খেয়াল; মেয়েমানুষ হ'য়ে—গরীবের মেয়ে হয়ে তার ওসব দিকে নজর দেবার দরকার নেই। এখন ওবলে' আর সে মনকে প্রবোধ দিতে পারে না। স্বামীর চরিত্রহীনতা পলে পলে তার হৃদয়কে দগ্ধ কর্‌তে লাগ্‌ল। মুখ ফুটে' সে কিছু বল্‌তে পারে না, সাহসে কুলায় না। নির্লজ্জতা ক্রমে বেড়েই চল্‌ল। বাড়ীতে বসে', তার চোখের সুমুখে দিনরাত চরিত্রহীনতার নিত্যনূতন অভিনয় হ'তে লাগ্‌ল। একদিন আর সে সহ্য করতে পার্‌ল না। সেদিন বিকেল-বেলা সে সইয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। একবারে সরাসরি স'য়ের ঘরে ঢুকে গেল; ঢুকে যে দৃশ্য দেখ্‌ল', তাতে তার মাথা ঘুরে' উঠ্‌ল—চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌ল, পায়ের তলা থেকে পৃথিবী যেন সরে' যেতে লাগ্‌ল। আর সই হ'য়ে যে এমনি করে তার সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে, এ তার ধারণাই ছিল না; আর সুবোধ যে কত বড় নির্লজ্জ লম্পট তা আজ নিজের চোখে দেখে দেখে, তার রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে' উঠ্‌ল। রাগে, দুঃখে, লজ্জায় পাগলের মত হয়ে গিয়ে, চেঁচিয়ে সে বাড়ীর লোক জড় কর্‌লে। সুবোধ ব্যাপার অনেক দূর গড়াতে পারে দেখে ধাক্কা মেরে মলিনাকে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে ছুটে পালাল। বাড়ীর লোক সকলে এসে ব্যাপার আগাগোড়া সব বুঝতে পার্‌ল। কেলেঙ্কারী লোকের মুখে মুখে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়্‌ল। নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে সুবোধ দুই একবার চেষ্টা কর্‌ল; কিন্তু মলিনা মুখের ওপর প্রতিবাদ করায় স্বামী-দেবতা ক্রোধে অন্ধ হয়ে পিশাচের মত নির্দ্দয়ভাবে তাকে প্রহার কর্‌লে। শুধু প্রহার করেই সে ক্ষান্ত হ'ল না; বল্‌লে, ঘরের বউ হ'য়ে ভদ্রলোকের নামে যে অপবাদ দেয়, তার মুখ সে আর এজনমে দেখ্‌বে না; কাল সকালেই এক কাপড়ে বাপের বাড়ী ফেলে দিয়ে আস্‌বে। বরদাসুন্দরী অনেক চেষ্টা কর্‌লেন, অনুনয় বিনয় কর্‌লেন, প্রতিজ্ঞা তবু টল্‌ল না। মলিনাকে বাপের বাড়ী যেতে হ'ল। যাবার সময়ে শাশুড়ীকে প্রণাম কর্‌লে, তিনি বল্‌লেন, "বৌমা, এখন যাও। কি ক'র্‌ব ব'ল। বড় একগুঁয়ে ছেলে, রাগ পড়ে' গেলে আবার নিয়ে আস্‌ব। কেঁদো না।" মলিনা বিদায় হ'ল।...

মলিনা বাপের বাড়ী ফিরে' এসেছে। আহিরিটোলার এক সরু গলিতে একখানা ছোট বাড়ীর এক অংশে। বাপ-মা সব কথা শুনে তাকে অনেক বক্‌লেন; বল্‌লেন, এতে জামায়ের দোষ ত তাঁরা কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। সে পুরুষমানুষ হ'য়ে যা করে, না করে, মেয়েমানুষের তাতে চোখ-কাণ দেবার কি আছে; বিশেষতঃ পতি পরম গুরু! অপরাধ যে তারই, তাই বুঝিয়ে দেবার জন্যে তাঁরা বল্‌লেন, হতভাগী মেয়ে ত জানে না, শাস্ত্রে আছে পতিব্রতা তার কুষ্ঠে স্বামীকে মাথায় করে' নিয়ে বেশ্যা-বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেছিল; তবেই না পতিভক্তি! পতি ভিন্ন স্ত্রীর আর কোন গতি নেই! এমন সহজ সরল ব্যাখ্যা শুনেও মুখ্যু মলিনা বুঝ্‌তে পার্‌ল না, তার দোষ কোথায়; মনে কর্‌ল; হবেও বা, ছেলেমানুষ বুদ্ধি কম ব'লে বুঝতে পার্‌ছে না। ভাদ্র,

আশ্বিন, কার্ত্তিক তিন মাস কেটে গেল। অঘ্রাণের শেষে অঘ্রাণের মতন হিমশীতল খবর এল—সুবোধ আবার বিয়ে করেছে। শাশুড়ী লিখেছেন, "সুবোধ আবার বিয়ে করেছে, তিনি অনেক বারণ করেছিলেন, বাধা দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও বিয়ে করেচে; ছেলে বড় একগুঁয়ে, তিনি কি করবেন! আর কি হবে, হাত ত আর নেই, সতীনের ঘর কি আর কেউ করে না ইত্যাদি!" শীতবস্ত্রের অভাবে অঘ্রাণের হিমে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসবার মতন হয়েছিল বটে, কিন্তু এ খবরে তার গায়ের সমস্ত রক্ত এক নিশ্বাসে জমে' বরফ্ হ'য়ে গেল। কি খবর সে শুনলে! সমস্ত শরীর দুলতে লাগ্‌ল, মলিনা মাথা ঘুরে' পড়ে' গেল।...

পাড়ার লোক পরামর্শ দিল, নালিশ করে' জব্দ করতে। মলিনা বারণ করল। বাপ-মা রেগে অস্থির হ'য়ে সে কথা শুন্‌লেন না, জামাইকে জব্দ না করেই ছাড়্‌বেন না। বেশী চটাতে মলিনা আর সাহস করল না, তাঁদের মতে মত দিতে হ'ল। থালা ঘটি যা ছিল সব বেচে মোকদ্দমা চল্‌তে লাগ্‌ল। ছেঁড়া কাপড় গুছিয়ে পরে' মলিনা আদালতে হাজির হ'ল। উকীলের বেঁকা ইঙ্গিত, চাপাহাসি, অসংখ্য অভদ্র প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিয়ে সে বাড়ী ফির্‌ল। হাকিমের বড় দয়ার প্রাণ, মলিনার অল্প বয়স কোন দোষ নেই দেখে পনের টাকা মাসহারার ডিক্রী দিয়ে দিলেন। সুবোধ খুব জব্দ হ'য়েছে, তার একদিনের খরচ পনের টাকা মাসোহারা দিতে হ'বে; তাও আবার ঠিক্ ঠিক্ না দিলে ফের নালিশ করে' 'বার করতে হ'বে! একি কম জব্দ! বারশ' টাকার আয় থেকে মাসিক পনের টাকা দিতে হওয়ায় তার খুব শিক্ষা হ'য়ে গিয়েছে! আর সে জীবন থাক্‌তে এমন কাজ করবে না! আর মলিনা? তার চিরদিনের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, মানমর্য্যাদা, জীবনের বিকাশ ও পূর্ণতা, আইনের মহিমায় সব প্রশ্নের এক কথায় সমাধান হ'য়ে গেল—মাসিক পনের টাকায়। তার আর ভাবনা কি? তার নারীত্বের মূল্য, মাতৃত্বের দাবী, জীবন যৌবনের মূল্য, হৃদয়ের আবেগ, আনন্দ, তরঙ্গ, উচ্ছ্বাসের মূল্য পনের টাকা পেয়েছে! প্রথম যৌবনের অজানা উচ্ছ্বাসকে, পরিপূর্ণ আবেগকে পনের টাকায় সান্ত্বনা দিক! গোপন অন্তরগেহে এতদিন যে আশায় সৌধ রচনা করে' এসেছিল, হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রতিদিন পলে পলে যে মধু সঞ্চয় করে' রেখেছিল, গরীবের মেয়ে হ'লেও যে সুখ তার নারী-হৃদয়কে পূর্ণ করে' রেখেছিল, আজ তার হিসেব কে নেবে? সে কি চির-জীবন কাটিয়ে দেবে—ম্লানমুখে, বিষাদে বিরসে?...

সুবোধের আবার ঘর-আলো-করা বউ এসেছে। এক গা গহণা পরে' বউ ঘুরে' ঘুরে' বেড়ায়; তাই দেখে শাশুড়ী বলেন, বড় বউমার কপালে সুখ নেই ত লোকে কি করবে? সুবোধের ফূর্ত্তি দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। নতুন বউ একে ছেলেমানুষ, তার ওপর বাড়ীর ইতিহাস সে সব শুনেছে; তাই ভালমানুষের মত মুখটি বুজে থাকে, কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য করে না। মলিনা অনেকদিন পরে ক্ষমা চেয়ে সুবোধকে একখানা চিঠি লিখেছিল; সেই ইনিয়ে বিনিয়ে নাকিসুরে কান্নার উপযুক্ত উত্তর পেয়েছে, যে হিন্দুর স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে, তাতে আর বাজারের বেশ্যাতে তফাৎ কি? এত বড় প্রশ্নের জবাব দেবার ক্ষমতা মলিনার নেই; সে শুধু দিনরাত কাঁদে, আর ভাবে তাকে পোড়া পেটের জন্য স্বামীর উপেক্ষার দান চিরদিন নিতে হবে। পতিকে সাক্ষাৎ দেবতা বলে' না ভাব্‌লেও, চিরজীবনের সুখের দুঃখের সাথী বলে' সে জান্‌তে পেরেছিল, আজ সে সাথী বিমুখ। সে তার দুষ্প্রবৃত্তিকে ক্ষমা করেছিল, তার ঘৃণাকেও ভুলেছিল; কিন্তু ভুলতে পারে নি সেই দুষ্প্রবৃত্তির, সেই ঘৃণার কর্ত্তাকে। পুরান সুখের দিনটাকে অবসর পেলেই সে ভাবে আর কাঁদে, শেষে আবার নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দেয়—"পূর্ণিমা-রজনী না হ'তে ভোর, ভেঙ্গে গেল যদি ঘুমের ঘোর, অলীক স্বপনে, মিছে রাখি মনে, বাড়াব' না আর যাতনা; চাহিনা তাহারে করিতে পরশ, নিকটে তাহারে চাই না!"

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

(ভগবান রামকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলার পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত বাঙ্গালীর বৃন্দাবন, দুনিয়ার শ্রীক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া যে ঈশ্বরকোটীর নিত্যগোষ্ঠী রাসমণ্ডলী রচনা করিয়াছিলেন, স্বামী শিবানন্দ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। ১৮৫৫ সালে ইঁহার জন্ম। গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দজীর জীবিত অবস্থায় তিনি সিংহল, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ইষ্টবাণী প্রচার করেন ও তারপর কাশীর নবপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত মঠের অধ্যক্ষ হন ও ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই মঠের কার্য্য পরিচালনা করেন। বেলুড় মঠের রেজেষ্টারীর সময় ১৯০৯ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত স্বামী শিবানন্দ মিশনের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া একান্ত ভাবে সঙ্ঘসেবা করেন। ব্রহ্মানন্দজী র তিরোধানের পর, ১৯২২ সালে, তিনি মিশনের সভাপতি হন ও বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৫টা ৩৫ মিনিটের সময়ে অশীতিবর্ষ বয়সে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। তিনি বহু মঠের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করিয়া এবং প্রায় বিশ হাজার শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। সঃ)

"ফোটে ফুল—
সৌরভ হৃদয়ে ধরি,
সৌরভ বিতরি
আপনি শুকায়ে যায়—
মৃত্যু ভয় আছে কি কুসুমে।"

১৮৮২ সালে পরমহংস-মহাশয় সর্ব্বদাই সিমলায় আসিতেন। তিনি সিমলায় মনোমোহনদাদার অর্থাৎ রাখাল মহারাজের শ্বশুর-বাড়ী, সুরেশ মিত্তিরের বাড়ী ও একদিন গোঁসাইদের বাড়ীতেও আসিয়াছিলেন; কিন্তু রামদার বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন এবং সেই উপলক্ষে বহু লোক-সমাগম, আহারাদি ও আনন্দোৎসবাদি হইত। এইরূপে ঠাকুরের সঙ্ঘ ও উৎসবের প্রথম সূচনা হয়। এই সময়ে রামদার বাড়ীতে একটি যুবককে দেখিতে পাই, অল্প কৃশ, ফুটফুটে, গৌরবর্ণ রং, মুখে একটু একটু দাড়ি। তরুণটী অতি ধীর এবং চক্ষুতে অন্তর্দৃষ্টি বা ধ্যানাভাবের বিশেষ লক্ষণ ফুটিয়াছিল। পরে জানা গেল, এই যুবকটির নাম তারকনাথ ঘোষাল—বাড়ী বারাসত এবং কোন এক অফিসে চাকুরী করে। কিছুদিন পরে

আর একজন যুবকও আসিয়া জুটিল, তার নাম তারক মুখার্জ্জি, বাড়ী সিতিবেলঘরে। বেলঘরের তারক বহুদিন হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বারাসতের তারকনাথের কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ছিল। তার লোকরঞ্জন স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহার সে সময়ে সকলকেই মুগ্ধ করিত। ইনি ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত করিতেন, এই জন্যই বোধ হয় অনেকটা ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন অর্থাৎ কোন বিষয়েই গোঁড়ামী বা অবজ্ঞার ভাব ছিল না। তারকনাথ যে বিশেষ ঈশ্বর-পিপাসু ছিলেন, তা তাঁর কথাবার্ত্তায়ই প্রকাশ পাইত। কালীদাস সরকার নামে একজন প্রবীণ ব্যক্তি মধুরায়ের গলিতে থাকিতেন। তিনিও অফিসে চাকুরী করিতেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরাগী ছিলেন। কালীদাস অফিস হইতে আসিয়া প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা তারকনাথকে ভজন গাইতে বলিতেন। তারকনাথও অতি সুললিত সুরে ব্রাহ্ম-সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইতেন। এই জন্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল। তারকনাথ তখনও চাকুরী করিতেন এবং সর্ব্বদাই রামদাদার বাড়ী আসিতেন। তিনি অফিসে বসিয়াই মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়া ধ্যান করিতেন বলিয়া অন্যান্য কেরাণীরা বিদ্রূপ সহকারে বলিতেন—'যদি চোখ বুজে ধ্যান করবে তো বেহ্ম-সমাজে গিয়া করগে না।' এই সময়েই পরমহংস মহাশয়ের সহিত তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় ও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন। চাকুরী পরিত্যাগের সময়ে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড হইতে শ' পাঁচেক টাকা পাইয়াছিলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তারকদা—তোমার নাম তারকনাথ হইল কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, যে পিতামাতার কোন সন্তান না হওয়ায় তারকেশ্বরের মানস করায় তাঁর জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হইয়াছিল তারকনাথ। তারকনাথের পিতা আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন—উকীল বা মোক্তার। ১২৮৩ সালে তারকনাথের সহোদরার ভগ্নীর (যিনি কাশী থাকিতেন) সহিত আমার কাশীতে প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। তাঁরা ছিলেন তাঁদের পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। তারকনাথের এক ভাইও মাঝে মাঝে বেলুড়-মঠে যাইতেন। এইরূপ শুনা যায়, যে তারকনাথ বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু বিবাহের অল্পপরেই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। এটা আমার শুনাকথা, বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করি নাই। এই সময়ে নিত্যগোপালদাদা (স্বামী অবধূত জ্ঞানানন্দ, যিনি মনোহরপুকুরে মহানির্ব্বাণ মঠ করিয়াছিলেন) রামদার বাড়ী থাকিতেন। নিত্যগোপালদা রামদার মাসতুতো ভাই এবং তুলসী মহারাজার (নির্ম্মলানন্দ স্বামী) মামা। তারকনাথ নিত্যগোপালদার সহিত খুব মেলামেশা ও একসঙ্গে দুজনে কঠোর সাধনভজন করিতেন।

তাঁর কঠোর তপস্যার প্রথম পরিচয় পাই রামদার বাড়ীতে। রামদার বাড়ীতে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই বামদিকে একটি পোড়ো কুঠুরীঘর ছিল। সেখানে তিনি একখানি ডোরাকাটা কম্বল গা-মাথায় জড়াইয়া কি গরমী-শীত-বর্ষা কাটাইয়া দিতেন। নিজের হাত উপাধানের কাজ করিত এবং একেবারেই শয্যাত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি জুতা বা জামা ব্যবহার করিতেন না, পরণের কাপড়ের খানিকটা গায়ে জড়াইতেন।

এই সময়ে তিনি কিছুদিন কাঁকুড়গাছির বাগানেও ছিলেন। সেখানকার কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, যে দিনের বেলায় কোন রকমে দুটি ভাত খাইতেন ও রাত্রে ধুনিতে রুটি পুড়াইয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পড়িয়া থাকিতেন। সে সময় পরমহংসদেব দেহে ছিলেন। সিমলার অনেকেই তাঁকে চিনিতেন এবং ছোট-বড় সকলেই তাঁকে সাধক ও ঈশ্বরানুরাগী বলিয়া বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

পরমহংসমহাশয়ের শরীর অসুস্থ হওয়ায় মতিঝিলের সামনের একটি বাগানবাড়ীতে রাখিয়া তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইলে, আমি একদিন সকালে কাশীপুরের বাগানে গিয়া দেখি, যে তারকনাথের মাথার চুল ঝাঁবড়া, দাড়ি কতকটা কোঁকড়ান ও গাঁতি করিয়া কাপড় পরা অর্থাৎ পশ্চিমে সাধুরা যেমন করিয়া গায়ে কাপড় জড়াইয়া পরে, আঁখিতে তাঁর অপরূপ আভা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মন অন্তর্মুখী, যেন ধ্যানমগ্ন। কথাবার্ত্তা একটু জড়ান, মনে হইল বিভোর অবস্থা হইতে মনকে নামাইয়া কথা বলিতেছেন। অতি ধীর, মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও নিতান্ত

নিরভিমান—উন্নত অবস্থার সাধক বলিয়া দেখিলেই বুঝা যাইত।

কাশীপুর বাগানে পরমহংসদেব দেহ রক্ষা করিলে আন্দাজ আশ্বিন মাসে বরাহনগরের মঠ হইল। তারকদা বরাহনগর মাঠ তখন থাকিতেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি চাকুরী ও ঘরসংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময়কার তাঁর কঠোর তপস্যার ছবি এখনও মনে পড়ে। আহারাদি বা শরীরের খেয়াল নাই, সর্ব্বদাই যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। মুষ্টিভিক্ষা করিয়া কয়েকজন কিছু চাউল আনিতেন এবং সেই পাঁচ মিশালি চাউল একটী পিতলের হাণ্ডীতে সিদ্ধ করিয়া থালা-গ্লাসের অভাবে চৌকা কাপড়ের উপর ঢালিতেন ও একটা বাটীতে নুন-লঙ্কা সিদ্ধ জল (কখন কখন উহার মধ্যে তেলাকুচার পাতাও দেওয়া হইত) ছিল তরকারী। ভাতের গ্রাসের সঙ্গে ঐ ঝাল-জল মুখে দিলে মুখ জ্বলিয়া উঠিত, আর ভাতের গ্রাস গলার ভিতর দিয়া নামিয়া যাইত। আমি একদিন সকলের সঙ্গে ঐ ভাত খাইয়াছিলাম; কিন্তু সেই ঝালের কথা এখনও মনে আছে। জল খাইবার একটিমাত্র ঘটি ছিল, পরে ফুটো হওয়ায় বরাহনগরের মঠের ভাঁড়ার ঘরের তাকে তুলে রাখা হইয়াছিল। ঐটাই আদি ঘটি, এখন আছে কিনা জানি না। কাপড়ের উপর ভাত ঢালিয়া চারিদিক্ ঘিরিয়া বসিয়া খাওয়াটা কি আনন্দেরই না ছিল—কত হাসি, গল্প, উচ্চাঙ্গের কথাও চলিত। এমন কি, উহাতে বরাহনগরের সাতকড়ি মৈত্র এবং দাশরথী সান্ন্যালও কখন কখন যোগ দিত। রাত্রে খানকতক রুটি করিয়া লওয়া হইত। তরকারী জুটিলে হইত, নচেৎ নয়। তখন ঠাকুরের জন্য রুটি, একটু তরকারী ও সুজির পায়েস হইত, লুচি-ভোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইহা প্রথম মাস পাঁচ ছয়েকের কথা। তারপর একটু একটু তরকারী আসিয়া জুটিল।

বরাহনগরের মঠ হইতে সিমলায় আসিলেই রামতনু বোসের গলিতে আমাকে তিনি দেখিয়া যাইতেন। সেই ডোরা-কাটা কম্বল গায়ে, খালি পা—সকল ঋতুতেই ঐ একই রকম। চলিবার সময়ে মাটির দিকে চোখ করিয়া স্থির নেত্রে চলিতেন, এদিক্ ওদিক্ মাথা ঘোরাইতেন না। পরে বেলুড়মঠে একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তারকদা, তুমি যে একদৃষ্টি মাটির দিকে তাকিয়ে চল্‌তে, এটা বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগ্রন্থ বলে, যে চল্‌বার সময়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে দূরে দৃষ্টি রেখে চল্‌লে গভীর ধ্যান হয়।" তিনি ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"তা কে জানে বাপু, আমি স্বাভাবিকই তাই কর্‌তুম, অত পড়েশুনে করি নি।" তাঁর সেই মঠের আদি ডোরাকাটা কম্বলখানার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"তা বটে, ওখানা গায়ে দিয়ে অনেক জপতপ করেছিলাম, তুলসী সেখানা নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল, তারপর কি হ'ল জানি না"—এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বরাহনগর মঠে প্রথম একদিন পরমহংস মহাশয়ের মেথরের বাড়ী পরিষ্কার করার কথা হইলে, সকলের ভিতরই তপস্যাদীপ্ত হইয়া উঠিল। মঠের শেষ দিকটাতে উপরে একটা পায়খানা ছিল। পায়খানাতে বসিবার জায়গায় ফোঁকরের ধারে দুইখানা বড় টালি বা ইট ছিল। নয় ইঞ্চি চওড়া, দেড়হাত লম্বা এক রকমারি টালি বা ইট। কয়েকটা মাটির গামলা ছিল। কেহ না কেহ শেষরাত্রে উঠিয়া মঠের পুকুর থেকে জল আনিয়া পায়খানাটি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া, দুটো গামলায় জল ভরিয়া, কল্‌কেতে তামাক সাজিয়া, হুঁকোর জল ফিরাইয়া সব ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়া শুইয়া থাকিতেন। ঘুম থেকে উঠিয়া লোকে পায়খানায় গিয়া দেখে, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কিন্তু পূর্ব্বে যে কে করিয়াছে, তা কেউ ধরিতে পারিত না। এইরূপে পায়খানা পরিষ্কার করা যেন পরস্পরের মধ্যে একটা সাধনা হইয়া উঠিল। পরস্পরের প্রতি এমনি অনাবিল অকৃত্রিম আকর্ষণ ও প্রেম ছিল, যে পায়খানা পরিষ্কার করিয়া সৌভাগ্যার্জ্জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। পায়খানায় একটিমাত্র ফোঁকর, একজন পায়খানায় বসিলে বাকী সকলে আশেপাশে ঘিরিয়া বসিত ও সঙ্গে সঙ্গে হুঁকা ও নানাবিষয়ের উচ্চাঙ্গের কথাবার্ত্তাও চলিত। সকলেই প্রায় থাকিত নেংটো। আগন্তুক আসিলেও, এই মজলিসে যোগ দিত। অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে এই নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার চিন্তনীয় বিষয়।

একবার কার্ত্তিকমাসের সকালে একদিন তারকদা

রামতনু বসুর গলির বাটিতে আসিলেন—শুধু পা, গোড়ালি ফাটা, গায়ে জমাট ময়লা আর কম্বলখানা মুড়ি দেওয়া। আমি তারকদাকে কলতলায় লইয়া বসাইয়া দিল্লী হইতে আনীত একটি গেঁজে (যাকে দিল্লীতে খিস্‌সে বলে) নিজের হাতে পরিয়া তারকদার গা ঘষিতে লাগিলাম। গাত্র-মার্জ্জনের সময়ে ধূলিমাখা মেজে-ধোয়ার মত কাদাজল বাহির হইতে লাগিল দেখিয়া তারকদাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"ধুনির ধারে বসিয়া সারারাত্রি জপ করি, তাই বোধহয় ছাইটাইগুলো লাগিয়াছে, গঙ্গায় তিনটে ডুব দিই মাত্র, গামছা টামছা ত নাই কিছু।" তারপর খানিকটা নারিকেল তৈল গোড়ালির ফাটলে দিলাম। আহারাদি করিয়া দুপুরবেলা তিনি চলিয়া যান। এমনি কঠোর তপশ্চর্য্যা, যে নিজের দেহের বিষয়েও কোনপ্রকারের হুঁস ছিল না।

বেলুড় মঠে একদিন কোন এক উৎসব উপলক্ষে মঠের উঠানে সকলে খাইতে বসিয়াছে। স্থানাভাবে অনেক লোক দাঁড়াইয়াও আছে। দালান আর উঠানের মাঝের জায়গাটুকুতে সকলে জুতা রাখিয়াছে। জুতা সরাইয়া ওখানে বসিবার জায়গা করিবার জন্য সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু কেহ আর অগ্রসর হইল না। তারক'দা মঠের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াও বিনাদ্বিধায় অবিচলিত চিত্তে সকলের জুতা কুড়াইয়া, দুই বাহুর দ্বারা উঠানের এক কোণে গিয়া রাখিতে লাগিলেন। তিনবার এইরূপ করাতেই সকলের বসিবার ঠাঁই হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "মহাপুরুষ কি করেন, কি করেন!" সহাস্যে তারক'দা কহিলেন, তোমরা খাও, এতে কিছু এসে যায় না।" মহাপুরুষ বটে, গুরু হইয়া শিষ্যদের জুতা বহিলেন—একেবারে নিরভিমান ছিলেন।

ঠাকুরের তিথি-পূজার দিন, একটি মুসলমান ভক্ত চা খাবার দালানে বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। তারক'দা ও আমি দাঁড়াইয়া তাকে ভোজন করাইলাম। মুসলমান বলিয়া উড়ে চাকরেরা কেহ তার এঁটো তুলিতে সম্মত না হওয়ায় তারক'দা আমাকে বলিলেন—"মহিম, জল নিয়ে এস দেখি এক বাল্‌তি।" আমি জল দিলাম; তিনি ঝাড়ু দিয়া এঁটো পরিষ্কার করিলেন। এই তুচ্ছ বিষয়েই মহাপুরুষ শিবানন্দের উদারতা ও মহত্ত্ব প্রকাশিত হইত।

আগেও তাঁর ভিতর ভালবাসা খুবই ছিল; কিন্তু জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বুকের ভিতরে ভালবাসার উৎস-দ্বার যেন উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কোন বাদবিচার নাই, উপযুক্ত অনুপযুক্ত নাই, সকলের প্রতি সমান। তিনি ছিলেন প্রেমের কেন্দ্রস্বরূপ—আর আকর্ষণে সকলকেই নিজের বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন।

ব্রহ্মের লক্ষণ হইতেছে অস্তি, ভাতি ও প্রিয়। অস্তি মানে সত্তা (existence), ভাতি বিকাশ করা—(emanation), প্রিয় আকর্ষণ-শক্তি (প্রীণাতি, attractiveness), মহাপুরুষ শিবানন্দের ভিতর এই প্রিয় বা ভালবাসা প্রভূতভাবে বিকাশ পাইত।

আর একটি কথা তাঁর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বলিতেন,—"আমি মহানন্দে আছি, সবই আনন্দের জগৎ, তবে শরীরটা জীর্ণ হয়েছে কি না তাই মাঝে মাঝে গোলমাল করে, তা ও-বিষয় বেশী মন দিতে পারি নে, থাকে থাক্ যায় যাক্।" অহং আর শরীর দুটা ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। শরীরের ভিতর থাকিতেন; কিন্তু শরীরের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। এ-কেই বলে জীবন্মুক্ত পুরুষ। He was in the flesh but not of the flesh.

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!! শিবোঽহং।

বীরনগর (উলা) পল্লী-সংস্কার

শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর একটী বহু পুরাতন পল্লী। ইহার ঐতিহাসিক নাম উলা এবং তাহার অধিবাসীরা একদল দুর্দ্দান্ত ডাকাত ধরার জন্য সরকার হইতে ঐ স্থানের নাম বীরনগর দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা হইতে উলা ৫১ মাইল দূরে অবস্থিত এবং গ্রামের অনতিদূরেই চূর্ণী নদি প্রবাহিত হইয়া গৌরনগরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে স্থানটি খুব সমৃদ্ধিশালী শতাব্দী হইতে দেশের লোকেরা ইহার পূজা করে। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সেখানে মেলা হয় ও বহু লোকের সমাগম হয়। একই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় বারোয়ারী পূজা তিন দিন ধরিয়া খুব সমারোহে সম্পন্ন হয়। ১৮৫৬ সালে ম্যালেরিয়া প্রথম বঙ্গদেশে এই স্থানে ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়। প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক মারা যায়। সেই অবধি ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দেশটী

নব-পরিচালিত কৃষিক্ষেত্র

ছিল, বড় বড় অট্টালিকা, প্রশস্ত জলাশয়, সুন্দর পাকা রাস্তা ও অতি উৎকৃষ্ট আম্র-বাগানে পরিপূর্ণ। প্রায় ৪০ হাজার লোকের বাস ছিল; বেশীর ভাগই ব্রাহ্মণ কায়স্থ। সংস্কৃতাধ্যয়ন ও সঙ্গীত-চর্চ্চার জন্য জায়গাটী বিখ্যাত ছিল। বহু পূর্ব্বে গঙ্গা নদী এই স্থানে প্রবাহিত ছিলেন ও তীরস্থ উলুবন কাটিয়া গ্রাম স্থাপন করায় উহার নাম উলা হইয়াছিল। শ্রীমন্ত সওদাগর নদী-তীরে একটী শিলা স্থাপন করিয়া যান, তাঁহাকে উলাইচণ্ডী দেবী বলা হয়। বহু বিধ্বস্ত হয় ও ১৯২১ সালে লোকসংখ্যা কেবল মাত্র ২৩০০ ছিল ও গ্রামটী প্রায় জঙ্গলে আবৃত হইয়া যায়।

পুরাতন গ্রামটী পুনরুদ্ধার করিবার জন্য কতিপয় ভদ্রলোক ও গ্রামের যুবকবৃন্দ একত্র হইয়া একটী পল্লীমণ্ডলী সংগঠিত করেন ও ম্যালেরিয়া-দূরীকরণের জন্য সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটী ও পল্লীমণ্ডলীর সম্মিলিত চেষ্টায় বীরনগরের আজ অনেক উন্নতি হইয়াছে ও বাংলাদেশের মধ্যে

পল্লী-সংগঠন ক্ষেত্রে বীরনগর আজ শীর্ষস্থানীয়। যে সকল জায়গা ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে বিজন অরণ্যে পরিণত ছিল এবং সর্প ও নেকড়ে বাঘের আবাসস্থান হইয়াছিল, আজ সেই সকল স্থান একেবারে পরিষ্কার হইয়াছে ও সেখানে

পুরাতন দ্বাদশ মন্দির
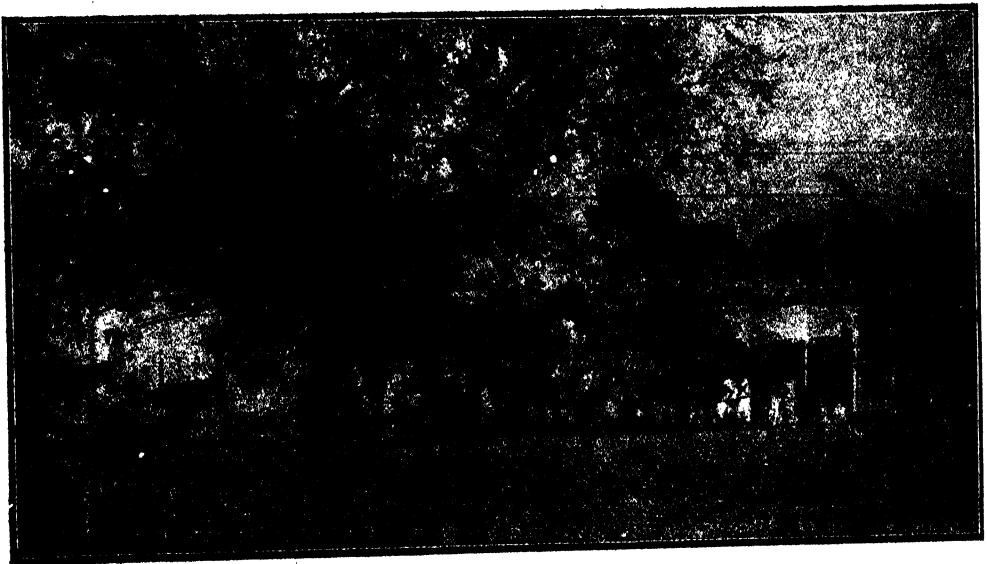
চূর্ণী নদীর তীরবর্ত্তী আশ্রম

শাকসব্জীর চাষ হইতেছে। অনেক কূপনলী (tube-well) বসান হইয়াছে এবং তাহারই জল সকলে খাইবার জন্য ব্যবহার করে। কূপনলী ১০০ হইতে ১৭৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীর ও উহার জল সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ। যে সমস্ত জলাশয়ের জল ব্যবহার করা হয় না, তাহাতে রোটারী ব্লোয়ার দিয়া নৌকা করিয়া Paris green ইটের গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় ও তাহাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত অল্প সময়ে অল্প খরচে Paris green জলাশয়ের
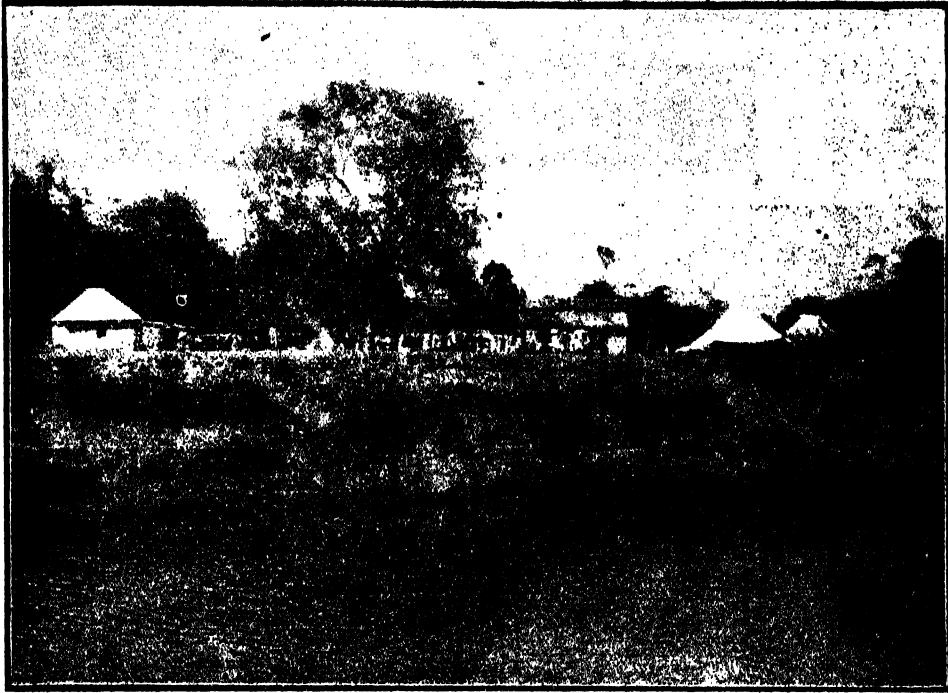
চূর্ণী নদীর আর একটী দৃশ্য

চূর্ণীতীরে কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্র

উপর সমভাবে বিস্তৃত হয় ও লারভিগুলি তাহা খাইয়া মরিয়া যায়। যে সকল পুকুরের জল ব্যবহার করা হয়, সেগুলিতে স্প্রেয়ার দিয়া malarial স্প্রে করা হয়। পল্লীমণ্ডলীর কর্ম্মচারীরা Tropical School of Medicineএ ও কৃষ্ণনগরের Public Health Department Laboratoryতে শিক্ষা পাইয়াছেন এবং বীরনগরেও Labortory খোলা হইয়াছে, সেখানে মশার identification হয়। যে বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা কৃষ্ণনগরে, কলিকাতায়, Kasauliতে ও species ডিম পাড়ে, তাহারও তদন্ত হইতেছে। আরও ম্যালেরিয়া-নিবারণের জন্য প্রত্যেক লোককে পল্লী-মণ্ডলী হইতে কুইনাইন বা সিনকোনার বড়ি বিনামূল্যে দেওয়া হয় ও মণ্ডলীর লোকেরা বেশীর ভাগ গ্রামবাসীদের নিকট যাইয়া খাওয়াইয়া দিয়া আসে। এই সকল প্রণালীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বীরনগরে অনেক কমিয়াছে ও আশা করা যায়, ৫ বৎসরের মধ্যে একেবারে প্রশমিত হইবে। Sir Malcolm Watson এবং Malaria Commission of the League of

খাঁ দিঘীতে রোটারী স্প্রেয়ার দ্বারা প্যারীস্-গ্রীণ ছড়ান হইতেছে

আসামে Dr Ramsayএর কাছে পাঠান হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশেখর বসু মহাশয় ম্যালেরিয়া রিসার্চ্চ সম্পর্কে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন ও বীরনগরে একটী মাত্র species পেলিপিনেনসিস্ carrier বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ভারত, বাংলা ও আসাম গভর্ণমেণ্টের expertও সেই সিদ্ধান্তে একমত হইয়াছেন। এখানে যে সকল জলাশয়ে উপরোক্ত species ডিম পাড়ে, কেবল মাত্র সেই সকল জলাশয়ে তৈল বা Paris green দেওয়া হয়। কোন্ রকম Vegetation-এ ঐ Nations বীরনগরে আসিয়াছিলেন ও সকলেই পল্লীমণ্ডলীর ম্যালেরিয়া-নিবারণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী একবাক্যে সমর্থন করিয়াছেন।

গ্রামের প্রত্যেক রাস্তার ধারেই অনেক পুরাতন দেবমন্দির এখনও উন্নত রহিয়াছে। তাহাদের উপর কারুকার্য্যগুলিও অতি মনোরম।

গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে এবং একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয় ও ৪টী নৈশ বিদ্যালয় ও একটী লাইব্রেরী আছে। উপযুক্ত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও

শ্রম দিতে পারিলে কৃষিপ্রধান বাংলার বহু সমস্যা বিশেষ করিয়া অন্ন-সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য বলিয়া সম্প্রতি একটী agricultural farm খোলা হইয়াছে; প্রায় ২৬ বিঘা জমীর উপর, একটী সুন্দর নূতন গৃহ ও একটী জলাশয় farm-এর মধ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে। স্কুলের ছেলেরা কৃষিকার্য্যাভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট কৃষিকার্য্য শিক্ষা করে ও farm-এ নিজ নিজ plot-এ নিজেরা চাষ করে ও শাকসব্জী উৎপাদন করে। তাহাদের উৎসাহ দিবার জন্য নিজ নিজ অংশের তরকারী সব নিজেদের বাটীতে খাইবার জন্য লইয়া যাইতে দেওয়া হয়।

কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বীরনগরে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চেয়ারম্যান মহাশয় Sir Daniel ও Lady Hamilton, Mr. and Mrs Wordsworth, Dr. Urqhart প্রভৃতি কলিকাতার ও নদীয়া জেলার অনেক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন এবং সুচারুরূপে Institute-এর উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বীরনগর পল্লীসংস্কার-সম্পর্কিত যে কয়েকখানি ছবি এখানে দেওয়া হইল, তাহাতেই পল্লী-মণ্ডলীর কার্য্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যাইবে।

৩৫টী ছাত্র ইহার মধ্যেই ভর্ত্তি হইয়াছে। কৃষি, তাঁত,

বীরনগর মিউনিসিপ্যাল আফিসে অভ্যাগত-মণ্ডলীর আগমন

সম্প্রতি যুবকদের বেকার-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য বঙ্গদেশের লাট বাহাদুর Rural Reconstitution Commission এর পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। চারিদিকে পল্লী-সংস্কারের সাড়া পড়িয়াছে। স্যার ডানিয়াল হামিলটন ও লেডি হ্যমিল্টন গোসাবাতে একটী Rural Reconstruction Institution খুলিয়াছেন। বীরনগরেও একটী Rural Reconstruction Institute প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহাতে Matric-পাশ বা Matric পর্য্যন্ত পড়া ছেলেদের কৃষিকার্য্য, কাঠের কাজ, বস্ত্র-বয়ন, কামারের কাজ, সাবান তৈয়ারী প্রভৃতি কাঠের কাজ ও সাবান তৈয়ারী এই সব শিক্ষা পাইতেছে। গভর্ণমেণ্টের Agricultural, Industry, Co-operative ও Education Department-এর কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইতেছেন ও এই নূতন experimentটীকে ফলবতী করিবার জন্য সম্যক্‌ভাবে সাহায্য করিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, যেন বীরনগরের এই Instituteটী বঙ্গদেশের যুবকদের স্বাধীন-ভাবে গ্রাসাচ্ছাদনার্জ্জনের পথের নিদর্শক হইয়া বাংলার সমস্ত পল্লীতে ঐরূপ Institute-স্থাপনের প্রচেষ্টা ফলবতী করে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ

(উপন্যাস)

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

— আঠেরো —

ভালো করে' ভোর না হ'তেই, চাপা, অনড় একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে থেকে, সৌরাংশু রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। চারপাশে সে যেন এখন অনেক জায়গা খুঁজে পেয়েছে, অনেক নিশ্চিন্ততা। তার চোখের আলোয় আকাশকে এখন অনেক বড়ো মনে হচ্ছে। ভোরবেলাটিকে অনেক পরিচ্ছন্ন :

কোথায় সে যাচ্ছে তা আর তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু যতই সে যাচ্ছে, ললিতার দৃষ্টির সেই দীর্ঘ কাকুতি শীর্ণ ও শাণিত একটা সাপের মতো তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। তাকে সে সেই আকাশহীন দেয়ালের দেশে নির্ব্বাসন দিয়ে এসেছে, দেয়ালের সেই শোকাকুল স্তব্ধতা বারে-বারে বেজে উঠছে তার হৃৎপিণ্ডে।

কিন্তু সেই জন্যে পথ ছোট করে' আনলে চলবে না। সৌরাংশু বাস্ নিলে। আগে তাকে বাঁচতে হ'বে, পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নয়; বাঁচবার এই প্রখর, নিষ্ঠুর স্বার্থপরতাতেই মানুষের মহত্ত্ব। তাকে বাঁচতে হ'বে, তার নিজের অনুপাতে, নিজের পরিমাপে: কোনো-কিছুর করার চেয়ে নিজের এই হ'য়ে-ওঠার দাবীই প্রচণ্ডতরো। জোর করে' কিছু করা যায় না, নিজের উপলব্ধিতে সহজেই নিজের হ'য়ে ওঠা চাই। যা সহজ তা-ই সত্য, সেই সহজ পথই বা সৌরাংশু ছাড়বে কেন? দেয়ালে ললিতা শত মাথা কুটলেও সৌরাংশুর আকাশ আর ভেঙে পড়বে না।

তবু ললিতার সেই দীর্ঘ দৃষ্টির শিথিল, শ্রান্ত রেখাটি বহুলীকৃত জনতার মধ্যে থেকে সৌরাংশুকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। ভুল, ভুল,—সৌরাংশুর মেরুদণ্ডটা তার প্রেতায়িত দৃষ্টির ছোঁয়া লেগে সিরসিরিয়ে উঠলো, ললিতা ভুল লোক বেছেছে। ললিতার আর সমস্ত মনোভাবকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, কিন্তু এই নির্ব্বাচনকে নয়। ললিতার চোখের দৃষ্টি যেন ব্যথায় ঘনিয়ে উঠলো: জলে যে ডুবেছে, সামান্য কুটোটাকেও সে ছাড়ে না। সৌরাংশু হাসলো, সামান্য কুটোটাকেও স্রোতের নিয়ম মেনে চলতে হয়, এবং সেইখেনে তারো আছে চলবার অধিকার। সেই বিষণ্ণ দৃষ্টি হঠাৎ যেন ধিক্কারে উঠলো ধারালো হ'য়ে: কাপুরুষ কোথাকার! তবে তুমি তোমার দেহ-মনের এই বলিষ্ঠ নির্লিপ্ততা দিয়ে আমাকে লুব্ধ করেছিলে কেন? কেন, তবে সেই বিশাল অন্ধকারে নটুর রোগশয্যার প্রান্তে বসে' তোমার উপস্থিতির উত্তাল স্তব্ধতায় আমাকে চুপিচুপি ডাক দিয়েছিলে? কেন তোমার সঙ্গে আমার সেই পরিচয় আবর্ত্তমান প্রাত্যহিক-তার তরলতায় সাবলীল, সহজ করে' তোলো নি? কেন তার মাঝে রেখেছিলে ব্যবধানের অলৌকিকতা? সৌরাংশু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সদ্য-ঘুম-থেকে-ওঠা কল্‌কাতার শোভা দেখছে: তুমি আমার জীবনে সেই নারী যে মনে মোহ না এনে আনে বিস্ময়, পুরুষের কামনার সেই ধ্যানমূর্ত্তি। তোমাকে তাই আমি প্রতি-দিনের নিরন্তরাল প্রবাহে এনে আবিল করে' তুলি নি, তোমাকে রেখে দিলাম সেই চিরকালের মৌনতায়। কথা, আর কথা, ললিতার সেই ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি সৌরাংশুকে যেন লেহন করতে লাগলো, সেই নির্ব্বাক্ দৃষ্টির কাছে কোনো কথাই পেলো না উচ্চারণ, দৃষ্টির সেই মরুভূমিতে কোনো কথাই পারলো না সান্ত্বনার ছায়া সঞ্চার করতে।

কোথায় তাকে বাস্ থেকে নামতে হ'বে তা-ও সৌরাংশুর মুখস্থ। তার পৌরুষ নিয়ে সে গর্ব্ব করতে না পারুক, তার প্রেম আছে অবিচল। ঐ তো সুমনাদের মেয়ে-মেস্‌টার দরজা দেখা যাচ্ছে। ঠিক এখন হয়তো

দেখা করবার সময় নয়, তবু, সেই রাত্রির পরে, এই নতুন ভোরবেলায়, আর কা'র কথা তার সবাইর আগে মনে পড়তে পারে? এই নতুন নির্মলতার সঙ্গে আর কা'র আছে এত মিল?

সৌরাংশু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ললিতার সেই লেলিহান দীর্ঘ, দৃষ্টি এখনো তার পিছু ছাড়ছে না।

দরোয়ানের হাতে স্লেটে নাম লিখে পাঠিয়ে সৌরাংশু বাইরের ঘরে এসে বসলো। জানতো, এ সময়টায় সুমনা মাষ্টারি করতে বেরোয়; ভেবেছিলো, বাইরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে। কিন্তু দরোয়ানের কাছ থেকে জানা গেলো, সকালবেলার মাষ্টারিটা তার আর নেই, অতএব স্লেট পাঠাতে হ'বে।

অন্তরালে সিঁড়িতে চটি-জুতোর শব্দ শোনা গেলো, সৌরাংশুর বুকের রক্ত দুলে' উঠলো সেই শব্দে। ভিতরে যাবার দরজার পর্দা ঠেলে সুমনা বেরিয়ে এলো—হাসিমুখে, ঝড়ে-ওড়ানো লঘু এক-টুকরো মেঘের মতো। বল্লে,—আমিই যে তোমার কাছে যাবো ভাবছিলাম।

সৌরাংশু রুদ্ধ নিশ্বাসে এক মুহূর্ত্ত সুমনার দিকে তাকিয়ে রইলো। সত্যিই এ সুমনা কিনা চিনতে যেন তার দেরি হচ্ছে। সুমনার এমন বেশবাস, বেশবাসে এমন প্রজাপতির চপলতা, সে কোনোদিন লক্ষ্য করে নি। পরনে ফিন্‌ফিনে পাৎলা একটা সাড়ী তার সারা গায়ে যেন স্ফূর্ত্তির ঢেউ এনেছে, বুকের উপর দিয়ে আঁচলটা লতিয়ে নেবার অলস ভঙ্গীতে সে যেন আজ অনেকটা প্রগল্‌ভ, কাণে রূপোর দুটো ঝুম্‌কো, পায়ে জরির ষ্ট্র্যাপ্‌-দেওয়া পাৎলা স্যাণ্ডেল, ঘাড়ের উপর খোঁপাটা তার ভাঙবে বলে'ও ভাঙছে না—সুমনা যেন উড়ছে। তার সমস্ত দাঁড়িয়ে-থাকাটি যেন আনন্দের একটা শিখা, সমস্ত মুখ বিশাল ফুলের মতো কাঁপছে যেন তার নির্লজ্জতার ঔজ্জ্বল্যে। সুমনাকে কোনোদিন এমন স্পষ্ট দেখায় নি—এতো উচ্চারিত, এতো উদ্দাম: বেশবাসে, তার সংক্ষিপ্ত, সম্বৃত বেশবাসে তাকে চিরকাল কেমন উদাস দেখাতো, কেমন অনুপস্থিত। সে যে সুন্দর তার শক্তিমত্তায় সে-কথা সে ভুলেই ছিলো এতোদিন। আজ যেন সারা শরীরে হঠাৎ তার ছুটি মিলেছে।

তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সুমনা বললে,—সকালে তুমি কী মনে করে'? বোসো।

সৌরাংশু চেয়ারে বসে' বল্লে,—তোমার কাছে আসতে হ'লে কিছু মনে করে' আসতে হয় নাকি?

সুমনা হাসলো, বল্লে,—ভাগ্যিস তবু এসেছিলে। আমার উইল-ফোর্স আছে বলতে হ'বে। সারা রাত কেবল তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সৌরাংশুও হাসলো: তারপর আনন্দে বুঝি খানিকটা সাজগোজ করলে।

—বা, আমি যে এখন বেরুবো।

—বেরুবে মানে? সকালবেলা মাষ্টারি তো আর করো না শুনলাম।

—তাই তো এতো সাজ, মুক্তির নীলিমা। সুমনার চোখ আবেশে পিছল হ'য়ে উঠলো: সবাইর আগে তোমার কাছেই তো এখন যাচ্ছিলাম, সবাইর আগে তোমাকে খবর দিতে।

সৌরাংশু কী বুঝলো তা সে নিজেই জানে, আনন্দের আকস্মিক অন্ধতায় সুমনার সে হাত চেপে ধরলো। স্থান ও কালের হিসেব গেলো ভুলে, তাকে টেনে নিয়ে এলো কাছে, আত্মার তাপমণ্ডলে। সমস্ত কথা হারিয়ে গেলো তার শরীরের স্তব্ধতায়।

স্খলিত একটি মুহূর্ত্ত। সুমনা আস্তে-আস্তে ফের সরে আসতে-আসতে বললে,—হ্যাঁ, তোমাকে খবর দিতে, এই আসচে পনেরোই মার্চ্চ আমি বিলেত যাচ্ছি।

—বিলেত যাচ্ছ? সৌরাংশু যেন এক নিশ্বাসে শুকিয়ে গেলো।

—হ্যাঁ, লণ্ডন। প্যাসেজ বুক্‌ করা হ'য়ে গেছে পর্য্যন্ত। মাঝে ক'টা দিন আর আছে বলো? সুমনা ম্লান একটু হাসলো: এখনো কতো কাজ।

—কই, আমি তো কিছু জানতে পাইনি।

—সব একেবারে ঠিকঠাক করে'ই জানাবো ভেবেছিলাম। কিছুই তৈরি ছিলো না, আমিও জানতাম না কিছু ঘুণাক্ষরে, সুমনার গলা উৎসাহে ঈষৎ ধারালো হ'য়ে উঠলো: হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেলো, সমুদ্র আমাকে ডাক দিলে।

—কিন্তু এমন তো কোনো কথা ছিলো না, সৌরাংশু শুকনো মুখে বল্‌লে,—ওখানে, বিলেতে তোমার কী ?

—আমার ভবিষ্যৎ। বিস্ফারিত আঁচলে সুমনা সহসা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : আমি আরো কিছু হ'বো, আরো কিছু করবো—এমনি একটা স্বপ্নের মহাদেশ। তুমি জানো, আমি ক'দিন থেকে স্বপ্নে কেবল সমুদ্রের ঢেউ দেখছি। উঃ, আমি যাবো, মাঝের এই দিনগুলোই শুধু যাচ্ছে না।

—সেখানে গিয়ে তুমি কী করবে ?

—কিছু একটা করবো নিশ্চয়ই, মেয়েদের পক্ষে যা সাধ্যতমো। সুমনা হাসলো : কিছু নেহাৎ করতে না পারি, বেড়াবো, লোক দেখে, দেশ দেখে, আকাশ দেখে, —বিস্তারিত করে' দেবো আমার অস্তিত্ব।

সৌরাংশু সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো তার মুখের দিকে। বললে,—এতো তোমার পয়সা হ'লো কবে ?

—পয়সা, পয়সার জন্যে আর ভাবি না। পয়সা ঠিক হ'য়ে যায়।

—বাড়ীর মত পেয়েছ ?

সুমনায় হাসিতে এলো এবার লজ্জার কুহেলিকা। কাণের ঝুমকোটা আঙুল দিয়ে অনুভব করতে-করতে ঈষৎ অন্যমনস্কের মতো বল্‌লে,—স্বচ্ছন্দে। বাড়ীর মত না পেলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে এক পা আমি বাইরে যেতে পারি কখনো ? বাড়ীর মত পেয়েছি বলে'ই তো—

—বলো কী ? অথচ তোমার ওপরেই তোমার সমস্ত পরিবার নির্ভর করে' আছে। তুমি চলে' গেলে তাদের চলবে কী করে' ?

—তারো একটা ব্যবস্থা হয়েছে বৈ কি। চলো, সুমনা নির্ভুল এক পা এগিয়ে এলো : একটা ট্যাক্সি নি। খানিকক্ষণ খুব বেড়ানো যাক্।

—না, তুমি বলো কী কথা। সৌরাংশু অন্ধকারে যেন ভূত দেখছে এমনি পাথুরে গলায় অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করে' উঠলো।

সুমনার চোখের পাতার মৃদুতম পালকটিও একটু কাঁপলো না। ঠোঁটের কিনারে হাসিটি তেমনি জ্বালিয়ে রেখে নির্জল গলায় বল্‌লে,—এই আসচে রবিবার আমার বিয়ে হচ্ছে।

—বিয়ে হচ্ছে ? সৌরাংশুর হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের থেকে মাটির উপর খসে' পড়লো।

—হ্যাঁ।

—কা'র সঙ্গে ?

—আছে সে একজন। ব্যক্তি হিসেবে না হ'লেও বিত্তহিসেবে নামজাদা। তার সঙ্গেই আমি বিলেত যাচ্ছি।

—তার সঙ্গেই তুমি বিলেত যাচ্ছ ?

কথার সুর শুনে সুমনা চম্‌কে উঠলো। ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—না, তুমি চলো বাইরে। সব কথা তোমাকে খুলে বলতে হ'বে।

—দরকার নেই, সঙ্ক্ষেপে বললেই আমি বুঝতে পারবো সমস্ত। সৌরাংশু চেয়ারের উপর সোজা হ'য়ে বসলো : কোন মাড়োয়ারি নাকি, না কোনো শিখ মোটর-ড্রাইভার ?

সুমনা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—না, অতোদূর যেতে হয় নি। কাছাকাছিই—পূর্ব্ববঙ্গের এক জমিদার, আমার সঙ্গে সবে মাস তিনেক আগে আলাপ হয়েছে—তাদের বরানগরের বাড়ীতে আমি সকাল বেলা পড়াতে যেতাম। সেই আলাপ—

বিদ্রূপে বিষিয়ে উঠে সৌরাংশু বল্‌লে,—সেই আলাপ ফেঁপে উঠলো এই ভালোবাসায় ?

—না ততো সময় ছিলো না, সুমনা মুখভাব তরল করে' আনলো : সেই আলাপে আমরা পর্ব্বতচূড়া থেকে একেবারে সমতল মাটিতে নেমে এলাম। আমাকে বিয়ে করা যায় কি না জানবার জন্যে ভদ্রলোক মা-কে সটান চিঠি লিখলেন। মা তো চেয়ে আছেন আমারই মুখের দিকে, আমি এবার আর মুখ ফেরালাম না। কারণ—

—কারণ, সৌরাংশু ডুবতে-ডুবতে বললে,—কারণ ভদ্রলোকের টাকা আছে।

—যদি তা বলো, আমি আপত্তি করবো না। সুমনার গলায় সামান্য একটা পরদা পর্য্যন্ত নেই ; নিশ্চিন্ত, নিস্পৃহ গলায় বলতে লাগলো : সে যে কতো টাকা আমি কল্পনায় ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারছি না। আমার সংসারের সমস্ত সমস্যা এক নিমেষে শেষ হ'য়ে গেছে। বিয়ের কথায়

রাজি হওয়া মাত্রই ভদ্রলোক মা-কে হাজার [illegible] টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, মানে, তাঁর নামে খুলে দিয়েছেন একটা ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট। তারপর আমাকে সঙ্গে করে' যাচ্ছেন ইউরোপ—আপাততো লণ্ডন, যতদিনে হোক্ যদি কিছু একটা পড়ে'-টড়ে' পাশ করতে পারি ইচ্ছে মতো—ততোদিন মা আর ছোট ভাইদের জন্যে আমাকে আর ভাবতে হ'বে না। এতোদিনে আমার ছুটি মিলেছে।

—এতোদূর? সৌরাংশু পীড়িত, নীরক্ত মুখে বললে,—এই কথা শুনে আমি কিছু মনে করবো না বলে' খানিক আগে তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে?

—মনে করা তো অন্তত উচিত নয়, যদি তুমি বুদ্ধিমান্ হও।

—যদি আমি বুদ্ধিমান্ হই?

—হ্যাঁ। কেননা, শুধু বুদ্ধিমান্ই এ সুযোগের সুবিধে নিতে পারে। সুমনা আরেকটা চেয়ার টেনে বসলো, অনেকগুলি কথা বলতে পেরে সে-ও যেন কতকটা হাল্কা হ'তে পেরেছে: বুদ্ধিমান্ হ'লেই ভাবের চেয়ে যুক্তিকে বেশি প্রাধান্য দিতে পারবে।

চেয়ারের মধ্যে সৌরাংশু ছট্‌ফট্ করে' উঠলো: এরি জন্যে তুমি আমাকে এতোদিন প্রতীক্ষা করতে বলেছিলে?

—কী করবো বলো, সুমনার গলা বেদনায় আবার কখন আর্দ্র হ'য়ে এলো: মানুষের জীবনে সুযোগ কখনো দুঃখের মতো ঝাঁক বেঁধে আসে না। নিজের অর্থে বাঁচতেই যদি এসেছি, নিজের প্রয়োজনে, তবে শুধু খেলার ছলে সুযোগ আমরা হারাতে পারি কী বলে'? জীবনের সবটাই যদি স্বপ্ন হ'তো তো তাতে সুখ থাকতো বটে, কিন্তু স্বাদ থাকতো না।

সৌরাংশু চেয়ার থেকে এক ঝট্‌কায় লাফিয়ে উঠলো: এই—এই তোমার ভালোবাসা?

সুমনা প্রশান্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে আপ্লুত করে' বললে,—জানি না। কিন্তু এটা যা-ই হোক্, আমার ভালোবাসার চেয়ে আমার ভবিষ্যৎ অনেক বড়ো জিনিস।

—তোমার ভবিষ্যৎ?

—হ্যাঁ, সুমনা একটুও নড়লো না, নির্বাপ্প, নিস্পৃহ গলায় বললে—আমার এই বৃহত্তরো অস্তিত্বের সাধনা। আমি অনেক কিছু হ'বো, অনেক কিছু করবো. অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বো,—আমার এই উদ্ধত স্বপ্ন। তুমি বলতে চাও, যদি সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাসো, সুমনা এখানেও একবার হাসলো: শুধু সেই একটা রঙিন কুহেলিকার মধ্যে থেকে আমার এই সার্থকতার সম্ভাবনাকে আমি সমূলে নষ্ট করে' দেবো?

—দয়া ক'রে তুমি ভালোবাসার কথা কিছু বোলো না।

—না, আমি চাইও না বলতে। আমি তার জন্যে নই, যেমন সূর্য্য নয় রাত্রির জন্যে। সুমনাও উঠে দাঁড়ালো: আমাকে তুমি যা-কিছু ভাবতে পারো, সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, হীনতর, আর যা-কিছু তোমার মনে হয়, কিন্তু তোমাকে একান্ত করে' ভালোবাসি বলে'ই বলছি, যাতে আমি সম্পূর্ণ না হবো, তাতে আমি বিশ্রাম পাবো না কোনোদিন। আমি ভালোবাসার জন্যে নই, আমার নয় সেই মুহূর্ত্তের অমরত্ব। আমার জন্যে, সুমনা সৌরাংশুর সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে এলো দরজার দিকে: আমার জন্যে বিরাট্ স্বার্থপরতা, আমাকে ক্ষমা কোরো, আমি বাঁচবার তীব্রতায় প্রতি মুহূর্ত্তে নিঃশেষ করে' মরতে এসেছি।

—কিন্তু, সৌরাংশু অতি কষ্টে বলতে পারলো, পুরুষ বলে'ই বলতে পারলো: কিন্তু আমার কথা তুমি একবার ভেবে দেখলে না?

—দেখেছি, ভেবে দেখেছি তোমারো একটা প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ আছে। সুমনা সমস্ত শরীরে আবার স্পর্শহীন, উদাস হ'য়ে গেলো: সেই ভবিষ্যতের তুলনায় আমার এই বর্ত্তমানটা তোমার কিছু নয়। শুধু কতোগুলো কথার দেয়াল দিয়ে তোমার সেই ভবিষ্যৎকে আমি সঙ্কীর্ণ করতে চাই না, তোমাকেও আমি ছুটি দিয়ে গেলাম।

—তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।

—কেননা আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পারতে না, মাত্র ভালোবাসায় কেউ সুখী হ'তে পারে না পৃথিবীতে। ভালোবাসাটাও মনের একটা আবহাওয়া, গুমোট করে' থেকে কোনোদিন বা ঝড় উঠে যেতে পারে।

—আর তোমার পূর্ব্ববঙ্গের আকাশেই কোনোদিন ঝড় উঠবে না ভেবেছ?

—উঠুক, কিন্তু সেটা দুঃখেরই হ'বে হয়তো, লজ্জার হ'বে না। তোমার-আমার মৃত্যুর চেয়েও লজ্জাকর হ'বে সেই তোমার-আমার ভালোবাসার মৃত্যু।

—শুনে কৃতার্থ হলাম। সৌরাংশু ঠাট্টায় ঝাঁজিয়ে উঠলো: কিন্তু একমাত্র টাকা দিয়েই পৃথিবীতে সুখ কিনে নিতে পারবে?

—আপাততো দু'টো জিনিষ তো পেলাম। সুমনা শব্দ করে' হেসে ফেললে।

—কী?

—মা ও ছোট ভাইদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা, আর আমার এই বিলেত যাওয়া—সমুদ্রের ওপর দিয়ে। হাসির জলে ধুয়ে সুমনার গলা ঠাণ্ডা, তরল হ'য়ে এলো: সুখ আমি চাই না, সুখ মানেই তো থেমে যাওয়া—আমি চাই এই যাত্রার রোমাঞ্চ, এই আমার দুঃসাহসিক অভিযানের মত্ততা—এর কাছে আমার বিয়েটাও একটা সাধারণ নৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র। যেমন আমাদের পার্থিব এই জন্ম মা'র জঠর থেকে। এই যে আমি চলতে পারছি এইখানেই পাচ্ছি আমি আমার জীবনের স্পন্দন, আমি পৃষ্ঠা উল্‌টে যাচ্ছি বারে-বারে। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, আমার সকল দুঃখের চাইতে সেই দুঃখই আমার বেশি হ'বে।

সৌরাংশু নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে এলো।

—যেয়ো না, দাঁড়াও। আমিও যে বেরুবো এক্ষুণি, তোমার সঙ্গে আরো যে আমার অনেক কথা আছে।

সুমনা তার পিছু নিলে। কিন্তু সে তখন গলির বাঁক প্রায় ছাড়িয়ে গেছে।

— উনিশ —

ধরণীবাবু ধম্‌কে উঠলেন: কিন্তু তবু সে একজন মানুষ, রুগ্ন অসহায়, তোর কাছে আছে অতিথি, এসেছে তোরই আশ্রয়ের আশায়, আর কোনো বোধ না থাক্, মানুষের প্রতি সামান্য একটা করুণাবোধও তোর নেই? তুই এতোদূর নেমে গেছিস?

ললিতা নিস্তেজ, বিস্তীর্ণ গলায় বললে—কই আর নামতে পারলাম? নামতে পারলে তো বেঁচেই যেতাম কবে! এর চেয়ে নারীর আর কী অধোগতি কল্পনা করা যায়? ধরণীবাবু রুক্ষ মুখে বললেন,—তোর স্বামী রুগ্ন, অক্ষম হ'য়ে তোর কাছে ফিরে এসেছে, আর তুই তার মুখের উপর তোর ঘরের দরজা বন্ধ করে' দিলি? তোর এতোটুকু কোথায় বাধলো না?

—কেউ তাকে ফিরে আসতে বলে নি, বাবা। তাকে চলে'ও যেতে বলেনি কেউ ঘটা করে'। তার খেয়াল হয়েছিলো, চলে গিয়েছিলো একদিন; খেয়াল হয়েছে ফিরে এসেছে আবার। এর মধ্যে আমি কোথায়?

—কিন্তু তোর জন্যেই সে ফিরে এসেছে জানিস?

—আমার জন্যে? ললিতার দুই চোখ ভুরুতে কুটিল হয়ে উঠলো: এতোদিন পরে বুঝি আমাকে তার মনে পড়লো—ধন্যবাদ তার স্মরণশক্তিকে। এতোদিন পরে আমার স্ত্রীত্ব বুঝি তাঁর কাছে মূল্যবান্ হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু আমার আত্মসম্মানের তো কিছু দাম নেই!

রাগে ধরণীবাবু অবশ, অসহায় বোধ করতে লাগলেন: স্বামীর কাছে নারীর আবার কিসের কী সম্মান?

—সে কথা তো তোমরা বলবেই। ললিতা বিবর্ণ একটু হাসলো: সে আমার স্বামী, শুধু এই একটা তথ্যের কাছে চিরকাল আমি বাঁধা পড়ে' থাকবো, সেখানেই আমার সংজ্ঞা, সেখানেই আমার অস্তিত্ব! কিন্তু কেন, কেন আমাকে এই অত্যাচার সইতে হ'বে বলো—শুধু এই একটা নামের অত্যাচার! ললিতার গলা শুকনো একটা কান্নার মতো শোনালো: আমার চেয়ে আমার একটা নাম এতো প্রধান হ'য়ে উঠবে?

ধরণীবাবু গলা নামালেন; বললেন,—কিন্তু তার এই শারীরিক অবস্থার কাছে তোর কোনো অভিমানই টিকতে পারে না, ললিতা। তাকে স্নেহ করতে না পারিস, সেবা করতে দোষ কী? সাধারণ মানুষ হিসেবেও সে তোর কাছ থেকে একটুকু দাবী করতে পারে না?

—এখানেও শুধু স্বামী বলেই পারছে, বাবা, সাধারণ মানুষ হিসেবে নয়। ললিতা এক পরদাও নেমে এলো না: সাধারণ মানুষ হ'লে কখনো সে তোমার মেয়ের সেবা পাবার জন্যে সরাসরি এ-বাড়ীতে ঢুকে পড়তো না, তুমিও উদারতায় এমন উথলে উঠতে না তার জন্যে। সাধারণ

মানুষ হ'য়ে সে সোজা হাসপাতালেই চলে যেতো। তোমার মেয়ে কিছু এমন নার্সিং-এর ট্রেনিং পায় নি।

ধরণীবাবু আবার তেতে উঠলেন: মহীপতিও যেতো, কিন্তু মরবার আগে তোকে একবার দেখতে চায় বলে'ই সে এখানে ছুটে এসেছে। তারো কিছু আয়োজন-সমারোহের ত্রুটি হ'তো না, কিন্তু তোরই জন্যে, আজ শুধু তোরই জন্যে সে সব-কিছু ফেলে দিয়ে এসেছে। মনে রাখিস সে জগদীশবাবুর ছেলে, টাকা-পয়সা সেবা-চিকিৎসা কোনো কিছুই তার অভাব হ'তো না সংসারে, কিন্তু আজ, অন্তত আজ, তুই ছাড়া আর কিছুই তার চিন্তনীয় নয়। দেখেছিস, একবার দেখেছিস তার চেহারা? এই শরীরে কেউ ট্র্যাভেল করবার রিস্‌ক্ নেয়, নিতে পারে? কিন্তু তবু, শুধু তোর জন্যে, তোকে একবার দেখবার জন্যে, তোর কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে, সে আজ মরতে পর্যান্ত প্রস্তুত। তার উপর এতোটুকু মায়া দেখাতে গেলে তোর মহিমা একেবারে ভস্মসাৎ হ'য়ে যাবে? তোর এতো অহঙ্কার কেন, কোথায় তুই এতো নিষ্ঠুরতা শিখলি?

ললিতা কোনো কথা বলতে পারলো না, এর উত্তরে কী-বা সংসারে বলবার আছে মানুষের?

হন্তদন্ত হ'য়ে নটু ছুটে এলো, বল্‌লে,—শীগগির এসো বাবা, মোটরে করে' সাহেব-ডাক্তার এসেছে।

ধরণীবাবু ব্যস্ত পায়ে নীচে নেমে গেলেন।

হায়, মানুষের অদম্য কৌতূহল, মোটরের থেকে মহীপতিকে যখন ধরাধরি করে' নামানো হয়, তখন জানলায় দাঁড়িয়ে, বোধকরি নিজেরো অলক্ষ্যে, ললিতা তাকে দেখেছিলো। তখনো তার শরীর নিঃশব্দ হাহাকারে ছিঁড়ে পড়ছে, অসহায়তার ভারে ঘরের এক কোণে সে ছিলো বসে', স্তূপীভূত হ'য়ে, তার চোখের সামনে অন্ধকার গলে'-গলে' কখন ভোর হ'য়ে গিয়েছিলো কিছু তার খেয়াল নেই; অথচ যখন বাড়ীর দরজায় মোটর এসে দাঁড়ালো, শোনা গেলো বহু কণ্ঠের মিলিত ব্যস্ততা, বাবার উত্তেজিত কথাবার্ত্তা, কখনো বা উদ্বিগ্ন কাতরোক্তি, তখন সে পারেনি আর চুপ করে' বসে' থাকতে, পারে নি একটু না দাঁড়িয়ে জানালার ধার ঘেঁসে। সত্যি কে এলো? সত্যি মহীপতিই এলো কি না। কী করে' সে আসতে পারলো নির্লজ্জের মতো? সন্ন্যেসির এখন কী রকম না-জানি চেহারা হয়েছে!

মহীপতিকে চিনতে তার আর চোখের পলক ফেলতে হয় নি। বিছানায় শোয়া অবস্থায় তাকে চারজন লোক বাড়ীর মধ্যে খুব আস্তে-আস্তে বহন করে' নিয়ে আসছে। চামড়া দিয়ে মোড়া অসংলগ্ন কতোগুলি হাড়—মূর্ত্তিমান্ একটা আতঙ্ক। ললিতা ক্ষিপ্র হাতে জানলাটা বন্ধ করে' দিয়েছিলো, রাগে, অপমানে, যেন বা অসম্ভব হতাশায়। সামান্য ঐ এক আঁটি হাড়ের কিনা এতো ভার, এতো অবহনীয় উৎপীড়ন! এমন কি, মৃত্যুতেও সে তার জন্যে এতোটুকু মুক্তি রাখলো না? এতোকাল বিস্মৃতি দিয়ে শাসন করে' এসেছে, আজ নিয়ে এসেছে মৃত্যুর উপদ্রব? ললিতা দুই হাতে জানলাটা বন্ধ করে' দিলো। পথে সে এর চেয়ে আরো অনেক দুর্দর্শ রোগ দেখেছে, অনেক ক্লিষ্টতা, অনেক মৃত্যু, কিন্তু কোনোদিনই সে ঝাঁপিয়ে পড়েনি তাদের সাহায্যে, এক তিল সহানুভূতিতে হয় নি প্রসারিত। এই আগন্তুকই বা তার কে? বিশাল জনতার সমুদ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত শুধু একটা ঢেউ। ললিতা নিষ্ঠুরতায় জ্বলতে লাগলো।

কিন্তু জানা গেলো, সাহেব-ডাক্তার ধরণীবাবুকে বিশেষ আশান্বিত করতে পারেন নি। এখন শুধু নাকি ঈশ্বরের করুণা।

আশ্চর্য্য, আজ ললিতাই কিনা মহীপতির ঈশ্বর। আশ্চর্য্য, তারই নাকি করুণার কোনো অন্ত নেই, তাকেই কিনা সেই অকৃপণ করুণায় আজ অবারিত হ'য়ে উঠতে হ'বে। অথচ এতোদিনে, আজ ভোর হওয়ার আগেও সে মরতে পারলো না, না বা পারবে সে তার এই লাঞ্ছনার ন্যায্য প্রতিশোধ নিতে। তাকে আজ সে সবলে একরাশ ঘৃণ্য আবর্জ্জনার মতো প্রত্যাখ্যান পর্য্যন্ত করতে পারবে না। সেদিন ছিলো বা যদি সে দস্যু তার উদ্ধত বৈরাগ্যে, আজ সে অক্ষম, অনুনয়ে শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল: দু' জায়গাতেই ললিতা হেরে গেলো। সেদিন সে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি, আজো পারবে না ফিরিয়ে দিতে। বারে-বারে সে-ই কেবল ফিরলো।

উপায় নেই, ললিতাকে যেতে হ'লো নীচে, মহীপতির ঘরে। তার শরীরের সেই অবস্থায় তাকে উপরে তুলে আনা সম্ভব ছিলো না। সৌরাংশুর বিশৃঙ্খল ঘরে, আপাততো তারই তক্তপোষের উপর কোনো রকমে একটা বিছানা করে' তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেই সৌরাংশুর ঘরে ললিতা আবার নেমে এলো। এবারো ভয়ে-ভয়ে, প্রতি পায়ে থেমে-থেমে। এখনো এই দিনের আলো সেই অন্ধকারের মতোই আতঙ্কিত। দেয়ালে-দেয়ালে কল্পনার সেই অশরীরী ছায়া।

শুধু তার বেশ-বাসেই নেই সেই ছটা, মুক্তির সেই বিস্ফারণ। সে যেন তার অস্তিত্ব থেকে নিশ্চিহ্ন গেছে মুছে, তার পরনের সাড়ীটা যেন শুদ্ধ একটা কবরের আস্তরণ। সে যেন বহন করছে না তার শরীর, তার শরীরই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

মহীপতি রোগা, অস্ফুট গলায় বললে,—কে?

কাল যে জায়গায় এসে সে দাঁড়িয়েছিলো, অলক্ষ্যে সেইখানটিতেই ললিতা সরে' এলো।

—ও! তুমি? মহীপতি চাঞ্চল্যের চেষ্টা করলে, কিন্তু শরীর তাকে উঠে বসতে দিলো না। তরল, প্রায় প্রসন্ন গলায় বললে,—এতোক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমি এই সাদা দেয়ালটার দিকে চেয়ে ছিলাম। আমি জানতাম, তুমি আসবে।

এতো সহজে ললিতা তার ফণা গুটোতে পারলো না; বললে, জ্বলে' উঠে বললে,—আমি জানতাম না তুমি আবার আসতে পারো।

—আমিও জানতাম না। মহীপতি বিশীর্ণ একটু হাসলো: কিন্তু প্রচণ্ড প্রকৃতির পরিহাস। এই নিষ্ঠুর বহিঃপ্রকৃতির। সন্নেসি হ'লে কী হ'বে, তাকে জয় করতে পারলাম না। আমাকে ধরলো এসে এই কালরোগ, সেইদিন আমার প্রথম মনে পড়লো, সন্নেসিরো শরীর আছে। এক নিমিষে আমার সমস্ত গর্ব্ব গেলো শেষ হ'য়ে, আমি হেরে গেলাম। শরীরের সঙ্গে পেরে উঠলাম না। পারলাম না তাকে ছাড়িয়ে যেতে।

ললিতা তার দিকে শূন্যায়মান চোখে চেয়ে রইলো। কোথায় সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তি, কোথায় বা সেই তার মহীয়ান দৃপ্ততা—জীর্ণ একটা কঙ্কালে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে পড়ে' আছে। কোথাও এতোটুকু স্পর্শের নিমন্ত্রণ নেই—রাশীভূত আবর্জ্জনা। তার নিশ্বাস লেগে ঘরের সমস্ত হাওয়া যেন পঙ্কিল, অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছে। তার এই শারীরিক উপস্থিতিটা যেন মূর্ত্তিমান্ একটা পাপ। ঘৃণায় ললিতা দগ্ধ হ'য়ে যেতে লাগলো।

বললে,—কিন্তু এতো অসুখ নিয়ে এখানে চলে' আসবার কী হয়েছিলো?

—আমি সেই নির্জ্জনতায় বসে' কিছুতেই মরতে পারলাম না, মহীপতির দুই নিষ্প্রভ চোখ বেদনার দীপ্তিতে হঠাৎ বিহ্বল হ'য়ে উঠলো: যখন শত সন্ন্যাসেও নশ্বর শরীরকে কিছুতেই বশীভূত করা গেলো না ললিতা, তখন আমার সমস্ত কথা মনে পড়ে' গেলো—বাঙলা-দেশের কথা, বাড়ী-ঘরের কথা, তোমার কথা। আমি এই অসুস্থ দেহে প্রথম বাড়ীতেই গিয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু শুনলাম তুমি সেখানে নেই। চোখ দিয়ে ললিতার মুখের নাগাল পাবার জন্যে মহীপতি কাৎ হ'তে চেষ্টা করলো, কিন্তু শরীরে নেই এতোটুকু প্রশ্রয়। বললে,—বাবা-মা সেবা-চিকিৎসার তুমুল একটা আয়োজন করলেন, কিন্তু মন না ভরলে শরীর সারবে কী করে'? মা-কে তোমার কথা জিগ্‌গেস করলাম, শুনলাম—তোমার সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক নাকি উঠে গেছে, তোমার নামোচ্চারণ করাও নাকি ভীষণ কলঙ্কের কথা।

ললিতা জ্বলে' উঠলো: কেন, তা জিগ্‌গেস করেছিলে?

—করেছিলাম। প্রশান্ত গলায় মহীপতি বললে,—কিন্তু তাতে তোমার ওপর আমার ভক্তি আরো বেড়ে গেলো, ললিতা। শুনলাম, তুমি আমাকে কায়মনোবাক্যে অস্বীকার করেছ, যা-কিছু তোমার জীবনে মৃত, অপহৃত, তার প্রেতমূর্ত্তির তুমি পূজো করতে চাও নি। খবরটা শুনে আমি অন্তত আহত হইনি, ললিতা, বরং,—মহীপতির গলা মমতায় কোমল হ'য়ে এলো: বরং তোমার প্রাণের উত্তপ্ত পরিচয় পেয়ে তোমাকে যেন আমি আরো গভীর ভালোবেসে ফেললুম। তোমাকে পাবো না, এই সত্যটি যেন আমাকে ক্ষণে-ক্ষণে আলোড়িত করতে লাগলো,

তোমাকে. আমি চাই। মা-কে বললাম, তোমাকে কোনরকমে নিয়ে আসা যায় কিনা। কিন্তু যে আমাকে অপমান করেছে, বাবা-মা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন, তার নিশ্বাস পর্য্যন্ত তাঁরা সইতে পারবেন না, আমারই বা কেন এই অশোভন পক্ষপাত? আমি তাঁদের কোনো কথা শুনলাম না, ঝগড়া করলাম, লোকজন জোগাড় করে' পালিয়ে এলাম কলকাতা। তখনো আমার শরীরে যেন কিছুটা সামর্থ্য ছিলো, কিন্তু এখন একেবারে ভেঙে গেছি।

—সত্যি, তোমারই বা কেন এই অশোভন পক্ষপাত? ললিতা মলিন ম্রিয়মাণ গলায় বললে,—যখন তোমাকে আমি অপমান করেছি জানলে, যখন সমস্ত সম্পর্ক তুলে নিয়েছি একেবারে, তখন কেনই বা তুমি এইখানে আসতে গেলে? তোমার শরীরের কী বিপজ্জনক অবস্থা তা তুমি জানো না?

—তুমি আমাকে অপমান করেছ! মহীপতি মুগ্ধের মতো তার দিকে চেয়ে রইলো: তুমি যে আমাকে সত্যি অপমান করতে পারলে সেইখানেই তো আমি মূল্যবান্ হ'য়ে উঠলাম, তখনই তো আমার বাঁচতে আবার ইচ্ছে হ'লো। আমাকে যে অপমান করতে পারলে সেইখানেই তো তোমার মহিমা, ললিতা। সেইখানেই তো তুমি সুন্দর।

—কিন্তু আমার কাছে তুমি এখন কি আশা করতে পারো?

—আমি কিছুই আর আশা করি না। শুধু তোমাকে আমি একটিবার দেখতে এসেছি। মহীপতি শিশুর মতো সরল কাতরতায় বললে,—একটিবার আমার কাছে এসে বসবে, ললিতা?

ললিতা রুদ্ধ, গম্ভীর গলায় বললে,—না। আমি অশুচি, আমি কলঙ্কিত।

—তুমি কলঙ্কিত?

—হ্যাঁ, আমি একজনকে ভালোবাসি।

—তুমি একজনকে ভালোবাসো, সেইজন্যে তুমি কলঙ্কিত? রোগা, বিবর্ণ মুখে মহীপতি অদ্ভুত হেসে উঠলো: কে বললে! আমারো চেয়ে কলঙ্কিত তুমি? আমার এই রোগ, এই জরা, এই পরাজয়—এর চেয়ে কলঙ্ক, এর চেয়ে পাপ? আর কিছু থাকতে পারে পৃথিবীতে তুমি ভালোবাসো, তুমি ভালবাসতে পেরেছ, এই তো তোমার গৌরব ললিতা। তবু একটিবার আমার কাছে এসে বসবে? আমার প্রতি তোমার এই ঘৃণা, অন্যের প্রতি তোমার সেই ভালোবাসা, তোমার ব্যক্তিত্বের এই পবিত্রতাকে একটিবার আমাকে স্পর্শ করতে দেবে, ললিতা?

ললিতা যেন এক নিমেষে শূন্য হ'য়ে গেলো, নিরস্ত্র, নিঃসহায়। পায়ের নীচে দাঁড়াবার তার আর নেই মাটি, ঊর্দ্ধে হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরবার তার আর নেই কোনো আকাশ। শুধু সামনে সৌরাংশুর তক্তপোষের উপর মহীপতি আছে শুয়ে।

মহীপতি আবার বললে,—তুমি যে আমাকে অস্বীকার করতে পারলে, আমাকে উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতে পারলে, সেইখানেই তো তুমি দীপ্ত, অকলঙ্ক। আমার জন্যে যে তুমি প্রতীক্ষা করে' থাকো নি নিশ্চল পঙ্গুতায়, তুমি যে প্রসারিত হ'য়ে পড়েছ চেতনা থেকে চেতনায়, আবিষ্কার করেছ নিজেকে নিজের রহস্যে—সেইখানেই তো তুমি বাঁচলে, সেইখানেই তো তুমি একান্ত করে' সত্য হ'য়ে উঠেছ। তাই দেখতেই তো আমি এই অসুখ নিয়েও এখানে ছুটে এসেছি। আমিও তাই আর এ-মুহূর্ত্তে ব্যর্থ নই, ললিতা।

ললিতা স্বপ্নাবিষ্টের মতো এক পা এগিয়ে এলো। বললে,—আমার মনের এই পরিবর্ত্তন কি তুমি মেনে নিতে পারবে না?

—প্রচুর মেনে নিতে পারছি, মনে-প্রাণে করছি আমি এর প্রচুরতরো সম্মান। মহীপতি বিছানার উপর আস্তে তার একখানি হাত প্রসারিত করে' দিলো: জীবনের বিচিত্রতরো সম্ভবনীয়তাকে আমার চেয়ে এ-মুহূর্ত্তে কেউ আর বেশি শ্রদ্ধা করতে পারছে না, ললিতা। আমার শরীরে, সেই আমার সবল প্রফুল্ল শরীরে, এই পরিবর্ত্তন হ'তে পারে, আর তার কাছে মন, তোমার মন—মানুষের মন! মহীপতি দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেললো: আমার এই শরীরের কুৎসিত পরিবর্ত্তনের চেয়ে তোমার মনের সেই রূপান্তর কতো সুস্থ, কতো সুন্দর, কতো ঐশ্বর্য্যময়। ও কী

ললিতা, তোমার চোখে জল কেন? মহীপতি অস্থির হ'য়ে উঠলো: না, না, তোমার কিছু ভয় নেই, আমি তোমার জীবনে বাধা হ'বো না, বিন্দুতমো বাধা হ'বো না। বরং সংসারে তোমার সেই সত্যকে আমি প্রতিষ্ঠিত করবার সাহায্য করবো। কিছু তোমার ভাববার নেই, আমার মতো শত-লক্ষ এই হেরে যাওয়ার চাইতে তোমার মতো একটি সার্থকতায় ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি ধন্য হ'য়ে ওঠে। আমি তোমার কেউ নই, কিছু নই, আমি চিরকাল সত্যের পূজো করে' এসিছি, তোমার এই সত্যকেও আমি পূজো করবো।

ললিতা কোনো কথা বললো না, ধীরে-ধীরে তার বিছানার পাশটিতে এসে বসলো। তার নির্ব্বাপিত দুই চক্ষু থেকে অশ্রুর দীর্ঘ দু'টি ধারা নেমে এসেছে।

—না, না, কিছুই তোমার ভয় বা দুঃখ করবার নেই। আমি সেদিনো যেমন মুছে গিয়েছিলাম, আজও তেমনি মুছে যাবো। শুধু তারই আগে দেখতে চেয়েছিলাম তোমার এই সত্যের উদ্ঘাটন। কিছুই তোমার কাছে আমার আর আশা নেই, ললিতা, শুধু তুমি তোমার সত্যে উদ্ধত হ'য়ে ওঠো। তাই দেখবার জন্যেই আমি এসেছি, আমি একটু সুস্থ বোধ করলে কালকেই আবার চলে' যাবো না-হয়।

ললিতা সন্তর্পণে মহীপতির কপালের উপর একখানি হাত রাখলো। বেদনায় কোমল সেবায় বিনম্র একখানি হাত।

মহীপতি বললে,—পৃথিবীর সমস্ত প্রাণে যে নিয়ম অব্যাহত হ'য়ে বিরাজ করছে, মানুষে আর গাছে, পশুতে আর পতঙ্গে—সেই প্রেম, তোমার সেই প্রেমকে আমি ককখনো অশ্রদ্ধা করতে পারবো না। ইন্দ্রিয়ের রশ্মিজালে সেই অতীন্দ্রিয়ের আরতি। সেই প্রাণনায় প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে অতিক্রম করে' যাওয়া, সেই বিস্ময়, সেই অপরিপূর্ণতা। আমিও হয়তো একদিন তারই সন্ধানে যাত্রা করেছিলুম। আমি না-হয় ফিরে এসেছি, কিন্তু তুমি থামবে কেন, তুমি কেন চোখের জল ফেলছ?

মহীপতির কপালে ধীরে-ধীরে হাত বুলুতে-বুলুতে ললিতা বললে,—তুমি বেশি কথা বোলো না, ডাক্তার তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলে' গেছেন।

—কিন্তু তুমি আর কাঁদবে না বলো? মহীপতি সেই একখানি হাত তাঁর মুখের উপর চেপে ধরলো।

—না, আমি কাঁদবো কেন? ললিতা শুকনো, শূন্য চোখে চেয়ে বললে,—আমার আর কী দুঃখ?

সমাপ্ত

গীতার যোগ

(২য় খণ্ড)

নবম পরিচ্ছেদ

সপ্তম অধ্যায়ের "জরামরণমোক্ষায়" ইত্যাদি শ্লোক শ্রবণ করিয়া "কিম্ তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মম্" ইত্যাদি শ্লোকে অর্জ্জুন আটটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সবগুলির উত্তর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমাহিত-চিত্ত পুরুষগণের মরণকালে কি উপায়ে ভগবান জ্ঞানগম্য হন, সেই কথা বলিয়া "অক্ষর ব্রহ্মযোগ" নামক অষ্টম অধ্যায় শেষ করিতেছেন।

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্"—বর্ত্তমান অধ্যায়ের পঞ্চমশ্লোকে এই কথার একবার উত্তর হইয়াছে। আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে 'মর্য্যর্পিত-মনোবুদ্ধি' হইয়া তনুত্যাগের সুযোগ সকলের হয় না,—এই জন্য ইষ্টের প্রতি অনন্যানুরক্তির অভ্যাস-যোগের দ্বারা চেতনাকে উর্দ্ধগামী করিয়া যে রাখে, সেই এই পরমতত্ত্বে আশ্রয় পায়।

ভারতের ধর্ম্মতত্ত্বে জন্মমরণ হইতে অব্যাহতি-লাভের কথা অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই হেতু কৃষ্ণ—লোক-প্রসিদ্ধ শাস্ত্রনীতি অর্জ্জুনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া ধরিতেছেন। নিম্নোক্ত শ্লোকে যে কালে মৃত্যু হইলে, সাধক জন্ম-মৃত্যুর অতীত হয় এবং তাহার বিপরীত অবস্থাপ্রাপ্তির কালও নির্ণয় করিয়া তিনি শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তম্ কালম্ বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩"

হে ভরতর্ষভ! যত্র (যস্মিন্) কালে প্রযাতাঃ (মৃতাঃ) যোগিনঃ (উপাসকাঃ, কর্ম্মিনশ্চ) তু (যথাক্রমম্) অনাবৃত্তিম্ (অপুনরাগমন-রূপম্) আবৃত্তিম্ (পুনরাগমন-রূপম্) চ এব যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) তম্ কালম্ (ফলাভিমানিনিভিঃ দেবতাভিঃ উপলক্ষিতম্ মার্গম্) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি)।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে সময়ে মৃত্যু হইলে সাধকেরা যথাক্রমে অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় বর্ণন করিতেছি।

এখানে 'কাল'-শব্দের অর্থ 'সময়' করিলে শ্রুতি-স্মৃতির সহিত বিরোধ হয়; এইজন্য শ্রীমৎ শঙ্কর 'কাল'-শব্দের অর্থ 'মার্গ' করিয়াছেন। শ্রুত্যাদিতে প্রসিদ্ধ দেহান্তরের পর দুইটী স্বতন্ত্র মার্গ নির্দ্দিষ্ট আছে।

সাধক প্রাণোৎক্রমণের পর কিরূপ প্রণালীতে কোন্ মার্গ অবলম্বন করে, তাহা ছান্দগ্যোপনিষদে বিশেষ করিয়া উল্লেখিত আছে। এই বিষয়ে শ্রৌত প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া 'গীতার যোগ' ভারাক্রান্ত করিব না। 'কাল'শব্দের অর্থ, গৌণার্থেই গৃহীত হইয়াছে; কালের এক গৌণার্থ সংযোগ; যাহার কর্ম্ম যেরূপ, দেহান্তে সে সেইরূপ মার্গ-সংযোগ প্রাপ্ত হয়। উৎক্রান্তির ক্রম-বিবরণ ব্রহ্মসূত্রের প্রথমেই এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, "বাঙমনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ" অর্থাৎ মরণকাল উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ বাগ্‌বৃত্তি মনে লয়-প্রাপ্ত হয়; তারপর অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও বৃত্তিহীন হইয়া মনেই লীন হইয়া পড়ে, মনও ধীরে ধীরে প্রাণে লীন হইয়া যায়। অতঃপর সেই প্রাণ বৃত্তি-হীন হইয়া জীবে লীন হয়। এইরূপ প্রাণসংযুক্ত জীব দেহের বীজভূত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে অবস্থিত হইয়া, ধীরে ধীরে স্থূল দেহকে পরিত্যাগ করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে মৃত্যুকালে উভয়েরই সমান অবস্থা ঘটিয়া থাকে। সূক্ষ্ম ভূত-প্রপঞ্চ লিঙ্গ-দেহ রূপে মরণান্তে দেহীকে আশ্রয় করিয়া পরলোকে প্রস্থান করে। বলা বাহুল্য, এই শরীর অপ্রতিহত ও অদৃশ্য। স্থূল শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব দীর্ঘতর কালস্থায়ী। মৃত্যুকালে এই যে ভিতরে ভিতরে সংযোগ রঙ্গ চলিতে থাকে, তাহাতেই জীবদেহের নানা প্রকার ভঙ্গী প্রকাশিত হয়। জীবাত্মা

মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া যখন হৃদয়-মধ্যস্থিত নাভির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া দাঁড়ান, তখন মুমূর্ষুর কেন্দ্রীকৃত চেতনা হৃদয়ে সমুজ্জল হইয়া উঠে। এই অবস্থায় ভবিষ্যতে যে দশাপ্রাপ্ত হইবে, সারা জীবনের কর্ম্মাদি সংস্কার হেতু সেই সেই বিষয়ের ভাবনার উদ্ভব হয়। সূক্ষ্ম শরীরের সহিত এই সময়ে ভাবনাময় শরীরও সংযুক্ত হয়, তারপর উৎক্রমণ ঘটিয়া থাকে। প্রয়াণ-কালে এই হেতু "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবম্" এই শ্লোকানুযায়ী জীব 'তদ্ভাব-ভাবিত' সেই সেই অবস্থাই লাভ করে,ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে।

"যোগিনঃ" শব্দের অর্থ 'যুক্ত-চেতসঃ' অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনায় আসক্তচিত্ত। বেদ হইতেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে; বেদের জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তিত উভয় শ্রেণীর সাধকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মার্গদ্বয়ের কথা অতঃপর উক্ত হইতেছে।

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥"

অগ্নির্জ্যোতিঃ (শ্রুত্যুক্তা অর্চ্চিরাভিমানিনী দেবতা) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণরূপা ষণ্মাসা ইতি উত্তরাভিমানিনী দেবতা) এতাসাং যো মার্গঃ) তত্র প্রযাতা (গমনশীলাঃ) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মোপসনাপরায়ণাঃ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্মমাপ্নুবন্তি)। অগ্নি ও জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ-রূপ ছয় মাস, এই পথে গমনশীল ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্র-কথিত দেবযান-মার্গের ইহাতে আভাষ পাওয়া যাইতেছে। দেবযানের প্রথম সোপান অগ্নি। যাঁহারা ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ, উৎক্রমণের পর তাঁহারা প্রথমতঃ অগ্নি, তদনন্তর জ্যোতি, দিবস, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণের ষণ্মাস, এই কয় স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা নীত হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। ছান্দোগ্য ও কৌষিতকী উপনিষদে উৎক্রান্তির পর জীবাত্মার এই প্রকার ক্রম-মুক্তির কথা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। এই হেতু এই বিষয় লইয়াও আমরা বিশদ আলোচনা করিব না। সাধক অর্চ্চির্লোকে উপস্থিত হইবামাত্র, তত্রত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাকে পর পর লোকে লইয়া চলেন। এইরূপ পর পর অভিগমনের ফলে জীবাত্মার চৈতন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; পরিশেষে, ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহার ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হয়। 'ব্রহ্ম'শব্দের দুইটী অর্থ এই ক্ষেত্রে অবধারণ করিতে হইবে—এক সর্ব্বময় সর্ব্বানুস্যূত পরমব্রহ্ম, আর এক হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা। জ্ঞানোপাসকদের শেষোক্ত ব্রহ্মের সহিতই যুক্তি ঘটিয়া থাকে; সে ব্রহ্মের শতবর্ষ আয়ুঃ। এই হেতু এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ক্রমমুক্তির দ্যোতক, ইহা বলাই বাহুল্য। অতঃপর কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তিত সাধকদের কথা বলা হইতেছে।

"ধূমঃরাত্রিস্তথা কৃষ্ণ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ম্।

তত্র চান্দ্রসম্ জ্যোতিঃ যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥"

ধূমঃ, রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণঃ পক্ষাভিমানিনী দেবতা) তথা দক্ষিণায়ণম্ (দক্ষিণায়ণ-রূপা ষণ্মাসা) তত্র যোগী চান্দ্রমসম্ জ্যোতিঃ (স্বর্গলোকম্) প্রাপ্য নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্ততে)॥

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন ছয় মাস এই মার্গে প্রয়াণশীল যোগী স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হন।

ইহাই পিতৃযানের কথা। চন্দ্র দেবতাগণের অন্নস্বরূপ, কর্ম্মিগণ যখন ধূমাদিমার্গ দ্বারা চন্দ্রের স্বরূপ লাভ করেন, তখন তাঁহারা দেবতাদিগের উপভোগ্য হন। তাঁহারা স্বর্গলোকে দেবতাদিগের সহিত সুখে ক্রীড়া করেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে, পুনরায় তাঁহাদের মর্ত্ত্যলোকে পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী জীবদেহ ধারণ করিতে হয়।

"শুক্লকৃষ্ণেগতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬"

জগতঃ শুক্লকৃষ্ণে শুক্লা (অর্চ্চিরাদি গতি) কৃষ্ণা (ধূমাদিগতিঃ) এতে গতী হি (প্রসিদ্ধে মার্গ) শাশ্বতে (অনাদি) মতে (সংজ্ঞাতে) (সংসারস্য অনাদিত্বাৎ তয়োঃ) (একয়া (শুক্লয়া) অনাবৃত্তিম্ (মোক্ষম্) যাতি, অন্যয়া (কৃষ্ণয়া) পুনরাবর্ত্ততে।

শুক্ল কৃষ্ণ, দুই পথ জগতে নিত্যসিদ্ধ, শুক্লপক্ষের দ্বারা সাধক অনাবৃত্তি, ও কৃষ্ণপক্ষের দ্বারা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হন।

ইহা উভয়মার্গের উপসংহার। জ্ঞান-কর্ম্মাধিকারীদের অনাদি-সম্মত এই উভয় পথের কথা জগতে প্রসিদ্ধ আছে। যাঁহারা বেদানুবর্ত্তিত সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া যে মার্গদ্বারা সংসারে পুনরাগমন করেন, তাহাকে পিতৃযান বলে; আর যাঁহারা অনন্যচিত্তে ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা ব্রহ্মত্ব-রূপ মোক্ষ লাভ করেন। অতঃপর প্রসিদ্ধ শাস্ত্রোক্তি যথাযথ বর্ণনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন।

"নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।"

হে পার্থ! এতে এতদুভয়ের সৃতী (মার্গৌ)—মোক্ষ-সংসার প্রাপকৌ মার্গৌ) জানন্ (নিশ্চিন্বন্) কশ্চন যোগী (যোগনিষ্ঠঃ) ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্তঃ ন ভবতি) তস্মাৎ (তদ্ধেতৌ) সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব।

হে পার্থ! এই উভয় সংসার ও মোক্ষপ্রাপ্তির পথের কথা জ্ঞাত হইয়া যোগনিষ্ঠ কোন ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হন না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি নিয়ত সমাহিত-চিত্ত হও। গীতার ইহাই মহাবাণী। একাধিক'বার মোক্ষ-তত্ত্ব এবং সংসার-ধর্ম্ম এই উভয় লক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তর্জ্জনীসঙ্কেতে ধর্ম্মজীবন-লাভের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। লোকপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রমর্ম্ম অবজ্ঞা না করিয়া, অতি সংক্ষেপে অর্জ্জুনের নিকট সেই সকল উপস্থাপন পূর্ব্বক তিনি সন্তর্পণে আপনার অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। অনাবৃত্তির দিকে ভারতের সাধকবৃন্দ একান্ত আকৃষ্ট-চিত্ত বলিয়া, তিনি এই অনাবৃত্তির নির্দ্দেশ দিতে গিয়া অষ্টম অধ্যায়ে তিন বার দিব্য জীবনেরই সঙ্কেত দিয়াছেন। এই অধ্যায়ের ২০।২১ শ্লোকে "অব্যক্তাৎ পরঃ" অন্য অব্যক্ত যে সনাতন ভাব, যাহা সর্ব্বভূত পদার্থের নাশেও নষ্ট হয় না, তাহাই শ্রীভগবানের পরমধাম বলিয়া তিনি যোগীকে পরমা ভক্তির পথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তারপর, এই শ্লোকে শাস্ত্রোক্ত উভয় পথে বিমোহিত না হইয়া সর্ব্বকালে ভগবানে যোগযুক্ত হওয়ার কথাই অনাবৃত্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল।

অর্জ্জুনের আটটী প্রশ্নের উত্তর শেষ করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার হইতেছে। "গীতার-যোগ" ইহাতে অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে।

"বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলম প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরম্স্থানম্ উপৈতি চাদ্যম্॥

বেদেষু, যজ্ঞেষু, তপঃসু চ এব যৎ পুণ্যফলম্ প্রদিষ্টম্ (উপদিষ্টম্) ইদম্ (ময়োক্তম্ তত্ত্বম্) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) যোগী তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি (অতিক্রমতি) আদ্যম্ (মূল-ভূতম্) পরম (উৎকৃষ্টম্) স্থানম্ পদম্ উপৈতি (প্রাপ্নোতি)।

বেদে, যজ্ঞানুষ্ঠানে, তপস্যায়, দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া যোগী সেই সমুদয় অতিক্রম করিবে। সকলের যে মূলীভূত পরমতত্ত্ব তাহাই প্রাপ্ত হইবে।

জীবের মধ্যে পরিমিত সাধ্য উদ্যত করিয়া যে ধর্ম্মসাধন বা ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক সদনুষ্ঠান ও অপরটী হৃদয়-পুণ্ডরীকে আত্মতত্ত্বের অনুধ্যান। মরণান্তে এই উভয় পথের যাত্রী যে মার্গে যে ফলপ্রাপ্ত হয় তাহা, পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে। ধ্যানীর দেবযান ও কর্ম্মীর পিতৃযান। জ্ঞান প্রকাশাত্মক বলিয়া দেবযান শুক্ল; স্বর্গলাভাদি কামনাসংযুক্ত কর্ম্মে উক্ত জ্ঞানাভাব হেতু পিতৃযান কৃষ্ণমার্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সংসার-চক্র অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত; এইউভয়বিধ মার্গ-ও চিরপ্রসিদ্ধ। জ্ঞানী ভোগাধিকার পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টির মূল বীজে বিশ্রাম লাভ করেন; কর্ম্মী চাহেন ভোগ ও অধিকার। মৃত্যুর পর এই হেতু সংযত-চিত্ত সাধকের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা এইটুকু বলিলেই সিদ্ধ হয় না। কেন না প্রশ্ন উঠিয়াছে জ্ঞানীর কণ্ঠ হইতে নহে, পরন্তু ভক্তির কণ্ঠ হইতে। অষ্টম প্রশ্নের উত্তর সাতাশ শ্লোকেই প্রদান করা হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে আছে—

অনন্যচেতা সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ

নিত্যযুক্ত সাধক মরণকালে ভগবানকে কেমন করিয়া লাভ

করিবে, ইহাই ছিল অর্জ্জুনের প্রশ্ন। তাহার উত্তর দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অনেক কথাই বলিতে হইয়াছে ; কেননা, ভারতে তত্ত্বানুশীলনের যে সকল অভিব্যক্তি আছে, তাহার সম্যক্ বিশ্লেষণ প্রয়োজন ছিল। অর্জ্জুনকে সকল দিক্ দেখাইয়া তিনি তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছেন।

মানুষের আহঙ্কারিক স্বাতন্ত্র্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অপৌরষেয় ভাগবত তত্ত্বে লীন হইয়া যায় এবং তাহার আহঙ্কারিক প্রকৃতি যতক্ষণ না পুরুষোত্তমের দিব্য প্রাকৃতিতে সংযুক্ত হয়, ততক্ষণ জীবের পরম তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে। এই জন্যই ভগবান কেবল "মামেতি" এই মন্ত্রে আপনার অপৌরষেয় তত্ত্বেই ভক্তকে তুলিয়া লইতে চাহেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে "মদ্ভাবম্" অর্থাৎ ভাগবত-স্বভাব-প্রাপ্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেই পূর্ণযোগের পরিপূর্ণ-সিদ্ধি নিহিত আছে। অষ্টম অধ্যায়ে যোগ-ভক্তির দ্বারা শ্রুতি-কথিত যে অনাবৃত্তি-মার্গ তাহা পরম-ব্রহ্মের অংশ-প্রাপ্তিরই সঙ্কেত দেয় ; তাই অনন্যভক্তি-প্রভাবে স্বষ্ট্যাদির আদিভূত যে পরম পুরুষোত্তমতত্ত্ব অর্জ্জুনের চিত্ত সেই দিকেই আকৃষ্ট করিলেন। ইহার পরের অধ্যায়েই এই উত্তম রহস্য সম্যক্‌প্রকারে উপলব্ধি করার জন্য তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুহ্যযোগ বর্ণনা করিবেন। অষ্টম অধ্যায় অক্ষর-ব্রহ্মযোগ সাধনের কথায় পরিপূর্ণ হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ গীতার যোগের পরম লক্ষ্য ইহার মধ্যে অনুস্যূত রাখিয়াছেন—জীবকে পাইতে হইবে পুরুষোত্তমকে, যিনি যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও অজ, নিত্য, শাশ্বত। ভোগ ও মোক্ষ এই দুই ভারতের প্রসিদ্ধ লক্ষ্যের অতীত যে পরম ধাম, তাহার প্রাপ্তির তৃতীয় পন্থাই তিনি ব্যক্ত করিতেছেন, ইহাই আমাদের অনুধাবনযোগ্য।

(ক্রমশঃ)

মিলন

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

কোন্ অতীতে ভোর বেলাতে হয়েছে চলা সুরু,
কতই আশা নিয়ে বুকে, কতই দুরু দুরু।
মেখেছি কত পথের ধূলা, হয়েছি কত পার ;
মনের মাঝে অশ্রু, হাঁসি, জাগায় স্মৃতি তার।
কত পথে তরুণ তপণ খেলেছে বারে বারে,
কতই ফুল উঠেছে ফুটে আমার পথের ধারে।
বাড়িয়ে বাহু ডেকে নিয়ে দিয়েছে গাছে ছায়া ;
ডালে বসে গেয়েছে পাখী বাড়িয়ে দিয়ে মায়া।
স্নেহের পরশ বুলিয়ে গেছে মলয় বাতাস এসে,
ফিরে ফিরে ডেকেছে সব কতই ভালবেসে।
কিন্তু যখন মরুমাঝে এলাম দ্বিপ্রহরে,
পিপাসাতে আকুল চাহি জলের আসে ফিরে'।

রবি যখন রুদ্র রোষে তপ্ত করে বালি,
তখন কেহ আসেনিত সাজিয়ে নিয়ে ডালি!
আসেনিত বৃক্ষ লয়ে ছায়া, পাখীর তান,
সুগন্ধ ফুল, মলয় বাতাস, ঝর্ণাবালার গান।
ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, পথিক তখন পড়েছিলাম লুটি,
বন্ধু! তখন বাড়িয়ে বাহু তুমিই এলে ছুটি।
বুকভরা ঐ দরদ নিয়ে পথিক পাশে এসে
বুকে তুলে অভয় পরশ বুলিয়েছিলে কেশে।
তৃষ্ণা আমার নিবারিলে বন্ধু! চাওয়ার আগে,
মিটালে মোর সকল আশা যা কিছু মন মাগে।
সেদিন থেকে সুহৃদ আমার! মিলিয়ে দিয়ে মোরে
রিক্ত, দীন, দিয়েছি ধরা তোমার প্রেমের ডোরে।

ফুরিয়ে গেছে সকল চাওয়া, তবু আবার চাই,—
সবার নয়ন অন্তরালে তোমায় যেন পাই।

সঙ্ঘ-বাণী

(আশ্রমি-সঙ্কলিত)

আমি যে জীবন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েক দিন যাবৎ ভাব্‌ছিলুম, তাহাই তোমাদের নিকট বল্‌ছি।

একদিন শাস্ত্রজ্ঞানহীন হয়ে প্রেরণার বশে যে সকল বাণী তোমাদের নিকট ব্যক্ত করেছি, পরে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে' আমার সামান্য জ্ঞান দিয়ে যেটুকু উপলব্ধি করেছি, তাতে স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবেই ঘোষণা করতে পারি—ভারতের জ্ঞান-সমুদ্র অতীতের মহাপুরুষ শাস্ত্রের ভিতর যা দান করে গেছেন, তা পৃথিবীর কোন ধর্ম্মাবতার অতিক্রম করে' নূতন কিছু আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন না। হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্র অনতিক্রমনীয়। জ্ঞানানুশীলনের নূতন অনুভূতি ও অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব শাস্ত্রকে অতিক্রম করে' কেহ দান করেছেন, তা আজ পর্য্যন্ত দেখা যায়নি। জ্ঞান-চর্চ্চা ভারতে আদিযুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে; জ্ঞানানুশীলনের মধ্য দিয়ে জীব ও ব্রহ্মে যুক্তির যে সাধনা হয়েছে তাহাতে মানুষের পরিপূর্ণ মুক্তি আসেনি। বুদ্ধি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়েছে, দিব্য প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় নি। শাস্ত্রালোচনা করে' দেখ্‌ছি, এই শাস্ত্রের বাণীও জীবনের সন্ধান দেয় না। যার জীবন ভগবানে উৎসর্গীকৃত, যে ভগবানে আপনার তনু-মনোপ্রাণ সমর্পণ করে' তাঁরই ইঙ্গিতে জীবন পরিচালিত করে' চলেছে, শাস্ত্রের জ্ঞান-বিজ্ঞান তার বুদ্ধিবৃত্তিকেই মার্জ্জিত করুছে; পরন্তু জীবন-শিল্পের সন্ধান সে ইহার মধ্য থেকে পাবে না। একমাত্র ইষ্টের অনুসরণেই জীবন অমৃতময় হয়।

জ্ঞানানুশীলনের পর হৃদয়-বৃত্তির বিকাশের সাধনাও হয়েছে। প্রেম-ধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হয়েছে, মানুষ তার হিয়াকে ভগবানে উন্নীত করে' তাঁতে তন্ময় হয়ে থাকার তপস্যা করেছে। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রেমের বাণী প্রচার করুতে করুতে প্রেমাবতারগণ উন্মাদ হয়েছেন। জীবনেও দেখি, প্রেমের সাধনা দীর্ঘ যৌবন-ব্যাপী করে' চলেছি। মাতৃ-ভক্তির সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, যৌবনে তাহা পত্নী-প্রেমে রূপান্তরিত হয়, তাহাই আজ আবার বিশ্বপ্রেমে রূপ নিতে চলেছে। আমি নিস্বঃ, রিক্ত, সন্ন্যাসী, জগতে কোন কামনা আসক্তি আমার প্রেমকে ক্ষুণ্ণ করুতে পারে না। আমার ভিতরে প্রশ্ন জাগে—আমি কি জন্য জগতে জন্মগ্রহণ করেছি, কি আমার উদ্দেশ্য, ভগবান কি জন্য আমায় প্রেরণ করেছেন? মানুষ কাম-পরতন্ত্র হয়ে সংসার-জীবন গ্রহণ করে, ভোগের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ তাকে পৃথিবীর বুকে টেনে আনে, বার বার সে জন্মগ্রহণ করে আপনার মধ্যে যে কামনার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, তার পরিতৃপ্তির জন্য। কিন্তু আমি বিশ্লেষণ করে' দেখি, আমার জীবনে সকল ভোগের অবসান হয়েছে, সংসারে কোন সৃষ্টির প্রতি আমার আসক্তি নেই, সকল বাসনা কামনার লয় হয়ে গেছে, ভগবান ভিন্ন পৃথিবীর কোন আশ্রয়ই আমার আর তৃপ্তি ও আনন্দ বিধান করুতে সমর্থ নয়—তবুও কেন পৃথিবীর আকর্ষণে আমি অবস্থান করুছি, কি আমার দেবার আছে, কি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি? এই প্রশ্নের সমাধান আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি এসেছি, প্রাণের মন্ত্রে জাতিকে জাগ্রত করুতে। এই প্রাণ ভোগকাতর পৃথিবীর মলিনতায় আবদ্ধ নয়, সকল কামনার ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়ে যে দিব্য প্রাণের জাগরণ তাহাই আজ আমাদের সাধ্য। অসীম জ্ঞানানুশীলনে ও বিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির জাগরণে প্রাণ-কেন্দ্র রূপান্তরিত হয় নি। পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে প্রাণকে ভগবানে তুলে' ধরুতে হবে। হৃদয়-কেন্দ্রে ভগবান অবতরণ করেছিলেন, তাই বিশুদ্ধ প্রেমের খেল

সম্ভব হয়েছে; কিন্তু প্রাণ আজও ভোগ-শক্তির প্রবাহে নিমজ্জমান। প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করার মন্ত্রে ঝঙ্কার তুল্‌তে হবে। হৃদয়-ক্ষেত্র যেমন নিঃস্ব, একমাত্র শিবের অধিষ্ঠান-ভূমি, এই রিক্ত, উলঙ্গ, অনাশ্রয়ী হৃদয়-মন্দিরে শিবের জাগরণ হয়েছে, তেমনি শিবের তাণ্ডব-নৃত্যেই দিব্য প্রাণ-শক্তি প্রকাশমান হবে। এই দিব্য প্রাণের সন্ধান দিতেই আমার জন্ম। জীবন যদি বিশুদ্ধ ও রূপান্তরিত না হয়, পৃথিবীর ভোগে লিপ্ত হয়ে থাকে, প্রেমের ও জ্ঞান-চর্চ্চার পথে মানবজাতিকে আহ্বান করার সার্থকতা কি? শ্রীকৃষ্ণ ক্ষাত্রশক্তি সহায়ে ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের জন্য কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিয়েছিলেন, ভগবান বুদ্ধ সঙ্ঘচক্রের মধ্য দিয়ে মুক্তির বাণী প্রকাশ করেছিলেন, শঙ্কর, রামানুজ বেদান্ত প্রচার উপলক্ষ করে' দেশে দেশে ধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষণা করে' গেছেন; আর খোল-করতালই হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের প্রেম-মন্ত্র-প্রচারের একমাত্র যন্ত্র। এ যুগে নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতর দিয়েই দিব্যপ্রাণের জাগরণ সম্ভব করে' তোলার ডাক ভগবান দিয়েছেন। একদল মানুষ তাদের প্রাণকে ভগবানে তুলে দিয়ে, জগতের সকল আসক্তি ও ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে' বিরত থেকে ভাগবত জীবনের জাগরণ সিদ্ধ করার জন্য কামনাহীন চিত্তে পৃথিবীতে শক্তি প্রয়োগ করবে। প্রাণ যদি পৃথিবীর ভোগে আকৃষ্ট হয়, সে প্রাণে ভর দিয়ে ভগবানের অবতরণ সম্ভব হবে না। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ কর্ম্মকে আশ্রয় করেছে, তার এই প্রাণ-জাগৃতির স্বপ্নকে মূর্ত্ত করে' তোলার জন্য। ব্যবসা-ক্ষেত্রে যারা আত্মদান করে' চলেছে, তারা নিঃস্বার্থ, কপর্দ্দকহীন, জগতের কল্যাণের জন্যই তাদের জীবন, তারা নিষ্কামচিত্তে সর্ব্বসাধারণের মতই শ্রম দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ হয়ত তাদের বুঝ্‌বে না; ব্যবসাকেই পুরোভাগে ধরেছি, এরূপ ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু যারা এই স্বপ্নকে বুকে করে' তিলে তিলে আত্মদান করে' চলেছে, তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস নিত্য জাগ্রত থাকা চাই, যে একটা দিব্যপ্রাণের সন্ধান দিতেই তাদের জন্ম; প্রাণের জাগরণকে লক্ষ্যে রেখেই তারা চলেছে। আপনার হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নিময়ী বিশ্বাসই একদিন এ পথে মানুষকে আকর্ষণ করবে।

আমি পূর্ব্বেও অনেকবার বলেছি—ধর্ম্মকে প্রচার করার জন্য একদিকে শিক্ষা, সাধনা ও অপর হস্তে অর্থ-সংস্থান আমরা গ্রহণ করেছি। শিক্ষা-সাধনার সঙ্গে অর্থকে সংযুক্ত না করলে এ যুগে সাধনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। অর্থক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই প্রাণের জাগরণ সম্ভব হয়। প্রাণের জাগরণের অভাবেই জাতি আজ ম্রিয়মাণ। জাতি যদি প্রাণকে জাগাতে না পারে, প্রাণের ক্ষেত্রে যদি তাকে উদ্বুদ্ধ করে' তুলতে না পারা যায়, যত বড় উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হোক, তা জীবনে কার্য্যকরী হয়ে উঠ্‌বে না, জীবনকে রূপান্তরিত করবে না। ইহা আমার নিকটে আজ জীবন্ত সত্য। আমার জন্ম পরিগ্রহের সমস্যার সমাধান আমার নিকট স্পষ্ট, মূর্ত্ত। "যোঽসাবসৌ পুরুষো সোঽহমস্মি"—সেই অনন্ত বিরাট্ পুরুষই আমি। আমি এসেছি জগতে প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করতে, বিশুদ্ধ প্রাণের সৃষ্টির জন্য। যতদিন একটী মানবের মধ্যেও ইহার অভাব পরিলক্ষিত হবে, আমায় যুগ যুগ এই মন্ত্র সিদ্ধ করার জন্য জন্মধারণ করতে হবে। আমার জন্ম-কর্ম্ম বন্ধন নেই, মৃত্যু-জন্মের দুঃখে কাতর হয়ে মোক্ষের পথে অভিযান আমি করব না—আমার আবার মোক্ষ, মুক্তি কি? ভগবান যা চেয়েছেন, ইহাকে রূপ দেওয়া ভিন্ন জীবনের আর অধিকতর আনন্দ কি আছে বলত! এই অভিযানই আমার জীবনের ধর্ম্ম, নিত্য গতির তালে তালেই সৃষ্টি ফুটে' উঠ্‌বে। একটা স্তব্ধতা আমার ভিতরে এসেছিল, ভগবান তা দূর করে' দিয়ে গতির পথে চলার বাণীই অন্তরে ঝঙ্কার তুল্‌ছেন—চল, যতদিন দেহ আছে, হুঙ্কারে তোল, মানুষের প্রাণকে জাগাও, তোমার আবার স্তব্ধতা কেন? চলাই তোমার ধর্ম্ম।

যে প্রাণের জাগরণ-মন্ত্র আমার মধ্যে মূর্চ্ছনা তুলেছে, যারা আজ জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় নিজেদের প্রদীপ্ত করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমার নিকট এসেছ, এই পুণ্য-প্রভাতে তাদের আশীর্ব্বাদ করি—আমার জাগরণের মন্ত্রকে রূপ দেওয়ার জন্য অধিকারী হয়ে উঠ, অসাধারণ জীবনের সন্ধান পাবে, একটা জাতির আশার কেন্দ্র হবে।

আমার শেষ কথা গৃহীভক্তদের প্রতি—আমার কাছে এসেছ মরার আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে। কারণ, আমার

মধ্যে যে আগুন জ্বল্‌ছে, তা সকল কামনা পুড়িয়ে ছাই করবে। কিন্তু এই মৃত্যুতে দুঃখ নেই, ব্যথা নেই ; মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতে অভিষিক্ত হবে। আমার সম্মুখে যে মৃত্যু-কামনা করে সে অমৃতত্ব লাভ করে ; যে আমায় এড়িয়ে জীবনে সুখ ভোগ চায়, তাকে পতঙ্গের মত বার বার মরতে হয়, তার জীবনে পুনরাবৃত্তি ঘটে, সে আবার পতঙ্গবৃত্তি নিয়ে সংসারধর্ম্ম করবে, কাম-কাতর হয়ে ভোগাসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকবে ; কিন্তু যে আমাতে জন্মগ্রহণ করে, তার আর পুনর্জ্জন্ম নেই, সে আমাকেই লাভ করবে। তোমরা পত্নীকে ভালবাস ; কিন্তু সে ভালবাসা কামনামূলক। পত্নীর সঙ্গে যে দিব্য প্রেম, তার সন্ধান তোমাদের জীবনে আবিষ্কৃত হয় নি। যে বস্তুকে ভালবাস, স্পর্শে তাহা মলিন হয়, অপ্রাকৃত ভালবাসা লাভ হয় না। 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তারে ভালবাস যারে রে, পরশনে ম্লান হবে হীরার কণ্ঠহার রে'......। ভালবাসা, তোমার পত্নী তোমার কাছ থেকে লাভ করে না, প্রেমের পরিবর্ত্তে গরল তোমার কাছ থেকে পান করছে। কাম-চর্চ্চায় গরল উদ্গীর্ণ হয় ; সে গরল তোমার জীবনকে আচ্ছন্ন করে' ফেলে ; বিশুদ্ধ, অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে যে সম্বন্ধ তা তোমায় উপলব্ধি করতে দেয় না। পুরুষ হয়ে স্ত্রীকে ভগবানের পথে নিয়ে যাওয়াই তোমার ধর্ম্ম। যে মুহূর্ত্তে তুমি বীর্য্যস্খলন করেছ, তখনই ইহার বিপরীত ধর্ম্ম অনুসরণ করে' চলেছ ; জেনো এই পথ পবিত্র প্রেমের পথ নয়, কাম-চর্চ্চা কামের আগুনকেই বাড়িয়ে তোলে, নিরন্তর ভোগের জন্য লালায়িত হয়। যদি সত্যই এ অমৃতের পথে চল্‌তে চাও, ভোগের দুয়ার বন্ধ করতে হবে—ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। অমৃত ও গরলের আস্বাদ একপাত্রে লাভ করা যায় না। বিশেষ ভাবে একজন গৃহীভক্তকে আমি আজ থেকে এক বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দান করছি। এই ব্রতকে জীবন-পণে রক্ষা করবে। স্ত্রী যদি বিদ্রোহ করে, তাহাতে বিচলিত হ'লে চল্‌বে না। যদি সত্য প্রেম-পত্নী হয়ে থাকে, সে তোমার অনুসরণ করবেই ; যদি সে তোমার ভোগকে দোহন করার জন্যই স্ত্রী-রূপে এসে থাকে, সে ব্যাভিচারিণী হোক, তাতে দৃষ্টি দিও না, ভগবানের আদেশ গ্রহণ করে' ব্রতপালনে যত্নবান্ হও, আপনাকে শক্ত কর, কোন অবস্থায় ব্রত-ভঙ্গ হতে দিও না। স্ত্রীর দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তোমার ভাব্‌বার কোন কারণ নেই, সে ভার ভগবান বহন করবেন। এই পুণ্য দিনে তোমাকে এক বৎসরের জন্য ব্রত দিলুম। আমি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পুরুষ ও নারীকে বল্‌ছি—যে বস্তুকে ভালবাস তাকে স্পর্শ করো না, স্পর্শ দ্বারা তার মহত্ব, বিরাটত্ব ম্লান হয়ে যায়। প্রেমের ধনকে কাছে টেনে আন্‌তে যেও না, দূরে রেখেই তাঁর সঙ্গে হৃদয়ে সংযোগ স্থাপন কর।

সাথী-হারা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

ভোর বেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে,
মনে ভাবি তার ঠিকানা তোমার জানা আছে !

সুদূরের ঐ মধুর গানে
সে আঁখি তার মনে মনে—
আকাশ-ভরা বেদনাতে রোদন ওঠে বাজি,
ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়া-তরীর মাঝি !
অশ্রুভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।।

উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়, বোঝা তার নয় ভারি নয়—
পুলক লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।
মরণ-গানে ঘুমিয়ে পড়ি,
সাথীর ব্যথা স্মরণ করি'
অসীমে ঐ ভাসিয়ে দিলাম সাথী-হারা ভাঙা তরি !

মজাফরপুরে

তখন সুন্দরবনে। আহারের পর বিশ্রামান্তে পৃথিবীর কম্পন অনুভব হ'ল। মাটীর দেওয়াল, খড়ে ছাওয়া প্রকাণ্ড গৃহ, যেন শিউরে উঠ্‌ল। প্রায় দুই মিনিটের কিছুকাল অধিক স্পন্দন ছিল, বাংলায় ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। ধরিত্রীর এমন মাথা-নাড়া প্রায় দেখা যায়।

বিধ্বস্ত পুরাণীবাজারের একাংশ

মকর রাশিতে ষড়গ্রহ একত্র হওয়ার লক্ষণটুকু প্রাচীন নক্ষত্রবিদ্‌দের সত্যদর্শিতার পরিচয় ব'লে'ই তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করা গেল। তখন জানি নি, উত্তর বিহারের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে!

সুন্দরবনের যে অংশে আমাদের সংস্থা, তাহার একদিকে বঙ্গোপসাগরের সীমাহীন নীল জল, অন্য দিকে খাল ও কালা জঙ্গল, দক্ষিণে দিগন্তহীন প্রান্তর, উত্তরে ভাগীরথী। কলিকাতা থেকে প্রায় ৬০।৭০ মাইল দক্ষিণে, যাওয়া আসার সুবিধা এখনও তেমন হয় নি, সহরের সংবাদপত্রগুলি পৌঁছিতে চার দিন সময় লাগে। কাজেই ভূমিকম্পের কথা আমরা একপ্রকার আমলেই আনি নি।

যখন সংবাদপত্র হাজির হ'ল, বীভৎস ধ্বংস-বিবরণ বুকে নিয়ে আমরা স্তম্ভিত হলুম। তখনও অনুমান ক'রতে পারি নি, যে এক মুহূর্ত্তে, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সমপরিমাণ ভারতের ভূখণ্ড এমন করে' ধ্বংস পেতে পারে। বাংলার ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পই আমাদের কাছে এখনও ভয়ঙ্কর হ'য়ে আছে। কয়েক মিনিটের দোলেই আমাদের চক্ষু-স্থির হয়েছিল। তার চেয়ে কত গুণ পৃথিবী মাথা-নাড়া দিলে এমন দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়, তাহা সত্যই অভাবনীয়; কিন্তু ভারতের ভাগ্যে বিধাতা দুর্দ্দশার অন্ত রাখেন নি, উত্তর-বিহারের জনপদগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

জাপানের ভূমিকম্প আমরা অনুমান করে' নিয়েছিলুম। সমুদ্রের জল বেড়ে বহু জনপদ প্লাবিত করেছিল। বিদ্যুৎ-সঞ্চালনের তার ছিঁড়ে নগরের পর নগর ভস্মীভূত হয়েছিল, বহু লোক অকস্মাৎ কাল-কবলে প্রাণ দিয়েছিল। বিশ্বে উঠেছিল হাহাকার। মানুষের হিয়ায় হিয়ায় করুণার বান ডেকেছিল। সমবেদনার সুরে জগতে ধ্বনি প্রতিধ্বনি উঠেছিল। আজ ভারতেই সেই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলুম। সকল প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন আছে; কিন্তু যাহা গেছে, তাহা আর সম্ভবতঃ হবে না। মজফরপুর, সীতামারি, মুঙ্গের ধ্বংস-স্তূপ হ'য়ে বুঝি এই দৈব দুর্ঘটনার স্মৃতি রক্ষা করবে।

দেশ বিদেশ হ'তে সহানুভূতির সাড়া উঠেছে। ভারতের নিখিল রাষ্ট্র সঙ্ঘ রাজরোষে বিপন্ন, তবুও তার নির্জ্জীব প্রাণ-শক্তি-রাজ-শক্তির সহানুভূতিতে সঞ্জীব হয়েছে; বেহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ কারামুক্ত হ'য়ে, এই শ্মশান-ক্ষেত্রে নব-সৃজনের ভেরী বাদন করেছেন। কলিকাতায় নাগরিক-সঙ্ঘ পুরনেতা সহৃদয় মেয়র সন্তোষ কুমারকে পুরোভাগে রেখে মুক্তহস্ত হয়েছেন। ভারতের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যেখানে যত সংস্থা ছিল, সবই মাথা তুলে আজ দাঁড়িয়েছে। বিপন্ন জনের সাহায্যে ও সেবায় আমাদের "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র নগণ্য প্রাণটুকুও

চঞ্চল হ'য়ে সেদিন উঠেছিল; কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ জানালেন যে সেবকের প্রয়োজন নেই, চাই টাকা, চাই কম্বল, চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য। দুর্ভাগ্যের পরিমাণ হয় না, এখানে ক্ষুদ্র সাহায্যটুকু নিয়ে ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর আত্মপ্রসাদ অতিশয় লঘু ব'লেই মনে হ'ল। সঙ্ঘের অবদানটুকু যথাস্থানে দিয়ে, ছুটলুম অন্তরের আকুলতাটুকু নিয়ে পাটনায় রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করে', বিধাতার অভিশাপের কঠোর শ্মশান-দৃশ্য দেখ্‌তে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যেখানে শতদল-শোভা সৃষ্টি করে', তাহাও দৃষ্টি-পথে খুব কমই পড়ে, রুদ্রলীলা বীভৎস বটে, কিন্তু ভগবানের শুভেচ্ছা ইহার মধ্যে নিহিত থাকে—আর এমন দৃশ্যও প্রতিদিন ঘটে না, যুগ প্রলয়ের নিদর্শন দেখার আকাঙ্ক্ষা দমন করা গেল না।

ভোরের আলো মাথায় নিয়ে গাড়ী পৌছল যখন বিহারের কোলে, তখন লাইনের পাশে চির-খাওয়া পাকা দালানগুলি দেখে'ই ভূকম্পনের বহর অনুভব হচ্ছিল; তারপর ঝড়ের মত গাড়ীখানা দুই পাশে একটা ষ্টেশনের মুচ্‌ড়ে-পড়া রূপ দেখিয়ে ছুট্‌ল মাঠের উপর দিয়ে হু-হু করে', জামালপুরে গাড়ী থাম্‌তেই স্তম্ভিত হলুম—প্লাটফর্ম্মের উপর বৃহৎ অট্টালিকাগুলি যেন বজ্রাঘাতে চূর্ণ হ'য়েছে; কোথাও দাঁড়িয়ে আছে সুদৃশ্য দেওয়াল, কিন্তু সবই মুকুটহীন, কোনটীর ছাদ নাই—বিস্ময়ের সীমা রইল না।

কলিকাতা থেকেই বেহারের ভূকম্পন-সাহায্য-সমিতির উপর একটু কড়া প্রতিবাদের সুর শুনে এসে-ছিলাম। সেটা তেমন কাণে নিই নাই, দুঃখী জনের ব্যথার রাগিণী তখনও সবখানি ভরিয়ে রেখেছিল। রাত্রে আমাদের গাড়ীতে সাহেবগঞ্জ থেকে এক ব্যক্তি উঠে-ছিলেন, তিনি জামালপুরেই নাম্‌বেন; তাঁর মুখে শুন্‌লুম, মুঙ্গেরে যে সকল সাহায্য-সমিতি স্থাপিত হয়েছে, তাঁরই তিনি একজন কর্ণধার। মেয়র সন্তোষকুমার বসু মহাশয় আজই মুঙ্গেরে আস্‌বেন; তাঁর কাছে অনেক কিছু নিবেদন করার আছে, তাই তাঁর সাহেবগঞ্জ থেকে ছুটে' আসা।

এখানে বিরোধ বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নিয়ে নয়, বিরোধের মূল দলাদলী—কংগ্রেসের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের। মুঙ্গেরে জগৎসিং একজন প্রসিদ্ধ দেশ-কর্ম্মী, ভদ্রলোক তাঁর উপর ভয়ঙ্কর অভিযোগ ক'রলেন—কংগ্রেস যে সেবা-কর্ম্মটাকে নিঃশেসে হাতিয়ে অন্য সকলকে খেদিয়ে দিচ্ছে, অভিযোগের ইহাই ছিল মূল কথা। মনে হ'ল প্রবাদ-বাক্য—সর্ব্বনাশের সঙ্গে পৌষ মাসের যোগাযোগের কথা। দুঃখেই হৃদয় ভাঙ্‌ল—এই দুর্দ্দিনে দলাদলীর নিশান উড়্‌তে দেখে'।

ভদ্রলোকের কথায় বুঝা গেল, সন্তোষবাবু এই সঙ্গে

শয্যা-শায়িতা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

যে ঐ কলিকাতা অভিমুখী গাড়ীখানি আস্‌ছে, তাতেই পাটনা থেকে আস্‌ছেন; কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা। গাড়ী এল, ছেড়ে গেল—সন্তোষবাবুর সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য ছাড়্‌তে হ'ল।

গাড়ীর গতি শ্লথ হ'য়ে পড়্‌ল। দু'ধারেই ধ্বংস-স্তূপ। সকল ষ্টেশনেরই অফিস-গৃহগুলি জখম হয়েছে; কোন কোনটী ইষ্টক-স্তূপে পরিণত হয়েছে। বক্তিয়ারপুরের ওভার-ব্রিজটীর চিহ্ন নাই। সমুচ্চ গুদাম গৃহগুলি সবই ভূমিসাৎ হয়েছে। তখনই মনে হ'ল জনবহুল নগরের দুর্দ্দশার কথা। দারুণ উৎকণ্ঠায় পাটনায় গিয়ে উপস্থিত হলুম।

পাটনার রাজপথে পূর্ব্বের মতই ছুট্‌ছে পুরাতন পাটনা সহর থেকে বাঁকিপুর পর্য্যন্ত ধুলিকাদা-মাখা যাত্রীপূর্ণ বাস্‌গুলি—পথে যান-বাহনাদির অভাব নাই। পথের ধারে বিপণিশ্রেণী খড়ে-ছাওয়া ঘর অধিকার করে' বসেছে। প্রায় সব বাড়ীই জখম হয়েছে; কিন্তু পাটনা সাম্‌লে নিতে পার্‌বে অতি শীঘ্রই, কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েও উঠেছে।

রাত্রে কাণে পৌছল—বাঙ্গালীর দিক্‌ থেকে গুরুতর অভিযোগ। বিপন্ন বাঙ্গালীর প্রতি দৃষ্টির অভাবের কথা।

শাহজীর শিব-মন্দির
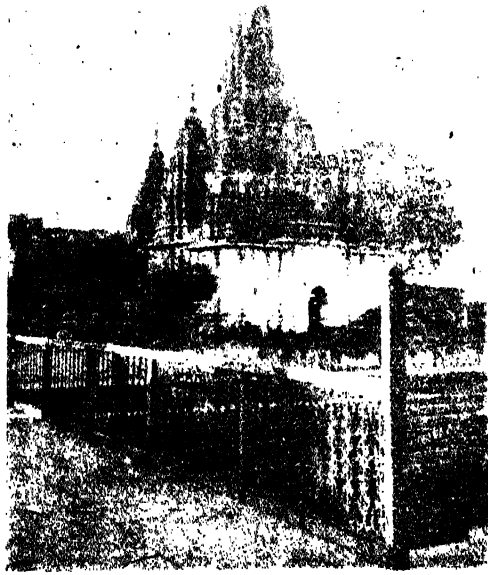
শুনে সত্যই হৃদয় ব্যথিয়ে উঠ্‌লো অসহ্য রূপে। এসেই বেহারের বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে চিঠি লিখেছিলাম—সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ নিয়ে; তিনি তারপর দিনই সার্চ্চ লাইট অফিষে দেখা করার ইচ্ছা জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন।

শীতও যেমন প্রচণ্ড, মাথার উপর প্রখর সূর্য্যকিরণের বর্ষণও তেমনি আবার কম হচ্ছিল না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বসেছিলেন—মুক্ত আকাশের নীচে, একখানি তক্তাপোষের উপর পাশেই তাঁবুর মধ্যে অফিষের কাজ কর্ম্ম চ'লছিল। সতীশবাবু ছিলেন খুব ব্যস্ত পোর্টফলিও বগলে নিয়ে; শ্রীপ্রকাশ, অধ্যাপক নরেন্দ্র ঘটক প্রভৃতির সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর, আলাপ আরম্ভ হ'ল। রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিনয় ও মধুর সম্ভাষণ তাঁর উদার স্বভাবের বিশিষ্ট পরিচয়।

কথায় কথায় অভিযোগের কথা উত্থাপিত হ'ল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ কথাটা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লেন। ডাঃ বিধান রায়ের চিঠিতে যেটুকু জেনেছিলেন, তা খুব বড় হয়ে উঠ্‌ল তাঁর সম্মুখে, আমার কথা শুনে। সতীশবাবু তখন বিষয়টা আরও ঘোরাল করে' ধর্‌লেন, তাঁর কাছে যে সব চিঠিপত্র এসেছে, সেইগুলির কথা কয়ে। "প্রভিন্সিয়েলিজম্‌" নিয়ে বিরোধের মাত্রা যারা বাড়ায় তাদের অদূরদর্শিতার কথা সতীশবাবু বিলক্ষণ রূপে বলে' গেলেন; "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" "সঙ্কটত্রাণ" প্রভৃতি সংস্থায় এ দোষ যেন স্পর্শ না করে, এইরূপ সতর্ক উপদেশও তিনি দিলেন। আসলে দাড়াল অভিযোগের সভ্যতা নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা। রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাকে নিরপেক্ষ ভাবে ইহার অনুসন্ধান ক'রতে অনুরোধ করলেন—আমি রাজী হলুম, দেখে' তিনি বিশেষ প্রীত হলেন।

ভোরের কন্‌কনে শীতে হি-হি ক'রতে ক'রতে, মহেন্দ্রঘাটে গিয়ে ফেরি-ষ্টীমারে উঠ্‌লুম। সম্মুখেই পরিচিত বন্ধু মিঃ এস্‌, এন্‌, বসু। প্রথমে তাঁকে চিনি নি, তার জন্য দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। বাহিরের পরিচয় রক্ষা করা দুঃসাধ্য হ'য়ে আছে বহুদিন ধরে'। আত্ম-ত্রুটি স্বীকার করলুম। তারপর, কথা। তিনিও চলেছেন মজফরপুরে বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালী বিরোধের মূল অন্বেষণ ক'রতে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ হঠাৎ কাল রাত্রে তাঁকে এই কষ্টটুকু করার জন্য নাকি বিশেষ অনুরোধ করেছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে আরও ঘোরাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

সারা পথই তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মজফরপুরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। রেল লাইনের দুই ধারে মাটী কেটে জলরাশির উচ্ছ্বাস তখনও রুদ্র-লীলার পরিচয় দিচ্ছে। বিস্তৃত শস্য-ক্ষেত্র বালুময়। ষ্টেশনে মিঃ বসুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। সেণ্টাল রিলিফ ক্যাম্প থেকে স্বেচ্ছা-সেবক তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। মিঃ বসু যেন একটু অপ্রস্তুতে প'ড়লেন। মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডদেব বেশ নির্দ্দয় মূর্ত্তি ধরেছিলেন, আর রিলিফ দলের হুড়াহুড়িতে

পথের ধূলায় দিঙ্মণ্ডল ধূসরিত হ'য়েছিল। কোম্পানীর বাগানে তাঁবু পড়েছে অসংখ্য, আর বড় বড় অক্ষরে বিভিন্ন কমিটীর নাম-ঘোষণার প্ল্যাকার্ড চক্ষু এড়ায় না।

এমন সর্ব্বনাশ এ পর্য্যন্ত কল্পনা করি নি। সে প্রলয়-কাণ্ডের বিবরণ সকলেই পড়েছেন, নূতন করে' দেওয়ার নেই। যতদূর যাই কেবল ধ্বংস-স্তূপ, অট্টালিকা-শ্রেণী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পথের উপর পাহাড় গড়ে' তুলেছে, আর্ত্তের হাহাকার তখনও যেন শুনা যাচ্ছিল।

আশ্রয়ের কথা মনে ছিল না। হঠাৎ এক ব্যক্তির সাদর আহ্বান পেয়ে তাঁরই অনুসরণ ক'রলুম। মজাফরপুরের অন্যতম নেতা লোক বাসন্তীবাবুর বাড়ীতেই তিনি আমাদের পৌঁছে দিলেন। বাসন্তীবাবু বাড়ী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর এক যোগ্য পুত্রের আতিথ্যে আমরা অশেষ প্রীতিলাভ করেছি। এইখানেই সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটী প্রভৃতি অবাঙ্গালী সমিতিগুলির অবিচারের কথা বিশদ ভাবে শুনে নিলাম। বাঙ্গালীর প্রতি আদৌ কেহ দৃষ্টি দেয় নাই, বাঙ্গালী এই দুঃসময়ে যে কিরূপ নিরাশ্রয় ও সহায়তার অভাবে বিপন্ন ভাবে দিনের পর দিন কাটিয়েছে। শুনে সত্যই হৃদয় দ্রব হ'য়ে গেল। কিন্তু সব দিকের কথা না শুনে কোন ধারণা করা যুক্তিযুক্ত মনে হল না।

আহারান্তে বেরিয়ে পড়্লাম—বিপন্ন বাঙ্গালী পরিবারের সন্ধানে। দুর্দ্দশার চিত্র চক্ষে দেখা যায় না। রুদ্রের রোষানল যেন নগর-শ্রী সম্পূর্ণ ভাবে পুড়িয়ে ছাই করে' দিয়েছে।

যে সকল বিবরণ পাওয়া গেল, তাহাতে সংশয় মাত্র রইল না, সাহায্য-সমিতিগুলির পক্ষপাতী দৃষ্টি সম্বন্ধে। কেবল অবিচার নয়, বেহারী সাহায্য সমিতির কাছে বাঙ্গালী যেরূপ অসম্মানের কষাঘাত খেয়েছে, তাতে লজ্জা ও দুঃখ রাখার ঠাঁই নাই। ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরুছিলাম। যে সকল অভিযোগের বিবরণ সংগ্রহ হল সবই শোনা কথা; ঠিক যাঁদের নাম করে' বিবরণ দেওয়া হচ্ছিল, তাঁদের সন্ধানে একটু ঘুরে এলাম। তাঁদের সঙ্গে দেখা হল না। শেষে বিদুষী বাঙ্গালীর গৌরব-স্বরূপা, কথা-সাহিত্যের রাণী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সহিত সাক্ষাতের জন্য অপূর্ব্ব বাবুর বাড়ী এসে উপস্থিত হলুম। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর হর্ম্ম্যরাজি ভূকম্পনের আঘাতে একটুও টলে নাই, ভগবানের আশীর্ব্বাদ যেন এইখানেই মূর্ত্ত হ'য়ে রয়েছে।

শোক-বিধুরা বিধাতার বজ্র যেন মাথা পেতে নিয়ে, এই মহীয়সী নারী উত্থান-শক্তিরহিতা অবস্থায় আমায় সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। মনে হল, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা, উপস্থিত অত্যাচারই করা হয়েছে।

এই বাড়ী পড়িয়া এগারজন মারা গিয়াছে

মাথায় তখনও তাঁর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কিন্তু তাঁর পবিত্র মধুর আলাপে একান্ত আত্মীয়তার স্পর্শে নিজেকেই ধন্য মনে ক'রলুম। তাঁর ব্যথার করুণ রাগিণী হৃদয়ে এখনও আঘাতে আঘাতে মূর্চ্ছনা তোলে। তিনি জ্ঞাপন ক'রলেন তাঁর দশ বৎসরের নাতিনীটীর কথা—দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে ঘরের বাহির হওয়ার সময়ে, দু'জনেই আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন ভাঙ্গনের চাপে; জ্ঞান হওয়ার পর, সেই কুসুমকোরক সুধাধবল পবিত্র স্নেহের পাত্রটীকে আর দেখা যায় নাই। বড় মর্ম্মন্তুদ কথায় অশ্রুবিগলিত নয়নে জানালেন—নিজের হাতে তাকে তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, আর সে দিন সে তার অমিয় নিছানি কণ্ঠে শেষ সঙ্গীত

শুনিয়ে গেছে। নিষ্ঠুর বিধাতা! তাঁর কথায় আমার চক্ষুও দ্রব হ'য়ে পড়েছিল।

এইখানেই জাতীয়তার মহিমা-সঙ্গীত গুণ গুণ করে' মর্ম্ম আমার অভিষিক্ত করে' দিলে। বাদাবাদির কথাটা সম্ভবতঃ তাঁর কাণে এসে পৌঁছেছিল, তিনিই আমায় বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন, এখানে যে "কল্যাণ সঙ্ঘ" গড়ে' উঠেছে, তা বাঙ্গালীদের জন্য, উহা কংগ্রেসের কাজের প্রতিবাদ নয়; সেবার প্রেরণা নিয়ে যারা এসেছিল, তার কাছে, তিনি দিয়েছেন, তাঁর নামটুকুর আশ্রয়। দেশের বর্ত্তমান কাজ যেন রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিরুদ্ধে না যায়,

এই ভগ্ন গৃহ-স্তূপের নীচে সাতজন সমাধিস্থ হইয়াছে

অতিবড় দুর্দ্দিনে ভুলত্রুটি আজ বড় করে' দেখার সময় নয়, বিশেষ ক'রে তিনি কাতর কণ্ঠে আমায় বার বার জানালেন—বিরোধের সুরে যেন দেশের মর্ম্ম ছন্দোহীন না হয়। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুরাণী বাজারের শ্মশান-দৃশ্য, ভগ্নচূড়া দেবমন্দির এবং কয়েকটী বাড়ীতে সমস্ত পরিবার সমাধিস্থ হয়েছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু পরলোকগত আত্মার জন্য নিবেদন করে' ফিরে এলুম কোম্পানীর বাগানে। তখন সন্ধ্যার অস্ফুট অন্ধকার চারিদিকে ঘনিয়ে আসছে, সকলের অলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মচঞ্চল মূর্ত্তি লক্ষ্য করে' স্বজাতিপ্রীতির উৎসাহে প্রাণে নূতন বল সঞ্চার করে। ফিরে এলুম সেণ্টাল রিলিফ ক্যাম্পের কর্ম্মক্ষেত্রে। কথা ছিল, মুজফরপুরের সেণ্টাল রিলিফ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রামদয়ালুর সহিত আলাপ করে' আমার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে যাবো। কিন্তু হঠাৎ তিনি সীতামারির দিকে চলে' যাওয়ায় তা আর ঘটে' উঠ্‌ল না। তখন মিঃ এস, এন বসুও তাঁর কার্য্য শেষ করে' ফিরেছেন। উভয়ের সমবেত ক্ষেত্রেই মুজাফরপুরের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নিয়ে যে অভি-যোগের সুর উঠেছিল, যাঁদের নাম উল্লেখ করে' অভিযোগের সত্যতা জ্ঞাপন করা হয়েছিল, তাঁদের সাক্ষাৎ পেলুম এইখানেই। এবং এই রহস্যের মর্ম্ম-দুয়ার খুলে গেল ইঁহাদের সহিত পরিচয়ে। অকস্মাৎ বিপন্ন অবস্থায় বাঙ্গালী যে কেন সহায়তা-বঞ্চিত হয়েছিল, তার নিগূঢ় কারণ জেনে আমার চিত্ত সুস্থ হ'ল, সে কথা আমি দেশবাসীকে জানিয়েছি।

আসল কথা, আজ বাংলায় উড়িয়ার যে অবস্থা ও পরিচয়, বাঙ্গালীর বিহারে ভবিষ্যতে সেই দুর্দ্দশার পরিচয় চোখে পড়েছে, আজ নয় যেদিন বিহারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'বিহার বিহারীদের জন্য'। বাঙ্গালী ইংরাজ-রাজত্বের গোড়া হ'তে তাদের প্রতিভা ও শক্তি দিয়ে সুধু ইংরাজ-রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করে নাই, ভিন্ন প্রদেশবাসীর চক্ষে আলোর কাজল পরিয়ে দিয়েছে, শিক্ষা-সম্পদ্ লাভের অধিকারী করে' তুলেছে। বাঙ্গালীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে—প্রবাস-দুঃখ তাদের সুখের ছিল নতি ও স্তুতির অবদানে, আজ বিহারবাসী নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চায়, বাঙ্গালী আজ তাদের মাথার বোঝা, সে বোঝা অপসারিত না হ'লে তাদের আত্মশক্তির অভিব্যক্তি যেন স্বচ্ছন্দ হয় না। বাঙ্গালী করেছে চাকুরী, মাষ্টারী, গড়ে' তুলেছে প্রবাসে ইটের উপর ইট সাজিয়ে ঘর-বাড়ী, ভিন্ন প্রদেশ-বাসী বলে' ভাষা-পার্থক্যে, আচার-পার্থক্যে অভিন্ন হৃদয়ের পরিচয় রাখে নি। আজ চাকুরী যায়, বিহারবাসীর উপর মাষ্টারী করারও অধিকার এক প্রকার নাই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। আজ তারা সত্যই বিপন্ন—নিজ বাস

আজ তাদের বিস্মৃতির অন্ধকারে বিহারের বাঙ্গালী অকস্মাৎ বিধাতার; বজ্রে দিশাহারা। শেষ সম্বল বাস্তুভিটাটুকুর মায়া-পর্য্যন্ত ছাড়তে গিয়ে তাদের সমস্তখানি অভিসম্পাত পড়েছে গিয়ে বিহারবাসীর উপর। ইহার উপর এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে মাড়োয়ারীর প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল স্বভাবতঃই মাড়োয়ারীর দিকে, বিহারীর দৃষ্টি বিহারীর সন্ধানই করেছিল; বাঙ্গালী প্রবাসে এই অবস্থায় কয়েকদিন নিজেদের অসহায় মনে করে' ব্যথিত হয়েছিল নিদারুণরূপে; কিন্তু স্বভাববশতঃ নিজ নিজ দেশবাসীর প্রতি যে স্নেহ ও প্রীতি তার সীমা অতিক্রম করে'ই মানব-হৃদয়ের ঔদার্য্য, দুঃস্থের মাঝে আর ভেদ রাখেনি। প্রায় ৩০০ বাঙ্গালীর মধ্যে যে কয়েক ঘর বাঙালী আশ্রয়হীন, একান্ত অভাবের মধ্যে অতিকষ্টে দিন যাপন করছিল, তারা কোন সাহায্য-সমিতির কাছে একান্ত রিক্ত হস্তে ফিরে নি। বরং এ অবস্থায় যেটুকু সহায়তা পেলে তাদের সুবিধা হয়, তদপেক্ষা প্রচুর সাহায্যই তারা পেয়েছে।

গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে সাহায্য-সমিতির যে সঙ্কল্প তাহার পূরণ কালে বাঙ্গালীর অভিযোগও যে উপেক্ষিত হবে না, এই প্রতিশ্রুতি কোন ব্যক্তির নয় মানবত্বের, এবং এই মানবত্বের গৌরবরক্ষায় দেশের যোগ্য কর্ণধার অক্ষম নন এবং তাঁহাকে ইহার জন্য অযোগ্য মনে করাও আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির পরিচয়।

পাটনায় ফিরে' এসে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হ'ল তাতে আমি সান্ত্বনাই পেয়েছি, বাঙ্গালা ও বিহারবাসীর সঙ্গে জীবনক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলেছে জাতির এই দুর্ভাগ্যের দিনে সেরূপ হওয়ার কল্পনা করা যায় না। এই হেতু ভূকম্পনের সাহায্য-কেন্দ্রের প্রতি যে বক্র কটাক্ষ করা হয়েছিল তার মূলে আদৌ সত্য নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় বলে'ই দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন জ্ঞাপন করেছি।

অতঃপর যে সকল জনপদ ধ্বংসলীলার কেন্দ্র-স্বরূপ কদাকার মূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে, জানি না সেই সকল ক্ষেত্রে পতিত বিধ্বস্ত অট্টালিকাশ্রেণীর পুনর্গঠনে দুর্দ্দিনের প্রতিকার হবে কি না। বাঙ্গালীর প্রবাস-দুঃখের মাত্রা এই বহুদিনের অর্জ্জিত সম্পদরূপ সুরম্য অট্টালিকাগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ায় এবং বিহারে রাজসরকারে পূর্ব্বের ন্যায় চাকুরী পেশায় সৌভাগ্য উদয়ের সম্ভাবনা না থাকায়, বাঙ্গালীর চক্ষে সত্যই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বিহারবাসীর জন্য এই হেতু তাহাদের এই শ্মশানক্ষেত্রগুলিকে নির্ম্মাণের তীর্থে পরিণত করতে হবে। কিন্তু বাঙালীর প্রবাসে আর কোন আশা নাই। আমরা মনে করি, বাঙ্গালীর প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বহু প্রদেশবাসীকে অতীতে মানুষ করে' তুলেছে; আজ স্বার্থ-সিদ্ধির সুযোগ হারিয়ে তাদের এখনো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ইহাদেরই পশ্চাতে। আরও যে তাদের বড় দান দিবার আছে, যাহা লৌকিক শিক্ষা ও অর্থ-প্রবৃত্তি জাগ্রত করা অপেক্ষা পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই দিতে। আজ প্রবাসী বাঙ্গালীকে শত সহস্র প্রকার অপমান, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করে' স্বদেশবাসীর কাণের কাছে চীৎকার

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীপ্রকাশম ও রিলিফ কমিটীর অন্যান্য কর্ম্মিগণ

করে' শুনাতে হবে সেই অমৃতময় বাণী—যা এই যুগে নবদ্বীপ, হালিসহর, দক্ষিণেশ্বরে প্রচারিত হয়েছে। আজ বাঙ্গালীকেই উত্তর দিতে হবে, যেদিন বিহারবাসীর কণ্ঠে প্রশ্ন উঠ্‌বে 'ততঃ কিম্‌?" নিঃস্বার্থ নিষ্কাম-চিত্ত প্রবাসী বাঙ্গালী হেঁকে বল্‌বে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ

বাঙ্গালীই ভারত-জাতির কর্ণে অমৃত ঋক্‌-মন্ত্র প্রদানের অধিকার পেয়েছে। এই মিশন তাকে অতঃপর কঠোর তপস্যার ভিতর দিয়েই সিদ্ধ ক'রতে হবে।

যবনিকা

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এতদিন প্রদ্যোতের পক্ষে নীরব ও নিরুত্তর থাকা সত্যই একটু বিস্ময়কর। দারবাক হইতে প্রথম যে পত্র আসিয়াছিল তাহার উত্তর সে নানা কারণে অবশ্য দিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার পরের চিঠিগুলির জবাব সে ইচ্ছা করিয়া দেয় নাই এমন নয়। দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। তাহার জীবন আবার বুঝি দ্বিধা-চিত্তে পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথ শুধু যে সে ঠিক করিতে পারিতেছে না তাহা নয়, পথ বিচার করিবার সাহস পর্য্যন্ত তাহার নাই। তাহার অন্তরে আবার আলোড়ন সুরু হইয়াছে। সুরু হইয়াছে গভীর গোলময় দ্বন্দ্ব।

প্রথম চিঠির উত্তরে সে কি লিখিবে ভাবিয়া না পাইয়াই নীরব ছিল। এই পরিবারটির জীবন হইতে সে নিজেকে বিলুপ্ত করিতে চায়। কিন্তু তাহার কারণ ত আর সে খুলিয়া লিখিতে পারে না। মার চিঠির মধ্যে ব্যাকুলতা ও যে ভয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য গোটাকতক মিথ্যা কথা বানাইয়া লিখিতেও তাহার ইচ্ছা হয় নাই। সে তাই নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ বুঝিয়াছিল।

সে জানে যে নিজেকে বিলুপ্ত করিতে চাহিলেও এই পরিবারটির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছেদন করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। করিলে কল্যাণের পরিবর্ত্তে এই পরিবারটির সমূহ ক্ষতিই করা হইবে। তাহারা প্রদ্যোতের উপরই নির্ভর করিয়া আছে। সে অকস্মাৎ নিজেকে সরাইয়া লইয়া ইহাদের অকূলে ভাসাইয়া দিতে পারে না। তাই সে ঠিক করিয়াছিল, দূর হইতে সে ইহাদের সাহায্যের ত্রুটি করিবে না। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা আর নয়। আর যে ইহাদের জীবনে নিজের অশুভ ছায়া জোর করিয়া ফেলিবে না।

সেই সঙ্কল্পই প্রদ্যোৎ অটুট রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে যেন আবার নিজেকে ধরা না দিয়া ফেলে, নিঃসঙ্গতার দারুণ অভিশাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কোনদিন আবার যেন সে ইহাদের জীবনের সঙ্গে নিজেকে না জড়ায় ইহার জন্যই সে ছিল সাবধান। তাহার জীবন শূন্য হইয়া গিয়াছে। তা থাক। তাহার জীবনের ক্ষতিপূরণ সে আর কাহারও দ্বারা করাইবে না। নিজের জীবনের অভিশাপ সে একাই বহন করিবে। সেই জন্যই সে চিঠি দেয় নাই ঠিক করিয়াছিল, নিতান্ত প্রয়োজনে ছাড়া আর সে কোনপ্রকার সংযোগ রাখিবে না। এতদিনের গাঢ় অন্তরঙ্গতার পর তাহা একটু দৃষ্টি কটু হয় হোক। তাহাতে যদি সকলে একটু পীড়া অনুভব করে, তাহা হইলেও উপায় নাই। ভাবী কল্যাণের জন্য এটুকু আঘাত

দিতেই হইবে। কিছুদিন বাদে এ আঘাতও হয়ত আর লাগিবে না। এই পরিবারটির ভিতর বাহির হইতে যে ভাসিয়া আসিয়াছিল আবার সে ভাসিয়া যাইবে। কোন দাগ কোথাও হয়ত আর থাকিবে না।

এ চিন্তা অবশ্য সুখকর নয়। তাহার সমস্ত অন্তরকে উত্তপ্ত মরুবাত্যায় দগ্ধ করিয়া যায়, তাহার জীবনের সমস্ত অস্ফুট আশা ও কামনাকে দেয় নির্ম্মূল করিয়া। চারিদিকে তাহার অন্তহীন মরু-বিস্তার, সেখানে কোনও দিন কোনও শ্যামলতার সম্ভাবনা আর নাই। তবু নিষ্ফল প্রতিবাদ সে করিবে না। এই জীবনকেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে অম্লান মুখে।

এই সম্বন্ধেই প্রদ্যোৎ অটল ছিল, এমন সময়ে অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। ঘটনা সামান্যই, কিন্তু তাহাতেই প্রদ্যোতের মরুধূলার জন্যও আলোড়িত হইয়া উঠিল।

প্রদ্যোৎ আজকাল মেসের ঘরে কাজকর্ম্মের আচারেও থাকিতে পারে না। অসহ্য মনে হয় ঘরের বন্ধন, অসহ্য মনে হয় মানুষের সঙ্গ। তাহাদের সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক কথা বার্ত্তায় সে যেন হাঁফাইয়া উঠে। শুধু তাই নয়—সে সমস্ত কথাবার্ত্তা তাহাকে কোথায় যেন নিষ্ঠুরভাবে সূক্ষ্ম সূচি-মুখে বিদ্ধ করে। যে নির্ব্বিকার নির্লিপ্ততাকে অনেক কষ্টে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা এই তুচ্ছ কথার আঘাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়।

তাহাদের অবশ্য দোষ নাই। তাহারা সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ। সংসার ও জীবনের মধ্যে মগ্ন হইয়া আছে। প্রদ্যোৎকে সহজ ভাবেই তাহারা হয়ত জিজ্ঞাসা করে—"কি মশাই! এবারেও বাড়ী যাবেন না নাকি! ঝগড়া টগড়া ক'রে' আসেন নি ত! দুইটো রবিবার কামাই!

প্রদ্যোৎকে একটু হাসিয়া উত্তর দিতেই হয়—"না, বড় মুস্কিল হয়েছে। পরীক্ষার সময়, ছেলেদের রবিবারত পড়াতে হচ্ছে। কখন যাই বলুন।"

তাহার পাশেই যে ভদ্রলোকের সীট তিনি সহানুভূতি দেখাইয়া বলেন—"এত জুলুম ত মন্দ নয় মশাই। ছাত্রের পরীক্ষা বলে' রবিবারও পড়াতে হবে! মাষ্টার আর মানুষ নয় যেন। আমি হলে রবিবারে মশাই এমন পড়ান জড়িয়ে দিতাম, যে ছেলে হপ্তার পড়া যেত ভুলে!"

প্রদ্যোৎ একটু হাসিয়া সে প্রসঙ্গ এড়াইয়া যায়। তাহার পর এক সময়ে বাহির হইয়া পড়ে। আজকাল সে এমনি করিয়াই বাহিরেই অনেকক্ষণ কাটায়। এমনি করিয়া নিজের কাছ হইতে যেন পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। রাস্তায়-রাস্তায় সে অকারণে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়! অনেক রাত্রে ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফেরে। কাহারও সঙ্গে দেখা যেন তাহার না হয়, নিজের অশান্ত মনের সঙ্গেও নয়।

এমনি পথে পথেই সে সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আকাশের আলো ম্লান হইয়াছে, নগরের আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে নাই, কেমন একটা ক্লান্তিতে সমস্ত নগর যেন আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটি লোকের সঙ্গে তাহার ধাক্কা লাগিয়া গেল। লোকটা একটু অপ্রসন্নমুখেই ফিরিয়া তাকাইয়াছিল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খপ্ করিয়া প্রদ্যোতের হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া উত্তেজিতভাবে সে বলিল—"বাঃ বেশ লোক দাদা তুমি!"

প্রদ্যোৎ তখনও বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। লোকটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার জগতে ইহার স্থান কোথাও নাই।

লোকটা নিজে হইতেই আবার বলিল,—"কতদিন এসেছ শুনি! এসে একবার দেখাও করনি! এমনিই হয় বটে। কাজ ফুরালেই সব শেষ।"

প্রদ্যোৎ তবু ও কোন উত্তর দিতে পারিল না। কি উত্তর সে দিবে! এতক্ষণে ঘটনাটির ভয়ঙ্কর অর্থ তাহার কাছে অবশ্য প্রতিভাত হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে এতদিনে অকস্মাৎ তাহার অতীত বিস্মৃত জীবন হইতে আসিয়াছে একটুখানি করাঘাত। কিন্তু তবু যবনিকা উঠিল না। প্রদ্যোৎ তাহার মনে কোথাও এ লোকটির পরিচয় খুঁজিয়া পাইল না। কোন সূত্রে ইহার সহিত ইহার সহিত তাহার আলাপ, অতীত জীবনে কি পথ সম্বন্ধ তাহার সহিত ছিল কিছুই সে জানে না। নীরব থাকা ছাড়া তাহার আর উপায় কি!

লোকটা বলিয়াই চলিল—"এক মাঘে শীত যায় না দাদা, আবার কিন্তু দরকার হবে! তা এখন উঠছ কোথায়? আচ্ছা থাক দরকার নেই। ওসব খপর তোমার কাছে চাওয়াই ভুল। কিন্তু একদিন দেখা করবে ত? তোমারও লাভ বই লোকসান নেই। হ্যাঁ আসল কথা বলি আগে, আমি এখন সে সাস্তনা বদলেছি। ওইত আমার দোকান। হ্যাঁ একটা দোকানই খুলে বসেছি দাদা, বাহিরের একটা ভড়ং চাই। দোকানে লোহালক্কড়ের সব জিনিষ পাবে।"

একবার চোখ টিপিয়া একটু ইসারা করিয়া লোকটা আবার বলিল,—"লোহালক্কড়ের দরকার থাকে ত ভুলোনা যেন! কেমন আসবে ত!"

'আসব!' বলিয়া কোনরকমে প্রদ্যোৎ তাহার হাত ছাড়াইয়া এবার অগ্রসর হইয়া গেল। তাহাকে এড়াইয়া যাইবার ত ব্যস্ততা তাহার কেন সে নিজেই জানে না। এতদিনে বিস্মৃত-জীবনের সঙ্গে বর্ত্তমানের একটিমাত্র সেতুক খুজিয়া পাইয়াছে সামান্য একটু সূত্র, যাহা ধরিয়া হয়ত সে আমার লুপ্ত জগৎকে আবিষ্কার করিতে পারে। সেই সূত্রকেই সে অবহেলা করিতে চায়! কেন! এ সূত্রকে অনুসরণ করার ব্যাকুলতা দূরে থাক—তাহার অস্তিত্বই তাহাকে কেন এমন বিচলিত শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে! প্রদ্যোৎ নিজের মনে স্পষ্ট কোন উত্তর পায় না। কিন্তু ভয় যে তাহার হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিস্মৃতির যবনিকার পারে কি আছে সে জানে না; কিন্তু আর যেন একটু উঁকি মারার সাহস পর্য্যন্ত তাহার নাই, ইচ্ছা নয়। তাহার সযচেতন মন হইতে কোন সতর্কবাণী যেন তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। যবনিকা এপারে কোন আকর্ষণ তাহার আর নাই, নাই কোন শান্তি—এপারে শুধু মরুধূলার শূন্যতা; কিন্তু তবু ওপারে সে যাইতে চায় না। মনের গূঢ় কোন দুর্বোধ প্রেরণাই তাহাকে বাধা দিতেছে।

লোকটার কথা সে ভুলিতে চেষ্টা করে। যেটুকু সে দেখিয়াছে, যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতে আনন্দে স্মরণ করিয়া রাখিবার মত ব্যক্তি সে নয়। এরকম লোকের সহিত কেন তাহার পরিচয় ছিল, তাহাই সে বুঝিতে পারে না। শুধু পরিচয়ও নয়, বিশেষ ভাবে তাহাদের যে যোগ ছিল, একথাও লোকটির কথায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সম্ভব? শুধু বাহিরের চেহারা দিয়া হয়ত মানুষকে বিচার করা উচিত নয়; কিন্তু তবু লোকটির সংস্পর্শে মন যে আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আসে একথা ত আর মিথ্যা নয়। তাহার মনও চেহারার ভঙ্গীতে, কথার কোন অন্ধকার-পঙ্কিল জীবনের ছায়া যেন আছে। সাধারণ মানুষের মত সহজভাবে সে যে জীবন-যাপন করে না, এ সন্দেহ তাহাকে দেখিলেই বুঝি মন হইতে দূর করা যায় না। যেখানে জীবনের রৌদ্রোজ্জ্বল পথ কুটিলভাবে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে নামিয়া গিয়াছে, যেখানে সমস্ত সত্য বিকৃত, সমস্ত স্বাভাবিক আশা আনন্দ অধিক, সেই অন্ধকার-জগতের ছায়া লোকটির সর্ব্বাঙ্গে। এরকম লোকের সহিত তাহার জীবন কেমন করিয়া তাড়াইয়া যাওয়া একটু বিস্ময়কর ছিল। কিন্তু যেমন করিয়াই বাড়াইয়া যাক, সে কথা বুঝি বিস্মৃত হওয়াই ভাল।

ভুলিতে চেষ্টা করিলেই কিন্তু ভোলা যায় না। প্রদ্যোতের সমস্ত মনের উপায় গাঢ় ছায়া ফেলিয়া এই ঘটনাটুকু জাগিয়া থাকে। কিছুতেই তাহার শান্তি নাই, কিছুতেই ইহাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে সে ঘটনা যেন তাহাকে ভয়ঙ্কর রহস্যময় ইঙ্গিত করিতে থাকে। মনের রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে কোথায় যেন আছে অন্ধকার গুপ্তদ্বার। এখনই তাহা খুলিয়া যাইতে পারে, দেখা দিতে পারে আবরণ-মুক্ত লুপ্তজীবন। কিন্তু প্রদ্যোতের যেন তাহাতেই ভয়। অর্থহীন গভীর ভয়। একদিন সে যবনিকার এপারে দাঁড়াইয়া হতাশভাবে তাহা অপসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, আজ যেন সে প্রাণপণে সেই যবনিকা টানিয়া রাখিতে হয়, দুই জীবনের মাঝে যে সেতু অকস্মাৎ দেখা দিয়াছে কোনমতে তাহাকে চায় ভুলিয়া থাকিতে; ভুলিতে না পারিয়াই তাহার আপত্তির আর সীমা নাই।

প্রদ্যোতের মনের ভিতর তাই চলিয়াছে ভয়ঙ্কর আলোড়ন। আকাশের উপর ঘন মেঘের গভীর আবরণ ছিল প্রসারিত। সেই মেঘ-লোকেই যেন অস্থির হইয়া

উঠিয়াছে। সেখানে সুরু হইয়াছে সংঘর্ষ আর চঞ্চলতা। এ বুঝি অপসারণেরই পূর্ব্ব সূচনা।

প্রতি মুহূর্ত্তে প্রদ্যোৎ উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। কোন দিক্ দিয়া কখন যে দ্বার খুলিয়া যাইবে, কে জানে! কে জানে, বিলুপ্ত জীবনের কোন সূত্র হঠাৎ কোথা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে।

সম্ভবতঃ, এই উদ্বেগের জন্য রাত্রে সে কয়েকদিন অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখিতেছে। হয়ত এ সমস্ত অর্থহীন স্বপ্নমাত্র। হয়ত এগুলি তাহার গত জীবনের ছিন্ন নানা অংশ মনের গভীর অন্ধকার কক্ষ হইতে অকস্মাৎ খেয়ালী হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এসব স্বপ্ন প্রদ্যোৎকে আরও শঙ্কিত করিয়াই তোলে। নিজের যে পরিচয় সে অধিকাংশ সময়ে এই স্বপ্নের ভিতর পায়, সত্য হইলে তাহা প্রীতিকর কোন দিক্ দিয়াই নয়।

ক্রমশঃ এই দ্বন্দ্বও তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজের উপর এমন বিনিদ্র ভাবে পাহারা আর বুঝি দেওয়া যায় না। সারাদিন এমন আতঙ্ক ও অস্বস্তির মধ্যে জীবন-যাপন করার চেয়ে দুঃখের বুঝি আর কিছু নাই। তাহার চায়ে এ অশান্তি বুঝি একেবারে শেষ করিয়া দেওয়াই ভাল। নিজেকে পুনরাবিষ্কার করিবার আঘাত যত বড়ই হোক, এই অনিশ্চয়তার অশান্তি হইতে সে ত মুক্তি পাইবে। এখন প্রতি মুহূর্ত্তে একটি ঘটনা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। কেবলই তাহার মনে পড়িতেছে, এই সহরেরই ভিতর একটি লোক তাহার বিলুপ্ত অতীতের সূত্র লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। যে কোন সময়ে তাহার সহিত আবার দেখা হইয়া যাইতে পারে। আর তাহাকে বাহিরে এড়ান হয়ত সম্ভব; কিন্তু ভিতরে তাহার ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত কিছুতেই যে উপেক্ষা করিয়া থাকা যায় না।

প্রদ্যোৎ শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করিল, সে যাইবে। যবনিকা দুলিয়া উঠিয়াছে। একবার অপসারিত হইলে কি যে সে দেখিবে তাহা সে জানে না; হয়ত তাহা নিজের অপ্রত্যাশিত ভয়ঙ্কর একরূপ, হয়ত আর কিছু, কিন্তু তাহা না জানিয়াও তাহার আর শান্তি নাই। এই ধুম্র-ধূসর জগতেও এই অস্বস্তি লইয়া সে আর যেন বাস করিতে পারিতেছে না।

লোকটি তাহার দোকানের অবস্থান জানাইয়াই দিয়াছিল। একদিন বিকালে প্রদ্যোৎ সেখানে গিয়া হাজির হইল। পথে আসিতে আসিতে সমস্ত কথা সে ভাবিয়া রাখিয়াছে। ধরা দিলে তাহার চলিবে না। অতীত যে তাহার স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, একথা সে জানাইতে চাহে না। তাহাকে ধরা না দিয়াই নিজের পরিচয় জানিয়া লইতে হইবে। অপরের কথা হইতে সমস্ত ইঙ্গিত সংগ্রহ করিয়া নিজের বিস্মৃত জীবনী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

কিন্তু সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা তাহার হইল না। দোকানের কাছে গিয়া প্রদ্যোতের মনে পড়িল, লোকটির নাম সে জানে না। নাম জানিবার সুবিধা সেদিন হয় নাই। দোকানের ভিতর সামান্য কিছু কিনিবার ছুতায় সে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু লোকটিকে সেখানে না দেখিতে পাইয়া সে যেন আশ্বস্ত হইল। নিজের মনকে শান্ত করিবার জন্য তবু আরও কিছু প্রয়োজন ছিল। প্রদ্যোৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিল, —"এ দোকানের মালিকের সঙ্গে একটু দরকার ছিল। কখন পাওয়া যাবে বল্‌তে পারেন।"

ছোট একটি তক্তপোষের উপর সামনে একটি কাঠের বাক্স লইয়া স্থূলকায় একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"মালিকের সঙ্গে কি দরকার! আপনার কি চাই বলুন না।"

প্রদ্যোৎ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"আমার মালিকের সঙ্গেই দরকার!

"আমিই মালিক!" বলিয়া লোকটা এবার অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে প্রদ্যোৎকে যেন আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল।

সে দৃষ্টিতে প্রদ্যোতের অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইবারই কথা। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার মন কি কারণে তখন যেন অত্যন্ত হাল্কা হইয়া গিয়াছে। এ দৃষ্টি সে লক্ষ্যই করিল না। দোকানের মালিককে বিমূঢ় করিয়া দিয়া সে একবার শুধু

সবিস্ময়ে বলিল—"আপনিই মালিক!" তাহার পর অসঙ্কোচে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া তাহার মনে হইল, হঠাৎ যেন তাহার মনের দুঃসহ গুমোট কাটিয়া গিয়াছে। সে মুক্ত। অতীতের ভয়ঙ্কর ছায়া তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে অনুসরণ করিতেছে ভাবিয়া এতদিন বুঝি সে বৃথাই ভয় পাইয়াছে। সত্যই, সামান্য একটা রাস্তার লোকের কথা হইতে এতখানি কল্পনা করিয়া লইবারই তাহার কি কারণ ছিল! রাস্তার কত লোককে ভুল করিয়া ত পরিচিত বলিয়া মনে হয়। লোকটারও যে ভুল হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে! লোকটা মিথ্যা ঠিকনা দিয়া নিজের বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার প্রমাণ ত নিজেই রাখিয়া গিয়াছে। হয়ত লোকটার সহিত তাহার জীবনের কোনও যোগ কোথাও নাই। তাহার অতীত জীবনের ধারা পৃথক্। হয়ত তাহার অতীত জীবন সত্যই সমস্ত চিহ্ন লইয়া একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর কোনদিন তাহার ছিন্ন সূত্র বর্ত্তমানের ভিতর দেখা দিয়া বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিবে না।

এই কয়দিনের দুশ্চিন্তার পাষাণ-ভার হইতে মুক্ত হইয়া প্রদ্যোৎ আজ প্রথম অনেকদিন বাদে সন্ধ্যা হইতেই মেসে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও তাহার জন্য আর এক বিস্ময় যে অপেক্ষা করিয়া আছে, কে জানিত! সিঁড়ি দিয়া নিজের ঘরে উঠিতে উঠিতে সে উপর হইতে উল্লসিত সাগ্রহ চীৎকার শুনিল—"রাঙাদা!"

আশ্চর্য্য ব্যাপার! বিমল সেই সুদূর দারবাক হইতে একলা খোঁজ করিয়া এই মেসে আসিয়াছে রাঙাদার জন্য! আশ্চর্য্য হইয়াছে সব চেয়ে বেশী বুঝি বিমল নিজে। এ কল্পনাতীত কীর্ত্তি তাই উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত পৃথিবীতে রাষ্ট্র করিতে দেওয়া তাহার পক্ষে অন্যায় নয়।

প্রদ্যোতের সিঁড়িটুকু উঠিবার অপেক্ষা না রাখিয়া বিমল তাড়াতাড়ি নামিয়া মাঝ-পথেই তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরই সুরু হইল তাহার ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু শুধু ভ্রমণ-কাহিনী সে নয়, এতদিনে রাঙাদার অভাবে অনেক কথা তাহার মনে জমা হইয়া আছে। বাড়ী হইতে আরও অনেক কথা রাঙাদাকে জানাইবার ভার লইয়া সে আসিয়াছে। এই সমস্ত কথাই এক সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া ভ্রমণ-কাহিনীকে একটু জটিল ও বিচিত্র করিয়া তুলিল।

প্রদ্যোৎ প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইবার পূর্ব্বেই অনেক কিছু বিমল বলিয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীতে সময়ের অভাব সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানপ্রখর। সে জানে, অনেক কথাই অবসরের অভাবে শেষ পর্য্যন্ত অকথিত থাকিয়া যায়। সময়ের অপব্যয় সে অন্ততঃ করিবে না।

সিঁড়িটুকু পার হইয়া ঘরে পৌছাইবার পূর্ব্বেই এক নিশ্বাসে সে যাহা বলিয়াছে, বিষয় ভাল করিয়া সাজাইলে তাহার ভিতর অনেকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। তথ্যগুলি অসংলগ্ন। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! বিমল ইতিমধ্যে জানাইয়াছে, যে ট্রেণ-গাড়ীতে চড়িয়া কলিকাতা আসিতে সে বিন্দুমাত্র ভয় পায় নাই। কলিকাতা এত বড় সহর, তাহা অবশ্য তাহার জানা ছিল না। কিন্তু ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে! এই ত সে অনায়াসে রাঙাদার মেস খুঁজিয়া বাহির করিল। বড়দিদি ও মার কেন যে তাহার শক্তিতে বিশ্বাস নাই, সে বুঝিতে পারে না। আর রাঙাদা কেন এতদিন দেশে যায় নাই তার কৈফিয়ৎ অবিলম্বে চাই। সেই জন্যই তাহার আসা। আর কমল এখন ভয়ানক আব্দারে হইয়াছে। আসিবার জন্য তাহার কি কান্না। সে যে ছেলেমানুষ, একথা সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না। এত বড় সহরে সে কি পথ খুঁজিয়া আসিতে পারিত? তাহাকে সঙ্গে আনিলে বিমলকেই পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত। আর কলিকাতায় বিমল যখন আসিয়াছে, তখন সে যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা না দেখিয়া যাইবে না।

বিমল দম লইবার জন্য একটু বুঝি তাহার পর থামিয়াছিল। প্রদ্যোৎ সেই সুযোগে জিজ্ঞাসা করিল—"তোকে যে একলা পাঠিয়ে দিলে! তুই লুকিয়ে পালিয়ে আসিস্ নি ত!"

বিমল উত্তেজিত হইয়া বলিল—"বা রে লুকিয়ে আসব কেন? লুকিয়ে এলে, পয়সা পাব কোথায়? মা ত পয়সা

দিয়ে দিলে। ট্রামের পয়সা কিন্তু বেঁচে গেছে, জান রাঙাদা! ষ্টেশনে একজন লোককে তোমার ঠিকানা দেখিয়ে কোন ট্রামে যাব জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিনা! আমি নিজেও আস্‌তে পারতাম কিন্তু। ট্রামে চড়া আবার কি শক্ত! তিনিই পয়সা দিয়ে দিলেন রাঙাদা। আমি দিতে যাচ্ছিলাম, কিছুতে নিলেন না। তিনি এই দিকেই আসছিলেন কিনা। তাই ট্রামে তাঁর সঙ্গেই উঠেছিলাম। ট্রাম থেকে নেমে কিন্তু আমি একলা এ বাড়ী খুঁজে বা'র করেছি। বা'র করা ত ভারী শক্ত! উমেশ ভট্টাচার্য্য লেন ত লেখাই আছে রাস্তার গায়ে।

বিমলের অসংলগ্ন উচ্ছ্বাস বহিয়াই চলিল। প্রদ্যোতের সমস্ত মন তখন কিন্তু অনুশোচনায় ভরিয়া গিয়াছে। কত দুঃখে, কি হতাশায় নিরুপায় হইয়া মা যে শেষ পর্য্যন্ত এই ছেলেটিকে তাহার খোঁজে কলিকাতার সমস্ত বিপদের মধ্যে পাঠাইয়াছেন, তাহা বোঝা তাহার পক্ষে কঠিন নয়। তাহার মনে পড়িল, এই কয়দিন মার চিঠির একটা উত্তর পর্য্যন্ত সে দিতে পারে নাই। বিমল নিরাপদে যে পৌছিয়াছে তাহা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু কোন বিপদ্ তাহার ঘটিলে নিজেকে কেমন করিয়া সে ক্ষমা করিত!

এবার বিমল তাহার উচ্ছ্বাসের মাঝে হঠাৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—"তোমার অসুখ করেছিল না, রাঙাদা?"

তাহার পর উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিয়া চলিল—"বড়দি তাই বল্‌ছিল। বল্‌ছিল খুব হয়ত ভারী অসুখ করেছে সেখানে। অসুখ না হলে সে কখন এতদিন একটা চিঠি দিয়েও খোঁজ নেয় না! আমিও তাই ভাব্‌ছিলুম। কাল কিন্তু বাড়ী যেতে হবে, রাঙাদা। কাল বিকেলে অবশ্য। সকাল বেলাই চিড়িয়াখানা খোলা থাকে ত!"

প্রদ্যোৎ হাসিয়া বলিল "থাকবে! কিন্তু কাল ত বাড়ী যাওয়া হবে না, বিমল!"

বিমলের মনের ইচ্ছা হয় ত তাই। এত কষ্ট করিয়া কলিকাতা আসিয়া একদিন মাত্র থাকিয়াই সে চলিয়া যাইতে চাহে না। কিন্তু তাহার দায়িত্ব সে ভুলিবে কেমন করিয়া! বিষণ্ন মুখে সে বলিল—"কালই যে যেতে বলে দিয়েছে, রাঙাদা। মা সে জন্যেই ত আমায় পাঠিয়ে দিলে। সেখানে কি সব গোলমাল হয়েছে কিনা!"

প্রদ্যোৎ উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি গোলমাল!"

"কি জানি কি সব—! ছোড়দির নাকি আর বিয়ে হবে না, তাই কি সব নিন্দে হয়েছে। ওঃ তোমায় যে!! একটা চিঠি দিয়েছে। ভুলেই গেছি দিতে!" কি ভাগ্য, যে চিঠিটুকু হারায় নাই। বিমল তাহার জামার পকেট খুঁজিয়া চিঠিটুকু এবার বাহির করিল।

ছোট চিঠি নয়, বেশ দীর্ঘ। অনেক কথাই মাকে লিখিতে হইয়াছে। না লিখিয়া বুঝি উপায় ছিল না।

চিঠি পড়িতে পড়িতে প্রদ্যোতের মুখ ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিল। তাহার অনুপস্থিতেই মা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন সে ভাবিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, দেখা শোনার অভাবে হয়ত সেখানে ভয়ানক অসুবিধা হইতেছে—সেই জন্যই এবং প্রদ্যোতের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া মা শেষ পর্য্যন্ত বিমলকে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সেখানে যে এত রকমের জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এই পরিবারটীর বর্ত্তমান সমস্ত দুঃখের সেই যে এক হিসাবে মূল, ইহা বুঝিয়া তাহার সমস্ত আরও বিস্বাদ লাগে। মিথ্যাই সে ইহাদের সাহায্য করিতে গিয়াছিল। কল্যাণের পরিবর্ত্তে সে ইহাদের জীবনে অশান্তিই ডাকিয়া আনিয়াছে। নিজের জীবনের অভিশাপ সে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে এই পরিবারটির উপর। নিজেকে অপসারিত করিয়াও লাভ হয় নাই। ফল বিপরীতই হইয়াছে।

মাকে অনেক দুঃখে সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সব কথা লিখিতে হইয়াছে। গ্রামে এই পরিবারটির বাস করাই দায় হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মলার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হইতেই বোধ হয় এই গোলমালের সুত্রপাত। অনুগ্রহ করিয়া প্রায় বিনা পণে যাহারা কন্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহারা এই প্রত্যাখানকে অপমান হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে এবং এ অপমানের প্রতিশোধ নিষ্ঠুর ভাবে দিতে বিলম্ব করে নাই। সৎপাত্র

পাওয়া সত্ত্বেও নির্ম্মলার বিবাহ দিতে নারাজ হইবার কারণ অত্যন্ত কুৎসিতভাবে উদ্ভাবন করিয়া তাহারা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। যথারীতি পল্লবিত হইয়া কথাটা ইতিমধ্যেই এমন ভাবে রাষ্ট্র হইয়াছে, যে বাহিরে তাঁহাদের মুখ দেখাইবার উপায় নাই। লোকে বাড়ীতে আসিয়া পর্য্যন্ত অপমান করিয়া যাইতে আর দ্বিধা করে না। প্রদ্যোতের সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি তাহাদের কল্পনার আরও খোরাক জুটাইয়াছে। প্রদ্যোৎ এ পরিবারের আপনার জন না হইয়াও যে ইহাদের ভরণ-পোষণ করিতেছে, ইহাই তাহাদের কুৎসিত আলোচনার বিষয়। এইখানেই তাহাদের কল্পনার ক্ষেত্র। প্রদ্যোতের অনুপস্থিতিরও তাহারা এমন সব ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছে যাহা কাণে শোনা যায় না। অথচ না শুনিলেও উপায় নাই। যাহারা এসব কথা উদ্ভাবন করে, না শুনাইয়া তাহাদের স্বস্তি নাই। নিজের গরজেই তাহারা গায়ে পড়িয়া সব কথা বলিয়া যায়।

মা শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন যে, পাড়ায় যে ভাবে কুৎসা রটিয়াছে তাঁহাতে নির্ম্মলার বিবাহ হওয়াই বুঝি অসম্ভব। সকলেই তাহাদের বিপক্ষে। তাঁহারা অসহায় বলিয়াই তাঁহাদের পক্ষ লইবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই—এই বিপদের সময় কি অপরাধে প্রদ্যোতও তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। প্রদ্যোতের কাছে শেষ একটি অনুরোধ তিনি করিয়াছেন। প্রদ্যোৎ আর কিছু না করুক, এই অনুরোধটি যেন সে রাখে। একদিন তিনি দেশের বাড়ী ঘর বেচিয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। প্রদ্যোৎ তখন বাধা দিয়াছিল। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। তাঁহার নিজের বাপের বাড়ীর গ্রামে সামান্য টাকাকড়ি যাহা ছিল কোন রকমে হয়ত তাঁহার আশ্রয় মিলিতে পারে। এ গ্রামে বাস করা যখন কোন দিক্ দিয়াই আর সুবিধা নয়, তখন প্রদ্যোৎ যেন এইটুকু ব্যবস্থা তাঁহাদের করিয়া দেয়। দারবাকের জমি জমা সামান্য যাহা আছে তাহার ন্যায্য মূল্যটুকু হইতে যাহাতে তাঁহারা বঞ্চিত না হন, এটুকু যেন প্রদ্যোৎ দেখে। তাহার বিরুদ্ধে তাঁর সত্যই কোন ক্ষোভ নাই। সে যাহা করিয়াছে, নিজের সন্তানও তাহা বড় একটা করে না। প্রদ্যোৎকে সে জন্য তিনি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

প্রদ্যোৎ চিঠি হাতে লইয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অমল-বাবুদের পরিবারের উপর হইতে দুর্য্যোগের মেঘ কোন দিনই দূর হয় নাই। তাহার নিজের চেষ্টাও সে দিক্ দিয়া নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এই পরিণাম সে যেন সহ্য করিতে পারে না। এত দূর যে কল্পনা করে নাই। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই, যে এ পরিণামের জন্য সে নিজেই বেশীর ভাগ দায়ী; কিন্তু কি এখন সে করিতে পারে।

হাঁা, পারে বই-কি! সমস্ত দুর্ঘটনা দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া ভাগ্য-দেবতার নির্দ্দেশ এবার সে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারে। ভয় করিবার, দ্বিধা করিবার আর তাহার কিছু নাই। নিয়তির নির্দ্দেশ যেখানে তাহার অন্তরের নির্দ্দেশের সহিত মিলিয়াছে, সেখানে সে সঙ্কোচ করিবে কেন? সমাজ, সংস্কার, সব কিছুর সম্মান রাখিয়া সে নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিল। নিজের সত্যকে অস্বীকার করিয়া স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনের সমস্ত বেদনা বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এ আত্মনিগ্রহের কোন অর্থই ত আর হয় না। কাহাকে সে সম্মান করিবে! সমাজ মানে ত এই! অসহায় এক নিরীহ পরিবারের বিরুদ্ধে জঘন্যতম ষড়যন্ত্র করিতে তাহার বাধে না। এই সমাজের মুখ চাহিয়া নিজের জীবনের সত্যকে কেন সে বলি দিবে? বলি দিয়া কল্যাণ হইবে কার? নির্ম্মলার নয়, তাহারও নয়। বিলুপ্ত জীবনে কি যে তাহার পরিচয় সে অবশ্য জানে না! কিন্তু না জানিলেই বা কি আসে যায়। সে জীবনের সহিত কোন সম্বন্ধও তাহার আর নাই। তাহার ত নবজন্ম হইয়াছে। সত্য তাহার বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমান জীবনে সে কিছুর অযোগ্য নয়। বর্ত্তমান জীবনেরও দাবী ত আছে! সুখের দাবী, শান্তির দাবী, নূতন করিয়া ভবিষ্যৎ-রচনার দাবী। সে দাবীও তাহাকে মিটাইতে হইবে। যে অতীত মৃত্যু-গাঢ় অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে, তাহারই ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া থাকিবার তাহার কোন প্রয়োজন নাই। এবার আর সে ভয় করিবে না, নিজের জীবনের সত্যকে নির্ভীকভাবে

প্রতিষ্ঠিত করিবে। অন্তরের নির্দ্দেশ যেখানে ভাগ্য-দেবতার নির্দ্দেশের সহিত মিলিয়াছে সেখানে দ্বিধা-ভরে সে দাঁড়াইয়া থাকিবে না।

নির্ম্মলার দিক্ হইতে যে বাধার কথা আগে তাহার ভাবার প্রয়োজন ছিল, সে বাধাও ত এখন দূর হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মলার নামে, তাহার পরিবারের নামে পাছে কুৎসা রটে, এই জন্যই সে ভয় পাইয়াছিল; কিন্তু আর ভয় করিবার কিছু নাই। সমাজ নিজে হইতেই তাহাদের নামে কালী-লেপনের ভার লইয়াছে, সত্যের জন্য অপেক্ষা করে নাই। নির্ম্মলাকে গ্রহণ করিলে, তাহাদের পরিবারের সামাজিক অখ্যাতি আর হইবে না। তাহাদের নামে যথেষ্ট কুৎসা রটনা হইয়াছে তাহার পূর্ব্বেই —বুঝি ভালোই হইয়াছে। অবস্থা সকল দিক্ দিয়া এমন জটিল না হইয়া উঠিলে, বুঝি প্রদ্যোৎ নিজের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রেরণা পাইত না। নিজের স্বার্থ-ই পাছে প্রধান হইয়া উঠে, এই ভয়েই সে নিজেকে অপসারিত করিয়া রাখিত।

সমস্ত ঘটনার ধারার ভিতর এবার প্রদ্যোৎ সত্যই যেন ভাগ্য-দেবতার স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেখিতে পায়। এই ধারায় যতক্ষণ সে ভাসিয়া আসিয়াছে, ততক্ষণ তাহার মনে বুঝি সংশয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষ ছিল না। নদীর প্রতি বাঁকে সে ভয় পাইয়াছে, হতাশ হইয়াছে, দুলিয়াছে সন্দেহ-দোলায়। তাহার মনে হইয়াছে, এ ধারা বুঝি অর্থহীন; উদ্দেশ্যহীন ইহার গতির কুটিলতা। তাহাকে লইয়া এ যেন খেয়ালী কোন নিষ্ঠুর দেবতার খেলা! কিন্তু এখন সে যেন লক্ষ্য দেখিতে পাইয়াছে। সমস্ত ঘটনার ধারার অর্থ এইবার তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নানা পথে ঘুরাইয়া, নানাভাবে নাকাল করিয়া জীবন-বিধাতা তাহাকে এইখানেই পৌঁছাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্যই বুঝি তাহার নবজন্মের প্রয়োজন ছিল। সমস্ত আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া, সমস্ত অবলম্বন হারাইয়া এমনি করিয়া নূতনভাবে তাহাকে জীবনের সার্থকতা ও মহিমা আবিষ্কার করিতে হইবে, এই বুঝি তাঁহার অভিপ্রায়!

চিঠি পড়ার পর রাঙাদার মুখ দেখিয়া বিমল ভয় পাইয়াছিল কিনা, কে জানে। এতক্ষণ কিন্তু তাহার কোন কথা শোনা যায় নাই। এইবার সাহস করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"কালকেই যাবে ত রাঙাদা।"

প্রদ্যোৎ হাসিয়া বলিল,—"নিশ্চয়ই।"

প্রদ্যোতের মনে আর কোন দ্বিধা নাই। নিজের পথ সে দেখিতে পাইয়াছে।

এ কাহিনী এখানেই সমাপ্ত হইলে বুঝি ভালো হইত। অতীত জীবনের যবনিকা তুলিয়া দেখিতে প্রদ্যোৎ আর চায় না; নূতন জীবনে আপনাকে সার্থক করিবার একটুখানি সুযোগ পাইলেই সে সন্তুষ্ট। সে সুযোগটুকু সে লাভ করুক, এই বুঝি আমাদের কামনা। কঠিন সাধনা সে করিয়াছে, মূল্যও বড় কম দেয় নাই। নিজের জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে রচনা করিবার অধিকার সত্যই সে অর্জ্জন করিয়াছে।

প্রদ্যোৎকে আমরা ছোট একটি সংসারের মধ্যে কল্পনা করিতে পারি। শান্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা—আনন্দ গভীর বলিয়াই বাহিরে কোন চাঞ্চল্য নাই। তাহারই ভিতর দিয়া সে প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের অসীম রহস্যের স্বাদ আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে। জীবনকে ভাবিবার জন্য উদ্ভট কোন সাধনার, অসাধারণ কোন আয়োজনের প্রয়োজন নাই, এইটুকু এতদিনে সে জানিয়াছে। সে জানে জীবনের সত্যকার মহিমা উচ্ছৃঙ্খল উল্কা-গতিতে নয়, শান্ত সুসঙ্গত ছন্দে। সৃষ্টির গূঢ়তম অর্থ এই ছন্দেই ধরা পড়ে। সেই ছন্দেই প্রদ্যোৎ তাহার জীবন এবং একটি সংসারকে রচনা করিয়া তুলিতেছে বলিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি।

আমরা মনে করিতে পারি, দারবাকের সেই বাড়ীটিতেই সে আছে। যে পরিবার তাহার নিরাশ্রয় জীবনকে আশ্রয় দিয়াছিল তাহাদের কাহাকেও সে ছাড়িতে চায় না। সকলকে লইয়াই চলিয়াছে তাহার অপরূপ রচনা। তাহার নির্ভীক আত্ম-প্রতিষ্ঠার শাসনে গ্রামের বিষাক্ত শাণিত জিহ্বাও হার মানিয়া নীরব হইয়াছে। এ পরিবারের মাথার উপর দুর্য্যোগের মেঘ আর ঘনাইয় নাই। বাহিরের দিক্ দিয়া তাহার জীবন এখনও হয়ত

পরিবর্ত্তিত হয় নাই ; এখনও সে সমস্ত হপ্তা কলিকাতায় কাটাইয়া শনিবার সন্ধ্যায় উৎসুকভাবে ট্রেণে আসিয়া চাপে। পুরাতন কবিতার মত সেই অতি পরিচিত পথ মধুরভাবে ট্রেণ যেন পুনরাবৃত্তি করিয়া যায়। ষ্টেশনে নামিয়া অস্পষ্ট অন্ধকারের ভিতর দিয়া অঙ্গনের মত সে গ্রামের পথ পার হয়। এ সমস্ত গ্রাম এখন যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত বিশেষভাবে গোচর না হইয়াই স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের স্পর্শ দেয়। তাহার হাতে ছোটখাট একটি মোট। তাহার ভিতর কত কি অপরূপ সামগ্রী যে আছে, কে জানে! হয়ত বড়দির ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু লজঞ্চুস্! কমলের জন্য রঙীন ছবির বই, বিমলের জন্য হয়ত দুর্লভ একটি দোফলা ছুরি, সংসারের জন্য দুষ্প্রাপ্য কিছু আনাজ, আর হয়ত নির্ম্মলার জন্য সামান্য কয়েক গজ জরির ফিতে। দরজায় আঘাত দিতে না দিতেই এখনও উৎসুক হাতে খিল খুলিয়া যায়। তাহার পর সুরু হয় আনন্দ-কোলাহল।

কিন্তু দারবাকের সেই বাড়ীটিরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে নিশ্চয়। দক্ষিণের ভাঙ্গা ঘরের হয়ত সংস্কার হইয়াছে। 'তাহার উপর নূতন পাতার ছাউনি। ঘরের ভিতর হইতে আলো দেখা যায়। দুটি উৎসুক হাত এই দিনটির প্রতীক্ষায় সমস্ত সুচারুরূপে নিখুঁতভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। ধব্‌ধব করে পরিপাটি বিছানা। আনলার ধারে কাপড় জামা পরিচ্ছন্নভাবে ঝোলান। টেবিলের উপর নূতন মাজা বাতিটি ঝক ঝক করিতেছে। ঘরের আস্‌বাব হয়ত সামান্যই কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটিকে নিপুণ একটি হাতের স্পর্শ পরিস্ফুট।

বড় আটচালার দাওয়ায় হয়ত আগেকার মতই জটলা হয়। আধ-অবগুণ্ঠিত একটি মেয়ে শুধু বুঝি দূরে দূরে থাকে। তবু তাহার সমস্ত দেহ মনের উচ্ছল আনন্দ বুঝি চাপা থাকে না।

হয়ত দিদি বলেন—"তোর আজ চা করতে হবেনা বাবু! পেয়ালাটা ভাঙলি ত!"

চাপা হাসির সঙ্গে মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"না গো ভাঙব কেন। পড়ে' গেল হাত লেগে!"

"আজ তোর হাত থেকে সব পড়ে যাবে! তুই সর দেখি।" বড়দিকে এ অন্যায় পরিহাসের জন্য দৃষ্টি দ্বারা শাসন করিয়া রাগের ভাণ করিয়া নির্ম্মলা চলিয়া যায়; কিন্তু বেশী দূরে কোথাও নয়।

বড়দি আবার ডাকিবামাত্র তাহার সাড়া পান,—"নে চা দিয়ে আয় প্রদ্যোৎকে! সেদিনের মত আবার হাতে ফেলে দিস্‌নি যেন গরম চা।"

"আহা, সেদিন বুঝি আমার দোষ ছিল--নিতে গিয়ে ছেড়ে দিলে কেন!"

...তাহার পর রাত আরও বাড়ে। নিস্তব্ধ গ্রামের উপর রাত্রির আকাশ জ্যোতির্লোকের রহস্য-সঙ্কেত প্রসারিত করিয়া দেয়। দক্ষিণের ঘরে নির্ম্মলা প্রদ্যোতের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। মাথার ঘোমটা তাহার হয়ত প্রায় সরিয়া গিয়াছে, তবু মনে হয়, সে মুখ আধ-অবগুণ্ঠনের অপরূপ রহস্যে যেন মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সবখানি তাহার জানা যায় না, কোন দিনই যাইবে না। যত দূরই অভিমান করুক না কেন, তাহার রহস্য যে কোনদিন ফুরাইবে না, ইহাতেই বুঝি প্রদ্যোতের গভীর পরিতৃপ্তি নির্ম্মলাই তাহার জীবনে রাত্রির আলাপের রহস্য-সঙ্কেত আনিয়াছে।

* * *

কিন্তু এ কল্পনা এখন থাক! এ কাহিনীর সমাপ্তি হইতে আরে একটু বাকী আছে।

প্রদ্যোৎ বিস্মৃতির যবনিকা অপসারিত করিতে আর চাহে নাই হয়ত, কিন্তু তবু যবনিকা উঠিল অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে। প্রদ্যোতের সমস্ত কল্পনা, সমস্ত সঙ্কল্প গেল বিপর্য্যস্ত হইয়া।

"পরের দিন সকাল বেলা প্রদ্যোৎ বিমলকে লইয়া চিড়িয়াখানা দেখাইতেই বুঝি বাহির হইতেছিল। সহসা দরজার কাছেই কাহার ডাকে সে ফিরিয়া তাকাইল! তাহার নিয়তির এই বুঝি বিধান—অকস্মাৎ তাই সে ফিরিয়া তাকাইল শুধু পিছনে নয়, তাহার বিলুপ্ত সমস্ত অতীত জীবনের উপর।

দেখা গেল, রাস্তার কাছে মেসের দরজার পাশে একটা লোক দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। প্রদ্যোৎ তাহাকে সহসা চিনিতে পারিল, রাস্তার ধারে আকস্মিক ভাবে যাহার সহিত দেখা হইয়াছিল সেই

লোকটি বদলায় নয়, চিনিতে পারিল তাহার পূর্ব্বের সমস্ত আবেষ্টন, সমস্ত ইতিহাসের সঙ্গে জড়াইয়া—যবনিকা খসিয়া পড়িল এক মুহূর্ত্তে। একটি লোকের পরিচয় যেন ঘন বিস্মৃতির কুয়াশা অপসারিত করিয়া আসিয়া মনের রুদ্ধ দ্বার সহসা খুলিয়া দিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে প্রদ্যোতের চোখে সমস্ত জগতের রূপও যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

লোকটা কুৎসিৎ মুখে, অশোভন ভাবে হাসিয়া বলিল "বড্ড চম্‌কে গেছ, কেমন দাদা! দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌বার চেষ্টায় ছিলে; কিন্তু মথুর রায়কে ফাঁকি দিতে পার্‌লে না। কেমন খুঁজে বা'র করেছি ত!"

প্রদ্যোৎ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে অতিকষ্টে যেন উচ্চারণ করিল—"কি দরকার বল?"

"দরকার! দরকার না হলে বুঝি আস্‌তে নেই। পুরোণ আলাপীর সঙ্গে দুটো কথা কইতে বুঝি ইচ্ছে হয় না!"

প্রদ্যোৎকে তথাপি নীরব দেখিয়া মথুর আবার বলিল—"আমায় দেখে বড় খুশী হয়েছ বলে ত মনে হচ্ছে না। আমাকে আবার ভয় কিসের, দাদা! নতুন কিছু মতলবে আছ বুঝি! কিন্তু জানত দাদা, আমা হতে কোন অনিষ্ট হবে না। আমি ত আর বিষ্ণুপদ নই। দরকার হলে কালা বোবা দুই হতে জানি।"

ইহাকে একেবারে উপেক্ষা করা বুঝি চলে না। প্রদ্যোৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"বেশ, কিন্তু আমায় ভুল ঠিকানা দিয়েছিলে কেন!"

"ভুল নয় দাদা, ঠিকই দিয়েছিলাম। তবে সাবধানের বিনাশ নেই। অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, প্রথম দিনটা তাই একটু ডুব দিলাম। যাই হোক দেখা ত হ'ল।"

প্রদ্যোৎ যেন একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"আচ্ছা, আর একদিন এস। আজ আমি একটু ব্যস্ত!"

"তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। তবু দুটো কথা আমার শুন্‌লে আর কি ক্ষতি হবে!"

এড়াইবার আর কোন উপায় নাই। বিমলকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া মথুরের সঙ্গে প্রদ্যোৎকে যাইতেই হইল।

মথুর হাসিয়া বলিল—"ওটি আবার কে? কি ফিকিরে কখন যে থাক বোঝবার উপায় নেই!"

প্রদ্যোৎ একথার জবাব দিল না। মথুর একটুখানি অপেক্ষা করিয়া, এবার আসল কথায় নামিল। গলার স্বর নামাইয়া আগ্রহ-ভরে বলিল—"ভালো একটা কাজ হাতে আছে, রাজী হও ত বল। কোন গোলমাল নেই,— ঠিক আধাআধি বখরা।"

প্রদ্যোতের মুখের ভাব একবার বুঝি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া মথুর আবার বলিল—"একেবারে আসল হীরের খণির সন্ধান পেয়েছি। সবে পাখা উঠেছে। বাপের বিষয় পেয়ে ওড়াবার ফিকির খুঁজে পাচ্ছে না। এই বেলা পাক্‌ড়াতে পার্‌লে আর ভাবনা নেই। আমার পুকুর, আমার ছিপ, তোমায় শুধু খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুল্‌তে হবে।"

প্রদ্যোৎ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"আমি ওসব কাজ ছেড়ে দিয়েছি।"

"ছেড়ে দিয়েছ!" মথুর খানিকটা বিস্মিতভাবে প্রদ্যোতের দিকে তাকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে হাসি আর থামিতে চায় না—"তা ছাড়্‌তে পার, দাদা! বেড়ালেও মাছ ছাড়ে কখনও কখনও ক্ষীরের বাটির সন্ধান পেলে। কিন্তু তোমার ক্ষিরের বাটি তোমারই থাক। উপরি পাওনায় তোমার আপত্তি কি? দিব্যি গেলে বল্‌ছি, কোন হাঙ্গামা হবে না। সব দায় আমার। কেমন রাজী ত!"

প্রদ্যোতের মনে হইল নিজেকে আর সে সংযত করিয়া রাখিতে পারিবে না। কোথায় তাহার ভিতর যেন ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিয়াছে, তাহার মনের সমস্ত নোঙর সে ঝড়ের বেগে ছিঁড়িয়া যাইবে এখনই। উন্মত্তের মত একবার যেন সে চীৎকার করিয়া উঠিতে পারিলে শান্তি পায়।

তবু শান্ত ভাবে প্রাণপণে নিজকে সংযত করিয়া সে বলিবার চেষ্টা করিল—"না, আমি পারব না।"

মথুর বুঝি এ উত্তর আশা করে নাই। খানিক নীরবে প্রদ্যোতের মুখের দিকে তাকাইয়া, হঠাৎ সে কঠিন বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"বিষ্ণুপদ জেলে একলা আছে, শুনিলাম। বেচারার কেউ নাকি সঙ্গী নেই।"

প্রদ্যোৎ হঠাৎ মথুরকে বিমূঢ় করিয়া দিয়া চীৎকার

করিয়া উঠিল—"তুমি যাও! শীগ্‌গীর যাও এখান থেকে। কোন কথা আমি শুনতে চাই না।" তাহার পর কোন দিকে না চাহিয়া আরক্ত মুখে সে হন্ হন্ করিয়া ফিরিয়া গেল।

কিন্তু বৃথাই বুঝি তাহার এ উত্তেজনা। মথুরকে সে জোর করিয়া বিতাড়িত করিতে পারে; কিন্তু যবনিকার ওপারে যে জীবন আজ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাকে অত সহজে সে ত বিদায় দিতে পারিবে না। মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিলেও, তাহাকে ছাড়ান সম্ভব নয়। বিস্মৃতির পার হইতে নবজন্মের জগতেও সে জীবনের গাঢ় ছায়া এবার আসিয়া পড়িয়াছে। চোখ বুজিলে, সে ছায়াকে অস্বীকার করা যায় না।

না, আবার তাহার নৌকার নোঙর ছিঁড়িয়াছে অতীতের বন্যা-স্রোতে। ঘাটের নিশ্চিন্ত আশ্রয় তাহার জন্য নয়। আবার তাহাকে ফিরিতে হইবে, গত জীবনের ঋণ তাহার অনেক, তাহার শোধ করিতেই হইবে।

কেমন করিয়া জীবনের অমন পথ সে প্রথম বাছিয়া লইয়াছিল, কে জানে? সামান্য হয়ত কোন প্রলোভন, হয়ত সামান্য একটু অসাধারণত্বের লোভ তাহাকে বিচলিত করিয়াছে; কিন্তু তাহার পর আর সে থামিতে বুঝি পারে নাই। নিজের গতিবেগের প্রেরণাতেই বুঝি ক্রমশঃ থামিয়া গিয়াছে, অসহায় ভাবে নামিয়া গিয়াছে অতল অন্ধকারে। চেষ্টা করিলেও, সে দিন বুঝি তাহার ফিরিয়া দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। অথচ এ জীবনে সার্থকতা শুধু নয়, শান্তিও যে নাই, এ কথা সেদিনও সে যেন বুঝিয়াছিল। ক্ষণে ক্ষণে সেদিনও তাহার মন উদাস হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকার বন্ধ্যা জীবনের তীর হইতে উৎসুক ভাবে চাহিয়াছে ওপারের স্নিগ্ধ শ্যামলতার দিকে, যেখানে মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনার উগ্র সুরায় মাতাল হইয়া জীবনের ব্যর্থতাকে ভুলিতে হয় না, যেখানে শান্ত স্রোতঃ বয় সৃষ্টির পরম সার্থকতার উদ্দেশ্যে।

ফিরিবার পথ নাই বলিয়াই হতাশ হইয়া সে বুঝি নিজের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে, আরও গভীর অতলতায় নামিয়া গিয়াছে। সুখে, শান্তিতে যাহারা বাস করে, আর যাহারা কাপুরুষের মত আসে উত্তেজনার উগ্র গণ্ডুষ মাত্র পান করিতে, সকলের উপরই তাহার ছিল আক্রোশ। তাহাদের প্রতারণা করাই তাহার শুধু ব্যবসায় নয়, বুঝি বিলাসই ছিল। তাই দিন দিন সে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ক্ষমতা বাড়িয়াছে দিন দিন। কত ভাবে, কত অদ্ভুত উপায়ে মানুষকে সে যে ঠকাইয়াছে তাহার বুঝি হিসাব হয় না। তাহার প্রতিভা স্বাভাবিক পথ পায় আর নাই, তাই বিকৃত ভাবেই তাহার স্ফূরণ হইয়াছে।

এক জায়গায় সে বেশীদিন স্থির থাকে নাই, এক পথ বেশীদিন অনুসরণ করিতে পারে নাই। তাহার ভিতরের অশান্তি কেবলই তাহাকে নূতনতর হইতে নূতন ক্ষেত্রে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। কখনও একদলের সহিত গোপন জুয়ার আড্ডায় বসাইয়া নিরীহ নির্ব্বোধ ধনীসন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়াছে! কখনও আর এক দলের সহিত ভিড়িয়া পুলিশের সতর্কদৃষ্টি এড়াইয়া, নিষিদ্ধ মাদক-দ্রব্য-চালানের বন্দোবস্ত করিয়াছে।

তাহার শেষ অপকীর্ত্তি বুঝি জাল নোট চালাইবার চেষ্টা। বিদেশে এই চেষ্টাতেই বিফল হইয়া সে গোপনে দেশে পলাইয়া আসিতেছিল। এবার পলায়ন সে সহজে করিতে পারে নাই, এত দিনে বুঝি সত্যকার বিপদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। একজন সঙ্গী তখন ধরা পড়িয়াছে। পুলিশের সতর্ক পাহারা চারিদিকে। কোন মতে তাহারই ভিতর হইতে ভাগ্যের সহায়তায় সে বুঝি নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে সমস্ত ঘটনা এবার তাহার স্মরণ হয়। পশ্চিমের একটি সহর হইতে কোন মতে পুলিশের হাত এড়াইয়া, ট্রেণে আসিয়া উঠিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে সে পারে নাই। ধরা পড়িবার ভয় প্রতি মুহূর্ত্তে। অসীম উদ্বেগের ভিতর তাহাকে সমস্ত ক্ষণ কাটাইতে হইয়াছে। কয়েক জায়গায় ট্রেণ বদল করিয়াও নিরাপদ্ সে হয় নাই, সে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ক্রমশঃই যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনে অনেক দুঃসাহসিক অপকর্ম্ম সে করিয়াছে, কিন্তু এত ভয় বুঝি কখনও পায় নাই। সেদিনও তাহার মনে হইয়াছে, এই ভয় যেন অস্বাভাবিক, বাহিরের কোন বিপদ্ ইহার মূল যেন নয়; যেন তাহার

অন্তরের কোন অতলস্পর্শী অজানিত গুহা-মুখ হইতে অন্ধকারের গাঢ় স্রোতে উৎসরিত হইয়া এই অহেতুক আতঙ্ক তাহার সমস্ত চেতনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ সে এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে যুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল; এইটুকু তাহার মনে আছে। তাহার পর কখন নামিয়াছিল বিস্মৃতির যবনিকা, কে জানে!

কিন্তু অতীতের এই কলঙ্কিত ইতিহাস প্রদ্যোৎ এখন অস্বীকার করিতে পারে না কি?' প্রায়শ্চিত্ত তাহার কি সম্পূর্ণ হয় নাই! জন্মান্তরের এ কাহিনী ভুলিয়া সে কি নূতন করিয়া জীবন-রচনার ব্রত লইতে পারে না!

পারে, কিন্তু আগে বুঝি অতীতের ঋণ শোধ তাহাকে করিতে হইবে। প্রদ্যোৎ অন্ততঃ তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়াছে। গত এক জীবনের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে। কোন দেনা সে বাকী রাখিবে না। দেবতার চোখে হয়ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ; কিন্তু মানুষের জগতের বিচারে এখনও সে ঋণী। সে ঋণও সে শোধ করিবে। অতীতের কোন ছায়া যেন নূতন জীবনকে বিড়ম্বিত না করে। কোন মধুর রায়ের প্রতিহিংসা যেন তাহার ভয় করিবার না থাকে।

প্রদ্যোৎ বিমলকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া দেশে পাঠাইয়া দিল। বিমল যাইতে চাহে নাই। কলিকাতা দেখার সাধ তাহার মেটে নাই বলিয়া যে যাইতে চাহে নাই তাহা নয়, যাইতে চাহে নাই কেমন এক অস্পষ্ট শিশুমনের উপলব্ধির ইঙ্গিতে। সমস্ত দিন রাঙাদার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন তাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। রাঙাদা তাহার সহিত যাইতে পারিবে না, বলিয়াছে। রাঙাদা বলিয়াছে, সামান্য একটু কাজ সারিয়াই সে পরে যাইবে। কিন্তু বিমলের তাহা কেমন যেন বিশ্বাস হয় নাই। সে তাই থাকিবার জন্য জেদ করিয়াছিল। রাঙাদাকে সঙ্গে লইয়া সেও পরে যাইতে চায়, এই ইচ্ছা জানাইয়াছিল। কিন্তু রাঙাদা এখানে কঠিন। বিমলকে শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইল।

ষ্টেশনে গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বিমল হঠাৎ বলিল,—"সব মিথ্যা কথা। তুমি আর সেখানে যাবে না, রাঙাদা!"

এই আশঙ্কাই বুঝি আর একদিন তাহার ব্যাকুল কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। প্রদ্যোৎ সেদিনকার মতই আজ আবার উত্তর দিল—"না ভাই, সত্যি যাব। এখানকার কাজ চুকলেই যাব।"

কে জানে, বিমল তাহা বিশ্বাস করিল কিনা। কিন্তু বিশ্বাস করিলেই বা ক্ষতি কি! হয়ত সত্যই প্রদ্যোৎ আবার সেখানে ফিরিবে, অতীত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিয়া সুরু করিবে নূতন জীবনের রচনা।

শেষ

পরলোকে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ,

বক-রূপী ছদ্মবেশী ধর্ম্মের 'কিমাশ্চর্য্যম্' প্রশ্ন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠীরের উত্তর 'মৃত্যু'—যা মানুষের নিত্যকারের অভিজ্ঞতা হইলেও সে তা দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বদা স্মরণের মাঝে রাখিতে পারে না—আবহমান কালের এক চিরন্তন সত্য। মানবতার সহস্র চেষ্টা সত্বেও, প্রকৃতির খেয়াল আজও অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে। উত্তর বিহারের ভূমিকম্পের মতই আকস্মিক স্যার প্রভাসের মৃত্যু। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কে জানিত, এমন করিয়া সবল সুস্থকায় প্রভাসচন্দ্র মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িবেন! বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা ২টা পর্য্যন্ত তিনি তাঁর দৈনন্দিন কার্য্য যথারীতি শেষ করিয়া স্নান সমাপনান্তে গাত্র-মার্জ্জনা করিতে করিতে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভৃত্যের অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন। ডাক্তার ডাকিবারও অবকাশ হইল না। কর্ম্মী প্রভাস যেন লম্ফপ্রদানে চলিয়া গেলেন জীবনের পরপারে—ফেলিয়া রাখিয়া এ মর্ত্ত্যের বুকে তাঁর প্রাণহীন দেহ। যুদ্ধক্ষেত্রের রণঝঞ্ঝনার মাঝে বীর সৈনিকের মতই তাঁর মরণ-বরণ। তাঁর কর্ম্মবহুল জীবন-মিশনের পরিসমাপ্তি হয়তো বিধাতার ইচ্ছায় এখানেই হইয়াছিল; না হইলে, এ উচ্ছ্বসিত মর্ত্ত্য প্রাণ-প্রবাহের উপর এমন অসময়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে কেন? তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য্য তো তখনও পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়ে নাই—লক্ষ্যের একটি ধাপ নীচেই তাঁর অগ্রগমন না হইলে রুদ্ধ হইবে কেন! কিসের সান্ত্বনা? কোথায় তাঁর এ চিরাবসানের স্বাভাবিকতা? সৃজনের এ উত্তম রহস্য হয়তো কোনদিনই উদ্ভিন্ন হইবে না, তবে স্যার প্রভাসের মৃত্যুতে রাজা-প্রজা যা হারাইল তা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না—কোনদিনই যায় না। প্রভাস চন্দ্রের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের ও বাঙ্গালীর একমাত্র সান্ত্বনা এই, যে তিনি তাঁর কীর্ত্তি অক্ষুন্ন রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

স্বর্গীয় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র

প্রভাসচন্দ্র ছিলেন হাইকোর্টের জজ, স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র মিত্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। মিত্র পরিবারের প্রতিভা বাংলায় সুবিদিত। হাইকোর্টের উকীল হইয়া তাঁর জীবনারম্ভ হয় এবং আইন-ব্যবসায়েও তিনি বেশ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। শুধু ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করিয়া তাঁর প্রতিভা পর্য্যবসিত হয় নাই, জনহিতকর কর্ম্মের সঙ্গে স্বীয় জীবন মিলাইয়া ধরিতেও তিনি হইয়াছিলেন অগ্রগামী যদিও পরিণত বয়সে। টেক্‌নি-ক্যাল শিক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্যার তারকনাথ পালিত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের' (পরে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনের অঙ্গীভূত হয়) সঙ্গে প্রথম প্রথম তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

বাংলা ব্যবস্থাপক সভার তিনি সভ্য ছিলেন; কিন্তু মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর তিনি হন অন্যতম মন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁর

প্রতিভা ছিল যেমন গভীর তেমনি শাসন-সম্পর্কীয় দক্ষতাও ছিল অসাধারণ। ভারতীয় শাসন-সংস্কার লইয়া তিনি মিঃ কারটিস ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বিশেষ পটুতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাইয়াছিলেন।

তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহযোগী সচিব ছিলেন ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য এবং স্যার সুরেন্দ্র নাথের মৃত্যুর পর সভাপতিও হইয়াছিলেন। বিভিন্ন বিভাগে মন্ত্রিত্ব করিবার সময়ে তিনি নীরবে দেশের অনেক হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বাংলা গভর্ণমেণ্টের ব্যয় বরাদ্দ কমাইতে তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল। তিনি শিক্ষা-সচিব থাকার সময়ে উপেক্ষিত বে-সরকারী শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া বাংলার শিক্ষক-সম্প্রদায়ের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন, যাহা শিক্ষাবিভাগে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অনুন্নত শ্রেণীর ও রায়তদের শুভকামনা তিনি সর্ব্বদাই হৃদয়ে পোষণ করিতেন এবং প্রজাদিগের অবস্থা ও আইন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও ছিল যথেষ্ট। বাংলা ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের পরিচালনাধীন যে সংস্থা (The Society for the Improvement of Backward Classes) আজ বিশ বৎসরাধিক দেশের বিভিন্ন জন-হিতকর কার্য্য করিয়া আসিতেছে, স্যার প্রভাসচন্দ্রকে তাঁর প্রাণ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই সংস্থার অধীন বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রায় ৬০০ স্কুল, সাধারণ গ্রন্থাগার, সেবা-সমিতি, কো-অপারেটিভ-সোসাইটি প্রভৃতি পরিচালিত হইয়া থাকে। রাউলাট এক্ট অনুমোদন করায় তিনি অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এইজন্য তাঁর অনেক সদ্‌গুণ ও হিতকর কার্য্য ঢাকা পড়িয়া যায়। সামাজিক কল্যাণের জন্য তিনি যে কিরূপ আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তা যাঁদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল তাঁরাই বেশ জানেন।

রাজনীতিতে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী (moderate)। স্বর্গীয় পৃথ্বীশ চন্দ্র রায়ের সঙ্গে তিনি একযোগে ন্যাশনাল লিবারল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গভঙ্গ বা কোন কংগ্রেস আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবে যোগদান করেন নাই। স্যার প্রভাসচন্দ্রের সত্য পরিচয় মিলে সরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে। দেশের অর্থসমস্যা ও তথ্যসংগ্রহ ব্যাপারে তাঁর যে পরিচয় ও পূর্ণতা তা অন্যত্র খুব কমই দৃষ্ট হয়। এসব বিষয়ে তিনি এত ভাবিতেন, যে নিমেষে বিনা চিন্তায় নির্ভুলভাবে সব বলিয়া দিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে তাঁর বুকের দরদ কতখানি ছিল তা তাঁর বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য পাট-শুল্ক বাংলাকে দিবার জন্য যে সংগ্রাম তাহা হইতেই বুঝা যায়। রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে হিন্দুদের প্রতি ন্যায়-বিচার ও পাট-শুল্ক বাংলাকে প্রদান করিবার জন্য তিনি সাহসিকতার সঙ্গে যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সুবিদিত এবং এই জন্যই জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া বাংলার হিন্দুর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছিলেন।

স্যার প্রভাস ছিলেন অক্লান্ত কর্ম্মী, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কর্ম্মই করিয়া গিয়াছেন। জীবনের নিজস্ব মৌলিক আদর্শ হইতে কোন দিন তিনি বিচ্যুত হন নাই। স্বপ্নের কল্প-জাল বুনা তাঁর স্বভাব ছিল না—তিনি ছিলেন একান্ত বাস্তব জগতের মানুষ। জীবনের সজীবতা ও উদ্যমশীলতা তাঁর এমনিই ছিল, যে যা ভাবিতেন, যে স্বপ্ন দেখিতেন তার বস্তুতন্ত্র রূপ দিতে তাঁর ছিল না এতটুকুও শ্রমকাতরতা।

স্যার প্রভাসের নিবিড় সংস্পর্শে যাঁরা আসিয়াছেন তাঁরাই অনুভব করিয়াছেন তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্য্য, জ্ঞান-সমৃদ্ধ মনের উজ্জ্বলতা, পরিচয় পাইয়াছেন তাঁর স্নেহশীতল কোমল হিয়ার—এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাঁর দরদী অন্তরের স্পর্শ পাইয়া ফিরিতেন বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া। বৈঠকে-আলাপে তিনি শিশুর মত নিজেকে মুক্ত করিয়া ধরিতেন। স্যার প্রভাসের নশ্বর দেহ আজ আর নাই, শুধু আছে স্মৃতি। শাশ্বত দেহী নিত্য অবিনাশী, শোক করিয়া সে অমর আত্মাকে ধরণীর ধূলায় টানিতে চাহি না। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ওঁ শান্তি!!!

শ্রদ্ধাঞ্জলী

দুনিয়ার উপর যে একটা কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে তা বর্ত্তমান বছরের ফলাফল হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। রোগ-শোক-মৃত্যু-অর্থকষ্ট-অশান্তি-প্রাকৃতিকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিচিত্র জ্ঞাত-অজ্ঞাত কারণে ধরিত্রীর বুক দুঃসহ ব্যথার ভারে প্রপীড়িত। দু'মিনিটের দৈব দুর্ব্বিপাকে নিঃসহায় জাগতিক জীব পোকার মত পিষিয়া অনিচ্ছায় অজানায় মরণালিঙ্গন করিল। সে বেদনার আঁখি-নীর নিঃশেষ হইতে না হইতে ভারতের নানা ক্ষেত্রে প্রিয়-হারার করুণ সুর আবার ভারতের চিত্তে শিহরণ তুলিল। মাদ্রাজের খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতা রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার, উৎকলের বরেণ্য দেশসেবক মধুসূদন দাস এবং বাংলার প্রবীণ পুরুষ শিবানন্দজী ও স্যার প্রভাসের অবসানে নিরাশার আঁধার আরও ঘনাইল। জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণী—এবার প্রত্যেকটি পরিবার, সমষ্টি বা ব্যষ্টি জীব কোন না কোন রকমে উদ্বেজিত হইবে, যেন অক্ষরে অক্ষরে ফলিতে চলিয়াছে। দিনের পর দিন এমনি আত্মীয় অনাত্মীয়ের নির্ম্মম মরণবার্ত্তা অবকাশহীন মনের আকাশে আশঙ্কার ছায়াপাত করিতেছে। সকল প্রিয়-বিরহীর ব্যথার অশ্রুর সঙ্গে আমাদের সশ্রদ্ধ সমবেদনা জানাইয়া কয়েক জনের মাত্র জীবন-স্মৃতির এখানে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া, পরলোকগত আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করিতেছি।

৺যোগেশচন্দ্র ঘোষ

জলপাইগুড়ীর কর্ম্মবীর যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিগত মাঘী পূর্ণিমার দিন পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার—বিশেষতঃ জলপাইগুড়ীর গুরুতর ক্ষতি হইল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর জলপাইগুড়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ সেখানকার প্রসিদ্ধ চা-ব্যবসায়ী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইংরেজ ব্যবসায়িগণের একচেটিয়া এই ব্যবসায়ে বাঙ্গালী প্রথম হস্তক্ষেপ করিল, তখন যাঁহারা এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, গোপালচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যোগেশচন্দ্রও এ বিষয়ে পিতার পদাঙ্কানুসরণ করেন—প্রথম জীবনে কিছুকাল ওকালতি করিবার পর তিনিও চা ব্যবসায়ে ব্রতী হন। চা শিল্পে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙ্গালী ক্রমশঃ কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু যোগেশচন্দ্র প্রতিভাবলে ও নিজের চেষ্টায় ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করিয়া বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বুদ্ধির

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র

পরিচয় দান করেন। জলপাইগুড়িতে ভারতীয় "চা-ব্যবসায়ী সমিতির" (Indian Tea Planter's Association) প্রতিষ্ঠাও মুখ্যতঃ তাঁহারই চেষ্টার ফল। এই সমিতির স্থাপনকাল হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি উহার Vice-president ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এই সভার প্রতিনিধি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অটোয়ার Imperial Economic Conference-এ নিমন্ত্রিত হন। তিনি Indian Tea Association-এর ভারতীয় প্রতিনিধি স্বরূপ Indian Tea Cess Committee-র সভ্য ছিলেন। চা-

ব্যবসায়ের যথার্থ উন্নতিসাধন করিতে হইলে ভারতের অন্যান্য বণিক্ সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ রাখা যে অত্যাবশ্যক তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং চা-ব্যবসায়িগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম Indian Merchants Chambers of Commerce and Industry'র Committee'র সদস্য মনোনীত হন। চা-ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থায়ী-কীর্ত্তি-স্থাপনই যোগেশচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি। যাহারা ইংরাজের ব্যবসায়-বুদ্ধির সহিত পরিচিত তাঁহারাই বুঝিবেন, কত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যোগেশচন্দ্র বাঙ্গালীর জন্য এই সম্মানের আসন রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সততা ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা ইংরেজ ব্যবসায়িগণেরও হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার কর্ম্মপ্রতিভার অন্য দিক্‌ও আছে। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র জলপাইগুড়ির অধিবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিন বৎসরকাল তিনি Jalpaiguri Municipality'র Vice-chairman ছিলেন এবং বহুকাল যাবৎ District Board-এর সভ্য ছিলেন। স্থানীয় নব-প্রতিষ্ঠিত Jackson Medical School and Charitable Dispensary'র ও তিনি সদস্য ছিলেন।

বাংলার এক সুদূর উত্তর প্রান্ত যোগেশ চন্দ্রের জন্ম ও কর্ম্মভূমি হইলেও তাঁর নীরব নিঃসঙ্কোচ দানে বাংলা ও বাঙ্গালীর জানা ও অজানা বহু সৎপ্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। পল্লীর মঙ্গলেই যে দেশ ও জাতির সত্য কল্যাণ তা তিনি একান্তভাবে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া, খাদি-শিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তন, হরিসভাগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতির জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। স্বগ্রামে তিনি ছেলেদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দরিদ্রের চিকিৎসার জন্য তিনি একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। হরিসভা প্রভৃতি ধর্ম্মান্দোলনের মধ্য দিয়া মৃতপ্রায় পল্লীপ্রাণের পুনর্জাগরণের জন্য তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। নানাভাবে স্বদেশ-সেবা করিয়া ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। যোগেশ চন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ সত্যই একজন সুসন্তানকে হারাইল। মাঘী পূর্ণিমার দিন তাঁহার মন্ত্রদীক্ষা হয়, মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতেই তাঁর মর্ত্ত্যদেহের চিরাবসান হয়।

৺রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার

মান্দ্রাজের 'হিন্দুপত্রে'র খ্যাতনামা সম্পাদক ও কংগ্রেস-নেতা এ রঙ্গস্বামী আয়ঙ্গার বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১-৪৫ মিনিটের সময়ে ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৯০৬ সালে ইনি প্রথম হিন্দু পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্যারম্ভ করেন এবং ১৯১৫ সালে বিখ্যাত তামিল দৈনিক 'স্বদেশ মিত্রমের' সম্পাদক হন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইনি মণ্ট-ফোর্ড কমিটীতে সাক্ষ্য দিতে বিলাত গিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন ও স্বরাজ্য দলের সেক্রেটারী হন। তিনি ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৩১ ও ৩৩ সালে তিনি রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দেন। অর্থনৈতিক বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। এ রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গারের মৃত্যুতে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্র ও সংবাদপত্র জগৎ হইতে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর অবসান হইল। বিশেষ করিয়া মান্দ্রাজের এই শূন্যস্থান সহসা পূর্ণ হইবার নয়।

৺মধুসূদন দাস

উৎকলের প্রবীণ নেতা, সর্ব্বজনপ্রিয় স্বদেশসেবক মধুসূদন দাস পরিণত বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স ছিল আশী বৎসর। সুদীর্ঘ জীবনের দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া তিনি একনিষ্ঠভাবে দেশ-সেবায় রত ছিলেন। উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সঙ্গেই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলা যায়। তিনি বিহার-উড়িষ্যার কাউন্সিলের সদস্য ও মন্ত্রী রূপে যে সকল দেশ-হিতকর কার্য্য করেন, তাহা সর্ব্বোতোভাবে প্রশংসনীয়।

উড়িষ্যার সঙ্গে তাঁর জীবন-স্মৃতি চিরজাগরূক থাকিবে। ধর্ম্মে খৃষ্টান হইলেও কেমন করিয়া নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িকভাবে দেশের সেবা করা যায়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ দাস মহাশয়ের জীবনে মিলে।

৺বিজয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাণিহাটী তারানাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক ৺বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহোদয়ের আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুতে এতটুকুও সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান্। মৃত্যুর সময়ে মাত্র কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। একেবারে অপ্রত্যাশিত অবসান। ১০ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়ে নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক সমিতির কার্য্যালয় হইতে কার্য্য শেষ করিয়া বেলগাছি যাইবার পথে শ্যামবাজারে ট্রাম ডিপোর নিকটে ট্রাম-দুর্ঘটনায় তিনি বামপদে গুরুতর আঘাত পান। মেডিকেল কলেজে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়; কিন্তু মানুষের শতচেষ্টা নিষ্ফল করিয়া মরণই বিজয়ী হইল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ট্রাম-কন্ডাক্টারের কোন দোষ নাই বলিয়া এক বিবৃতি দেন এবং উহাতে তার চরিত্রের মহত্ত্বই সূচিত হয়। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও ২৪ পরগণা শিক্ষক-সমিতির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বিজয়কৃষ্ণের মৃত্যুতে বাংলার শিক্ষক-জগৎ বিশেষ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও সহকর্ম্মী বন্ধুবান্ধবদিগকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

৺এককড়ি সিংহ রায়

বাণীবনের প্রাণ, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় এককড়ি সিংহ রায় আর রক্ত মাংসের শরীরে এ মর্ত্ত্য-ভবনে নাই—মনে করিতেও মর্ম্মন্তুদ বিরহ-বেদনায় হিয়া হাহাকার করিয়া উঠে। তিনি আজ জীবনের পরপারে —মন বিশ্বাসই করিতে চায় না; কিন্তু তবুও এ যে নির্ম্মম, অতি নির্ম্মম, কঠোর সত্য। অপ্রত্যাশিত সে মরণ-বার্ত্তা কি ভীষণ মর্ম্মান্তিক! তিনি ছিলেন রক্তের সম্পর্কহীন আমাদের আত্মীয়, অতি নিকট আত্মীয়। যে প্রাণের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে ছিল আমাদের যোগ, তা অতি গভীর, বড় নিবিড়—যেখানে ধরণীর ধূলি-মলিন স্বার্থ-কলুষিত মানুষের পদচিহ্ন কালিমা লেপন করিতে পারে না—যে মিলনে নশ্বর দেহের অবসানেও ব্যবধান সৃজন হয় না। তাঁর সঙ্গে আমাদের নিঃসম্পর্ক নিঃস্বার্থ যুক্তির আভাস বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁর সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী সুরমা দাসের স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ-বাসরের স্মৃতি-তর্পণে; "ব্রাহ্মসমাজ তো ধর্ম্ম চায় নি, চেয়েছে ধন। তিনি দুঃখ করে বল্‌তেন,—গরীব ব্রাহ্ম অনেকেই ধনী হয়েছে, কিন্তু ধার্ম্মিক হয়েছে কয় জন? বল্‌তেন 'ত্যাগই ধর্ম্মের মূল'—যে সমাজ ভোগবিলাসী—তার ধর্ম্ম হবে কি করে'? সেজন্যই যেখানে লোকের ত্যাগ দেখ্‌তেন সেখানে আনন্দের সঙ্গে ছুটে যেতেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিলাসহীন অনাড়ম্বর জীবন তাঁকে ঐ আশ্রমের দিকে আকর্ষণ করেছিল।" শ্রদ্ধেয় সিংহ রায় মহাশয় মোটা খদ্দরের সাদাসিদে পোষাক পরিচ্ছদ নিজেও ব্যবহার করিতেন এবং আত্মীয়-পর সকলকেই আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন। বাণীবনের ব্রাহ্মসমাজ, স্কুল-রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি যা কিছু উন্নতিকর প্রতিষ্ঠান সবই তাঁর জীবন-স্মৃতির সঙ্গে একান্তভাবে বিজড়িত। তিনি বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের সুখ-দুঃখের প্রতি সহৃদয় দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁর মৃত্যুতে সত্যই আজ বাণীবনের দুঃস্থ-দুঃখী সহায়হীন হইল।

১২৭১ সালের ৩০শে শ্রাবণ হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কৈশোরেই ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর উপদেশে প্রভাবান্বিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিয়া হাওড়া জেলাস্থিত বাণীবনের নির্জ্জন অনুকূল আব্‌হাওয়ার মাঝে তাঁর আদর্শানুযায়ী জীবন যাপন সুরু করেন। দীর্ঘ ৫৬ বৎসর-ব্যাপী কর্ম্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি হইল তাঁরই স্ব-সৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হইয়াছিল ৬৯ বৎসর।

জীবনের শেষ সায়াহ্নে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায়ের উপস্থিতি কামনা করেন। তাঁর হৃদয়ের এ অকৃত্রিম চাওয়াও অপূর্ণ থাকিয়া যায় নাই।

শ্রদ্ধেয় এককড়ি সিংহ রায় মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের ব্যথার অশ্রুর সঙ্গে আমাদেরও বিহ্বল অশ্রু মিশাইয়া তাঁর পরলোকগত অমর আত্মার চিরকল্যাণ কামনা করি।

৺মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ

ভট্টপল্লীর অন্যতম গৌরব-রবি, হৃদয় ও পাণ্ডিত্যের শতদল কমল মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহোদয় ও বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়া চিরবিদায় লইয়াছেন। পণ্ডিত-বরের পবিত্র স্মৃতি আমাদের সঙ্ঘ-জীবনেও একটী মধুময় অমর রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। ১৩৩৭ সালে সঙ্ঘ-জননী রাধারাণী দেবীর দ্বিতীয় সাম্বাৎসরিক তিরো-ভাবোৎসবে তিনি তাঁহার সরস মধুর হৃদয়খানি লইয়া সঙ্ঘের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে যে ২য় বার্ষিক হিন্দু সম্মেলন হয়, তাহার তিনিই ছিলেন যোগ্য সভাপতি। সেই সময়েই তাঁহার আন্তরিকতা, সরলতা, চরিত্রের উদার বিমল মাধুর্য্যে তিনি আমাদিগকে শুধু মুগ্ধ করেন নাই, তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের নিগড়ে আমাদের চিরতরে বাঁধিয়া গিয়াছেন। এই নিরহঙ্কার সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-গৌরবের জাগ্রত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার সেই হাসি-ভরা সদানন্দ মুখচ্ছবি আমরা কোন দিন ভুলিতে পারিব না।

ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণসমাজ এই অন্যতম গৌরব-মণি হারাইয়া আজ শোক-সন্তপ্ত—শুধু ভট্টপল্লী নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি একজন হৃদয়বান্ সুপণ্ডিত খাঁটি মানুষ হারাইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ

পতিত

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

পতিত মানব তরে কেহ কি করুণা করে'
দিবে নাকো একবিন্দু হৃদয়ের প্রীতি,
দীন দুঃখী হাহাকারে ভিজিয়া নয়ন-ধারে,
নিত্য কি গাহিয়া যাবে বেদনার গীতি?

কারো কর্ণে পশিবে না, কারো প্রাণে বাজিবে না,
আর কারো নেত্রে কি গো বহিবে না জল?
চিরকাল একই ভাবে সে কি গো কাঁদিয়া যা'বে
মর্ম্মছেঁড়া হাহাকার, চির অচঞ্চল?

মর্ম্মছেঁড়া হাহাকার রুদ্ধ ব্যথা অশ্রুধার,
যুগযুগ ব্যর্থ হবে, ব্যর্থ অনিবার?
পরাণে প্রীতির সিন্ধু নিয়ে কি মানব-বন্ধু
আসিবে না কোনদিন মরতের দ্বার?

পাপী, তাপী, দুঃখী, দীন, রিক্ত-নিঃস্ব শক্তিহীন,
তারা কি মানুষ নয় সৃষ্টি বিধাতার?
তা'দের পরাণে ভাই, কোন কি বাসনা নাই,
তা'দের হৃদয় কি গো লৌহকারাগার?

তোমার আমার মত, তা'রা কি জানে না অত,
তা'রা কি পায়না ব্যথা মোদের মতন?
তা'দেরো যে প্রাণ আছে, একথা ভুলোনা পাছে,
তা'দেরো পরাণে রাজে পরাণ-রতন।

মুকুতা-মাণিক নিধি, না হয় না দিল বিধি
তা'বলে তা'রাও সৃষ্টি একই বিধাতার;
একই শোণিতধার বহিতেছে অনিবার,
একই প্রবাহে মিশে প্রবাহে সবার।

"উপনিষৎ-সমূহের প্রতিপাদ্য"

স্বামী মহাদেবনান্দ গিরি

১৩৪০ সালের পৌষমাসের প্রবর্ত্তকের ৭৭৮ পৃষ্ঠায় শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি, এ, মহাশয় লিখিত "উপনিষৎ-সমূহের প্রতিপাদ্য" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া লিখক "ধান ভানিতে শিবের গীত" গাহিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। শ্রীমান্ ভবানীপ্রসাদ কেবল তত্ত্বালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে কোন কথা ছিল না; কেননা, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ পূর্ব্বাপরই চলিয়া আসিয়াছে ও চাক্কির ন্যায় চলিতেই রহিবে। সূক্ষ্ম অদ্বৈত তত্ত্ব বিষয়ে অধিকারিত্ব বহুজন্মের সুকৃত বশেই লাভ ঘটে। গীতাতে ভগবান্ কৃষ্ণ, "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে", "অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ ততো যাতি পরাং গতিম্"—বাক্য দ্বারা উহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভবানীবাবু ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের মন্ত্রের ব্যাখ্যান দিতে গিয়া তাঁহার pet theory প্রিয়তম নিজস্ব মতবাদ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মালদহ চাকুরী করার অভিজ্ঞতাকে স্বয়ং পেন্সন পাইয়াও পেন্সন দিতে পারেন নাই। তিনি এই প্রবন্ধে ছান্দোগ্য-মুণ্ডকাদি উপনিষৎ হইতে ভূরি ভূরি মন্ত্র আপন মতবাদ স্থাপনার্থ উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বিরাট্ বৈশ্বানর বলিতে ঋষিগণ কি বুঝিতেন তাহা ছান্দোগ্য ও মুণ্ডকে সবিশেষ বর্ণিত থাকিলেও, তাহা তাঁহার দৃষ্টিপথে আইসে নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে "তস্যহবা' এতস্য আত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজা..........পৃথিব্যেবপাদাঃ" এবং মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের চতুর্থ মন্ত্রে "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ ... পদ্ভ্যাং পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়। "সুতেজা" অর্থ দিব বা দ্যুলোক। দ্যুলোকস্থ আত্মাকেই মুণ্ডক লক্ষ্য করিয়াছে অথচ লিখক ব্যাখ্যান দিলেন "এই পুরুষ-মূর্ত্তির মস্তক ছিল মালদহ জেলা জুড়িয়া, দক্ষিণ হস্ত ছিল বর্ত্তমান কালের নর্ম্মদা নদীর পার দিয়া বিস্তৃত, বাম হস্ত বাঁকান অবস্থায় মুখের নিকট বংশী বা শূল ধারণ করিয়া অবস্থিত ছিল, বাম পদ গোদাবরী হইয়া কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দক্ষিণ পদ বাঁকান এবং বাম পদের উপরে বিস্তৃত ছিল"। দ্যৌ-মস্তক-চন্দ্রসূর্য্য-চক্ষু পৃথিবী-পাদ সহস্রশীর্ষই পুরুষের মস্তক মালদহ লিখা সকলের পক্ষে শোভনীয় না হইলেও, কাহারও কাহারও পক্ষে শোভা পায় বটে। ঋষিগণ যখন ঋগ্বেদের মন্ত্র দর্শন করেন তখন আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে পৃথক ছিল, মধ্যে সমুদ্র থাকা "জিওলজি"-বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন। তখন বিরাটের বাম পদ গোদাবরী-তীরে থাকা ঋষিগণের জ্ঞাত হইবার সুযোগ ছিল কিনা, তাহাতে অনেকেই সন্দিহান। ভারত-বর্ষস্থ সিন্ধু, সরস্বতী, সরযূর বর্ণনা ঋগ্বেদে আছে। মালদহের বর্ণনা কোন বেদে বা উপনিষদে আছে বলিয়া মনে হয় না। যে বঙ্গদেশে মালদহ, সেই বঙ্গদেশই ঋগ্বেদাদির সময়ে সমুদ্রগর্ভে ছিল, এমন সুবিজ্ঞগণ বলেন। বঙ্গদেশের নাম "বাঙ্গালা" হওয়া সরস্বতী-দৃষদ্বতী দেবনদী-দ্বয়ের

মধ্যস্থ ভূভাগের "বাঙ্গর" নাম হইতে সমুদ্ভব হওয়া খুবই সম্ভবপর। রোহতক, আম্বালা ও কর্ণাল জিলা-ত্রয়ের দেশজ নাম 'বাঙ্গর", ইহা এই সব প্রদেশে সর্ব্বজন-বিদিত। যেমন উত্তর কুরু দক্ষিণ-কুরু, উত্তর-পাঞ্চাল দক্ষিণ-পাঞ্চাল, উত্তর-কোশল দক্ষিণ কোশল, উত্তর-মদ্র দক্ষিণ-মদ্রাদি নাম উপনিবেশ স্থাপনকারিগণ দিয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশকে মনুসংহিতায় "এবো দেব-নির্ম্মিতো দেশ" বলা হইয়াছে। তাহা পশ্চিম বাঙ্গর ও পূর্ব্ব বাঙ্গর নাম পাইয়া পশ্চাৎ "রলয়োরভেদে" বাঙ্গল বা বাঙ্গালা হইয়াছে। শব্দ-শাস্ত্র চর্চ্চা করিলেও, বঙ্গভাষাতে যত সংস্কৃতসহ মিলঝিল আছে, অন্য কোন প্রাকৃত ভাষাতে তত পরিদৃষ্ট হয় না; ব্রজবুলি ও বঙ্গভাষা তাহার সাক্ষাৎ দেয়। ছান্দোগ্যের যে মন্ত্র উল্লেখ করিয়া লেখক "শ্যাম" সাজাইতে গিয়াছেন, সেই মন্ত্র এই "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শাবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"। এই মন্ত্রের অর্থ—হার্দ্দ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছি ও ব্রহ্ম-লোক হইতে হার্দ্দ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতেছি। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ গতাগতি হইতেছে। তাই ঐ মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশে ঋষি অশ্ব যেমন চর্ম্ম ঝাঁকরাইয়া লোম হইতে ধূলি, জলকণাদি বিদূরিত করে, তদ্বৎ আমরা যেন পুণ্য কার্য্যাদির নিমিত্ত পুনরাবৃত্তিরূপ দুঃখ বিদূরিত করিয়া নিত্য ব্রহ্মলোকে চিরতরে গমন করিতে পারি, এই প্রার্থনা রাখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের অন্যত্রও অনেক গোলযোগ-পূর্ণ কথা আছে, তাহা পশ্চাৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"ঘর-ছাড়াদের দল"

শ্রীদিগেন্দ্র কৃষ্ণ দেব

পথের-সাথী-বন্ধুরা মোর বেরিয়ে এস ঘর্ছেড়ে
ওই খানেতে নয়ক তোদের স্থান!
ডাক দিয়েছে তোদের আজি উতল্-হাওয়া বন্ থেকে
শুন্তে তোরা পাস্ না কি তার গান?
তোরা যে রে ছন্নছাড়া—
সকল বাধা-বন্ধ-হারা,
তোদের তরে নয়ত গৃহ,—নয় সে তোদের স্থান।
কেউত সেথায় তোদের লাগি' গায়না বিষাদ গান!

সুখের তরে' সৃজন তোরা নয়ত ওরে কভু
তোদের তরে' নেইক ভালবাসা।
ঘর-ছেড়ে সব বেরিয়ে এলে ডাক্‌বে তোদের পিছু
এমন-ও ত নেইক তোদের আশা!
তাই বলি সব বেরিয়ে এসে—
চল্ ছুটে আজ মরুর দেশে;
সেথায় গিয়ে বাধ্‌তে হবে নতুন করে বাসা।
নেইবা হেথায় রইলো তোদের একটু ভালবাসা।

আছল্-গায়ে বেরিয়ে এসে এক সুরে বল্ ভাই
নতুন করে কর্‌বো জগৎ সৃষ্টি।
হিংসা—অনল—গরল দিয়ে, অমঙ্গলের গানে
আন্‌বো দেশে আমরা সুধা-বৃষ্টি
শনির-শাপ আর, শিবার-কাঁদন—
খুল্‌বে মোদের মনের বাঁধন;
রক্ত-চিতার হাস্য মোদের,—উল্কা চোখের দৃষ্টি।
আমরা এবার অমঙ্গলের করবো জগৎ সৃষ্টি!

দেখ্‌বি তখন বিশ্ব-ভুবন অবাক হয়ে গিয়ে
দেখ্‌বে চেয়ে তোদের ওগো চারপাশে।
ঝড়-দানবের মতন বেশে তাই বলি আজ বেরিয়ে এসে
জ্বালার জগৎ সৃষ্টি রে কর উল্লাসে।
দরাজ বুকে বাজিয়ে বিষাণ
অমঙ্গলের উড়িয়ে নিশান
নাঙ্গা-পায়ে চল্ ছুটে চল্,—এক হয়ে হাস্ উল্লাসে।
যেমন ওরে শারদ প্রাতে শিশির হাসে দুব্-ঘাসে!

বর্ষ-শেষে তুনিয়ার আবহাওয়া—

ইংরাজী বছর শেষ হইয়াছে, বাংলা সালেরও গোণা কয়টা দিন কালের গর্ভে ডুবিতে চলিয়াছে। মানুষের চলার গতি রুদ্ধ হয় নাই—ভাবী কালেও হইবে না। গতিই যে সৃষ্টির জীবন! বিশ্বের বুকে এই চলার যে আজিকার রূপ ও ভঙ্গী, তা মানবতাকে পরম প্রেয় ও শ্রেয়ঃ দিতে পারে নাই। চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে আজও সে পথহারা—তাই তার সকল প্রচেষ্টা, বিপুল উদ্যম তুনিয়া-ব্যাপী একটা বিকট হাহাকারই তুলিয়াছে।

বিশ্বের সমস্যা অর্থ বা রাষ্ট্রের নয়। সত্য সমস্যা অজ্ঞানের, অহং'য়ের। আপনার অন্তরের চারিদিকে ছিদ্রহীন সভ্যতার দেউল উঠাইয়া ব্যষ্টি, সমষ্টি বা জাতি চাহিতেছে প্রসারতা। বিশ্ব-সভ্যতা অতি সূক্ষ্মভাবে লীলায়ত হইতে চলিয়াছে তুইটী ধারায়। এক রক্তের ব্যাপকতায় সাম্রাজ্য-গঠন, যেমন সে যুগের ভারতের ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতা বা আজিকার মধ্য ইউরোপের টিউটনিক আর্য্য, যার প্রতীক জার্ম্মাণীর হিটলার। আর এক, বিশিষ্ট সভ্যতা ও শিক্ষার দ্বারা বিশ্ব-মনো-বিজয়ের উৎকট আকাঙ্ক্ষা, যা স্পষ্ট রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে ইংলণ্ডবাসীর মধ্যে। এ তুইয়ের সংঘর্ষ ফল্গুর মত বর্ত্তমান ধরণীর সকল জাগ্রত আন্দোলন-চঞ্চলতার তলে তলে প্রবাহিত। কোন্ পথে মানবতা পাইবে অখণ্ড শান্তি, অবিমিশ্র কল্যাণ, কোন্ ভাবীকালে কোন্ বিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির অনাবিল ক্রমবিকাশ, নিখিল মনুষ্য-হৃদয়ের অবাধ প্রেম-ঐক্য লইবে রূপ, তা এখনও অজানার মধ্যেই নিহিত। মনের তুয়ার বন্ধ করিয়া সে নিজেই রুদ্ধ করিয়াছে এ মুক্তির পথ।

তুনিয়ার বর্ত্তমান প্রগতির উপরিভাগ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আজ তুটো প্রশ্ন সব-চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিণের রুজভেল্ট-বাদ—যা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করিয়া ধনের একচেটিয়া শক্তিতে চাহিতেছে বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে। 'শান্তি অথবা যুদ্ধ' আজ ইউরোপের নিত্য আলোচ্য বিষয়। সংবাদপত্র প্রতিদিন বড় বড় অক্ষরে এই আতঙ্কের কথা বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে দিতেছে জানাইয়া। পূর্ব্বের জাপান চাহিতেছে চীনের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথিবীর বুকে আপনাকে ছড়াইয়া দিতে। শিল্প-বাণিজ্যের যাতুর দ্বারা সে করিয়াছে বিশ্বজনকে বিস্মিত, বিমূঢ়।

প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক—এ প্রলয়-নাচন সুরু হইবে কোন্ গগনে? একই সঙ্গে সাধারণ মনের কোণে উঁকি মারিয়া উঠে হিটলার ও জাপানীর কথা। কিন্তু নিবিড় আন্ত-র্জাতিক অন্তরবিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে, সকল জাতির চিত্তই এই অনম্র দাম্ভিকতায় মোহাচ্ছন্ন, যদিও তার অনেকখানি অসঙ্কোচ আড়ম্বর দৃষ্ট হয় জার্ম্মানী ও জাপানের বেলায়।

স্বেচ্ছায় সমরে নামিবার মত ঘর বোধ হয় কারও গুছান নয়। বর্ত্তমানের আন্তর্জাতিক শক্তির সমতা ও সম্বন্ধের অসরলতা এমনি যে, বাহিরের শত দাম্ভিকতা আস্ফালন সত্বেও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে যুদ্ধ করিবার মত মনোবৃত্তি কোন জাতিরই নাই। সমস্বার্থ পারস্পারিক জাতির মিলন সম্ভব করে; কিন্তু বর্ত্তমানে জাতিতে-জাতিতে স্বার্থ-বৈষম্য এত বিচিত্র যে, এ মিলন খুব সহজসাধ্য নয়। তবে যুদ্ধ যদি একান্তই বাধে, তা হইবে নেহাৎ হঠকারিতা।

ভাবী মহাসমরের রূপ হইবে ভীষণতর, যদি জার্ম্মানী ও জাপান হয় এক সঙ্গে। রুশিয়ার সমস্বার্থ লইয়া এই তুই জাতির এক হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। রুশিয়ার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপই যেন হিট্‌লারিজম্। কমিউনিজমের প্রতি ঘৃণা ও উহার উচ্ছেদসাধনে হিটলারের জার্ম্মাণীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গোপন নয়। জার্ম্মানীর বৈদেশিক নীতির মধ্যে ইহা অন্যতম। রুশিয়ার এই শূদ্র জাগরণের বিরুদ্ধে বিগত মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মাণীর নীতি যে কেমন

করিয়া ক্রমে ক্রমে হিট্‌লারিজমে ক্রমবিকাশ ও ক্রম-পরিণতি লাভ করিয়াছে, তা তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞের নিকট অবিদিত নয়। অতএব, জাপান যদি পূর্ব্ব হইতে রুশিয়া আক্রমণ করে, তবে পশ্চিম হইতে জার্ম্মাণীর

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

আক্রমণও অসম্ভব নয়। জাপানের আত্মবিস্তারের পথে রুশিয়া প্রধান বাধা। রুশিয়া ও জাপানের বর্ত্তমান মনোভাবও ইহার অনুকূল: এ ক্ষেত্রে রুশিয়া ও ফ্রান্সের একত্র হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক; কারণ জার্ম্মাণী উভয়েরই সাধারণ শত্রু। সে অবস্থায় গ্রেটব্রিটেন যে কি করিবে, তা আগে হইতে বলা সুকঠিন। গ্রেটব্রিটেন যত নিরপেক্ষভাবই দেখাক না কেন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ, কমিউনিষ্টিক রুশিয়ার সঙ্গে যোগ দিবার চেয়ে বরং জাপানের মিতালি বরণ করিয়া লইবে. কমিউনিজমের জন্মের পর থেকে রুশিয়ার প্রতি ইংলণ্ডের মনোভাব যে একান্তই অপ্রিয়, তা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তবে জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের মধ্যেও কোন সত্য বিরোধিতা নাই—একথা হিটলারী নীতিতেও বরাবরই সুস্পষ্ট। সর্ব্বদাই সমুদ্রের উপর প্রতিপত্তি লইয়া ইংলণ্ডের অন্য জাতির সঙ্গে বিরোধ বাধিয়াছে। বর্ত্তমান জার্ম্মাণী সাগরপারে সাম্রাজ্য বিস্তারের রঙীন স্বপ্ন দেখে না। কাইজারের এই দুরাকাঙ্ক্ষা জার্ম্মাণীর সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। বিমান ও স্থল-শক্তিতেই সে চায় বলীয়ান্ হইতে—সে চায়, ইউরোপখণ্ডের মাঝেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে। তাই তার বিরাট্ ক্ষুধা গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে পোল্যাণ্ড সমেত বাল্‌টিক হইতে আকরেইন পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও মধ্য ইউরোপে তার আশে-পাশের জমিটুকুকে। কারণ সে বুঝিয়াছে, খাঁটি ইউরোপীয় সভ্যতার সুষ্ঠু মূর্ত্তি গঠন করিয়া তুলিবার জন্য সেখানকার জল-বায়ু-মাটি-মানুষের রক্তধারা উপযুক্ত। প্রতিবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষ তাই জার্ম্মাণীর অনিবার্য্য। মধ্য ইউরোপে ফ্রান্সের বন্ধুর সংখ্যাও সেই জন্য স্বাভাবিকই বেশী। তা'ছাড়া ফ্রান্সের সমর-সজ্জাও নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। জার্ম্মাণীর আশঙ্কায় ফ্রান্স ও রুশিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বেকার মিতালি-বন্ধন আবার দৃঢ় করিবার আয়োজন চলিয়াছে। জার্ম্মাণীর সঙ্গে বৃটেনের বিশেষ কোন স্বার্থ লইয়া বিরোধ না থাকিলেও, ইংলণ্ড মধ্যস্থতা না করিয়া পারে না; কারণ সমর-ঋণের দেনা-পাওনা তো আছেই, তাছাড়াও তার বহু টাকা মূলধন এই ইউরোপীয় জাতির মধ্যেই আছে ছড়ান।

সিনর মুসোলিনি

পোলাণ্ডও নিরস্ত থাকিতে পারে না। আকরেইনের স্বপ্ন তাকে সর্ব্বদাই উদ্ব্যস্ত করে। নাজী, পোলাণ্ডের এ স্বপ্ন সফলতায় সাহায্য করিতে চায় কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ফিরাইয়া চায় ডানজিগ ও করিডর। পোলস্‌রা অবশ্য সহজে এ আগুনে ঝাঁপ দিবে না। বৈদেশিক কারও সাহায্য ব্যতিরেকে আকরেইন উদ্ধারের সুযোগান্বেষণে সে এখনও আছে। রুশিয়া ও জার্ম্মাণী উভয়কেই পোলাণ্ড শুধু সন্দেহ নয়, ঘৃণার চোখে দেখে। মারশ্যাল পিল-

সুডস্কির স্মৃতির মাঝে রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর জেলের তিক্ত অভিজ্ঞতা আজও জাগ্রত। বরং স্বার্থ-সম্পর্কহীন জাপানের প্রতি তারা অনেকটা আশা পোষণ করিতে পারে। ফ্রান্সের সম্পর্ক ছিন্ন করাও পোলাণ্ডের পক্ষে বিপজ্জনক। তবে যদি জার্ম্মাণী-জাপান একযোগে কোনদিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, হয়তো পোলাণ্ড আকরেইনের মায়ায় সে দলে ভিড়িয়াও যাইতে পারে।

অষ্ট্রিয়ার ভাগ্যও শিকায় ঝুলার মত—একদিকে নাজী, অন্যদিকে ফ্যাসিজম্। মধ্য যুগের ক্রিশ্চিয়ান প্রভাবও আবার অষ্ট্রিয়াকে ভর করিয়া মাথা তুলিবার আয়োজন করিতেছে। অষ্ট্রীয়া এখন পরিষ্কাররূপে ত্রিধা বিভক্ত—তিনজন অষ্ট্রীয়ানের মধ্যে একজন সোস্যালিষ্ট, একজন নাজী ও তৃতীয় জন ডলফাসের মতে 'ডিটো' দিয়া চলে। যদি এই দল-সমতা থাকে তবে অষ্ট্রীয়া হইতে কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। মধ্য ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ নিজ নিজ স্বার্থের জন্যই ইউরোপের রাষ্ট্রভার-কেন্দ্র এই অষ্ট্রীয়ার রাজনীতিতে কোন বৈষম্য-সৃষ্টি হইতে দিবে না। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বেকার জার্ম্মাণ-অষ্ট্রীয়ার সম্বন্ধ ফিরাইয়া আনিতে এক দিকে জার্ম্মাণী যেমন প্রাণপণ করিতেছে তেমনি তাহা না হইতে দিবার জন্য ফ্রান্সও মরিয়া হইয়া লাগিয়াছে। ডলফাস-দলকে লইয়া যা একটু সন্দেহ। এ দলের বিশিষ্ট কোন আদর্শ না থাকায়, তার বর্ত্তমান নাজী-বিরুদ্ধতারও স্থায়িত্ব দেওয়া যায় না। তবে অষ্ট্রীয়াকে আত্মস্থ করার নাজী-প্রচেষ্টা যদি সাফল্য লাভ করে, তবে সারা ইউরোপে সেদিন সমরানল জ্বলিয়া উঠিবেই উঠিবে। ইতালীও নিজের শক্তি-বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে এবং বৃটেনের মত মধ্যস্থতা করিবার পক্ষপাতী। ইতালী ও বৃটেনের যে মনোভাব তাতে মনে হয় না, তারা জার্ম্মাণীকে অস্ত্রহীন করিবার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে সোজাসুজি যোগ দিবে।

ইউরোপখণ্ডের যে আজিকার অশান্তি তার গেড়ায় আছে ভার্সাই সন্ধিতে বড় বড় শক্তি-সমূহের তখনকার সমরপীড়িত হতবীর্য্য রাষ্ট্রনিচয়ের প্রতি অসামঞ্জস্য ও অবিচার, যা বর্ত্তমানে ধূমিয়া ধূমিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বড়দের স্বার্থের দায়ে ছোটদের মাঝে তখন যে ওলট-পালট আনীত হইয়াছিল, প্রকৃতি তাহা সামঞ্জস্য করিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত ইউরোপের এ আতঙ্কের কলরব থামিবে না। তাই মনে হয় পশ্চিমের এই চঞ্চলতা অদূর ভবিষ্যতে সত্যি সত্যি অগ্নি-গোলক না ফাটাইয়া প্রবঞ্চিত জাতিসমূহকে আত্মস্থ ও সমরসজ্জায় সজ্জিত করিবার আয়োজনেরই সূচনা করিতেছে।

আয়ারলণ্ডের শতাব্দীর সাধনা আজ ডি ভেলেরার নেতৃত্বে সুপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্তর বাহিরের কোন প্রতিবন্ধকে আর তার অগ্রগমন রুদ্ধ হইবার নয়।

মিঃ ডি, ভেলেরা

স্পেনের অন্তর্বিপ্লব ও রাষ্ট্র-সমস্যা ভবিষ্যতে কোন্ দিকে গড়াইবে তা এখন পরিকল্পনার মধ্যে নিশ্চিতভাবে আনা সম্ভব নয়। তবে এ রক্ত-বিপ্লব শীঘ্র থামিবার কোন আলো পাওয়া যায় না।

মাঞ্চুরিয়া লইয়া জাপানীর 'চালবাজী' ও উহার পশ্চাতে তাহার নগ্ন অভিপ্রায় দুনিয়ার দরবারে অপ্রকাশ্য না থাকিলেও অবস্থার চাপে তা বিণাবাধায় চলিয়া গিয়াছে। রুশিয়ার উপর জাপানের আক্রমণ অত সহজে যে স্বীকৃত হইবে না, তা ওয়াশিংটন কনভেনসনের স্পিরিট হইতেই অনুমিত হয়। বিশেষ আমেরিকা জাপানকে এতদূর আগাইতে দিতে পারে না, কারণ প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ ও জাপানের বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরে

উভয়েরই ভাবী ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। কামানের মুখ যদি নাও খুলে, তবুও বাণিজ্য-সভায় পূবের এই উদীয়মান জাপানকে পশ্চিমের শ্বেতদ্বীপবাসী অপাঙ্‌ক্তেয় করার চেষ্টা করিবেই।

চীন অন্তর-বাহিরের চাপে শতধা বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত। তার ভাগ্যাকাশের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া নব বর্ষের প্রভাত-অরুণ-কিরণের কোন আশার আলো সঞ্চার করিতে পারার সম্ভাবনা নাই।

মধ্য এশিয়ার চৈনিক তুর্কিস্থানকে কেন্দ্র করিয়া যে রাষ্ট্রচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, তার নিঃশেষ অবসান এ বৎসরেও শেষ হয় নাই। আগামী কালেও ইহার যে জের চলিবে, তাহা এসিয়ার আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-সম্বন্ধের মাঝে একটা কাঁটার খোচার মত হইয়াই থাকিবে।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
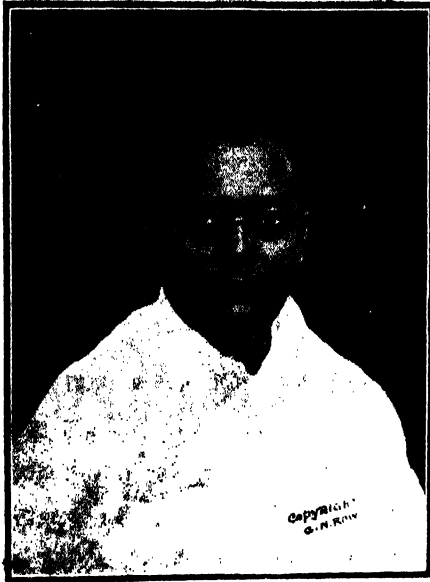
তিব্বতের ত্রয়োদশ দলাইলামার লোকান্তরিত হইবার মাঝেও একটা প্রচ্ছন্ন রহস্য আছে বলিয়া গুজব। এ অজ্ঞাতপ্রায় রাজ্যটীর আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপ লোক-চক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যায়। চীনের কবল হইতে তিব্বতের মুক্তি কেমন করিয়া কোন্ দিন সম্ভব হইবে, তা একমাত্র ভবিতব্যই জানে।

ষড় গ্রহের ফেরে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের মত সিংহলকেও বা এবার স্বায়ত্তশাসনটুকুর সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়! নব বর্ষের প্রথম প্রভাতে একটা দুঃস্বপ্নের মতই এ দুঃসংবাদ সিংহলবাসীর নিকট নিরানন্দের কারণ হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী

ভারতের সমস্যা যেমনি সোজা, তেমনি জটিল। এক-দিকে নিরস্ত্র নিঃসহায় স্বাধীনতাকামী ভারতাত্মার করুণ ক্রন্দন, অপরদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত সশস্ত্র রাজশক্তির দৃঢ়সঙ্কল্প ও রোষগর্জ্জন। প্রলোভন-কর ভাবী শাসনতন্ত্রের স্বরূপোদ্‌ঘাটনে লুপ্তপ্রায় সকল আশার মরীচিকা। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কল্পনার জাল বুনার এখনও অবসান হয় নাই। রাজা প্রজা প্রপীড়িত অভাব-অনটনে। তরুণ ভারতের প্রতীক পণ্ডিত জহরলাল কারাগারে। রুগ্ন সুভাষচন্দ্র মরণের পারে দাঁড়াইয়া স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন ভুলেন নাই; তাই জেনেভা হইতে জানাইয়াছেন অভিনব রাজনৈতিক পরিকল্পনা, কংগ্রেসের নূতন গঠন-ব্যবস্থা—ভারতের রাষ্ট্রসভার নূতন বৈদেশিক নীতির ইঙ্গিত। মহাত্মা হরিজন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়া ভারত-ভ্রমণে ব্যাপৃত। জাপ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির জল্পনার জের এখনও শেষ হয় নাই।

উপরের রোষ যেন ভীড় করিয়া হাজির হইয়াছে ভারতের দরজায়। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় উত্তর বিহারের ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ আনিয়াছে। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া হাত ধরাধরি করিবার হয়তো বা ইহা দেবতারই ইঙ্গিত।

কে জানে, কবে কোন যুগে ছুনিয়ায় এ বিষাক্ত আব্-হাওয়া বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে!

সোভিয়েট রুশিয়ার দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিক প্ল্যান—

১৯৩২ সালে সোভিয়েট রিপাবলিকের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক স্কীম শেষ হইয়াছে এবং উহার ফল যে কিরূপ আশ্চর্য্যজনক ভাবে সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা রুশিয়ার

সোভেট রুশিয়ার স্রষ্টা লেনিন
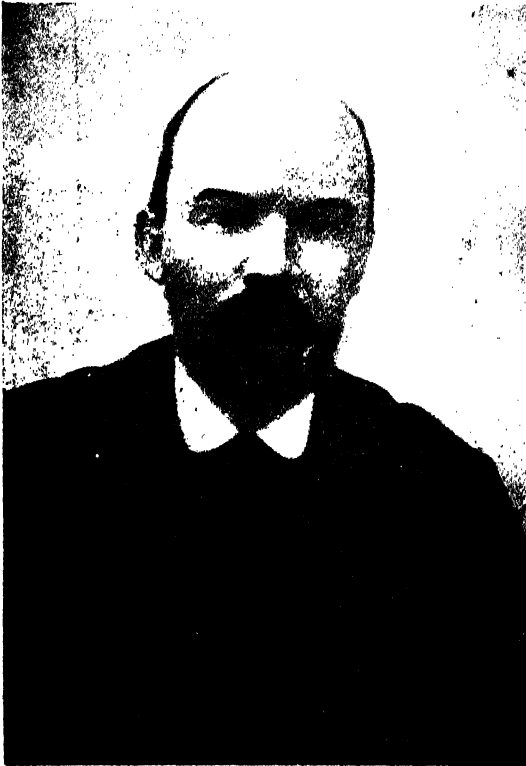
বর্ত্তমান অবস্থা হইতেই বেশ বুঝা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক প্ল্যান শেষ হইবে ১৯৩৭ সালে। এই স্কীমে ধরা হইয়াছে, যে ৫ বৎসরে মাছ, মাংস, ডিম ও চিনির মূল্য শতকরা ৩৫ ভাগ কমিবে এবং উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। বার্ষিক ব্যবহার্য্য মালের শতকরা ২২ ভাগ বাড়িবে, যাহা প্রথম পঞ্চ বার্ষিক প্ল্যানে ছিল শতকরা ১৭। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ২৪,২০০,০০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ৩৬,০০০,০০০। ১৯৩২ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে সোভিয়েট রুষিয়ার প্রধান চারিটি বাণিজ্য-শিল্পের অবস্থা কিরূপ দাড়াইবে, তার পরিচয় নিম্নে দেওয়া দেওয়া গেল। মার্কিণের ১৯৩২ সালের অঙ্কও দেওয়া গেল—তুলনায় সোভিয়েট স্কীমের বিপুলত্ব বুঝিবার সুবিধার জন্য।

	১৯২৭ সাল	১৯৩২সালের উপর শতকরা বৃদ্ধি	১৯৩২এর মার্কিণের পরিমাণ।
মটর যান	২৫১,১১৬	৮৩৭	১,৩৭০,০০০
পাথুরে কয়লা (টন)	১৫২,০ ০,০০০	২৩৫	৩৫৪,৩৫৫,০০০
ইস্পাত (টন)	১৯,০০০,০০০,	৩৫	১৩,৩২২,০০০
লৌহ (টন)	১৮,০০০,০০০,	২৯২	৮,৫৮৬,০০০

মার্কিণের মস্তিষ্ক—

যেমন ইতালি বলিতে মুসোলিনির কথা মনে পড়ে, জার্ম্মাণী বলিতে হিটলার, সোভিয়েট রুষিয়া বলিতে লেনিন, তুর্কি বলিতে কামালপাশা, তেমনি আজিকার আমেরিকার কথা ভাবিতে রুজভেল্টকে বুঝায়। হিটলারিজম, ফ্যাসিজম, কমিউনিজমের মত রুজভেল্টের অর্থনীতিক কার্য্যধারাও ক্রমে একটা ইজম্ বা বাদে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

নবীন মার্কিণ ধন-সম্পদে ধরণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইলেও, ধনের অসামঞ্জস্য বোধ হয় এমনটি ছুনিয়ার আর কুত্রাপি নাই। ধনীর গগন-চুম্বিত বিলাস-প্রাসাদের পার্শ্বেই দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটীর মনুষ্যত্বের উপহাসকর। ধনের উপর যে মানুষ সত্য—একথা এতদিন বণিক্ মার্কিণের মস্তিষ্কে-হৃদয়ে ঠাঁই পায় নাই। জাতীয় মূলধন মুষ্টিমেয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, বিরাট্ গণ-দেবতা সেখানে একান্ত দৈন্য-দারিদ্র্য-পীড়িত। আমেরিকায় পুরাতন বণিকৃতন্ত্রের দীর্ঘদিন এই একচেটিয়া প্রভাবের ফলে সারা দেশব্যাপী অভাব অনটনের, ছুর্দ্দশার করুণ রোল উঠিল—কৃষক-শ্রমিক-বেকার, অন্নাভাবে কাতর হইল; ব্যাঙ্কের দরজায় লাল বাতি জ্বলিল, আমানতের হইল অপচয়।

উপরে—অধ্যাপক মলি, বামে—লুই ডগলাস, দক্ষিণে—মিঃ ওয়ারবার্গ

এই দারুণ দুঃসময়ে আশার বর্ত্তিকা হাতে আসিলেন রুজভেল্ট। তিনি বিত্ত-সম্পৎশালীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমার ঐ কলকব্জা বড় নহে—বড় হইল মানুষ।" সঙ্গে সঙ্গে সুরু করিলেন জাতীয় সম্পদকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনিতে—আইন করিলেন এন-আর-এ (National Recovery Act). গণ-স্বার্থের জন্য জাতীয় সম্পদের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ এই কার্য্যপদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্য ট্যাক্স করিয়া কড়ি সংগ্রহ নয়, পরন্তু ধার করিয়া। রূপান্তরিত মিঠেকড়া সাম্যবাদের উপর রুজভেল্টের নীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত। বিগত ৪ঠা মার্চ্চ হইতে মার্কিণের পুনর্গঠন কার্য্য সুরু হইয়াছে; কিন্তু এর মধ্যেই সুফল ফলিয়াছে প্রচুর।

রুজভেল্টের এই যে অভিনব অর্থনৈতিক ইতিহাস-রচনা, অলক্ষ্যে এর পিছনে আছে পাকা ব্যবসায়ী ও অধ্যাপক, যাদের তিনি আখ্যা দেন তাঁর 'মস্তিষ্কমণ্ডলী'। এই 'মস্তিষ্কমণ্ডলীর বিনা পরামর্শে তিনি কোন কাজে এক পাও অগ্রসর হন না। তিনি তাঁদের কোন মন্ত্রী বা সরকারী বিভাগে কর্ম্মচারী করেন নাই। মস্তিষ্ক যেমন মানুষের অলক্ষ্যে থাকিয়া সারা শরীরকে করে সঞ্জীবিত, তেমনি সভাপতির এই মস্তিষ্ক-মণ্ডলী মার্কিণের সমর ঋণ, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারের পশ্চাতে থাকিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। এই মণ্ডলীর সভ্য-সংখ্যা দশজন। বিশেষ বিশেষ বিভাগে এক একজন অভিজ্ঞ। একজনের (অর্ডয়েন, ডি, ইয়াং—যিনি শিল্প-বাণিজ্য-বিশেষজ্ঞ) বয়স ষাট আর বাকীর গড়ে বয়স উনচল্লিশ। বাকী নয়জনের মধ্যে অধ্যাপক মলির বয়স সাতচল্লিশ এবং তিনিই তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ। সমস্ত অর্থ নৈতিক ও দুনিয়ার বর্ত্তমান প্রবাহ বিষয়ে ইনি সভাপতি রুজভেল্টের পরামর্শদাতা ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ। কেহ কেহ এঁকে রুজভেল্টের শাসন-তন্ত্রের সত্য নিয়ামক বলেন। বিলাতে বিগত সমরঋণ আলোচনায় ইনিই মার্কিণের পক্ষে যোগ দেন। এই দলের

মিসেস ফ্রান্সের রবিনসন

সর্ব্বকনিষ্ঠ মিঃ ওয়ারবার্গ, বয়স ছত্রিশ। মস্তিষ্কমণ্ডলীর ফাইন্যান্স-মেম্বার হইতেছেন মিঃ লুই ডগ্‌লাস। এঁর বয়স আটত্রিশ। মার্কিণের বাজেট-ব্যাপারে ডগ্‌লাসের অলক্ষিত প্রভাব অত্যধিক।

মার্কিণের নব জাতীয় পুনর্গঠন আইন (N. R. A.) পরিচালন-কার্য্য সম্পর্কে সব চেয়ে ব্যস্ত কর্ম্মী হইতেছেন একজন নারী—নাম ফ্রান্সেস রবিনসন। ইনি এন-আর এ-র এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনেরেল হিউজনসনের সহকারিণী। ফ্রান্সেস রবিনসনের জন্য কোন 'কোড'. নাই, কারণ তিনি প্রায় সারাদিন রাত্রিই খাটেন।

বর্ত্তমান মার্কিণের প্রতীক রুজভেল্টকে বুঝিতে হইলে তাঁর 'মস্তিষ্কমণ্ডলীর' পরিচয় থাকা চাই।

সমালোচনা

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা।

বাংলার ঐতিহ্যের যে অংশ বিস্মৃতির অন্ধকারে অবলুপ্ত, মহারাজ আদিশূরের রাজ্যকাল তাহার অন্যতম। মহারাজ আদিশূর এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত বাংলার নূতন ব্রাহ্মণ্য যুগের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা লইয়া যথেষ্ট মতদ্বৈধ বিদ্যমান। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রবীণ চিন্তাশীল ক্ষিতীন্দ্র বাবু এই সকল বিবদমান মতামতের আলোচনা পূর্ব্বক উক্ত নরপতি ও তাঁহার শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি পঞ্চ ব্রাহ্মণানয়ন সম্বন্ধে নিজের একটা সিদ্ধান্ত দিয়াছেন। সিদ্ধান্তটী গবেষণার বস্তু—বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য। পুস্তকখানির ৭০ পৃষ্ঠায়, বাণ-গড় শিলা-লিপি-প্রোক্ত "কুঞ্জর ঘটা বর্ষেণ" সম্বন্ধে লেখক ৮৮৮ বর্ষকে সম্বৎ বর্ষ অর্থাৎ ৮৩১ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন এবং তিনি "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়াধিপতি" বলিতে ফরাসীপণ্ডিতের মতানুযায়ী তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের সত্যতা অনুমান করিয়া লইয়াছেন। এই "বাণ-গড়" লিপিটীর সম্পূর্ণ শ্লোক এই :—

> "দুর্ব্বারারি বরূথিণী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
> সানন্দং দিবিযস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
> কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দু মৌলেরয়ং
> প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূ ভূষণঃ॥"

এই হেঁয়ালী উদ্ঘাটন করিলে, আমাদের মতে উল্লিখিত রাজার নাম পাওয়া যাইবে "কাম্বোজের রাজকুমার বাণেশ্বর" এবং এই কাম্বোজ প্রাচ্য সমুদ্রস্থ কাম্বোজ অর্থাৎ কাম্বোডিয়া। বৃটিশ এনসাইক্লোপিডিয়াও আমাদের এই শেষোক্ত কথা সমর্থন করিবে। এই রাজবংশ শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহাদেরই অন্যতম রাজা শালিবাহনের বংশধর গৌড়দেশ বিজয় করিয়া যে শালিবাহন এ দেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন, তদন্বয়জ রাজা বাণেশ্বর সেই অব্দই এখানে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই বাণেশ্বর ১ম মহীপালের পিতা ২য় বিগ্রহ পালকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং এই রাজ্যচ্যুতির ফলে ইতিহাসে পাওয়া যায়—৯৬৬ খৃষ্টাব্দ। অতএব এই ৮৮৮ অঙ্ক শতাব্দ ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, কাম্বোডিয়ায় শকাব্দাঙ্কিত বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মহীপালের পিতৃ-রাজ্যলোপকারী "অনধিকারী" রাজা এই "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" বাণেশ্বরই, কোনও ধর্ম্মপাল নহে—আমাদের এইরূপই অনুমান হয়।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যগুলি লেখক বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। বইখানির ছাপা, বাঁধা সুন্দর।

আগামী বারে সমাপ্য—মোহাম্মদ কাসেম কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

হিন্দু বাংলার ন্যায় মুসলমান বাংলাকেও প্রাণের কথা যে বাংলা ভাষাতেই প্রকাশ করিতে হইবে, এই ভাষাই যে তাঁদের প্রাণের ভাষা হইবার একমাত্র যোগ্য উপকরণ, এ সম্বন্ধে যদি এখনও কারও মনের কোণে কোনও সন্দেহ থাকে, তবে এই উপন্যাসখানি পড়িলে, আমাদের বিশ্বাস, তা দূর হইয়া যাইবে। গল্পের আখ্যান উপন্যাসের যোগ্য এবং লেখকের বলিবার ভঙ্গীও সহজ, স্বচ্ছ, মনোহারী। বইখানি কথা-সাহিত্যে উপভোগ্য।

আকাশ ও মৃত্তিকা—শ্রীসরোজকুমার রায় চেধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা।

আকাশ ও মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া নারীহৃদয় চিরদিন যে রহস্যের জাল বুনিয়া তুলিতেছে, সাহিত্য-শিল্পী সরোজ বাবুর হাতে তারই একটী অনবদ্য আলেখ্য এই বইখানিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। শেষের দিকে, রাণীর সহজ প্রকৃতিটী যেন একটু অতিমাত্র কঠোর হইয়া উঠিয়াছে; মনে হয়, বুঝি আরও একটু কোমল সুরে বাজিলে আরও স্বভাব-সুন্দর হইত।

উপন্যাসখানি "প্রবর্ত্তকে" ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল। তখন নাম ছিল "আয়সী।"

ভক্ত-বাণী—শ্রীশিশিরকুমার রাহা কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। মূল্য ছয় পয়সা মাত্র।

ভক্ত-বাণী 'টমাস, এ, কেমপিস' এর 'ইমিটেশন অব ক্রাইষ্টের প্রতিধ্বনি—ভক্ত-হৃদয় অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত করিবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা (বার্ষিক দোল সংখ্যা) সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা 'আনন্দ প্রেস' হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য মাত্র চারি আনা।

গল্পে, প্রবন্ধে, ছবিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর! মূল্যও সুলভ। এ জন্য সম্পাদক ধন্যবাদার্হ।

রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীর তিরোধান উপলক্ষে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই বাণীটী বেলুড় মঠে প্রেরণ করেন :—

"দেশে যে সকল মহাপ্রতিষ্ঠানে মানুষই মুখ্য, কর্ম্ম-ব্যবস্থা গৌণ ; মানুষের অভাব ঘটলে তাহাদের প্রাণ শক্তিতে আঘাত লাগে। শিবানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশ্রমে সেই দুর্য্যোগ ঘটিল। এখন যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, প্রাণ দিয়া মৃত্যুর ক্ষতি-পূরণের দায়িত্ব তাঁহাদেরই। অহমিকা-বর্জ্জিত পরস্পর ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন এখন আরও বাড়িয়া উঠিল। নহিলে শূন্য পূর্ণ হইবে না এবং সেই ছিদ্র-পথে বিশ্লিষ্টতার আক্রমণ আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে, সেই আশঙ্কা অনুভব করিতেছি। মহাপুরুষের কীর্ত্তি ও স্মৃতি রক্ষার মহৎ ভার যাঁহাদের উপরে, তাঁহারা নিজেদের ভুলিয়া, সাধনাকে অক্ষুন্ন রাখিবার এক লক্ষ্যে সকলে সম্মিলিত হইবেন—শিবানন্দ স্বামী তাঁহার মৃত্যুর মধ্যে এই বাণী রাখিয়া গিয়াছেন।"

পাদরীর দুরাশা—

পাদরী অ্যাব্বি ডিউবনুইস (Abbi Dubnois) তাঁর 'ভারতের দারিদ্র্য' (Poverty of India) নামক পুস্তকে ভারতকে সভ্য করার এক উৎকট উপায়ের সঙ্কেত দিতে গিয়া বলিয়াছেন।

ইংরেজ যে কোনদিন ভারতীয় হিন্দুদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারিবে তা আশা করাই বৃথা। একটী ন্যায়পরায়ন ও সুশাসন-তন্ত্রের সাফল্যেরও সীমা আছে, কিন্তু হিন্দুরা যদি তাদের অতীত সমাজ-ধর্ম্ম-আচার-আচরণকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে তবে তাদের চির-দিনের দৈন্য-দারিদ্র্য ভাবীকালেও দূর হইবার নয়। প্রগতির পথে এগুলি অনতিক্রমনীয় বাধা। হিন্দু জাতিকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে তাদের অতীত ধর্ম্ম-সভ্যতার বিলোপ সাধন করিতে হইবে, বানাইতে হইবে তাহাদিকে নাস্তিক ও বর্ব্বর এবং তারপর দিতে হইবে নূতন আলো, নূতন আইন, নূতন ধর্ম্ম এবং নীতি। কিন্তু কেবল তাই করিলেই করার মাত্র অর্দ্ধেকখানি হইবে যদি না আমরা দিতে পারি নব স্বভাব ও বিভিন্ন মনোবৃত্তি ; অন্যথায় তারা আবার পাক খাইয়া পুরাতন গর্ত্তেই পড়িবে।

কিন্তু স্বর্গীয় রাণাডে তার 'Religion and Social Reform' নামক পুস্তকে ভরসা দিয়া বলিয়াছেন।

আমাদের স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না। যদি তাই-ই হয় তবে বিষয়টা অসম্ভবে দাঁড়াইবে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান পথ ও মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণ পাল্টাইতে হইবে। আমাদের অব্যবহিত আঁধার অতীতের নৈরাশ্যজনক অবনতির ইতিহাসকেই সবখানি মনে না করিয়া দৃষ্টি দিতে হইবে সুদূর অতীতের গৌরব যুগের প্রতি। সে জন্য অবশ্য কোন বৈদেশিক প্রভুর প্রয়োজন হইবে না। তাহারা ন্যায়ের খাতিরে যদি শান্তি ও সকলের প্রতি সমানভাব বজায় রাখেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। বহিরারোপিত আইন-কানুন সত্যিকার কোন উপকার করিতে পারিবে না। তবে কোন কোন চরম ক্ষেত্রে উহার যে প্রয়োজনীয়তা তাহা রোগীর অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য চিকিৎসক ডাকার মত, কিন্তু রোগীকে সুস্থ ও সবল করিতে হইলে উপযুক্ত সময় ও সুযোগ দিতে হইবে। মুক্তি আনার ভার আমাদের নিজের হাতেই—এ জন্য প্রত্যেককেই সচেষ্ট হইতে হইবে।

— অর্থ-নীতি ও রাষ্ট্র —

সরকারী বাজেট—

তুলনায় বাংলা

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির বজেট স্ব স্ব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। এই বজেট-গুলির তুলনা-মূলক পরিদর্শনে দেখা যায়, মাদ্রাজের ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ব্যয় বাদে মোট ৬১,০০০৲ উদ্বৃত্ত ছিল; অর্থসচিবের মতানুসারে ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দেও উদ্বর্ত্তের পরিমাণ ৪,৪৬,০০৪৲ টাকার কম হইবে না। যুক্তপ্রদেশের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা বেশী হইলেও, ঋণ-তহবিলে ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত থাকিবে ১৯ লক্ষ টাকা; কাজেই এই প্রদেশের বজেটে মোট ১৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। মধ্য প্রদেশের বজেটেও দেখা যায়, ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের আয় অপেক্ষা ব্যয় ২ লক্ষ টাকা কম হইবে, নূতন ট্যাক্সও ধার্য্য করিতে হইবে না। বোম্বাই প্রদেশের সরকারী তহবিলেও ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্যয় বাদে ৭০ হাজার টাকা মজুত থাকিবে। কিন্তু বাংলার অর্থ-সচিব যে হিসাব নিকাশ দাখিল করিয়াছেন তাহাতে উদ্বর্ত্ত দূরে থাকুক, আগামী বৎসরে ঘাটতি হইবে সওয়া দুই কোটী টাকা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার আর্থিক অবস্থা কি পরিমাণে শোচনীয়, ইহা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বাংলার এত ঘাটতি কেন?—

বাংলা দেশের আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য-রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই, ইহা শুধু এই বৎসরেই নূতন শুনিতে হইতেছে তাহা নহে—আমরা গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই ঘাটতির কথাই অবিশ্রান্ত শুনিয়া আসিতেছি—আর এই ঘাটতির পরিমাণ উত্তরোত্তর কমা দূরে থাকুক, প্রতি বৎসর লম্ফে লম্ফে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দের যেখানে ঘাটতি হইয়াছিল প্রায় এক কোটী টাকা, বর্ত্তমান বর্ষে সেইখানে ঘাটতির পরিমাণ ১⅘ কোটী টাকা এবং আগামী বর্ষের শেষে ইহার সহিত আরও ২¼ কোটী টাকা যুক্ত হইয়া মোট ঘাটতি দাঁড়াইবে প্রায় ৫ কোটী টাকা। বাংলার এই আর্থিক গহ্বর সহজে পূরণ হইবার নহে। অর্থসচিব তাই নিরাশকণ্ঠে তাঁহার বক্তৃতার মুখবন্ধেই জানাইয়াছেন—"বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ প্রদেশের আর্থিক উন্নতির আশু সম্ভাবনা আর দেখা যায় না। বরং বজেট আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, দুরবস্থা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে; আর আমাদের রাজস্ব-সংক্রান্ত দাবী গ্রাহ্য করিয়া যদি একটা সুব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে বাংলার ভবিষ্যৎ ঘোরতর সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে।"

বাংলার এই ক্রম-বর্দ্ধিত বকেয়া আর্থিক অবস্থার কারণ কি? একটা সর্ব্বজন-স্বীকৃত কারণ, মেষ্টনী ব্যবস্থানুযায়ী বাংলার পাট হইতে যে প্রভূত রাজস্ব আদায় হয়, তাহা বাংলা গবর্ণমেণ্ট পান না; ভারত গভর্ণমেণ্টেই তাহার অধিকাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা বাংলার যে কতখানি দুর্ভাগ্যের নিদান, তাহা বাংলার পক্ষ হইতে ভারতগভর্ণমেণ্ট ও পরিশেষে রাউণ্ড-টেবিল কন্‌ফারেন্সে পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও স্বর্গীয় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারিগণ দেশের এই দাবী লইয়া যথেষ্ট আলোচনা ও আন্দোলন করিয়াছেন এবং সুখের বিষয়

সে আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায়, হোয়াইট-পেপারে এই দাবীর ন্যায্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। বাংলার বর্ত্তমান অর্থ-সচিবও উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, "for the final judgment of our claim that this great province was unjustifiably treated in the financial arrangement incidental to the present constitution and should be both recompensed for that unjust treatment and given an equitable settlement under the impending constitution." গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী স্যার জর্জ্জ স্থষ্টার ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বাংলাকে আশ্বস্ত করিয়া জানাইয়াছেন—বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিদারুণ আর্থিক কৃচ্ছ্রতা উপলব্ধি করিয়া ১০৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে পাট-শুল্কের অর্দ্ধেক টাকা তাহাকে দেওয়া হইবে। অবশ্য এই প্রস্তাবনায় বাংলার পূরা দাবী স্বীকৃত হয় নাই এবং এই যে ব্যবস্থাও আশু সঙ্কট বিবেচনা করিয়া অস্থায়ী ভাবেই বিহিত হইতেছে, ইহাও স্যার জন স্থষ্টারের এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে—"The whole of these proposals must be regarded as purely of a provisional nature to deal with the immediate situation and as in no way creating a permanent arrangement which could be regarded as anticipating the final decision of Parliament in this matter," তথাপি, এই পাট-শুল্কের অর্দ্ধ পরিমাণ অর্থাৎ প্রায় ১৯০ লক্ষ টাকা বিহার-উড়িষ্যা ও আসামের সহিত যথানুপাতে বণ্টন করিয়া বাংলার ভাগ্যে যে ১৬৭ লক্ষ টাকা পড়িবে, তাহা দ্বারা তাহার উপচীয়মান ঘাটতি সামলাইতে যে উপস্থিত কতক পরিমাণে সহায়তা হইবে, এইটুকুও যথেষ্ট। ইহা 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল', এই নীতি অনুসারেই বাঙ্গালীকে গ্রাহ্য করিয়া লইয়া অতঃপর তাহাদের পুরাপুরি দাবীটার জন্যই প্রতীক্ষা ও আন্দোলন করিতে হইবে; নতুবা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের তহবিল-পূর্ত্তির জন্য দিক্ দিয়া বিশেষ আশা কোথায়?

বাংলার রাজস্ব-সচিব ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের জন্য ১১,২৯,১৭০০০৲ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহা ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের ব্যয় অপেক্ষা ৩৪,৬৮০০০৲ টাকা বেশী। এই অতিরিক্ত ব্যয়গুলির তালিকা ও অর্থসচিবের মন্তব্য পাঠ করিলে, বুঝিতে হয়, যতদূর সম্ভব টানিয়া কষিয়াই ব্যয়-নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, ইহার অধিক আর ব্যয়-হ্রাস করিবার সম্ভাবনা নাই। সত্য যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে একমাত্র উপরোক্ত পাট-শুল্ক ছাড়া বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের আর অর্থ-সঙ্কুলানের দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু ভারত-ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান অর্থসচিব বাংলা সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। স্যার জর্জ্জ স্থষ্টার অবশ্য স্বীকার করেন, যে "Bengal has since 1930, been incurring deficits at the rate of about 2 crores per annum, and its debt on this account is piling up figures which may become really unmanageable," কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে বিশেষ গুরুচিত্তেই বলিয়াছেন—"If we are prepared to take account of this and ask the Central Legislature to support us in raising funds to help Bengal, we can also fairly claim to be satisfied that the Bengal Government and Legislature are doing all that is possible to help themselves."

আমরা জানি না, কেন্দ্রীয় অর্থসচিবের এই ন্যায়-সঙ্গত দাবী বঙ্গীয় শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ কত দূর পূরণ করিয়াছেন ও ভারত-কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁরা সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন কি না। প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায়, বাংলা গভর্ণমেণ্ট ব্যয়-সঙ্কোচ সম্বন্ধীয় যে তদন্ত-কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধান্ত-মতে কর্ত্তৃপক্ষ যে ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াছেন তাহার চেয়ে আরও বেশী ব্যয় কর্ত্তন করা যাইত—বাংলা গভর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই। তাহা ছাড়া, দার্জ্জিলিঙ্গের শৈলবিহার সম্পর্কিত সঙ্কোচ-প্রস্তাবনাও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন নাই—এ সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যদি কোন যুক্তি থাকে তাহা ভারত

গভর্ণমেণ্টের নিকট সত্যই সন্তোষজনক কি না তাহাও বিবেচ্য।

শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে অর্থসচিব বলিয়াছেন, "যতই অর্থব্যয় হউক, ইহা যখন অটুট রাখিতে হইবেই, তখন এই বাবদ আমাদের আয়ের বহুলাংশ ব্যয় করিতেই হইবে।" এই ব্যয় কত, তাহাও তিনি বলিয়াছেন—"১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষে, বিপ্লববাদীরা এই প্রদেশকে ১,৭৩,৭৫০০০৲ টাকা খরচ না করাইয়া ছাড়িবে না।" ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে বাংলার বিপ্লবের বিভীষিকা সম্পূর্ণ নির্ম্মূল না হইলেও, পূর্ব্বোপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে। গভর্ণরের উক্তি সত্য হইলে, বাংলার সমগ্র রাজস্বের এক ষষ্ঠাংশ বিপ্লব-দমন কল্পে এখনও ব্যয় করিতে হইবে কেন, সে সম্বন্ধেও অর্থসচিবের কথায় সান্ত্বনাপ্রদ যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যে নূতন শাসন যুগ আসিতেছে তাহাতে যদি বাংলা গভর্ণমেণ্টকে এখনকারই মত দুর্ব্বহ ঘাটতির বোঝা মাথায় করিয়াই শাসন আরম্ভ করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলার ভাগ্যে সে নূতন যুগ রাজা ও প্রজা কাহারও পক্ষেই যে আশার বার্ত্তা বহন করিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে, বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদি তাহার আর্থিক দুর্গতি ও তাহার নিত্য বার্ষিক ফাজিল তহবিলের অন্যতম কারণ হয়, তবে এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকেও পরিবর্ত্তিত বা নাকচ করিয়া স্বচ্ছ লঘু স্কন্ধ বাঙ্গালীকে নূতন ভাবে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের একটা সুযোগ দেওয়া বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টের কর্ত্তব্য। "শ্বেত-পত্রে"র প্রবর্ত্ত যে সব ইংরাজ রাষ্ট্রনেতা ভারতের ভাগ্য-সূত্র-নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদের নিকট বাংলার এই ক্ষীণ কণ্ঠের দাবী কি শ্রুতি-গ্রাহ্য হইবে?

ভারতীয় বজেট—

ভারত গভর্ণমেণ্টের বজেট আলোচনায় বাঙ্গালীর বিশেষ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত এই, যে পাট রপ্তানী শুল্ক-বিষয়ক অবিচার আংশিক ভাবে বিদূরিত হইয়াছে। ইহার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বাংলার প্রতি এই ন্যায়াচরণ করিতে স্যার জন সুষ্টারকে কয়েকটি শিল্প দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইতে বা বাড়াইতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে তিনটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তামাক ও সিগারেট, দিয়াশালাই এবং ইক্ষুজাত চিনি। আমদানী তামাকের উপর প্রতি পাউণ্ডে ।৵০ মাশুল বাড়িবে এবং সিগারেটের মাশুল বাক্স প্রতি ৫৸৶০ ও মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ শুল্ক ধার্য্য করা হইলেও—ইহার ফলে বিদেশীয় ব্যবসায়ী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। বৃটিশ ভারতে প্রস্তুত দিয়াশালাইয়ের উপর গ্রোস প্রতি ২।০ উৎপাদন শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং সেই সঙ্গে দেশীয় দিয়াশালাই শিল্পটীকে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষিত করিবার জন্য আমদানী দিয়াশালাইয়ের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যে সকল করদ রাজ্য বৃটিশ ভারতের ন্যায় শুল্ক-ব্যবস্থায় অস্বীকৃত হইবে, তাহাদের রাজ্যে প্রস্তুত দিয়াশালাইয়ের জন্যও এই আমদানী শুল্ক দিতে বাধ্য হইবে। দেশীয় দিয়াশালাইয়ের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ বোম্বাই প্রদেশে প্রস্তুত হয়—বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ইতিমধ্যেই এই লইয়া অসন্তোষের গুঞ্জন শুনা গিয়াছে, বাংলার প্রতি পক্ষপাতিতা-মূলক এই ব্যবস্থা তাঁহাদের আদৌ মনঃপূত হয় নাই। চিনির উপর প্রতি হন্দর ।✓০ উৎপাদন শুল্ক গ্রহণ করা হইবে এবং ভারত-জাত চিনির জন্য হন্দরে ১।✓০ মাশুল দিতে হইবে। এই মাশুলের আয় হইতে অবশ্য হন্দরে এক আনা ইক্ষু-চাষের জন্য সমবায়-সমিতি গঠন করিতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-সমূহকে দেওয়া স্থির হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় চিনির মহাজনদিগের কিঞ্চিৎ লভ্যাংশ কমিলেও, তাহাতে দেশের ক্রেতা ও কৃষক সম্প্রদায়ের সেই অনুপাতে ক্ষতির আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে, কাঁচা চামড়ার উপর রপ্তানী শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—যদিও পেটা চামড়ার উপর এই শুল্ক বর্জ্জন করা হয় নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, এই ক্ষেত্রে ভারতীয় মহাজন-মণ্ডলীর দাবী উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয় মহাজন-সংসদের দাবীই স্যার জন সুষ্টার গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্যান্য ছোট ছোট পরিবর্ত্তনগুলির মধ্যে, পাঁচ পয়সার ডাক টিকিটে এখন যেখানে ২।০ তোলা ওজনের

চিঠি যায়, সেখানে অর্দ্ধ তোলা ওজনের খাম এক আনার টিকিটেই যাইবে। মনে রাখিতে হইবে, অতীতে এই অর্দ্ধ তোলার চিঠিতে ৵১০ পয়সা লাগিত। সুতরাং এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের তেমন খুসী হইবার কারণ নাই। ডাক-ঘরের খামের দাম পাঁচ পয়সা এক পাই ছিল, উহা হইতে এক পাই কমান হইয়াছে। কিন্তু বুকপোষ্ট সংক্রান্ত ৵১০ পয়সার স্থলে ৵১৫ পয়সা মাশুল-বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যবসায়ী ও সাধারণ সকলেই অল্পবিস্তর চাপ বোধ করিবে, ইহা অবধারিত। টেলিগ্রামের ব্যাপারে ৷৵০ আনায় ৮টী শব্দ-প্রেরণের ব্যবস্থা মোটের উপর মন্দ বলা যায় না।

এইরূপে দেখা যাইতেছে, নূতন ট্যাক্স বসাইয়া ও আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভারতের অর্থসচিব তাঁহার বিদায়কালীন শেষ বজেটে যথাসম্ভব দুই প্রান্ত মিলাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই চেষ্টায় এক হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় আছে। কিন্তু সংখ্যার মায়াব্যূহে প্রবেশ না করিয়াও এইটুকু অনায়াসে বলা যাইতে পারে, যে ভারতবাসী নিজেদের বাস্তব জীবনে স্যার জর্জ্জ কল্পিত সুদশার সন্ধান এখনও পাইতেছে না। অর্থসচিব উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন "Results of Government's industrial policy had been that past years of unexampled depression had actually been the period of industrial expansion in India" এবং ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি তুলা, লৌহ, ইস্পাত, চিনি, সিমেণ্ট, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও রঙ প্রভৃতি শিল্পগুলির প্রভূত উন্নতির কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু এই শিল্পোন্নতির সহিত জনসাধারণের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত নয়, ইহা তাঁহাকেও পরবর্ত্তী উক্তিতেই স্বীকার করিতে হইয়াছে—"But admittedly the main interests of India was agricultural rather than industrial." তাই সে সমস্যার সমাধান করিতে গভর্ণমেণ্টকে প্রচুর পরিমাণে ট্যাক্স ও খাজনা মাপ করিতে হইয়াছে এবং ঋণদানের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহার ফলে, "the general condition of agriculturists was that they had enough to eat and been left with a margin of cash for necessary purchases at something like normal level" বাস্তবিক পক্ষে এই অবস্থা জন-সাধারণের স্বাভাবিক স্বাচ্ছল্য ও স্বচ্ছন্দতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা উচিত নয়। যে জাতির নিজ শ্রম-জাত উপার্জ্জনে রাজস্ব দিবার ক্ষমতা নাই, এবং যাহার "যথেষ্ট খাইবার ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খরিদ করিবার সংস্থানটুকুও" ঋণ-কৃত অর্থেই নিষ্পন্ন করিতে হয়, সে জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা যে একেবারে ভূয়া কথা, তাহা যুক্তি দিয়া প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন হয় না। তবুও অর্থসচিবের মুখে "India's financial position in its strength challenges comparison with that of any country in the world, and in these times of increasing economic nationalism, there is no country, that has brighter prospects or greater potentialities for economic advance than India with her own vast market and with her place in British Common-wealth of Nations."—এই অতি বড় সৌভাগ্য এবং অতুলনীয় ঋদ্ধিময় আর্থিক ভবিষ্যতের কাহিনী সাধারণ ভারত-বাসীর প্রাণে কোন আশা-চিত্র আঁকিয়া তুলিবে কি না তাহা কে বলিতে পারে!

বিহারকে সাহায্য—

স্যার জন সাষ্টার তাঁহার বজেট প্রসঙ্গে এই কথাও জানাইয়াছেন—"১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষে ভারত গভর্ণমেণ্টের হাতে ১,২৯,০০০০০৲ টাকা থাকিবে—এই টাকা স্বতন্ত্র করিয়া বিপন্ন বিহারের পুনর্গঠন কল্পে সাহায্য প্রদান করা হইবে। বিহারের ইক্ষুক্ষেত্র ও চিনির কলগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে—এইগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে ভারতগভর্ণমেণ্ট ৫ লক্ষ টাকা দিবেন। সরকারী অফিষ, আদালত প্রভৃতির নির্ম্মাণের জন্যও ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া, আরও ২,৭০,০০০০০৲ টাকা ঋণ দিয়া পুনর্গঠন কার্য্যে সাহায্য করা হইবে।" বিধ্বস্ত

বিহারকে এই ৩া০ কোটী টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়া অর্থ-সচিব পরম সন্তোষ সহকারে বলিয়াছেন—If more is needed before the end of 1933-34, it will be provided. We trust that these proposals will be regarded not only as adequate but generous."

তাঁহার এই উক্তি পড়িয়া, বিহারের ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, ভারতগভর্ণমেণ্ট যে বিহারের দুর্দ্দশার পরিমাণ কত লঘুভাবে অবধারণ করিয়াছেন, ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদও তাই মনে করেন, যখন ভারত-গভর্ণমেণ্টেরই ধারণা এইরূপ, তখন স্যার স্যামুয়েল হোরের যে ৫ কোটী টাকাই বিহারের জন্য যথেষ্ট, এই কথায় আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের বাহিরে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে ও অন্যান্য বিদেশ হইতে যে বিহারের দুঃখে এত কম বস্তুতন্ত্র সাড়া মিলিবে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ফলতঃ, ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহার বর্ত্তমান সাহায্য-ক্ষমতা এইটুকু, এইমাত্র জ্ঞাপন করিলেও যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না, স্যার জন সুষ্টারের "not only adequate but generous" এই বিশেষণ দুইটির মধ্য দিয়া শুধু ভারত-শাসন-তন্ত্রের হৃদয়হীনতা ও কল্পনা-নিঃস্বতার প্রকাশ নহে, পরন্তু সারা দুনিয়ার নিকট বিহারবাসীর যথেষ্ট সাহায্যপ্রাপ্তির পথ কণ্টকিত করা হইয়াছে, তাহা কি বিজ্ঞ অর্থসচিব মহাশয় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ ও রাজেন্দ্র প্রসাদের সমালোচনোক্তি পাঠ করিবার পরও উপলব্ধি করিবেন না? অতঃপর, বিহার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে একক তাহার দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহা বুঝিয়া প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ কি করিবেন তাহাই বিবেচ্য। জনসাধারণের যাহা সাহায্য-সামর্থ্য, তাহারা তাহা সাধ্যমতই অর্পণ করিয়াছে; কিন্তু এই কয়েক লক্ষ টাকা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যতুল্য, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যদি ভারতগভর্ণমেণ্ট এইভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে দৈবপ্রপীড়িত বিহারবাসীর "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" অবস্থা ছাড়া অন্য পরিণাম ভাবিয়া পাই না। স্বয়ং বিহারের গভর্ণর অন্যূন ৩০ কোটী টাকা ছাড়া বিহারের পুনর্গঠন সম্ভব হইবে না, ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট কি স্থানীয় দায়িত্বপূর্ণ মানুষের—"man on the spot" নীতির উপর আস্থাবান্ হইয়া বিহার সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য ও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিবেন না?

পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ—

পাট তদন্ত কমিটীর ত্রিধা-বিভক্ত রিপোর্ট পড়িয়া আমাদের আশঙ্কা হয়, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট আলোর পরিবর্ত্তে মতদ্বৈধে সমধিক দিশেহারা হইয়া বিলম্ব-নীতিরই না আরও কিছুদিন ধরিয়া অনুবর্ত্তন করিয়া চলেন। বাংলার অর্থসচিব প্রসঙ্গান্তরে জানাইয়াছেন—"পাট ও ধান্যের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই ফসলের মূল্যবৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না; তবে আশা হয়, আগামী বৎসরে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মত ধান্য ও পাটের মূল্য হ্রাস হইবে না।" এই আশার কোনই মূল্য নাই, যদি গভর্ণমেণ্ট তৎপর হইয়া পাট-চাষ ও পাটের বাজার যুগপৎ সুনিয়ন্ত্রিত করিবার আশু সুব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করেন। মেজরিটী ও মাইনরিটী রিপোর্ট উভয়েই এই মূল বিষয়ে একমত, যে পাটের বাজার মন্দা কাটাইবার জন্য একটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেই হইবে—কার্য্যপদ্ধতি লইয়াই মত-ভেদ। পাট-তদন্ত-কমিটীর প্রত্যেক সদস্যই স্বীকার করিয়াছেন, যে চাহিদার অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইতেছে বলিয়াই কৃষকেরা যোগ্য দর পাইতেছে না। এই জন্য পাট-চাষ অতি অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। মেজরিটী রিপোর্টের লেখক অধিকাংশ সরকারী ও ইউরোপীয় সভ্যগণ ইহার জন্য প্রচার-কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ দেশীয় সভ্যগণ শুধু প্রচারে আস্থাশীল না হইয়া, বাংলার পাট-চাষের উপযোগী সমস্ত জমী কতকগুলি ভাগে বিভক্ত ও প্রত্যেক বিভাগের জন্য আবাদের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে চাহেন। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মনে করেন, আইন ভিন্ন পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার উপায় নাই এবং এইরূপ আইন-প্রণয়ন

করাতে কৃষকের ক্ষতির পরিবর্ত্তে উপকারই হইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ়মূল ধারণা। খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকও এই মতই পোষণ করেন; কিন্তু তিনি আরও পাঁচ বৎসরকাল বিনা আইনে প্রচার সাহায্যেই চেষ্টা করিতে বলেন।

মেজরিটী রিপোর্টের চেয়ে মাইনরিটি রিপোর্টখানি সুচিন্তিত, সারগর্ভ যুক্তিপূর্ণ, তথ্যবহুল, প্রত্যয়প্রদ। কিন্তু উভয় মতের সদস্যগণই কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যবসায়িগণের পরামর্শ গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারিতেন, এদেশের কৃষক সম্প্রদায় নিজেদের ভালমন্দ নির্দ্ধারণে একেবারে অসমর্থ নহে। তাহারা নিরক্ষর হইলেও, লাভ লোকসান হিসাব করিয়াই কাজ করে। ধানের দর চড়া থাকিলে, তাহারা চাহিবার অতিরিক্ত পাট বুনিতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের এক পাটতদন্ত কমিটীর রিপোর্টে এই মন্তব্য দেখা যায়—"বাংলার চাষীরা মূর্খ নহে; যে ফসল বুনিলে লাভ আছে, সেই ফসল তাহারা নিশ্চয়ই বুনিবে। চাহিদা ও দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহারা পাটের চাষ বাড়াইয়াছে, তেমনি উহা কমিবা মাত্র একবৎসরেই অর্দ্ধেক চাষ কমাইয়া ফেলিয়াছে।" গভর্ণমেণ্ট হউন কিম্বা কংগ্রেসের ন্যায় কোনও জাতীয় প্রতিষ্ঠানই হউন, তাঁহারা আইন বা প্রচার দ্বারা যাহা না করিতে পারিবেন, বাংলার কৃষকগণের সদ্বুদ্ধি জাগাইয়া তাহাদের সংহতিবদ্ধ করিতে পারিলে ততোধিক ও স্থায়ী ফললাভের সম্ভাবনা। বাংলার চাষীদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কোনও নির্ভরযোগ্য সংহতি বা প্রতিষ্ঠান এ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। গভর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ সংহতি-গঠনের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়া তাহাদের স্থায়ী স্বার্থ-রক্ষার আয়োজন করিতে পারেন। কৃষিপ্রধান বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন-সংগঠনের সহিত এই ধান ও পাট-চাষ-সুনিয়ন্ত্রণের নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত—এই জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার-কার্য্যাদি পরিচালনা না করিয়া, একটী অখণ্ড জাতি-সংগঠন-নীতির অবধারণ ও তদনুবর্ত্তন করিলে, স্বল্প সময়ে ও স্বল্প শ্রমশক্তি ও অর্থব্যয়ে বাংলার কৃষককুল আত্মনিয়ন্ত্রণে ঋদ্ধি ও অধিকার লাভ করার পথে অগ্রসর হইতে পারে। সেই সুযোগই একদিক্ দিয়া গভর্ণমেণ্ট ও অন্যদিক্ দিয়া শিক্ষিত সংগঠন-ধর্ম্মী কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান অনেকখানি সৃজন করিয়া দিতে পারেন। পাট-চাষের নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিটী-নিয়োগ, মত-প্রকাশ ও মতদ্বৈধ-সামঞ্জস্য এবং সর্ব্বশেষে কার্য্যকরী নীতি অনুসরণ করিতে যত সময় ইত্যাদি লাগিতেছে, আমাদের মনে হয়, একটী স্থায়ী, সংগঠন-মূলক কর্ম্মধারা নিরূপণ করিয়া তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে ততোধিক সময়াদি লাগিবে, এইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। দুর্দ্দিনের তাড়নায় বিধ্বস্ত বিহারে যেমন রাজশক্তির আনুকুল্যে জাগ্রত দেশশক্তিই দেশ-গঠনের সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে, তেমনি বাংলার চিরস্থায়ী সংগঠনের কার্য্য উভয়ের সম্মিলিত প্রেরণায় ও সহযোগিতায় এই মুহূর্ত্তেই অনায়াসে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই জন্য ধান ভানিতে শিবের গীত এখানে এইটুকু করিয়া রাখিলাম।

খদ্দর-সংরক্ষণ-বিল—

ভারত ব্যবস্থাপক পরিষদে শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিংহের খদ্দর-সংরক্ষণ-বিলটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায়, এই শিশু-শিল্পটী যন্ত্র-দৈত্যের প্রবল প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার কথঞ্চিৎ সুবিধা পাইবে, ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। মিলগুলির স্বার্থপুষ্টির জন্যই সরল-চিত্ত দেশবাসীর দেশপ্রেমকে ঠকাইয়া, খাঁটি খদ্দরের অনুরূপ ভেজাল খদ্দর রাশি রাশি উৎপাদিত হইতেছে ও দেশে বিক্রীত হইতেছে। এই জুয়াচুরির ব্যবসায়ে জাপানের ন্যায় বিদেশী ব্যাপারী এবং কোনও কোনও দেশীয় ব্যবসায়ীও সংলিপ্ত আছেন—নতুবা এত ভেজাল খদ্দর আসে কোথা হইতে? খাঁটি খদ্দর তপস্যার ধন—শত শত নিরন্ন ও দরিদ্র জনসাধারণের একমাত্র উপজীবিকার সম্বল। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহাজীবনের উৎসর্গে এই মৃতকল্প উটজ-শিল্পে সবে মাত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হাতে-কাটা সূতায় হাতে-বোনা কাপড়কেই খাঁটি খদ্দর বলা হয়। এই বিলের সাহায্যে, জাপানী বা বোম্বাই-ওয়ালা ব্যবসায়ীরা অতঃপর ভেজাল খদ্দরের উপর খদ্দর বলিয়া ছাপ মারিয়া বিক্রয় করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। বাংলার খাঁটি খদ্দর-প্রস্তুতির অন্যতম কেন্দ্র

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আমরা এই বিলের প্রস্তাবক গয়াপ্রসাদ সিংহজী এবং ভারত ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্যমণ্ডলীকে খাদি-শিল্পের প্রতি এই সময়োচিত সহায়তা ও আনুকুল্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ষ্টেট লটারী বিল—

বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার মিঃ পি বানার্জ্জীর লটারী সংক্রান্ত একটী বিল সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন; সুখের বিষয়, তাহা ১৭×৫৫ ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই বিলটির মর্ম্ম এই ছিল যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট টাকার অভাব আছে, অতএব কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা-বোর্ড প্রভৃতির পক্ষ হইতে লটারী চালাইয়া অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা আইনসঙ্গত বলিয়া গণ্য হউক। গভর্ণমেণ্ট এই বিলের বিরুদ্ধে ছিলেন, যে হেতু সদুদ্দেশ্যে প্রযুজ্য হইলেও লটারী, জুয়াখেলা ছাড়া কিছু নয় এবং ইহাতে নানা অকল্যাণের সৃষ্টি হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টের এই প্রতিবাদ তাঁহাদের অপরাপর আচরণের সহিত সর্ব্বথা সামঞ্জস্যযুক্ত না হইলেও, এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। ষ্টেট লটারী খাস ইংলণ্ডেই ছিল, কিন্তু ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে উহা বিসর্জ্জিত হইয়াছে। গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে "আইরিশ হসপিট্যাল সুইপস্" উপলক্ষে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার বৈধাবৈধতা অবধারণ করিবার জন্য এক রয়েল কমিশন গঠিত হয়। স্যার সিড্‌নী রাউলাট উক্ত কমিশনের সভাপতি এবং উহার অন্যতম সভ্য ছিলেন আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাক্‌সন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ষ্টেট লটারীর অনুকুলে হয় নাই।

"আইরিশ হসপিট্যাল সুইপ্‌সের" হিসাবপত্রে দেখা গিয়াছে, উদ্বৃত্ত টাকার শতকরা ৮০্ খরচায় উড়িয়া যায়, বাকী ২০্ মাত্র থাকে উদ্দিষ্ট সৎকার্য্যের জন্য। "বৃটিশ হসপিট্যালস্ এসোসিশনকে' এ পর্য্যন্ত সরকারী লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। ইংরাজ জাতি এই নীতির অনিষ্টকারিতা বুঝিয়াছে বলিয়াই, "চেয়ারিং ক্রশ হসপিট্যালের" হাউস গভর্ণর মিঃ ফিলিপ ইন্‌মান এইরূপ সদুদ্দেশ্যে অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহ নীতির তীব্র প্রতিবাদ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"You cannot mix oil with vinegar, and you cannot mix gambling with charity."

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসও এই প্রসঙ্গে তীব্র কণ্ঠে বলেন —"State lotteries are an abomination, as they undermine the whole character of the State."

যাহাতে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়, এমন কোনও বিধান, রাষ্ট্র বা সমাজক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত না হওয়াই ভাল। সৎকার্য্যের জন্য অন্য ভাবে অর্থ-সংগ্রহের আরও অনেক পন্থাই পাওয়া যাইতে পারে।

লবণ-শুল্ক—

দেশীয় লবণ-শিল্পের সংরক্ষণ ও সাহায্য কল্পে বৈদেশিক লবণের উপর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মণ প্রতি ।১০ অতিরিক্ত শুল্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল। দুই বৎসর পরে উহা কমাইয়া মণ প্রতি ৵১০ পয়সা করা হয়। এই শুল্ক-হ্রাসের মূলে বাঙ্গালীর প্রবল দাবীই ছিল। বাঙ্গালী এই অতিরিক্ত শুল্কে কিছুমাত্র উপকৃত হয় নাই; কারণ এই লাভের গুড় প্রায় সবখানিই পিপীলিকায় খাইয়াছে অর্থাৎ পারস্য-সাগরের উপকূলস্থ এডেনের ভাগ্যেই এই লাভ ফলিয়া আসিয়াছে। কলিকাতায় দেশীয় ও বিদেশীয় লবণ আমদানীর হার দেখিলেই এই কথা বুঝিতে পারা যায়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই শুল্ক-প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কলিকাতা অর্থাৎ সারা বাংলার সমগ্র লবণ আমদানীর শত-করা ৮ ভাগ দেশীয় লবণ ছিল। উহা পরবর্ত্তী তিন্ বৎসরে বাড়িয়া যথাক্রমে শতকরা ১২,২২ ও ২৯ ভাগে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ মোট ২১ ভাগ বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে, ঐ সময়ে বৈদেশিক লবণ আমদানী শত করা ৬৪ হইতে কমিয়া যথাক্রমে শতকরা ৩৪,২৯ ও ১৭ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। দেখা যাইতেছে, অতিরিক্ত শুল্ক বসাইবার ফলে, এই কয়েক বৎসরে বৈদেশিক লবণ আমদানী মোট শতকরা ৪৭ ভাগ কমিয়াছে। বাকী শতকরা ২৬ ভাগ লবণ ভাগ যোগাইল কে? এডেন। কিন্তু অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা তাহাকে ইহার জন্য দিতে হয় নাই—কারণ এডেনের

লবণ বৈদেশিক আখ্যায় পড়ে না। এই রাষ্ট্রনৈতিক মারপ্যাঁচ বর্ত্তমান থাকিতে, বাংলাকে ঘরের কড়ি দিয়া পরের লাভের খোরাক যোগাইয়া যাইতেই হইবে। তাই এই অবস্থায় বাংলার দরিদ্র জনসাধারণকে পাতের নিমকটুকু উচিত মূল্যে সরবরাহ করিতে হইলে, এডেনের লবণ বৈদেশিক পর্য্যায়ভুক্ত করিতে হইবে; নতুবা অতিরিক্ত শুল্ক একেবারে বর্জ্জন করিয়া ৫৪৸০ মূল্যের ১০০ মণ লবণ ৫০৲ টাকায় দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমোক্ত উপায় যখন রাজনৈতিক কারণে গৃহীত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না, তখন আমাদের মন্তব্য—এই অতিরিক্ত লবণ-শুল্ক রহিত করিয়া লবণ শস্তা করাই হউক।

ইহা ছাড়া, বাংলা গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করিয়া জানাইয়াছেন, এ দেশে লবণ শিল্প লাভজনক ব্যবসায় হিসাবে দাঁড়াইতে পারিবে না। ইহার কারণ কি তাহা ঠিক বুঝা গেল না। বাংলা অনাদি যুগ হইতে আহারের লবণ স্বীয় সুদীর্ঘ সমুদ্রোপকূল হইতে প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছে—আজ তাহা অসম্ভব হইবে কেন? সুন্দর-বনের বালু-সৈকতে লবণের পাহাড় সঞ্চিত রহিয়াছে—ইহা আহারোপযোগী করার ব্যবস্থাটুকু করা বাংলা গভর্ণ-মেণ্টের পক্ষে আদৌ অসাধ্য মনে করা যায় না। সে জন্য বিশেষজ্ঞের তদন্তের চেয়ে সমুদ্রতীরবাসী স্থানীয় জন-সাধারণের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শই অধিকতর বরণীয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি।

বাংলার সেচ-নীতি—

ডাঃ বেণ্টলীর কথা—"Irrigation must be the watch-word of Bengal" এবং তিনি এই আদর্শ বরণ করিয়া বাংলার অবরুদ্ধ জলপথগুলির মুক্তি ও উপযুক্ত জল সেচনের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা যথেষ্ট করিয়াছেন। তিনিই মিশর হইতে প্রসিদ্ধ পূর্ত্ত-তত্ত্ব-বিশারদ স্যার উইলিয়ম উইলকক্সকে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন ও তাঁহার সাহায্যে বাংলা দেশের জন্য একটী সুচিন্তিত কার্য্য-পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা বস্তুতন্ত্র করিতে ৪½ হইতে ৬ কোটী টাকা ব্যয় পড়িবে, স্থির হয় এবং তাহা মঞ্জুর করিলে বাংলাকে নূতন জীবন-দানের ব্যবস্থা সম্ভব হইবে, ইহাও জোর করিয়া তিনি বলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চিরন্তন অর্থানটনের অজুহাতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই সুযোগ দিতে পারেন নাই; এবং নিজেরাও হাজা-মজা নদী-নালাগুলির সংস্কারের অন্য কোনও ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন নাই।

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় স্বর্গীয় ইঞ্জিনীয়র মহাশয়ের পরিকল্পিত জল-সেচ নীতি কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে ৫ কোটী টাকা ঋণ দানের প্রস্তাব করেন। বিলটী পাশ হইয়াছে বটে; কিন্তু টাকা মঞ্জুর হইয়াছে মাত্র ২,৫০,০০০৲—এক্ষণে এইরূপ থুতু দিয়া ছাতু মলা যাইবে কি না, তাহাই বিবেচ্য। অথচ বাংলার স্বাস্থ্য, কৃষি-সম্পদ্, লোক-রক্ষা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে এই সেচ-নীতির উপর। বোম্বাই যেখানে জল-সেচ বিভাগের জন্য ১৯,৪৪,৭৫,৭৬৬৲ টাকা ব্যয় করে, মাদ্রাজ ১২,৬৫,৫৩,৯৪২৲, যুক্তপ্রদেশ ২২,০০,২৫,৬৩৬৲, পঞ্জাব ৩২,৭৮,০২,০৫১, বর্ম্মা ২,১২,২১,২৮১৲, এবং এমন কি ক্ষুদ্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও ব্যয় করে ৭৭,০৭,৪০০৲, সেখানে বাংলার জন্য বরাদ্দ আছে মাত্র ৬৭,৪৩,৫৪১৲ টাকা! অথচ এই শেষোক্ত টাকা ব্যয় করিয়া বাংলার যে জল-পথ-রক্ষা করা হয়, তাহা অন্যান্য প্রদেশের মত কার্য্যকরী হওয়া দূরে থাকুক, এক মাইলও "productive irrigation" বলিয়া গণ্য করা যায় না। বাংলার বর্ত্তমান সেচ-মন্ত্রী স্যার আবদুল করিম গজনবী সাহেব ইহার উপর ২॥ লক্ষ টাকা সংযুক্ত করিয়া কতটুকু কার্য্যকারিতা গুণ-বৃদ্ধি করিবেন তাহা তিনিই ভাল বুঝেন। বিল-প্রস্তাবক কুমার বাহাদুর স্বর্গীয় স্যার উইলকক্সের স্বপ্নের প্রতি মর্য্যাদা-দানের এই উদার বহর দেখিয়া নিশ্চয়ই মনে মনে সন্তুষ্ট ও অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। বাংলার সেচ-বিভাগের এই কার্পণ্য-নীতি সমালোচনার অতীত।

বাঙ্গালী পল্টন—

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আহ্বানে, ফরাসী চন্দননগর হইতে একদল যুবক উদ্বুদ্ধ হইয়া ইউরোপে রণ-যাত্রা করিলে, সে দিন বাঙ্গালীর জীবনে "red-letter day" বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আমাদের মনে আছে, সে দিন বিখ্যাত জাষ্টিস চন্দ্রাভরকর, লর্ড সিংহ প্রমুখ ভারতের শীর্ষস্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী নেতৃগণ চন্দননগরে শুভাগমন করিয়া এই তরুণ রণ-বাহিনীকে সগৌরবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন ও শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। পলাশীর পর এই দিনে বাঙ্গালী বীর-জীবনের পরিচয় দিবার সর্ব্ব প্রথম সুযোগ লাভ করিয়াছিল এবং সে সুযোগ চন্দননগরের তরুণ যোগ্যতার সহিত ব্যবহার করিয়াছিল। ভাদুনের প্রচণ্ড সমরে, ইহারা যে বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার ফলে ফরাসী সেনানায়কের উচ্চ প্রশংসাপত্র আমাদের নিকট পৌছিয়া আমাদিগকে পুলকিত, গৌরবে আনন্দে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিল।

ইহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া এস কে মল্লিক বৃটিশ [illegible] বাঙ্গালী যুবকদের এইরূপ সুযোগ দিবার জন্য [illegible] আন্দোলন উত্থাপন করেন ও ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেণ্ট গঠিত হয়। মেসেপোটেমিয়ায় এই বাহিনী প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যুদ্ধাবসানেই এই বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালী রণক্ষেত্রে নব দীক্ষা লাভ করিয়াও, তদবধি স্থায়ী ভাবে ভারতের সামরিক বিভাগে কার্য্য করিবার সুযোগে বঞ্চিত হইয়াছে।

সম্প্রতি রায় বাহাদুর কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুযোগ পুনরায় মুক্ত করিয়া দিবার জন্য বঙ্গীয় কাউন্সিলে প্রস্তাব করেন এবং সে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ধূমায়িত সামরিক আকাঙ্খা আত্মপ্রকাশের একটা প্রণালী খুঁজিতেছে। বীর জাতির সকল গুণই বাঙ্গালীর চরিত্রে নিহিত আছে ও সুযোগ পাইলেই তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে, ইহা চন্দননগর ও বাংলার তরুণ গত মহাযুদ্ধে প্রমাণ করিয়াছে; কাজেই যোগ্যতার কথা আর নূতন করিয়া প্রতিপাদনের প্রয়োজন নাই। গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবটী যেন মনে হয় উদাসীন ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন; অন্যথা, স্বরাষ্ট্র-সচিব এক্ষেত্রে কলিকাতা ও ঢাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সুযোগ বাঙ্গালী যুবকেরা কেন গ্রহণ করিতেছেন না, এ অভিযোগ তুলিতেন না। মিঃ মোমিন তাহার উত্তর দেন—যে বাঙ্গালী চাহিতেছে যে সব পুরাদস্তর সামরিক বাহিনীতে উপস্থিত তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই তাহাতেই প্রবেশ করিতে, শুধু স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করিতে নয়—এবং প্রস্তাবটীতে তাহাই উল্লিখিত আছে। বাংলা-গভর্ণমেণ্ট অবশ্য এই প্রস্তাব ভারত-গভর্ণমেণ্টকে যথারীতি বিজ্ঞাপিত করিবেন। ভারতীয় এসেম্বলীর বাঙ্গালী সদস্যগণও উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এই আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করিতে, আশা করি, ত্রুটি করিবেন না।

বিপ্লব দমন আইনের পাণ্ডুলিপি—

বাংলায় বিপ্লব-দমন বিল পুনরায় বাহাল করিবার জন্য সিলেক্ট কমিটীতে প্রদত্ত হয়। কমিটী উহার সামান্য একটু অদল বদল করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ভয়াবহ অনেক সূত্রই সমান ভাবেই বর্ত্তমান আছে। এই আসন্ন বিধান যে দেশবাসীর প্রাণে আশ্বস্তির চেয়ে সমধিক বিভীষিকা ও আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছে, ইহা অবধারিত। অথচ দেশবাসী বিপ্লব-বীজ দেশের বুক হইতে উৎপাটিত করিতেই কৃতসঙ্কল্প এবং গভর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিতেও প্রস্তুত। বিপ্লব-দমন আইনের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলে এই সহযোগিতা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াই পড়িতে হয়—কেন না, এই আইন হইলে সমিতি, সংবাদপত্র, সাহিত্য প্রভৃতি কথা বলিবার ও কাজ করিবার সকল প্রণালীই এমন এক প্রকার আড়ষ্টতার আবহাওয়ায় কুণ্ঠিত ও অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে, যে সহজ সরল সহযোগিতার সুযোগই আর মিলিবে না। গভর্ণমেণ্ট দেশের এই মর্ম্মাহত অবস্থা বুঝিতেছেন না বলিয়াই আমরা আরও দুঃখিত।

আলিপুর জেলে অনশন—

এক সপ্তাহর অধিক আলিপুর জেলের বন্দীদের অনশন-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার প্রতিকারের খবর আসে নাই। দেশবাসী উৎকণ্ঠিত। বন্দীরা যখন অনশন করে, তখন নিরুপায় হইয়াই করে। ইহাদের অভিযোগ হয়ত জিদের উত্তরে জিদের চেয়ে যুক্তি ও স্নেহ মূলক আচরণে সহজে দূর হইতে পারে। দেশ সেই সান্ত্বনাটুকুই এখানে চাহিতে পারে এবং চাহিতেছে। সে সান্ত্বনা দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। ২০।১১।৪০

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী গুড্ ফ্রাইডের অবকাশে (২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হইতে) তালতলা পাব্লিক্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সম্মিলনের মূল সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শাখা সভাপতিগণের নাম নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল।

(ক) সাহিত্য-শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে। (খ) বিজ্ঞান-শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার মিত্র। (গ) বৃহত্তর বঙ্গ শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। (ঘ) ইতিহাস শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন। (ঙ) বাংলা ভাষা ও মুসলিম সাহিত্য-শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর। (চ) ধনবিজ্ঞান শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার। (ছ) চারুকলা ও লোকসাহিত্য শাখা-সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন। (জ) শিশু সাহিত্য ও মহিলা শাখা—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক। (ঝ) গ্রন্থাগার আন্দোলন শাখা-সভাপতি শ্রীযুক্ত কে, এম, পাশাহুল্লা।

এই সম্মেলনের অন্যান্য তথ্য তালতলা পাব্লিক লাইব্রেরীর সম্পাদক, শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র নিয়োগীর নিকট জ্ঞতব্য। বাংলা ও বাংলার বাহিরের সকল সাহিত্যিক ও শিক্ষিত মহোদয়গণের উৎসাহ, সাহায্য ও উপস্থিতির দ্বারা সম্মেলনের সাফল্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। বাংলার এই সম্মিলিত সাহিত্যান্দোলনের বিলুপ্তপ্রায় প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ ধন্যবাদার্হ।

[আশ্রমি লিখিত]

১২শ বর্ষ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

দ্বাদশ বর্ষে এক একটা ব্রত পূর্ণ হয়, ইহা প্রসিদ্ধি আছে—আমাদের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবেরও এইবার দ্বাদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইবে। সঙ্ঘের জাতি-সেবা সঙ্কল্পের ইহা একটা স্মরণীয় পর্য্যায় ও ঘটনা।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের "যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরকে" কেন্দ্র করিয়া এই উৎসব। আজ দ্বাদশ বর্ষ হইল, ১৩২৯ বঙ্গাব্দের (ইং ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দির প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অধিকারভুক্ত হয়। পর বৎসর শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায়, যোগ্য সমারোহে ভারত-লক্ষ্মীর প্রতীক-চিহ্ন-স্বরূপ রজতকুম্ভে স্বর্ণাঙ্কিত প্রণব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠান হয়। সে মহোৎসবের স্মৃতি আমরা ভুলি নাই। তপস্যার যজ্ঞকুণ্ডে আত্মাহুতির অনল-শিখা জ্বালাইয়াই সঙ্ঘের জীবন-সাধনায় একদিন মন্দিরের মহিমা-স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল—এই লুপ্ত মহিমা জাগ্রত করিয়া ভারতের মন্দির জ্ঞান ও তপস্যার কেন্দ্র-তীর্থ রূপে যাহাতে আবার জাগিয়া উঠে, তাহাই ছিল আমাদের আদর্শ। ভারতের মুক্তি—জাতি-সাধনারই অনিবার্য্য অভিব্যক্তি; সে মুক্তি নির্ব্বাণ-মোক্ষ নয়, প্রেম ও ঐক্যের অমল শতদলে ভারতাত্মার পরিপূর্ণ স্ব-প্রকাশ। সঙ্ঘ এই মহাযজ্ঞের ভিতর দিয়া চাহিয়াছে জাতি-রূপে জাগিতে বাঁচিতে, ভারতকে সত্য-রূপে চিনিতে পাইতে এবং সেই আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়াই চিণ্ময়ী ও মৃন্ময়ী ভারতলক্ষ্মীর অটল প্রতিষ্ঠা। মন্দির-গ্রহণের গোড়ার সঙ্কল্প ছিল ইহাই, উদ্দেশ্য সার্থক না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনার সিদ্ধি নাই, দ্বাদশ বর্ষের সন্ধি-বৎসরে আমরা এই আত্ম-সাধনারই একটী শুভ যুগ-পর্য্যায় প্রতীক্ষা করিতেছি।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সঙ্ঘ ও চন্দননগরবাসীর সম্মেলনে ১১শ বর্ষের উৎসব-সমিতির বিলোপ এবং সেই সঙ্গেই অতঃপর নব বর্ষের জন্য নূতন উৎসব-সমিতি সংগঠিত হয়। এই নব-গঠিত উৎসব-সমিতিতে নিম্নলিখিত নির্ব্বাচিত সভ্যমণ্ডলী কার্য্যকরী সভার কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

সভাপতি—শ্রীকালীপদ বসু, মেয়র, চন্দননগর
সহঃ ,, —শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে, সহকারী মেয়র
শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক, ভূতপূর্ব্ব কন্সেই জেনারেল
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসত্যানন্দ বসু, কলিকাতা
সহঃ ,, —শ্রীঅরুণচন্দ্র সোম, জমিদার, চন্দননগর
সম্পাদক —স্বামী বোধানন্দ

দ্বাদশ বর্ষের মহোৎসব উপলক্ষে মন্দিরগুলির পুনঃ সংস্কার ও উৎসবাঙ্গ স্বরূপ জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করা হইতেছে। যাহারা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কর্ম্মধারার সহিত চিরদিন অনুরাগ ও সহানুভূতির সূত্রে আপনাদিগকে সংযুক্ত অনুভব করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা লইয়া নববর্ষের উৎসব যোগ্য ভাবে অনুষ্ঠিত ও সার্থক হউক, ইহাই প্রার্থনা।

প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি-ভবনে পরিদর্শনে ফরাসী-ভারতের গভর্ণর

বিগত জানুয়ারী মাসের ২২শে তারিখে ফরাসী ভারতের গভর্ণর মিঃ জর্জ্জ বুরে তাঁর সেক্রেটারী মরিস এবং চন্দননগরের এডমিনিষ্ট্রেটর ও মেয়র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রবর্ত্তক বিদ্যাথিভবন পরিদর্শন করিয়া সাতিশয়

প্রীতিলাভ করেন। এতদুপলক্ষে গভর্ণর বাহাদুরকে যথোপযুক্ত অভিনন্দন দেওয়া হয়।

চট্টল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে মনীষী সমাগম

৪ঠা মার্চ্চ রবিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার চট্টল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কুমিল্লার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত ও চট্টলের জন ত্রিশেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক। সময় সংক্ষেপ হলেও এই উপলক্ষে উভয় পক্ষের মধ্যে—ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা হয়। সঙ্ঘের কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু পাইয়া তিনি সন্তুষ্ট হন ও ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ১৯০৭।৮ সালে সঙ্ঘের বিশিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে একযোগে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি আজও গৌরব বোধ করেন।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীযুক্ত পি, কে, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া প্রবর্ত্তক আশ্রমে যান। তথায় শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী নিম্ন-লিখিত বক্তৃতা করেন :—

"এখানে আসিয়া শুধু একটী ভাবই মনে জাগিতেছে, হয়ত ইহা ক্ষণিকের মাত্র তবুও ইহা এইক্ষণের নিমিত্ত একান্ত সত্য! সেই ভাবটী হইতেছে আমি যেন এখানে থাকিয়া যায়। আপনারা যে রবীন্দ্রনাথের গানটি গাহিলেন, সেই গানের

"করুণারুণ রাগে, নিদ্রিত ভারত জাগে"

এই কলিটী শুনিতে শুনিতে আমার ইহাই মনে হইতেছে যে বহুদীর্ঘ শতাব্দীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ এই গিরিকন্দরে প্রাণের শিহরণ জাগিতেছে।

আমরা কলিকাতায় থাকি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্য্যে বহু কোটী টাকা আয় ও ব্যয় হইতে দেখি। এই কলিকাতা নগরীকেও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি বলিয়া জানি। নগরীর বাহিরে যে কোথাও শিক্ষা সভ্যতা প্রাণবন্ত হইয়া দেখা দিতে পারে, তাহা কল্পনাও করি না। সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার দেখিয়া তাহার মধ্যে যে দেবতার আসন রহিয়াছে, সে বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছি! আজ এখানে আপনাদের মধ্যে আসিয়া মানুষের প্রতি হারানো বিশ্বাসটুকু খুঁজিয়া পাইলাম। জীবনের এক মহালাভ

প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি-ভবন পরিদর্শনে ফরাসী ভারতের গভর্ণর

সংঘটিত হইল। আপনারা যে নগরের মুখর বাচালতা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া একদল তরুণ এই ভাবে জাতির মেরুদণ্ডে শক্তি সঞ্চারের সাধনায় ব্যাপৃত আছেন, ইহা দেখিয়া আমার খুবই আনন্দ হইতেছে। সত্যই আমি অনুভব করি, জাতির এই যুগসন্ধিক্ষণে জীবনের সর্ব্ব অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগ-বৈরাগ্যের ধ্বজা উড়াইয়া জাতির মুক্তির পথ সুগম করিবার জন্য একদল লোকের পথে বাহির হইতে হইবে।

বাংলার জাগ্রত যুবকের দল এইভাবে ত্যাগের হোমানল জ্বালাইয়া বাংলার প্রাণশক্তি বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, ইহা সত্যই গৌরবের বস্তু।

স্বর্গীয় দেশবন্ধু বলিতেন, বাংলার প্রাণ গ্রামে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই গ্রামবাসীদের প্রতি আমরা ফিরিয়াও তাকাই নাই। চাষা একটা মানুষ, তারও যে হৃদয়, প্রাণ ও বুদ্ধি আছে, ইহা আমরা বুঝি নাই। আজ যে আপনারা একদল তরুণ জীবনের সর্ব্ব উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নীরবে এই পর্ব্বতশ্রেণীর কোলে বসিয়া, বস্তুর সঙ্গে একটা সত্য পরিচয় স্থাপনের প্রচেষ্টা করিতেছেন—গ্রামে একটা নব প্রাণস্পন্দন জাগাইবার জন্য শ্রম দিতেছেন, তজ্জন্য সমস্ত বাংলার পক্ষ হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্ব্বশেষে, দেশপ্রিয় সম্বন্ধে একটু কথা বলিয়া শেষ করিব তাঁহার সম্বন্ধে আপনাদের বিবৃতিতে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য! তিনি কোন কর্ম্ম-বিশেষে বা প্রতিষ্ঠান-বিশেষে থাকিতেন না। যেখানে উদ্যতপ্রাণ শক্তির পরিচয় পাইতেন, সেখানেই তাঁহার আন্তরিক সহায়তা গিয়া পড়িত। তাঁহার সৌভাগ্য বলিয়াই বলিতে হইবে, যে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাকে তিনি তাঁহার যোগ্য সহধর্ম্মিণীরূপেই পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে সর্ব্বকর্ম্মে তিনি ছিলেন উৎসাহদাত্রী। আজ তাঁহার মৃত্যুর কয়েকমাস পরেই শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার প্রথমে চট্টগ্রাম আগমনেই—তাঁহাকে যে আপনারা এমন আপনার করিয়া লইলেন, তাহা হইতে মনে হয় যে, আপনাদের কোথাও বাঁধন নাই— আপনারা চির উদার মুক্ত। আজ আমাদের সঙ্গে আপনাদের যে নিবিড় সংযোগ সাধিত হইল, ইহা উত্তোরোত্তর বর্দ্ধিতই হোক। ভগবানের নিকট ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

হৃদয়-পদ্ম

শ্রীঅবনীনাথ গুপ্ত

মম সকল সত্তা ব্যাপিয়া জাগাও
তোমার গভীর ছন্দ,
কেন মলিনতা মাঝে হয় ক্ষণে ক্ষণে
শুভ্র-চেতনা বন্ধ!
জ্ঞানের প্রভাত-অরুণ-আলোকে,
হৃদয়-কমল বিকশি পুলকে—
বিলাইয়া দিক গগনে পবনে
নির্ম্মল মধুগন্ধ।
মম সকল সত্তা ব্যাপিয়া বাজিবে
তোমার ব্যাকুল ছন্দ।

যে ব্যথার সুর বাজিছে শাঙনে
ঝর ঝর বরিষণে,
উতল বাতাসে করুণ আবেশে
ঘনায়িত ঘন গানে;
যে সুর আজিকে তারায় তারায়,
পথহারা হ'য়ে কেঁদে ফিরে যায়
আজি এ বাদল তিমির নিশিথে
পরশ লভিল প্রাণে।

উদ্দাম যাহা হেরি চঞ্চল
নিখিল ভুবন ছাইয়া,
অন্তরলোকে জাগ্রত তুমি
শান্তির বাণী বহিয়া!
যা কিছু মোদের দৈন্য-বেদন,
ক্ষুদ্রতা সব ক'রেছে সৃজন;
লভিব আত্মা মঙ্গলময়
জ্ঞানালোক-পথ বাহিয়া।

সকল করমে সকল আবেগে
সুখ ও দুঃখে-মরণে,
হেরিবারে দাও শকতি মরমে
কাণ্ডারী, তব চরণে।
চেতনাস্বরূপ তব অবদান,
অমৃতময় জীবন মহান
বিকশিত কর গভীর জ্ঞানের
বিপুল চেতনানন্দে;
কবে সকল তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হবে
তোমার গভীর ছন্দে!

নববর্ষের প্রবর্ত্তক

নিবেদন

"প্রবর্ত্তক" বাঙ্গালীর এক অভিনব সম্পদ্। দেবনাগরী অক্ষরে "প্রবর্ত্তক" যখন প্রথম পাক্ষিক আকারে বাহির হয় শীর্ণ-মূর্ত্তি নিয়ে, দেশের তরুণ তাকে বুকে ক'রে নিয়েছিল মহা সমাদরে—সে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের কথা। তারপর, ধীরে ধীরে "প্রবর্ত্তক" বর্ত্তমান আকারে মাসিক রূপে পরিবর্ত্তিত হ'লো। বিপদের পর বিপদ অতিক্রম করে' "প্রবর্ত্তক" আগামী বৈশাখে উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করবে।

"প্রবর্ত্তকে" মতিবাবুর লেখাই ইহার প্রাণ। এমন দিন গেছে, যেদিন একাই তিনি 'প্রবর্ত্তকে"র ৬৪ পৃষ্ঠা পূর্ণ করেছেন। বুকের রক্ত ঢেলে, তাঁর অগ্নিমন্ত্রে বাঙ্গালীর মরা প্রাণে জীবনের স্পন্দন উঠেছে। "প্রবর্ত্তকে"র মন্ত্রসিদ্ধি এইখানেই।

স্বপ্ন যে দেখে, সে স্বপ্নকে রূপ দিতে চায় না, রূপ দেওয়ার শিল্পী প্রায় অন্যে হয়। এই ক্ষেত্রে তাহার অন্যথা হয়েছে। মতিবাবু স্বপ্নের সঙ্গে রূপের রেখা টান্‌তে গিয়ে ব্যর্থ হন নাই কর্ম্মক্ষেত্রে; কিন্তু স্বাস্থ্য হারিয়েছেন অসময়ে। তবুও "প্রবর্ত্তকে" তাঁর বাণী অল্প নহে। যাঁরা "প্রবর্ত্তকের গ্রাহক, তাঁরা ইহা লক্ষ্য করবেন।

বর্ত্তমান যুগের অর্থ-সমস্যা সম্মুখে রেখে "প্রবর্ত্তকে"র সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিসাধন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার, প্রেরণায় "প্রবর্ত্তকে"র কলেবর বৃদ্ধি স্বাভাবিক। "প্রবর্ত্তক" পাঠকদের মধ্যেও যাঁরা ইহার ভাব ও ভাষায় উদ্বুদ্ধ, তাঁদের অবদানও "প্রবর্ত্তকে"র শোভা বর্দ্ধন করেছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক প্রভৃতির দানেও "প্রবর্ত্তকে"র যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

অতঃপর "প্রবর্ত্তক"কে অধিকতর সম্পদ্‌পূর্ণ করে' বাহির করার জন্য আমরা আগামী বর্ষে ইহাকে নূতন কলেবর দিতে উদ্যত হয়েছি। আমাদের পাঠক ও গ্রাহকবর্গের সহানুভূতি ও আনুকূল্য প্রার্থনীয়।

"প্রবর্ত্তকের" ভাব ও আদর্শ মতিবাবুর লেখনী অচল না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হবে না, ইহা আমরা নির্ভয়ে বল্‌তে পারি। ইহার সঙ্গে তাঁহারই নির্দ্দেশে "প্রবর্ত্তক" বাংলার প্রাণে সকল দিকের আশা ও উৎসাহের আলো জেলে তোলার জন্য গল্প, উপন্যাস ব্যতীত, শিল্প, বাণিজ্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবন্ত সাহিত্যের অনুশীলন ইহার মধ্যে নিহিত করা হবে। "প্রবর্ত্তকে" দুইখানি বহুবর্ণ ও প্রায় ৪০ খানি এক বর্ণ ছবি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে; দুই ফর্ম্মা অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠা কাগজও বৃদ্ধি করা হবে। এই অনুসারে আমরা ইহার মূল্য কেবলমাত্র ৩৸৹ আনা স্থলে ৪৲ ধার্য্য করলাম। আশা করি গ্রাহকদের ইহাতে কোনই অসুবিধা হবে না।

"প্রবর্ত্তকে"র নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠকগণ আগামী বর্ষেও ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হয়ে' আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিলে বাধিত হ'ব। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা ২০শে চৈত্রের মধ্যে আমাদের অফিসে না পৌছিলে ১লা বৈশাখ বৈশাখের "প্রবর্ত্তক" ভিঃ পিঃ যোগে প্রেরণ করা হইবে। যাঁহারা গ্রাহক থাকতে অনিচ্ছুক, অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত [illegible] তারিখের মধ্যেই খবর পাঠাবেন।

কর্ম্মকর্ত্তা—"প্রবর্ত্তক"

[illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.
Printed by Krishna Prasad Ghosh, at Prakash Press—61, Bowbazar St. Calcutta.